আবুল বাশার

অগ্নিবলাকা



রাহুল চিৎপুরে এই প্রথম কালোগাড়ি ঢুকতে দেখল। এরকম একটি অখ্যাত অজ গ্রামে কালোগাড়ি আসার ঘটনা অদৃষ্টপূর্ব। এই ধরনের লম্বা, বড় ছাদঅলা, প্রকাণ্ড কালো রঙের মোটর দেখার অভিজ্ঞতা রাহুলের নেই। গাড়ির পিছনে দুই পাল্লার ঝমঝমে দরজা মাঝে মাঝেই রাস্তার খন্দে পড়ে ঝাঁপাচ্ছে। এটির গায়ে ওটি যেন চাপড় মেরে চলেছে ক্রমাগত। ঝগড়ুটে পাল্লাদুটি ছাড়া গাড়ির আর কোন শাব্দিক দোষ নেই।

শোঁ শোঁ একটা শব্দ হয় ইঞ্জিনের খুব চাপা, গলা মোটেও ঘড়ঘড় করে না, তেলপোড়ার কটুগন্ধও নাকে লাগে অত্যন্ত কম। এই গন্ধটা রাহুলের অবশ্য বেশ পছন্দ, গাড়ির মুভমেণ্টে একটা কেমন গা আলগা ভাব, যেন এ গাঁয়ে বেড়াতে এসেছে।

আশ্বিন মাস। এই মাসে রাহুলের জন্ম। জন্মমাসের উপর মানুষের একটা আলাদা টান থাকে। তাছাড়া মাসটি এমনিতেই সুন্দর। স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ আলো। হালকা সাদা মেঘ। একটু একটু শীতের আমেজ। বর্ষার পর পাখিদের গলা খোলে। ফড়িঙের সঙ্ঘবদ্ধ শূন্য-সাঁতার চোখে পড়ে, কোথাও যেন যাচ্ছে না, কেবলই ভাসছে। অবশ্য ফড়িং ধরার বয়স আর নেই, কিন্তু ফড়িং আছে। চারিদিকে একটা চিকচিক শব্দ। পাখিদের শিস লেগেই আছে। কা কা করছে সবখানে। এখন উড়ছে ধানের গা থেকে আসা তেকোনা ছোট পতঙ্গ, প্রজাপতিই হবে। ওর গায়ে আফসান আছে, রেণুরেণু। শুঁকে দেখলে ধানের গন্ধ লাগে বা খড়ের গন্ধ বা ঘাসের গন্ধ। খড়ের গাদার ভেজা গুমোট থেকে দলে দলে বার হয় এরা। এবং এরা ধানগাছের গোড়ায় থাকে, গায়ে লেগে থাকে থোড়ের গর্ভকুসুমের ছাই। খোলা বইয়ের অক্ষরে সেই ছাই লেগেছে এবং একটা মৃত পতঙ্গ পাতার চাপে পড়ে জীবাশ্মের মত হয়েছে। তার একটা কষাটে দাগ লেগেছে অক্ষরে। অক্ষরটি অদ্ভুত। মরা পতঙ্গের মুখে চেপটে গেছে।

জানলা দিয়ে বাইরে চোখ চলে যায়। অক্ষরটিকে আর দেখা হয় না। গাড়িটা দক্ষিণ দিক থেকে ঘুরে পথ যখন পূর্বদিকে সিধে হয়, সেই পথে এগিয়ে আসে। এখন দুপুর। ভাদুরে ধান মাড়াই হচ্ছে বাইরের উঠোনে গরু দিয়ে।

বাবা মাথায় সাদা ফেট্টি বেঁধে 'কান্দল' দিয়ে মাঝে মাঝে ধানের গাছশিষ নেড়ে উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন ঘূর্ণায়মান গরুদলের পায়ের তলায়। মেড়াটা নাড়া পাকিয়ে তোলে, পাকানো ধানগাছ কান্দলের বাঁকা চঞ্চু দিয়ে টেনে ছড়িয়ে দিতে হয় অন্য গরুদের পায়ের তলায়।

সরু বাঁশের আঁকশি-বিশিষ্ট এক ধরনের হাতিয়ারের নাম 'কান্দল'। বাংলার অভিধানে

এই হাতিয়ারটির কী নাম ভগবান জানেন, রাহুল জানে না। হয়ত এই জিনিস এখনও আভিধানিক হয়নি। হলেও এমন নাম রয়েছে, রাহুল চিনতে পারবে না। কান্দল বা কাঁদলকে অন্য নামে ডাকবার বিদ্যা চিৎপুরের জানা নেই। ধান মাড়াই হচ্ছে, ছড়ানো এই গেছো ধানের গোলাকার ঘূর্ণন, ঘুরছে গরু এবং একজন মুনিষ— পুরো এই কাজটি 'মলনের' কাজ। দলন-মলন। যাকে বলে, দলাই মলাই, তাই হল মলন। বাবা কোথায় ? বলতে হবে, মলনে বা মলনের কাছে।

মলনের কাছে এসে কালো গাড়ি কি থামল ? ধান মাড়াইয়ের প্রাঙ্গণকে চিৎপুর বলে খুলান। খুলানে এসে কচি পাকুড় তলায় নাড়াগাদার কাছে কালোগাড়ি থেমে গেল কেন ?

বাইরে বেরিয়ে এল রাহুল। বাবা ধানগাছের জট ছাড়াতে ছাড়াতে থেমে পড়েছেন। বইয়ের ফাঁকে পাঠ্যান্তরকে আঙুল দিয়ে আটকে বই-ধরা অবস্থায় সে এসে দাঁড়ায়। গাড়ির অভ্যন্তরে অন্ধকারে দুই দিকের টানা বেঞ্চে বসে আছে দুই তিন জন বন্দুকধারী পুলিস, একজন কোমরে দড়িবাঁধা চোর। কদম আলি। নিতান্তই ছিঁচকে। এই কদম আলিই বাবাকে গড়াবাসা থেকে লঘুশাল ধানের 'বিছন' এনে দিয়েছিল গত সন।

গাড়ির সামনে তকমা-আঁটা রৌপ্য-নক্ষত্র বেঁধানো কাঁধ-অলা খাঁকি অফিসার, আগে কখনও দেখা যায় নাই। থানার বড়বাবুরও উপরের লোক বোধহয়। বড়বাবুও সঙ্গে আছেন। তাঁদের পাশে বসে আছেন সাদা হাফ শার্ট আর পা-জামা পরা মহীন গোমস্তার ছেলে ললিতবাবু। রেশনের দোকান আছে ওঁর। এখন ওঁর ভাইপো গোমস্তার ট্যাক্স আদায় করে। উনি পলিটিক্স করেন। তাছাড়া উনি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের মাস্টার। মধ্য চাষী লোক। ওঁর কড়া উত্তেজক খর চরিত্রকে সবাই ভয় পায়। এই থানার উনি পার্টি-কনভেনার। রেশন-দোকান ওঁর ছোটভাই ত্রিদিবের নামে চলে।

ছিঁচকে চোর ধরার জন্য একটা প্রকাণ্ড কালোগাড়ি, তিনজন বন্দুক তাক করা সিপাহী এবং এত বড় মস্ত অফিসার কেন ? এবং বাবার কাছে এসে থামলেন কেন হঠাৎ ?

বাবার হাতের কাঁদল থেমে পড়েছে। তিনি যথারীতি আশ্চর্য হয়েছেন। তাঁর বাড়িতে কখনও ফৌজদারি মোকদ্দমা ঢোকেনি, থানা-পুলিস হয়নি কখনও। একটি মাত্র ঘটনা কেবল অন্য রকম হয় একদিন অতীতে। তাছাড়া কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ ঘটে না। সৎ লোক বলে সবাই জানে। নানান মজলিশে তাঁর খাতির আছে। বিভিন্ন গাঁয়ের বিচার-আচ্চায় বাবা একজন মুরুব্বি। রঘুনাথপুর মাইনর স্কুলের হেড-পণ্ডিত। নামটি মাইনর, কিন্তু আসলে প্রাইমারি। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশুনোর মঞ্জুরির প্রস্তাবনা ছিল গোড়ার দিকে, কিন্তু কোনদিনই তা হয়নি। ১৯৭১ সালের আগে অবধি এ গাঁয়ে ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল পাশ কোন মানুষ ছিল না। বাবারই ছাত্র তিন চার সন হয়েছে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করল, নাম নকিবুদ্দিন মোল্লা। এ গাঁয়ে, অর্থাৎ রঘুনাথপুরে এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কাদা ঠেলে বর্ষায় ওই গাঁয়ে ছাত্র পড়াতে যাওয়া যে কী মেহনত তা বাবাকে না দেখলে কল্পনা করা যায় না।

বাবার মাথায় ফেট্টি বাঁধা ছিল বলে বড় দারোগা অম্বরীশলাল, দৃশ্যত হাতে কাঁদল-ধরা মানুটিকে চিনতে পারেন না। গরুর পাল থেমে পড়েছিল— হুকুম আলি, বাবার পছন্দের মুনিষ গরুর ন্যাজে চাটকি আর জিভে চিক্ করতেই মলন ঘুরতে শুরু করল। বাবা হুকুমের হাতে কাঁদলটা গুঁজে দিয়ে দারোগার দিকে সরে আসেন। পরনের লুঙ্গি কাজের সুবিধার জন্য কোমরে উঁচু করে গোঁজা। লুঙ্গিতে দু' হাত মুছে নিলেন, তারপর কোমর

থেকে টেনে নামালেন পায়ের পাতা পর্যন্ত।

বললেন, আমার চশমাটা তাকের ওপর আছে। বড় ঘরে গিয়ে দ্যাখো। নিয়ে এসো মেজখোকা, আমি বিনে চশমায় ললিতকে চিনতেই পারছি না।

রাহুল চশমা আনতে যায়। যাওয়া এবং আসার সময়টুকুতে কী কথা হল বুঝতে পারে না, চশমা এগিয়ে দিতেই মাথার ফেট্টি খুলে ফেলা বাবা ফের হুকুম করেন—সানফ্রাইজের ফুলশার্ট, খাদির বেনিয়ান জ্যাকেট, সব আনো। পাজামা আনবে ? না থাক। লুঙ্গিতেই হবে। কালো জুতো জোড়া দিও। কালি করা আছে।

—আপনাকেও কি চেনবার উপায় আছে ! মোলায়েম সুরে অম্বরীশ বলেন।

বাবা মিষ্ট হাসেন। ভেতরে ভেতরে তিনি যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন তেমন মনে হয় না। বলেন— খাঁটি চাষী মানুষ, ছাত্র পড়াই। আপনার চেনার কথা নয়।

—আপনি মুরুব্বি লোক।

—বয়েস হলে মুরুব্বি হয় সকলেই। হয়েছি। বিচার-কর্মে ডাক পড়লে যাই। তাছাড়া আসল পরিচয় তো চাষী। শেকড়ে বাকড়ে কৃষক। কালটিভেটার, ফারমার নই। দেখলেন তো, মলন ঘোরাচ্ছি, হাতে নাতে কাজ।

—ইংরেজি বলা এমন চাষীরা গাঁয়েগঞ্জে খুব ফেমাস হয়। আপনার খুব নামডাক আছে। সেই জন্যে ললিতবাবু আপনার কাছে ধরে এনেছে। চলুন, আপনি একটু আমাদের সঙ্গে যাবেন।

—না। আমি কোন মানুষের দিকে আঙুল তুলে বলতে পারব না, এই লোকটা চোর, কি দাগী ! চাষী লোক। জজ তো নই মশাই। আমাকে কেন এই সব বিড়ম্বনার মধ্যে টানছেন !

পাকুড় চারার তলা দিয়ে পথ গিয়েছে নানান দিকে। নদীর দিকে, মাঠের দিকে, গঞ্জের দিকে— বিচিত্র দিকে চলে গেছে চৌমাথার এই গোড়া থেকে। এই জায়গাটি হল চিৎপুরের মোহড়া। কথাটি মোহনার বিকৃতি সম্ভবত। অবশ্য গরুগাড়ির সম্মুখের দুই বাহুর মিলিত অংশ, যেখানে গাড়োয়ান বসে গরু খেদিয়ে চলে, সেই মুখটির নামও মোহড়া— দক্ষিণে আছে মোহড়ার ঘাট।

দিবারাত্র এখানের দিঘল মাচায় লোকের আনাগোনা, মজলিশ-বিবাদ হয়। আউশের মলন-ঘোরানো তাড়ায় এই দুপুরে মাচা সুনসান। কালোগাড়ির আবির্ভাবে তবু এখন দু' চারজন জমে এল চতুর্দিক থেকে। পথ-চলতি ভিন্ গাঁয়ের লোক দাঁড়িয়ে পড়ল।

অম্বরীশলাল বললেন— মিঃ চৌধুরী ! আপনি অনুগ্রহ করে পাজামা পরে নিন।

—কেন লুঙ্গি থাকলে অসুবিধা কোথায় ? আমাকে কত দূর নিয়ে যাবেন ? আশ্চর্য স্বরে জানতে চাইলেন রাহুলের বাবা সাদা চৌধুরী। সাদা ওঁর ডাকনাম।

—কদমকে তো চেনেন ! ওই রকম দুচারটি কালপ্রিট, হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাব। এমারজেন্সির এসব হল থানা-ডিউটি ! চলুন ! আপনি আমাদের সাক্ষী !

অম্বরীশ পাতলা হেসে হাতের রুল উঁচিয়ে গাড়িটাকে দেখালেন। গাড়িতে উঠে পড়ার জন্য নির্দেশ করলেন।

—আমি কোন বিসম্বাদ ভালবাসি না বড়বাবু। আজ থেকে পাঁচ-সাত বছর আগে লগড়াজলির মার্ডার কেসের সাক্ষী আমি ছিলাম। বাধ্য হয়ে। জীবনে একবার, ওই একবারই। বাধ্য কেন হলাম ! আমারই চোখের উপর ঘটনা ঘটল তো ! আমি মিথ্যে বলতে পারিনি।

কথাগুলি বলতে গিয়ে সাদা চৌধুরী আর ললিতের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারলেন না। চোখের পাতা আপনা থেকে মাটির দিকে নেমে গেল। সাদা বুঝতে পারছিলেন তাঁর বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। আজকের কালোগাড়িটিকে তিনি যথেষ্ট ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি চোখ নামিয়েও বুঝতে পারছিলেন, তাঁর কথায় চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে এবং ললিতের চেহারাও আর স্বাভাবিক নেই।

মৃদু অথচ খর গলায় ললিত বললেন— আপনার সাক্ষীর দাম আছে সাদা চৌধুরী ! এ দিগরে সবাই জানে। আঙুল আপনাকে তুলতে হয় না। বড়বাবু ডাকছেন, চলুন ! ধর্মের যুধিষ্ঠিরও কি আর আঙুল তুলে কথা বলতেন !

ললিতের কথায় আহত সাদা কেমন তৃষ্ণার্ত চোখ তুলে নক্ষত্র-খচিত পুলিস অফিসারটির দিকে চাইলেন। চাহনিতে ফুটে উঠল প্রার্থনা।

—আমার আর ন'মাস স্কুলের চাকরিটা আছে। রিটায়ার করব।

—চাকরির কোন ক্ষতি আপনার হবে না।

আশঙ্কার উত্তরে পুলিস-অফিসার কথা বললেন এই প্রকার।

বললেন— আপনাকে থানায় গিয়ে একটা সই করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেব। আপনি সাক্ষী রইলেন। ব্যস !

সাদা চৌধুরী গাড়িতে ওঠার আগে দেখলেন তাঁর সবচেয়ে ছোট মেয়ে, শেষ সন্তান নূপুর পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে সবুজ ধানের পাতা চুষতে গিয়ে ঠোঁট কেটে ফেলেছে, তারপর অক্ অক্ করতে করতে বসে পড়ল পথে। বমি করতেও পারছে না, গলায় সাঁধ হওয়া পাতায় দম আটকে পড়েছে। দু'চারজন ওর দিকে ছুটে গেল। রাহুল ভাবতে পারল না সে বোনটির দিকে ছুটে যাবে নাকি বাবার গাড়িতে উঠে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। দিশেহারার মত সে দু পা ছুটে গিয়ে থেমে পড়ল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এগোতে লাগল কালোগাড়ি।

হুকুমের দু'চোখ আনমনা হয়ে যায়। সে হতভম্বের মত ক্রমশ এগিয়ে চলা কালোগাড়িটির দিকে চেয়ে হাতের পাচন থামিয়ে ফেলে। গরু থামে। ছটফট করা ছোট গরুটা মলনের বৃত্তের বাইরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়। গলার দড়ি, নাম গলতানি, তাতে টান পড়ে। এক সময় দলের মেড়াটা দলসুদ্ধো মলন-বৃত্তের বাইরে ছুটে যায়। মেড়াই হল সংসারের মুরুব্বি—এমন দার্শনিক ভাব সামান্য মুনিষেরও থাকে।

মেড়া বেরিয়ে পড়লে আর মলন হয় না। সংসারের জাঁতাপাতি থেমে যায়। শিলনোড়ার কুটুনিবাটুনি আর যুৎ হয় না। হুকুমের মন বলছিল, সে ছুটে যায় ! রাহুল এই সময় সাইকেল নিয়ে বাইরে বার হয়ে এল। তারও নিশ্চয় সন্দেহ হয়েছে, বাপকে ওভাবে নিয়ে গেল কেন ? থানায় কেন যেতে হবে তাঁকে ? সংসারে কি আর লোক ছিল না ?

—যাও, যাও, ছুটে গিয়ে দ্যাখো ! পুলিসকে বিশ্বাস নাই। পেয়াদার রাজত্বে বাস, কালো আইনের জমানা, কখন কি হয় !

কাঁধে চট-জড়ানো করাত-ধরা ভিখু ছুতার পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে গাওনা করে আপন মনে। ওই ভিড়ের আড়ালে ললিতের লোক আছে। শরম। লঘু দফাদারের ছেলে, চিবুক-কাটা শরম সেখ। মিটমিট করে চাইছে এদিকে।

সে-ই বলল—বাইক তেড়ে কলা ধরবে নাকি হে ! যা হওয়ার হয়ে গেছে !

দীর্ণস্বরে হুকুম যেন আর্তনাদ করল— হয়ে গেছে মানে ?

—কী ঠাউরেছ বল দিকিনি ! বাবুকে আর ছাড়বে ভেবেছ ! ও হয়ে গিয়েছে !

মুখচোখের এমন এক ভঙ্গি, ঠোঁটের এমনই একটা মুদ্রা গড়ে কথা বলে শরম যে, রাহুল 'হয়ে গিয়েছে' বলার চাল দেখে শরমকে কী বলবে ভেবে পায় না। আশ্চর্য হয়, থমকায়, রাগে নাসিকা সামান্য স্ফীত হয়ে ওঠে।

—তুমি গরুগুলো ধর হুকুমচাচা! আমি আসছি! দেখো কারো ক্ষেতে কি মলনে গিয়ে না নামে!

শরমের উপর রাগ করবারও সময় পায় না রাহুল, শুধু হুকুমকে নির্দেশ দিয়ে সাইকেল ছুটিয়ে দেয় কালোগাড়িটাকে ধরবার জন্যে। মা চামেলি ধান সেদ্ধ করছিলেন প্রকাণ্ড কালো কড়াইতে, যাকে বলে ভাপানো— হাতে ওঁর উসকাঠি।

উসকাঠি হল উসকানোর কাঠি। মাটির উনান। কাঠের জ্বালানি। আগুনকে উসকে দেবার জন্য চামেলি একটি জামালগোটার ডাল ব্যবহার করছিলেন, সহজে এ জিনিস পুড়ে যায় না, দগ্ধালে রস ঝরে আর কাঠির মুখ কালো হয়ে ওঠে। সেই লাঠি হাতে তিনি বাহির উঠানের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বামীকে এ দিগরের লোক সম্মান-বাচক বাবু সম্বোধন করে। তাঁকে পুলিসে ধরবে কেন? তিনি তো সমাজের উপকারী মানুষ। অবশ্য সেকথা সবাই না মানতেও পারে। ললিতবাবু অর্থাৎ ললিতমোহন নিশ্চয় একথা মানে না যে, বাবু লোকটি আদপে বাবু। লগড়াজলির সমস্ত ঘটনার কথা মুহূর্তে জাগরূক হয়, মনে হচ্ছিল ওই ঘটনা আজও ফুরায়নি, তার দংশন আছে। যে-ঘটনা নিবে গেছে বলে মনে হয়েছিল... এই অবধি ভেবে চামেলি তাঁর আপন হাতের মৃদু ধূমায়িত উসকাঠির দিকে চাইলেন। তখনও ধুঁয়োর সুতো পাকিয়ে উঠছে। আগুন মিটমিট করছে।

চামেলি শরমকে উদ্দেশ করে শান্তসুরে বললেন— তুমি বড় বাজে কথা বলতে পার শরম! বাবু কি চুরি করেছে!

তারপর উনি পায়ে পায়ে নূপুরের কাছে এসে দেখলেন মেয়েকে ভিখু ছুতার মাচায় শুইয়ে ধানের পাতা বার করে ফেলেছে, কাঠ-বমি করেছে মেয়ে। খানিকটা নেতিয়ে পড়া অবস্থা। চোখ বুঁজে রয়েছে। মায়ের ভয়ে সে চোখ পর্যন্ত খুলছে না।

—তুমি আর মরবার সময় পেলে না পোড়ারমুখী! খেতে পাও না! এসো, কোলে ওঠো এখন!

বলে বাঁ হাত প্রসারিত করে চামেলি নূপুরকে কোলে এবং বুকে তুলে নিলেন। নূপুর মায়ের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ভয়ে মায়ের কাঁধে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল। নূপুরের বোধহয় মনে হয়েছিল, সে মরে যাবে। তার ক্ষুদ্র জীবনে মৃত্যুর প্রথম উপলব্ধি হল। তার মনে হল, কালোগাড়িটা না এলে এমন হত না!

মরতে মরতেও তাহলে কত ঘটনা দেখা সম্ভব। খর পাতা পেটের দিকে যাচ্ছে। গলায় লেগেছে পাতার সুঁইসুঁই করা তলিয়ে যেতে চাওয়া অবরুদ্ধতা! সব যেন বুঁজে আসছে, চোখ ঠিকরে বার হয়ে যেতে চাইছে, শ্বাস আর বইতে পারছে না।

তখনও নূপুর দেখতে পায় কালোগাড়িটাকে, তার পাল্লা খুলে দেওয়া হয়েছে। অক্ অক্ করছে ক্ষুদ্র মেয়েটি, চোখ ঠিকরে পড়ছে, তবু দেখতে তার ভুল হয় না। দম টানতে টানতে তার ঝাপসা দেখা হয়ে যায়। বমির জল উগরে ফেলতে ফেলতে কান্না লাগে, তবু দেখা হয়। বাবা গাড়ির সামনে, বড় পুলিসদের সঙ্গে বসতে চাইলেন, ড্রাইভারের পাশে।

ললিতবাবু এবং বড় দারোগা কী যেন হাত নেড়ে বললেন বাবাকে। বাবা খোলা পাল্লা, ওই গাড়ির পিছনে উঠে বসলেন। ঠিক কদম আলির পাশে। কদমের কোমরে দড়ি বাঁধা, বাবাকে কেন ওর পাশে গিয়ে বসতে হল? বাবা নূপুরের দিকে দেখলেন না,

তখন উনি ঢুকে পড়েছেন। গাড়ি ছাড়ল আর নূপুরের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। অক্ অক্ হতে লাগল। গ্যাঁজলা উঠল। সাদা ফেনার মত। থুথুর সঙ্গে ভয় মিশলে কি অমন হয় ? ঠোঁট কেটেছে পাতায়, থুথুর রঙ যেন নীল। জাম খেলে যেমন হয়। অবশ্য ভয়ে এই রকম দেখায়।

নূপুর ছোট। কিন্তু সে-ও বুঝতে পারল, বাবাকে পুলিসের গাড়ির সামনে বসবার সম্মান দিলে না। অথচ সামনে জায়গা ছিল। বাবার সামনে বসবার মত মানই যেন নেই। বাবা কদম আলির মত সাধারণ, কোন কারণে দাগী, অপরাধী। ওরা কি বাবার কোমরে দড়ি বাঁধবে ? একটা শিশুও যে এত দূর ভাবতে পারে তা কেউ তো জানে না।

গরুর দড়িবাঁধা দল, মলন ছেড়ে মাঠের দিকে ছুটেছে, হুকুম ধরবার জন্য ছুটে যায়। রাহুল সাইকেল তাড়িয়ে গেল। একা পাগলের মত ছুটল। ধরতে পারবে তো ? শরম যেমন করে বলছে, শুনে হুকুমের একদম ভাল লাগল না। কিন্তু বাবুকে কেন এভাবে নিয়ে যাবে ! কোথায় চোর ডাকাত থাকে বাবু কি তা জানেন ? জানলেই কি তা ধরবার জন্য বাবুর দরকার ! হুকুম বুঝতে পারল, এই ফ্যামিলির সর্বনাশ হয়ে গেল ! মান-ইজ্জত গিয়েও যদি বাবুকে ওরা ছেড়ে দেয়, ফ্যামিলিটা বাঁচে। অবশ্য শরমের কথা মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু শরম যে ললিতমোহনের লোক। সেদিন সেই দুপুরে পুলিসের ভ্যানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক দূর ছুটে গেল রাহুল। অনেক দূর। গঞ্জ পর্যন্ত।

গাড়ির ভিতর থেকে শিকের জাফরিকাটা জাল দিয়ে বাবার চোখ পড়ছিল ছুটন্ত সাইকেলের চাকার উপর। অম্বরীশলাল রাহুলকে না দেখছিলেন এমন নয়, গাড়ি চলছিল অতি মন্থর। কিন্তু গাড়ি থামবে এমন লক্ষণ দেখা যায় না। কোথায় চোর কেউ জানে না। এই দৃশ্য গ্রামের মানুষ চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ছেলেটা কি পাগল বটে ! তিন চারটি গ্রাম অতিক্রম করে কালোগাড়ি এবং সাইকেল পৌঁছায় গঞ্জে। রাহুল অনেক বার পিছিয়ে পড়েছে, রাস্তার বেহালে পড়ে গাড়ি থেমেছে সামান্য, তখন বেশ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছে রাহুল। মন্থরতার মধ্যেও গাড়ির স্পীড এক রকম ছিল না। বাড়ছিল, কমছিল। বর্ষায় রাস্তা কাদার রেত খাড়া করেছে, এখন তা শুকিয়ে খানাগর্ত মতন করেছে নানাস্থানে। গাড়ি অতএব ছুটতে পারে না। রাহুল আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। শক্ত শুকনো কাদায় প্রচণ্ড আঘাত পায় পায়ে গায়ে।

রাহুল ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ওর পরনের প্যান্ট পর্যন্ত ভিজে গেছে। সে শ্বাস টানতে পারছিল না। গঞ্জে এসে পাকা রাস্তায় পড়ল ভ্যান। তারপর গতি বেড়ে গেল, রাহুল আর ছুটতে পারল না। মতিলাল তলার পাকুড়ের নীচে থেমে গেল। এখানে ছোট একটা মাছের বাজার বসে সকালে। আশেপাশে চা আর মেঠাই এবং মনোহারীর ছোট ছোট দোকান দুপুরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবু দুচারটি লোক কোথা থেকে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। শুধাল, কী হয়েছে ? রাহুল হাঁফাচ্ছিল। কথা বলতে পারছিল না।

এখান থেকে থানা ছয় সাত মাইল। কালোগাড়ির চলে যাওয়া পথের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতে থাকতে ভিতরের অপমান আর কান্না দমন করে রাহুল অত্যন্ত সংযত স্বরে বলল— বাবাকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে !

—আপনি সাদা চৌধুরীর ছেলে ? কে একজন প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।

ছোট জবাব করে চুপ করে থাকে রাহুল। কী করবে বুঝে পায় না। দেখতে দেখতে আরও দু'চার জন তার কাছে জড়ো হয়। তারই বয়েসী একজন কিশোর কাছে সরে এসে

আশ্চর্য প্রশ্ন করে সবিস্ময়ে— গোরাবাজারে আপনি চৌধুরী হস্টেলে থাকেন ! তাই না ? চৌধুরীরা আপনাদের রিলেটিভ ?

—না। বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে রাহুল। অত্যন্ত বিপদের সময়ও অনেক মানুষ খেজুরে করে।

ছেলেটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে একটি লাল রঙের কুকুরের দিকে চায়। কুকুরটা মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলেছে। মাছের আঁশ, বেড়ায় কাত হয়ে থাকা নাদা শুঁকছে।

সেই ছেলেটা মুখে বসন্তের খুদে খুদে গর্ত, কালো বর্ণ, ক্ষুর দিয়ে রেখায়িত হালকা গোঁফ, সাদা হাওয়াই শার্ট পরা, পরনে মেটে নীল-রঙের লুঙ্গি, ফের প্রশ্ন করে। গলাটা এমনিতেই চড়া, খাদে কথা বলতে পারে না। সামনে থেকে পিছনে টেনে আঁচড়ানো ভাঁজ-তোলা অত্যন্ত কালো চুল। নাসিকা উন্নত, মনে হয় চোখে সুর্মা টানা, আসলে চোখই ওই রকম স্বপ্নময়। তবু তাকে ভাল লাগছিল না রাহুলের।

ছেলেটি রাহুলের সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে বলল—অ্যারেস্ট কেন করল !

অবসাদগ্রস্ত গলায় রাহুল বলল—জানি না। থানায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে বলেছে। একটা খালি সই নেবে। সাক্ষী।

—কিসের সাক্ষী ?

—কী করে বলব !

—ঠিক আছে। তুমি থানায় যাবে ? সাইকেলের ব্যাকে বসে পড়। আমি চালিয়ে যাব। নাও, আর দেরি করো না।

রাহুল অবাক হয়। ততক্ষণে ছেলেটি ওর হাত থেকে সাইকেল কেড়ে নিয়েছে। পরনের লুঙ্গি খুলে সাইকেলের হ্যান্ডেলে বাঁধল। ওর পরনে ছোট সাদা মোটা কাপড়ের হাফ-প্যান্ট। ওই রকম প্যান্ট পরে ব্যায়াম করা যায়। ছেলেটি মাত্র একবার 'আপনি' বলার পরই লম্বা ধাপে আপনি থেকে 'তুমি'-তে টপকে গেল।

—তোমার নাম ?

—কবি।

—কবি ?

সাইকেল চলছিল দ্রুতই। কবির গায়ে সামর্থ্য আছে।

—মেয়েদের নাম কবিতা হলে পুরুষের নাম কবি হতেই পারে, কবিতা না লিখেও। কবি নাম নতুন শুনলে ?

—না। উত্তর করে রাহুল।

—আমি ইসলামপুর সাব-পোস্টাপিসের পোস্ট-মাস্টার তারক গাঙ্গুলির ভাগ্নে। কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম। আমার মায়ের বাড়ি ভগীরথপুর, বাবা বাঙাল, মা ঘটি।

—বাবা কি করেন ?

—আয়ুর্বেদ ডাক্তার। হাওড়ায় দোকান আছে।

—তুমি বেড়াতে এসেছ ?

—না। কৃষ্ণনাথ কলেজে নতুন করে ভর্তি হয়েছি কেমিস্ট্রি অনার্সে। কলকাতায় অন্য সাবজেক্ট ছিল। পার্ট-ওয়ান দেওয়া হয়নি। এখানে এসে সাবজেক্ট বদলে ভর্তি হয়েছি।

—কেন ?

—কেন মানে কী ? চলে এলাম কেন, নাকি বিষয় বদলালাম কেন ? তবে বলছি, স্থান বদলালো বলে বিষয়ও বদলে গেল।

—বুঝলাম না !

—ও তুমি বুঝবে না। তোমার তো হিউম্যানিটিজ গ্রুপ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়, পলিটিক্স কর না !

—না।

—ফার্স্ট ইয়ার ?

—না। সেকেন্ড ইয়ার।

—তুমি তো ভাল ডিবেট করতে পার। কলেজের সোসাল ফাংশানে শুনেছি। ছাত্রদের পলিটিক্সে আসা উচিত কিনা। সভার মতে উচিত নয়। তুমি পক্ষে বলেছিলে।

—তুমি তো অংশ গ্রহণ করনি !

—না। এটা একটা গ্রাম্য-বিতর্ক। আসলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছাত্ররা রাজনীতি করে। বুড়োরা করে অফিস-পলিটিক্স। মাগ্যি ভাতা বাড়ানোর কচকচি। মোড়লী করবার জন্যে রাজনীতি করা যারা করে, তাদের জবাব দেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হয়। রাজনীতি না করেই রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলা, কী বলব, এ আমাদের একটা সোসাল প্র্যাকটিস। সেই অনুশীলনকে কলেজের মঞ্চে তোলা এবং তাই নিয়ে তর্ক বাধানো...এর চেয়ে কোনও কুসংস্কারের চর্চা করা ভাল, যেমন মড়ার খুলির উপর বসে শক্তির সাধনা। কিংবা পাঁঠাবলি। শনি ঠাকুরের পুজো। অনেক ভাল।

কথা বলতে বলতে কবি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং উত্তেজনা সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দিতে থাকে। রাহুলের বড়ই আশ্চর্য লাগছিল ছেলেটিকে। সতর্ক, কিন্তু কঠিন তার্কিক নয়। তার উপর রাগ করবার কথা এখন আর রাহুলের মনেই এল না। একটু আগেই তাকে সে পছন্দ করছিল না।

তবু রাহুল শান্ত গলায় বলল—খুব অসহায় বোধ করছি কবি। কিন্তু এখন তো তর্কের সময় নয়। অচেনা একজনের উপর এত বিরক্ত হওয়া কি ঠিক ?

—সরি ! আমি কিন্তু তোমার উপর রাগ করিনি। একই কলেজের ছাত্র আমরা। তর্ক নিশ্চয় করব। তোমার বাবাকে হঠাৎ পুলিস-ভ্যান এসে উঠিয়ে নিয়ে গেল, তুমি জান না কী হবে ! এ সময় খুব সঠিক শোনাবে না—তবু বলছি, যদি পুলিস এ রকম হেনস্থাই করে, এর পিছনে কী আছে, তোমাকে জানতে হবে।

—কী করে জানব ! বাবা তো কোন রাজনীতি করেন না। বরং ললিতের দলকেই ভোটের সময় বরাবর সাপোর্ট করে এসেছেন। হতে পারে, বাবাকে হয়ত পুলিস ছেড়ে দেবে। ঠাকুদ্দা ললিতদেরই আদি দল করতেন।

—ললিতমোহনকে আমি কিছুটা চিনি। মামার কাছে আসে। ব্রাঞ্চ পোস্টাপিসের মাস্টার।

—তুমি তোমার মামাকে একটু বলবে বাবার জন্যে !

—আগেই এত ভেঙে পড়ছ কেন ? আগে চল দেখি।

—না, মানে। ললিতমোহনের সঙ্গে বাবার একটা পুরনো বিবাদ ছিল। এক অর্থে বিবাদ বলা যায় না, ফের...

—পরে শুনব রাহুল ! তুমি আগে বাঁচো। ডাউট হচ্ছে, ললিতমোহন যখন পুলিসের

সঙ্গে আছে, কেস সহজ হবে না।

—ললিতের ভাই শশাঙ্কমোহন জেল খেটে ফিরল ছ'মাস আগে।

—জানি। জমি নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

—মোকদ্দমা নয়। হাঙ্গামা। খুন হয়েছিল একজন।

—শুনেছি। মামা বলছিলেন সেদিন। ললিত এসেছিল, চলে গেল, তারপর মামা বললেন, মানুষটা চিৎপুরের বাঘ। ওর ভাই শশাঙ্কমোহন...ইত্যাদি।

—তখন গলায় লাল রুমাল বেঁধে একদল খেতমজুর ভেস্টেড ল্যান্ড বলে চাষীর জমির কাঁচা আধপাকা ধান কেটে নিত। ললিতমোহনের জমির ধান কেটে নিয়েছিল। হুকুম আলি, আমাদের মুনিষ, তার বড়দা এই আন্দোলনে ছিল ; সোভান আলি। ধান শুধু নয়, জমি দখল চলছিল। সেই সময় খুন হয়ে যায়। তারপর সেই আন্দোলন চিৎপুরে আপাতত চাপা পড়ে গিয়েছে।

—এই আন্দোলনে তোমার বাবা কেন জড়ালেন ?

—তুমি ঠিক শোননি তবে। বাবা তো জড়াননি।

—জড়িয়েছেন, তাই হয়। না জড়াতে চাইলেও জড়িয়ে পড়তে হয়। আমি বলছি, রাজনীতির আঁচ সবার গায়েই লাগবে। চাই আর না চাই।

রাহুল চুপ করে রইল। কবির কথার উত্তরে নীরব থাকলেও তার মনে অদ্ভুত ক্রোধ আর অপমান জমা হচ্ছিল। রাজনীতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজনীতিই তবে একমাত্র উপায়, এই যদি অনিবার্য হয়, তবে মানুষের অসহায়তা কতখানি !

—তুমি কুমার হস্টেলে থাক ? শুধাল রাহুল।

—হ্যাঁ, আপাতত তাই আছি। তোমার সঙ্গে বহরমপুরে দেখা হবে। অবশ্য নাও হতে পারে।

—কেন ?

—দেশের যা অবস্থা ! কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। গণতন্ত্র বলে কিছু থাকল না। তবে গণতন্ত্র বলে যে সত্যিই কিছু আছে, আমি নীতিগতভাবে বিশ্বাস করি না। ওই জিনিসটা চুষিকাঠি। ছেলে ভোলানো পদার্থ, জনগণের পেট ভরে না। অথচ চিৎকার করবা মাত্র মুখ বন্ধ করার জন্য মুখে গুঁজে দিয়ে ফল পাওয়া যায়।

—এসব চিন্তা করতেও আমার ভাল লাগে না কবি।

—ভাল না লাগারই কথা।

—আমার ঘৃণা করে। মনটা কেমন বিষিয়ে উঠেছে।

—তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। ললিতমোহনের আচরণের জবাব দিতে হবে।

—পুলিস নিশ্চয় বাবাকে ছেড়ে দেবে। বাবা কোন অন্যায় করেননি।

—তুমি পুলিসকে সেকথা বলবে।

—বলব কেন ! কেন বলতে হবে আমাকে ! ওরা কি জানে না ? আমার বাবা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। সামান্য শিক্ষক। সামান্য চাষী। নিজেকে শিক্ষক বলে পর্যন্ত দাবী করেন না। বলেন, আমি একজন ফারমার নই, কালটিভেটার, নিজের হাতে জোতজমা করি। পুলিসের মুখের ওপর আজও সেকথা বলেছেন !

—উত্তেজিত হবে না রাহুল ! মাথা ঠাণ্ডা রাখ !

সাইকেল আরও জোরে চালাতে শুরু করে কবি। থানা থেকে বেশ খানিক দূরে দেবদারু গাছের তলায় ছোট একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ায়।

দাঁড়িয়ে পড়ে সহসা বলে—আমি আর যাব না রাহুল। তোমাকে একা যেতে হবে। বলে ম্লান করে হাসে কবি। ভয়ানক তীব্র বিস্ময় ধীরে ধীরে রাহুলের চোখের আলোয় ঘন হয়ে ওঠে। যত ঘন হয়, তত তীক্ষ্ণ হয়। প্রায় ঠিকরে পড়তে চায়।

—আমাকে একা যেতে হবে ! তুমি যাবে না ?

—না।

—কেন ? তবে এলে কেন আমার সঙ্গে ?

—আমাকে যেতে বলো না, আমার অসুবিধা আছে !

—কী তোমার অসুবিধা ?

—তোমাকে এখন বলা যাবে না, তুমি যাও !

চোখের আগুন ধীরে ধীরে নিবে আসে রাহুলের। হতাশায় তার চোখদুটি শুকনো হয়ে ওঠে। রাজনীতি নিয়ে এত বাতেলা করবার দরকার কী ছিল ? না চাইলেও যে রাজনীতি জড়িয়ে ধরে, ছাড়ে না, দণ্ড চার আগের বলা কবির কথাগুলি মনে পড়ল বারবার, আর একা যেতে হবে, এই অসহায়তা রাহুলকে ক্রোধী করে তুললেও তার মুখ দিয়ে কথা বার হতে চাইল না। কবির উপর রাগ করতেও তার ঘেন্না হচ্ছিল ক্রমশ। কবির চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতেও রাহুলের চোখ রাজি হচ্ছিল না। উদভ্রান্তের মত সে 'ঠিক আছে, একাই যাব' বলে থানার দিকে এগিয়ে যায় দ্রুত, দশ ধাপ গিয়ে থেমে পড়ে, ফিরে দাঁড়ায়। দ্রুতই আবার ফিরে আসে কবির কাছে।

শরীরভর্তি অসহায় ক্রোধ ছোবলাচ্ছিল রাহুলকে, আবার মনে হচ্ছিল কবির মত ভীরু, থানাকে ভয় পাওয়া, বিপদে জড়াতে না চাওয়া মানুষই তো স্বাভাবিক, এরাই বাতচিত ভাল করে। আবার মনে হচ্ছিল, কবি তার সঙ্গে থানায় গেলে কী এমন বিপদ হত কবির ? কী হবে জানে না বলেই হয়ত যাচ্ছে না, বুদ্ধিমান এরা, কখনও কোন ঝুঁকি নেয় না। অথচ সাহস দেবার জন্য পিছনে লাগে। কবির চেহারাটা কুৎসিত মনে হচ্ছিল রাহুলের।

কাঁপছিল সে।

বলল—ঠিক আছে। তুমি ফিরে যাও। এখনই জলঙ্গীর বাস পাবে।

—তুমি আগে যাও ; আমি এখানে রইলাম !

—এখানে থেকে কী হবে ! তুমি চলে যাও। সাইকেলটা দাও আমাকে।

—আমার কথা শোন, তুমি যাও ! তোমার বাবাকে ওরা ছেড়ে দিতেও তো পারে। অনেক এ রকম হচ্ছে। থানায় আনছে, কথা বলছে, ছেড়েও দিচ্ছে কিছু কিছু।

—তুমি আর কথা বলো না কবি ! আমি যাচ্ছি !

প্রায় উন্মত্তের মত থানার দিকে ছুটে আসে রাহুল। সিধে ঢুকে আসে থানার বাবুদের ঘরে। দেখতে পায় লক-আপে ঢোকানো হয়েছে বাবাকে। বাবার সঙ্গে কদম আলিও একই কুঠরিতে বন্দী। বাইরে কালোগাড়িটা দেখতে পেল না রাহুল। খাকি পোশাকের একজন মাঝারি মাপের বাবু একা লম্বা মতন টেবিলের ওপাশে বসে রয়েছে। ঢুলছে। টেবিলের উপর ফাইলবন্দী কাগজ, একটা রুল আর ওল্টানো চশমা এবং ওয়েট-পেপার রয়েছে। রয়েছে একটি নীলরঙের জগ ; একটি উপুড় করা কাচের গেলাস। বাবুর মাথার কাছে দেওয়ালে ফ্রেমে-বন্দী সহাস্য গান্ধীজী।

একজন কনস্টেবল লক-আপের সামনে ঘোরাফেরা করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

অসহায় বাবা ক্ষীণসুরে বললেন—খোকা ! থানা আমাকে আটক করেছে ! কাগজের

উপর সই করিয়ে নিয়েছে ! আমার চাকরির আর ন'মাস বাকি ছিল ! তুমি ফিরে যাও, তুমি এদের বিরুদ্ধে পারবে না !

—না ! অস্ফুট বলে উঠল রাহুল। এগিয়ে এল বাবুটির কাছে। থানার কত নম্বর বাবু রাহুল জানে না। সে কখনও থানায় আসেনি।

থানার টেবিলের উপর দু'হাতে ভর রেখে বাবুটির মুখের উপর সামান্য ঝুঁকে নামল রাহুল। বাবার স্বর শুনে এবং কেউ একজন ঢুকে এল অনুভব করে থানার মেজবাবু সমীর পুরকাইত তন্দ্রা ঠেলে চোখ মেলে চাইলেন।

—কী চায় ?

—বাবাকে ছেড়ে দিন !

—আমি পারব না।

—কেন পারবেন না ! কী দোষ করেছেন আমার বাবা ! ধরে আনলেন কেন ?

—আমি সেসব কিছুই বলতে পারব না।

—তবে বসে আছেন কেন ?

—বসে আছি কেন ? বাঃ ! বসে থাকব না ! এ আমার ডিউটি। ডিউটি করব না !

—বাবাকে ছেড়ে দিন !

—বললাম তো, পারব না ! আমার এক্তিয়ার নয়। উপর থেকে অফিসার এসেছেন, তিনিই সব করছেন !

—কী করছেন তিনি ! কেন এভাবে একজনকে...অযথা...নিরীহ একজন শিক্ষক !

—তিনিই বলতে পারেন ! আইন হয়েছে, উনি অ্যারেস্ট করছেন ! সঙ্গে বড়বাবু আছেন, ওঁরাই সব বলতে পারেন ! তুমি ভাই অপেক্ষা কর ! ওঁরা আবার বেরিয়েছেন ! যাও, ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকো !

—না ! উত্তেজিত হয়ে উঠল রাহুল।

—না, কী ? চিৎকার করবে না থানার মধ্যে ! বলেছি, বসে থাকো ! চোখ পাকিয়ে তুললেন দারোগা।

—একজন চোরের সঙ্গে বাবাকে রেখেছেন ! এ অন্যায় !

—পরে আর একসঙ্গে থাকবে না। আলাদা করা হবে।

—আলাদা করা হবে ! কী করবেন বাবাকে !

—বললাম তো আমি জানি না !

—এই যে বললেন, আলাদা করা হবে !

—তা হবে। হতে পারে ! চোর যখন নয়, তাই বলছি !

—আপনি সমস্ত জানেন। জানেন যে বাবাকে সাক্ষী করবার জন্য আনা হয়েছে ! তবে আটক করলেন কেন ! উত্তর দিন !

সমীর পুরকাইত রাহুলের 'উত্তর দিন' বলায় সহসা যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন মনে মনে। টেবিলে পড়ে থাকা রুলখানি মুঠোয় ধরে ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেন। চোখে চশমা তুলে নিয়ে যুৎ করে নাকের উপর বসিয়ে আঙুল দিয়ে সামান্য চাপ দেন ব্রিজের উপর। ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে চোখ দুটি।

বলে ওঠেন—দ্যাখ হে ! বারবার তোমাকে বলছি আমার এক্তিয়ার নেই কিছু করার। তুমি বিরক্ত করছ কেন ! এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন ! বস !

বস বলার ধমকটি তীব্র হুকুমের মত ঝেঁঝে ওঠে, যেন তিনি চাকরের সঙ্গে কথা

বলছেন। রাহুলের দাঁড়ায় হিম স্রোত বইতে থাকে, চাবুকের মত এক অপমান তাকে ছিটকি মেরে গেছে ! অপমানিত দুই চোখ তুলে সে লক-আপে বন্দী পিতার দিকে চায়। বাবার চোখে অসহায় ক্ষীণ অশ্রু চিকচিক করছে।

সাদা চৌধুরী চোখেরই ইশারায় রাহুলকে নিজের কাছে ডাকেন। রাহুল কাছে আসতেই চাপা স্বল্পস্ফুট স্বরে বলেন—তুমি চলে যাও রাহুল ! এরা আমাকে ছাড়বে না।

—কেন ছাড়বে না, তুমি কী দোষ করেছ !

—সে কথা বলা যাবে না খোকা ! অনেক ঘাট হয়েছে আমার, তুমি চলে যাও ! চাপের মুখে পড়ে আমি সত্য বলেছি। খুব নির্দোষভাবে ওরা আমাকে শুধালে, আমি সত্য কথাই বললাম।

—কী কথা ! তুমি তো কোন অন্যায় করনি !

—আইনের চোখে কোন্‌টা অন্যায় কী করে বুঝব রাহুল ! মুমতাজ আলি আমাদের বাড়িতে এসে সাতদিন ছিল, মদনের ছেলে, আমার মিতপো !

—হ্যাঁ ! তাতে কী হয়েছে !

—সেকথা ওরা আমাকে লিখিয়ে নিলে, মানে সই করালে, এই হল সাক্ষ্য, বুঝলে !

কদম হঠাৎ বলে উঠল—আর কথা বুলবেন না, দোষ হবে। মেজবাবু কান পেতে আছে !

এই মুহূর্তে বাস্তবিক সমীর পুরকাইত কটমট করে রাহুলের দিকে চাইলেন। তারপর তীরবেগে ছুটে এলেন রুল হাতে। রুলটা রাহুলের থুতনির তল দিয়ে গলায় ঠেকিয়ে ধাক্কা দিলেন সজোরে। পিছন দিকে ধাক্কা খেয়ে রাহুল চকিত বিস্ময়ে পিছিয়ে আসে দুই তিন ধাপ।

—কী করছেন !

—কী করছি বুঝতে পারছ না ! চল্‌। হট্‌ ! তোমাকে শালা কতবার বলছি বেঞ্চে গিয়ে বসতে, তুমি কি শেষটায় আমার চাকরি খাবে পোদের পো !

বলতে বলতে রুল দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সমীর পুরকাইত রাহুলকে বাইরে থানার বারান্দার বেঞ্চের কাছে এনে ফেলেন। থুতনি থেকে রুল সরিয়ে নিয়ে কাঁধে একটা ছোট ধরনের আঘাত করে বেঞ্চের উপর বসিয়ে দেন।

—তুমি ভিতরে ঢুকবে না, এখানে চুপচাপ বসে থাকবে। দরকার যখন হবে, অফিসাররা এলে তোমাকে ডাকা হবে।

এ কথা বলে হাতে রুল নাচিয়ে বাঁ হাতের তালুতে রুলের মাঝ বরাবর রেখে এবং মুঠোয় বদ্ধ করে আবার ছেড়ে হাতের মধ্যে খেলতে খেলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে চেয়ারে বসে পড়েন মেজবাবু।

সন্ধ্যার মুখে কালোগাড়িখানি থানার বাইরের চত্বরে এসে দাঁড়ায়। দড়িবাঁধা দুটি চোর নামে লুঙ্গিপরা, গায়ে গেঞ্জি। আর নামেন সাদা চৌধুরীর মত একজন ভদ্রবেশী বয়স্ক ব্যক্তি, পরনে সাদাপাজামা, কালোজুতো পালিশ-করা, গায়ে ঘি-রঙের টেরিকটনের পাঞ্জাবি। রাহুলের মনে হল, এই ব্যক্তিটিকে সে কোথায় যেন আগে দেখে থাকবে। বাবারই লকআপে তাঁকেও বন্দী করা হয়। ঘৃণায় আর ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে হয় না রাহুলের।

রাহুল শুনতে পায় ঘি-রঙের ব্যক্তি প্রবল আর্তনাদ করে কী সব প্রতিবাদ করছেন। বড়বাবু অম্বরীশলাল গম্ভীর গলায় ধমক দিচ্ছেন ক্রমাগত। গাড়ি থেকে নক্ষত্র-খচিত

উপরঅলাকে নামতে দেখা যায় না। তিনি কোথায় রইলেন জানবার উপায় নেই।

কালোগাড়ি কাত হয়ে একদিকে পড়ে রইল। একটু বাদে একখানি কালো জিপ এল কোথা থেকে। দেখা গেল জিপের মধ্যে সেই নক্ষত্র এবং ললিতমোহন বসে রয়েছেন। থানার ভিতর থেকে জিপের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনেই বড়বাবু দ্রুত বেরিয়ে চলে গেলেন। জিপে গিয়ে উঠে বসতেই জিপ ছেড়ে চলে গেল। রাহুল কোন কথা বলে উঠতে পারল না। সে এগিয়ে গিয়েছিল বড়বাবুর দিকে, দারোগা তাকে কোনওই আমল দিলেন না।

থানার বারান্দার টানা বেঞ্চে আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে রাহুল ? সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আশ্বিনের আকাশে প্রসন্ন অন্ধকার। সে অন্ধকার কুঞ্চনশীল এবং প্রসারমান এবং চোখের উপর ভাসছে, ভেসে যাচ্ছে। আকাশের গায়ে উদ্গত হচ্ছে অদ্ভুত নীলাভ আঁধার—দূরে দিগন্তের তলায় ফেটে পড়ছে চাপা একধারা আলো। আশ্বিনের সন্ধ্যার পর এরকম আলো জেগে থাকে কেন জানা যায় না। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাহুলের মনে হচ্ছিল, ললিতমোহনই থানাকে চালিয়ে নিয়ে ফিরছেন, তাঁরই হাতে কালো আইন একটি তৌফার মত উপহার দিয়েছে ভারতভূমি।

বারান্দা থেকে নেমে আসে রাহুল। পায়ে পায়ে সড়ক ধরে কবির খোঁজে চায়ের দোকানে এসে দেখে ছেলেটি নেই। দোকানদার সাইকেলের তালার চাবিটি এগিয়ে দেয়।

বলে—খুলে লিয়ে যান। আপনার সাথে যে ছেলেন, উনি বাসে চড়ে চলে যেয়েছেন।

—কখন ?

—ওই তো সন্ধেবেলা ! বুললেন, আর পারব না, থানার অবস্থা খারাপ। ধরপাকড় চলছে। আপনার দোস্তজি ছেলেন মুনে লয় !

—হ্যাঁ !

আর কোন কথা না বলে সাইকেল নিয়ে রাহুল থানায় ফিরে আসে। বাইরে নিমতলার বেঞ্চে শুয়ে পড়ে, সামনে স্ট্যান্ড করায় সাইকেলখানি। রাহুলের খুব খিদে পেয়েছিল। পকেটে মাত্র সাতটি টাকা আছে। তবু তার কোন কিছু কোথাও গিয়ে খেয়ে আসতে মন চাইল না। সে কাঠ হয়ে পড়ে রইল বেঞ্চের উপর। রাত বেড়ে চলল দণ্ডে দণ্ডে। খিদেয় নেতিয়ে পড়তে থাকল দেহ। দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইল। একটু একটু শীত করতে থাকল রাহুলের। সে পা দুখানি জড়ো করল বুকের কাছে। পায়ের ফাঁকে হাত দুখানি লম্বা করে ঢুকিয়ে দিল। এভাবে আঁকড়ে ধরল নিজেকে।

শুয়ে থাকতে থাকতে ঝিম ধরে রক্তে। মস্তিষ্কের কোষে ঘুম লাগে। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে কী এক ভয়াল আকৃতির জীব সরোষে খড়্গ উচিয়ে রাহুলকে তাড়া করে। ঘুমের মধ্যেই কঁকিয়ে আর্তরুদ্ধ স্বরে সে ফেটে পড়ে, ভয়ে উঠে বসে বেঞ্চের উপর। তেষ্টায় বুকের ছাতি শুকিয়ে উঠেছে।

রাহুল রাস্তার নলকূপ থেকে জল খেয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ে। একবার তার মনে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে থানার ভিতরে ঢুকে লকআপের লোহার গরাদ ধরে চেঁচিয়ে ওঠে। সে জানে, তাতে কোন ফল হবে না। পুলিস তাকে শাসাবে, রুল দিয়ে ধাক্কা দেবে, গুঁতোবে, মারতেও পারে। মুখ করতে পারে।

বাবা সত্য বলেছেন। মিতপো মুমতাজ আলি তাদের বাড়ি সাতদিন ছিল। বেড়াতে এসেছিল। মুমতাজ চোর ডাকাত নয়। কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র। অতএব সত্য বলতে

বাধা কোথায় !

বাবা লগড়াজলির মার্ডার কেসের সত্য সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তার ফল ভাল হল না। এই সব ভাবতে ভাবতে রাহুলের আবার কেমন আচ্ছন্নতা আসে। হয়ত ঘুম আসে। রাত্রি বেড়ে যায়। হিম হাওয়া বইতে থাকে। তার ঘন ঘন পেচ্ছাব পায়। আবার জল খায় রাহুল। আবার জলবিয়োগ করে। শুয়ে পড়ে। গায়ে ব্যথা, দাবনায় শক্ত মাটির আঘাত লেগেছে। পা তুলতে নামাতে কষ্ট হয়। কী করে সে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরবে ? বাড়ি ফিরে যদি যেতে পারে, কী বলবে সবাইকে ?

তবু ভাবনার ভিতরে শরীর ঘুমে অসাড় হয়ে আসে এক সময়। মধ্যরাতে তখন কালোগাড়িটা চাপা গলায় গোঁ গোঁ করে উষ্ণ হয়। সেই শব্দেই সতর্ক নিদ্রা টুটে যায় রাহুলের। সে ধড়ফড় করে বেঞ্চের উপর উঠে বসে। অন্ধকারেই বুঝতে পারে কালোগাড়িটা চলে যাচ্ছে। রাহুল পাকা সড়কে আর্তনাদ করতে করতে ছুটে যায়। বাবাকে সে ব্যাকুল হয়ে ডেকে ওঠে। গাড়িটি থামে না।

রাহুলের কণ্ঠস্বর হয়ত বাবার কানে পৌঁছয় না। গাড়ি চলে গেলে রাহুল সাইকেলের কাছে ফিরে আসে। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একা। আকাশে চোখ তুলে সে কতকগুলি জ্বলজ্বলে নক্ষত্র দেখতে পায়। নক্ষত্রের গায়ে লেগে বাতাস আলো কাঁপিয়ে তুলছে টের পায়।

এমন সময় হঠাৎ কে একজন কাঁধে হাত রেখে বলল—আমাকে ছেড়ে দিলে বাবুরা। একশ টাকা বখশিস দিয়েছে, এই দ্যাখো, বিশ্বেস কর আমার দোষ নাই রাহুল দাদা !

বলে উঠল কদম আলি।

॥ ২ ॥

কদম আলির উপর রাগ করতে পারল না রাহুল। অন্ধকার মধ্যরাত্রির সেই অসহায় মুহূর্তে কদমকেই তার আপনার লোক মনে হল। লোকটা চোর বটে, কিন্তু গ্রামের চাষীজীবনের সঙ্গে তার যোগ আছে। গড়াবাসা থেকে এই লোকই বাবাকে লঘুশালী ধান এনে দিয়েছিল বীজের জন্য। তাছাড়া এ মুহূর্তে রাহুলের শরীর বইছিল না।

কদম বলল—তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি !

সড়কের উপর নিমগাছের তলে সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে রইল রাহুল।

প্রায় বিশ মিনিট বাদে সেখানে ফিরে এল কদম আলি। হাতে একটা কাচ-ফাটা চৌচির নিষ্প্রভ টর্চ কোথা থেকে যোগাড় করে এনেছে। টর্চ সম্বন্ধে রাহুল কোন প্রশ্ন তুলল না।

কদম নিজে থেকেই কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলল—চুরি করিনি দাদা ! ওই তোমার চানুর কাছে থেইক্যা লিয়ে এনু—মাহেশ্বরীদের গদিতে কাম করে, ফুপাত ভাই। লাও, সামনে রডের ওপর বস, আমি প্যাডেল মারব, কানা 'টর্চ', যা রোশনাই হবে, অ্যাকসিডিন না হলেই হল !

সাইকেল চালাতে চালাতে কদম আপন মনে বলল—চুরি কায্য আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদা ! সুতাকারণ (অর্থাৎ সুতরাং) চুরির জন্যি ধরে নাই বাবুরা।

—কেন ধরলে !

ছোট প্রশ্নটুকু করে চুপ করে রইল রাহুল। টর্চের আলোয় পথ দেখা যায় সামান্য।

সামনে থেকে কেউ এলে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে, আলোর সেই সামান্য ইশারা ছাড়া সবই অন্ধকার এবং নির্জন। সাইকেল চলছিল তেজের সঙ্গে।

কদম আলি বারবার প্রতিপন্ন করতে চাইল, চুরি না করলেও থানা তাকে চোর বলে দড়ি বেঁধেছিল ইসলামপুরের গঞ্জঘাটায়, সে চুপচাপ বসে বসে চায়ের দোকানে চায়ে পাউরুটি ডুবিয়ে খাচ্ছিল। কোমরে দড়ি বেঁধে চিৎপুর নিয়ে গেল, যাতে কিনা বোঝা যায়, বাবুরা চোর পাকড়াতে বার হয়েছে। দড়ি বেঁধেছিল বলে একশ টাকা বখশিস দিয়েছে। এত হয়রানি কি একশ টাকায় পোষায়?

রাহুল অবাক হয়ে গেল।

—চুরি কায্যে এট্টু নামডাক হলে আর রক্ষে নাই।

আবার আপন মনে বলে উঠল কদম আলি। বয়সে বয়স্ক হলেও কদম রাহুলকে কোন এক ধরনের ভব্যতাবশে 'দাদা, দাদা' করছিল। বা সেটা তার অভ্যাস।

—আশ্বিনের আজ কত? ভাদই ধানে ম ম করছে খুলান। মলন-বন্দী মনিষ্যি, সাদা চৌধরী হ্যাণ্ডকাপ পরল এই আন্ধারে, দাদা গো, ললিতমোহনের পুঞ্জিতে ক্ষ্যামা নাই!

একথা শুনতে শুনতে একটি হরিদ্রাভ অগ্নিশিখা রাহুলের বুকের মধ্যে রি রি করে উঠল। দাঁড়ায় একটা হিম স্রোত বইছিল। চোখে মুখে এসে লাগছিল ঠাণ্ডা হাওয়া, চোখে জল কাটছিল, হঠাৎ সে ভাবল, তার কি কান্না পায়! মনে মনে লজ্জা লাগে, কান্না কি অত সহজ?

—তুমার কি খিদে পেয়েছে দাদা!

অন্যমনস্ক রাহুল কোন উত্তর করল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, ম ম করছে খুলান, মলন-বন্দী সাদা চৌধুরী, একজন কালটিভেটার, গ্রামের মানী মানুষটিকে লকআপে ঢোকাবার জন্য কী ছলনাই না করল পুলিস! ইসলামপুরের সদরঘাটের চায়ের দোকানে বসে বসে চা-পাউরুটি খাচ্ছিল কুখ্যাত ছিঁচকে চোর কদম আলি, তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল চিৎপুর! এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সাদা চৌধুরীকে ভ্যানে তোলা—এই ছলনার কী প্রয়োজান ছিল? এই সময় প্রচুর সাদা ধেনো পতঙ্গ উড়ছিল। প্রজাপতি, ফড়িঙ উড়ছিল। পাখি ডাকছিল, নূপুরের গলায় সাঁধ হয়ে গেল ধানের পাতা! সমস্ত জীবন একথা মনে থাকবে, তার জন্মমাসে ধানের উতলা গন্ধের ভিতর চিৎপুরে কালোগাড়ি এসেছিল!

আমাদের কী দোষ! একথার সদুত্তর কেউ কখনও দেবে না। ভাবতে ভাবতে হরিদ্রাভ আগুনের শিখা রাহুলের চোখের তারায় ফুটে উঠল রাত্রির অন্ধকারে।

ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত অঞ্চল। সদরঘাটটি মেঠাইয়ের দোকান, দাওয়াখানা আর হোটেলে সাজানো, পাশে বহতা নদী ভৈরব। বাংলাদেশের সঙ্গে এই এলাকার নাড়ীর যোগ যত, ব্যবসার দু'নম্বরী সম্বন্ধ তার চেয়ে কম নয়।

বিশাল চোয়াড়ে সাদা সাদা বলদ, গাই, বাছুর, বক্‌না, চেপ্টা খাটো গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দু'তিন জন মাথায় ফেটি বাঁধা ব্যাপারি। পাকা সড়ক খটখট করে ক্ষুরের শব্দে ভৌতিক নিস্তব্ধতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। ওই গরুর দঙ্গলের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে আসে কদম আলি। রাত্রি এখন ১টা। সামান্য টর্চের আলো না থাকলে বিশাল বপু বলদের ঝাড়ালো বাঁকা শিঙের অর্ধবৃত্তে আটকে যেত নিশ্চয়, এমনকি তাদের বুক ফুঁড়ে যেতে পারত বাগানো তীক্ষ্ণ শৃঙ্গে।

এই সব গরু গোপনে চালান যাচ্ছে ওপারে, কালো আইন এদের ঠেকাতে পারেনি।

এইটুকু মনে আসে রাহুলের। চোর ধরবার আইন, সমাজ-বিরোধীকে জব্দ করার আইন, চোর লাগিয়ে দেয় সাদা চৌধুরীকে শায়েস্তা করবার জন্য। এই অবধি চিন্তা করতে পারে রাহুল। কিন্তু সে কদমের উপর রাগ করতে পারে না।

সদরঘাটে মেঠাইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দাওয়াখানাও খোলা নেই। নেই অন্যান্য দোকানগুলি, কিন্তু দু'একটি হোটেল সমস্ত রাত্রি খোলা থাকে। একটি হোটেলের সামনে এসে কদম সাইকেল থামায়। একটা অত্যন্ত মোটা শিখার আলো জ্বলছে কাত হয়ে হোটেলের ভিতর থেকে বাইরে মুখ বাড়িয়ে। একটি বাঁকানো লোহার শিকের উপর কাত হয়ে ঝুলছে এনড্রিনের কীটনাশক কৌটোর ডিবা। প্রচুর কালি নির্গত হচ্ছে গলগল করে। হিলিহিল করে কাঁপছে শিখা—এটি নফর সেখের মুসলিম হোটেল, নো বীফ। শিখাটি যেন রাতচরা ধান্দা-করা মানুষদের ডাকছে।

—আসো দু'মুঠা খাই রাহুল দাদা, ভুখে জেরবার, আছো নাকি নফর ভাই!

সাইকেল থেকে নেমে হেঁকে উঠল কদম আলি। রড থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াল রাহুল, পায়ের কাছে একটি লাল কুকুর পড়ে আছে। সাইকেলখানা একটি বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দেবার ভঙ্গিতে কাত করে রাখে, যেন আছড়ে পড়ল। কদম এমনভাবে সাইকেলখানাকে ঠেলে দিল আলগা হাতে যে, তার পথশ্রম বোঝা গেল। একটি চাকা হাতধোয়ার নাদার গায়ে এসে লাগল, নাদার গা এত নোংরা যে চাওয়া যায় না।

খোপরা আর বাঁশবেড়ার হোটেল, কিছু কাঁচা ইট গাঁথা আছে। মেঝে মাটির। বর্ষায় মেঝেতে কেঁচো ওঠে। শীতে বেড়ার ফোঁকরে ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে। লম্বা বেঞ্চ। একটি উঁচু বেঞ্চিতে টিনের থালা পেতে খাওয়া, নীচু বেঞ্চিতে বসতে হবে। নাদায় হাতমুখ ধোয়া। এখানে সপ্তায় ছ'দিন খাসি কাটা হয়, তাছাড়া গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম থেকে মাংস আসে। মাছের হাট বসে সকালে সন্ধ্যায়, সবজি তহবাজার চালু হয়েছে, দু'দিন বড় হাটও বসে। মিঠে কুমড়োর ঝাল, মশুর ডাল আর খাসির মাংস এবং কাগজি লেবু, পেঁয়াজ, কাঁচা দীঘল লঙ্কা এই রাত্রি দেড়টায় কদমের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। পাশাপাশি দু'টি থালায় খাবার বেড়েছে নফর সেখ।

—আসো দাদা!

—না। তুমি খাও!

—ক্যানে গো! আমার পয়সায় খেতে তুমার কি রুচবে না?

এই প্রস্তাবে রাহুলের কী অপমান ছিল কেউ বুঝবে না। পুলিসের বখসিসের টাকায় কদমের ট্যাঁক উলঝুল করছে। কদম কি করে ওভাবে ডাকছে বারবার!

—আসো! আসো! ও দাদা!

—না হে!

—রাগ করেন নাকি?

আহ্বানের সুরে একটা নিষ্পাপ আন্তরিক ভাব। মনেই হয় না, কদম কোন অন্যায় প্রস্তাব করছে। বলতে বলতে কদম খেতে বসে যায়।

—আমি কি জানি এরকম হবে! মুখে গ্রাস তুলে গিলতে গিলতে বলল কদম আলি।

—ধরল বাবুরা! মান্‌জায় দড়ি বাঁধলে। শালা চোর, চ ইবার! কুথা যাব? না, চিৎপুর! ভোবো না দাদা যে থানা আমাকে পুষছে!

—চুপ করে খাও কদম, কথা বলো না! বলতে ইচ্ছে করল রাহুলের। বলতে পারল না।

নফর বলল—তাহলে আপনি খাবেন না ভাই !

—না, বললাম তো ! কেন বকছেন ! বিরক্তির সুরে বলে উঠল রাহুল। নফর সলজ্জভাবে আর কোন কথা না বলে রাহুলের ভর্তি থালাটি সরিয়ে রাখল।

—মন ভাল নাই ! ভরামুখে মন্তব্য করল কদম।

একটি টুলের উপর বসে ছিল রাহুল। হোটেলে ঢোকার মুখেই কোণটিতে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বলল—আমি চললাম কদম !

বলে আর একদণ্ড দেরি করে না রাহুল। নাদার কাছে লাফ দেয়। সাইকেল তুলে নিয়ে সিটে চেপে পড়ে। অন্ধকারেই তাড়িয়ে চলে বাইক। মুখের গ্রাস থামিয়ে আহাম্মকের মত চেয়ে থাকে কদম বাইরের অন্ধকারের দিকে। তারপর সহসা বড় বড় গ্রাস গরুর মত ভক্ষণ করতে থাকে। তার চোখ ঠিকরে পড়তে থাকে।

নদীর ধারের পথে তিন চার বার তীব্র আছাড় খায় রাহুল। মৃদু কঁকিয়ে ওঠে। সাইকেলের হ্যান্ডেল খুব 'টাইট' ছিল না বলে বেঁকে যায়। দু'পায়ের ফাঁকে সামনের চাকা চেপে ধরে হ্যান্ডেল সোজা করতে গিয়ে রাহুল বুঝতে পারে, তার হাঁটু এবং দেহ থরথর করে কাঁপছে, সে নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারছে না।

—আসো, দু'মুঠা খাই, রাহুল দাদা !

ক্ষুধার্ত মানুষের এমন মিঠে সরস বেহায়া ডাক এর আগে কখনও শোনেনি রাহুল। মুখের গ্রাসের কাছে মানুষের কোন মান অপমানের বোধ থাকে না, ভাত যে কী অমৃত কদমের ডাক না শুনলে বোঝে কার সাধ্য ! নিশ্চয়ই কদম আলি রাহুলকে কোন ধরনের কষ্ট দেবার জন্য অমন করে 'আসো, আসো ! ও দাদা !' বলেনি।

নদীর ধারে অন্ধকারে 'হ্যান্ডেল' সিধে করতে গিয়ে প্রায় অপারগ রাহুল সেই ডাক এক দুই বার নয়, সহস্র সহস্র বার ক্রমাগত শুনতে পায়। অজস্র তেকোনা পতঙ্গের মত সেই ডাক যেন ঝুরছে কণায় কণায় চারপাশে এবং নক্ষত্রখচিত আকাশে। ভারতবর্ষের এক অতি আশ্চর্য রূপ এই অন্ধকারে রাহুলের চোখের উপর উন্মোচিত হচ্ছে, বাপকে ধরিয়ে দেওয়ার বখসিসের টাকায় ভাত খেতে ডাকার নিরপরাধ স্বর যেন ভারতাত্মার গভীর থেকে উঠছে !

এই দেশটিকে কত মানুষ কত না বিচিত্রভাবে জেনেছে, মহাপুরুষদের মনে ভারতবর্ষ কত না বিপুল মহাভাব উৎপন্ন করেছে, তার সঙ্গে ঘুণাক্ষরেও আজকের অভিজ্ঞতার কোন মিল খুঁজে পায় না রাহুল। এই কঠিন অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হওয়ার চরম কোন শক্তি কি সে সমগ্র জীবনেও অর্জন করতে পারবে কোনদিন ! না। সেই চেষ্টার কোন আগ্রহই তার হবে না। সে নিশ্চিত এই অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়ার উৎসাহ মহাভাবুকদের থাকলেও রাহুল অন্তত ভুলবে না যে, একটি ক্ষুধার্ত মানুষ কীভাবে তাকে খেতে ডেকেছিল !

আকাশে মুখ তুলে ঘন ঘন শ্বাস টানতে থাকে রাহুল। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, পরে দীর্ঘায়ত শ্বাস-প্রশ্বাস। বুক খালি লাগে। সাইকেল গড়াতে গড়াতে চলতে থাকে সে। লম্বা পাঁচ মাইল কাঁচা সড়ক তাকে ভাঙতে হবে। দু'খানি মস্ত মাঠ তাকে পার হতে হবে। রাত্রি দু'টো। শিশ্যাডিহির কোলে কোন ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলো চোখে পড়ে রাহুলের। আলোর নিশানা ধরে এগিয়ে চলে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত রাহুল। তারও লোভ হয়েছিল ভাতের জন্য। বখসিসের টাকায় অন্নভোগের বাসনা হয়েছিল। সে ক্ষুধাকে তন্মুহূর্তে জয় করেছে শুধু কদমের বিস্ময়কর আহ্বানের জন্য। ঘৃণায়। অবশ্য এ ঘৃণা কতখানি সঙ্গত সে জানে না। রাহুল পাগলের মত হাঁটতে থাকে।

বাঁশবাগান দিয়ে এদিক থেকে গ্রামখানির শুরু। অর্থাৎ সদরঘাট থেকে ফেরার পথে শিশাডিহা ঢুকতে বাঁশবাগানের ভিতর দিয়ে পথ। নদীর অববাহিকায় বিলের মত জলাভূমি, জলাভূমির পশ্চিমে বাঁধ-পথ উঁচু। নদীর কিনার ঘেঁষে বর্ষার পর পূর্বদিকের গ্রাম শিশাডিহা পথ তোয়ের করে নেয়, বিল বা খালের পাশ ঘেঁষে নদীর কিনারা বরাবর। বাঁধ-পথ দিয়েও যেতে পারত রাহুল, সংক্ষেপ হবে বলে নদীর পথ ধরেছে। বাঁশবনের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল সে।

অন্ধকারের প্রসন্নতা থাকায় চোখে পড়ল একখানি মজবুত ছইতোলা গরুগাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে বালির উপর, পথে। একখানি চাকা খসে পড়েছে, সেটি গাড়ির সামান্য তফাতে চিত।

আকাশে কখন হালকা চাঁদ উঠেছিল কিনা মনে পড়ছে না। বোধহয় উঠেছিল। থানায় যখন বারান্দায় বসে থাকল তখন উদয় অস্ত হয়ে গিয়েছে হালকা চুড়ির মত চাঁদখানির, তারপর সর্বক্ষণ প্রসন্ন অন্ধকার বিরাজ করছে। দেখা যায় না কার গাড়ি পড়ে আছে।

খালে এখনও বর্ষার জল অতি সামান্য জমা আছে, নদীতে নেমে যেতে পারেনি। ওতে কাঠমাছ আছে, গড়াই-জিওল, মাগুর। সোলার বঁড়শীতে ওই ধরনের মাছ ধরা হয়। সোলা ভাসে, বঁড়শী ঝোলে জলের ভিতর টোপসুদ্দো। এই মাছ ধরে চাষীরা, মল্লরা নয়। গরীব চাষী, ক্ষেতমজুর—এরা সোলা ফেলে আসে।

খাল বা বিলের ওদিক থেকে একটি কালিপড়া লণ্ঠন, যেন জল থেকেই উঠে আসছে মনে হল। কাছে আসতেই দেখা গেল চয়ন খতিব।

—আপনিও মাছ ধরেন নাকি ?

—অ। রাহুল চাচা ! কী খবর, এত রাতে ! আরে হ্যাঁ, এ গাড়ি তো তোমাদের বাড়িই যাচ্ছিল, পথে হড়কে গিয়েছে ! ওই দ্যাখো টাপুরে নাম লেখা আছে !

বলে চয়ন খতিব লণ্ঠনটা মাথার উপর হাত দিয়ে খাড়া করে তুললেন।

—বাহ্যে বেরিয়েছিলাম চাচা, মাছ কোথা !

লণ্ঠন দেখিয়ে ছইয়ের লেখা বানান করে পড়তে থাকলেন খতিব।

সমির চৌধুরি। চৌধুরী হাসানপুর। থানা+মহকুমা লালবাগ।

—ছোট মামার গাড়ি ! ছোট করে উচ্চারণ করে রাহুল। —মণি ছিল গাড়িতে ?

—ওই তো গাড়োয়ান গো ! খেদিয়ে যাচ্ছিল। প্যাসেঞ্জার ছিল দু'জন। একজন মরদ, অন্যটি মেয়েমানুষ, যুবতী। কে হবে বা !

—পুরুষটি কে ? ছোট মামা ?

—না বাপু। তোমার বড়দা, বুবন চোধ্‌রী !

—অ। বুঝেছি !

—বড়দা শাদি করলেন নাকি ! এম এ পাশ করে গিয়েছেন ?

—হ্যাঁ।

—শাদি করলেন ?

—জানি নে।

—শঙ্করপুরের মাদ্রাসায় চাকরি হয়ে গেল ! হাই মাদ্রাসা নাকি ?

—জানি নে চাচা !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাহুল।

চয়ন ঈষৎ বাঁকা করে বললেন—তুমি যে কিছুই জান না দেখছি। কত ভান করবে তোমরা বাপু ! বাপটা যে অ্যারেস্ট হয়ে গেল, বল, তা-ও জান না তুমি ! থানা থেকে এই ফিরছ বুঝি ! সদরঘাটে কত ধারা গাওনা হচ্ছে শুনে এলাম। ললিতমোহন যে বাঘের বাচ্চা সেকথা 'একিন' হয়ে গেল !

বলতে বলতে লণ্ঠন নামালেন উচ্চে তুলে ধরা চোখের উপর থেকে চয়ন খতিব। খাটো মানুষ, মুখ গোলাকার, ছুঁচলো করা নুরের তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও মুখের টমেটো-গোল কাটেনি, চোখ দু'টি ক্ষুদ্র ; চোখের মাংসে আধবোজা, সামান্য কুতকুতে চাহনি, পলক বেশি পড়ে। হাঁটুর উপরে লুঙ্গি উঠে আছে, বাঁ হাতে বদনা। কাঁধে গামছা, চ্যাপটা বুকে অতিরিক্ত মাংস লেগে বোয়াল মাছের মসৃণতায় থলথল করছে গড়ন। মানুষটি দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী, শিশাডিহায় ছোট মসজিদে থাকেন। মুখের ভাষা বেশ শুদ্ধ, কথায় দক্ষিণবঙ্গীয় টান প্রায় বোঝাই যায় না। চাচাকে কাকা ডাকেন, বড়ভাইকে বড়দা বলেন। মুর্শিদাবাদে এরকম চল নেই ধার্মিক মুসলমানের। বরং এখানে অনেক হিন্দু মুসলমান-ধার্মিককে চাচা ডেকে আমোদ পায়।

চয়ন চলে যাচ্ছিলেন, তাঁর বদনায় মাছ খলবল করে উঠল। বদনার সাইজ বড়। তিনি কি মাছ চুরি করে আনলেন ? খুব সন্দেহ হয় রাহুলের। রাহুল সাইকেলখানি গরুগাড়ির চাকায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ দেখা যায় চয়ন লণ্ঠন মাটিতে রেখে বসে পড়েছেন, কী যেন হাতড়াচ্ছেন মনে হল। রাহুল কৌতূহল বশে এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। সাইকেলখানি হেলানো, কাত রইল। বদনা থেকে মাছ লাফিয়ে পড়েছে বালির উপর। একটি বড় বেলে আর একটি দীর্ঘ, মাথা চেপ্টা উপল। উপল হল গড়াই প্রজাতির মাথা মোটা, চেপ্টা মাথার মাছ, রাত্রে ডাঙায় উঠে গুগোবর খেয়ে বেড়ায়। বঁড়শীতে বেঁধে, বোকা মাছ।

বালিসুদ্দো পাকড়াও করলেন চয়ন। বদনার জল ফেলে দিয়ে মাছ দু'টি ঢোকালেন। বদনার জল হাতে ধরে নিংড়ে দিয়েছেন, বদনায় আরও মাছ আছে মনে হচ্ছে।

রাহুলকে দেখে বোকার মত হেসে বললেন—কী করা, ঝাঁপায় বড় ! আবার লোকাচ চলে যেতে লাগলেন।

পিছনে ফিরে এসে গাড়ির কাছে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রাহুল। চয়ন লণ্ঠন হাতে এদিকে আসেন।

বলেন—গাড়ির বলদজোড়া হাত ফস্কা পেয়ে এই রাত্তিরে মাঠের মধ্যে বিলধারে লাফাতে লাফাতে চলে যায় অন্ধকারে। ছোটভাই মণি ছুটে গিয়েছে, কী হল জানা যায়নি। বড়দা ওই যুবতীকে সঙ্গে করে হেঁটে চলে গেল চিৎপুর ! দুর্ভোগ আর কাকে বলে !

এই খবরটুকু দেবার জন্য অনেক দূর চলে গিয়েও ফিরে আসেন খতিব। আবার চলে যান। সাইকেল গড়াতে গড়াতে বাঁশবন পেরিয়ে এসে রাহুল একটি পাকাটি-ঘেরা বাড়ির সামনে লণ্ঠনটি দেখতে পায়। চয়ন বেড়ার প্রবেশ-মুখে দাঁড়িয়ে ডাকছে— ও বউ টগর ! ওরে বাবা শাবান ! তোদের ভুঁইয়ের মাছগুলি নাও দিকিন !

অনেকক্ষণ ডাকার পর ঘুম জড়ানো টগর উঠোনে নামে।

—কী হয় খতিব সাব !

—মাছ গো বিটি ! ভুঁইয়ের মাছ !

—উঠানে রাখেন !

টগর দাওয়ার খুঁটি ধরে কুপির বাতি উসকে দাঁড়ায়। চালের বাড়ি। খড় ছাওয়া। নদীর ভাঙনের উপর দাঁড়ানো। এদের জমি-জিরাত আছে বোঝা যাচ্ছে। ছোট গাঁয়ের খতিবটিকে বড় আশ্চর্য লাগছিল রাহুলের। খুব গরিব গাঁ শিশাডিহা।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছিল, খতিব বদনা উপুড় করলেন।

বললেন—রইল। জিইয়ে রাখিস মা!

—কাল তবে নেমন্তন্ন থাক আপনার!

—জানি তুমি প্রস্তাব দিবে! দাওয়াত কবুল করলাম। তবে কেঁচোর মাছ খাই না যে! শাকভাত দিও! কঙ্কা-নটে আর ডুমুর আর থোড়। পারবে না?

—খুব পারব!

—এইভাবে দাওয়াত নিতে লজ্জা করে মা! নবীর দোস্ত আমার এই ভাগ্য করেছেন। নসীব!

—আপনার দাওয়াতের মান আছে খতিব সাব। আপনি কাল সকালে আসবেন!

রাহুল এবার সাইকেলে চড়ে। তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেও এ মুহূর্তের দৃশ্যটি তাকে স্তব্ধ করে তুলেছিল। চয়ন এইভাবে আহার্যের সন্ধান করছিলেন এই আকাশের তলে নক্ষত্র-খচিত অন্ধকারে। তার মাছ ধরে আনা যে চৌর্য নয়, সংগ্রহ, যোগাড়, তা বুঝতেও বিস্ময় ধাক্কা দেয়। যোগাড়ের নাম দাওয়াত।

মন দিয়ে দেখবার মন ছিল না রাহুলের। তাই সে দ্রুত বড়দা বুবন এবং নতুন যুবতী আর মণির কথা ভাবতে থাকে। একটি সমস্যা নয়, অগুণতি ভাবনা তাকে ঘিরে ধরেছে। বদলজোড়া, ছোট মামার সাদা বলদ বিলধারে মাঠের মধ্যে চলে গিয়েছে, একথাও তাকে উদ্বিগ্ন করে। রাত্রি সাড়ে তিনটায় সে বাড়ি পৌঁছায়।

গরুঘরে উচ্চ বলদ জোড়া দেখে খানিক শান্ত হয়। ওদের বাড়িই এ গাঁয়ে একমাত্র দোতলা। সিঁড়ির রেলিঙের মিহি থামের উপর মোটা মোমবাতি জ্বলছে। বাড়ি জেগে আছে। এমনকি নূপুর পর্যন্ত। ঘুম কোথা থেকে আসবে!

রাহুলের শোবার ঘরের চৌকাঠের কাছে, বারান্দার মেঝেয়, মা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। ওই দেওয়ালে লাগানো কাঠের চেয়ারে বড়দা চুপচাপ। ওর পায়ের কাছে মায়ের পিঠের আঁচল ধরে নূপুর মুখ গুঁজে রয়েছে। অদূরে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে হুকুম। রাহুলের শোবার খাটে বসে রয়েছে দু'জন। দু'জনই মেয়ে। রাহুলের বোন নাতাশা আর সেই নতুন মেয়েটি। হুকুমের গা ঘেঁষে বসে আছে মণি। মণি হুকুমকে স্পর্শ করে রয়েছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দোতলায় পা রেখে বাঁক নিতেই চোখে পড়ল রাহুলের, ওরা জেগে আছে। রাহুলকে দেখে বারান্দার প্রত্যেকে সামান্য নড়ে ওঠে। মায়ের পিঠের আড়াল থেকে নূপুর মুখ বাড়ায়, তার চোখও প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করে ওঠে।

মা মৃদুস্বরে বলে ওঠেন—রাহুল এসেছে! কিন্তু উনি তো আসেননি।

—না। তাঁকে পুলিস রাত বারোটার সময় চালান করে দিয়েছে, সাক্ষীটাক্ষী বাজে কথা। কিন্তু মা, দোহায়! একদম কান্নাকাটি করবে না। কোন প্রশ্নও ক'রো না আমাকে!

বলতে বলতে দরজার মুখের কাছে এসে নিজের শোবার খাটখানির দিকে চেয়ে দেখে বলে—ঠিক আছে, ওরা সবাই আছে, আমি তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছি মা, রুটি আছে, রুটি! রুটি খাব! নাতাশাকে বল, দিয়ে যাক এ ঘরে!

—আমার যে কিছু শুধোবার ছিল রাহুল !

চেয়ারে বসে থাকা এ বাড়ির বড় ছেলেটি বলে উঠল। সে-কথায় এক ধাপ এগিয়ে চলে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রাহুল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকিয়ে পিছনে তির্যক চেয়ে একদণ্ড চুপ করে থেকে বলল—বাবুকে যেভাবে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল সেসব বর্ণনা করে লাভ নেই, যা শুনেছ তাই। থানায় বিশেষ কিছুই ঘটেনি, ওই একই ভ্যানে করে রাত বারোটায় চালান করে দিয়েছে।

—কোথায় নিয়ে গেল !

—সেকথা জানব কী করে ! জেনেই কি কিছু হবে ! দ্যাখ, তুমি যদি কিছু পার ! তোমার তো দল আছে, পলিটিকাল পার্টি ! তোমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তোমার কমরেড নিশ্চয় !

রাহুলের কথা বলার ধরনটি বড় ছেলের ভাল লাগে না, সে বিশেষ গম্ভীর হয়ে যায়।

মা বলেন—ওভাবে বলছ কেন রাহুল ! দোলন এ বাড়ির বউ ! ওদের বিয়ে হয়েছে।

—অ। লোকে তাহলে ঠিকই শুনেছে ! পার্টি অফিসে সর্ব্বোচ্চ নেতার প্রতিকৃতির সামনে তোমাদের মালা বদল হয়েছে। একথা কি ঠিক ? তবে যাই হয়ে থাক, এই চরম সঙ্কটের সময় তোমরা এসে পড়ে ভাল করনি !

—আমরা কী করে জানব ! রাহুলের কথার জবাবে বুবন এইটুকুই কেবল পেশ করতে পারে।

—এখন তো জানলে ! বলেই মৃদু বিরক্তির সঙ্গে দ্রুত পায়ে রাহুল স্থান ত্যাগ করে মায়ের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে।

রাহুলের কথার মধ্যে এমন এক অসহিষ্ণুতা এবং বক্রতা ছিল যে সাময়িক প্রত্যেকেই বিমূঢ় হয়ে পড়ে, কথা বলতে পারে না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাতাশা থালায় করে খাবার সাজিয়ে আনে মায়ের ঘরে। মেঝেয় শেতলপাটির খাবারের আসন পেতে দেয়। কলঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসে রাহুল। পায়ের চড়াতোলা জুতো, মোজা খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে। এমন অসহিষ্ণুতা আগে দেখা যায়নি। কেমন আর্ত বিপন্ন ভাবখানি রাহুলের চোখে মুখে ফুটে আছে।

—দে।

—দিয়েছি, দেখছ না ! বিপদ হয়েছে বলেই কি অমন করে বলতে হবে রাহুল !

বলে একটু দূরে নাতাশা চৌকাঠের কাছে ধপ্ করে বসে পড়ল। শাড়ির পাড় টেনে পা দু'খানি ঢাকছে বারবার। নাতাশা এমনিতে লাজুক প্রকৃতির হলেও রাহুলকে ভয় করে না তক্কাতক্কি করে, পিঠোপিঠি হলে যা হয়, বাড়ির বাইরে সে অত্যন্ত শান্ত। এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে, চৌধুরী হাসানপুরে ছোট মামার ওখানে থেকে পড়াশুনো করে। চিৎপুর থেকে পায়ে হেঁটে হাইস্কুল যাওয়া আসা অসম্ভব, তা কেবল ছেলেরাই পারে, তাছাড়া ছেলেরা সাইকেল করে যেতে পারে। এ গাঁয়ে প্রথম সাইকেল চড়তে শেখা মেয়েটির নাম নাতাশা, কিন্তু সাইকেল চড়ে স্কুল যাবে এ হিম্মত সাদা চৌধুরীর মেয়ের অন্তত নেই। কারণ তাতে মান থাকবে না।

সাইকেলে চড়লে মেয়েদের কুমারিত্বের হানি হয় একথা চিৎপুরে এখনও সাধারণ মনে প্রতিষ্ঠিত ধারণা। নাতাশার ঠাকুমা একদা নাতাশার কানে কানে একথা বলেছিলেন তাঁর জীবিত কালে। আজ তিনি নেই, কিন্তু মামাদের ওখানে সাইকেল চালাতে গিয়ে সেকথা

মনে পড়লে নাতাশার সংশয় হয়, তার সেই মর্যাদা আছে না গেছে ! পুরনো হাসানপুরের অন্য নাম চৌধুরী হাসানপুর, মামাদের টাইটেল দিয়ে গাঁয়ের নাম, সেখানে নাতাশা সাইকেল চড়তে কি সাঁতার কাটতে কিংবা মামাদের সাদা ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়তেও ভয় পায় না। চিৎপুর এলে তার সেই সাহস চলে যায়।

রাহুল এক মনে খাচ্ছিল, বারবার তার কদম আলির ডাক মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল। বাপের কী হবে সে জানে না, কিন্তু কদমের ডাক সে ভুলতে পারছে না। মনে পড়ছে কিছুক্ষণ আগে দেখা চয়ন খতিবের কথা। এই জীবন কি কম ! নবীর দোস্ত চয়নের ভাগ্য করেছেন অদ্ভুত।

নবী অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ, মুহম্মদের দোস্ত হন ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর খতিবের মুখের গ্রাস নিরূপণ করেন রাত্রির অন্ধকারে। মানুষটি মাছ ধরে আনেন জলাভুঁই থেকে, গাঁয়ের বউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে সেই মাছ উঠোনে রাখেন—এই স্বেচ্ছাকৃত কাজের বিনিময়ে বউয়ের কাছে দাওয়াত চান, অর্থাৎ খেতে চান। আশ্চর্য লাগে খতিবের প্রান্তিক জীবনখানির অস্তিত্ব।

রাহুল সহসা খাবারের থালা সামনে ঠেলে দেয়। আর গ্রাস তুলতে পারে না, দাঁতে রুটি ছিঁড়তে গিয়ে থেমে পড়ে। বোনের মুখের দিকে অপলক অন্যমনস্ক চেয়ে থাকে। শ্যামাঙ্গী, কিন্তু বড়ই সুশ্রী নাতাশা মনে করে রাহুল তার কথা নিতে পারেনি। নাতাশা পা ঢাকে বারবার।

—তুই রাগ করলি রাহুল ! বউদির সঙ্গে তুই কথা বলবি না ?

—বউদি ?

—কেন, হিন্দুর মেয়ে তো !

—সিঁদুর পরে ?

—না। পার্টিতে ওসব চলে না। বউদি অ্যাকটিভ ওয়ার্কার, কলকাতার ভবানীপুরের মেয়ে, এম. এ দিয়েছে মডার্ন হিস্ট্রিতে। রেজাল্ট হয়নি। রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রী। মহিলা সমিতির ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি না কী যেন— এখানে এসেই বড় দায়িত্ব পেয়েছেন, অবশ্য তোর কাছে এসবের কোন দাম নেই ! নে, খা !

—না। আর খাব না, ঘুম পাচ্ছে ! তোর পরীক্ষা কবে ! ছোট মামা কি বুবন চৌধরীর পার্টি করেন নাকি ?

—না। সিমপ্যাথাইজার !

—বাঃ ! টার্মটা তো খুব ভাল শিখেছিস !

—খাবি না ?

—না।

রাহুল খাবার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কলঘরে ঢুকে যায় সটান। দ্রুতই বেরিয়ে আসে। নাতশা হাতমোছার শুকনো তোয়ালে এগিয়ে দেয়। হাত মুখ মুছে নিতে নিতে রাহুল বলে—ছোটমামা, অর্থাৎ চৌধুরী মামা আমাদের আপন মামা নয় নাতাশা। মায়ের মাসতুত ভাই, জানিস তো !

—কেন ? চোখ ঈষৎ সরু করে নাতাশা।

—তাই বলছিলাম ! তোর পড়াশুনাটাই আসল, তাই করবি !

—তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না রাহুল !

রাহুল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তোয়ালেটা বোনের হাতে সামান্য ঠেলে গুঁজে দিয়ে

খাটে চিত হয়ে পড়ে যায়। যেন সে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছিল না। এতক্ষণ হাঁটাচলা করছিল তাই খুব আশ্চর্যের, দেহে কোনওই বল ছিল না।

চোখ মুদে রাহুল বলল— ভাবীকে ভাবী বলাই ঠিক। বউদি বলিস না। আমরা তো মুসলমান, নাকি ? তাছাড়া চৌধুরী হাসানপুরে ছোট মামার জোর আছে, এখানে সেই জোর খাটে না। মনে রেখো, আমাদের কোন সাদা ঘোড়া নেই।

বলতে বলতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল রাহুল। রাহুল পারভেজ। বড়দা বুলবন তাহির চৌধুরী। বাবা সাহির আজীজ চৌধুরী ওরফে সাদা চৌধুরী। ছোট ভাই মণির আজীজ চৌধুরী ওরফে মণি। বোন নাতাশা চৌধুরী ওরফে তাশা। মা চামেলি চৌধুরী ওরফে আয়েষা বিবি। ছোট বোনটি ফরিদা পারভিন চৌধুরী ওরফে নূপুর। কাজের লোক ওরফে কিষেন ওরফে মুনিষ ওরফে দেখভাল করনেওয়ালা বাড়ির চাকরটির নাম হুকুম আলি। হুকুম আলির বউয়ের নাম ফুলু, শুদ্ধ নাম ফুলভানু। প্রকৃত পক্ষে ফুলভানু সোভান আলির বউ ছিল। লগড়াজলিতে মার্ডার হয়, তার মৃত্যু হলে সাদা চৌধুরী সোভানের ছোটভাই হুকুমের সঙ্গে নিকে দেন পুনর্বার। দেওর হয় স্বামী।

নাতাশা সকুণ্ঠ গলায় বার কতক ডাকল ভাইকে। সাড়া পেল না। চলে এল পাশের ঘরে। বলল—রাহুল ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে আর ডেকো না মা !

তারপর বউদির হাত ধরে বলল—আমাদের ভাগ্য বউদি ! বাবা থাকলে তোমার নিশ্চয় ভাল লাগত।

—হ্যাঁ মা ! তোমার সম্মান করার লোকটিই যে নেই !

একথা বলে চামেলি নিঃশব্দে আঁচলে চোখের জল মুছতে থাকলেন বারংবার। রাহুল তাঁকে কাঁদতে নিষেধ করেছে। চোখের জল তাঁকে কিন্তু বাকি রাতটুকু ঘুমাতে দিল না।

আশ্বিনের চাঁপা রঙের আলো এসে পড়েছিল রাহুলের বোজা চোখের পাতায়। চোখ খুলতে তার ভয় হচ্ছিল। কেমন ভাবে আজকের দিনটির সে মোকাবিলা করবে জানে না। মায়ের গলার আর্দ্র কোরান পাঠ তার কানে আসছিল। মা আর বাবা বাদে এ বাড়ির কেউ নামাজ পড়ে না। বাবা অনিয়মিত নামাজ পড়েন। তবে মজলিস-আড্ডায় গেলে তাঁকে নামাজ পড়তেই হয়। কোরানের সুরে যে প্রার্থনা ভেসে আসছিল, তাতে মনে হল, রাহুলের শরীরের ভিতরভাগ একটা কোমল অনুভূতিতে বড়ই অসহায় হয়ে পড়ছিল। সে ঠিক করল, প্রথমে লালবাগ এবং পরে বহরমপুর যাবে, কোথায় বাবাকে রাখা হয়েছে, যদি জানা যায় !

মাথার কাছের জানলাটা কি রাত্রে খোলাই ছিল ? নাকি কেউ ভোরে খুলে দিয়েছে ? তাকে কি মা জাগিয়ে তুলতে চান ? অথবা নাতাশা ? বারবার কি এরা তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবে, তারপর বাবার কি হয়েছে ?

ভাবতে ভাবতে খাটের উপর উঠে বসল রাহুল। নাতাশা ঘরে ঢুকে এ মুহূর্তে ধূলা ঝাঁট দিতে থাকল পালকের ঝাড়ন দিয়ে কোমল স্পর্শে মেঝেয়। কোন কথা বলছিল না। জানলাবাহিত স্বর্ণালোকে ধূলার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলি চিকমিক করছে বীজাণুর মত, যেন অজস্র প্রাণ ভাসছে আকুলিবিকুলি করে। সেদিকে অলস সরু চোখে চেয়ে দেখছিল রাহুল। তার এই বিষন্ন চেয়ে থাকা দেখে নাতাশা কথা বলার কথা ভাবল।

হাতের ঝাড়ন থামিয়ে বলল—সাতটা বেজে গিয়েছে ! চা খাবি ?

—রোদে চোখ খোলা যাচ্ছে না !

—চোখেমুখে পানি দে !

—দিই !

বলে ফের তেমনই বসে থাকে রাহুল। ঝাঁট থামিয়ে নাতাশা রান্নাঘরে যায়। দেখে, বউদি দোলন পিড়ির উপর বসে নীরবে চা তৈরি করছে, স্টোভ শোঁ শোঁ করছে। রাত্রি এগারোটায় সে এ বাড়িতে ঢুকেছে, এখন পর্যন্ত প্রায় অমনই নীরব, দু'চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা বিশেষ কিছুই শোনা যায়নি, হয়ত তার বলা হয়ে ওঠেনি। নাতাশা জেনেছে, বউদি কম কথা বলে, এত কম কথা বলে পার্টির কাজ কি সামলানো যায় ! হতে পারে বাইরে, জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে কথা বলার অভ্যাস আছে।

একটা চিনে মাটির ফুলপাতা আঁকা প্লেটে চায়ের ভরা কাপ যত্ন করে বসিয়ে দেয় দোলন। বলে—বিস্কুট লাগবে না ?

—কার চা দিচ্ছ বউদি ? বড় ভাইয়ার ?

—না। রাহুলের জন্যে। বুলবন খুব ভোরে বেরিয়ে গেছে, তোমরা তখন ওঠনি। মাকে বলে গেছে।

—কোথায় গিয়েছে ?

—আমায় সব কথা বলে যায়নি। শঙ্করপুর যাবে, আরও কোথায় কোথায় যেন। ডিস্ট্রিক্ট পার্টি অফিসেও দেখা করবে। তোমার বোধহয় ঘুম এসে গিয়েছিল, ভোররাতে। মা, আমি, হুকুম আলি, মণি আর বুলবন জেগে থেকেছি ! আসলে ঘুম তো এল না।

—কী হবে বউদি ! বাবাকে ছেড়ে দেবে ?

প্লেট হাতে নিতে নিতে সাহসা এ প্রশ্ন করে নাতাশা। রাজনৈতিক কর্মীর কাছে এ প্রশ্ন করা অবান্তর নয়, বোধহয় কোনও আশ্বাস সে চায়। দোলন কী যেন বলবার জন্য নাতাশার দিকে চোখ তোলে, এমন সময় মা এসে চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালেন।

বললেন—আমাকে চায়ের প্লেট দে। নীচে শরম আলি এসেছে, রাহুলকে সাবধান করে দি। ও যেন মাথা গরম না করে। দফাদারের ছেলে, পুলিসের খবর আনতে পারে, ললিতের লোক, ফের বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা মা দোলা, তোমার শ্বশুরের জন্যে তোমাদের পার্টি কিছু করতে পারে না ? বল না ?

নাতাশার হাত থেকে চায়ের কাপ-প্লেট চামেলি নিজ হাতে নিলেন। তারপর দোলনের কথা না শুনেই রাহুলের কাছে চলে গেছেন।

—মা খুব অস্থির হয়েছে বউদি !

মায়ের এই অদ্ভুত আচরণের যেন একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে নাতাশা। এ কথায় আত্মকুণ্ঠা বোধ করে দোলন, মাথা নীচু করে। সে বুঝতে পারছিল ক্রমশ সে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু তার তো কিছুই করার নেই, সামর্থ্যই নেই। সমস্ত রকমের রাজনৈতিক কর্মক্রিয়া এখন নিষিদ্ধ। প্রেসের স্বাধীনতা নেই, সেন্সার হয় পত্রিকার আর্টিকল। সব খবর প্রকাশ করা এখন অবিধেয়। এই অবস্থায় কোন রাজনৈতিক মিটিং মিছিল স্লোগান বক্তৃতা চলে না, চাপা শ্বাসরুদ্ধকর একটি সময়-মুদ্গর পাষাণের মত বুকের উপর চেপেছে। এক অদৃশ্য হিংস্র নখর তুমুল নিবিড় অন্ধকারকে, দলা পাকানো, পিচ্ছল প্রায় অক্সিজেনশূন্য রাজনৈতিক আকাশকে নিঃশব্দে ছিন্নভিন্ন করে। কাজ বলতে অন্য দলগুলি নৈঃশব্দ্যকে আলস্যে যাপন করে চলে। দোলনের দল যাপন করে শরৎ জন্মশতবর্ষের উৎসব। রাজনীতিই যেখানে নেই, সেখানে শাশুড়ির আর্ত আবেদনে দোলনের অধোমুখ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সে এখন কী করে বোঝাবে, তার অসহায় অক্ষমতার কথা ! বউ হয়েছে বলে দোলনের যেন অপরাধের সীমা ছিল না !

রাহুলও বলতে চায়, তোমার রাজনীতির শক্তি দিয়ে আমাদের বাঁচাও ! নাতাশা বউদিকে আর কী বলবে ভেবে পেল না ।

দোলন তবু বলল—ও নিশ্চয় পার্টি অফিস যাবে ! প্রাণকিশোরদাকে অবশ্যই বলবে সব কথা, বাবাকে কোন্ জেলে রেখেছে নিশ্চয় জানতে পারব ! প্রাণকিশোর দাদা জেলা সেক্রেটারি, শহরে ওঁর ইনফ্লুয়েন্স আছে ।

নাতাশা বলল—একথা আর মায়ের সামনে বলো না বউদি । মা ভাববে, তোমরা সত্যিই হয়ত পারবে, এ প্রত্যাশা না জাগানোই ভাল । বলে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে না থেকে নাতাশা নীচের তলায় নেমে চলে যায় ।

চায়ের প্লেট হাতে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে মায়ের বাসি ম্লান রাতজাগা চোখের দিকে চায় রাহুল ।

গলায় সেই বিস্ময় ঠেলে ওঠে—আবার প্লেট কেন ? কখনও তো এমন দাও না ! এক কাপ জর্দা-ঘোলা চা, তাই তো যথেষ্ট !

—বউ করেছে, ওরাই চা-পাতা এনেছে শহর থেকে বোধহয় !

মা সামান্য হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেন ঠোঁটে । সেই হাসি রাহুলের ভাল লাগে না । চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুস্বাদ-গন্ধ পেলেও মুখ তোলে রাহুল । চায়ের উত্তাপে কি না কে জানে একটা চোখ কুঁচকে তোলে, তারপর একটু সিধে হয়, বলে—কাপের তলে প্লেট লাগিয়ে চা খাওয়ার সময় কি এখন ?

দ্রুত চা গিলতে থাকে রাহুল পারভেজ ।

—ক্রিম লাগানো বিস্কুট ! এ কে খাবে ! নিয়ে যাও ! রোজকার মত যা দাও, শুধু চা, তাই দিলেই তো হত !

বলতে বলতে ঘন ঘন চুমুক দেয় রাহুল ।

মা বললেন—নতুন মেয়ে । ভোরের চা যে কেমন খাও, কী করে জানবে ! অত দোষ না ধরলেই কি নয় ! ওরা তো কিছুই জানে না বাপু ! এসে পড়েই ওদের ঘাট হয়েছে ! ওদের আমি চলে যেতে বলছি !

—অত ভয় দেখাচ্ছ কেন মা ! বলে খাট ছেড়ে মেঝেয় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় নেমে গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে নিয়ে রাহুল বলে—বড় ছেলের উপর তোমার অশেষ দুর্বলতা ! তাছাড়া ওদের চলে যেতেই বা বলবে কেন ! এ বাড়ির মেহমান তো নয় এরা । তবে একটা কথা তোমাকে বলি, তোমারও নিশ্চয় মনে আছে !

—কী কথা !

—'মিরাজ' নামে একটি পত্রিকা ওদের বিয়ের খবর কীভাবে ছেপেছিল ! গাঁয়ে গাঁয়ে সেই পত্রিকার মুসলমান পাঠক আছে ; সাইকেলের ক্যারিয়ার বোঝাই হয়ে বিলি হয় । কী লিখেছিল ? 'হায় হায় হায় গো, এ কেমন বিহা গো !' এই হল হেডিং ! কী নোংরা গ্রাম্যতা ! কে কীভাবে বিয়ে করছে, কোথায় মালা বদল করছে, তা ওরা কী করে জানল ! আর তাই কি লেখার বিষয় ! নিউজ নাকি সেন্সার হচ্ছে শুনি, এত বড় মানহানির বিষয় ছেপে বেরিয়ে গেল ! এভাবে মানুষ খেপানোর মানে কী ! তোমাকে আমি সেই পত্রিকার কপি দেখিয়েছি ! দেখাইনি ? এমারজেন্সি মানে কী মা !

—আমি কী করে জানব খোকা !

চামেলির গলা সহসা কেমন হাহাকার করে ওঠে । রাহুল বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল । এই সময় ঘুম থেকে উঠে পড়েছে নূপুর । ঘুম থেকে উঠেই যেখানেই থাক

রাহুলের ঘরে এসে ঢোকে। ভাইয়ের কোলে এসে চুপচাপ বসা ওর অভ্যাস। গাঁয়ে রাহুল থাকলে এই ঘটনার প্রাতঃ অভ্যাসে ব্যত্যয় হয় না। নূপুরকে রান্নাঘর থেকে এসে ধরেছে দোলন, এই রান্নাঘরে ভোরের চা হয় কেবল, সন্ধ্যায় হয়। অন্য রান্না নীচে হয়।

দোলন তাদের বিয়ের প্রসঙ্গ শুনতে পাচ্ছিল। রাহুল বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল, বউদিকে দেখে স্বর নিরস্ত করে সে।

মা বলেন—নীচে শরম বসে আছে। সাবধানে কথা বলিস!

সিড়ি ভেঙে নীচে ঝড়ের মত নামে রাহুল। শরমকে দেখে তার মাথা গরম হয়। —কী চাও! খবর জানতে এসেছ, তাই না! ললিতবাবুই তো সব জানে! বল, আমার বাবা কোথায়?

প্রবল এই আক্রমণে আচমকা মিইয়ে পড়ে শরম আলি। থতমত খেয়ে কোন প্রকারে বলে—তোমাদের কালী কলাইয়ের বিছন আছে? পোকাপড়ার বিলে খেসারি-ভুঁইয়ে ছিটে মারব। আমি খবর লিতে আসিনি, দিতে এসেছি! আগে এক হেঁটো কলাই দেও, বলছি!

—তোমার মুখটা আমি ছিঁড়ে ফেলব, শরম! শুধু এইটুকু উচ্চারণ করতে পারে রাহুল। পাগলের মত হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে আসে। বস্তার মুখ খোলে। বেতের সরায় ভর্তি করে কলাই। ধড়ফড় করে নীচে নেমে শরমের চাদরের মুড়োয় দ্রুত সেই বীজ বেঁধে লটকে দেয়, শরমের কাঁধে ফেলে দিয়ে দম ফেলে। মা, নাতাশা, দোলন, হুকুম পর্যন্ত নীচে এসে ঘটনা দেখতে থাকে নীরবে।

—কথা দেও, কারুকে বলবে না! ললিতের বউ বললেন, বাবুর জেল হয়েছে! লালবাগে রেলস্টিশনের কাছে আটক আছে বাবু! যাও দেখে এসো! কালী কলাইয়ের কসম, তাশা, তোদের মিছে বললে আমার মুখে কুষ্ঠ হবে।

—কবে শোধ দিবি শরম! হেঁকে উঠল রাহুল।

—আবার শোধ চাও। এক সরা বিছন রাহুল! তোমার বাপ তো এমনই দিত! যাই গিয়ে ছিটে মারব আঘনে জল মরলে জো জাগবে!

কাঁধে লটকে নেওয়া বীজ, শরম আর দাঁড়ায় না। মানুষকে দানখয়রাতের সুনাম এখন যেন মনে হয় একটা ট্যাক্স! বাপের দান যেন পাপ মাত্র। হঠাৎ সিঁড়ির দিকে চাইতেই রাহুলের চোখ পড়ে বউদির উপর। দোলন সিঁড়ির নীচের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে, গা ঘেঁষে আছে নূপুর। কী স্বচ্ছ, কোমল, ঈষৎ ব্যথাহত ভদ্র চক্ষুদ্বয়। অসহায় কিন্তু নিরাশ নয়। কোথায় যেন সেই চোখের অতলে কী একটা প্রার্থনা শুয়ে রয়েছে আলোর মত। তবু এক সুতীব্র এত অদ্ভুত আঁধারে এই অকাট্য ভীতিপ্রদ গাঁয়ে, অজঅন্ধ চিৎপুরে এল কেন বউ? তোমার বিবাহ যে বিলাস মাত্র দোলন! তুমি ভুল করেছ!

মনে মনে একথা বলে ওঠে রাহুলের অবচেতনা। রাহুল লালবাগ রওনা দেয়।

বুলবন দুপুর থেকে শঙ্করপুর হাই মাদ্রাসার টিচার্সরুমে প্রায় নির্বাক বসে রয়েছে। আজ তাকে চাকরির জন্য ডেকেছেন সেক্রেটারি। সে জানে, তার চাকরি হয়ে যাবে। ছোট মামার তদ্বিরে এই চাকরি এক প্রকার বাঁধা। মামার লেখা একখানি জোরালো তদ্বিরি খৎ সঙ্গে ছিল, যেটি সে সেক্রেটারির হাতে তুলে দিতে পেরেছে। চারটে বেজে গেল, পাশের হল ঘরে কমিটির মিটিং চলছে। সে জানে, তার ডাক পড়বে।

স্কুলের মাস্টারমশাইরা অধিকাংশ চারটার অনেক আগেই চলে গেছেন। দু'জন তখনও আছেন, ওঁরা কমিটির সদস্য। একজন টিচার যাওয়ার আগে কাছে এসে বললেন—আমি

দুলাল রায়। বায়োসায়েন্স ! আপনি তো বাংলা অনার্স ! এম. এ.। বি. টি. করেছেন ? করেননি। ও হয়ে যাবে। আটকাবে না। বোধহয় সামনে মাসের দুই তিন তারিখ ডেট পাবেন জয়েন করার !

বলে সাইকেল বার করে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাইতেই বিদায়ী নমস্কারও হল।

যখন ডাক পড়ল তখন পাঁচটা। হলঘরে সেক্রেটারি, হেডমাস্টার, দু'জন শিক্ষক আর দু'জন কারা যেন। ঢুকে কী মনে হওয়ায় মুসলমানী সালাম জানায় বুলবন।

সেক্রেটারি চোখের ইশারায় বুলবনকে বসতে নির্দেশ করেন সামনের চেয়ারে। ভদ্রলোক পাজামা ফুলসার্ট পরা দাড়ি গোঁফ কামানো অত্যন্ত স্মার্ট। নাম হিফাজত তরফদার। হোমিওপ্যাথির যশস্বী ডাক্তার, অবস্থাপন্ন, কোন রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলেও ললিতমোহনের দলের সমর্থক হবেন। বুলবনের ভয় করছিল, এখানেও ললিতের কালো হাত থাবা হয়ে রয়েছে কিনা !

সেক্রেটারি মিষ্টস্বরে বললেন—সবই ঠিক আছে পারভেজ। তোমার মার্কস ভাল, মাত্র ক'টি নম্বর পেলেই ফার্স্ট ক্লাস হত। অনার্সে পঞ্চাশের উপরে মার্কস—চমৎকার ! আমরা খুশি ! কিন্তু এরা একটা অশোভন প্রস্তাব করেছেন ! তোমাকে তোমার বিয়ের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। না, না, এটা আমাদের কৌতূহল—এই সার্টিফিকেটের জন্য কোন গ্রেস পাবে না !

বলে আত্মগতভাবে হেসে ওঠেন হিফাজত ডাক্তার। বলেন—এটা তো মাদ্রাসা কিনা ! তুমি নামাজ পড় ?

একটা কালো রঙের বিদ্যুৎ, যেন সরীসৃপ কোনও, বল্লরীর মতন বক্র, লতানো, লেলিহ তীব্র আগুন, শলাকার ক্ষিপ্রতায় বুলবনের দেহে ঢুকে তাকে চেয়ার থেকে খাড়া করে তোলে।

সে ছিটকে সরে আসে পিছনে। ধীর চাপা গলায় কী যেন বলতে গিয়ে দেখে তার স্বর ফুটতে চাইছে না।

॥ ৩ ॥

সদরঘাট থেকে জলঙ্গীর বাস ধরে চুনাখালির পার্কের কাছে নেমে দাঁড়াতেই রাহুল কবিকে দেখতে পায়। এখান থেকে পথ দুভাগ হয়ে ডানহাতি পথটি লালবাগ গেছে। বহরমপুর থেকে জিয়াগঞ্জ যাওয়ার বাস ধরে লালবাগ যেতে হবে। কবিকে দেখে রাহুল অসোয়াস্তি বোধ করে, যেন কোথাও পালাতে পারলে বাঁচে। ঘড়িতে এখন সকাল দশটা বেজেছে। কবি এগিয়ে এল।

—লালবাগ আমিও যাব রাহুল ! হাজার দুয়ারী কখনও দেখিনি।

আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে কবি বলল—রাগ করেছ ?

রাহুলের এত ক্রোধ হচ্ছিল যে, কোন জবাব দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—থানা-পুলিসকে খুব ভয় পাও ? আজও কিন্তু সেই পুলিসের কাছেই যাচ্ছি, যাবে নাকি ! স্টেশনের কাছে গারদে বাবা আছেন। আমার বাবা, সাদা চৌধুরী।

—তুমি তো আমায় আর বিশ্বাস করবে না। আমার সব কথা তোমাকে বলতেও

পারছি না। কিন্তু সত্য বলছি, তোমার চেয়ে আমার বিড়ম্বনা কিছু কম নয়, পরে তোমাকে বলব !

—একথা তোমার চালাকি কবি। শখ করে লালবাগ যাচ্ছ, আমি কি তাই যাচ্ছি ! আমার যে বিপদ ভাই !

—তোমার বাবাকে আমিও দেখব ! রাত্রে ললিতমোহন মামার কাছে এসেছিল ! একটুখানি অবাক হয়ে রাহুল কবির মুখের দিকে চাইল।

—হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। লালবাগে উনি আছেন, তা-ও জানি। আর এ-ও শুনলাম, কাল পরশুই ওঁকে বহরমপুর জেলে চালান করে দেওয়া হবে। দেখলাম, ললিতমোহন খুশিতে ডগমগ করছে। রাত তখন এগারোটা। এরকম হিংস্র মুখ দেখলে আর সেই মুখে আনন্দ দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

—সত্যি বলছ !

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি ?

কবির চোখ মুহূর্তে ধক ধক করে জ্বলে উঠেছিল প্রাচীন যজ্ঞাগ্নির মত। মুখের চামড়ায় ফুটে উঠেছিল কী এক স্বপ্ন-ব্যথিত কাঠিন্য। খুব রহস্যময় দেখায় ওকে।

—রাত্রি এগারোটা নাগাদ মামার বাড়ির সামনে নেতাজী পার্কে পুলিসের জিপ এসে থামল। ওই গাড়ি থেকে নেমে এল ললিতমোহন। যেন বাদশা নেমে এলেন। পা ফাঁক করে হাঁটছে। উইলস সিগারেট খায়, নেভিকাট। ব্রাঞ্চ অফিসের পোস্টমাস্টারের বেতন শুনলে তুমি হাসবে। সারা মাস ওই টাকায় ওরকম সিগারেট চোষা যায় না রাহুল ! মামার কাছে থেকে একখানা নিষিদ্ধ পত্রিকা নিয়ে পুলিসেকে দেখালে। পত্রিকাখানি তোমাদের বাড়ির ঠিকানায় যাচ্ছিল। মুমতাজ আলির নামে C/O সাহির আজীজ চৌধুরী। মামা এই পত্রিকাখানি আটকে দিয়েছেন, কেন জানো ?

—কেন ?

বিস্ময়কর বিবরণ শুনছিল রাহুল। কবিকে আর সে অবিশ্বাস করতে পারছিল না।

কবি বলল—সবই বলব তোমাকে ক্রমশ। এই ঘটনার সঙ্গে আমারও যোগ আছে জানবে। বিশ মিনিট বাদে পুলিসের জিপ খুব সম্ভব ললিতকে সঙ্গে করে থানার দিকে চলে যায় হাওয়ার বেগে। শুনে কী মনে হচ্ছে তোমার, গোয়েন্দা গল্পের মত, তাই না ? থানা হাতে থাকলে কাহিনী তৈরি করা কঠিন না রাহুল !

—পত্রিকাটির কী নাম ?

—একটা লিফলেট মত, হালকা ! লেটার প্রেসে ছাপা, বাইরের মলাটখানি আশ্চর্য ! টুনটুনির গল্পের ছবি। ভিতরে অন্য কথা আছে।

—কী কথা !

—পরে বলব সব। আমার মনে হচ্ছে মুমতাজ আলি তোমাদের বাড়ি আরও কিছুদিন থাকতে চেয়েছিল ! হয়ত একমাস, দুমাস, তিনমাস !

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না কবি !

—একটা কথা বলি রাহুল ! তোমাতে আমাতে আর কোনও পার্থক্য নেই !

কথাটি শুনে রাহুল অশেষ বিস্ময় বোধ করে। ঈষৎ বিরক্তও হয়। সবই কেমন হেঁয়ালির মত ঠেকছে। কবিকে আর সহজ মনে হচ্ছে না। তাকে সে থানার ঘটনায় গতদিনে একমাত্রিক কল্পনা করেছিল, আজ মনে হচ্ছে, ভীরু বা স্বার্থপর কোনটিই নয়

কবি, তার সঠিক মাত্রা বোঝা যাচ্ছে না। তোমাতে আমাতে আর কোন পার্থক্য নেই, একথার কীই বা মানে !

কথা বলতে বলতে কবির চোখমুখ থেকে আগ্নেয় কাঠিন্য সমান্য সরে গিয়েছিল। তবু মনে হচ্ছিল তার অন্তর কেমন তোলপাড় করে চলেছে। ঠিক এই সময় জিয়াগঞ্জের বাস এসে চোখের উপর থামে। কবি রাহুলের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে টেনে বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ে। এত ভিড় ছিল যে ভিতরে ঢুকে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। বাস চলাকালীন আর কোন কথা বলার অবকাশ হয় না।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা মোড়ে এসে বাস থেকে নামে ওরা দুজন। বারোটা বেজেছে। রাস্তার দুপাশে বুনোগাছের অজস্র ঝোপ। কুকশিমা, প্রচুর কাঁটালতা, গান্ধল ঝোপ। হলুদ ফুল ধরেছে ঝনঝনি গাছে। বড় বড় পুরনো আম গাছ দুপাশে খাড়া। গাছের প্রাচীনতার মধ্যে বিরাটত্বই নয়, একটা কেমন অলৌকিক গাম্ভীর্যও রয়েছে। একটা হাতুড়ি-পাখি টকটক করছে ক্রমাগত। মনে সেই শব্দের নিস্তব্ধ আবেশ রচনা করছে এই মধ্যাহ্ন।

গারদখানার সামনে দুজন ঘোরাঘুরি করে। লোহার শিকঅলা প্রকাণ্ড দরজা। ছোট মতন একটা গেট। ভারী তালা লাগানো। সেখানে লম্বা টুলের উপর বসে রয়েছে খাঁকি হাফ-প্যান্টপরা একজন লোক। গায়ে খাঁকি পোশাক। অনেকক্ষণ যাতায়াত করল পথের উপর ওরা। কীভাবে প্রস্তাব করবে ঠিক করতে পারে না রাহুল।

দেখা গেল খাঁকি লোকটিই হাতের ইশারা করে ওদের ডাকছে যেন। প্রথমে ওরা বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কাছে।

লোকটি শুধায়—কে আছে ?

—বাবা !

—কবে এল ?

—কাল !

—ভিতরে কিছু ঢুকবে না। না টাকা পয়সা, না বিড়ি। না বই। না কাপড়চোপড়।

—আমরা শুধু দেখব একবার ! দিন না দাদা, বাবাকে ডেকে ! আমার বাবা লুঙ্গি পরে আছেন। সানফ্রাইজের জামা, বেনিয়ান জ্যাকেট, ইসমাইল লুঙ্গি, কালি পালিশ করা জুতো ! বাবার দাড়িগোঁফ কামানো। মাস্টার মশাই।

হঠাৎ রাহুল কেমন কাতর হয়ে পড়েছিল। কবির চোখের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বর শক্ত করে বলল—আমরা কথা বলব দুটি। সময় বেশি চাইব না।

খাঁকি বলল—কোন কথা অ্যালউ হবে না। খালি দেখতে পাবে। লোকটা দূরে ওই ওখানে এসে দাঁড়াবে শুদু।

আঙুল তুলে ভিতরে একটা অনির্দেশ্য স্থানকে ইঙ্গিত করে পাহারাঅলা। তারপর টুল থেকে নামে।

লোহার মোটা শিক ধরে বলে—এখানে আজ কাল দুদিন থাকবে। পরশু এলে দেখতে পাবে না। দুতিন দিন রাখছে, তারপর তুলে নিচ্ছে।

—কোথায় ?

—তা কী করে জানব ! পাঁচটা টাকা ছাড়ো দেখি ! কী রিস্ক জানো না। উপরঅলা জানলে চাকরি থাকবে না। সাধারণ চোর ডাকাত হত তাও কথা ছিল !

কবি পকেট থেকে দশটি টাকা বার করে এগিয়ে গলিয়ে দেয়। তারপর বলে—দুটি

নয়! মাত্র একটি কথা শুধাব। কাছে আসতে দিও!

সাদা চৌধুরী ছেলেকে দেখতে পান বটে, কিন্তু হাত নেড়ে ইশারা করেন চলে যাওয়ার জন্য। কিছুতেই কাছে আসেন না।

—জোরে কথা বলবে না, দেখছই তো ভয় করছে!

পাহারাঅলা কবি আর রাহুলকে সাবধান করে দেয়। একটি রাতেই বাবা যেন কেমন শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। গায়ে জামা নেই, শুধু গেঞ্জি, পা খালি। গালে দাড়ির অস্ফুট খোঁচা। চোখের কোলে কালি পড়ে গিয়েছে। মুখ নাড়ছেন নিঃশব্দে, কতকিছু বলে চলেছেন ইশারায়। রাহুল কিছুই বুঝতে পারে না। রাহুল যে বুঝতে পারছে না, সেকথা ঠাহর করে দমকা ছুটে চলে আসেন গেট পর্যন্ত।

—মুমতাজ আলিকে সাবধান করে দিও! সাবধানে থেকো। তুমি বলবে, তুমি ওকে চেন না। যাও, চলে যাও!

এইটুকু বলে সাদা চৌধুরী আর দাঁড়িয়ে থাকেন না। চোখের আড়ালে মিলিয়ে যান গারদের দক্ষিণ দিকে কোথাও একটি কুয়ো মতন কিসের পাশ দিয়ে দ্রুত বেগে। সেখানে একটি কপিকল ঝুলে রয়েছে ফাঁসির মতন।

কপিকলটা গারদের বাইরে থেকে চোখে পড়ছিল। ওখানে জটলা করে এসে দাঁড়াল একদল কয়েদী। তারপর দাঁত বার করে অকারণ হাসতে থাকল, বিচিত্র কলবর এবং মুখভঙ্গি করতে থাকল। একজন আর একজনকে মুঠো বেঁধে কুস্তির মহড়া দেওয়ার মত গুঁতোতে গুঁতোতে শুইয়ে দিল মাটিতে। মারপিটও হয়ে গেল মুহূর্তে। রাহুলের চোখে এরা কেউ মানুষ ছিল না, ছায়া আর কঙ্কালের মতন জীবপিণ্ডের আকৃতি একটি নৃত্যের সমারোহ করছিল হিংস্র উল্লাসে। কপিকলটি মরচে ধরা চেনসুদ্দো কর্কশ শব্দে নড়েচড়ে উঠছিল ওদের লাফালাফির ঘায়ে।

রাহুল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কবিকে হাত ধরে টেনে পথে নেমে এল। দু'জন চুপচাপ পথ হাঁটতে থাকল। কেউ কারও দিকে চেয়ে দেখছিল না, কী এক ভয়াবহ স্তব্ধতা কিছুক্ষণের জন্য দু'জনকে ঘিরে ধরেছিল।

কাঁধে ঝোলানো রাহুলের কাপড়ের ব্যাগটির মধ্যে বাপের জন্য জামা কাপড় ছিল, যা সে বাপকে দিতে পারল না। মা কিছুটা বরফি হালুয়া বানিয়ে দিয়েছিলেন, রাহুল সঙ্গে নিতে না চাইলেও তিনি জোর করে ব্যাগের ভিতর গুঁজে দিয়েছিলেন। কোন খাদ্য খাবার, জামা কাপড় যে বাবার কাছে কিছুতেই পৌঁছবে না, তা রাহুল জানত। গারদখানা সম্বন্ধে যেটুকু তার শোনা তাতে করেই তার মনে হচ্ছিল, এই পোশাক, খাদ্য সঙ্গে নেওয়া অর্থহীন। কিন্তু মায়ের মন যাতে আঘাত না পায় সেই কারণে হালুয়ার পুঁটুলিটা বাধ্য হয়ে থলেতে স্থান দিয়েছিল। মাকে বলেছিল, এ সব দিও না! মা শোনেননি।

একটি রাতেই বাবার চেহারা কেমন পাগলের মত হয়েছে, চোখের দৃষ্টি কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। তিনি কেন মুমতাজ আলির কথা ওভাবে বললেন? মনে হল, তিনি সর্বক্ষণ মুমতাজের কথাই ভাবছেন। মুমতাজকে কখনও চোখে দেখেনি রাহুল। মদন শিকদার যে বাবার মিতে সে কথা সে জানে। মদনকে রাহুল তাদের বাড়িতে ছেলেবেলায় দেখেছে। মানুষটি হেকিম। গেঁয়ো কবরেজ। বাবার কোন একটি কঠিন ব্যাধির মদন চিকিৎসা করে আরোগ্য করেছিলেন। সেই থেকে বাবার সঙ্গে মিত্রতা হয়। আগে তিনি চিৎপুরে আসতেন, ইদানীং আর চোখে পড়ে না। বোধ হয় পাঁচ সাত বছর কি তারও বেশি এ দিগরে তাঁর ছায়া পড়েনি।

রাহুল বলল—তুমি কি তাহলে হাজার দুয়ারী দেখবে ?

কবি বলল—কী করব বুঝতে পারছি না ! বরং আজ তোমার সঙ্গেই ফিরে যাই। একলা তোমাকে ছাড়তে মন বলছে না। আচ্ছা, মুমতাজ আলির সঙ্গে তোমার দেখা হবে ?

রাহুল একদণ্ড কী ভাবল ; তারপর বলল— আমি তাকে চিনি না। ওকে কেন সাবধান করতে হবে, কী সাবধান করব ! ওকে চিনি না একথাই বা বলতে হবে কেন ! কাকে বলব ? মুখে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেও এ ছিল রাহুলের সবিস্ময় স্বগতোক্তির মত।

কবি বলল—কেউ যদি শুধোয় ! যেমন পুলিস ! আসলে মুমতাজকে ধরবার জন্যই তোমার বাবাকে আটক করা হয়েছে। একথা তুমি বুঝতে পারছ না ?

রাহুল শান্তভাবে বলল—তা পারছি।

কবি বলল—মুমতাজের বাড়ি কোথায় ?

রাহুল উত্তর করল—হাতিনগর !

কবি সঙ্গে সঙ্গে বলল—ঠিক আছে, আমিই মুমতাজের সঙ্গে দেখা করতে পারি !

রাহুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—তুমি কেন এই ঘটনায় জড়াতে যাবে !

ছোট এবং সবেগ জবাব করল কবি—জড়িয়েই তো আছি !

—তার মানে !

আশ্চর্য হয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল রাহুল। কবির মুখের দিকে এক দণ্ড অবাক হয়ে দেখল।

কবি হো হো করে হেসে ফেলল।

তারপর বলল—অবাক হচ্ছ কেন ! তুমি দেখছ ললিতমোহন, আমি দেখছি তারক গাঙ্গুলি। ধরপাকড়ের ব্যাপারে পুলিসকে 'কেস' সাজাতে হবে। ওই নিষিদ্ধ পত্রিকাখানি একটা প্রমাণ। প্রমাণ হয় যে মুমতাজ তোমাদের বাড়ি বাস করেছে। এই প্রমাণাদি মামাই তো পুলিসকে যোগান দিয়েছেন আর ওই ললিতের খাতিরে মামার এত উদ্যোগ। শুধু তাই নয়, আরও কারণ আছে !

—কি ?

—মামার মত উদ্যোগী মানুষের অভাব এ সমাজে হয় না কখনও। তুমি ভেবেছিলে, মামা বুঝি তোমাকে সাহায্য করতে পারেন, তাই না !

খানিকটা থতিয়ে চুপ করে থাকে রাহুল। হাঁটতে শুরু করে। পায়ে পায়ে ওরা বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যায়।

রাহুল বলে—বাবার সঙ্গে তারক গাঙ্গুলির সদ্ভাব আছে। বাবাকে মান্য করেন তিনি। ভেবেছিলাম, ললিতকে বলে তিনি থানাকে বলা করাবেন, বাবাকে যাতে ছেড়ে দেয়।

কবি বলল—সে খুবই দুরাশা রাহুল ! এই 'কেস' এখন আর ললিতেরও হাতে নেই। আমিই মুমতাজের কাছে যাব। তুমি যেও না !

—কেন ?

—মুমতাজ যাতে রক্ষা পায় সেকথাও ভাবছেন তোমার বাবা ! মুমতাজ যাতে আত্মগোপন করে থাকে, তাই উনি চান।

—তুমিও কি তাহলে...বলতে গিয়ে চুপ করে গেল রাহুল।

—বল ! থামলে কেন ? কবি সামান্য শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলে উঠল।

রাহুল কথাটা অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়ে বলল—তুমি তাহলে মুমতাজকে নিশ্চয়ই

চেনো।

—না।

—দ্যাখনি কখনও ?

—না।

—তুমি কেন যাবে তাহলে ?

—যাব। যেতেই হবে আমাকে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, সব কেমন হয়ে গেল ! আমরা এসব কিছুই চাইনি রাহুল, তোমাদের বিপন্ন করতে চাইনি !তোমার বাবা আমারই বাবা, বিশ্বাস কর তাঁর সব অসম্মান তোমারই মত আমাকেও বিঁধেছে ! ললিতরা দেশ রক্ষার নামে মানুষকে মারছে, তার হিংসা কি খুব মহৎ !

—জানি না। রাজনীতির কিচ্ছু বুঝি না কবি ! তবে তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি।

সহসা এবার রাস্তার পাশের প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষচ্ছায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কবি। এই পথটি খুব নির্জন। সদর পথ এটি নয়। ফসল ক্ষেতের ভিতর দিয়ে পথ। এই পথ লালবাগের ছায়াবাণী সিনেমা হলের গায়ে গিয়ে উঠেছে।

কবি রাহুলের দু'টি হাত আঁকড়ে ধরে বলল—বিশ্বাস কর, মামাকে কখনও আমি ক্ষমা করব না। মামা ভেবেছেন, এইভাবে আমি বাঁচব ! তা হয় না। আমার ওপর পুলিসের যেন কোন ধরনের সন্দেহ না হয়, তাই উনি ললিতের লোক সাজলেন। এ গ্লানি বইবার সাধ্য আমার নেই, না এ আমি চাইনি !

বলে মাথা নীচু করল কবি। অনেকক্ষণ রাহুল কবির নত মস্তকের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল। তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় কবির কাঁধে হাত রেখে বলল—এই ঘটনার তোমার কাছে ব্যাখ্যা যাই হোক, তা আমি দেখব না কবি ! অত দুর্বল আমাকে ভেবো না। কিন্তু একটি কথা তোমাকে অবশ্যই বলব ; সত্যি কী বলব তোমাকে ?

একথায় নৈঃশব্দ্যে সচকিত হয়ে কবি রাহুলের চোখের দিকে চাইল। দু'টি চোখ আবেগের চাপে ঈষৎ চিকচিক করে উঠল তার। শরীরটাও সামান্য কেঁপে উঠল। সেই কম্পন টের পাচ্ছিল রাহুল।

রাহুল বলল—শশাঙ্কমোহন সোভান আলিকে বন্দুক চালিয়ে গুলি করে। এ ঘটনা মিথ্যা ছিল না। বাবা কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দেবার সময় বলেন, হ্যাঁ তিনি শশাঙ্কর হাতে বন্দুক দেখেছিলেন। মিথ্যা কি বলেছিলেন তিনি ? কেন বলবেন ! একজন সামান্য চাষী, সামান্য শিক্ষক কেন মিথ্যা বলবেন ! যা দেখেছেন, যেমন দেখেছেন কোর্টে গিয়ে সেই কথা কবুল করা কি অন্যায় ? খাস মনে করে জমির ধান কেটেছিল সোভান আলির দল। সেই জমি ললিতের জবরদখল করা। সে যাই হোক, ধান কাটার মীমাংসা বন্দুকের গুলি দিয়ে যদি সম্ভব মনে কর, তা তুমি করতেই পার। সে কথা বলার জন্য তো বাবা সাক্ষ্য দেননি। তিনি দেখেছিলেন শশাঙ্কমোহন বন্দুক হাতে সোভান আলির লাল রুমাল বাঁধা দলটির দিকে মাঠের ভিতর দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে ! গুলির আওয়াজ শোনা যায় পাঁচ মিনিট বাদে, আরও দু'জনের কাছে বন্দুক ছিল, কার গুলির শব্দ বাবা জানেন না—কারণ তখন তিনি মাঠ ছেড়ে পথে নেমে পড়েছেন সাইকেল চালিয়ে।

এক নাগাড়ে কথা বলে দম নেবার জন্য থেমে পড়ল রাহুল। থেমেই পড়ল। আর কোন কথা বলতে তার বোধহয় উৎসাহ ছিল না। সে তখন অন্য একটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল স্মৃতির ভিতর। তামাম চিৎপুর গ্রামটিকেই চাক্ষুষ করছিল মনে মনে। গ্রাম তখন

মথিত হচ্ছে সেই হত্যাকাণ্ডের নিবিড় অনুশোচনায়, ঘৃণায়।

মৃত রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ সোভান আলির দেহ সাদা চৌধুরীর বাড়ির উঠানে পড়ে আছে। সমস্ত গ্রাম স্রোতের মত ঠেলে এসেছে চৌধুরী বাড়িতে। ফুলভানুর বেদনা-দীর্ণ উচ্চকিত কান্না সাদা চৌধুরী সহ্য করতে পারছেন না।

বারবার বলছেন—এ অন্যায় আমি মুখ বুজে সইব না। আমার কিষেনকে মেরে ফেলেছে শশাঙ্কমোহন। জোতজমার এত অহংকার ! মানুষকে মানুষ মনে কর না ! এই লাশ কী করে আগলাবো আমি ? ফুলভানু যে পাগল হয়ে গেল !

বাবা সেই যে বলতে লাগলেন তিনি মুখ বুজে সহ্য করবেন না, যেহেতু তাবৎ গ্রাম শুনে ফেলল সেই কথা, বাবা সত্যবদ্ধ হয়ে অকাট্য প্রতিজ্ঞাই বুঝি করে ফেললেন সেই এক নির্মম উত্তেজনায়, মুখের ভাষা ছেড়ে অতএব তাঁর চরিত্র আর নড়তে চাইল না।

ললিতমোহন গভীর রাত্রে শায়িত বাবার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। বাবার হাতদুটি জড়িয়ে ধরলেন। চাপা গোপনীয় স্বরে বললেন—চৌধুরী দাদা ! আমার ভাইটিকে বাঁচাতে হবে আপনাকে।

—কী করে বাঁচাব, আমি যে দেখেছি ভাই। তাছাড়া ও জমিও তোমাদের নয়।

—বিন্দি পিসির জমি। আমাদেরই ভাগজোত ভোগ দখলের জিনিস ! পিসি তো বেঁচে নেই। আমরাই অংশী।

—জানি। বিন্দি বাঁজা ছিল। ও তোমার দূর সম্পর্কের পিসি।

—আমরাই চাষাবাস করি।

—সাতকুলে যার কেউ নেই, তার জমি তোমাদের হয় কী করে, বোঝাও ! ও জমি খাস হয়ে গভর্নমেন্টের হিসেবের খাতায় জমা হয়ে গিয়েছে।

—যায়নি। আপনার ভুল ধারণা। তাছাড়া আপনি ভুল দেখেছেন। শশাঙ্ক গুলি ছোঁড়েনি।

বাবা কেমন ক্রুদ্ধ হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। তারপর বললেন—কে ছুঁড়েছে সে কথা তো আমি বলছি না ভাই ললিত !

রাগত গলায় ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করেন—তবে কী বলছেন আপনি !

বাবা বললেন—বলছি, গুলি কে ছুঁড়ল আমি দেখিনি, যা দেখিনি তা কেন বলতে যাব ! আমি বলছি, শশাঙ্কর হাতে বন্দুক ছিল ! সে মাঠের ভিতর তেড়ে ছুটে গিয়েছে বন্দুক উঁচিয়ে।

—না। একথা সত্য নয় !

—তুমি কী করে জানলে সত্য নয় ! তুমি কি সেখানে ছিলে !

—আপনিও ছিলেন না সেখানে, লগড়াজলি নয়, আপনি চকজমার চর হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

—না। ফিরি নাই।

—আপনাকে এ কথা বলতে হবে দারোগার সামনে। আপনি লগড়াজলি হয়ে বাড়ি ফেরেননি, আপনি ঘুর পথে গিয়েছেন। আপনার দুটি হাত ধরে বলছি, শশাঙ্ককে বাঁচান।

—সোভানের পরিবারকে কে বাঁচাবে ললিত ? ফুলভানুর কী হবে ?

—শশাঙ্করও তো বউ-পরিবার আছে !

—আমি যে দেখেছি, সেকথা সবাই জেনে গিয়েছে ললিত ! সোভানের পলিটিকাল পার্টির নেতা তিমির এসেছিল, সোভান যে শহিদ হয়েছে, খুন হয়েছে সে কথা আর

গোপন হয় না। আমি যদি গোপন করতে চাই, সোভানের পার্টি আমাকে ছাড়বে না। তাছাড়া মিথ্যা আমি বলতে পারব না। গ্রাম আমাকে চিরকাল দুষবে। ও আমার সহ্য হবে না।

—আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, তিমিরকে আমি সামলাব, ও আপনার কোন ক্ষতি করবে না। তিমির আমার আত্মীয়।

—সেই আত্মীয়তাকে আমি তবে ঘৃণা করি ললিত! এই হত্যাকাণ্ডে পার্টির পলিটিকাল ইনটারেস্ট আছে, গলায় লাল রুমাল বেঁধে মরেছে সোভান, ওদের দল তোমার আত্মীয়তা দেখতে যাবে কেন!

—দেখবে দাদা! আপনি যদি দেখেন, তিমিরও দেখবে। মানবতা বলে একটা কথা আছে দাদা! আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনাকে কী বোঝাব!

ললিতমোহনের মুখে এরকম একটি ভারি মানবতাবাদী কথা শুনে হেসে ফেললেন সাদা চৌধুরী। সেই হাসিটি মনে পড়ে যায় রাহুলের। নিঃশব্দ হাসি। ঠোঁটে কিঞ্চিত বাঁকা হয়ে ফুটে ওঠা হাসিটি এখন রাহুলেরই ঠোঁটে ভেসে উঠল। কবির কাঁধ থেকে হাতটি নামিয়ে ফেলে সিধে হয়ে দাঁড়াল রাহুল।

ললিতমোহন হঠাৎ বিস্ময়কর আরও গূঢ় কথা পেশ করলেন সাদা চৌধুরীর কাছে সেই রাতে।

—দাদা! সোভান শহিদ হয়েছে, বেশ কথা, তা কে মিথ্যা বলছে বলুন! শশাঙ্ক যদি রক্ষা পায় তাতেই কি ওর শহিদ হওয়া তার পার্টির কাজে লাগবে না ভাবছেন! আপনিও যে জনদরদী সে কথা জানি। কিন্তু আপনি একবার আমার দিকটা ভাবুন, আমারও তো একটা দল আছে।

—আমার কিন্তু কোন দল নেই ললিতমোহন! ভোট হলে তোমার দলকেই ভোট দিই আমরা!

—তাই বলছি, আপনি তো আমারই দলের লোক!

—না! না হে!

বাবার বলা সেই রাতের কণ্ঠস্বর রাহুলের গলায় এই মুহূর্তে খেলে উঠল এক প্রবল আচ্ছন্নতার ভিতর। রাহুল কবির চোখের অতলে চেয়ে থেকে বলল—না হে! তোমাতে আমাতে পার্থক্য অনেক। কবি, তুমি আমাকে আর জড়াতে চেও না! তোমার মামা আমার শত্রুপক্ষ, তুমি কলকাতা ফিরে যাও, এখানে থেকো না। যত থাকবে গ্লানি বাড়বে! বলেই রাহুল বাসস্ট্যান্ডের দিকে না গিয়ে অত্যন্ত দ্রুত পায়ে স্টেশনের দিকে ছুটতে শুরু করল। একেবারে উল্টো দিকে।

কবি ডেকে উঠল—রাহুল! শোন রাহুল! যেও না! শোন!....

রাহুল এবার দৌড়তে শুরু করে। তীব্র বেগে তারপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দেড়টাকার একটি টিকিট কেটে ফেলে, কাউন্টার নির্জন ছিল। ঠিক দু'টো বাজছে রাহুলের ঘড়িতে। লালগোলা প্যাসেঞ্জার যাবে কলকাতা। অতি দূরে তার সিটি শোনা গেল। বহরমপুর কোর্ট স্টেশন পর্যন্ত টিকিট কেটেছে রাহুল। গাড়ি ঢুকছে, তাই ঘণ্টা বেজে উঠল। কবি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টেশনের বাইরের পথের উপর, রিকশা স্ট্যান্ডের কাছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল দেখতে দেখতে।

কোন এক প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকের লেখা বিড়াল আর টুনটুনির গল্প আছে। সেই

গল্পের রঙিন প্রচ্ছদে মোড়ানো মলাট ঢাকা বস্তুটি একটি গুরুতর রাজনৈতিক ইশতেহার, এভাবে কল্পনা করতে পারছিল রাহুল। কারণ সে কবিকে আরও একবার জিজ্ঞাসা করে, টুনটুনির গল্প মানে কী? এ রকম গোপনীয়তা কেন? আর এই গোপনীয়তাকে ভেদ করলেন তারক গাঙ্গুলি, স্রেফ কৌতূহলবশে, শিশুপাঠ্য বস্তুটির ভিতরে তাঁর চোখ চলে যায়।

একজন পোস্টমাস্টার ইচ্ছে করলে গোয়েন্দার কাজ অবলীলায় করতে পারেন। কোন কোন মানুষের শিশুপাঠ্য পুস্তকাদির উপর বিশেষ ঝোঁক থাকে, হাতের নাগালে পেলে রোখ চেপে যায়, না পড়ে থাকতে পারেন না। শিশুসুলভ এই কৌতূহলই তারক গাঙ্গুলিকে গোয়েন্দা বানিয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিটি মোটামুটি নির্দোষ। ভাগ্নের জন্যই তাঁর এই গোয়েন্দাগিরি।

সন্ধ্যার মুখে সদরঘাটে বাস থেকে নেমে একটি মুদির দোকানে রাখা সাইকেল নিয়ে চেপে পড়ে রাহুল। বাজারের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসতে আসতে চোখে পড়ে পোস্ট আপিসের বাড়িটা—নীচের তলায় অফিস, উপরে দোতলায় তারক গাঙ্গুলির বাসা। হঠাৎ রাহুলের তারক গাঙ্গুলিকে খুন করতে ইচ্ছে হয়। এই জিঘাংসার উপলব্ধি তার জীবনে অপূর্ব। তার চোখে পড়ে সবুর খাঁর ডাক্তারখানায় সান্ধ্য আড্ডা চলছে, পাশাপাশি চায়ের কাপ মুখে করে বসে আছে তিমির আর ললিতমোহন—দুই বিপরীতপন্থী নেতা। একজন অন্যের ক্যাডারকে একদা শহিদ করেছে। তাদের চোখে মুখে কী নিষ্পাপ অন্তরঙ্গতা, কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছে ভূমি আন্দোলনের রক্তাক্ত সংঘাত।

সাদা চৌধুরীকে জেলে ভরে দিয়ে ললিত এখন রয়েল বেঙ্গলের মত হালুম হালুম করে কথা বলছেন, যেন তিনি শান্তির পারাবত উড়িয়ে দিয়েছেন—এ কথা ভাবতে গিয়ে রাহুলের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। যে রাজনীতির সে বিন্দুবিসর্গ জানে না, পছন্দও করে না, যে ভূমি আন্দোলনে তাদের পরিবারের কোনও ভূমিকা ছিল না, যে টুনটুনির ইশতেহার তারা চোখেও দেখেনি, সেই সব অচেনা অপরিজ্ঞাত বিষয় কেন তাদের এভাবে জড়িয়ে ধরছে!

টর্চ জ্বেলে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি পৌঁছতে রাহুলের প্রায় আটটা বেজে যায়। সে বাড়িতে না ঢুকে চারা পাকুড়তলার মাচায় সাইকেল হেলান রেখে অন্ধকারে একা চুপচাপ বসে থাকে। এই মাচাও তাদের বাড়িরই অন্তর্গত। সে কী মনে করে চোখে মোটা করে আঁকা সুর্মার মত বাঁকা চাঁদটির দিকে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকে। চাঁদটাকে মনে হয় কাজলবর্ণের, কোন একটা কালো রঙের নদীর মত স্বচ্ছ আর হিম মাখা শান্ত।

কবির কথা মনে পড়ে। সে বলেছে, ললিতমোহনের হিংসা কি মহৎ! কেন নয় কবি, তাই যে ললিতের মানবতা। সোভানকে মেরে ফেলে তাদের বিন্দুমাত্র হৃদয় বিচলিত হয়নি। রাহুল দেখেছে, সোভানের মৃত্যু কি তুচ্ছ ছিল সেদিন! ফুলভানুর কান্না কেবল সাদা চৌধুরীকে পীড়িত করেছে।

তবে কি শিশুর মত সত্য বলার যন্ত্রণা অশেষ? সাদা চৌধুরীর মস্তিষ্ক কি কোনকালেই সুপক্ক হবে না? কোন কোন মানুষের বোধহয় সত্য বলার নেশা থাকে। সত্যও মানুষকে উন্মত্ত করে হয়ত বা। নইলে বাবা কেন অমন করে সাক্ষ্য দিতে কণামাত্র কুণ্ঠিত হন না!

বাড়িতে ঢুকতে রাহুলের ভয় হচ্ছিল। বরং এখানে কাজল নদীর তীরে শুয়ে মোহড়া-বন্দী চাঁদটিকে দেখে দেখে অদ্ভুত পিতাটির নির্বুদ্ধিতার কথা চিন্তা করা অনেক ভাল। চাঁদটি মোহড়ার ঘাটের উপর ঝুলছে। মোহড়ার ঘাটটাই যেন এখন কাজলা নদীর

মত।

এমন একটি আশ্চর্য মন নিয়ে এ সংসারে কী করবে রাহুল! এমন এক রূপালি সোনালি হিরা জহরতের প্রবাল নীলার মনটি সে বাবার কাছে থেকে পেয়েছে। বাবা অসম্ভব রোমান্টিক মানুষ। প্রথম যৌবনে খুব বোহেমিয়ান ছিলেন, বাড়িতে ঝগড়া বিসংবাদ করে গৃহত্যাগী হয়ে মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে প্রথমে পঞ্জাব, পরে কোয়েটা চলে গিয়েছিলেন। তখন ভারতবর্ষ পরাধীন, ইংরাজ আমল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের, বেশ কিছু পরের ঘটনা। যুদ্ধের আতঙ্ক ছিল বাতাসে, আর তাই তখনও মিলিটারিতে নাম লেখানোর একটা হিড়িক চলছিল। শস্তা চাকরি, নাম লেখালেই হল। তাছাড়া তখনকার ম্যাট্রিকুলেশনের একটা দাম ছিল। সিপাহী হতে হলে বুকের একটা আলাদা সাহস দরকার হয়।

বাবার সাহস যেমন ছিল বুকভরা, হৃদয়ও ছিল গানে ভরা, গলায় অজস্র সুর ছটফট করত। শ্রুতিক্ষমতা ছিল এমনই জোরদার যে, যে-কোন গান কানে শুনেই কণ্ঠে হুবহু তুলে নিতে পারতেন। ওস্তাদ ধরে গানও শিখেছিলেন— একদা তাঁর মনেই হয়েছিল গানই হবে তাঁর জীবন। সেই মানুষটিই হঠাৎ মিলিটারিতে নাম লেখালেন, গানবাজনা পড়ে রইল কোথায়!

সেই বাবা বলতেন, বিদেশ-বিভুঁইতে পড়ে আছি, রাত্রে ঘুম হয় না কেবল মায়ের কথা মনে পড়ে। চোখে উত্তম ঘুম আকর্ষণ করার উপায় তোমাকে বাপু বাতলাতে পারি! যত আপদই মাথার উপর থাক, যত সংকটই আসুক, রাত্রে শুয়ে চোখ বুজে একটি ছবি তুমি কল্পনা করবে। তুমি একজন মুসাফির। সাদা চৌধুরী কি আয়েষা বিবির ছেলে তুমি নও। এই সংসারে সবাই তোমার আপনজন, ফের কেউ তোমার আসল নয়, তুমি একা। একা থাকার ধ্যান তুমি করবে ঘুমনোর সময়। একা একটি মরুভূমির উপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রের দিকে চলেছ, দূরে নীলাভ পাহাড়, পাশেই অরণ্য। উপরে আকাশের পর আকাশ। পৃথিবীর চারটি পাঁচটি সুমহান জিনিস হল আকাশ, সমুদ্র, পাহাড় আর অরণ্য। এবং মরুভূমি। আমি প্রত্যেকটিই দেখেছি। মরুভূমি অতিক্রম করা কঠিন। তুমি সেদিকে না গিয়ে সমুদ্রে যাও, বিশাল বিশাল ঢেউ আর কী তোলপাড়, কী গর্জন-ফেনা, সীমাহারা জলরাশি, সূর্যের সোনালি আলোয় আছাড় দিচ্ছে স্বর্ণবিম্ব, ঝিলমিল করছে, ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে যাবে, যেন তুমি সমুদ্রে কান পেতে শুয়ে পড়েছ।

বা অরণ্যের দিকে যাও। কত পাখি গান করছে! কী বিশাল বিশাল গাছ, সবুজ আর লাল। পাতা সবুজ, লাল ফুল। সাদা ফুল, গোলাপী ফুল, কত রঙের ফুল। হলুদ, নীল। কত বিচিত্র প্রজাপতি। কী রকম আলো হয়ে আছে। এই অরণ্য হাতের কাছেই আছে। সমুদ্র দূরে, কিন্তু বন বনানী দূর নয়। স্রেফ একটা আগুন ধরা শিমুল গাছের কথা ভাবলেই ঘুম এসে যায়। টুপটুপ করে খসে পড়ছে ফুলগুলি। আকাশে গলা তুলে দাঁড়ানো শিমুল। ওর ডালে বসে আছে সাদা চিল। সাদা ধবধবে রঙ, যেন টগর ফুলের জামা পরেছে।

গারদখানায় বাবা আজ রাতে কীভাবে ঘুমোবেন এখন? তিনি কোন্‌দিকে যাবেন? সমুদ্রে নাকি অরণ্যে? নাকি তিনি পাহাড়ের স্বপ্ন দেখবেন শুয়ে শুয়ে। নিদ্রা আকর্ষণ করার জন্য তিনি নক্ষত্র-খচিত প্রসন্ন আঁধারে চেয়ে থাকবেন কি? নাকি তাঁকে একলা ঊষর মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে?

'কেউ তোমার আসল নয়, তুমি একা।' বাবার মুখে একথা শুনলে ছেলেবেলায়

রহুলের কান্না পেয়ে যেত, বাবাকে নিষ্ঠুর মনে হত। মনে হত, বাবা তাদের সকলের সঙ্গে তাবৎ সম্বন্ধ অস্বীকার করতে চাইছেন।

যখন রাহুলের একটু একটু বুদ্ধি পড়েছে, 'একা' কথাটির মানে সে নিজের মত করে অনুভব করতে পারে, তখন বাবার মুখে অমন কথা শুনে মায়ের কাছে ছুটে এসে আঁচলের তলায় দাঁড়িয়ে আঁচল মুখে গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠেছে কতদিন। মা আশ্চর্য হয়েছেন, ছেলে কাঁদে কেন ?

—ছেলেকে অমন ভয় দেখান কেন রোজ ?

—কই ভয় দেখাই, আসল কথাটাই তো বলছি গো !

—না। অমন বলবেন না। ছেলের ডর করে। ও কি আর সেয়ানা হয়েছে। আপনার একা একা করা স্বভাব। আপনাকে কে একা করেছে এ সংসারে !

—না। একা কেউ করে না। একা হতে হয় ! একা যে হতে পারে সেই তো অসাধারণ আয়েষা। নবী তুর পাহাড়ে গিয়ে একা হতেন না ? আমি রাহুলকে একা হওয়ার বিদ্যেটা শেখাব।

—না। শেখাবেন না। ওকে বিবাগী করবেন না আপনার মত। কোথায় কোয়েটা, কোথায় করাচি, কোথায় পাঞ্জাব, রাজস্থান, আজমীর ! তারপর খাজা বাবার চিশতিখানা ! আপনি ওকে পথের বার করবেন না, দোহায় আপনার ! এই সব শুনিয়ে আপনার কী লাভ হয় ! আপনি তো আর সেখানে যেতে পারছেন না। আবার সেখানে থাকতেও পারেননি। কেন ফিরে এসেছেন ?

—সে শুধু তোমার জন্যে !

—না। আমার জন্যে কিসের ! মায়ের টানে এসেছিলেন। মা জোড়া খাসি কুরবানি দিয়েছিল আপনার নামে। তখন কিনা ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেল, স্বাধীন হল দেশ। আপনি আর একা থাকতে পারলেন না। সেই বিভুঁয়ে থাকলেই তো হত ! সেখানে মনের মানুষও তো জুটেছিল একটা !

—না। জোটেনি। ওই পাঞ্জাবি মেয়ের ফটোটার কথা বলছ তো, সমিরের কাছে আছে ! আরে বাবা, ওটা তো ছবি ! জোটেনি কিছুই, তাই তো তোমার কাছে আসা চামেলি ! ফিরে এলাম।

—আহা ! আমরা যেন কিছুই বুঝি না ! ছবি তো বটেই ! কে আর মনে রেখেছে আপনাকে ! আপনি ওই মেয়ের সর্বনাশ করে এসেছেন, চৌদ্দ মাস পাঞ্জাবে ছিলেন, কী করেছেন তখন ! ছবির মেয়েটার কোলে একটা বাচ্চা, কার বাচ্চা ?

—ওহো ! পাগলামি কর না চামেলি বিবি ! আমি রাহুলের মনটা যাতে শক্ত হয়, তারই চেষ্টা করছিলাম। ওটা সত্যিই ছবি, ও কিছু নয়।

—তা বললে কী হবে ! কেন এত পাঞ্জাব কোয়েটা করেন, বুঝি না ! ওই পাপের নিদান খুব ভাল নয় চৌধুরীসাব। আপনি ছেলেকে ওই সব বাজে কথা বলবেন না !

—না, বলব না।

—কিছুতেই বলবেন না ! বলেই মা যেন চৌচির হয়ে ফেটে ডুকরে ওঠেন। বাবা কেমন অসহায় মুখ করে প্রবল এক বিষন্নতায় গাঢ় হয়ে মূক হয়ে পড়েন। আর কথা বলতে পারেন না।

দেখা যায় মা তখন বাবার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন, রা কাড়ছেন না অন্তত তিনদিন। বাবা তখন সত্যিই একা হয়ে পড়েন। ঘন ঘন মসজিদে নামাজ পড়তে চলে

যান। মসজিদে রাত্রে শুয়ে থাকেন পর্যন্ত। তারপর একদিন ভোরে হঠাৎ স্বস্তি স্বস্ত্যয়ন হয়। হয় মায়ের কোরান পড়ার সুবাদে।

সাদা চৌধুরী বলেন—এই সুরাটা দেখেছ আয়েষা। রবীন্দ্রনাথ খুব সম্ভব কোরানের এই আয়াত শুনেছিলেন। আমার দিব্য প্রত্যয় হয়।

তারপরই বাবা আউড়ে উঠতেন—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির স্বাদ!' মহানবীর জীবনের উপলব্ধিই এটা। পূর্ববর্তী কোন মহাপুরুষ বা পয়গম্বর এভাবে দেখেননি জীবনকে। ধর ইশা বা বুদ্ধ। এঁরা গৃহী ছিলেন না। ওই যে বললাম, ওই সুরাটা যেন হুবহু কবিতা হয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলমে। কত বড় কবি, কল্পনা করতে পারো!

একথা শুনে মা তখন বাবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রেহেলের উপর কোরান চিত হয়ে খোলা। কাগজের নোকতা দিয়ে হলুদ পাখির মত ঠেলে ঠেলে মা পড়ছিলেন সুরে সুরে। মায়ের মনে হল, বাস্তবিক তাঁর স্বামীটি সাধারণ নয়।

সাদা চৌধুরী বললেন—শেষ তক রাজার ছেলে গৌতম বুদ্ধ সুজাতার হাতে পায়েস খেয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন, বৈরাগ্যে মুক্তি অসম্ভব। একটা জীবন প্রায় খরচ হয়ে গেল একথা বোঝবার জন্য।

মা কোরান সহসা বন্ধ করে কোরানের দেহে পোশাক পরিয়ে তুলে রাখতে রাখতে বললেন—ঠিক আছে, মিলিটারিকে আমি তাহলে আজ পায়েসই খাওয়াব। চাষীর ধানের পায়েস। কী গো!

তারপর বাবা-মায়ের কী হাসি! যেন সাদা ফুল ঝরছে। কিন্তু ওই যে ছবির পঞ্জাবী মেয়েটাই বা কে? ওর কোলে এত টুকুন শিশুই বা কেন? তা ফের সমির মামার কাছে পৌঁছল কী করে? বাবার একাকিত্ব তবে কোথায়? বাবাকে পায়েস খাওয়ানোটা কি আরও কোন বিদীর্ণ পরিভাষা মায়ের? রাহুল জানে না। রাহুল তার বেশি ভাবতেও সাহস পায় না। মিলিটারিকে চাষীর ধানের পায়েস খাওয়ানোয় জীবনের কোন্ বশ্যতা ফুটে ওঠে, এই কি ভালবাসার আতিথ্য মাত্র? মা যে বাবাকে 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলেন, সেই পুরনো সহবত কী আশ্চর্য! আবার কখনও খুব নিভৃতে 'তুমি' বলার গোপন আড়ালে একটা অন্য ঘনিষ্ঠতা দেখা গিয়েছে বিরল মুহূর্তে, তা বোধহয় প্রথাবিরুদ্ধ কিছু একটা হবে, তথায় কান পাততে রাহুলের সংকোচ হয়েছে কতদিন। 'আপনি' শব্দটি দূরত্ববিশেষ। তারই ভিতর মিশে আছে সামুদ্রিক কলহাস, সফেন সুদূরতা আর আছে অরণ্যের দূর নির্জনতা, আছে মরুযাত্রার দিগন্তবিস্তীর্ণ একাকিত্ব, পাহাড়ের গম্ভীর খাড়া দূরত্ব ওই আকাশের দিকে। বাবার মনটি মা বোধহয় কখনও ধরতেই পারেননি।

পায়েস খাওয়ানোর দৃশ্য মনে আছে। তা দেখে জীবনের সবখানি কি বোঝা যায়!

বাবা গারদখানায় একা কী করে রয়েছেন, তাঁর কি কোন কষ্ট হচ্ছে? তাঁর পাহাড়, তাঁর সমুদ্র, মরু, অরণ্যানী কি সঙ্গে রয়েছে? ললিতমোহনের মুখটা কি তাঁকে ঘুমাতে দিচ্ছে না?

একজন মিলিটারিতে চাকরি করা মানুষ কী ভাবে চাষী হয়ে উঠলেন, ভাবলে খুব অবাক বোধ হতে থাকে। গানবাজনা করা এক তরুণ হঠাৎ একদিন জীবনের কী এক মোহে বিয়ে করে বসেন গাঁয়েরই মেয়েকে। বিয়ের ছ'সাত মাস বাদে মিলিটারিতে নাম লেখালেন। বউকে ফেলে রেখে পাড়ি জমালেন সুদূরে। সেখানে তাঁর জীবনে কি

সত্যিই কোন মেয়ের আবির্ভাব হয় ? কী ভাবে ? এসব প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব আজও জানা যায় না। কতকগুলো টুকরো টুকরো দৃশ্যের কথা তিনি বলেন। একটি পাহাড়ের কথা, পাহাড়ি পথে তিনি একলা চলেছেন ঘুরে ঘুরে। একটি সমুদ্রের কথা। মরুপথের কথা। আর বলেন, একা থাকার অভ্যাসের কথা ! একজন মুসাফিরের কথা।

কেউ যেন সেকথা না শোনে। মা ছেলেমেয়েদের একথা শোনাটি পছন্দ করেন না। কিন্তু ওই সব কথার আকর্ষণ রাহুল উপেক্ষা করতে পারে না। বাবার কোলের কাছে বারবার ঘেঁষতে ইচ্ছে করে। বাবা যে আর পাঁচটা গাঁয়ের মানুষদের মত নন, আলাদা, তা বুঝতে রাহুলের কখনও অসুবিধা হয়নি। বাবা তবু চাষী হতে চাইলেন, তা কি সহজ কথা !

এই সব ভাবতে ভাবতে মাচায় শুয়ে কত সময় যে পার হয়ে যায় ! রাত বাড়তে থাকে। এই মাচায় শুয়ে বাবার কথা দুর্বার স্মৃতির প্রহারে প্রহারে মনে পড়তে থাকে।

বাড়ির সকলে উৎকণ্ঠিত হয়, রাহুল এখনও ফিরল না ! চাঁদ ডুবে যায়। কেউ টের পায় না রাহুল মাচায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করেনি। বুলবন রাত এগারোটায় ফিরেই প্রথম প্রশ্নটি করেছে, 'রাহুল ফেরেনি ?'

—না।

বুলবনের চোখমুখে ভয়াবহ ক্লান্তি। অবসাদে, বিষন্নতায় এক অন্য নৈরাশ্যে পুড়ে চলেছে সে। গলায় কথা ফুটতে চাইছে না। কোন রকমে ঠেলে ঠেলে দোতলায় উঠে এসেছে। বলেছে—আমি আর কিছু খাব না রাতে !

—একটু কিছু মুখে দে বাবা ! কোথায় খেয়েছিস কখন ! রাতে উপোস দিতে নেই !

মায়ের কথা যেন শুনতেই পায় না বুলবন। মায়ের বড় খাটের দেওয়াল-ঘেঁষে খাড়া করে সাজানো বালিশ আর চাদরের স্তূপ থেকে পছন্দ মত বালিশ এবং চাদর তুলে নেয় বুলবন। দেওয়ালের কোণে খাড়া করা রঙিন মাদুরখানা টেনে নেয়। মা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন,এসেছিল নাতাশা এবং দোলন ওরফে চন্দ্রিমা। সবাই আশা করছিল, বুলবন কোন আশার কথা বলবে, হাই মাদ্রাসার চাকরির কী হল ! কিন্তু বুলবনের অসম্ভব গাম্ভীর্য, বিষণ্ণতা, চোখমুখের নৈরাশ্যের কালো ছায়া দেখে কারুর মুখেই আর কোন বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

কোন প্রকারে মা শুধু জিজ্ঞাসা করেন— সেক্রেটারিকে সমিরের চিঠি দিয়েছিলি, খোকা !

—হ্যাঁ !

বুলবন নীচের তলায় শোবে। বালিশ, চাদর, মাদুর সঙ্গে করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে— দোলন ! আমার লুঙ্গি গামছা আর একখানা র‍্যাপার ট্যাপার যা হোক কিছু নিয়ে এসো নীচে ! এখানে আলো দেখা তো নাতাশা, ল্যাম্পটা তুলে ধর, আমি নামব। এই বাঁকটায় কেমন আবছা লাগে ! ওরে, আমার কাপড়ের থলেটা দিস তো ! ওতে দরকারি কাগজপত্র আছে ! 'গণমুক্তি' নামের একটা ম্যাগাজিন আছে, একটা হ্যারিকেন দিয়ে যা !

কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রিমা সমস্ত কিছু সঙ্গে করে নীচে নামে। নাতাশা কাপড়ের কাঁধে ঝোলানো পার্টি-ইউনিফর্ম একটি ব্যাগ, সেটি নেয় এবং হ্যারিকেন নিয়ে আসে নীচের তলায়। লম্বা চৌপায়ার উপর লম্বা চৌকির সিঁথানের কাছে হ্যারিকেন রাখে। বিছানা পেতে দিয়েছিল চন্দ্রিমা টানটান করে, সাদা বালিশের কাছে জিনিস-ভর্তি, কাগজপত্র ঠাসা

ব্যাগটা রেখে দেয়।

নাতাশা জানায়—বাবুর এরকম হয়েছে শুনে, আর তোমরা এসেছ শুনে তামাম দিন, রাত ন'টা পর্যন্ত সারা বাড়ি লোকে ভরে গিয়েছিল, এ যায় তো সে আসে ! যত লোকে যত কথা শুধিয়েছে, উত্তর তো পরের কথা, শুধু শোনবার জন্যে একজন মানুষের তেগুণা কান দরকার, অসহ্য ! বউদি তো প্রায় ভয় পেয়ে মরে। গ্রাম সম্পর্কে ওর কোন অভিজ্ঞতা নেই কিনা ! তাছাড়া ওকে দেখে কী বিচিত্র প্রতিক্রিয়া যে হয়েছে, ঠিক কী হবে, বুঝতেই পারা যাচ্ছে না। হাকিম আর খলিল চাচারাও দল বেঁধে এসে বউ দেখে গেল। আর এসেছিল বালুমাটির নিজাম মামা ! সমস্তক্ষণ বকবক করেছে !

বিছানার উপর বসে থ' হয়ে বোনের উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণ শুনে যাচ্ছিল বুলবন।

খুব মৃদু গলায় বলল— তোর বউদি তো খুব মসৃণ ভাগ্য করে আসেনি সংসারে ! কত যে সইতে হবে ওকে !

নাতাশা বলল— কেউ সাহস ক'রে, হয়ত বাবুর সম্মানে বলছিল না বটে, ফের সবাই হয়ত জানেও না, কিন্তু শেষটায় ওই নিজাম মামুই 'মিরাজ' পত্রিকার বিয়ের কথা তুললে। পরম আত্মীয়ের গলায় মধু মাখিয়ে বললে, মিরাজ, কী লিখেছে জানো আয়েষাবুবু ! পড় নাই ! আমার ঠিক বিশ্বেস হয় না। ... মা সঙ্গে সঙ্গে বললে, ও কথা এখন থাক নিজামভাই, আমার অনেক যাতনা এখন ! যাও, পরে এসো তুমি ! রাত হয়েছে !

বুলবন ব্যাগের ভিতর থেকে 'গণমুক্তি' পত্রিকাখানি বার করে বিছানায় মেলে ধরল আলোর সামনে। তারপর বোনের দিকে পড়া থামিয়ে চোখ তুলল একবার। নাতাশার কথার মধ্যেই সে পত্রিকাখানি হাতড়ে বার করে মেলে ধরেছিল চোখের উপর। এখন বিছানায় ফেলেছে।

বোনের দিকে চোখ তুলল। কোন কথা বলল না। আবার পড়ায় মন দিল।

তারপর আপন মনে বলল—রাহুলটা যে কোথায় রইল ! লালবাগ যাওয়ার কিছুতেই সময় করতে পারলাম না। বহরমপুর গিয়ে প্রাণকিশোরদার সঙ্গে কথা বলে বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি জিয়াগঞ্জের লাস্টট্রিপ ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। সাতটার পরে তো আর বাস নেই। পার্টি অফিসেই সাতটা বেজে গিয়েছিল।

এই সব বলার পর পত্রিকার উপর আরও ঝুঁকে পড়ল বুলবন। নাতাশা ঘরের দুয়ারের দিকে সরে গেল। চন্দ্রিমা আরও একটু সরে এল স্বামীর দিকে। তারপর বুলবনের পিঠের উপর আলতো করে হাত রাখল। নাতাশা ঘর ছেড়ে এসে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল।

চন্দ্রিমা বলল—তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে বুলবন ? আমায় বল ! তুমি কোন কথাই বলছ না ! কী হয়েছে ! বলে পিঠের পিছনে গা লাগিয়ে চন্দ্রিমা স্বামীর পিঠে গাল পেতে চুপ করে থাকে। পিঠেরই আড়াল থেকে চোখ তুলে স্বামীর সহসা সহাস্য মুখের একপাশ আলোকিত দেখতে পায়।

বুলবন পড়া থেকে চোখ তুলে বলল—পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি একটা খুব সুন্দর প্রোগ্রাম পাঠিয়েছেন। তোমার ভাল লাগবে শুনলে।

বুলবনের কথায় বড়ই অবাক হয়ে যায় চন্দ্রিমা। সামান্য ক্ষুন্নও হয় মনে মনে।

বলে—চাকরিটা কি হবে না তাহলে ?

—না।

—কেন ?

—পরে বলব। তোমার কিন্তু পার্টির প্রোগ্রামটাই আগে জানতে চাওয়া উচিত ছিল।
—অ। তাই! ঠিক আছে। আমার ভুল হয়েছে! বলে চন্দ্রিমা চুপ করে রইল।
গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে চন্দ্রিমা দেখে স্বামীটি খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে অন্ধকারে চেয়ে রয়েছে।

॥ ৪ ॥

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে পাকুড়তলার মাচায় অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাহুল। বাবা থাকলে এই মাচায় মগরিব নামাজের পর এশা নামাজের আজান না হওয়া পর্যন্ত সান্ধ্য মজলিস গুলজার হয়। রাত আটটা নাগাদ সেই মজলিস আজান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়। বাবা নেই, মাচাও খালি। যদিও প্রায় পথেরই উপর মাচা বাঁধা আছে, মাচার গা-ঘেঁষে পথ, তবু রাত হয়েছে বলে লোক চলাচলও নেই। দু-একটি দূর গাঁয়ের পথিক মাচার পাশ দিয়ে মোহড়াঘাটের দিকে একাকী চলে গেছে, কে শুয়ে আছে আঁধারে, তলব করেনি। সবাই বোধ হয় জেনে গিয়েছে, সাদা চৌধুরী গারদখানায় ফাটক খাটছেন।

চিৎপুর ওরফে মোহড়া গাঁয়ের গা-লাগা গ্রাম ঈশানপুর। ঈশানপুরে কোন ভিখিরি নেই। চোরও নেই। চোর না থাকার কারণ লাটাই তরফদার। লাটাই, নাকি নাটা? মানুষ দু'রকমই ডাকে। ও গাঁয়ে সবাই বেশ সম্পন্ন। ভিখিরি না থাকার দরুন চোরেরও সাহস হয় না। গণ-প্রহারে চোর মেরে ফেলার ঘটনা ঈশানপুরেই ঘটেছিল— বড়লোকদের তেজালো রোখের মুখে পড়ে ও-গাঁয়ে চোর টিকতে পারে না। নাটা তরফদার চোর মারার এক নম্বর লোক, দু'নলা বন্দুক ওঁরই কেবল আছে।

দু'নলা এবং প্রথম একনলা বন্দুক এই দিগরে তাঁরই পিঠে ঝুলতে দেখা গেছে। স্বপ্নের মধ্যে নাটা তরফদারকে দেখতে পাচ্ছিল রাহুল। পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে হেঁটে চলেছেন লম্বা ধাপ ফেলে ফেলে। অত হালকা স্বাস্থ্যের 'বড়লোক' এই মুল্লুকে আর কেউ নেই। ব্যঙ্গ করে কথা বলা ওঁর স্বভাব, বেশির ভাগ মানুষকে তুই-তুকারি করেন, একটু মানী হলে তুমি বলেন, থানার অনেক বাবুকে পর্যন্ত তুমি করে বলতে শোনা গিয়েছে, গাঁয়ের মাস্টারদের 'তুমি' করে বলেন। বাবাকে কিন্তু 'আপনি' বলেন, কেন বলেন সে ভারি অদ্ভুত। অবশ্য 'আপনি' বলার একটি-দুটি কারণ রাহুল সাব্যস্ত করেছে।

সেই যে সেবার হাকিম চাচার দাওয়ায় বসে ডোবার জলে মাছ খেতে আসা একটি চা পাখিকে গুলি করলেন বাবা—ওই তাক দেখে নাটা একেবারে স্তম্ভিত! সেই ঘটনাটাই স্বপ্নে দেখছিল রাহুল।

দশ-বিশখানা গাঁয়ে একদল লোক আছেন নাটারই মত যাঁরা দু'বার, তিনবার, চৌথাবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে সফলকাম হন নাই। তাঁদের রোখ ছিল খুব ; ভারি বহর ছিল পড়াশুনার। বেশির ভাগ দু-চার নম্বর পুরা করতে না পেরে অঙ্কে বা ইংরেজিতে গাব্বু খেয়েছেন। আগেকার কালে 'ব্যাক' ছিল না। ফেল, ফেল! 'কম্পার্টমেন্টাল' পরীক্ষা সে আমলে চালু হয়নি। নাটা সেই দলের একজন। ফলে বাবার ইজ্জত তাঁদের চোখে সমীহের— রাহুল অনুভব করেছে। সেই কারণেও হয়ত নাটার 'আপনি' করা।

যাই হোক, স্বপ্নে নাটা হেঁটে চলেছেন ডোবার ধারে, সরু পথ দিয়ে। একটা ক্ষুদ্র চা পাখি দেখা যায়। সাদা কুচি মাছ ঠোঁটে করে তুলছে। বন্দুক-বওয়া নাটা, লুঙ্গি-পরা, সাদা

পাঞ্জাবি-পরা, জুতো চকচকানো নাটা পিঠে করে বন্দুক বইবেনই, তাই তাঁর জোতদারির অহঙ্কার। মজলিস-আড্ডা, মোকদ্দমা, খেলার মাঠ, বাজার-হাট যেথা যাবেন, পিঠে বন্দুক ঝুলছে, যেন তিনি শিকারে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আসছেন। কিন্তু তাই দেখে কারও কথা বলার সাহস হয় না। অর্থাৎ কোন বাঁকা মন্তব্য চলে না।

এখানেও নাটার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, সবাই ভাবে। উনি শিকার করার তাগ জানেন না। বাড়িতে ডাকাত পড়লে কী হবে কে জানে! অবশ্য, বন্দুক বইছেন, তাই যথেষ্ট।

—ওহে চৌধরী দেখাও একটা খেল্! শুনি তো খুব মেলেটারি ছিলে! লোকে দেখুক একবার!

স্বাভাবিক, বাবা তখনও নাটার মুখে 'তুমি' পদবাচ্য। বাবা যে সত্যিই কোয়েটায় গিয়ে মিলিটারির সার্ভিস করেছেন, সে তো খালি বাবারই মুখে শোনা কথা, কেউ তো দেখেনি! মানুষ হয়ত বিশ্বাসই করে না। কিন্তু এভাবে যে পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে প্রৌঢ় মানুষটি ভাবেননি কখনও। হাত বাড়িয়ে বন্দুক না ধরলে এখন আর মান থাকে না। কিন্তু ওই এতটুকু চা পাখি, অতটা তফাতে বিন্দুবৎ নড়ছে, তার উপর দিয়ে পরীক্ষা হয়ে যাবে, বাবা সত্যিই মিলিটারি কি না! কতকাল বাবার সঙ্গে বন্দুকের সংসর্গ নেই।

তবু বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন। আলগোছে নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসেন নাটা।

—নাও ধরো!

এক হাত বাড়িয়ে বন্দুক ধরলেন বাবা, পায়ের উপর পা যেমন ছিল আয়েসি মুদ্রায়, তাই রইল, বাবা স্থির। ফুঁসে উঠল চকচকে একনলা। পাখিটা চিৎ হয়ে গেল জলের কিনারে। জল থেকে কিনারে উঠেছিল মাত্র।

তারপর বাবা বললেন—আমার ভেতরটা কেমন সিরসির করছে তরফদার সাহেব। আমার তো ছিল ক্লারিকাল জব। তবে ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। দরকার হলে আমাকেও বন্দুক ধরতে হত বই কি!

—আপনি সত্যি বাহাদুর চৌধুরী সাহেব! এতটুকুনই চা, তাই কাত করে দিলেন!

—আপনার মুখ রক্ষা হল। বলে হাসতে লাগলেন বাবা।

গুলির শব্দে রাহুলের ঘুম চমকে উঠল। অদ্ভুত আতঙ্কে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকল হঠাৎ জেগে ওঠা মস্তিষ্ক। একটি ক্ষুদ্র পাখির প্রাণ কেড়ে না নিলে বাবার মিলিটারি-জীবন যেন সার্থক হচ্ছিল না। মানুষের প্রাণও তো এমনই করে যেতে পারে।

এ কথা ভাবতে গিয়ে রাহুল আর কিছুতেই ঘুমাতে পারল না। শরীরটা পর্যন্ত কেমন করতে থাকল। গায়ে যেন ঝিঁঝি ধরেছে। এক ধরনের বোবা অনুভূতি হচ্ছে। বাবা কি সত্যিই আর ফিরতে পারবেন! বাবার চোখের কোলে অমন করে কালি পড়ল কেন! অমন সাহসী একজন মিলিটারির তো ওই রকম মুষড়ে পড়ার কথা নয়! তবে কি বাবা বুঝতে পেরেছেন, বাবা আর ফিরতে পারবেন না?

মাথার আকাশ একটি মহৎ বিস্তার, উচ্চ এবং সীমাহীন। তার নক্ষত্রপুঞ্জ, তার স্তব্ধতা কী অপরিমেয়! তারই কালো গহনতা কী বাঙ্ময়! সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কি সত্যিই আর একবার ঘুমিয়ে পড়া যায়?

ভয়ানক খিদে পেয়েছে রাহুলের। মায়ের দেওয়া বাবার খাবার রয়েছে থলেয়। মায়ের কাছে এ জিনিস কি ফেরত দেওয়া যায়? না, এ খাদ্য অন্ধকারে কোথাও ফেলে দিতে হবে। মাকে বলতে হবে বাবা খেয়েছেন। বাবা যে খেয়েছেন, তাই তাঁর নিরাপদ

অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বাবা আছেন, বাবা ফিরে আসবেন। খাদ্য সরাসরি শরীরে যায়, যেন মানুষের স্পর্শ পর্যন্ত যায় সেই খাদ্যের সঙ্গে। তাই এই বরফি হালুয়া এবং সাদা পাতলা রুটি মায়ের সামনে আর বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

তবু থলে থেকে বরফিগুলি আর রুটিগুলি বার করে ফেলে দিতে গিয়ে পারে না রাহুল। মাচার উপর অন্ধকারে বসে থাকে চুপচাপ। ছুঁড়ে দিতে গিয়ে তার হাত থেমে যায়। এবং কখন যে সেই খাবার অন্ধকারেই তার মুখের কাছে তার ডান হাতখানি ঠেলে তুলে আনে সে খুব স্পষ্ট বুঝতে পারে না। মুখের গ্রাস ফেলে দিতে না পারার সংস্কারবশে কি এরকম হয়? নাকি খিদেয় এমন হয়!

খাবার গলাধঃকরণ করতে করতে গলায় লাগছিল। গলা দিয়ে ঠিক নামতে চাইছিল না। রাহুলের হৃদয় কেমন সিরসির করছিল! বাপের খাবার সে যেন চুরি করে খেয়ে নিচ্ছে! মরুপথযাত্রী তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত মুসাফিরের কাঁধে লাঠির ডগায় ঝোলানো খাবার যেন সে ছিনিয়ে নিয়েছে। ভাবতে গিয়ে রাহুল ভাবাবেগে ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠছিল।

—আসো দু'মুঠি খাই, রাহুল দাদা!

চকিতে কোথা থেকে কদম আলির গলা ভেসে এল। মুখের গ্রাস থেমে গেল মুহূর্তে। রাহুলের মনে হল, ওই চোরটা তাকে বোধ হয় জীবনভর ছাড়বে না। বাপকে জেল-খাটানো বখসিসের টাকার ভাত ঝোলে মাখামাখি, গরাসে গরাসে বিস্ফারিত তৃপ্তি, মুখে একটা অদ্ভুত ভক্ষণ-মোহিত শব্দ উঠছে, অবলীলায় তাকে ডাকছে বারবার। কোন অপরাধবোধ নেই, বড়ই স্বাভাবিক সেই গলা, বড়ই বেহায়া।

—আসো খাই!

—নাহ্!

ভর্তি মুখের ভিতর থেকে ছিটকে আসে রাহুলের চাপা আর্তনাদ! আর সে পারে না। খেতে পারে না আর। এমন সময় তিন-ব্যাটারির টর্চের ছড়ানো তীব্র আলো তার মুখের উপর এসে পড়ে। আলো হঠাৎ নিবে যায়।

—কে? কে গো! ভয়ে রাহুল প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে বোঝে, সে ঠিক চোর নয়, বাপেরই খাবার সে খাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে রাহুল জানতে চায় কে বটে! এভাবে মুখের উপর আলো ফেলছে কেন!

মণি মাচার কাছে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। ভাইকে এভাবে এখানে দেখে সে কিছু আশ্চর্য হয়েছে।

নীচু করে থলে খোলা খাবারের উপর টর্চের আলো ফেলে একদণ্ড কী ভাবে। তারপর অবাক সুরে মণি বলে—এভাবে চোরের মত খাচ্ছ, বাড়ি যাওনি?

—না। ছোট উত্তর।

—খাবি? ছোট করে জিজ্ঞাসা। রাহুল জিজ্ঞাসার ছলে মণিকে খেতে বলে সলজ্জ স্বরে।

আর অদ্ভুত বড়, মণির পক্ষে যা স্বাভাবিক, সে খাবারের মধ্যে কোন দ্বিধা না করে হাত চালিয়ে দেয়। ও জানত, এ জিনিস বাপের জন্য বেঁধে দিয়েছিলেন মা।

—আব্বাকে দিতে পারনি?

—না।

—সোয়াদ হয়েছিল বেশ! বাপু খেতে পেল না!

—তুই সবটুকুনই খেয়ে ফ্যাল মণি!

—তুমি খাবে না বলছ ?
—ঠিক, খিদে নেই রে !
—আচ্ছা !

মাচায় সেঁটে বসে পড়ে মণি। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালে আর বরফি-রুটি তুলে নেয়।
—এত রাত অবদি কোথায় চরে বেড়াচ্ছিলি !
—বাঁশতলি গিয়েছিলাম, বুলবনকে বলো না ! মাকেও না।
—বড়ভাই বলতে পার না, নাম ধরে বলছ কেন ? কেন গিয়েছিলি, বাঁশতলি ?
—মুনিষ দেখতে !
—মা কি যেতে বলেছে !
—না। নিজেই গিয়েছিলাম ! দরকার।
—কিসের দরকার ?
—ধানগুলো পচে যাবে না ! মলন-খুলান ফেলে রেখে বাপ চলে গেল যে !

আর কথা না বলে স্তব্ধ হয়ে রইল রাহুল। বাঁশতলিতে ডোঙা চড়ে যেতে হয়, বিলপথে। সাপখোপের ভয় থাকে। একলা আঁধারে ডোঙা ঠেলে যাওয়া ডাকাবুকো ছাড়া অন্য কেউ পারে ! শরৎ পড়েছে, এখনও জলে ভরা বিল, মাটির পথ পড়তে দেরি আছে। অত দূরে এভাবে মুনিষ দেখতে যাবে কেন মণি ! এ গাঁয়ে কি মুনিষ ছিল না ? মণি বলবে, ওখানে শস্তা সাঁওতাল মুনিষ পাওয়া যায় ! আসলে এসব কথা সবখানি সত্য নয়। মণি গিয়েছিল মণি পালের কাছে ব্যাঞ্জো শিখতে। মণি পাল প্রৌঢ়, কিন্তু নামের মিলের কারণে মিতালি করেছে মণি চৌধুরী। এ বৎসর ক্লাস নাইনে পরীক্ষায় ফেল করেছে ইচ্ছে করেই, পরীক্ষা দেওয়ার ধৈর্যও মণির নেই। ছেলেটা কি পাগল ! ভাইবোনের ভেতরে সবচেয়ে কালো আর চেহারা-ছবিতে একটা ডাকাতে ভাব।

ওর যেন বামুনের সংসারে নমশূদ্রের দশা। ভাইবোনেদের প্রত্যেকেই পড়াশুনায় জবরদস্ত মেধাবী, ওই বেচারি পড়াশোনায় কোন ভক্তি রাখে না—লেখাপড়া ওর অসহ্য। তা ছাড়া ও কালো, চোয়াড়ে। নাতাশা শ্যামাঙ্গী হলেও অত্যধিক সুশ্রী এবং চোখদু'টি বড় বড়, মায়াবী। ফলে মণি নিজে নিজেই নিজের গোত্র আলাদা করেছে। বুলবন এবং রাহুল রীতিমত ফর্সা আর সুন্দর।

ওর ধারণা মা ওকে দেখতে পারেন না। এক বাবা ছাড়া কেউ ওকে পছন্দ করেন না। নূপুর তো সবচেয়ে সুন্দরী, মায়ের পেট-মোছা, নূপুরকে হিংসে করে মণি। ওর ধারণা এমনও হতে পারে যে, ওর কালো হওয়ার পিছনে বাপ মায়ের কোন ধরনের পাপ আছে। বাপ মা নিশ্চয় দায়ী। এসব অদ্ভুত যুক্তি কোথা থেকে জোগাড় করেছে মণিই জানে।

মণি একদিন মাকে অদ্ভুত কথা শুনিয়েছে—আমি কালো হলাম কেন জানো ! আমি যখন তোমার পেটে ছিলাম, তখন তোমার কঠিন ব্যামো হয়, দাদিমা বলে গেছে। সেই তাড়সে একবেলাও কোরান-পাঠ করনি মা, সেই পাপে আমি কালো হয়েছি।

সবাই হো হো করে হেসে ফেলেছে। রাহুল হাসতে গিয়ে থম মেরে গিয়েছে। সে ভেবেছে, এ যে আশ্চর্য মানসিক ব্যাধিবিশেষ, এভাবে যে, কেউ ভাবতে পারে, তা সহজ কল্পনায় আসে না। দাদিমা কি সত্যিই মণিকে অমন করে বলে গিয়েছেন !

—মুনিষ পেয়েছিস ?
—না।

মণি সশব্দে খাচ্ছে, যেন কদম আলিই রাহুলের পাশে বসে খেয়ে চলেছে।

—তোর খিদে পেয়েছিল!

—পাবে না, কখন গিয়েছি! ডোঙা ঠেলেছি আর মিতের আড়-বাঁশিতে ফুঁ দিলে দম খালাস হয়ে যায়!

—বাঁশি বাজাস নাকি!

—বাজাই।

—ব্যাঞ্জো?

—তা-ও শিখি! মিতের ফের তবলার চাঁটিতে মেঘ ডাকে।

—এক হাতে এত কাজ?

—হবে না! ওস্তাদ বলে কথা! পায়ের কাজও কম না!

—নাচও শিখছিস নাকি?

—না। আমার কোমর শক্ত, খুব আঁটো, আমাকে ডিঙ্গু ফিভারে মেরেছে, এ জন্মে নাচগান হবে না—গলাও কর্কশ। আমার নাকি ভিতরে সুর আছে। তুমি বুঝতে পার রাহুলভাই!

আর্তির ধাক্কায় সহসা মণির গলা কেঁপে যায়। অন্ধকারে রাহুল কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে।

—বাপু বলেছে, আমার ভোকাল হবে না, আমার নাকি ইন্সট্রুমেন্টস।

রাহুল মণির স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে যায়। এ বাড়িতে গান-বাজনা বহুকাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে ইতিহাস খুব দুঃখের, সেকথা ভাবতে চাইল না রাহুল। ভাবলে বিষাদে মন ভরে যায়। মণি পাল পঞ্চরসের অধিকারী। তার কাছে কী শিখবে মণি? সঙ্গীতের 'বেস'টাই নড়বড়ে হয়ে যাবে। মণির ভিতরে সুর আছে হয়ত, তাই তাকে খেতে দেবে এমন প্রত্যয় করা যায় না। ওর শৈশবে ডিঙ্গু জ্বর হয়। হাত পা বেঁকে গিয়েছিল, বহু দিন সিধে হয়ে হাঁটতে পারত না। রাহুল সাইকেল ছুটিয়ে গিয়ে মণির জন্য তালুকদার ডাক্তারের ওষুধ এনেছিল সাদা রঙের, মণির হাত পা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না, তবু বেঁচেছে ওই ওষুধের গুণে আর রাহুলের তদ্বিরে। মণি তাই মনে করে, রাহুল তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে নেমে ডুবে যাচ্ছিল মণি—সেই বারও রাহুলই তাকে বাঁচায় রায়-দিঘিতে। মণির ধারণা, রাহুল তার পরিত্রাতা, কিন্তু তাকে ঠিক পছন্দ করে না। তবু রাহুলের কাছে সরলমনা মণি বারংবার ঘেঁষে ঘেঁষে আসে।

তার ভিতরে সুর আছে কি না রাহুল বললেই যেন হয়। বাপের বলার চেয়ে রাহুলের বলা অনেক দামি। কিন্তু এ মুহূর্তে রাহুল সে কথায় না গিয়ে হঠাৎ বলল— মায়ের কাছে বরফির কথা তুলবি না!

—না।

—বাবু খেয়েছে সেই কথা বলতে হবে।

—বাপ হয়ত না খেয়েই আছে।

—চুপ কর! জোরে কথা বলবি না। তুই পাঁচিলের উপর তড়কে উঠে খিড়কির দোর খুলে দিবি এখন। নীচের ভাঁড়ার-ঘরের পাশের ঘরে তুই আমি শুয়ে যাব।

—মা কিন্তু জেগে থাকবে সারারাত। বাবুর কথা শুধোবে বলে জেগে আছে। আচ্ছা, বাপু আমার কথা বলেছে কিছু?

—হ্যাঁ।

—কী বলেছে ?

—পড়াশুনা করতে বলেছে ! আর কী বলবে !

—ওই এক কথা, আমার একদম ভাল্লাগে না ! বলে মণি মাচা থেকে নেমে পড়ল। তারপর টর্চ জ্বেলে হনহন করে বাড়ির দিকে ছুটে যেতে চাইল।

রাহুল বাধা দিয়ে বলল—দাঁড়া ! আমি যাব ! রাগ করছিস কেন, তোর যা ভাল লাগবে তাই করবি।

—আমি একটা অপেরা খুলতে চাই। পঞ্চরস। পারব না ? মণি পাল আমাকে সাহায্য করবে বলেছে ! আমার ওস্তাদ-মিতে মাত্তর সিক্স পাশ, জানো তো ? ওস্তাদ-মিতে আমাকে চাষবাস দেখতে বলেছে, তোমরা তো দেখবে না। আমাকেই দেখতে হবে, অধিকারী হতে হলে জমি-জায়দাদের জোর লাগে, দল পুষতে হয়।

মণি তার স্বপ্নের কথা বলছিল, অথচ মণি বিশ্বাস করছিল, সে যা বলছে, তাই সে করবে। যেন সে মণি চৌধুরীর অপেরার মালিক হয়েছে। আনন্দে তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল। দলের অধিকারী, দলের মাস্টার, দলের মালিক। সে বাঁশি, তবলা, ব্যাঞ্জো সবটাতে হাত লাগাতে পারে। বাঁকা, সোজা, লেজতোলা সব ধরনের বাঁশি তার হাতে খেলে। একটা পুরো দল তার কথায় ওঠে বসে। নর্তক-নর্তকী, নট-নটী সবাই তাকে প্রণাম করে তবে স্টেজে যায়। ভাবতে ভাবতে স্বপ্ন যেন স্বপ্নই থাকে না।

কিন্তু সেই স্বপ্ন এই মধ্যরাতে প্রচণ্ড শব্দে পিষে দিয়ে চলে যায় ললিতমোহনের বুলেট বাইক। কোন সাইলেন্সার নেই মোটর বাইকটার। অনেক দূর থেকে মোটরটার শব্দ কানে আসে। এই শব্দের মধ্যে রয়েছে ললিতের উগ্র খর চরিত্রের অহঙ্কার। রাত্রি অবধি সদর ঘাটের গঞ্জে তৈমুরের মেঠাইয়ের দোকানে বসেছিলেন ললিত, ওই দোকানটি ওঁর রাজনীতির আখড়া। যাবৎ যোগাযোগ সেখান থেকে হয়। দিনের বেলা পোস্ট অফিসের চাকরি, বিকেল চারটার পর মধ্যরাত পর্যন্ত পলিটিক্স।

হিম এক অন্ধকার নেমে এসেছে ভারতবর্ষে। শীতকালে যেমন সাপ মাটির তলে ঘুমিয়ে থাকে, সব রাজনৈতিক দলগুলি সেইভাবে এখন ঘুমন্ত। এই প্রগাঢ় শীতলতার মধ্যে জেগে আছে বরফ-বাড়ির মত একটি রাজনৈতিক ইগলু—তৈমুরের দোকান ওরফে ললিতের পার্টি-অফিস। তাঁরও আসল পার্টি অফিসে তালা ঝোলানো। বাতাসে চাপা আতঙ্ক মিশে গেছে কালো গাড়িটা আসার পর। বুলেট-বাইকের শব্দে রাত্রি যেন হিংসায় আর্তনাদ করছে। ললিত তাঁর আপন মুঠোর মধ্যে ধরে আছেন আদি-হিংস্রতার একটি অদৃশ্য পিণ্ড অথবা কঙ্কাল-মস্তিষ্ক, আর তিনি রাজনীতির নামে নিঃশব্দ জাদুদণ্ড ঘোরাচ্ছেন, থানা এক আলাদিনের দৈত্য, ললিতের ক্ষমতামদমত্ততার সংবাহক।

বাইক পথের উপর দিয়ে চলে যায়। প্রায় গা-ঘেঁষে। চমকে ওঠে রাহুল।

হঠাৎ অসতর্ক মণি চিৎকার করে ওঠে—শালা, হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা ! তোর বাইকের গুষ্টি মারি পোস্ট-মাস্টার !

বাইকের ভটভট শব্দের মধ্যেও রাত্রির নৈঃশব্দ্যের কারণে স্পষ্ট কথাগুলি শুনতে পায় ওরা। মাচার কাছে গিয়ে বাইক থেমে যায়। চারাতলায়। মোহড়া নদীর গা-লাগা পথ আছে ললিতের বাড়ি পৌঁছবার, বাইক সেই দিকেই যাবে। অন্য পথও আছে। রাত্রি হয়েছে বলে শর্টকাটে যাচ্ছে।

বাইকের ব্যাক থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ললিতের বডিগার্ড শরম আলি, লঘু দফাদারের

ছেলে, ভোরবেলা যে কিনা কালী কলাইয়ের বীজ নিয়ে গেছে। রাত্রেই দেখা যায় তার আসল পোশাক। লুঙ্গি নয়। পায়ে ভারী জুতো পরা, পরনে শার্ট প্যান্ট, হায়ার সেকেন্ডারি কম্পার্টমেন্টাল পাস করা গোঁয়ার চোয়াড়ে ছেলেটি। গলায় চাপা হিসহিস করা হিংসাত্মক ভাষা।

—কে রে, ও কথা বলছিস, এদিকে আয়! চোপা সিধে করে দি! বাপ ফাটক খেটে মরছে, তবু সাধ মেটেনি! আয়, এদিকে আয়!

বলে দুই ধাপ এদিকে এগিয়ে আসে শরম। পাগল মণি তাজী পায়ে শরমের দিকে ছুটে ধেয়ে যেতে চেয়েছিল, রাহুল ওকে হাতে ধরে টেনে নিরস্ত করে।

—যাস না। দাঁড়া। কী বেকুবি করিস না! আয়, চলে আয়।

—না।

—আয় বলছি!

মৃদু ধমক দিয়ে ওঠে রাহুল মণিকে। জোরে হাত ধরে টানে।

—ও আমাদের বীজ নিয়েছে ভোরবেলা, নেমকহারাম!

—বিছন মারবার জন্যে নিয়েছি। সাদা চৌধুরীর বীজ মারব দিয়াড়ে, পানির ডাঙালে ছিটে মারব। মুখ করিস না সুপুত্তুর, পাগলা!

পাগলা বললে মণি সত্যিই পাগল হয়ে ওঠে। ক্ষেপে মত্ত হয়, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শরম তার দুর্বল স্থানে আঘাত করল। মণি আর্তনাদ করল তীব্র গলায়—বাপের দুশমন! বাপকে ফাটক খাটিয়ে মারবি! তোকে দেখে নেব! খবিশের ছ্যানা!...

বলতে বলতে অকথ্য শব্দ ছুঁড়তে লাগল মণি। এবার বাধ্য হয়ে রাহুল ছোটভাইয়ের মুখ হাতের তালুর আড়ালে চেপে ধরে। হিড়হিড় করে টেনে আনে বাড়ির দিকে।

—তুই এসব কী করছিস মণি! এমন করে হবে?

রাহুল শান্ত আদুরে গলায় ভাইকে শাসন করতে চায়। মণি ততক্ষণে প্রতিহত হয়ে, যেন সে মরে যেতে পারলে ভাল করত, তা সে পারল না, রাহুল আটকে দিল, এভাবে প্রতিহত হয়ে, বাধা পেয়ে ভিতরে ভিতরে গোঙাতে থাকল। ক্রুদ্ধ রোষ, ক্ষুব্ধ কষা তাকে ভিতরে ভিতরে পিষছিল।

মণি ককিয়ে ওঠে—কীভাবে হবে! বলে দাও, কীভাবে হবে। রাহুল ভাই, তুমি বলে দাও আমাকে।

বাড়ি জেগেই ছিল। সদর খুলে এসে দাঁড়াল বুলবন। বুলবন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নির্বাক চেয়েছিল অন্ধকারে। সবার আগে সে বেরিয়ে এসেছে। দরজার কাছে সবাই এসে পড়ে একে একে। মণিকে বুলবনের বিছানার কাছে টেনে আনা হয়। বিছানার উপর না বসে মণি মেঝেয় জোর করে বসে পড়ে। ঠিক এসময় বুলেট বাইক গর্জে উঠে ছেড়ে চলে যায়। সেই গর্জনে মণির ক্রোধ চোখে দপ্‌দপ্ করে ওঠে। প্রতিটি শব্দের ধাক্কায় তার শরীর বেঁকে যায়। কপাল ঘেমে উঠেছে। তার ঘন ঘন সক্রোধ শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়, ঢোকে। বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়েছে। ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে মণি। তারপর মুঠোবাঁধা হাত কামড়াতে থাকে। মুঠোয় লালা মেখে যায়। দাঁতের দাগ পড়ে। ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে কিশোর মণি। অপ্রতিরোধ্য মূক যন্ত্রণা তাকে দগ্ধাচ্ছে এখন। ওকে নিরস্ত করার ভাষা বা অবলম্বন যেন হারিয়ে বসে আছে সাদা চৌধুরীর সমস্ত পরিবার।

—মেঝেতেই ওকে শুইয়ে দে রাহুল। মা বলে ওঠেন। তারপর মণির কাছে ঝুঁকে

আসেন। —অমন করলে আমরা কী করে বাঁচব ছোটখোকা ! জীবন যে বড় কষ্টের, সহ্য করতে হবে না ! বলে মা মণিকে স্পর্শ করেন। মণি তখন জলডোবা মানুষের মত বাতাসে নাখ মুখ উচিয়ে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। ওর চোখ দু'টি বুঁজে আসতে চাইছে। ফের হঠাৎ চোখ তীব্র আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠে বিস্ফারিত হচ্ছে।

বিমূঢ় চন্দ্রিমা হঠাৎ-ই বুদ্ধি করে বলল—ওর গায়ের জামাটা খুলে দাও নাতাশা, আমি হাওয়া করছি !

চন্দ্রিমা তালপাতার হাওয়া দিতে থাকে মণির কাছে এসে। নাতাশা ওর জামা খুলে দেয়। মণি কিছুক্ষণ কিছু বলে না, চোখ বন্ধ করে থাকে। তারপর সহসা পাখার দিকে হাত ছুঁড়ে মেরে বলে—পাগল ভাবছ, তাই না ?

বলে ঘাড় বাঁকিয়ে চন্দ্রিমার দিকে কটমট করে চায়। ভয়ে চন্দ্রিমার হাতে পাখা থেমে যায়।

—আমার বড়দা একটি গাধা, তাই তোমাকে এনেছে ! একথা বলে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়ের দিকে চায়।

মা বলেন—তোমার ভাবী হয় দোলন ! ওভাবে বলছিস কেন মণি !

—বলব না, ওকে গরুগাড়ি করে কে চিৎপুরে এনেছে ! আমি, আমি, আমি !

বলতে বলতে আবার চুপ করে যায় মণি। এত সত্ত্বেও চন্দ্রিমা মণির আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়। হাওয়া করতে করতে বলে—মাথায় একটু জল দেব তোমার !

—না।

—বেশ। তাহলে হাওয়া করছি, তুমি শুয়ে পড়। তুমি না চাইলে, আমরা এখানে থাকব না, আমরা চলে যাব !

বলে রাহুলের দিকে চন্দ্রিমা ঈষৎ বাঁকা নরম চোখে চাইল চকিতে। এবং আবার বাতাস করতে থাকল। চন্দ্রিমার কণ্ঠে গাঢ় অভিমান লক্ষ্য করল সবাই। বুলবন ঈষৎ অসোয়াস্তির চাপা বেদনায় চৌকির বিছানার প্রান্তে বসে পড়ল নিঃশব্দে।

রাহুল একটু কঠিন গলায় বলল—তুই যা করছিস মণি, তা কিন্তু ভাল নয় ভাই। আমি তোকে দু'দুবার মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনেছি ! কী রে ! তোকে যে বাঁচতে হবে ! নে, শুয়ে পড়। আমি থাকতে ভয় কিসের মণি !

এ কথায় আশ্চর্য শান্ত হয়ে পড়ে মণি। ম্যাজিক হয় বুঝি বা। তার উত্তেজনা ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসে। মণি মেঝেয় শুয়ে যায়। চন্দ্রিমা বালিশ এগিয়ে দেয় দ্রুত হাতে।

বুলবন বলে—ওর গায়ে একখানা চাদর দাও ! এখানেই শুয়ে থাক। যা নাতাশা, তোরা উপরে যা।

রাহুলও রাত্রিতে খেতে চাইছিল না। মা জোর করে খাবার খুলে দিলেন। ও যখন খেতে বসেছে দোতলার বারান্দায় তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে এল বুলবন।

বলল—কাল ভোরে একবার ললিতের সঙ্গে দেখা করে বলবি, ভাইটা পাগল, আপনি কিছু মনে করবেন না। ওটা গোখরো রাহুল !

—জানি। কিন্তু ও-কথা আমি বলতে যেতে পারব না। সাধ হলে, তুমিই যেতে পার। তা ছাড়া, মণি পাগল নয়। শরম পাগল বলেছে, তাহলে সেই কথাই স্বীকার করতে হয়।

—আহা, আমি কি তাই বলছি !

—তাই তো বলছ ! যে মোটেও পাগল নয়, তাকে পাগল বলা রীতিমত অপরাধ !

—আমার ঘাট হয়েছে, কিন্তু ললিতের কাছে যাওয়া দরকার।

—তাই একবার যা না মেজখোকা, বাবুর কথা একবার বল।

আয়েষা বলে উঠলেন বুলবনের কথার সমর্থনে। রাহুলের খাওয়া থমকে পড়ে। হাত মুখ থেমে যায়। চর্বিত খাদ্য গলায় আটকে থাকে। মৃদুভাবে মণিরই ইতিপূর্বের শরীরী প্রতিক্রিয়া তার দেহে যেন সঞ্চারিত হতে চাইছে। সে ঈষৎ কেঁপে ওঠে মনেরই অজান্তে। মা তার কেঁপে ওঠা টের পান।

মা বলেন—বরং তুমিই একবার যাও বুলবন।

কথাকে ঘুরিয়ে বড় ছেলের উপর চাপিয়ে দিতে চান চামেলি। বুলবন চুপ করে থাকে।

তারপর শান্ত গলায় বলে—অনেক ভেবেচিন্তেই রাহুলকে যেতে বলছি মা ! ঠিক আছে। থাক। বলে পায়ে পায়ে বুলবন নীচে নেমে চলে যায়। নীচে এসে দেখে, তখনও চন্দ্রিমা মণির মাথার কাছে বসে ধীরে ধীরে হাওয়া করে চলেছে। দু'টি চোখে চন্দ্রিমার ঘুমের ক্লান্তি যত না তারও চেয়ে বেশি মণির এই আকস্মিক উত্তেজনার চাপ তাব উপরে পড়েছে, ফলে এক অসহায় দিশেহারা অবসাদ একটু একটু গ্রাস করেছে তাকে।

বুলবনের এ সময় কেমন যেন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। কেমন সে চন্দ্রিমার দিকে ক্ষমাপ্রার্থীর মত চাইল। সেই চাহনির স্পর্শে ঈষৎ শক্ত হয়ে গেল চন্দ্রিমার অবসাদগ্রস্ত, ঘুম জড়ানো দেহ। প্রবল বুদ্ধিমতী চন্দ্রিমা একবার বুলবনের বুকের উপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চালনা করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেই ধারালো দৃষ্টির ঠিক কি মানে, অথবা চন্দ্রিমা মাঝে মাঝে ওরকম কেন করে, তার দৃষ্টির কোমলতা হঠাৎ কেমন শক্ত হয়ে যায় কেন, বুলবন বলতে পারে না। দোলন কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে ? মণির এই আচরণের জন্য লজ্জাও বোধ করছিল বুলবন। অসম্ভব এক জড়তা তাকে জড়িয়ে ধরছিল ক্রমশ। যদিও তার রাজনৈতিক বুদ্ধি কম নয়, তবু সে মনে মনে বেশ অসহায় হয়ে পড়ে।

এক অসহায় যখন তারও চেয়ে অধিক অসহায়কে দেখে, তখন এক আশ্চর্য মায়া ঘটনার মধ্যে খেলা করতে থাকে। সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতির সামনে পড়েছে চন্দ্রিমা, এমনিতেই কলকাতা ছেড়ে এসে নিজেকে ছিন্নমূল মনে হচ্ছে, তীব্র কষ্ট হচ্ছে বুকের ভিতর। মনে হচ্ছে, সে পারবে না। অকারণ, বারবার অকারণ দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। গ্রামের রাত্রির অন্ধকার দেখে সে যেমন রোমাঞ্চ অনুভব করছিল, তেমনই ভয় পাচ্ছিল। এ পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল আদিম আঁধারে পড়ে আছে। চিৎপুর গ্রামখানিও যেন কত একা।

—ও কিছু নয় !

—কী ?

—আমি কি কিছু বলছি ? অন্যমনস্কভাবে এক সেকেন্ড বা দু'দশ সেকেন্ড বা পঞ্চাশ সেকেন্ড আগে 'ও কিছু নয়'—উচ্চারণ করে বুলবন, তারপর কী বলল বুঝতে বা মনে রাখতে পারে না। চন্দ্রিমা ওর অকাট্য অসহায়তা দেখতে পায়, নিজের চেয়ে তাকে, অর্থাৎ বুলবনকে অধিক বিপন্ন অনুভব করতে পারে। তখন মায়া হয়।

উপরে উঠল এবং পাঁচ মিনিটও নয়, নেমে চলে এল বুলবন। কী হল উপরে গিয়ে ? বুলবনকে এখন আরও বিমর্ষ এবং ভারাক্রান্ত দেখায়। বেচারি কী যেন বলতে চাইছে, পারছে না। মণির ঘুমন্ত মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। মণিই সমির মামার

বলদগাড়ি হাঁকিয়ে চাষী-গেরস্তর মত তাদের চিৎপুরে এনেছে। মণিই যেন শ্বশুর মশাই, সেই ফের বড় ভাইকে গাধা বলে তিরস্কার করতে ভয় পায় না। খুব মুখছুট, কিন্তু বড় সরল।

হাওয়া করতে করতে এইভাবে ভাবছিল চন্দ্রিমা। স্বামীর দিকে স্নেহময় চোখে এবার একদণ্ড তাকায়। মায়া ঘন হয় চোখে। শুধাতে ইচ্ছে হয়, অমন কেন করছ !...আশ্বাস দিয়ে বলতে সাধ হয়, অত ভেবো না, আমি তো আছি !

চৌকি ছেড়ে হঠাৎ নীচে নেমে পড়ে বুলবন। ঘুমন্ত ছোট ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে টের পায় মণি একটা গাঢ় শ্বাস টেনে নিল বুকে, তার দেহ অভিমানে ফুলে উঠল। কেমন সংকোচে হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় বুলবন। তারপর ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় চলে আসে। অন্ধকারে চেয়ে থাকে।

চন্দ্রিমা পাখা বন্ধ করে স্বামীর কাছে এসে পিছনে দাঁড়ায়। 'এ কেমন বিহা গো !' কথাটি মনে ভেসে উঠে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস চাপে চন্দ্রিমা।

সেই ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস মোচনের শব্দে স্ত্রীর দিকে সামান্য ঘুরে দাঁড়ায় বুলবন। বুঝতে পারে, কলকাতা শহরের আলোকমালা সজ্জিত সহস্র কোটি শব্দ ফেনাইত দুরন্ত দুর্বার ছন্দোময় জীবন থেকে উপড়ে তুলে আনা এই মানুষটি, দোলন—তাকে এই নিবিড় আঁধারময় অজ গ্রামের নিস্তরঙ্গ মৃত্তিকায় যেন জোর করে পুঁতে দিয়ে তারই বাঁচা-মরা লক্ষ্য করতে হচ্ছে বৃক্ষের মত, বুঝতে পারে বুলবন, এই নারী যেন সেই রকম বৃক্ষবৎ তার কাছে ঘন হয়ে আসতে চায়। মণির ঘটনায় কি বেচারি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে ?

বুলবন শ্লথস্বরে বলে সবচেয়ে ভীত, অসহায় মানুষই বেশি চিৎকার করে, তাই না ! যেই রাহুল বলল, তোকে আমি বাঁচিয়েছি, তোকে বাঁচতে হবে মণি, অমনই ছেলেটা ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

—তুমি আর অত ভেবো না, প্লিজ ! সকাতর অনুনয় চন্দ্রিমার।

উচ্চকিত বুলবন বলে ওঠে—আমরা কিন্তু চিৎকার করতেও পারব না। বলতেও পারব না, আমার কী হচ্ছে !

—আমায় বল ! গাঢ়স্বরে স্বামীকে বলে চন্দ্রিমা।

—না।

—কেন ?

—তোমাকে বলা যায় না। এক্ষেত্রে শুধু একা আমায় লড়ে যেতে হবে। চাকরির একটা খুব দরকার ছিল দোলন। কিন্তু মুখ বুজে চলে আসতে হল আমাকে, কোন জবাব পর্যন্ত করতে পারিনি কমিটিকে।

—কী বলেছে, ওরা তোমাকে ?

চুপ করে রইল বুলবন। বুলবনের বুকের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল চন্দ্রিমা। —বলবে না আমাকে ?

—না।

সুদৃঢ় একটি 'না'-এর পর ছেদ টানতে চাইছিল বুলবন। সে বেশ বুঝতে পারছিল, এভাবে কথা বলা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না।

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেলেও, অ্যাপ্রোভ্যাল কবে হত ঠিক নেই। এখন ডি. আই. অফিস, ডি. পি. আই. কোথাও কোন কাজটাজ হয় না। তবু হা পিত্যেশ করে ছুটে গিয়েছিলাম ! সমির মামার হাতচিঠি কী কাজে লাগল !

—কষ্ট পাবে, অথচ আমায় বলবে না, এই জন্যে বুঝি বিয়ে করেছিলে !

চন্দ্রিমার এ কথায় বুলবন আকস্মিক তেতে ওঠে বেশ। বলে—এ রকম কাঁচা কথা বলবে না দোলন। আমরা স্বামী-স্ত্রী হতে পারি, কিন্তু সেই সম্বন্ধটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—জানি।

—জানো, তবে ভুলে যাও কেন !

—জানি তুমি পার্টির নেতা, জিলা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য। যাবতীয় কথা তুমি প্রাণদাকে বলে এসেছ, তাও জানি। জানি একথাও যে, সব কথা আমায় বলা যায় না। আমি শুনতেও চাই না অতএব। কিন্তু তোমার কষ্ট দেখে জিগ্যেস করেছি। কোড অফ কন্ডাক্টের বাইরে আমি তোমার বউ, জানি না তার জানতে চাওয়ার অধিকার কতটুকু !

—তুমি এই প্রশ্ন পার্টির কাছেই করবে !

—কোন্ প্রশ্ন ?

—এই অধিকারের প্রশ্ন।

—সমস্ত জীবন এই প্রশ্ন করতে হবে বুলবন। আমি কিন্তু রাগ করে একথা বলছি না। যেখানে এসেছি, সেখানে বারবার এই প্রশ্ন উঠবে।

—ওঠাই তো স্বাভাবিক।

—আমি তো অস্বাভাবিক বলছি না। তোমার কষ্ট দেখে ভয় হচ্ছে !

—ভয় !

আচ্ছন্নের মত উচ্চারণ করে বুলবন। অন্ধকার থেকে আলোয় ঘরের মধ্যে ফেরে। অবাক হয়, মাত্র দণ্ডভর আগে মণি চাদরসুদ্দো কোথাও উঠে চলে গিয়েছে। মেঝেয় কাত হয়ে পড়ে থাকা তিন-ব্যাটারির টর্চটা আন্দোলিত হচ্ছে এপাশে ওপাশে, মণির হাতের ধাক্কা লেগেছে ওর গায়ে—টর্চটা ওভাবে ফেলে রেখে চলে গেল কেন ! টর্চটা দাউদাউ করে জ্বলছে। দেওয়ালে তার আলো নড়ে কেঁপে চলেছে, এক সেকেন্ড আগেও মণি তাহলে ঘরের মধ্যে ছিল !

আলোটা নড়ছে ! কোনও আলো এভাবে নড়লে মনে হয় পৃথিবী দুলছে। নক্ষত্র দুলছে। বোধের ভিতর বিপন্নতা কেঁপে ওঠে। আলোর এই নড়ে ওঠা সহ্য করা যায় না। দ্রুত ছুটে এসে টর্চটা হাতে তুলে নিবিয়ে দেয় বুলবন।

—ভয় কিসের ! আমি ভয় করি না। আমি হেরে যেতে পারি না কিছুতে। বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে থাকে বুলবন।

—প্রশ্ন উঠবে বারবার, তবু আমি থামব না।

একথা আপন মনে নিজেকে শোনায় বুলবন। চন্দ্রিমা এখানে নতুন, সে জীবনের ধাক্কায় কীভাবে এখানে এল ! প্রেম তাকে টেনে আনল, নাকি দলের আদর্শ তাকে নগর থেকে গ্রামের নিস্তরঙ্গ আবহে ঠেলেছে, তার কি দমবন্ধ হয়ে আসে ! সে কি সত্যিই ভাল নেই ? সে কি কোনওই দাম্পত্য-সুখ পাবে না আর ?

—টর্চ কী হবে, মণি কোথায় ? পিছন থেকে চন্দ্রিমার প্রশ্ন আসে।

—উপরে যাব !

—কী কাজ তোমার, রাত হয়েছে ! মণি দোতলায় গেছে !

—কী করছে সে ?

—যাই করুক, তুমি আর যেও না !

—তুমি আমার সমাজটাকে কিচ্ছু বোঝ না দোলন, কথা বল না! বলে টর্চ হাতে সিঁড়ির দিকে এগোতে চেষ্টা করে বুলবন।

আশ্চর্য আহত গলায় চন্দ্রিমা বলে ওঠে—তোমার সমাজ! সেকি! কলকাতা আমার, আর এই গ্রাম বুঝি তোমার! তাহলে কি আমি গ্রাম দিয়ে নগর ঘেরার রাজনীতি করতে এসেছি বুলবন। তোমাকে ভালবাসিনি?

—কী বলছ!

—তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তুমি নিজেকে মুসলমান ভাব, তাই না!

—চুপ কর, কী বলছ জান না! আমি কি তাই বলেছি!

—কী বলেছ তবে! সমাজটা কিসের! তোমার আমার আলাদা সমাজ কোথায় পেলে তুমি?

—কথার অনর্থ করবে না, এরকম তর্ক ভাল লাগে না।

—তুমি কথা এড়িয়ে যাচ্ছ! যদি নেতা হও, ঠিক জবাব দেবে!

—আমি তা বলিনি, তুমি যা মানে করতে চাইছ। অক্ষর ধরে কথা বলা কি ঠিক দোলন। এই সমাজেই তো জন্মেছি আমি, একে আমি চিনি! এই গ্রাম, এখানে!

—ঠিক আছে, যাও!

বুলবন স্পষ্ট বুঝতে পারল, চন্দ্রিমা অকারণ একটি ভুল দংশন আপন বুকে তুলে নিয়েছে। মুসলমান এবং সমাজ এই কথা দু'টিকে হাইফেন দিয়ে জুড়ে নিল কেন! দোলন এই পরিবেশকে কিভাবে তবে মানিয়ে নেবে? অমন যে বলল, সে কি ললিতমোহনকে সত্যিই চেনে? হিফাজত, হাকিম, খলিল, নিজাম এবং নাটা তরফদারকে দেখেছে কখনও? ও কি জানে, চাকরির জন্য কেন, ম্যারেজ-সার্টিফিকেট দাখিল করতে বলে স্কুল-কমিটি! তবু এই সমাজকে তো কখনও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেনি বুলবন।

এ কথা ভাবতে ভাবতে দোতলায় আসে সে। বারান্দা নির্জন। থামের কাছে একটি ক্ষীণ হ্যারিকেন। বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে ছায়া পড়ে। ছায়া দেখে নিজেকে ভয় করে বুলবন। হঠাৎ কেমন চমকে ওঠে। বারান্দার এককোণে হুকুম আলিকে জড়ো হয়ে চাদরে গা ঢেকে ঘুমিয়ে রয়েছে দেখতে পায়।

রাহুলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে ক্ষীণস্বরে ডাকে—রাহুল! ঘুমিয়ে পড়েছিস! রাহুল!

সাড়া না পেয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে ফিরে আসছিল বুলবন। গায়ে নিদ্রাহীন চাদরখানি জড়িয়ে দরজা খুলে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল রাহুল।

—কী বলছ! রীতিমত বিরক্তিমাখা স্বরে পিছন থেকে প্রশ্ন করে রাহুল পারভেজ।

বুলবন ঘুরে দাঁড়ায়। এক দুই ধাপ ফিরে আসে রাহুলের কাছাকাছি। অত্যন্ত বিনীত গলায় বলে—একবার কাল নাটা তরফদারের কাছে যাবি, বাবুর জন্যে? যদি উনি ললিতকে বলে...

—একথা ভোরে বললেই তো পারতে! তুমি নিজে যা পার না, তাই বারবার আমাকে করতে বল কেন? কী করতে পারি আমি! তোমার পলিটিকাল ডিগনিটি আছে, কিন্তু আমার তো কিছুই নেই, তুমিই যাও না! বলি কি, তুমি তা পারবে না। অথচ ঘুমাতেও দেবে না আমাদের! তোমার চাকরির কী হল, সেটা শুনি!

—হবে না!

—বিয়ে করেছ, একটা চাকরির যোগাড় করতে না পারলে, ওই রকম বউ নিয়ে আরও

বিপদে পড়বে, বাবুর প্রত্যাশা আর না করাই ভাল।

—আমায় তুই উপদেশ দিচ্ছিস ! বাবু থাকলে কখনই একথা বলতেন না।

—তিনি থাকলে, আমিও কি বলতাম তোমাকে ! অনেক ভেবেছি, অনেক !

—অ। ঠিক আছে !

বলে অত্যন্ত ম্লান-নত মুখে ঘাড় নীচে করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামে বুলবন। মনে হয়, সমস্তই আজ পূর্ণ হল। ছোট ভাই, বধূ, কমরেড সকলে আজ তাকেই দুষতে চায়। কোথাও তার আশ্রয় নেই। প্রাণকিশোর তাকে মুখ বুজে থাকতে বলেছেন। কিন্তু মনে হচ্ছিল, তার সমাজের হয়ে রাহুলই তাকে উৎক্ষিপ্ত করবে শূন্যে।

সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছটফট করতে থাকে রাহুল। এ কী করলাম ! কী বললাম বুলবনকে ! এ কথা আমিই কি উচ্চারণ করেছি মুখে ! কখনও কি বলতে হয় এভাবে ! আমি কি এ বাড়ির অভিভাবক ! আমার মধ্যে এমন কেন হল ?

একটি রাতেই রাহুলের চেহারাটি যেন কালো হয়ে পুড়ে যায়।

ভোরে সূর্যের আলো সদ্যমাত্র পড়লে শার্ট-প্যান্ট পরে, গায়ে একখানা লেডিজ হালকা চাদর জড়িয়ে সাইকেল নিয়ে কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায় রাহুল। বাইরে চারাতলায় এসে দেখতে পায় মলনে দু'হাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে শস্য মেলছে মণি। হুকুম গরু জুড়ছে, সমির মামার হেতের বলদজোড়াও যুতে নিচ্ছে সঙ্গে। ফুলভানু খুলানে ন্যাতা দিয়ে দিচ্ছে দ্রুত হাতে হালকা করে।

রাহুলকে দেখে হাতের কাজ থামিয়ে মণি অবাক হয়। নিঃশব্দে হাসে।

—বউদির চাদর গায়ে দিয়েছ ?

—তাই নাকি ?

খুবই আশ্চর্য হয়ে গা থেকে খুলে ফেলতে যাচ্ছিল রাহুল। ফুলভানুও বাঁ হাতে আঁচল মুখে চেপে হাসছে। নীরবে। হাসির এই সৌন্দর্যেই যেন বধূবরণ হচ্ছে সংসারে। বাপু, তুমি দেখতে পেলে না এই হাসিটুকু, ঊষার সোনালি আলোয় যেন আকাশ ভরে উঠেছে। রাহুল বিস্ময়-ব্যথিত হয় নিজেরই ভাবনায়।

—গায়ে রাখ না চাচা ! হুকুম বলে। ফুলভানুর চোখে নৈঃশব্দ্যের সমর্থন।

সরল মণি হি হি করে হেসে ফেলে। তারপর পরমানন্দে ধান ভাঙতে ভাঙতে ছড়িয়ে দেয়।

রাহুল সাইকেল গড়াতে থাকে ঈশানপুরের দিকে। নাটার বাইরের উঠোনে পৌঁছে চমকে ওঠে। সেই বুলেট-বাইক দাঁড় করানো।

পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসেন নাটা তরফদার, পিছনে পিছনে স্নানশুদ্ধ ললিতমোহন। ড্রাইভ করবেন ললিত। ইস্ত্রিবিহীন ধোয়া পাজামা এবং ভারি শেলেট রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন নাটা। ওরা বুলেটে চেপে বসলেন। বুলেট গর্জে উঠল গম্ভীর, কিন্তু পাতলা হাসি হাসলেন নাটা, মনে হল ব্যঙ্গ করছেন।

—চাচাজি ! অস্ফুট বলে উঠল রাহুল।

নাটা বললেন—বন্দুকের লাইসেন্সের ব্যাপারে লালবাগ যাচ্ছি, পরে কথা হবে তোমার সঙ্গে।

—কী কথা আর বলবেন ওকে ! বলে ললিত বুলেটকে লাফিয়ে নাচিয়ে ফেললেন রাস্তায়। হাত নেড়ে কী যেন বলতে বলতে চলে যান নাটা। রাহুল শুনতে পায় না।

এখন কী করবে ভাবতে পারছিল না রাহুল। নাটার বাড়ির সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বোকার মত ? সূর্যের সকালবেলার সোনালি চাঁপা বর্ণের আলো এসে গায়ের টগর বর্ণ চাদরে পড়েছে। এক ধরনের আশ্চর্য সাদা রঙ চাদরখানির, খুব মোলায়েম। ফোঁপাতোলা গোল গোল পয়সাফুল। পয়সাফুলের রঙ ঈষৎ বেগুনি। বেগুনি আর সাদার চমৎকার বাহারি চাদরখানি দেখে রাহুলের লোভ হয়েছিল। শুভ্রতার প্রতি রাহুলের দুর্বার আকর্ষণ আছে। যে কুমারী মেয়েটি গহনা পরে না, দুল, হার, চুড়ি বা কোন ধরনের গহনা ছোঁয় না ; একদম খালি গলা, খালি কান, খালি নাক, খালি হাত—সম্পূর্ণ নিরাভরণ যাকে বলে, সেই মেয়ে যদি বিধবা বা বিবাহিতা না হয়, বয়েস কাঁচা হয়, স্বাস্থ্য ভাল এবং মোটামুটি সুশ্রী হয় এবং সাদা পোশাক পরে, তাহলে রাহুলের যেন কী হয়ে যায় !

সাদার প্রতি তার এই গোপন দুর্বলতার কথা সে কখনও কারুকে বলতেও পারবে না। সে লাল আর হলুদ রঙ সহ্য করতে পারে না। তবে ফুলফোটা সরষেভুঁইয়ের আল ধরে যেতে যেতে সে ধাঁধিয়ে যায়, মনটা কেমন ম ম করে। লাল রঙের মধ্যে কোন বিস্ময় নেই বলে তার মনে হয়। অথচ শোনা যায়, মানুষের গায়ের রক্ত নাকি সবচেয়ে বিস্ময়কর পদার্থ। মানুষের ইতিহাস নাকি রক্ত-চিহ্নিত এক আশ্চর্য সরণি। বাবাকে যদি গুলি করে মারে ওরা, তাহলেও রক্ত ঝরবে, তা-ও কি কোন ইতিহাসের বিষয় ! পুলিসের হাতে কোন গুপ্তহত্যার রক্তপাতকে কি ইতিহাস গ্রহণ করে ? বাবা তো রাজাবাদশা নন, সামান্য মানুষ !

ভাবতে ভাবতে রাহুলের কেমন দুঃখও হয়, অকারণ হাসিও পায় ! কিন্তু সে আপন মনে হাসতেও পারে না। বারবার সে গায়ের চাদরখানি হাতে নেড়ে দেখতে থাকে। নিমগাছটির তলের মাচাটিতে এগিয়ে এসে বসে পড়ে। হঠাৎ মনে হয়, গভীর রাতে বা ভোররাত্রির দিকে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, পথ কেমন ভেজা ভেজা মনে হল। বাতাস ঠাণ্ডা। চাদরখানির উপর লোভ হওয়ার এটি আরও এক কারণ। চাদর তবে নাতাশার নয়। বউদির। বউদি কি সাদা রঙ পছন্দ করেন ?

বউদির সঙ্গে রাহুল এখনও কোন কথা বলেনি। কথা বলার কীই বা আছে ! কথা না বলা এক ধরনের অসভ্যতা, সে মনে করে এখন— এই মুহূর্তে। তারপর নাটার বাড়ির ছাদের দিকে, পায়রার টঙের দিকে চোখ তোলে। কেউ নিশ্চয় এত ভোরেই পায়রার খাঁচা খুলে দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে। এক ঝাঁক সাদা আর মেঘ বর্ণ পায়রা টঙে এসে চড়ল। উড়ে এল বাড়ির ভিতর থেকে। অবস্থাপন্ন গেরস্ত ধানপানঅলা মানুষদের টঙ থাকে। ঘরে পর্যাপ্ত দানা না থাকলে পায়রা পোষা যায় না।

সাদা পায়রার পাখনায় সূর্যের দূরাভিসারী স্বর্ণালোক এসে ছুঁয়ে যায়। ঝিকিয়ে ওঠে। এত কষ্টের ভিতরেও রাহুলের ভাল লাগে। কষ্টের বেগ যেন কিছুটা হালকা লাগে। একটি সুন্দরী কিশোরী ছাদের উপর আসে সাদা উড়নি ছাদে লুটাতে লুটাতে। গলা বেড়ে পিঠ দিয়ে পিছনে ঝুলছে, ছাদ স্পর্শ করছে, কারণ গলা থেকে দুই প্রান্ত উড়নির দুই অংশ ধরলে, মধ্যভাগে গলা নেই, ভাগ সমান সমান নয়, এক ভাগ অনেক অধিক ঝুলে আছে। ফলে ছাদে লুটোচ্ছে। চমৎকার ছবি।

এক কবুতর দেখ্ হাত মে
পুছা অপর কাঁহা হ্যায়,

উসনে কহা অপর কৈসা !
উড়ই গয়া সপর হ্যায় ॥

কিশোরীটির হাতে সাদা ধবধবে পায়রা একটি। বাবার কথা মনে পড়ে যায় বারবার। বাবার বলা উর্দু পোয়েট্রি ভেতরে গুনগুন্ করছে। এই প্রায় বার্ধক্যেও, প্রায় কেন, বুড়োই বলা যায়, কারণ বাবার আসল বয়েস এজ-সার্টিফিকেটে নেই, বাবাদের আমলে ছেলেরা বেশ তাগড়া হয়ে পাঠশালে হাতেখড়ি নিত, যেমন বারো-তেরোতে ক্লাস ওয়ান বা টু—অতএব বাবা বৃদ্ধই একজন, অতি বৃদ্ধ নন, তবে বুড়ো বটে—তিনি তবু এখনও কি আশ্চর্য রোমান্টিক ! মাকে পর্যন্ত এই কবিতাটি শোনানো চাই। তাও ফের কখন, মা যখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আছেন, দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছেন না, তখনই, আহা শোনই না আয়েষা ! একটা শায়েরি ! গল্পটাও বলছি তোমাকে।

—না।

—আহা ! না বলছ কেন !

—বলব না ? শায়েরি ধুয়ে জল খেলে কি আমার চলবে !

—কবিতা ধুয়ে খাওয়ার জিনিস না চামেলি। দেখার জিনিস। খুয়াব। মানুষের দরকার। ও ছাড়া বাঁচা যায় না।

—খুয়াব দেখেই তো কাটল আপনার। কী করতে পারলেন ?

—পেরেছি ! ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে, আবার কী চাই ! আমার ছেলেমেয়েরা বুদ্ধিমান, আমি ব্যর্থ হয়েছি, ওরা হবে না।

—সব বাপই ও রকম বলে।

—আমি শুধু বলি না। প্রমাণ দিই। বুলবন এম. এ. পাশ করবে। এ দিগরে একটা এম. এ. পাশ দেখাতে পার ? নাতাশা হবে এ মুলুকে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট, চাই কি এম. এ. পড়বে। আর রাহুল...

—থাক হয়েছে। এইজন্যেই মেয়েকে পরের বাড়ি রেখেছেন !

—সমির কি পর ? কী বলছ আয়েষা। তোমার ভাই নয় সে ? সমির এ কথা শুনলে দুঃখ পাবে না ? ঠিক আছে, আমি আর কিছুই তোমাকে শোনাতে চাই না। কিন্তু শুনে রাখ, আমি সত্যিই ব্যর্থ হইনি চামেলি, হবও না কখনও ! সবাই ভাবত, গান কী হবে—তাই না ! বড় গাইয়ে দূরের কথা, আমি মাঝারি গায়কও হইনি, তবু গান আমাকে অনেক দিয়েছে। অনেক। আজকের এই চাষী-জীবন তো আমার গানেরই দান। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে !

মা চুপ করে থাকেন।

—গান আর ধান এই আমার জীবন আয়েষা ! একদম সত্য কথা। এমন ঘটনা কার ভাগ্যে হয়েছে ! খোকা মিঞা এমন এমন বাঘা সম্পত্তি আমাকে জলের দরে দিয়েছিল কি মুখ দেখে, বন্ধু বলে ! কখনও নয়। এই মুখের গান ওকে এমনই মুগ্ধ করেছিল ! সমবয়েসী আমরা, কিন্তু ও আমার গানের ছাত্র। এই জমি-জিরেত হয়েছে গানের দৌলতে ! খোকা বললে, ওস্তাদ, তোমাকে আমি শস্তায় সম্পত্তি করে দিচ্ছি, তুমি ভেবো না ! দাঁড়াবার মত জমি তুমি ভালই পাবে। তোমাকে না দিয়ে কী করব ! এত জমি আমি রাখতে পারব না। তুমি আমাকে গান দাও, আমি তোমাকে ধান দেব। খোকার মুখের হাসি ছিল মিষ্টি, মনও সেই রকম ! রাজার ছেলে কিনা !

রাজা মিঞার ছেলে খোকা মিঞা। রাজা কথাটি শুধু নাম নয়, তা মানুষটির

সম্পন্নতারও পরিচয়। মনেরও পরিচয়। সেই কথা বলে বাবা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। মা চুপ করে থাকেন। মানুষের জীবন কি বিচিত্র হতে পারে বাবাকে না দেখলে বোঝা যায় না। একজন মিলিটারি, একজন শিক্ষক, একজন চাষী এবং গাইয়ে এই 'কম্বিনেশন' কী অদ্ভুত! একেবারে নানাখানা করে জীবনকে দেখা, বিচিত্র জীবন-স্বাদ, বিচিত্রতর উপাখ্যান তাঁর। এমনকি তিনি হোমিওপাথির ডাক্তারি করেন, আগে দর্জির কাজও করেছেন—সিঙ্গার মেশিন আছে একটা। সেই তুলনায় রাহুল তো কতকগুলি 'ডট্‌স্'... বিন্দু, ফোঁটা, চলমান বিন্দুবিসর্গ, কিছুই না, তুচ্ছ! একটি ফোঁটা থেকে আর একটি ফোঁটার দিকে চলেছে।

মা গম্ভীর হয়ে থেকে হাতের ঝাড়ন থামিয়ে মিঠে হেসে ফেলে বললেন—তাহলে শায়েরিটা আপনি শোনাবেনই। ওরে, ডোলে করে জাবনায় পানি দে মণি। ঠিক আছে, বলুন!

এক কবুতর দেখ্ হাত মে...

—কবুতর মানে পায়রা। বাবা বলে উঠলেন।

রাহুল কিশোরীটিকে লক্ষ্য করতে থাকে। এবার নিশ্চয়ই হাতের পায়রা উড়িয়ে দেবে। এই পায়রা রাজাবাদশার স্বপ্নের ওড়াউড়ি, কী দুরন্ত!

বাবা বললেন—যুবরাজ সেলিম তাঁর প্রেয়সী নূরজাহানের হাতে দু'টি পায়রা উপহার দিয়ে বললেন, ধরে রাখ, আমি আসছি। শাহজাদা কোথায় গেলেন কে জানে! কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে দেখেন, প্রেয়সীর হাতে একটি পায়রা আছে, অন্যটি নেই। যুবরাজ খুবই আশ্চর্য হলেন, জানতে চাইলেন, অপরটি কোথায়! এক্ কবুতর দেখ্ হাত মে—একটি পায়রা হাতে দেখে—পুছা, মানে জিজ্ঞাসা করলেন—অপর কাঁহা হ্যায়—অন্যটি কোথায়! এক কবুতর দেখ্ হাত মে/ পুছা অপর কাঁহা হ্যায়? তাই না? তা বুদ্ধিমতী রসিকা সুন্দরী নূরজাহান কী বললেন তখন? উসনে কহা অপর কৈসা! অপর কোথায়? অর্থাৎ অ-পর, পরহীন, পর হল পালক বা পাখনা বা ডানা। অপর কৈসা—পালকহীন তো নয় শাহজাদা! অপর বলছেন কেন! ওর ডানা ছিল, সপর মানে পরযুক্ত, পালক বা ডানাযুক্ত, উড়ই গয়া সপর হ্যায়। ডানা ছিল বলেই না উড়ে গেল!

বাবা হঠাৎ হা হা করে উচ্চস্বরে হেসে আবৃত্তি করলেন—উসনে কহা অপর কৈসা/ উড়ই গয়া সপর হ্যায়।

সেই এক মনোমুগ্ধকর রসজ্ঞের অভিজাত হাসি রাহুলের মনের মধ্যে বাজতে লাগল। নূরজাহানের বাক-চাতুর্য যে কি কবিত্বময়, তাই ভেবে বাবার যেন বিস্ময়ের শেষ নেই। বাবা এমন পর্যন্ত বলেন যে, এ হল উৎকৃষ্ট যমক অলংকার, ভাষালংকারের উদাহরণ। ঘটনাটা যেন একেবারে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছ তুমি।

ছাদের উপর যেন সেই অপর পাখিটি ডানা ঝটপটিয়ে ওঠে, যাকে একেবারে ঝটাপটি বলে, বাতাস মথিত করে, বাজি খেলে খেলে সুশুভ্র পারাবত উড়তে থাকল। কিশোরীটির চোখে-মুখে নূরজাহানের দীপ্তি, জগৎ আলো করা এই এক দৃশ্য। পায়রার পায়ের নখে পালকে আলতা পরিয়ে দিয়েছে মেয়েটি। কে জানে কেন, রাহুলের এখন রঙের এই দুর্ব্যবহার খারাপ লাগে না। রঙ পরানো পায়রাটি তবে ওর। খুব বেশি সাদা, একেবারে মাজাঘষা চকচকে স্নিগ্ধতা আকাশে ঝিলিক দিচ্ছে। এখন পাখি শুধু নয়, বিশাল আকাশটাই বুঝি বিষয় হয়ে গেল রাহুলের কাছে। মহৎ আকাশকে মহত্তম করে ছড়াতে ছড়াতে কত গভীরে চলে যাচ্ছে পাখিটা। আরও আরও গভীরতায়, সোনালি আলোকে,

সুস্নিগ্ধ নীলে। বাবা বলেন, আকাশ একটি মহৎ জিনিস। মেয়েটি কি তা জানে? ওর হৃদয় কি আকাশে ভেসে চলে গেল!

বাবা! তুমি আমাকে মেরেছ! আমি এসব কী ভাবছি! ভেবে রাহুল আকাশে চেয়ে থাকে। মেয়েটি ছাদে ঘুরতে ঘুরতে টঙের কাছে এসে নাড়িয়ে দিতেই এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য তৈরি হয়, যেন কতকগুলি সাদা কালো আলোক-কণিকা আকাশে চমকে ওঠে। রাহুলের হৃদয় মুগ্ধ-বিস্ময়ে সচকিত হয়। ললিতমোহন নিশ্চয় কখনও এই আকাশ দেখেনি। তাহলে বাবাকে সে হাজতে ঢোকাতে পারত না।

ছেলেমানুষের মত ভাববার চেষ্টা করে রাহুল। এবং খুবই অবাক হয়, মেয়েটি বাড়ির উঠোনে ঝুঁকে কার সঙ্গে কী সব বলাবলি করে এদিকে এগিয়ে এসে ডাকে—অ্যাই রাহুল! মামী তোমাকে ডাকছে, শুনে যাও!

কণ্ঠস্বর শোনামাত্র রাহুল অবাক হয়ে ভাবে, এ তো মোহর! এটি মোহরের মামাবাড়ি। কিন্তু চেনাই যে যায় না, খুব যুবতী হয়ে গেছে! মেয়েরা অনেকেই এমন আছে যে, হঠাৎ করে যুবতী হতে শুরু করলে তাদের আর তাড়ার শেষ থাকে না। তাদের দেহে হব হব ভাবটা নেই, তারা হয়েই বসে সহসা। অনেক ফুল আছে যে কিনা ফুটব বলামাত্র ফুটে যায়। মোহরের হয়েছে তাই। গত বছর ফাল্গুনে দেখা আর এই আশ্বিনেই যেন তাক লাগিয়ে বেচারি যুবতী হয়ে পড়েছে।

সদ্য ঘুমভাঙা যুবতী পায়রা ওড়াতে এল ছাদে, চোখে-মুখে ঘুমের আলুনি লেগে আছে, জলে ধুয়েও যার রেশ মোছা যায়নি, সেই চোখ যে কী মারাত্মক হয়! চোখ দু'টি যেন শিশিরে ভিজে রয়েছে এখনও। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে আধো আধো—বাতাস যেন উদাসীন, বইছে কিন্তু কোন তাগিদ নেই। বইতে বইতে থেমে পড়লেও কেউ তাকে কোন দোষ দেবে না। কিন্তু ঠাণ্ডায় কিছু সামান্য কনকনানি আছে, রাহুলের মনে হল। ওর কি তবে জ্বর হয়েছে ঈষৎ? বা বৃষ্টি হয়েছিল রাতে, তাই কি শীত ভাব এতটা জাঁকিয়ে পড়ার মতলব করছে হাওয়ার ধাক্কায় মাঝে মাঝে? এ বছর কি শীতটা কিছু আগাম এসে পড়তে চায়?

গরুর নাদায় জাবনা দিচ্ছে কিষেন, গায়ে ফুলহাতা পাতলা গেঞ্জি, হাতা নাদার জলে ভুঁসিতে ভিজেছে, ওর কি শীত করছে না? কোন পরোয়াই যেন নেই। পথে একটি দু'টি চারটি মাথাল পরা, কানে বিড়ি গোঁজা, হাতে দাউলি, ক্ষেতমজুর চলেছে গায়ে কারও গামছা, কারও বা গেঞ্জি হাফহাতা বা পিঠ ফালা করা ছেঁড়া জামা, দু'টি হাত কারও কারও বুকের কাছে জড়ো করা—হালকা শীতটা বোধহয় বিঁধছে কিছুটা।

মোহর পরে আছে সালোয়ার কামিজ; উড়নি লুটনো। মূলত সাদা রঙ, পাতলা, ফুল-আঁকা হালকা ছোপ তোলা। মেয়েদের শীত কম লাগে। চাদর গায়ে রাহুল চাদরের পক্ষে বিপক্ষে এতদূর ভাবল বসে বসে। ওর কিঞ্চিৎ লজ্জাও করছিল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে লোহার ঢালা ভারি গেট, যা এখন হাট খোলা—ভিতরে ঢুকল। টানা লম্বা বৈঠক-বারান্দায় উঠে পড়ল। টানাবেঞ্চিতে বসতে যাবে, এমন সময় বাড়িতে ঢোকার প্রধান দরজায় মোহরকে দেখা গেল। মোহর ডাকল—এসো!

রান্নাঘরেরও বড় বারান্দা আছে। মোড়ার উপর বসতে দিল মোহর। রান্নাঘরের ভিতরে তরফদার গিন্নি প্লেটে করে সুজি আর কলা এবং দু'টুকরো সেঁকা পাউরুটি সাজিয়ে ট্রে করে চায়ের চিনেমাটির কেতলি আর কাপ সুদ্ধো পাঠিয়ে দেন। মোহর নিয়ে আসে। বিশাল উঠোনকে ঘিরে চৌদিকে অনেকগুলি ঘর—নাটার ছেলেপুলে, বউমা, সন্ততিরা

থাকে। বড় ছেলের কাপড়ের দোকান সদরঘাটের গঞ্জে, মেজছেলের ওষুধের দোকান। ছোট ছেলের আটা, তেলকল আর বড় মুদির দোকান ওই সদরঘাটেই রয়েছে। তিন ভাই-ই দোকানে বেরিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। বউগুলি ব্যস্ত। বাচ্চারা বই খুলে বসে পড়ছে ধীরে ধীরে। গোল বারান্দার নানাদিকে মাদুর পেতে। এ বাড়ির একমাত্র মেয়েটির বাল্যকালেই শাদি হয়ে সে শেঠের নহর চলে গেছে—একদঙ্গল ছেলেপুলে নিয়ে বৎসরে একবার সোৎসাহে ঈশানপুরে মায়ের কাছে আসে।

রাহুল বলল—এত সব কেন ! আমি বাড়িতে অবশ্য চা...মানে খুব অন্ধকার থাকতেই আমাদের চা হয় কিনা ! বাবু বরাবরই চায়ের ভক্ত। জানেন তো !...

তরফদার-গিন্নি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে রাহুলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন—তা কি আর জানিনে বাবা ! মেলেটারি মানুষ, আগে চা তো শুধু তোমাদের বাড়িতেই হত। সায়েবি অভ্যেস ! তা উনিই তো এ বাড়িতে চা ঢুকিয়েছেন ! হররোজ বাইরের বারান্দায় উনি হোমিওপাথির ব্যাগ নিয়ে বসেন, দেখবে একটু বাদেই ছ্যানাগণ্ডা, বউঝিতে সব কেমন ভরে যাবে—অবশ্যি তেনার ফাটক হওয়ার কথা বোধহয় জানাজানি হয়ে গেছে ! ললিত কী যে দুশমনি করল, ভাবতে পারছি নে ! নাও, একটু মুখে দাও !

বাবার প্রতি নাটা তরফদারের মুগ্ধতা এ দিগরে সবার জানা। অত্যন্ত ভদ্রতার সম্বন্ধ। এই চিকিৎসা-ব্যবস্থা নাটারই উদ্যোগ, উনিই বাবাকে এখানে এনে বসিয়েছেন—ফ্রি ওষুধ, ফ্রি ডাক্তারি। ওষুধের দাম বহন করেন তরফদার।

এই গ্রামাঞ্চলে পাস করা কোন বড় ডাক্তার নেই। হাতুড়ে দু-একজন আছে। গঞ্জে আছেন দু'জন ক্যাম্বেল। তালুকদার আর চক কুসিতলার পটল ডাক্তার। ফলে দাতব্য এই ব্যবস্থা তরফদার করেছেন বাবার জন্য। সাদা চৌধুরীও ওষুধ জোগাড় করে আনেন চুনাখালি নিমতলার বিশ্বনাথ ডাক্তারের দাওয়াখানা থেকে। নাটার ছেলেরা কলকাতা যায় ব্যবসা উপলক্ষে, ওষুধ এনে দেয়।

বাবা প্রত্যেক সকালে এ বাড়ির বাইরের বৈঠক-বারান্দায় ব্যাগ খুলে বসেন। বেলা চড়লে বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া করে রঘুনাথপুরের মাইনর পাঠশালে চলে যান।

—তোমার বাবা কত বিদ্যাই না জানেন ! তুমি চেষ্টা কর না কেন ! দাও না ওখানে গিয়ে দু-চার দানা করে, পার না ? তাই বা পারবে কেন ?

—কী যে বলেন ! আমি ওষুধের অ জানি না !

রাহুলের কথায় অসহায় নিঃশব্দ হাসলেন তরফদার গিন্নি। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। সুজি-কলা খাওয়া শেষ হলে, মোহর ট্রের উপর রাখা কাপে চা ঢেলে দিল। রাহুল চায়ে চুমুক দিতেই তরফদার-গিন্নি ব্যথা মোহরকে উদ্দেশ করে বললেন—ওষুধের কালো ব্যাগটা নিয়ে আয় দেখি মোহর !

ব্যথা নামটি শুনতে রাহুলের অবাক লাগে, সুন্দরও মনে হয়। রাহুল আশ্চর্য হয়ে দেখল, ব্যথার কালো চোখে একটা কেমন ব্যথাই বুঝি ছায়া ফেলেছে। আশ্চর্য-স্বরে রাহুল বলল—আমি যে পারব না খালা মা ! সত্যিই আমি কিছু জানি না !

—তাহলে তুমি ব্যাগটা বাড়ি নিয়ে যাও, এখানে থেকে কী হবে ! একটা কাঠের সুন্দর ব্যাগও আছে, তোমাকে দেব ? কত ওষুধ যে আছে ! সবই তোমাকে দিচ্ছি, তুমি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখ। এ বাড়িতে আর চিকিৎসা হবে না, আমি সকলকে বলে দেব !

—কেন খালা-মা ?

চেয়ারের পিছনে দাঁড়ানো চেয়ারের কাঁধে হাত-রাখা ব্যথার ঘোমটার আড়ালে স্পষ্ট

মুক্ত মুখখানির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল রাহুল। হঠাৎ তার গলা কেমন সামান্য কেঁপে গেল। হঠাৎ তার চায়ের স্বাদ বিস্বাদ লাগে জিভে। রাহুল ঘাড় ঘুরিয়ে অসহায় চোখ মেলে মোহরের দিকে। সে সামনে দাঁড়িয়ে ছিল টেবিল-ঘেঁষে। মোহর সামান্য নড়ে উঠে রাহুলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। মাথা নীচু করে। নখ-দর্পণে চোখ রাখে নিজের, নখ দিয়ে নখ খোঁটে অকারণ। ব্যথা চুপ করে থাকেন অধিক মুহূর্ত।

—বলুন ! রাহুল ঈষৎ আর্ত হয়ে পড়ে।

ব্যথা ভাবনায় যেন তলিয়ে গিয়েছিলেন, একটা চাপা শ্বাস বুকে টেনে, সেই শ্বাস মোচন করতে গিয়ে একটুখানি নড়ে উঠলেন, সচেতন দেখালো তাঁকে তখন।

বললেন—কী বলব বাবা ! তরফদার সাহেব আমাকে সব কথা বলেন না। ব্যাগপত্তর ফেরত দিতে বলেছেন, এই মাত্তর !

—অ। আচ্ছা !

—তুমি আমাদের ভুল বুঝো না রাহুল !

—না, খালামা ! এতে ভুল বোঝার কী আছে ! আপনারা ওষুধ দিতেন, বাবা চিকিৎসা করতেন ! গরিবলোকের হয়ত কিছুটা উপকার হত !

—সেই রকমই তো কথা ছিল বাবা !

এবার রাহুল আরও কিছুটা বিস্মিত হয়। ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যথাকে দেখে। তারপর বিস্ময়-বিদ্ধ গলায় বলে—তাহলে ?

—ক'দিন আগে !

বলে ব্যথা কথাটা অন্যভাবে গোছালেন—বলি কি বাবা, ক'দিন আগে কথা কাটাকাটি হল কিনা ! তোমার বাপ হঠাৎ করে রুগীপিছু চার আনা করে ফি ধার্য করলেন, বললেন ওষুধের এটুকু দাম নাকি নেওয়া দরকার। নইলে নাকি গরিবরা মাগনা ওষুধের কদর বুঝবে না ! এতদিন বুঝল, হঠাৎ আজ বুঝবে না কেন, তুমিই বল ! ওষুধ তো আমরা দিই, তোমার বাপ কেন কিনতে যান ! সব ওষুধ কিনে দিতেন সে একটা আলাদা কথা ছিল ! চার আনা থেকে সেটা পরে আট আনা এক টাকা হবে ! দু'দিন পয়সা নেওয়ার পর ফের উনি নাকি বন্ধও করে দিলেন। তারপর কী হল জানি না, মন কষাকষি হল বোধহয় !

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে চকিতে দাঁড়িয়ে উঠল রাহুল। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে গেল রাহুলের মন। মোহরের সামনে তার লজ্জা হচ্ছিল সীমাহীন। সে কোনক্রমে বলল—এসবের আমি কিছুই জানি না খালামা !

ব্যথা বললেন—তা তুমি না জানতেই পার বাবা ! তবে কথা হল, সেবার মধ্যে কোন ধরনের লোভ থাকা কি উচিত ? ওষুধের কদর যদি গরিব নাই বোঝে...

রাহুলের আত্মসম্মান বোধের চরমে গিয়ে কথাটা মুহূর্তে বিঁধে গেল এবার। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল।

রাহুল বলল—ঠিক আছে, দিন। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ব্যথা বললেন—ললিত শুনে বলেছে, দাওয়াখানা বন্ধ করে দিতে। আমি কিন্তু তা চাই না।

রাহুল বলল—আমার বাবাও গরিব মানুষ খালামা ! তাঁর লোভ থাকাই স্বাভাবিক ! কিন্তু তাঁকে এত বড় শাস্তি আপনারা না দিলেই পারতেন ! যাও মোহর, ওষুধের বাক্স দু'টি এনে দাও আমাকে।

বলে রাহুল ত্রস্তপায়ে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে, বৈঠকের বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থেকে বেঞ্চের উপর বসে পড়ে। তার আর শীত করছে না। গা থেকে চাদর নামিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। মৃদু মৃদু ঘাম হয়েছে শরীরে। কপালের চুলের গোড়াও ঘামে কিছুটা ভেজা ভেজা। ব্যথার স্বর এবং চেহারা ভারি, মেদপূর্ণ কিন্তু ঢিলে নয়, মজবুত। তাঁর শ্যামাঙ্গ কিছু উজ্জ্বলও বটে। চোখে সুর্মা পরেন বারো মাস। পান খান দামি জর্দার। গায়ে পান-সুপুরি-জর্দার মিঠে গন্ধ লেগে থাকে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুনো, ভরাট গলায় পুঁথি পড়তে পারেন।

আহা রে দুলদুলি ঘোড়া,
জোর কর থোড়া থোড়া—
যেতে হবে টুঙ্গির শহর...

তারপর—

আশি মণ লোহার গর্জ্জ বগলে দাবিয়া,
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ্দ চলিল হাঁকিয়া ॥

রাহুল দেখল, বৈঠক-বারান্দার সামনে একদঙ্গল নানা বয়েসী স্ত্রী-পুরুষ-শিশু রুগীর ভিড় জমে উঠেছে। মায়েদের কোলে রোগা পিলে মোটা, গলায় কালো ডোর, তাবিজ বাঁধা শিশু চিঁ চিঁ করছে, কাঁদবার চেষ্টা করছে, কিন্তু দেহে বল না থাকায় স্বর ফুটছে না, বাচ্চার মায়ের বয়েস চৌদ্দ পনরর বেশি নয়, নিষ্পাপ কচি মুখ, শত দুঃখেও নিস্তরঙ্গ। এরা জানে না, বাবু কোথায়! বা জানলেও সেকথা বিশ্বাস করতে পারেনি কিংবা বাবু ফিরেছেন কিনা দেখতে এসেছেন।

কচি বউটির স্বামী ডিম-কেনা ব্যাপারি, বউটি আশান্বিত হয়ে রাহুলের সামনে এগিয়ে এল। বলল—রাহুল ভাই, আমার মুন্নিডেরে দু'পুরিয়া ওষুদ দিবেন? বাবু তো নাই! আপনি পারেন না?

—না রোকেয়া, আমি পারি না বোন!

—আমি একখান আদুলি আঁচলে বেঁদে এনিচি, দিব? বাবু অবশ্যি আমার কাচে চাহে নাই। তবো যেতি, আপনি কহেন...

কেমন এক অদ্ভুত অপমান-দীর্ণ বোধ রাহুলকে ধাক্কা মেরে বেঞ্চ থেকে খাড়া করে তোলে, সে দাঁড়িয়ে উঠে পড়ে। এত বিচলিত হয় যে, এক দুঃসহ ছটফটানি তাকে অন্তরে ছোবলাতে থাকে। সে বুঝতে পারে না, বাবার কি সত্যিই তবে লোভ হয়েছে! কিন্তু রোকেয়া তো বলছে, বাবু তার কাছে কিছু 'চাহে নাই।' চাহে নাই, তবু সে এনেছে। এ এক নিদারুণ অসোয়াস্তি, যা রাহুলকে পীড়িত করতে থাকে।

বড়লোকের দানের গৌরবে গরিব কেন ভাগ বসাতে চাইবে? নাটার তুলনায় সাদা চৌধুরী নিতান্তই দীন বইকি! কেন তিনি ঔষুধ কিনতে চেষ্টা করেন? তাঁর অধীত বিদ্যাই কি যথেষ্ট ছিল না? বাবুর নিশ্চয়ই মাত্রাজ্ঞান ঔষধে, কিন্তু আচরণে তা নয়। বাপের উপরই রাগ হচ্ছিল রাহুলের। এ বুঝি ভালই হয়েছে, তিনি জেল খাটছেন, সেই ফাঁকে চিকিৎসার দাতব্য-পাঠ তাঁর চুকে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রাহুল। ব্যথার কথার মধ্যে চাপা বিরক্তি লক্ষ্য করেছে সে। এখানে আর একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে করছে না তার। চলে যাবে, কিন্তু ওষুধের বাক্স সে সঙ্গেই নিয়ে যেতে চায়।

তাছাড়া দারিদ্র-লাঞ্ছিত রোগীদের সামনে কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? ডোর-তাবিজ পানিপড়া শিশুর দিকে চেয়ে থাকা, অসহায় চেয়ে থাকা; দানের অপমানে

আহত রাহুল এখন কী করবে ? আবার ভাবল, বাবা জেলে গিয়ে ভালই হয়েছে, কিন্তু সত্যিই কি ভাল হয়েছে ওই শিশুটির ? বাবা কি ওই শিশুকে সারিয়ে তুলতে পারতেন ?

মেডিসিন বক্স দু'টি বয়ে আনে মোহর। রাহুল পারবে না জেনেও রোগীর মায়ের চোখ মুহূর্তে চকচক করে ওঠে এবং তারপর হঠাৎ নিবে যায়। রোকেয়া ক্রমশ কেমন ম্লান হয়ে গেল।

মোহর সবই অনুভব করছিল। মোহর নাতাশার বয়েসী। এ বছর হায়ার সেকেন্ডারি দেবে নাতাশারই মত, হাসানপুর বিদ্যাপীঠের দু'জনই ছাত্রী। ওদের মধ্যে বন্ধুত্বও আছে।

মোহর বলল—মামী মেডিসিন-বক্স চাকর বলে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। তুমি কেন নিয়ে যাবে !

—তবে নিয়ে এলে কেন ?

বাক্স দু'টি টেবিলে রেখে মোহর ঘাড় নীচু করে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ।

—বাক্স ফেরত দিলেন কেন তুমি বুঝতে পেরেছ ? তুমি এত ভোরে এখানে কেন এসেছিলে ?

মোহর অত্যন্ত মায়াপূর্ণ দুই চোখ রাহুলের চোখে মেলে ধরল এক সেকেন্ড, তারপর সরিয়ে নিল চকিতে।

—তুমি তোমার বাবারই মত সহজ রাহুল ! যাও, চলে যাও !

মোহরের কথার একটুও অর্থ বুঝতে পারে না রাহুল। বাক্স দুটির একটি সে হাতে ঝুলিয়ে নেয়, অন্যটি বগলে খাড়া করে দেবে নিয়ে লাফিয়ে নামে বারান্দা থেকে। অন্যটি কাঠের বাক্স। হাতে ঝুলছে চামড়ার ব্যাগ বা বাক্স। লজ্জায় তার মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে একবার সে ফিরে দাঁড়ায় পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে, তারপর মাথা নীচু করে দ্রুত হাঁটতে থাকে। কেমন একটা শোর রুগীদের গলা থেকে হাহাকারের মত বাতাসে মিশে যাচ্ছিল।

অত্যন্ত জটিল জিনিস যেমন রাহুল সহজে বুঝতে পারে, তেমনি খুব সহজ কথা অনেক সময় চট করে ধরতে পারে না। মোহরের কথার মধ্যে একটা কী যেন লুকনো আছে মনে হল ! বাবা কি তবে আর ফিরতে পারবেন না ? তাই কি ব্যথা অপমানও করলেন, ওষুধের বাক্সও ফেরত দিয়ে দিলেন ? তাই বটে। আমি কেমন জানি না মোহর, তবে বাবা নিশ্চয় সহজ মানুষ ! মনে মনে বারবার নিজেকে বলতে লাগল রাহুল।

এই ঘটনাটি বাড়িতে চেপে রইল সে। বলল, সে ইচ্ছে করেই ওষুধের বাক্স নিয়ে চলে এসেছে। বাপু ফিরলে আবার চিকিৎসা করবেন নাটার বারান্দায়, চাই কি চৌধুরী নিজের বাড়িতেই ওষুধ দিয়ে লোকের উপকার করতে পারেন !

—বাবা ফিরে আসবে বলল, ললিত ?

—না।

—তরফদার বলেছেন ?

—না।

—তাহলে ?

—মা ! বাপু কেন ফিরবে না, বলতে পার ?

এমন অসহিষ্ণুর মত প্রায় আর্তনাদ করে ফেলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে মায়ের কাছে ঘনিষ্ঠ হল রাহুল যে, মা ছিটকে সরে চলে গেলেন।

—আমি তোদের বিশ্বাস করি না ! বলে সহসা মা আজ ভেঙে পড়লেন ওষুধের বাক্সর

দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। আমি জানি, ব্যথা কেন বাক্স ফেরত দিয়েছে!

—তুমি কিচ্ছু জান না মা! বাক্স আমি নিজেই এনেছি! বলতে গিয়ে স্বর ফুটল না রাহুলের। সে পালিয়ে চলে এল নিজের ঘরে। তারপর আবার ছুটে এল মায়ের কাছে। গলা শক্ত করে জোর দিয়ে বলল—বাক্স কেউ ফেরত দেয়নি আমাকে। বারবার বলছি, কেউ আমায় দেয়নি। বাপুকে ফিরে আসতেই হবে মা!

এমন সময় মণি মলন থেকে জল খেতে আসে রান্নাঘরে—সবার কথা সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যায়। ওর সামনে বাবা সম্পর্কে কোন আলোচনা, কোন প্রসঙ্গ এরা কেউ তুলতে চায় না। নিঃশব্দে জল খেয়ে মণি রাহুলের কাছে আসে রাহুলের ঘরে। ঘর্মাক্ত, ঈষৎ শ্রান্ত মণি সাদা সুন্দর দাঁত বিকশিত করে হাসে। এই হাসির কোন কারণ নেই। কাজ করেও তার আনন্দ, এই ধরনের হাসি হেসেও তার আনন্দ।

বিছানার উপর কাগজের সাদা শীট ফেলে নূপুরকে কোলের মধ্যে নিয়ে রাহুল বোনটিকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছিল, মণিকে দেখেই বিছানায় ছুটে এসেছে। তারপর মণি জল খেয়ে ঘরে ঢুকে এসেই হেসে ফেলল। সহাস্য মণির মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে রাহুলও হাসি দিয়ে হাসির জবাব দেয়। হাসির এক প্রগাঢ় শীতল প্রলেপ বুক দিয়ে নামতে থাকে। মণির গায়ের গন্ধ এসে রাহুলের নাকে লাগে, শস্যের গন্ধ, আউসের সপ্রাণ মাদকতা। এই গন্ধই ঘিরে থাকে বাবাকে। মণি যেন বাবারই প্রতিরূপ। রাত্রের সেই কুঁকড়ে যাওয়া, বিক্ষত কিশোরটির কোন চিহ্নই মণির মধ্যে নেই এখন, সে সম্পূর্ণ আলাদা একজন।

রাহুলের চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মণি কী ভাবে, সেই জানে। হঠাৎ ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বলে—এত ভাবছ কিসের! আমি আছি কী কত্তে বল? ভেবো না। রাহুল ভাই!

রাহুলের হৃদয় কেমন সিরসির করে উঠল। মণি যেন হঠাৎ বড়ই মুরুব্বি হয়ে উঠেছে। ওরকম হঠাৎ বয়স্ক হয়ে ওঠা ওর ধাতের জিনিস, তাবৎ সংসারটা যেন তারই, মণির এই সগর্ব ঘোষণা বোধহয় অন্য এক অসহায়তারই নাম, নির্ভয়তা তার ভয়েরই কারণ। তবু এই সাহসের দামটি তো কম নয়!

মণি বেরিয়ে চলে গিয়ে একে একে সকলের সঙ্গে তার সাহসের কথা ঘোষণা করে, নির্ভয় থাকতে বলে। নাতাশাকে বলে। মাকে বারবার বলে। বউদিকে বলে।

—ভেবো না গো বউদি, ভয় ক'রো না। মণি থাকতে কারুকে উপোস দিয়ে মরতে হবে না।

—তাই বুঝি!

—তো, বলছি কি তোমায়! চাষ আবাদ দানাপানি, কী বলে যে তাই, আমার এই হাতের দর্পণ। তোমাকে একটা গেট-ডায়ালগ বলে দিয়ে যাচ্ছি! গুরুর কৃপায়, আমি লক্ষ্মীকে আমার জোতে বাঁধব!

চন্দ্রিমা এই মজার ছেলেটির কথায় ফিক করে হেসে ফেলে। শান্ত আর মিঠে গলায় বলে—তুমি ভাই ভীষণ একটা ছেলে! হাতের দর্পণটা কী?

—গেট-ডায়ালগ! যাত্রায় হয়। সুন্দরী এক রাজার মেয়ে বা ধর তোমার ওই আনারকলি বা জমিদারবাড়ির ছোট বউ।

—হ্যাঁ!

—আয়না হাতে ধরে ডায়ালগ বলবে, একটা সিন। তাই বললাম তোমাকে।

—অ।

শত দুঃখের মধ্যেও চন্দ্রিমা শব্দ করেই হেসে ফেলল। মণি দ্রুত মলনে শস্য-সম্ভারে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ছবি আঁকল রাহুল। নূপুর মহা খুশি।

নূপুর বলল—মণিকে দেখিয়ে আনব।

—যা।

মণি দেখল একটি মুখ। অবিকল সাদা চৌধুরীর আদল। হাতে বন্দুক ধরে সামনে তাক করে আছেন। মণি সবচেয়ে ছোট গরুটার শিঙে, তীক্ষ্ণ শৃঙ্গে অঙ্কিত কাগজটি ফুটো করে ঢুকিয়ে দেয়—শিঙের ডগার ছুঁচলো ধারেই ছিদ্র হয় সেটি। নূপুরের আর আনন্দের সীমা থাকে না। মণির মনে হয়, মলনটি যেন মঞ্চের উপর ঘুরছে। বাপের ছায়া রয়েছে সঙ্গে, আর কোন ভাবনা নেই।

মলনের গরুদল ঘুরছে। মঞ্চ ঘুরছে। সংসার চলেছে আবর্তের গোলাকার পৃথিবীতে, সূর্যে, চন্দ্রে। তিমিরালোকে শস্যকণা ঝিলমিল করছে এবং ঢেকে যাচ্ছে। এভাবে রাহুলের সময় কেটে যায়। গরুর কপালে জেগে থাকেন রঙছায়ার অস্তিত্ব, তার বাপ। দিনান্তে, মধ্যাহ্নে, রোদে, ছায়ায়, উষার আলোকে।

তার সহসা নাটার ছাদের আলোকোজ্জ্বল শ্বেত ও মেঘালি পায়রার কথা মনে হয়। মোহর বলে—তুমি তোমার বাবারই মত সহজ!

এ কথা কিছুতেই হজম করতে পারে না রাহুল। বুকের মধ্যে একটি আহত সিংহ গর্জে ওঠে, আঁচড়াতে থাকে লোহার গরাদ।

একদিন তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে কবি আসে তার কাছে। চারাতলার মাচায় চুপচাপ বসেছিল রাহুল। কবিকে দেখে কী বলবে ভেবে পায় না।

কবি বলে—তুমি এখনও গাঁয়েই আছো?

—হ্যাঁ! কিন্তু তুমি কেন এলে?

—হস্টেলে কবে যাচ্ছ?

—ঠিক নেই।

—মুমতাজের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। আমি বলেছি সব কথা।

রাহুল আর কোন কথা বলতে চায় না। কবিও কথা বলবার পায় না।

—তোমাদের ফ্যামিলি যাতে সাফার না করে আমরা সেকথা ভেবেছি!

—কোন বাজে কথা শুনতে চাই না কবি! যা হওয়ার সে তো হয়েছে! আবার কেন ও-কথা তুলছ!

—ঠিক আছে! কবি খাদের গলায় সকুণ্ঠ উচ্চারণ করে। তারপর বলে—তাহলে এখন যাচ্ছি আমি!

—যাও। আর এসো না!

—আচ্ছা!

কবি চলে যায়। পরে এক রাত্রে মাচায় একই ভাবে একলা বসে ছিল রাহুল। হাতে টর্চ ছিল। রাত তখন দশটা। জোনাকি উড়ছে। মনে হল ডোবার গড়ানের খড়গাদার পিছনের তালগাছটির কাছে কী একটা বস্তু নড়ছে। কী হতে পারে বলে টর্চ না জ্বেলে রাহুল লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যায়।

কাছাকাছি হয়ে মনে হয় মানুষ। টর্চ জ্বালে। অত্যন্ত চমকে ওঠে সে। টর্চের আলোয় কবিকে এইভাবে এখানে দেখে ভয়ানক বিস্মিত হয়। প্রথমে কোন কথা বার

হতে চায় না। রাহুলের গলায় যেন সব ভাষা থমকে পড়েছে। কিছুক্ষণ বাদে কবিই বলে—আলোটা নিবিয়ে দাও রাহুল !

—কেন, তুমি এভাবে এখানে লুকিয়ে আছো ?

—আস্তে। সব বলছি ! প্লিজ রাহুল, প্লিজ ! কথা বলো না। চলো।

—কোথায় ?

—মাচার কাছে গিয়ে সব বলব।

এই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে নাটার লাল ট্রাকটরের আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে এগিয়ে আসে।

॥৬॥

লালবাগ হাজত থেকে মোল্লার চকের জিরাত মাস্টার ছাড়া পেয়েছেন। ললিত তাঁকে ছাড়িয়ে এনেছেন দু'দিন আগে। বালিমাটির নিজাম মামা আয়েষার কাছে সেই খবর বয়ে এনেছেন। শুধু এইটুকু সুসংবাদ বয়ে আনার খাতিরে আয়েষার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মণি খুব ভোরে জলঙ্গীর বাসে করে গোরাবাজার এল চৌধুরী মেসে রাহুলের কাছে।

—তুই ?

— মা পাঠিয়ে দিলে। যেতে হবে তোমাকে। তোমার মেস-খচ্চা বাবদ এই দু'শো টাকা।

একশ' টাকার একখানি, বাকি দশ-পাঁচ, মোট দুশো টাকা— ভাইয়ের দিকে এগিয়ে ধরল মণি। টাকাটা হাতে ধরে ভুরু কুঁচকে মণির দিকে চাইল রাহুল।

—কী হয়েছে ! শঙ্কিত গলায় রাহুল শুধায়।

সংক্ষেপে সব কথা বিবৃত করল মণি। শুনে রাহুল বুঝতে পারল, জিরাত মাস্টার মানুষটি কে। থানায় সেদিন বাবার সঙ্গে একই লক-আপে বন্দী হয়েছিলেন, কদম আলি সুদ্দো। যিনি চিৎকার করে প্রতিবাদ করছিলেন। চেনা চেনা ঠেকেছিল রাহুলের।

—বুবন কী বললে ?

—তোমার কথাই বললে।

—কেন, উনি নিজে চেষ্টা করছেন না কেন ? পার্টি-প্রেসটিজ, তাই না ? আমার তো পড়াশুনা আছে মণি !

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল রাহুল। তারপর লুঙ্গি ছেড়ে জামা প্যান্ট পরতে শুরু করল। জুতো মোজা পরতে পরতে শুধালো— চা খাবি ?

মণি বলল— খাব।

চা এল দ্বিতীয় দফায়। প্রথম দফা আসে সূর্য ওঠার আগেই। ওই চায়ে ঘুম ভাঙানো হয়, প্রাকৃতিক প্রাতঃকৃত্যও সেরে নেয় রাহুল। দ্বিতীয় দফায় খাস্তা বিস্কুটসহ ঘোলা চা আসে। মেসের ব্যবস্থা মোটেও ভাল নয়। ঘরটা দিনের বেলাতেও আবছায়া মোড়ানো, দুপুরে খানিকটা আলো আসে, জানলা খুললে আলোর একটা আভা লাগে পড়ার টেবিলে, পড়াশুনায় বেশ অসুবিধা হয়। অবশ্য 'সীটরেন্ট' ছাড়া এখানে কিছু দিতে হয় না। রাঁধুনির জন্য মাসকাবারি মাইনের ভাগটা যত জন তারা একসঙ্গে আছে, সেই সংখ্যা দিয়ে সমান ভাগ করে হিসেব মত দিতে হয়। মেসের মালিকদের সঙ্গে রাঁধুনির মাইনের

কোনও বোঝাপড়া বা সম্পর্ক নেই। শুধু সম্পর্ক সীট ভাড়ার টাকার। চৌধুরী হস্টেলকে তাই চৌধুরী মেসও বলা হয়। মেস কথাটাই সহি।

মণি খাস্তা বিস্কুট আর চা খেয়ে নেয়, একটি রোগা, হাঁফধরা, শ্বাসকষ্টে কাতর কালো শুকনো চেহারার প্রৌঢ় চা-বিস্কুট দিয়ে যায়। চায়ের দাম দিনান্তে হিসেব করে মেটাতে হয়। দু'শো টাকায় অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হয় রাহুলকে। হাত-খরচা-টিফিনেই তার পঁচাত্তর আশি টাকা বেরিয়ে যায়। রাহুল হিন্দি সিনেমা দেখে না খুব একটা, কিন্তু বাংলা সিনেমা না দেখলেই নয়। টান যত না সিনেমার, অধিক টান গানের— সিনেমার গান। রাহুল ইচ্ছেমত যেকোনও ভাল গান গলায় তুলে নিতে পারে— ওর শ্রুতিক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর। ওর ভীষণ ভাল লাগে মুকেশ-মান্না-লতার হিন্দি গান, ফের হেমন্ত-লতা-শ্যামলের বাংলা গান, প্রতিমার গান। এই মেসেও ওর গলার, সুমিষ্ট ভরাট গলার গানের খুব কদর আছে। মোহর ওর গান শুনে গতবছর কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। পাগলের মত ওর কণ্ঠে গান শুনতে চায় সে। বারবার, আর একটা কর রাহুল... না। ... আর একটা, প্লিজ ! ...না। ...প্লিজ আর একটা...

—রাহুল, তুমি শিখলে পারতে !

—হুম্ !

—কেন, শিখলে পারতে না ?

—দরকার কী, এই তো বেশ গাইছি !

—তবু, শিখলে আরো ভাল হত !

—হত না !

—কেন ?

—এর কোনও উত্তর নেই।

—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ ! তোমার ইচ্ছে করে না ওস্তাদ ধরে শিখতে ?

—না।

—কেন ?

—এরও কোন উত্তর নেই। থাকলেও বলব না তোমাকে।

রাহুল বলল— কোন ফায়দা হবে না, তবু আমাকে যেতে হচ্ছে ! মাকে আমি বোঝাতে পারছি না, বাবাকে ছাড়িয়ে আনার লোক ললিত নয়। জিরাতকে এনেছে তিমিরের কথায়। নিজাম মামা মাকে আশা দিয়েছে মজা করবার জন্য, আমি যাতে ললিতের হাতে পায়ে ধরি। অথচ জানি, ললিত আমাকে পায়ে ঠেলে ফেলে দেবে।

মণি বলল— তরফদার সাহেব এসেছিল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে ! এখন ললিতকে বললেই নাকি হবে। গাঁয়ের লোক নাকি ললিতকে চাপ দিচ্ছে !

—বাজে কথা।

—যাই হোক, তবু তুমি চল। নইলে আমি গিয়ে কথা বলব, আমার সঙ্গে ললিত সেদিন তৈমুরের দোকানে আপনা থেকে ডেকে কথা বলেছে ! বললে, কত মন ধান মাড়লি রে মণি ! আমি মনে মনে বললাম, তাতে তোমার শালা কী ?

ভাইয়ের কথায় রাহুল হেসে ফেলে সাবধানী গলায় বলল— অ্যাই চুপ, এটা মেস !

মণি ঈষৎ লজ্জা পেয়ে পাতলা হাসল। তারপর দুই ভাই রাস্তায় নেমে এল। তালা ঝুলিয়ে দিল দুয়ারে, দোতলায় গিয়ে মালিকের ছেলের হাতে চাবি দিয়ে এল রাহুল।

কবে ফিরবে ? জানতে চাইলে রাহুল বলল, ঠিক নেই। মালিকের ছেলে বাবুল বড়

আশ্চর্য হয়ে বিমর্ষ চোখে রাহুলকে দেখল, কথা বলল না।

গঞ্জে নেমে সিধে তৈমুরের দোকানে উঠল রাহুল। ললিতমোহনকে সেখানে পাওয়া গেল না। পার্টি অফিসে থাকবে না জেনেও, যদি থাকে ভেবে একবার এল। তারপর মোহড়াঘাটের কিনারা ধরে নদীর উপরের বাতার মাচার সাঁকো পার হয়ে ললিতমোহনের বাগান-ঘেরা বিশাল সীমানার বাড়ির বৈঠকখানায় পৌঁছল।

ওকে দেখে শশাঙ্কমোহন তীব্র দৃষ্টিতে হিম চোখে চাইল। বৈঠকে একটা চেয়ারে ধুতিকে লুঙ্গির মত ভাঁজ করে পরা এবং গেঞ্জি গায়ে বসেছিল, মেঝেতে খালি পা ছড়ানো। হঠাৎ লোকটা উঠে দুয়ার ঠেলে বাড়ির ভিতর চলে গেল। মণিও রাহুলের সঙ্গে ছিল। মণি সারাপথ কোনও কথা বলেনি। গোরাবাজারের মেস ছেড়ে এসে পাকা সড়ক ধরে আসতে আসতে রাহুল চোখের ইশারায় ভাইকে দীর্ঘ উচ্চ লাল প্রাচীর দেখিয়ে বলেছিল— ওটা জেলখানা মণি। বাবা আছে ওর ভিতরে!

মণি বহরমপুর এসেছে, তাই খুব। মেস চিনে এসেছে এ ঘটনাও নতুন। তবে তার পক্ষে অচেনা জায়গা চিনে নিতে সময় লাগে না। ওর মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের বাতিক আছে, হঠাৎ করে এখানে ওখানে চলে যেতে পারে। বহরমপুর বোধ হয় দু'একবার এসেও থাকবে। তবে ওর চোখের চাউনি দেখে রাহুল বুঝল, ওই প্রাচীর যে জেলখানা মণি সম্ভবত জানত না অথবা বাবা যে এখানে এসে থাকবেন তা এতই কল্পনাতীত ছিল তার কাছে বলেই সে-হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে।

উচ্চ, দীর্ঘ, বৃহৎ এবং রক্তবর্ণ পরিসীমা দৃষ্টিকে প্রতিহত করছিল শ্বাসকষ্টের মত। মণি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তার চোখ সহসা ছলছল করে উঠল। অশ্রুতে ক্রোধ মিশে গিয়েছে। এই উচ্চতা অসহ্য, এই দৈর্ঘ্য অসহ্য, এই বিশালতা অসহ্য, এই বর্ণ অসহনীয়। রাহুলের সহসা মনে হল, এই সংশোধনাগারে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র শোধিত হচ্ছে। বাপু গো! বলে অন্তরাত্মা তার আর্তনাদ করে উঠল।

মনে পড়ে গেল, কুমারস হস্টেলে কবির সঙ্গে একদল ছেলে অদ্ভুত একটি রাজবংশী ভাষার মিশেলি গণগান গাইছিল বিচিত্র সুরে, চটকা পয়ারের ধুনে উচ্ছলিত সেই গান ; নেবারন পণ্ডিতের বাঁধা :

ওকি ও হো রে এরিন্দিরা, তুই করলু মোক্ ঘরের বাহিরা।
মেলা পুলিশ আসিল বাড়ি
মোর ঝড়ুক নিলে ধরি—
সেদিন হতে মুই ছাড়িনুরে ঘরবাড়ি
ওকি ও হো রে এরিন্দিরা, তুই করলু মোক ঘরের বাহিরা ॥
আশি টাকাত খাসী বেচানু, ভিটাখানা মোর বন্ধক থুইনু
ধার করিনু আরও টাকা দেড় কুড়ি—
কত নাগানু মুহুরি, উকিল, মোক্তার ধরিনু
    দেওয়ানী ধরিনু সরকার
ঘুরিছুং কত না কোট আর কাছারী
টাকাগুলা মোর ফাঁকত গেইল, ঝড়ুর নাকি মিসা হইল
    মিসায় ধরিলে নাকি নাই ছাড়াছাড়ি
ওকি ও হো রে এরিন্দিরা, তুই করলু মোক্ ঘরের বাহিরা ॥

মণি পাকা সড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ক্ষেপে যায়। পথে পড়ে থাকা একটি

আধুলি-ইট হাতে তুলে নেয়। ক্ষিপ্র বেগে প্রাচীরের দিকে তেড়ে ছুটে গিয়ে ইটখানি ছুঁড়ে মারে। আরও কিছু আধুলি সিকি ইট পাকা সড়কের পাশে ড্রেনের, কাছে পড়েছিল, তুলে নিয়ে ছুঁড়তে থাকে।

—অ্যাই খুকা! কী করছস! অরে অরে! বলে একটা পেয়াদা কোথা থেকে বন্দুক পিঠে ঝুলিয়ে তেড়ে আসে। মোহন সিনেমার মোড়ের রিকশাঅলারা দৃশ্যটি দেখছিল হতবাক হয়ে। কিছু পথচারী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে একটি জটলা পাকিয়ে ওঠে, যখন পেয়াদাটি মণিকে নিরস্ত করবার জন্য ছুটে গিয়ে হাত ধরে টেনে আনে হিচড়ে ঠেলে, অসভ্যের মত গলায় একটা ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। মণি মাটিতে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পুলিসটিকে সরোষে রুখে ওঠে।

রাহুল তার ভাইকে সামাল দেবার জন্য হাত ধরে টানে। একটি চায়ের দোকানের কাছে ধরে আনতেই জনতা এবং রিকশাঅলারা ঘিরে দাঁড়ায়, পেয়াদা কী সব বকবক করছে, হাত তুলে তুলে শাসাচ্ছে।

রাহুল বলে— ওকে মারবেন না! ও কোন দোষ করেনি!

—পাথর ছুঁড়ে কিস্তে, কও, ই কি মামুর ঘর পাইছ, দ্যাশে ডিসিপ্লিন নাই, ল অ্যান্ড অর্ডার নাই!

রাহুল ভয়ানক আশ্চর্য হয়। পেয়াদাটাকে তার সুস্থ বুদ্ধির লোক বলে মনে হয় না। এ যেন মণিরও চেয়ে ছেলেমানুষ। 'কি করতে' না বলে পেয়াদা কিস্তে কিস্তে করছে, অন্য সময় হলে হয়ত হাসিই পেত রাহুলের। ঘটনা খুবই তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে ঢুকে একটি দশ বারো বছরের বাচ্চা পকেট থেকে কী যেন মুঠো করে তুলে পুলিসটার চোখে ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে পালিয়ে চলে গিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়। কী ছুঁড়ল ওভাবে?

পেয়াদা পাগলের মত আঁতকে বসে পড়ে দু'চোখে হাত চেপে, কঁকিয়ে ওঠে— অরে! চক্ষুতে মরিচ মারছে রে! গুঁড়া ছুঁইড়্যা দিইছে, অ হ হ! বাচ্চাপোলারাও আইজকাল আমাগো ডরাই না, ডাক্তারের ভিজিট বিশ ট্যাকা হইতে কইম্যা দাঁড়াইল চার ট্যাকা, আর কী অইব ! অ হ হ!

ঘটনাটি এত চকিতে ঘটে যায় যে রাহুল কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক রিকশাঅলা তাকে ভিড় ঠেলে টেনে এনে বলে— ওঠেন! আর দাঁড়াবেন না!

মণিকে নিয়ে রিকশায় চেপে পড়ে রাহুল। বাস স্ট্যান্ডে ছুটে আসে রিকশা। রিকশাঅলা শুধায়— আপনারা সাদা চৌধুরীর ছেলে! আপনার বাপ জেলে আছে শুনেছি। বাড়ি চলে যান। আমি গোয়াসের লোক।

—বাপ জেলে আছে, কী করে শুনলে?

—আমাদের কাছে খবর আসে নানান রকম!

—তোমার নাম?

—সুলতান। মুমতাজ ভাইকে চিনেন আপনি?

—না।

না বলায় সুলতানের চোখ কেমন রহস্যে সন্দিহান দেখায়। এবং রাহুল ঈষৎ বিরক্ত হয়েছে, তা দ্রুত 'না' বলে অস্বীকার করায় সুলতানের কাছে প্রতীয়মান হয়। গাড়ি ছেড়ে দেয়। সারা পথ দুই ভাই কথা বলে না। রাহুল কেবল আপন মনে ঘটনাটিকে ভেবে চলেছিল। তার বারংবার হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদিত হচ্ছিল। এই সময় মানুষ যত ভীত,

ততই সাহসী। বন্দুকধারী পেয়াদার সঙ্গে একটি শিশুও যেন কিসের মোকাবিলায় নেমেছে, আর ওই শিশু বা কিশোরের রক্ত খাবার জন্য দেশের মাটি তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে ; খরার মাঠের ফাটলের ভিতর থেকে রক্তবর্ণ আগুন ফোয়ারার মত আকাশে উঠে ধুঁইয়ে দিচ্ছে বাতাস— এ রকম একটা ছবি কল্পনা করে রাহুল। রাহুলের একবার মুমতাজ আলির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয় ! কেমন সেই মানুষ মুমতাজ আলি ?

প্রাইমারি স্কুলবোর্ডের দেওয়ালে কালো কালি দিয়ে বাঁকাচোরা কাঁচা হস্তাক্ষরে লেখা :

পুলিস তুমি যতই মারো

মাইনে তোমার একশো বারো ॥

ওই লেখার পাশে অস্পষ্ট চোখে পড়ে 'চেয়ারম্যান' শব্দটি। শুধু কোনও কালোগাড়ি নয়, অন্য কারা যেন জীবনের একটি কোণ থেকে তাদের পরিবারটিকে পাহারা দিচ্ছে। আর একটি দেওয়াল চোখে পড়ে। বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। রাহুল আপন মনে মাথা নাড়তে থাকে— না। না। না।...

সে যতবার না না করে ওঠে, ততবারই সেই উচ্চারণ হ্যাঁ হ্যাঁ করতে থাকে কেন সে বুঝতে পারে না। হ্যাঁ এবং না সমোচ্চার্য হয় যখন একটি অকুতোভয় শিশু পকেটে লঙ্কার গুঁড়ো পুরে পেয়াদার সামনে দাঁড়ায়, প্রকাশ্য দিনের আলোয়।

রাহুল নিজেকে বলে— এই দেশটা কি উন্মত্ত বেঘোর নৌকো ? ললিত কিসের খেলায় মেতেছে ? বাপের কী হবে ! তার ছোট ভাইটা কি পাগল হয়ে যাবে ? কবি কেন সেদিন রাতে ডোবার ধারের খড়গাদার কাছে তালতলায় ওভাবে দাঁড়িয়েছিল ? কবি কি তাদের বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে ? কবি আর সুলতান কি একই দলের লোক ?

মণি বোকার মত ইট ছুঁড়ল কেন প্রাচীরের গায়ে এবং জেলখানার ভিতর ? নইলে অবশ্য রাহুল বুঝতে পারত না, এই মফস্বল শহরটা কেমন আছে !

শশাঙ্কমোহনের হিমেল দৃষ্টির সামনে বসে থাকতে রাহুলের বেশ অসোয়াস্তি হচ্ছিল, কারণ ওই দৃষ্টি ছিল অনড় আর আশ্চর্য ধরনের কঠিন, দুঃসহ অপরিচয় সেই দৃষ্টিকে তীব্র হিংসায় জ্বালিয়ে তুলেছিল, সেই আগুন ছিল বরফের মত নিরুত্তাপ, চোখের সেই ভাষায় চাপা বিদ্বেষ সাপের জিহ্বার মত চতুর। রাহুল বুঝল, এ দৃষ্টি মানুষকে ক্ষমা করে না, কোনও ফাঁক পেলেই এ চাউনি মানুষকে ছোবল হানবে।

শশাঙ্কমোহন উঠে চলে যাওয়ায় খানিকটা স্বস্তি বোধ করে রাহুল। মণি চেয়ারে কেমন এলিয়ে পড়েছে, অপমানে। চোখ মেঝেতে কোনও একটি স্থির বিন্দুতে নিবদ্ধ রেখে মাথা নীচু করে রয়েছে, ঘাড় ভেঙে পড়েছে তার। সে ভাল করে শশাঙ্কমোহনকে চেয়েও দেখেনি। মণির মনটি এখনও জেল-প্রাচীরে মাথা কুটে চলেছে, দলিত হচ্ছে বোকা পেয়াদাটির আচরণের আঘাতে।

ওরা দুই ভাই আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে ? আধঘণ্টা হয়ে গেল, কেউ জানল না তারা বসে আছে। শশাঙ্কমোহন দাদাকে কোন সংবাদই কি দেয়নি, নাকি ভিতরে গিয়ে নিষেধ করে দিয়েছে ?

বাড়ির একটি চাকর বাইরে থেকে ভিতরে যাচ্ছে একটি সবজির ডালি কাঁধে নিয়ে, তাকে রাহুল বলে, খবর দিও চাচা ! লোকটা কথা না বলে ঢুকে যায়। কোনও আগ্রহ দেখায় না।

একঘণ্টা বাদে বাড়ির একটি ঝি এসে বলে যায়, বাবু শুয়ে আছে। শুয়ে আছে মানে ঘুমিয়ে আছে হতে পারে।

—আমরা বসব !

—তা কী করে বলব ! বলেই মেয়েটি দুয়ার টেনে বন্ধ করে দেয়। তবু দুই ভাই অপেক্ষা করে। আরও একঘণ্টা কেটে যায়। হঠাৎ শশাঙ্কমোহন ফিরে আসে বৈঠকখানায়, আগের সেই চেয়ারটায় বসে। গোল কাঠের টেবিলে হাতের কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত রাখে। সেই দৃষ্টি।

কথা বলল শশাঙ্কমোহন। কথা বলবে ভাবা যায়নি।

—সাদা চোধরীর জেল হয়ে গেল শেষটায়। শালা !

শালা মানে কি ? বাবাকে কি লোকটা গালি দেয় ? নাকি শালা শব্দের মধ্যে তার এক অশেষ আনন্দানুভূতি রয়েছে মাত্র ! রাহুল চমকে ওঠে। মণির ঘাড় সামান্য কেঁপে যায়। লোকটার মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে উঠে মিলিয়ে যায়। আর একদণ্ড এখানে তিষ্ঠোতে মন চায় না রাহুলের। সে চলে যাবে কিনা ভাবে।

হঠাৎই শশাঙ্কমোহন বলে ওঠে— আর এভাবে বসে থাকা কেন ? চলে গেলেই তো হয়, দাদা তো বেরিয়ে চলে গেল।

—কোথায় !

—মিটিঙে।

—আমরা যে বসে রয়েছি !

—তাই থাকো !

—কখন আসবেন ?

—বলে যায়নি তো !

—অ।

—খুব অবাক হলে দেখছি ! বলে শশাঙ্কমোহন গলার খাদে অদ্ভুত করে হাসতে লাগল। রাহুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। ভাইকে ডাকল— চ মণি।

শশাঙ্কমোহনের হাসি আরও প্রকাশ্য হল এবং উচ্চে উঠল ঈষৎ। কড়াও হয়ে গেল ক্রমশ। রাহুলের আপাদমস্তক ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

সহ্য হয় না। আর সহ্য হয় না। মণির একটি বাহু ধরে ললিতমোহনের বৈঠকখানা ছেড়ে পথে নেমে আসে রাহুল। ললিতমোহন অন্য পথে খিড়কি দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন, দেখা করার সামান্য ভদ্রতাও বোধ করেননি তিনি। দু'ঘণ্টা বসে থেকেও কোনও ফল হল না। অযথা এক ক্রূর হাসি তাদের দংশাতে থাকল।

—ভাই, আর চেষ্টা করে লাভ নেই !

—ললিত যে শুধাল, কত মণ ধান হল তোদের ! সেদিন যে বলল !

—ও কিছু না মণি।

—নাটা তরফদার এসেছিল মায়ের কাছে !

—তাও কিছু নয় রে !

—বাবু ফিরে আসবে না ! বলে রাহুলের বুকে মুখ গুঁজে দেবার চেষ্টা করে মণি, ওর চোখ জলে ভরে গিয়েছে, অসহায় অপমান তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ে, সে এতক্ষণে ভেঙে পড়ল সহসা। রাহুলের অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, তবু ভাইকে সামলে নিয়ে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছকাছি এসে ভাইয়ের হাত ছেড়ে দেয় রাহুল। ওরা দেখতে পায়, চারাতলায় একখানা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কাছে আসতেই বুঝতে পারে, সমির মামা এসেছেন। এই

গাড়িটা এ বাড়ির সকলেই চেনে। মামা বছর পাঁচ-ছয় আগে সস্তায় মোটরগাড়িটা সেনা বিভাগ থেকে অথবা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দফতর থেকে কিনে নিয়েছেন— বাতিল জিনিস, কিন্তু এর সবকিছুই নতুন আর মজবুত আছে। অথবা তা হয় তো নয়। মামা অন্য কোনও জায়গা থেকে কিনে থাকবেন। মাঝে মাঝে গাড়িখানা বুলবনের দলের নেতারা ব্যবহার করেন, দেখেছে রাহুল।

আগে মামার অন্য ধরনের একটা কালো গাড়ি ছিল। সেটির কঙ্কাল এখনও আছে। বাড়ির সামনের বিশাল প্রাঙ্গণে সেটি পড়ে থাকে। অত্যন্ত কুচকুচে মসৃণ চকচকে রঙ ছিল সেটির। গাড়ি চড়া মামার বনেদি আভিজাত্য। তাঁর ড্রাইভারও আছে, মাইনে করা। মাইনেই শুধু নয়, মামা তাকে সাত বিঘে জমি দিয়ে রেখেছেন। রাহুল সেই ড্রাইভারটিকে দেখতে পায় গাড়ির মধ্যে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর নাম আয়না।

আয়না দেখতে সিনেমার অনুপ কুমারের মত। খুব একটা উঁচু চওড়া নয়, মিষ্টি মুখ। শোনা যায়, আয়না নাকি মামার কেমন সম্পর্কের ভাই। মামার বাড়িতেই থাকে অধিকাংশ সময়। রাহুল ছেলেবেলায় জানত, আয়না মামার বাড়িরই লোক। অনেক বয়েসে আয়নার বিয়ে হয়েছে, বউটি খুব সুন্দরী, কাঁচা বয়েস। একবার একটা অত্যন্ত বাজে খবর শুনেছিল রাহুল, সমির চৌধুরী প্রৌঢ়, কিন্তু আয়নার বউয়ের সঙ্গে মামার একটি অবৈধ ব্যাপার আছে— মামাই পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছেন, বউ গঙ্গার পারের কোনও এক গরিব দর্জির মেয়ে, পড়াশুনা করেছে কলেজে। আয়না নন-ম্যাট্রিক লোক। মামাকে 'তুমি' 'তুমি' করে কথা বলে।

রাহুল ভাবল, আয়নাকে ডাকবে কিনা ! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আর ডাকল না। সিধে বাড়ির ভিতর ঢুকে এল। মায়ের সঙ্গে কি সব কথা বলে চলেছেন সমির চৌধুরী। বুলবন নিঃশব্দে কান পেতে শুনছে। চন্দ্রিমাও রয়েছে নীচের বড় ঘরটির বড় চৌকির বিছানার কিনারে বসে। নাতাশা তারই পাশে তার কাঁধে হাত রেখে ঈষৎ ভর দিয়ে রয়েছে। মণি ও-ঘরে না গিয়ে উপরে চলে গেল। রাহুল ঢুকে এল। সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। কিন্তু বিকেলের ছায়া পড়ে গিয়েছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে সোনালি আলো এসে ঢুকছে।

রাহুলকে দেখেই মামা বলে উঠলেন— এই যে রাহুল ! আমি থানার বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমা ঠুকে দেব স্থির করেছি, জানি ফল হবে না, তবু এটা দরকার ! অবশ্য কোর্ট নাকি এ ধরনের মামলা নিতে চায় না ! দেশটার কী হল বল তো !

রাহুল বলল— আপনি ললিতমোহনের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ? অনেক ভেবে দেখেছি মামা, কোর্ট কাছারি করে লাভ নেই। বাবার বিরুদ্ধে পুলিসের নালিশ অন্যরকম।

—কি রকম ?

—আগে আমি ভাল করে বুঝে নিই, তারপর বলব !

—ললিত অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছে। কিন্তু আমি তো ওকে বলতে পারব না। ও আমার কথা শুনবে না। আমি বছর দুই হল বুলবনের রাজনীতি সাপোর্ট করি। ললিতের সঙ্গে পলিটিক্যালি আমার পুরনো রিলেশন শেষ হয়ে গেছে !

মামা একটু থেমে বললেন— চৌধুরী জামাইবাবু একদম নন্-পলিটিক্যাল ম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে ললিতের ব্যক্তিগত নালিশ থাকতে পারে। কিন্তু থানা তাঁকে এভাবে অ্যারেস্ট করবে কেন !

—করবে মামা ! কেন করবে, তার ব্যাখ্যা কি আমি করব ! আমিও তো পলিটিক্স বুঝি

না।

—এই যে বললে, তুমি আগে বুঝে নিতে চাও। কী বুঝতে চাইছ তুমি ?

—পলিটিক্যাল মিস্ট্রি, রাজনৈতিক রহস্য ! এখন মনে হচ্ছে, ললিতের দলেই যদি থাকতেন আপনি, আমাদের উপকার হত ! আমাদের জন্য বলবার লোক তো কেউ নেই। অথবা আপনি তিমিরের দল করতে পারতেন !

—তুমি এসব কী বলছ, রাহুল !

—ঠিকই বলছি মামা ! আপনি রাগ করবেন না ! আপনার সমর্থন কি বুলবনের দল পছন্দ করে ? যদি করে, তবে সেই দলটাই বা কী রকম !

—তার মানে ?

সমিরের গলা একটু কঁকিয়ে উঠল ! রাহুল সেই স্বরকে আমল না দিয়ে বলল— সরি ! চোখমুখ দেখে বুঝতে পারছি, এখানকার কেউ আমার কথা পছন্দ করছে না। বউদি পর্যন্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমি চলি।...

—না, যাবে না। দাঁড়াও। বলে ওঠে বুলবন। বিছানার প্রান্ত ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। নাতাশার হাত বউদির কাঁধ থেকে নেমে যায়। বউদি নড়ে বসে। মা সমির মামার সামনের চেয়ারে বসে কথা বলছিলেন, তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। মায়ের সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবিষ্ট সমির চৌধুরী ধুতির কোঁচা ফুলশার্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেন।

বুলবন বলে— তোমার কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমার রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই জানো না। তাছাড়া মামা কী রাজনীতি করবেন না করবেন সেই পরামর্শ তো উনি তোমার কাছে চাননি। এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। উনি আমাদের দলের ক্যাডার বা সাপোর্টারিও নন। সামান্য সিমপ্যাথাইজার। দল তাঁর কতটুকু সমর্থন চায় না চায়— তা দল বুঝবে। তোমার খারাপ লাগতে পারে, তুমি চুপ করে থাকো। না জেনে বুঝে কি কথা বলা ঠিক হচ্ছে তোমার !

—না হচ্ছে না, তবে তুমি যা বললে আমি সেসব কথা, কিছুই বলিনি। আমি ঠিক তা বলিনি। মামার ওপর আমারও শ্রদ্ধা আছে।

—তবে তাঁর রাজনীতি করা নিয়ে কথা তুললে কেন ! তুমি ললিতের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না বললেই তো পারতে ! এই ফ্যামিলির পাশে দাঁড়াবার মত আর কে আছেন আমাদের ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

—তাই হয়েছে আমার। তবে একটা কথা খুব বলা দরকার তোমাদের। বাবাকে ছাড়িয়ে আনার কোন চেষ্টা ক'রো না, পারবে না। বাবা খুব সম্ভব এখন একজন পলিটিক্যাল ম্যান, তোমাদের রাজনীতি তাঁর ধারে কাছে যায় না।

—কী বলছ !

—কী বলছিস মেজখোকা !

—কী হল তোর রাহুল !

পরপর বলে উঠল বুলবন, মা এবং নাতাশা। রাহুল আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

মামা অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন— আমি নাকি জোতদার সামন্ত মানুষ, আমার পলিটিক্যাল সাপোর্ট নেবার দলের অভাব নেই, কিন্তু যারা নিতে চায় না, আমি বোকার মত তাদেরই সাপোর্ট করে ফেলেছি— কেন করেছি প্রাণকিশোর জানে, তোমরা জানবে না। যাই হোক, সাপোর্ট কিছু নয়, সিমপ্যাথি রয়েছে, কিন্তু এই ফ্যামিলি যে অ্যায়েষার,

এখানে সিমপ্যাথি অনেক বেশি রাহুল, তুমি চাইলে, আমি এখনও ললিতের দলে ফিরে যেতে পারি, সেই পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। তা, বউমা তুমি কী বলছ! তুমিই তো আমাকে তোমার দলে সত্যিকার রিক্রুট করেছ মামণি ; তুমি বল!

মামা দেখতে অনেকটাই সিনেমার ছবি বিশ্বাসের মত। উচ্চতায়, স্বরে, চেহারায়, চলনে। ছবি বিশ্বাস ওঁর প্রিয় অভিনেতা। মামা খোলা গলায় হাসেন।

চন্দ্রিমা হঠাৎ মুখ খোলে— আমার বলবার মত কথা তো নেই মামা! আপনার মুখে, বুলবনের কাছে শ্বশুর মশাইয়ের কত কথা শুনেছি আমি! তাঁর সংসারে এসে, তাঁকেই চোখে দেখতে পাইনি, আমার কষ্ট কে বুঝবে বলুন! অন্য মেয়ে হলে, নিজের কপালকেই দুষত! আমি তা পারি না।

চন্দ্রিমার এই কথায় ঘরের আবহাওয়া বদলে গিয়ে কেমন থমথমে হয়ে আসে। আয়েষার বুকটা কেমন সহসা মুচড়ে ওঠে।

আয়েষা বলেন— দুঃখ কর না মা! খোদা তোমাকে দেখবেন!

মামার মনে হয়, আয়েষা ধরেই নিয়েছেন তাঁর স্বামী আর ফিরতে পারবেন না। সমির তাই অস্ফুট বলে ওঠেন— আমি কি তাহলে একবার ললিতের কাছে যাব!

—না।

বুলবন বলে ওঠে। 'না' শুনে সবাই ওর দিকে চায়। একদণ্ড কী ভেবে বুলবন বলে ওঠে— যাবেন না। কোন ফল হবে না। মাঝে থেকে আপনার সম্মান যাবে। আপনি একবার প্রাণকিশোরদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, উনি কী বলেন!

মামা বললেন— আমি বলেছি তাঁকে। উনি বললেন, ললিতের বর্তমান রাজনীতি কথা শোনার নয়। তবু একবার বলে দেখতে পারেন। অবশ্য বুলবনকে শুধিয়ে কাজ করবেন। ফের কিন্তু আমি রাহুলকেই প্রশ্ন করছি, আমি কি যাব!

রাহুল হঠাৎ গম্ভীর গলায় জবাব করল— না। আমি গিয়েছিলাম তার কাছে। ললিত কথা বলতে চায়নি। আবার যাব। আমার বোঝাপড়া আছে। আমি বুঝে নিতে চাই। তোমরা কেউ যেও না।

বলে রাহুল সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে চলে যায়। মুহূর্তে বুলবনের মনে হল, রাহুল বোধহয় কোনও একটা বিপদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে ক্রমশ, কোনও ফেরে আর অতল আবর্তের মধ্যে। চিন্তায় বুলবনের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

'আমি বুঝে নিতে চাই। তোমরা কেউ যেও না'— রাহুলের একথা সকলেরই কানে বেজে চলেছিল। পারিবারিক সমস্ত দুর্যোগ রাহুল যেন একাই মাথায় করে নিতে চাইছে, এ যে ভয়ানক!

আয়েষা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন তিনি। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসেন শ্লথ পায়ে।

মণি সিধে উপরে এসে চিৎ হয়ে মায়ের খাটে শুয়ে পড়েছিল। চোখ বুজে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। মা এসে ঘরে ঢুকতেই সে উঠে বসল। মাকে কোনও কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে আসে। সোজা কলঘরে ঢুকে টিউবওয়েল নিংড়ে জল বার করে চোখেমুখে ঝাপটা দেয়। তারপর নীচে বাপের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি আর হাওয়াই শার্ট পরে, জামার হাত গুটিয়ে নিয়ে উঠোনের কোণের কল থেকে ডোলে করে গরুনাদায় জল বইতে থাকে। জলভেজা মুখটা সে গামছা বা তোয়ালেয় মোছেনি, তা দেখে ফুলভানু সন্ধ্যার আগের অপরাহ্নের ঝাঁট ফেলছিল উঠোনে, বলল— মুছো, পানি মুছো ছোটভাই!

তহমন (লুঙ্গি) দিয়্যা মুছে লাও। আমি দিব ? দাঁড়াও, আঁচল ফিরাই !

ঝাঁটা ফেলে বউটি কাছে আসে। ডোল মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মণি। আচমকা ফুলভানু তার নিজের আঁচল দিয়ে মণির ভেজামুখ সযত্নে মুছিয়ে দেয়। আঁচলে ওর পারুল তেলের গন্ধ, নারকেল তেল মেশানো পারুলের গন্ধটি খাসা, শস্তা দামের তেল বটে, কিন্তু কেমন এক গ্রামীণ গন্ধ আছে, বউ-ঝিরা মোহড়ার মুদিখানা থেকে কেনে।

—কী মাখো গো তুমি, ভুরভুর করছে, ইস্ !

—খারাপ নাগে বুঝিন ! ছোটভাই, খারাপ নাগে ?

—তুমি ভাই ভাই কর কেন, হুকুম তো আমাদের চাচা !

—অ। তাও জান না ! গোকুলপুর বালিডাঙার সম্বন্ধে তুমার মা আমার চাচী হয় ! তাই ভাই ডাকি, ভাই ! বালিডাঙার ভাগ্যন চাচী তুমার মায়ের সই। সেই বিচিরে তুমাকে ভাই বুলি, খারাপ নাগে ?

—লাগে। নাও, ছাড়ো ! গন্ধে একেবারে থইথই করছে !

—তুমার খারাপ লাগলে আমি আর মাকব কী করে, নজ্জা করবে !

—কেন, তোমার সঙ্গে কি আমার প্রেম হয়েছে ? তুমি তো হুকুম চাচার নিকেতে বউ ! তাকে শুধাও !

—অর লাক নাই।

—নাক নাই !

অবাক হয়ে গেল মণি।

—না। গম্ভীর হয়ে বউটি সরে এসে ঝাঁটা হাতে তুলে নেয়। ঝাঁট দিতে থাকে।

বধূটি বড়ই অদ্ভুত কথা বলে। সে কথা শোনার মত। মুহূর্তে সবার কানে উঠে যায় সে কথার মজাটুকু। নীচে বাপের ঘরে এসে রাহুল কেমন ফ্যালফ্যাল করে হোমিওপ্যাথির বাক্সদু'টি স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে কী সব ভাবছিল। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য মা ফের নীচে নেমেছেন। চন্দ্রিমাও সে কথা শোনে। মামা এবং বুলবনের কানে আসে ফুলভানুর আক্ষেপ। এত দুঃখের মাঝেও হাসি পায় সবার।

এবার ফুলভানু ঘরগুলি ঝাঁট দিচ্ছিল। মাকে রাহুল প্রশ্ন করে— তরফদার সাহেব ওষুধের বাক্সের কথা কিছু বলেছেন ! আমি যে নিয়ে এলাম...

—কই না ! এসে সেদিন বললেন, ললিতের সঙ্গে কথা উনি বলবেন, তুমি যেন দেখা কর একবার।

—কোথায় ?

—উনার সাথে !

—অ।

রাহুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হঠাৎ মনে হয়, বাবা ওই ফুলভানুর নিকে দিয়েছেন। দেবর হয়েছে স্বামী। কিন্তু সেই স্বামীর নাক নেই, এ যে আশ্চর্য অভিযোগ।

ঝাঁটা থামিয়ে ফুলভানু বলে— নাক নাই, চোকও নাই। কতা শুনে হাসবা !

—কেন গো ভুলভানু !

রাহুল ফুলভানুকে ঠাট্টা করে ভুলভানু বলে ডাকে। তাতে বধূটির যে খুব দুঃখ হয়, তা নয়। কিন্তু ভুলভানু শুনে চন্দ্রিমা অবাক হয়। তার খুব আগ্রহ হচ্ছিল বউটি এবার কী বলে শুনতে।

ফুলভানু বলল— তুমি বুঝবা দিদি। আমার হল সীতের আবস্তা ! কও দেখি ! যেতি

নক্ষণের সাথে সীতে দেবীর শাদি হত, কী হাল হত সংসারে ! মরদ আমার পায়ে চাহে, মুকে চাহে না। ভারি নজ্জা ! আমি যে ভাবী গো ! গন্দ নাই, দিষ্টি নাই কনো। আমি কী মাকব, কী পরব, দিশা পাই না। ছোট্ ভাই মুনি বুললে খারাপ নাগে। তা নাগে। মরদ তো সে কতাও কইলে পারে ! কহে না। কিচ্ছু কহে না দিদি।

বলতে বলতে আশ্চর্য এক দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বধূটি হাত চালায়, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে— বাবু আমার ভাল করে নাই !

—এ কথা আর বলবি নে, আর না ! কোনওদিন না ! খুব হয়েছে ! বলে ওঠেন অসহিষ্ণু স্বরে আয়েষা ! তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন যেন হাহাকার করে উঠেছে। অশ্রু দমাতে দমাতে তিনি আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকেন।

রাত্রি হয় আশ্বিনের শেষ সপ্তাহের কোনও একটি দিনে। মাস ফুরায়। দিন চলে যায়। এবং সেদিন সন্ধ্যার পর মাচায় একলা চুপচাপ বসে থাকে রাহুল। পথের উপর চোখ পড়ে। একটি ক্ষীণ আলোর টর্চ এগিয়ে আসে। মাচার কাছে সালোয়ার কামিজ পরা সুগন্ধিত মোহর এসে দাঁড়ায়। এই সময় মামার জিপের হেড-লাইট আচমকা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। গর্জে ওঠে মোটর।

—আমি যাচ্ছি, নাতাশাও যাচ্ছে ! মামার জিপে। চৌধরী হাসানপুরে কখনও যাও না কেন ? এবার তোমার একটি গানও শোনা হল না। বাবু ফিরে এলে আবার নিশ্চয় তুমি গান গাইবে ?

—না এলেও গাইব মোহর, তবে সে গান অন্য রকম হবে ! তুমি তখন আর হয়ত শুনতেই চাইবে না !

—কেন ?

—আয় ! চলে আয় মোহর !

সমির চৌধুরী ডাকছেন। মোহর রাহুলের জবাব না শুনেই বলে— রাহুল ! আমি যাচ্ছি ! আবার আসব।

রাহুল কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল। মোহরও আর কোনও কথা বলতে পারল না। মণিকে উদ্দেশ করে মামা বলছেন— বলদ জোড়া পৌঁছে দিস বাপ। খুলানে ধান পড়ে আছে, বড় বলদ তো, কাম বেশি দেয়। কিছু ভাল নাড়া খড় গাড়িতে বেঁধে নিয়ে যেও।

জিপ ছেড়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে আসে পরিবেশ। রাত্রি বেড়ে যায়। একলা রাহুল বসে থাকে। হঠাৎ তালগাছের নীচে, খড়গাদার পিছনে, ডোবার কাছে টর্চের আলো জ্বলে ওঠে। রাহুলের সন্দেহ হয়। নিঃশব্দে এগিয়ে যায় সে। কে ওখানে কী করছে ? আলোর ছায়ায় মনে হয়, ওটা কবি। সেই রকম আকৃতি। কি করছে ছেলেটা ? কী খুঁজছে চোরের মত ? রাহুল ওকে ডেকে উঠবে কিনা স্থির করতে পারে না।

॥ ৭ ॥

রাহুল ডোবার ধারে তালতলার খড়গাদার কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। রাহুলের গায়ে টর্চের আলো এসে লাগতেই ওই মানুষটা সাবধান হয়ে যায়। টর্চের আলো তৎক্ষণাৎ নিবিয়ে দেয়, তারপর লাফ দিয়ে পথে নেমে যায়। পথে নেমেই প্রায় দৌড়

লাগায়, এত দ্রুত লম্বা ধাপ ফেলে ফেলে ছুটতে থাকে যে, রাহুল ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে একদণ্ড পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্ধকার হলেও লম্বা আকৃতির লোকটি যে কবিই সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না অন্ধকারের জন্য। রাহুল ভাবে, এই অন্ধকারে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া এমনও হতে পারে যে, সে এই মুহূর্তে হয়ত চোখের সামনে কবিকেই দেখতে চাইছে। কেননা ওই নাড়া বা খড়গাদার কাছে চোরের মত দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা অথবা শুধুমাত্র আত্মগোপন করার চেষ্টা কিছুদিন আগে কবিই করেছিল।

একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখলে সন্দেহ জাগে বই কি! কিছু খোঁজার চেষ্টা মানে কী খোঁজার চেষ্টা? আগের দিন কি কোন কিছু ওখানে ফেলে রেখে গেছে বা পকেট থেকে কিছু পড়ে গিয়েছিল? কিন্তু যদি এমন হয়, লোকটি কবি নয়, অন্য কেউ? কে তবে?

সামনে সামনে লোকটা ছুটছে। নদীর পথে ধাপ ফেলে দ্রুত হেঁটে প্রায় পালিয়ে যেতে চাইছে। তেড়ে গিয়ে ধরবার আগেই আরও জোরে ছুটে চলে যায়।

রাহুল ডেকে ওঠে—কবি? কবি গাঙ্গুলি, ওহে, দাঁড়াও দেখি একবার! চলে যেও না। শোন, শোন! কী হয়েছে তোমার? আমাকে ভয় পাচ্ছ কেন? অ্যাই কবি, শুনতে পাও না নাকি হে? ওহে, শোন না! কবি-ই-ই-ই...

না। লোকটি যে কোন কথাই শুনতে পায় না। একবার বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল এক সেকেন্ড, তারপর আরও জোরে ছুটতে লাগল। নদীর ধারে ছুটে গিয়ে বিলমুখো দৌড়তে লাগল। কোদালকাটির বাঁধের স্লুইস ওয়াটার-গেটের জলোচ্ছ্বাস শোনা যায় এখন। প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত জল বিল ছেড়ে নদীতে নামছে। ছোট নদী হয়ে এই জল বড় নদী ভৈরবে গিয়ে পড়বে। বিলের গা-লাগা একটি কালো ডোঙা একটি শীর্ণ দিঘল জলে পোঁতা লগিতে দড়ি দিয়ে আটকানো ছিল। লোকটি চড়ে পড়ল সেই ডোঙার উপর। লগি ঠেলে দ্রুত অন্ধকার জলের বিস্তৃত বিলের ওদিকে সরে যেতে লাগল। ক্রমশ জলের অন্ধকারে ডোঙাটিকে কেমন পড়ে থাকা এলানো কালো কম্বলের মত দেখায়।

অন্ধকার ভিজে আবহাওয়ার মধ্যে কম্বলের মত ডোঙাটি ভাসছে। লোকটা চোর কিনা বোঝা যাচ্ছে না মোটেও। চোর হলে ডোঙা ঠেলে দৌলতপুর, বীরকুচি বা নটখুলি অথবা বিলপারের অন্য গাঁয়ের দিকে চলে যেতে পারত। মনে হচ্ছে, লম্বা বাবলাগাছটি, যা কোনক্রমে খাড়া হয়ে রয়েছে, ওখানে ডোঙাটি গিয়ে মিশল। একটা লেপের মত ঝাঁকড়া বাবলা, তার পাশে পড়ে আছে একটি লম্বা কম্বল। জলের একটা টান আছে এদিকে, স্লুইস গেটের তাড়সে ডোঙাটিকে জল-শৃঙ্খল অত্যন্ত আলতো করে টানবে, যদি না সাবধান হয় কবি। বেচারি কবি ছাড়া কেউ নয়।

কিন্তু এত সাহস ওর কোথা থেকে হল! ডোঙা ঠেলতে শিখেছে একটা শহুরে ছেলে, প্রয়োজন অথবা জীবনেরে দায় মানুষকে চটপট কত কি যে শিখিয়ে ছাড়ে! জলের মধ্যে কতক্ষণ ওভাবে থাকবে ছেলেটা? রাত্রির মত সাহস করে বীরকুচি অথবা নটখুলির দিকে চলে গেলেই তো পারে! বাবলাগাছে লগি ঠেকিয়ে জলে ভেসে থাকা কম কথা নয়। আরও খানিক যদি জলের উপর ওইদিকে সরে যায়, দিনু মুহুরির ভুঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা জল ছাড়িয়ে ওঠা শিমুলগাছটা পেতে পারে। বাবলার চেয়ে শিমুলে নোঙর করা ডোঙার পক্ষে সুবিধা। অবশ্য সাপখোপ থাকবে, জলবোড়া, ঢোড়া। বাবলার গায়েও যে

না থাকবে এমন কথা নেই। শিমুলগাছে শকুন থাকবে অথবা বক। কী করবে তা হলে কবি?

মনে হচ্ছে, এই জলের পৃথিবী কবির কাছে নতুন হলেও একেবারে অচেনা নয়। অনেকটা অভ্যস্ত হাতেই ডোঙা ঠেলে জলের ভিতর চলে গিয়েছে। কিন্তু ওই ডোঙাটিই বা কার? এই জলোচ্ছ্বাসের টানা অব্যাহত গুঞ্জনের ভিতর অন্ধকারে কাছে-ভিতে কোন জন-মনিষ্যি দেখা যায় না। অত্যন্ত নির্জন রহস্যময় নদী। বিলের দিগন্ত পরিব্যাপ্ত জমাট গম্ভীর স্তব্ধতাকে জাগিয়ে রেখেছে নদীর উচ্ছ্বসিত উদ্বেল স্রোত। কোথাও কেউ নেই, অথচ ডোঙার উপর জলের ভিতর যেন সে, ওই কবি আত্মগোপন করেছে। স্পষ্টত এই দৃশ্য আত্মগোপনীয়তার একটা অদ্ভুত ঘটনা। কিন্তু রাহুলকে ভয় করার কী আছে!

কিছুই নেই। মনে মনে বলল রাহুল, তুমি চলে এসো! নাড়াগাদার কাছে, এই জলে, জলবেষ্টিত ভূমির কিনারে, ওপারের গ্রামগুলিতে তোমার যা-ই কাজ থাক, আমাকে বল, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার ধারণা নেই এই জল সম্পর্কে। এই জল বড়ই কঠিন। অত্যন্ত নিষ্ঠুর! এই যে ওয়াটার-গেট দেখছ, এর পরিচয় জানো? এ একটি মরণ-ফাঁদ। মোটেও নিরাপদ নিরীহ কিছু নয়। একবার যদি এর স্রোতের নাগালে পড়ে যাও তুমি, এর প্রবল জলের গোলাকার কোঁ কোঁ করা কুহকী আর্তনাদের ঘেরে ঘূর্ণনে পড়লে, তার পাতালগামী তীব্র ধাক্কা ডোঙাসুদ্ধো গেটের তলায় নামিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। তোমার সামান্য অসতর্কতা তোমারই মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

—কবি-ই-ই-ই! শুনছ-ও-ও-ও!

রাহুল নিজেকে বলল, কবি শুনতে পাবে না। জলে কোন প্রতিধ্বনি হয় না। একপাশে দীর্ঘ সরীসৃপের মত বেগবান নদী শুয়ে আছে, গেটের অন্য পাশে বিস্তৃত গম্ভীর বিল মুখ ভার করে ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তে। জলের শব্দে কণ্ঠের প্রতিধ্বনি অসম্ভব, কাউকে ডাকলে এখানে বোকা হতে হয়। নিজেরই কণ্ঠস্বর নিজের কানে স্পষ্ট করে শোনা যায় না। রাহুল পরীক্ষা করার জন্য নিজেরই নাম ধরে ডেকে ওঠে বারকতক। কারণ সে জানে এখানে কেউ নেই, কেউ শুনবে না। ডাকল—রাহুল! রা...আ...হু...উ...উ...ল!

রাহুল স্রোতের শব্দে টের পেল গলায় সুরের কেমন একটা হাহাকার মতন হয়, হু হু করে ওঠে। সেটা স্রোতের শব্দে মিশে প্লুত হয়ে লম্বা একটি আর্ত গোমরানির মত হচ্ছে। নিজের কণ্ঠস্বরকে কিছুতেই সে আর চিনতে পারছে না।

আচ্ছা, আমি যদি একবার মোহরের নাম ধরে ডাকি? ডাকবার জন্য রাহুল মুখ হাঁ করে হঠাৎ আর ডেকে উঠতে পারে না। ওর মনে হয় এই ডাকটা স্রোতকে যদি অহেতুক ছাপিয়ে গিয়ে কবির কানে পৌঁছায়? আকাশ যদি শুনে ফেলে? সাদা বকগুলি যদি চমকে ওঠে বা ডাহুক ডাহুকির যদি চমক ভেঙে যায়, ওরা তা হলে 'মোহর মোহর' বলে ডাকতে শুরু করবে!

বা এইসব বাতুলতা খুবই অর্থহীন, কেউ হয়ত সাড়াই দেবে না। অথবা এইসব ভাবনা কি আবশ্যক কিছু? এই অন্ধকার জলস্রোত এবং জলেরই গাম্ভীর্য কি মানুষকে এরকম করে সহসা এক রাত্রিতে। সহস্র বিপন্নতার মধ্যেও কি মোহরের প্রসঙ্গ এই নদী মেনে নেয়! এখন এভাবে কেন তোমাকে মনে পড়ল মোহর!

রাহুল বুঝে পেল না। ভাবনারও যেন ডানা আছে, কিন্তু সেই ডানায় তার পক্ষে এখন এই বিল অতিক্রম করা কঠিন। কারণ, বিলে কবি লুকিয়ে আছে! একটি ডোঙা করে

ভাসছে। ডোঙাটি যেন যুদ্ধের সাবমেরিনের মতন হঠাৎ জলের তলা থেকে ভেসে পড়েছে জলেরই উপরিভাগে।

আরও অনেকক্ষণ একইভাবে একলা বাঁধের পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল রাহুল। কী করছে বুঝে পেল না। তারপর একটি দৃশ্য কল্পনা করে শিউরে উঠল। যদি এমন হয়, জলে বড় শীত করছে কবির। হাত দু'টি ঠাণ্ডায় কনকন করছে, এই শীতে জলীয় হাওয়ায় মানুষের ঘুম পায়। সে ঘুমিয়ে পড়তেই, ডোঙা আলগা হয়ে গেল। জলের স্রোত ঘুমন্ত ডোঙাটিকে ওয়াটার গেটের আবর্তের দিকে ধীরে ধীরে টানতে থাকল। ক্রমশ এদিকে ভেসে আসতে থাকল ডোঙা। তা হলে এই মৃত্যু কি অন্যায় হবে না ! এই মৃত্যুকে কি মেনে নেওয়া যাবে !

তবে এ কথা সত্য বটে, কবির কাছে পুলিস বা মিলিটারি বা কালো ভ্যান কিছুই এখন পৌঁছতে পারবে না। শুধু কি এই কারণেই মুমতাজ আলি এই চমৎকার ভূখণ্ড পছন্দ করেছিল ? তা হলে কি এমনও চিন্তা করা যায় যে, বিলের ওপারের গ্রামগুলি মুমতাজের ঘাঁটি হয়ে উঠছিল ; কবিই বা এখানে কেন ?

শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান একা এভাবে জলের উপর ভেসে রয়েছে কিসের তাড়নায় ? কবিকে আর কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ সে বারবার খড়গাদার ডোবার ধারে যাচ্ছে। যাই সে করুক, রাহুলকে বলতে হবে। আমার বাপ জেল খাটছেন, তোমার রাজনীতি যদি এই দুর্ঘটনার কারণ হয়, আমাকে তা হলে এভাবে লুকিয়ে থাকছ কেন ? মনে মনে ভাবতে ভাবতে কঠিন হয়ে ওঠে রাহুল। তারপর হঠাৎ মনে হয়, ললিতমোহন বাবাকে জেলে পুরেছেন, এই সত্যই আমার বিবেচ্য ! রাহুল চিন্তা করে।

কবি যে আত্মগোপন করে রয়েছে তাতে সন্দেহের ক্ষীণ অবকাশ আর নেই। কেননা কবির সমস্ত আচরণে সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিন বেচারি খুব অসহায় গলায় বলেছিল, পুলিসের জিপ ভেবে সে ভয় পেয়েছে। অথচ পরে দেখা যায়, কথিত মোটরের শব্দ আসলে নাটা তরফদারের ট্রাক্টরের শব্দ। কিন্তু ভয় সত্য হলেও কবির স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। আজ আবার সে খড়গাদার কাছে এল এবং ডোঙা ঠেলে বিলের জলে পালিয়ে গেল। বারবার রাহুল, ঘটনার রহস্য সম্পর্কে মনে মনে আলোচনা করতে থাকে।

পথ বেয়ে ডোবার ধারের খড়গাদার কাছে এসে দাঁড়ায় চুপচাপ। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায় না। সমস্তই একই রকম দেখে। সব অস্পষ্ট। বাড়িতে ঢুকে এসে কারুকে কিছু না বলে চুপ করে মণির তিন ব্যাটারির টর্চটা বড় ড্রয়ার থেকে তুলে নেয়। আবার এসে পৌঁছায় ডোবার ধারে। সাবধানে আলো জ্বেলে জ্বেলে খতিয়ে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করে, কী রহস্য রয়েছে এখানে। বাঁশ আর দড়ি দিয়ে বাঁধা সযত্নে গাদানো গরুর খাবার খড় একটুখানি ঢলে আছে ঈষৎ কাত মেরে, কিন্তু সবই তো পরিপাটি সজ্জিত দৃশ্য। ডোবার তলানে জল স্থির। তালগাছটি ডোবার পাড়ে সামান্য কাত। এই গাছটিতে একটি সুদীর্ঘ আঁকড়ি বাঁশের মই গায়ে লাগানো, গাছটি চৈত্রে বৈশাখে রস দেয়, ফাল্গুনেই ঝরতে শুরু করে। মণি সেই রসের আমদানি করে। এই গাছেরও ড্রেসিং করাতে হয়। বেগো বা বেঁশো ছোলাতে হয়, মোজ কামাতে হয়। মুনিষ ধরে করিয়ে নেয় মণি। তালগাছের শীর্ষ বরাবর আলো ফেলে রাহুল এক ঝলক দেখে নেয় অকারণ। কোথাও কিছু নেই। অবশ্য জায়গাটা বেশ আড়াল মত। এখানে কেউ

আত্মগোপনের জন্য দাঁড়াতেই পারে। এরই পাশে একটি ভুঁষিঘরও রয়েছে। এখানে কবি তা হলে আত্মগোপন ছাড়া আর কী করতে পারে!

রাহুল আর দাঁড়িয়ে থাকে না। চারাতলায় মাচায় এসে চুপচাপ বসে থাকে।

হঠাৎ এই অন্ধকারে নূপুর এসে দাঁড়িয়েছে, 'ভাই' বলে আহ্লাদে ডেকে উঠল। ওকে কাছে টেনে নেয় সাগ্রহে রাহুল। তুলে নেয় মাচার উপর। কোলের উপর দু'হাত জড়িয়ে বুকে আলতো করে চেপে ধরে। তুমি ঘুমোওনি বুঝি! প্রশ্ন করে। রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। নূপুর ন'টার আগে শোবেই না। খেয়েছ? মাথা নাড়ল নূপুর। বউদি তোর সঙ্গে কথা বলে? মাথা নাড়ে ক্ষুদ্র বোনটি। ভালবাসে? হ্যাঁ-সূচক মাথা দোলাতে থাকে নূপুর সুন্দরী। তুমি কী পড়লে সন্ধ্যাবেলা? পড়েনি, বোঝা যায়। এ বাড়ির যেন সমস্ত মনোযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নূপুর পড়াশুনোর কথায় রা করে না।

মাচায় আরও ঘণ্টাভর বসে থাকার পর বোনকে কোলে করে রাহুল বাড়ির ভিতর ঢুকে আসবে, এমন সময় দেখতে পায় বুলবন সদর দুয়ারের কাছে হঠাৎ কোথা থেকে এগিয়ে এল। মনে পড়ল, বুলবন সমির মামার জিপে করে সদরঘাট পর্যন্ত না গেলেও বাঁধপথে নদীর কোনও একটা অংশ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল দরকারি কথা বলার জন্য। অথবা হয়ত সদরঘাট অবধিই গিয়েছে। বুলবন তার চাকরি সম্বন্ধে কোনও কথাই বলছে না। মামার হাত-চিঠির তদ্বির কি তবে নিষ্ফল হয়েছে? মা সমির মামাকে দু'দুবার প্রশ্ন করেছেন চাকরির সম্ভাবনা সম্পর্কে, উনিও তেমন গা করলেন না কেন বোঝা গেল না। কেবল বললেন, চাকরি কি সহজ জিনিস? হিফাজত তো ধর্মের হিফাজত করে, মানুষের হিফাজত তো করে না। ভেবেছিলাম আমার কথা শুনবে! তা কই, কিছুই তো বলছে না বুলবন। হলে নিশ্চয় বলত!

রাহুল বুঝতে পেরেছে, চাকরিটা হওয়ার নয়। বুলবন চুপ করেই ছিল, হঠাৎ বলল—এই চাকরির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা আছে মামা। চলুন, পথে যেতে যেতে বলব।

—আমাকে এরা কিছুই বলতে চায় না। মা সহসা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে বলে ফেলেন। এবং বলেন—বউমা পর্যন্ত কেমন চুপ করে থাকে। একটা চাকরি হলে এ সংসারে এত সাশ্রয় হয়, বাপের আর মাত্র আট-ন মাস চাকরি ছিল, ললিত কী সর্বনাশ করে দিলে সমির!

—বাপের এক্সটেনসনের চাকরি মা, কিন্তু নতুন চাকরি কে দেবে? বলে উঠল বুলবন।

মা বললেন—তা হলে কি সেই চাকরি আমিই চাইব ললিতের কাছে?

বুলবন এবার চমকে উঠে রাহুলের মুখের দিকে অত্যন্ত অসহায় চোখে চাইল, তারপর চোখ নামিয়ে নিল মেঝের দিকে।

সমির মামাও ওই সময় কেমন এক অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন দেখা যায়। দ্রুত বলে ওঠেন—বুবু তোমারও আর কোন ধৈর্য নেই দেখছি। চলো দেখি বুবন, আমাকে এগিয়ে দাও দেখি। চাওয়ামাত্র কোন্ জিনিসটাই বা এ সংসারে পাওয়া যায়! কোথাও মুচলেকা দিয়ে বা নখখৎ করে তো চাকরি চাওয়া যায় না! রাজনীতির লোকেদের আবার সবখানে নানান হ্যাপা হয়। আমি বুবনের জন্যে চেষ্টা করব, তোমাকে কথা দিচ্ছি বুবু! হিফাজত ডাক্তারকে বলব দেখা হলে!

এ সবই ঘটে গিয়েছে সন্ধ্যার আগে। রাহুলের মনে হচ্ছিল, মা পর্যন্ত বুলবনকে যেন

আক্রমণ করে বসলেন তখন। মানুষটার যে অশেষ দুর্গতি দেখা যায়, এত ভদ্র যে মায়ের কথায় আধোমুখে বসে থাকে, কথা বলতে পারে না, যেন সে বিয়ে করেই অপরাধ করেছে। বউদি স্বামীর অসহায় মুখের দিকে সরাসরি চাইতে পর্যন্ত পারছিল না।

বুলবন রাহুলের পিছু পিছু মাথা নিচু করে দুয়ার ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসে। ওর মাথার উপর বোধ হয় ভাবনার ভার চেপেছে পাহাড়ের মত। মাথা সে কিছুতেই তুলছে না। সোজা করে চাইছে না সমুখে দৃষ্টি চালিয়ে। ঘাড় নিচু করে হাঁটলে বুলবনকে দুঃখী দেখাতে পারে, সে কথা বুলবন হয়ত জানে না।

—সদরঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলে ? জানতে চাইল রাহুল।

—হ্যাঁ।

—কথা হল ?

—কী কথা হবে ? ঈষৎ রুষ্ট স্বর বুলবনের।

—কী কথা হল, তাই তো শুধোচ্ছি ! রাহুল বলে।

—সদরঘাটে হিফাজত ডাক্তারের সঙ্গে তৈমুরের দোকানে দেখা হয়, মামাও ছিল। আর ললিত মাস্টারও ছিল।

বলতে বলতে নীচের ঘরে ঢোকে দুই ভাই। কোল থেকে রাহুল বোনটিকে নামিয়ে দিতেই সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে দ্রুত ছুটে চলে যায় অন্ধকারেই। সিঁড়ির রেলিঙের উপর মিহি মোম বসানো হয়নি, নাতাশা থাকলে সে বসিয়ে দেয়। মায়ের পেটমোছা ছোট্ট নূপুর অত্যন্ত দুরন্ত, পেটমোছারা দুষ্টু আর আদুরে হবেই, পাকা গিন্নির মত স্বভাব, সব ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান। ছোট এবং ছোট হয়ে থাকতেও ভালবাসে, সবার কোলে চড়তে চায়। এরা অনেক বড় হয়ে গিয়েও সহজে কোল ছাড়তে চায় না।

—ললিত আবার মাস্টার হল কবে থেকে ?

—ওই আর কি, পোস্টমাস্টার কিনা ! লোকে তো তাই বলে কেউ কেউ। তৈমুর ফের মাস্টার ছাড়া ডাকে না দেখলাম।

—বাবুর কথা কিছু হল ?

—হ্যাঁ !

শুধু এক চিন্তান্বিত হ্যাঁ, ক্ষুদ্র শ্বাস ফেলে, যা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনায়, বুলবন চুপ করে যায়। তারপর চৌকির উপর বসে পড়ে। রাহুল বুঝতে পারে, বুলবন আর কথা বলতে চাইছে না। জোর করে খুঁচিয়ে জানতেও রাহুলের ইচ্ছে করল না। সে দোতলার সিঁড়ির কাছাকাছি সরে আসে। উপরে যাবে, এমন সময় দোতলা থেকে চন্দ্রিমা নেমে আসে।

হঠাৎ বুলবন কথা বলে ওঠে—আচ্ছা, রাহুল !

রাহুল সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে ঘুরে দাঁড়ায়।

বুলবন বলে—মুমতাজ আলি নামে একজন আমাদের বাড়িতে এসে কিছুদিন থেকে গিয়েছে, বাবুর চেনা !

—কেন ! ঈষৎ চমকে ওঠে কেন, রাহুল বুঝতে পারে না।

—না, তাই বলছি ! ওকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ঠিক হয়নি।

—কেন ?

—জানি না কেন, কিন্তু ললিত বললে মুমতাজ এসেছিল বলেই নাকি বাবুর এই হেনস্থা ! নইলে থানা থেকেই পুলিস বাপুকে ছেড়ে দিত। বাপুর কাছে মুমতাজ এসেছিল

কিনা পুলিস সেই সাক্ষ্য চেয়েছে।

—মুমতাজ বাবুর মিতপো ! তুমি মদন শিকদারকে দেখেছ, কবরেজ ! মদনের আসল নাম বাবুর সঙ্গে মেলে। সেই সুবাদে ওঁরা মিতে। তো, মুমতাজ আসতেই পারে !

বুলবন আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শান্তস্বরে বলল—আসতে পারে বললেই হয় না রাহুল ! ললিতের মুখে যা শুনলাম, ললিতেরও সাধ্য নেই বাবুকে ছাড়িয়ে আনে। তবু সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তোকে একবার দেখা করতে বলেছে। বললে, বাপুই নাকি গোলমাল করেছেন, থানায় স্বীকার করেছেন, মুমতাজ এসেছিল !

—ললিত তোমাকে এই সমস্ত কথা বলল !

—হ্যাঁ !

—তুমি সব বিশ্বাস করলে ?

—কেন করব না ? মুমতাজ যে এসেছিল এ-কথা মিথ্যা নয়। এই বাড়িটা তার 'শেলটার' হয়েছিল কিছুদিনের জন্য।

—মুমতাজের পরিচয় পুলিসের জানা থাকতে পারে, সাদা চৌধুরী জানবেন কী করে ?

—সেই যুক্তি পুলিসের পছন্দ হবে কেন ? আমি ললিতকে সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করা মাত্র লোকটা কেমন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বুনো পশুর মতো করলে, ক্ষেপে উঠল ধাঁ করে। আমি সব জানি, বুঝলে বুবন চৌধুরী, যত বলছ, তোমার বাপটা তত সিধে লোক না ! তোমার বাপের অনেক নকশালি বুদ্ধি আছে, তোমরা খবর রাখ না ! বলতে বলতে প্রায় চিৎকার করে উঠল পোস্টমাস্টার। আমার বাপ যা নয়, তাকে আজ তাই বানাতে চায় ললিতমোহন !

বুলবনের গলা সহসা খুবই বিপন্ন শোনায়। —তুই কোন কথাই আমাদের বলিসনি। বিপন্নতার মধ্যেই বুলবনের কণ্ঠ কেমন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বেজে ওঠে।

—বলবার মতো কথা আমিও জানি না। মুমতাজ এসেছিল, যখন আসে আমি তখন শহরে। থানার লকআপে বাবুকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিস। মুমতাজের কথা শুধিয়েছে, এই মাত্র। বাবু কেবলই বলছিলেন, আমার অনেক ঘাট হয়েছে, রাহুল, এরা আমাকে ছাড়বে না। তুমি ফিরে যাও। এই সব কথা তোমাদের শুনিয়ে বিশেষ কী সুবিধা হত ! তুমিই কেমন ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে, মা কি সামলাতে পারত ! আমি তোমাকে সাবধান করে দিই, মা যেন কোন কথাই না শোনে। ললিত 'কেস' সাজাবার জন্যে নানান ছুতো তৈরি করবে। আমার বাপ সিধে নয়, কিন্তু ললিতের মতো অত পবিত্র 'পলিটিকাল' ঘড়েল-ও আমি দেখিনি। খুব জাঁদরেলি করছে, ওর কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়া দরকার।

—কী বলছ রাহুল ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ! এইভাবে তুমি পারবে ? ওই ললিতের এখন একটা স্টেটের রাষ্ট্রপতির সমান ক্ষমতা, ভেবে দ্যাখো তুমি...

—ভেবে অনেক দেখেছি বুলবন ! অনেক ভেবেই তো বলিছ, নাউ মাই ফাদার ইজ এ পলিটিকাল ম্যান। আমি তাঁকে আর পুওর টিচার বা কালটিভেটার মনে করি না।

—তুমি অত্যন্ত ভারি ভারি কথা বলছ রাহুল ! তোমার এই ভাবাবেগ খুব ভয়ঙ্কর !

—আমি জানি।

এমন সময় সিঁড়ির মাথায় মাকে দেখা যায়। চন্দ্রিমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সে হতবাক হয়ে দুই ভাইয়ের উষ্ণ-প্রায় কথাবার্তা শুনছিল। মাকে দেখে দুই ভাই-ই থেমে পড়ে। চন্দ্রিমা মায়ের ছায়া নয়, মোম হাতে স্পষ্ট আয়েষাকে দেখে নিচের ঘরে ঢুকে

পড়ে।

—শোন, রাহুল ! বলে ওঠে বুলবন। —আমার মনের অবস্থা বলবার মত নয়। তবু তোমাকে বলছি...

—পরে শুনব। বলে রাহুল দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে যায়। মায়ের পাশ দিয়ে না থেমে দোতলার বারান্দায় চলে আসে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। মা ঠিক করতে পারেন না, তিনি কোন্‌দিকে যাবেন। মোমের বিন্দুবৎ আলোর শিখাটির দিকে একবার চাইলেন আয়েষা। সেটিকে সিঁড়ির রেলিংয়ের উপর বসিয়ে দিয়ে বুলবনের কাছেই নেমে এলেন। এই সময় মণি ঢুকল বাড়ির ভিতর, পিছনে হুকুম আলি। মণির হাতে একখানা দা। হুকুমের হাতে দু ব্যাটারির টর্চ।

বুলবন মণির উদ্দেশে বলল—এত রাতে দা কী হবে ?

—বাঁশড়ায় গিয়েছিলাম। ছিপ বানাবার বাঁশ কাটতে, তল্লা। গিয়ে দেখি, অনেক ক'খানা বাঁশ কারা কেটে নিয়ে গেছে। আমাদের বাঁশড়ার বাঁশ গত বছর চৌদ্দ মাইলের ডোমেদের কাছে নাটা তরফদারের কিষেন আছগর বিক্রি করে দিয়েছিল। তরফদারের বাগান আমাদের গা-লাগা। মাঝে একফালি পথ, বাঁশের আড়ঙে ঢেকে যায়।

—তো ? বুলবন অবাক হয়ে শুধায়।

আয়েষা এবার মণির কথা কেড়ে নিয়ে বলেন— হুকুম আছগরকে ধরে। তাই নিয়ে ওই মাচানে মগরিবের পর মজলিস হল। বাবু বললেন, তরফদারের কিষেন চুরি করে আমার বাঁশ বেচে দিয়েছে, এর কোন বিচার হয় না। আমি পারব না।

চন্দ্রিমা বুঝতে পারছিল, তরফদারের সঙ্গে তার শ্বশুরের হৃদ্যতা গভীর।

আয়েষা আবার বললেন—চোরের কথা আর বলো না ! কদম আলি তখন বাচ্চা। আমার শ্বশুর তখন বেঁচে। নতুনই চুরি করা শিখেছে কদম। আমার বাড়ি চুরি করতে ঢুকে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল এসে। রাত বেশি হয়নি, দেখি রান্নাঘর থেকে কেমন সপ্‌-সপ্‌ আওয়াজ উঠছে। কিসের শব্দ হয় !

মণি এবার হি হি করে হেসে ফেলে বলল—শুনেছি। রান্নাঘরে ঢুকে কদম আলি পান্তা বেড়ে নিয়ে চালকুমড়োর ঝাল দিয়ে সাপটাচ্ছিল। মা অন্ধকারে চুপিসাড়ে গিয়ে কদমের এঁটো হাত চেপে ধরলে, কী কাণ্ড ! সবাই যখন কদমকে মারধর করবার জন্যে তৈরি, বাপু সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললে, দাঁড়াও, ওকে মেরো না তোমরা ! খেতে দাও ! কদম বাপুর ফেজের কালো টুপি মাথায় দিয়ে খেতে বসেছিল ! দাদিমায়ের ছোট এক বগ্‌নে কাঁচা পঞ্চম জর্জ না কার, নাকি নেড়া রাজার রুপিয়া চুরি করেছিল।

—থামো তুমি, আমাকে বলতে দাও ! আয়েষা মণিকে মৃদু ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

মণি বলল—তুমি যেমন করে বল, আমি তো হুবহু তাই বলছি মা ! আমার মুখস্থ আছে।

আয়েষা বলেন—তা কি আর থাকবে না ! তুমি যে আমার বুড়া বাপ ! তো বাপু কী করলে মণি ! যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হল, চৌধ্রী পাহারা দিয়ে কদমকে খাওয়ালেন। তার বগ্‌নের আর্ধেক টাকা কদমের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন নে। এই টাকা দিয়ে মনোহারীর গাঁওয়ালি ব্যবসা খোল দেখি ! কদম কিছুদিন তাই করলে। তারপর যে কে সেই, চোরের স্বভাব কোন ধারায় থিতু হয় না। এই একটা আজব চোর বাবা, বাবুকে একবার ভাতশালা থেকে মাস-কলাইয়ের বিছন এনে দিলে, ওই বলত, জলের তলে

বেতাই ধান বাবু ! দাঁড়াশের পানা গলা তোলে, লাগলে বলবেন, আনে দিব। সেই মানুষ বাবুকে অ্যারেস্ট করালো বুলবন ! থানার ঘুষ খেল !

বুলবন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। চন্দ্রিমা ঘটনা শুনতে শুনতে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার মনে হল, একটি সহজ জীবন, বিশ্বাসের জীবন কীভাবে ক্রূর অন্ধকারের থাবায় পড়ে কত জটিল হয়েছে !

বুলবন এবার মণির মুখের দিকে চেয়ে বলল—তুই একবার কালই মামার ওখানে চলে যা ! ছইগাড়ি আর বলদজোড়া মামাকে দিয়ে আয়। আমি তোকে একটা চিঠি লিখে দেব, মামার হাতে দিবি ! কালই যা, নইলে মামা ফের শহরে চলে যাবেন। আর শোন, এক আধ কাহন গরুর খড় নিয়ে যাস, মামা বলেছেন। সোনাডিহির খড় সুখাদ্য। গরুরা খায় বেশ। যাবি তো ? মামা তোকে একটা জিনিস দেবেন, খামের মধ্যে। আনবি। তোর খুলে পড়ার দরকার নেই। কনফিডেনশিয়াল।

মণি ইংরেজি শুনে বুঝল, তা হলে খুব গুরুত্বের ব্যাপার, সে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ করল।

—চাকরির ব্যাপার বুঝি বাবা ? আয়েষা লোভীর মত প্রশ্ন করলেন। বুলবন দুদণ্ড চুপ করে রইল, ঠোঁট চাপল ঠোঁটে। চোখ দুটি কেমন ম্লান হল কিসের ব্যথায়। চন্দ্রিমার দিকে চেয়ে দেখল একবার। চেয়ে থাকতে পারল না। হুকুমের চেহারার উপর দিয়ে দৃষ্টি উড়ে গেল ঘরের কড়ি বরগার দিকে। একটা কী যেন বুকে করে চেপে রাখবার চেষ্টা করছে বুলবন। তারপর দম ছেড়ে বলল—হ্যাঁ মা, সেই রকমই !

—তাই চেষ্টা কর বাবা ! বলে মা ঘর ছেড়ে উপরে চলে গেলেন।

মণি বলল—তা হলে ভোররাতে গাড়ি ছেড়ে যাব। বেলাবেলি যাব, দূরের পথ। এখনি যা লেখার লিখে দাও ভাইয়া। হেতের বলদ, বেশিদিন রাখা ঠিক না। খুলানে মলন আর নাই, সব সাফা।

হুকুম সমর্থন করল—সব সাফা। মামুর হেতেরের জন্যি খড়নাড়া কতক পণ লিয়ে যাওয়া ভাল। তাই যেও মণি চাচা !

বুলবন বলল—বেশ। আমি লিখে রাখছি। গরুর জাবনা দিবি যখন, ভোররাতে, আমাকে ডাকবি !

—কেন ?

—চিঠিটা তখনই দেব। অবিশ্যি এখনই যদি হয়ে যায়, দিচ্ছি তা হলে। যা এখন।

মণি আর হুকুম নীচেরইকোনওএকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। রাত সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। চন্দ্রিমা বলল—আমি কাল একবার প্রাণদার সঙ্গে দেখা করতে চাই। শরৎ জন্ম-জয়ন্তীর প্রোগ্রাম আগে বহরমপুরে হচ্ছে, একটা প্রস্তুতি-কমিটি হয়েছে, আমাকে মহিলা সমিতির তরফ থেকে ওই কমিটিতে পার্টি-প্রতিনিধি থাকবার কথা প্রাণদা লিখেছেন, আমি বাসে যাব আসব। পরে শহরেই থাকতে হতে পারে।

—বাসে যাওয়া আসা করে কতটুকু প্রোগ্রাম করতে পারবে ? সদরঘাট পৌঁছতেই পায়ে হেঁটে প্রায় দু ঘণ্টা, বাসে বহরমপুর দেড় ঘণ্টা, রিকশায় পার্টি অফিস পনেরো-বিশ মিনিট।

—দরকার হলে থেকে যাব, বললাম তো !

—মা এখনই তোমার পার্টি-প্রোগ্রাম কতটা পছন্দ করবে, বোঝা দরকার।

—সেই জন্যই আমি বহরমপুর যেতে চাইছি ! ওখানে থেকে করলে মা অপছন্দ

করবেন না।

—আমার চাকরিটা খুব চাই দোলন !

—আমার প্রোগ্রাম করার সঙ্গে তোমার চাকরির বোধহয় সম্বন্ধ আছে ?

—দ্যাখো, খোঁচা দিও না। আমার মনের অবস্থা তোমাকে বলবার নয়। আমি কত অসহায় হয়ে হিফাজতের চাকরির তোষামোদ করছি, তুমি জান না ! চাকরির সঙ্গে তোমার স্বাধীনতার প্রশ্নটা কিছু যুক্ত বই কি ! তুমি আমি কি আলাদা ? চাকরির চেষ্টা তোমাকেও করতে হতে পারে !

বুলবনের কথায় চন্দ্রিমা গম্ভীর হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর পাতলা করে হেসে ফেলে বলল—তুমি এই বাড়ির বড় ছেলে, আমি বউ, চাকরি দরকার নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলে আমার স্বাধীনতার দোহাই দিচ্ছ দেখে আমার খুব খারাপ লাগল বুলবন। আমার স্বাধীনতা তোমার চাকরির শর্তাধীন নয় বোধ হয়। বা ইট মে বি, আমি ঠিক জানি না, তুমি নেতা তুমিই বলতে পার ! বলেই চন্দ্রিমা মেঝেয় খাবারের আসন পাতবার জন্য এগোয়। বলে—টেবিল থেকে তোমার খাবার নামিয়ে দিচ্ছি নীচে। দেব ?

—নাহ্ ! কেমন যেন অসহিষ্ণুর মত কঁকাল একবার বুলবন। তারপর কাগজকলম নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলে চিঠির পাতা ফেলেই স্থির হয়ে গেল। চোখের সামনে দু ঘণ্টা আগের সদরঘাটের তৈমুরের দোকানের দৃশ্য হুড়হুড় করে ভেসে উঠতে লাগল। বুলবনের দেহ সামান্য মৃদু কেঁপে কেঁপে উঠল বার কতক। সে খচখচ করে লিখতে শুরু করল, লিখে চলল মিনিট কতক, তারপর কাগজখানিকে থাবা মেরে একটা তালগোল পাকিয়ে টেবিলের তলায় পায়ের কাছে ফেলে দিল। বুঝতে পারছিল, তার স্বামীর মনের আর কোন স্থিরতা নেই, এমন কি তার কথায় বুলবন অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়েছে।

বুলবন দেখছিল হিফাজতকে। স্টেথোর কালো পদকটা নাড়ছেন হাতের আঙুলে। টিউবে হাত বোলাচ্ছেন আর কথা বলছেন।

—একবার খালি শো করবে ম্যারেজ-সার্টিফিকেট, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমরা যে বাস্তবিক বিয়ে করেছ, কোর্ট তার প্রমাণ। এটা জাহির করতে হচ্ছে কেন ? কেননা 'মিরাজ' পত্রিকা একটা খুব বাজে কাজ করেছে। পার্টির সর্বোচ্চ নেতার ফটোর সামনে যে মালাবদল হয়নি, সেকথা আমি বিশ্বাস করি। তোমরা দুজনই ছেলেমানুষ নও, তোমার পার্টি নিশ্চয়ই দায়িত্ববান। সমির তার কোর্টে তোমাদের বিয়ে দিয়েছে, কোর্টের উকিল উপস্থিত ছিল সেই অনুষ্ঠানে। অতএব সন্দেহ কিছু নেই।

ললিত বললেন—চাকরি তোমার হোক আমি চাই বুলবন। সার্টিফিকেট দেখাতে তুমি আপত্তি কেন করছ ! এতে লজ্জারও নেই, চুরিও করনি। চাইছে দেখিয়ে দাও। সমির আছে, আসল লোকটাই তো রয়েছে, স্কুল-কমিটির যদি অতই বায়না, দেখাতে ক্ষতি কি ! মনে কর, তুমি একস্ট্রা কারিকুলামে ওই সার্টিফিকেট শো করাচ্ছ, শুধু জেদ করলে তো হয় না ! আমরা গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, এ চাকরি তোমার বাঁধা। তোমার কোন কমপিটিটার নেই। শুধু একবার দেখাও, ব্যস ! তোমার বাপ জেল থেকে শিগগির ফিরে এসে দেখবে, তার এক্সটেনশন আছে, নতুন একটা চাকরিও হয়েছে। তোমাদের হিংসে আমি করি না বুবন। তোমার বাপকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টার কোন ত্রুটি আমি করব না। তবে, প্রসাশন যদি এই ঘটনার কোন পলিটিক্যাল কালার দেয়, উগ্রপন্থী বলে আটকে রাখে, আমি তা হলে অপারগ।

হিফাজত বললেন—কথা দিচ্ছি, তোমার কোন অসম্মান হবে না। সমির আসল

লোক।

বুলবন বলল—একটু আগেই আপনি বাপের অনেক নকশালি বুদ্ধি আছে বলেছেন!

ললিত বলল—তা বলেছি। কিঞ্চিৎ মশকরা হয়েছে! ওটা ওই পলিটিক্সের দোষ।

—আ। চাকরিটা মশকরা নয় তো?

—ছিঃ! ছিঃ! তাই কি পারি! দাঁতে জিভ কাটলেন ললিতমোহন। তারপর বললেন—আপনি পারবেন ডাক্তার! পারবেন না, এটা হল জীবন-জীবিকার প্রশ্ন।

বুলবন বলল—রাজনীতিটাও জীবনের প্রশ্ন ললিতমোহনবাবু। আমরা মনে করি।

ললিত বললেন—আমিও করি বোধ হয়। না হলে জিরাত মাস্টারের জীবনটা তো আমিই ফিরিয়ে দিয়েছি। তোমার বাপের মতোই সে যে আটক হয়েছিল। আমার আমলে কোন অন্যায় তুমি পাবে না। থানা আমার, প্রসাশন আমার, সবুজ বিপ্লব আমার, সবই জনগণের জন্য। একটু-আধটু দমন-পীড়ন কোন্ কালে ছিল না। তা-ও শ্বেত-সন্ত্রাস হয়েছে বলে। নেত্রী মানুষকে কল্ দিয়েছেন গ্রিন রেভেল্যুশন! প্রোগ্রাম ইজ মেকিং! সেই সত্তর একাত্তর সন থেকে আমরা বলে আসছি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যবন কী বলেছিলেন, সবুজ বিপ্লব যদি সামাজিক ন্যায়ের উপর ভিত্তি না করে, সবুজ বিপ্লব লাল হয়ে যাবে। সর্দার কোঙারও একথা বলেন। আমরা এই রাজ্যে এক লক্ষ শিক্ষিত বেকারকে চাকরি দেব। এমারজেন্সি তুলে দেব। আমাদের গোপন মিটিংয়ে কী ধরনের প্রস্তুতি চলছে, তুমি জান না। অদ্ভুত ইংরেজি বাক্যে কথা বলেন ললিত।

—জানি। সব জানি। ঈষৎ ক্ষিপ্ত স্বর বুলবনের। বলে—বাপ জেল খাটছেন, আমি জানব না! নিশ্চয় জানব! বলে বুলবন রাস্তায় নামে।

রাস্তায় নেমে জিপে উঠতে গিয়ে মামা বলেন—মনে হচ্ছে, হিফাজত তোমাকে সত্যিই চাকরি দিতে চাইছে। একবার ভেবে দেখা দরকার। ঠাণ্ডা মাথায়।

আবার চিঠি লেখার চেষ্টা করে বুলবন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার। তালগোল পাকানো চিঠির কাগজ পায়ের তলায় ছুঁড়ে দেয়।

শ্রদ্ধেয় ছোটমামা—

অনেক ভেবে দেখলাম, বিয়ের সার্টিফিকেট স্কুল-কমিটিকে দেখিয়ে চাকরি জোগাড় করা চূড়ান্ত কোন আপোস হয়ত নয়, কিন্তু অপমান নিশ্চয়। হিফাজত ডাক্তার, কমিটির সেক্রেটারি, কোন অপমানের প্রত্যক্ষ অভিসন্ধির বশে সার্টিফিকেট দেখতে চান না ঠিক কথা, কিন্তু আমার বাংলার সমাজের অন্তঃকরণে ধর্মের কঠিন মৌলবুদ্ধি অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে দিনে দিনে, আমার সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অপমানে সেই মৌল-সংস্কার-বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হতে চাইছে। আমার এখন কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না।

দ্বিতীয় চিঠিতে বুলবন লিখল, বিয়ের সার্টিফিকেট কমিটিকে দেখিয়ে চাকরি জোগাড় করার মতন চূড়ান্ত আপোস কিছু হয় না, তবু জীবনে এই আপোসটিই আমি করতে চাই।

তৃতীয়বার লিখল, আপোস যদি না-ও হয়, কিন্তু অপমান যে কত সাংঘাতিক, আমার মতো কর্মীর পক্ষে...এই সমাজকে কীভাবে বদলাতে পারি আমরা! তা কি অসম্ভব? তবু চাকরিটা আমার চাই।

এই চিঠিও শেষ হয় না। তালগোল পাকিয়ে ফেলে দেয় নীচে। বিচানায় শুয়ে ঘুমাতে পারে না একা চন্দ্রিমা। ছটফট করে। ডাকে—শুতে আসবে না?

বুলবন চতুর্থবার চিঠি লেখার চেষ্টা করে। তার ঘুম আসে। টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে যায় কাঠ হয়ে। তখন চন্দ্রিমা বিছানা থেকে নামে। টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে

তালগোল পাকানো চিঠির প্রতিটি খণ্ড টেবিলের ল্যাম্পের সামনে মেলে ধরে। তারপর সে বিষম বিস্মিত হয়ে ভাববার চেষ্টা করে, হায় বুলবন, এ কি সত্যি! ভাবতে ভাবতে চন্দ্রিমা ওই কাগজ খণ্ডগুলি ফের টেবিলের তলে ফেলে দেয়। ভোররাতে 'ভাইয়া' বলে দরজায় কড়া নেড়ে ডেকে ওঠে মণি। দরজা খুলে খাম ঢাকা একখানা চিঠি এগিয়ে দেয় বুলবন। কতবারের চেষ্টায় লেখা বুলবনেরও হিসাব নেই। **চন্দ্রিমা তখন অর্ধসুপ্ত,** নড়ে ওঠে মাত্র। রাহুল দেখতে পায় না বটে, কিন্তু আলো ফোটার আগেই মণির খড় বোঝাই গাড়ি ছেড়ে যায়।

রাহুল তখন স্বপ্ন দেখছিল, কবির ডোঙা স্রোতের টানে গেটের দিকে ছুটছে।

॥৮॥

মণি ভোররাতে দরজার শেকল নেড়ে করাঘাত করে 'ভাইয়া' বলে ডেকে উঠতেই অর্ধসুপ্তির ঘুমে আচ্ছন্ন চন্দ্রিমার ঘুম টুটে যায়। সে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে। টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়া স্বামীটির দিকে চায়। বুলবন ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। বুলবনের পায়ের তলায় তালগোল পাকানো চিঠির কাগজপিণ্ড খসে পড়েছে একটার পর একটা, অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারি। বুলবনের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার অশেষ যন্ত্রণাকেও উপলব্ধি করতে পারে চন্দ্রিমা। মেঝের তলায় পড়ে থাকা কাগজের পিণ্ডগুলি সে স্বামীর ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে পাট করে ফেলে। চন্দ্রিমার দাঁড়া সিধে হয়, চিন্‌চিন্ করে ওঠে বুকের ভেতরটা।

মণির ডাকে উঠে বসার পর চন্দ্রিমা স্বামীর কাছে চৌকি থেকে নেমে এসে পিঠে আলতো স্পর্শ করে ডেকে ওঠে— বুলবন, শুনছ, মণি ডাকছে, কিসের চিঠি নাকি দেবে বলেছিলে!

—হ্যাঁ! বলে ধড়ফড় করে জেগে উঠে টেবিল থেকে মাথা তোলে বুলবন। টেবিলে খামবন্দী চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে টলতে টলতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজা খুলে মণির হাতে খামটা এগিয়ে দিয়ে বলে— মামাকে দিবি! তাশা বা কেউ যেন দেখতে না পায়। গোপন ব্যাপার আছে।

মণি মাথা নেড়ে অস্পষ্ট হালকা অন্ধকারে খাম হাতে করে চলে যায়। বুলবন চৌকির দিকে ফিরে আসতে গিয়ে দেখতে পায় ল্যাম্প হাতে করে টেবিলের তলার কাগজপিণ্ডগুলি খুঁটে তুলছে হাতের মুঠোয় চন্দ্রিমা। ল্যাম্পটা মেঝেয় রাখল সে। রেখে কাগজ-পিণ্ড গোছায়।

—ওগুলো আর কী হবে?

—ফেলে দিতে হবে। স্বামীর প্রশ্নের জবাব দেয় চন্দ্রিমা।

—তুমি জানতে চেয়েছিলে, চাকরির কী হয়েছে!

—জানি।

—তুমি কিছু বলবে না?

—না।

এক হাতে কাগজের পিণ্ডগুলি নিয়ে, অন্য হাতে ল্যাম্প ধরে উঠে দাঁড়াতেই চন্দ্রিমার কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বুলবন হঠাৎ সজোরে বউয়ের কাগজ ধরা হাতটি চেপে

ধরে তীব্র স্বরে বলে— কেন তুমি এই জিনিস পড়লে দোলন !

—তুমি আমাকে মারবে বুঝি, অমন কেন করছ ! হাত ছেড়ে দাও !

—নাহ্ !

—ছেড়ে দাও বলছি !

—ওগুলো পুড়িয়ে ফেল ! আমি মামাকে লিখেছি, তিনি এই সার্টিফিকেট শো করতে বলেছেন। আমি তো ভূয়ো কিছু দেখাচ্ছি না ! কোর্টের সাক্ষ্য-প্রমাণ যে আছে, সমাজ যদি তাই দেখে সন্তুষ্ট হয়, আমাদের লজ্জার কী আছে !

—আমার আছে বুলবন, আমার আছে ! আমার হাত ছেড়ে দিয়ে কথা বল !

চন্দ্রিমা চাপা কিন্তু কঠিন স্বরে স্বামীকে হাত ছেড়ে দিতে বলে ! বুলবন কেমন ভীতুর মত স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে সিড়ি ভেঙে দোতলায় এবং সেখান থেকে দোতলার ছাদের উপর উঠে চলে আসে।

দরজার দিকে এগনোর সময় শুনতে পায়, চন্দ্রিমা বলছে— বিয়েটা তোমার একার নয় বুবন ; ওটা আমারও। সার্টিফিকেটটা যখন স্কুল-কমিটিকে দেখাবে, অপমান আমারও হবে। **এটা কোনও মার্কসীট নয়।** কিন্তু পার্টির কাছে এই জিনিসটার একটা নম্বর আছে, তুমি ভুলে যেও না।

ছাদের উপর উঠে এসে আকাশের একটি জ্বলন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বুলবন বলল— জানি দোলন ! আমি তোমাকে অপমান করলাম। আর কমিটির কাছে এ তো একসট্রা কারিকুলাম। **মার্কস** পাব আমি। আমার কি তাহলে পতন শুরু হল !

পাগলের মত নিঃশব্দে ছটফট করে ওঠে বুলবন। নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে পার্টির সর্বোচ্চ নেতার, লিডার অফ দি প্রোলেটারিয়েট, সর্বহারা বিপ্লবের প্রতীক-চক্ষুদ্বয় উদ্ভাসিত হতে দেখে শিহরিত হয়। ভয় পায়।

সিরসির করে বাতাস বইছে সমস্ত ছাদ জুড়ে, নদী থেকে উঠে আসছে আঁযগন্ধমাখা সবল হাওয়া, মনটা কেমন করছে ! উষার ক্ষীণ আলো লেগেছে পুব আকাশের গায়ে, মনে হচ্ছে, সূর্যোদয়ের পথে তার চলবার সাহস কে যেন কেড়ে নিতে চাইছে ! এমনটি হওয়ার তো কথা নয়, প্রত্যেক পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয় এখানে, যে কোন সামান্য অসতর্ক আচরণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে পতনের বীজ। বিবাহিত জীবন অনেক কঠিন। আরও কঠিন চন্দ্রিমার মত একজন পার্টি-কমরেডকে বিয়ে করা। অবিবাহিত জীবনে যৌথ-সংগ্রামের রূপটি এত জটিল হয় না। প্রতিটি মুহূর্তে পার্টির আদর্শ যেন অঙ্গুলিসংকেত করতে থাকে অদৃশ্য বাতাসে। চন্দ্রিমা শুধুমাত্র বধূ নয়, সে পার্টি-সংস্কৃতির অঙ্গ, একটি সম-তরঙ্গের মধ্যে দুটি জীবন দুজনের ব্যক্তিসত্তাকে পরস্পর পাহারা দিয়ে চলেছে। একটি তুচ্ছ ভুলও এড়িয়ে যেতে পারে না, এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই।

মনে হচ্ছে, ভুল হয়ে গেল। বুলবনের পা দুটি যেন সামান্য টলে গিয়েছে। মণির কাছে থেকে চিঠিটা ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। হেতের বলদ বাঘের মত লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেছে, কত দূর গেছে কে জানে ! তাহলে কী করতে হবে এখন ? সে কি সাইকেল তাড়িয়ে ছুটে গিয়ে দেখবে মণিকে ধরা যায় কিনা ! ভাবতে ভাবতে সময় চলে যায়। সময় বয়ে যায় ভারী স্রোতের মত। বুলবন ছাদ থেকে নেমে আসতে পারে না। কেন পারে না ? এখনও সময় ছিল। নিজেকে শুধরে নিতে পারত সে। এই চাকরির প্রস্তাবকে কেন সে যথার্থই ঘৃণা করতে পারল না ? নেতা হয়ে এ সে কী করল ?

চাকরিটা যে দরকার, মা পর্যন্ত বারংবার সেকথা স্মরণ করিয়ে চলেছেন। এমনকি

তিনি ললিতের কাছে ছেলের চাকরির প্রস্তাব করবেন বলে ভয় দেখালেন। রাহুল প্রায় স্পষ্টত চাকরির তাগাদা দিয়ে বলেছে, তাদের বিবাহিত জীবনের ভার বইবার সাধ্য এই পরিবারের নেই। ছোট ভাইয়ের মুখে এমন কথা শুনে মাথাটি ঠিক রাখা যায় না। মাথার ঠিক ছিল না বলেই এমন একখানা চিঠি সে লিখে ফেলেছে। চন্দ্রিমা, তোমার বোঝা উচিত! মনে মনে বলে ওঠে বুলবন।

কিন্তু সে নিজেও জানে, এই সব যুক্তি চন্দ্রিমার কাছে কত হাস্যকর শোনাবে! স্বামী বলে তাকে তো করুণা করবে না দোলন, প্রেমিক বলে ছেড়েও দেবে না। এখন স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও ভয় করছিল বুলবনের। সূর্যটা লাফিয়ে উঠে পড়েছে আকাশের গায়ে, ছাদটা সোনার আলোয় ভরে গিয়েছে। কোথাও একটা ঢাক বাজছে বলে মনে হচ্ছে। খল্‌সে পাড়ার পূজামণ্ডপে হতে পারে। এ যেন পতনের শব্দ। তবু হঠাৎ বুলবনের মন বলল, চাকরিটা নিতে পারলে অনেক সুবিধা হয়। 'মিরাজ' পত্রিকায় এমন একটা মিথ্যা যদি না ছাপা হত, তাহলে হিফাজত সার্টিফিকেট দেখতে চাইতেন না।

ছাদের উপর চায়ের প্লেট হাতে একলা উঠে আসে চন্দ্রিমা। তার দিকে চোখ পড়া মাত্র বুলবন দৃষ্টি বিনত করে ছাদে। ঘাড় গোঁজ করে চায়ের প্লেটের দিকে হাত বাড়ায়। চন্দ্রিমা স্নান পর্যন্ত সেরে নিয়েছে। এরই মধ্যে প্রাতঃকৃত্য, স্নান সবই সম্পন্ন হয়। কপালে গোল লাল টিপ। জ্বলজ্বল করছে। বউয়ের গায়ে পড়েছে অশেষ মহিমার মত সূর্যালোক। সৌন্দর্যে টইটই করছে দোলনের ঠোঁটের রেখা, ভেজা চুলে মিষ্ট গন্ধ আর চকচকে রুপার আলো ঢাল হয়ে নেচে উঠছে, চোখে অপূর্ব শ্রী চমকে উঠছে।

—তুমি যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—প্রাণদার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে?

—কেন হবে না?

—আচ্ছা, যদি আজ না গিয়ে কাল যাও? আকূতির মত শোনায় বুলবনের গলা।

—কেন? তোমার কী সুবিধা হয় তাতে?

—সুবিধা অসুবিধার কথা হচ্ছে না।

—এইভাবে ইনঅ্যাকটিভ হয়ে কতদিন থাকব?

—বেশ। প্রাণদাকে কী বলবে? বলে বুলবন চায়ে চুমুক দেয়।

—কী বলব মানে, তোমার কথা বোঝা গেল না। আমি তো প্রোগ্রামে যাচ্ছি! প্রাণদা কী কাজ দেবেন, পার্টি অফিসে গেলে তবে বুঝতে পারব।

—বলবে মানে, তোমার সঙ্গে কথা হবে না, যেমন আমাদের পারিবারিক অবস্থার কথা? এই ধর, চাকরির কথা বা বাবার জেল, এইসব প্রসঙ্গ।

—হতে পারে, কী বলতে হবে বলে দাও!

এই কথা বলে চন্দ্রিমা ছাদ ছেড়ে নীচে নেমে চলে আসে। এই ভোরে বাড়ির কোথাও রাহুলকে দেখতে পাওয়া যায় না। মণি চৌধুরী হাসানপুর চলে গেছে প্রাক-প্রত্যূষ-বেলায়। গরুর নাদায় ডোলে করে জল বইছে ফুলভানু, হুকুম আলি ভোরেই পটললতির ভুঁইতে দাউলি হাতে নিড়ুনি করার জন্য লুঙ্গির কোমরে পান গুঁজে আর মাথালের আকাশে বিড়ি এবং ক্ষুদ্র গোল কড়ে আঙুল প্রমাণ লাইটার গুঁজে নিয়ে চলে গেছে। এই জিনিসটা নতুন উঠেছে বাজারে— এই দিগরে। এটা ঢেঁকিকল নয়, ফায়ার ওঠে চাকার ঘষা লেগে। চকমকি হয়।

ফুলভানুকে আয়েষা নীচের রান্নাঘরে চুলায় আগুন দেবার জন্য গলা তুলে হাঁক দিলেন। উঠোনের কোণে ডালিমতলায় টিউবওয়েল, ডালিমের গা-লাগা শিউলি, মাটিতে ফুল ঝরে পড়েছে হিমে মাখা। জলের এই কলতলা ইটে বাঁধানো, পাশে চারখানি দেওয়াল তোলা ছাদবিহীন স্নানের ঘর। টিউবওয়েল থেকে জল একটি টিনের ছই করে ঢোকানোর ব্যবস্থা করেছে মণি, দেওয়ালের গায়ে ছিদ্র করে ওই টিনের ডোঙানো পাতটি ঢুকিয়ে দিয়েছে, প্রয়োজনে ওটি খুলে ফেলে বাসন মাজা, বালতি করে জল ভরে অন্যান্য কাজ চলে। যখন মেয়েরা স্নান করে তখন বাথরুমের দেওয়ালে শুকনো ভাঁজ করা শাড়ি ঝোলে, পুরুষ করলে লুঙ্গি। একটি টিনের দরজার আড়াল তোলা আছে।

আয়েষা কলতলায় বাসনগুলি নামিয়ে দিয়েছেন। নূপুর মায়ের গলা জড়িয়ে পিঠের উপর ঝুলছে, ঝুলে ঝুলে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলে মা হাতের ধাক্কা দিয়ে পিঠে সিধে করে রাখছেন। উঠোন ঝাঁট দিচ্ছেন মা পিঠ বাঁকিয়ে ঝুঁকে। মা মেয়ের এই দৃশ্য দেখে চন্দ্রিমা অন্তরে পুলক অনুভব করে। বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান বলে এই দৃশ্যটি তার অধিক মধুর মনে হয়। মা বাবার মুখ মনে পড়ে যায়। ভবানীপুরের বাড়িতে এই ধরনের মাটির উঠোন নেই, কোন ডালিম গাছও নেই। সে কি কখনও মায়ের পিঠে এমন করে চড়েছে ? সেই ধারা কোন স্মৃতিই, সেই শৈশবের, এখন মনে আসে না। তার শৈশবে এমন উঠোন তো ছিল না !

আয়েষা নীচের বারান্দায় বউমাকে দেখতে পান। একটা হালকা খয়েরি রঙের তাঁতের শাড়ি, ঘটিহাতা ব্লাউজ সাদা রঙের, পায়ে কালো ফিতের পাতলা স্যান্ডেল, পা দু'খানি ধবধব করছে, ফর্সা। আর রক্তাভায় বড়ই সুন্দর। কপালে বড় রক্তিম টিপ জ্বলজ্বল করছে। কাঁধে কাপড়ের ঝুলন্ত ব্যাগ। বাঁ হাতে কালো ফিতের ঘড়ি বাঁধা, গোল। দু'খানি হাতই চুড়িহীনা, একটা পূর্ণ বলিষ্ঠতা রেখায়িত হয়। ঘড়ির সময় বইছে নিঃশব্দে, স্রোতে কোন ধ্বনি ওঠে না, কারণ হাতে কোন অলংকার নেই, নিক্বণ নেই। এই হাতে রক্তিম অভিবাদন দৃপ্ত হলে একটা আলো খেলে ওঠে।

আয়েষা নূপুরকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সিধে হয়ে কোমর সটান করে দাঁড়ালেন।

—কোথাও যাবে বুঝি দোলা ?

—হ্যাঁ মা ! বহরমপুর যাব। কাজ আছে।

—একটু অপেক্ষা কর, আমি সেদ্ধভাত করে দিই তোমাকে, আগে কেন বললে না, বেলা চড়ে গেল ! খালি পেটে ঘরের বউ বাইরে যাবে, আমার খারাপ লাগবে।

—আমার যে দেরি করার জো নেই, পার্টি-অফিস যাব। দু' ঘণ্টা পায়ে হাঁটা পথ, বাসে দেড় ঘণ্টা। রিকশায় বিশ মিনিট। আমি অন্য কোথাও খেয়ে নেব।

—একটু তাহলে জল-খাবার করে দিই ? নাশ্‌তা !

—তাতেও দেরি হবে মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। সদর-ঘাটে পৌঁছে একটু কিছু খেয়ে নেব।

একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন আয়েষা। তারপর আঁচলের গ্রন্থি খুলতে খুলতে বারান্দার কাছে এগিয়ে উঠোন-লাগা সিঁড়ি, ছোট ছোট তিন চারটি ধাপ আছে, সেখানে এসে দাঁড়ালেন। গ্রন্থি উন্মুক্ত হলে কতকগুলি দশ পাঁচ টাকার নোট বার হয়ে এল।

আয়েষা বললেন— আতর দালাল খন্দের দাম বাবদ বিহানে দিয়ে গেল। তোমাকে দিই, এই নাও, দশটা টাকা কাছে রাখ। তোমার শ্বশুর থাকলে, তুমি আরও বেশি

পেতে। বলে হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

তারপর প্রসন্নচিত্তে বললেন— হাঁপিয়ে ধুঁকে পার্টি-পলিটিক্স করো না মা! মেয়ে তুমি, বউ, তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। হাসিনা মনসুর নামে এক কংগ্রেসী মেয়ে পলিটিক্স করত, আমার বাপের গাঁয়ে ছেলেবেলায় দেখেছি, কারে করে আসত, কী তৌফা সুন্দরী! রাজহাঁসের মত গলার ডৌল আর টোল পড়ত গালে। বক্তৃতা করতে পারত না। এর স্বামী সঙ্গে থাকত। সেই তিনিই বউয়ের হয়ে লেকচার দিতেন, ভোট চাইতেন। সঙ্গে আরও সব তুখোড় বক্তারা থাকত। তোমাদের আবার স্বামী করলে স্ত্রীর হয় না। তা, বুলবন তোমার সঙ্গে যাচ্ছে তো?

চন্দ্রিমা কিঞ্চিৎ সলজ্জ গলায় বলে— না মা! আমি একা যাব।

—সেকি! একা যাবে? মণিও নেই যে সঙ্গে দেব, সদর-ঘাট অবদি এগিয়ে দিয়ে আসবে!

—একাই পারব মা। আমাদের অনেক কাজ একা করতে হয়, আপনি ভাববেন না।

—তাহলে বুলবনই তোমায় এগিয়ে দিবে।

—না। দিনের বেলা, হাঁটতে আমার ভালই লাগবে, পথটাও চিনতে পারব।

একটা ছোট মনি-ব্যাগের ভিতর দশ টাকার নোটটি ঢুকিয়ে কাঁধের কাপড়ের থলেতে ফেলে চন্দ্রিমা তাদের শোবার ঘরে এসে ঢোকে। দেখে, বিছানার চাদরে শরীর এবং মাথা ঢেকে বুলবন শুয়ে আছে। মড়ার মত। আস্তে করে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে অত্যন্ত মৃদু ঠেলা দেয় চন্দ্রিমা।

—অ্যাই! শুনছ! আমি যাচ্ছি!

—অ্যাঁ! বলে কেমন আঁতকে ওঠে বুলবন। মাথার চাদর গলার কাছে ঠেলে টেনে নামিয়ে হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে— আচ্ছা!

পিছন থেকে আয়েষা এসে প্রশ্ন করেন— রাতে ফিরবে কী করে?

—কাল ফিরে আসব বা পরশু।

—ঠিক আছে মা, তোমাদের পার্টির কাজ আমি বুঝব না। পার যদি, শ্বশুরের কথা প্রাণকিশোরবাবুকে বলো!

—হ্যাঁ! বলে সত্বর পা বাড়িয়ে দেয় চন্দ্রিমা, নিজেকে তার হঠাৎ কেমন অসহায় মনে হয়। বুলবনের মুখটা কেমন কাতর দেখায়। সে যেন কী বলতে চাইল, পারল না। আরও কিছু কথা আয়েষা হয়ত তাকে বলতে চাইছিলেন, মা এবং পুত্রকে চন্দ্রিমা সেই সুযোগ না দিয়ে দ্রুত রাস্তায় নেমে আসে। জোর কদমে হাঁটতে শুরু করে। একটা এলোমেলো হাওয়া তার ভেজা চুলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এত পথ কখনও এভাবে হাঁটেনি চন্দ্রিমা। ছোট নদী গুমানি। নদী ছোট, কিন্তু গম্ভীর। জল অত্যন্ত, ভারি পুরুষ্ট স্রোত কেমন থমথম করছে। পথ ঠিক চেনে না সে। চেনার কথাও নয়। ভুল করে উল্টো দিকে চলে এসেছে। কানে আসে তীব্র জলস্রোতের বেগান্ধ শব্দ। একটা বাঁক পেরতেই সেই শব্দ তার কানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চন্দ্রিমা চমকে ওঠে।

কিছু দূর এগিয়েই চোখে পড়ে রুপালি জলোচ্ছ্বাস। বুকের ভেতরটা কেমন নেচে ওঠে। কোদালকাটির ওয়াটার গেটের কাছে এসে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। এত জল! দিগন্ত প্রসারিত নদীমিশ্রিত বিল। কোথায় প্রসারিত হতে হতে সীমা হারিয়ে ফেলেছে।

গুমানি নামটা শুনলেই কেমন ভয় করে। এই জলে মানুষ গুম হতে পারে। ওই দূরে জল পেরিয়ে গাঁয়ের আভাস চোখে পড়ে। জলের উপর জেলেডিঙি, ডোঙা দু' চারটি ভাসছে, তা-ও কত দূরে! হঠাৎ চোখে পড়ে নদীপাড়ের তল থেকে, গেটের বাঁধের নীচে থেকে রাহুল উঠে আসছে। বাঁধের পথে দু'চার জন মানুষ হাঁটছে মন্থর পায়ে, চাষীবাসী মানুষ। চন্দ্রিমাকে দেখে রাহুল ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়। তার দিকে চাইতে অকারণ দৃষ্টি ব্যাহত হয়, চোখ নামিয়ে নেয়। ফলে, চন্দ্রিমাও লজ্জা পায়। রাহুলের চোখে কিছু বিস্ময়-বিদ্ধ জিজ্ঞাসা খেলে গিয়েছে— বউদি এদিকে কেন?

—তুমিই বা এখানে কী করছ?

সপ্রশ্ন চেয়ে চন্দ্রিমা দুদণ্ড থেমে পড়ে। কথা বলে না। হঠাৎ-ই আবার বাঁধের নীচে বিলপাড়ের ঢালে নেমে চলে যায় রাহুল। চন্দ্রিমা মনে মনে বেশ আঘাত পায়। রাহুল তার সঙ্গে কথাও বলতে চায় না। কেমন যেন সহ্য করতেই পারছে না। চন্দ্রিমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। সদর-ঘাট কোন্ পথে যেতে পারবে নির্দেশ চাইবে মনে করেছিল। হল না। রাহুল প্রায় অসভ্যের মত নীচে নেমে গিয়েছে।

গাঁয়ের পথ নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে মিলেছে, যেখানে পৌঁছে সদর-ঘাটের রাস্তা সে বার করে নিতে পারবে ভেবে পা বাড়াতে গিয়ে একটি দৃশ্যে চন্দ্রিমার চোখ আটকে যায়। বাঁধের উপরে গলা তুলেছে কম্পমান একটি সাদা মাছ-বিদ্ধ ছিপ, ডোর টান টান। সরপুটি মনে হয়। রাহুল তবে কি মাছ ধরছে? যাই সে করুক, তার সঙ্গে কথা বলল না কেন? সাদা চৌধুরীর জেল হয়েছে বলে কি চন্দ্রিমাই দায়ী? বুলবনের চাকরি না হওয়ার জন্যও কি সে-ই দায়ী? রাহুল কি তাই মনে করে? তবে কেন কথা বলছে না? অমন করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিলপাড়ে চলে গেল কেন? আমি শহরের মেয়ে! গ্রামের পথঘাট কিছুই চিনি না, কখনও দেখিনি এমন নদী! এই পথ! অমন যে সাদা মাছটি শূন্যে ডোরে বিঁধে পাক খেয়ে গেল, তা-ও এমন জলোচ্ছ্বাসের শব্দের ভিতর; কত দূর বিস্তীর্ণ জলের পৃষ্ঠদেশ, বাঁয়ে ডাইনে, কী গম্ভীর জলের ছবি, কখনও কি দেখেছি রাহুল?

শত কষ্টের মধ্যেও এমন নদীর কাছে আসা যায়, এ অভিজ্ঞতার আনন্দ সবাই বোঝে না। আমি কাউকে বোঝাতেও চাই না। নদীর কাছে এলে মানুষের কান্নাও বুঝি পায়? নিজেরই মনের অবস্থার কথা ভেবে বড়ই আশ্চর্য হয়ে যায় চন্দ্রিমা। নদীর কাছে এসে তার যে কান্না পেয়ে যাবে এ কথা এতই গোপন যে, কোন পার্টি কমরেডকে বললে সে নির্ঘাত হেসে ফেলবে। ভাববে এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কোন বুর্জোয়া ভাবালুতা! এই সমাজের গর্ভে আমার জন্ম, তাহলে এমন কষ্ট কি হতে নেই? নদী কি কেবল কাব্য আর দুর্গতি এবং শস্যের, মাছের বিষয়? নদীই যে সভ্যতা, কেন কান্না পাবে না তবে? তবু লজ্জা করছিল চন্দ্রিমার। দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে যেতে মন চাইছিল।

দশটি টাকা হাত পেতে নেওয়ার সময় কী সংকোচ হচ্ছিল মনের ভিতর, অথচ সে শাশুড়িকে 'না' করতেও পারল না। যখন বাবা বা মা দিতেন, তখন তো এমন হত না! বরং সে জোর করে আদায় করে নিয়েছে হাতখরচের টাকা। টাকা যখন শাশুড়ি আঁচল খুলে দিচ্ছেনই কেনই বা নেব না, একথা ভাববার সাহস এবং লোভ তার নেই। অথচ এমন নির্লোভ থাকতে হলে, বুলবনের চাকুরিটার সত্যিই বড় দরকার ছিল! কিন্তু চাকরির জন্য যা বুলবন করতে চলেছে, তাই যদি ঘটে যায়, এত দুঃসহ অপমানের ভিতর দিয়েই যদি নির্লোভ থাকার মর্যাদা জীবনের কাছে থেকে আদায় করতে হয়, তাহলে আর যাই হোক, এই জীবন বিপ্লবের যোগ্য নয় কিছুতেই। নদীর কাছে এসে কান্না ভাল,

হিফাজতের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি ভাল নয়। ম্যারেজ-সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরি চাওয়া কান্নার চেয়েও অপমান! বুলবন কেন এ-কথা বুঝতে চাইল না? এভাবেই যদি পতিত হতে হয়, তা হলে আর কেন, এখানেই তাদের সম্পর্কে ছেদ ঘটা উচিত।

ভাবতে ভাবতে মনে মনে কঠিন হয়ে উঠল চন্দ্রিমা। পা বাড়াল সামনের দিকে। একাই আমাকে যেতে হবে, রাহুল আমাকে পথ না দেখালেও যেতে হবে। রাহুল আমার গাইড নয়। যদি বুলবন ভুল করে, তবে এই তরুণ নেতাটিও আমার কেউ নয়। এমন একটা চাকুরির জন্য যদি এমনই হয়, তাহলে চৌধুরী ফ্যামিলির সঙ্গে সম্পর্কের এখানেই ইতি। বিদায় বুলবন, হয়ত আমি আর ফিরব না! মনে মনে একথা বলা দূরে থাক, ভাবনার শব্দেই চন্দ্রিমা চমকে উঠল। তারপর সে বিড়বিড় করে উঠল, তবু এইই সত্য যেদিন বুলবন এই চাকুরির নিয়োগপত্র হাতে পাবে, সেই দিনই বুলবনের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে। যাবে না কি?

কী হবে, তখন কী হবে? একথা ভাবতে ভয় কি করে না? নদীর স্রোতকে কি মনে হয় না, কান্নার প্রবাহ? গুমরানো গম্ভীর নদীর উচ্ছ্বাস কী করুণ লাগে মুহূর্তে! স্লুইস গেটের জলের উদ্দাম দেওয়াল যেন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে থামের মত ভেঙে পড়ছে।

চন্দ্রিমা ক'ধাপ এগিয়ে বুঝতে পারে, পথটি অর্ধাকৃতি চাঁদের মত গোল হয়েছে স্লুইস ওয়াটার গেটকে ঘিরে। যে-পথে সে এসেছিল যেদিক থেকে, সেই পথ সেইদিকেই চলেছে, আর একটি পথ সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলে গেছে, মনে হল ওদিকে নিশ্চয় আরও অজ দূরবর্তী গ্রাম, বিল, নদী এবং অন্য মোহনা। অতএব সদর-ঘাট নিশ্চয়ই এই পথেই হবে। ঘাড়, নীচু করে হাঁটতে থাকে চন্দ্রিমা। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পায়— বউদি! থেমে ঘুরে দাঁড়ায় সে। দেখে, একটি বছর পনর-ষোলর কিশোর পিছন থেকে এগিয়ে আসছে।

—কে তুমি ভাই!

—আমি সোনাই। নাটা তরফদার আমার মামা। মাছ ধরছিলাম ওখানে। রাহুল ভাই আছে। আপনাকে পথ দেখিয়ে দিতে বলল। আপনি বাড়ি যাবেন?

—না।

—সদরঘাট তাহলে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, এই পথ ধরে সিধে কদমতলায় উঠবেন। চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি মোহরের ভাই। মোহরকে আপনি দেখেছেন!

—হ্যাঁ, একটুখানি।

—মণি আমার বন্ধু!

—অ। তাই নাকি?

—আপনি জানেন না? ও আপনাকে বলেনি? ওই যে দেখছেন ডাইনের সড়ক, ওদিকে গেলে আবার মোহড়াঘাটের দিকে চলে যাবেন। ডাইনের উঁচা ডিহির উপর গৌর ঘোষের ভিটে, সোজা যাবেন।

—ঠিক আছে, তুমি ফিরে যাও, আমি এবার যেতে পারব!

—পারবেন?

—কেন পারব না?

—রাহুল ভাই কিন্তু আপনাকে সদরঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বলেছে! বললে, পৌঁছে

দিয়ে আয়। এখনই ফিরে গেলে, আমাকে ধমক দেবে, ওর টেম্পার খারাপ। মাছ ধরা আমার বাতিক, বুঝলেন ! অবশ্য রাহুল ভাইয়ের হাত খুব পাকা।

—কোন্ ক্লাসে পড় ?

—সামনে নভেম্বরে আমার পরীক্ষা। নাইন। মণি পরীক্ষা দিল না, টেনে উঠে যেত।

—তুমি ওকে বল !

—বলেছি, শুনবে না।

পথ হাঁটতে হাঁটতে এই সব সংলাপ হতে থাকে। হঠাৎ সোনাই বলে ফেলে অদ্ভুত স্বরে— মণি যাত্রাদল করবে বলেছে আপনাকে ?

—হ্যাঁ।

—মণি কিন্তু নকশাল, জানেন ?

—নকশাল ? এখানে নকশাল কোথায় ? কী বলছ ? বলে চন্দ্রিমা হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ে। সহসা সোনাই কেমন থতমত ভঙ্গিতে আশ্চর্য উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে— না, মানে ! মণি রেগে গেলে বলে ও রকম।

—তাই বল ! তোমরা বুঝি ওই রকম চিন্তা কর ? নকশাল দেখেছ কখনও ?

—না। একদম না। মণি বলেছে, আছে ! তাই নাকি বাবুকে ধরেছে **পুলিশ** ! আপনিও তো পার্টি করেন, আপনি জানেন না ?

পথের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীর স্বরে চন্দ্রিমা বলে ওঠে— না ! তারপর অসহায়ভাবে হেসে ফেলে সে। অত্যন্ত মিষ্টি চেহারার, মোহরের সঙ্গে আদলে মিল আছে এমন সিধে স্বভাবের সোনাইকে চন্দ্রিমার অত্যন্ত ভাল লাগছিল। ভাবছিল, মণি আর সোনাইয়ের চর্চার বিষয় কী সাংঘাতিক ! কিশোর বটে, কিন্তু ওদের মনেও তো নানাখানা হয়ে ফুটে উঠছে এই দেশ, সময় এবং রাজনীতি।

—এই সব কথা বলাবলি করছ। ঠিক নয় সোনাই !

চন্দ্রিমার গাম্ভীর্যে ভয় পেয়েছিল, চন্দ্রিমার কণ্ঠে স্নেহের ছোঁয়া দেখে সোনাই সাহসভরে বলল— আমিও তাই বলি বউদি ! আমি বলি নেই। মণি বলে আছে। ও নাকি দেখেছে ! কোথায়, দেখাও ! তা কিন্তু পারে না, বুঝলেন ! বলে কি জানেন, আমার পেটে নাকি কথা থাকে না। এই সব কথা কি রাখা যায়, বলুন ! মণি একজন লিডারকে দেখেছে, তা-ও বলে। বাপুর জন্যে কাঁদে !

—সোনাই, তুমি এখন ফিরে যাও। যা তোমরা জানো না, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবে না।

—আপনাকে বলতাম না, আপনি পলিটিক্স করেন বলেই বলে ফেলেছি !

—আমি নতুন মানুষ !

—আপনি মণির বউদি ! মণি বলেছে, আপনি যদি বাবুকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে সে আপনার দলই করবে। আমি বলেছি, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভাবা যেতে পারে !

—তুমিও করবে ?

—হ্যাঁ। সাদা চৌধুরীর জন্য সবারই কষ্ট। মণি কাঁদলে আমার ভাল লাগে না !

—স্বাভাবিক। তুমি তাহলে যাও এখন ! তুমি জানো, মিসা কাকে বলে ?

—আমাদের জানার দরকার নেই।. পেটো ঝাড়লে সব ঠিক হয়ে যায়।

—হয় না সোনাই হয় না। যাও ! বলে স্বর কঠিন করে তোলে চন্দ্রিমা।

—ঠিক আছে ! বলে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাজা ঝকঝকে কিশোরটি আকস্মিক ঘুরে যায় ওদিকে, পিছনে— তারপর দৌড় দিয়ে অসম্ভব ছুটতে শুরু করে জলোচ্ছ্বাসের দিকে। একটি বিদ্যুৎ যেন ছুটে চলে যায়, অদ্ভুত ঘোর ঘিরে ধরে চন্দ্রিমার দৃষ্টিকে।

চন্দ্রিমা অনেকক্ষণ নিষ্পলক সোনাইয়ের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল। তার রাজনৈতিক অহঙ্কারকে ওই কিশোরটি যেন এতক্ষণ দলিত করছিল পাগলের মত। এ অভিজ্ঞতা তার কাছে আশ্চর্যের, তার জ্যাঠতুতো ভাই মন্মথ ওই পেটো মারতে গিয়েই শেষ হয়ে গেছে, কোথায় মরেছে, তা-ও সঠিক শনাক্ত হয়নি, ওদের কলেজ-হস্টেল 'রেড' হয়েছিল, মরার সময় তার বন্ধুরাও কেউ সঙ্গে ছিল না। অনার্সে পার্ট টু পরীক্ষায় নিশ্চয়ই দারুণ রেজাল্ট করত, পার্ট-ওয়ানে বিস্ময়কর নম্বর পেয়েছিল। জ্যাঠা জ্যেঠি তো এখন পাগল। ওঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও ভয়ানক কষ্ট হয়। জ্যাঠা প্রলাপ বকেন— পলিটিক্স ইজ এ ট্র্যাপ। ইডিওলজিক্যাল ট্র্যাপ। হিংসার সুতো দিয়ে বোনা হয় ওই ফাঁদটা। মন্মথ যদি ফিরে আসে, নিশ্চয় বলব তাকে একথা ! তবে ফাঁদটা কে পাতে বোঝা যায় না ! বুঝতে পারিস দোলন !

ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠল চন্দ্রিমা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পথ হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ সেদিন রাত্রের দৃশ্যটা মনে পড়ল তার। শরম আলি যে রাতে মণিকে 'পাগলা' বলেছিল। মণি ক্রোধে, অপমানে কুঁকড়ে নিজেরই হাত কামড়াচ্ছিল। অসুস্থ হয়ে পড়েছে মণি। চন্দ্রিমা তাকে হাত-পাখার বাতাস দিতে চাইলে, মণি হাত ছুঁড়ে প্রচণ্ড বাধা দেয়। তার হাওয়াটুকুও যেন মণি গায়ে লাগাতে চায় না ! মণি কেন অমন করেছিল সেই রাতে ? এখন, এই মুহূর্তে মণি যেন আবার তাকে অস্বীকার করে অদৃশ্যভাবে— হাত ছুঁড়ে পাখার উপর আঘাত করে। বারবার আঘাত করে মণি।

ফাঁদ কে পাতে ? সাদা চৌধুরীর ফাঁদটা কে পেতেছে অমন করে ? সাদা মানে তো সিধে। সাদা মানে শুভ্রতা, তাকে কেই বা রক্তাক্ত করে তুলল ! সত্য ? তিনি যে সত্য বলতে চাইলেন একদিন। কেন চাইলেন ?

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রিমার মাথাটা কেমন নুয়ে পড়ে। তার স্বামীর ইজ্জৎকে মারবার জন্যও তো ফাঁদ পেতেছে মানুষ। এসো, চাকরি দেব— সেটাকেও এখন ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই মনে হল না চন্দ্রিমার। সে এবার হঠাৎ দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

সদর-ঘাটে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে বাস পেল বটে, কিন্তু যা ভিড় ! বাসের মধ্যে গলবার উপায় নেই।

পার্টি-অফিস পৌঁছতে এগারোটা বেজে যায়। সোনাপট্টির তেমাথায় রিকশা থেকে নেমে চন্দ্রিমা তিন মিনিট হাঁটে। অত্যন্ত সংকীর্ণ গলি দিয়ে ঢুকতে হয়, তারপর খাড়া ছোট ছোট ধাপের সিঁড়ি। বেশি দীর্ঘ নয়, তাই বাঁচোয়া, হাঁফের রুগীর পক্ষে এইটুকু ভাঙাই কষ্টকর, সেক্রেটারি প্রাণকিশোরের হাঁপানি আছে। ছ' ফুট দীর্ঘ, দোহারা স্বাস্থ্যের ভরাট মিষ্ট চেহারার মানুষ তিনি। কিঞ্চিৎ তোতলা, মাঝে মাঝে কথা জড়িয়ে যায়, তিনি এক আশ্চর্য শিশুর মত সরল। কিন্তু ব্যক্তিত্ব মোহময়। অ্যাকাডেমিক শিক্ষা তাঁর উল্লেখ করার মত নয়, তাঁর পেশা বলে একটা জিনিস আছে বটে, সোনার কাজ। গভীর রাতে রাত জেগে সেই কাজ তাঁকে করতে হয়। তাঁর একই ধরনের পোশাক-পরিধেয়। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, মচমচ করা কালো জুতো। বয়েস পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। চুয়ান্ন পঞ্চান্নও হতে পারে।

এদিকটায় ছাদ, ওদিকে সংকীর্ণ রেলিঙ ধরে এগিয়ে বাঁহাতি একটা ঘর, এখানেই সাধারণ মিটিংগুলো হয়। গোল অর্ধচন্দ্রাকার রেলিঙ চলে গেছে বেঁকে ঘুরে, আরও একটি ঘর, তালাবন্ধ, কাগজপত্রে, বই-পুস্তিকায় ঠাসা। রেলিঙ চলে গেছে পশ্চিমমুখো, একটি দরজা পড়ে, তারপর একটি লম্বা, এবং অনধিক চওড়া ঘর, এখানে ছাত্র-নেতা ছাত্রদের নিয়ে বসেন। আরও পশ্চিমে আবার দরজা, ঢুকে এলে বড় আকারের একখানা ঘর, দুই প্রান্তে দেওয়াল-ঘেঁষে একটি বড় এবং একটি ছোট সাধারণ মানের খাট আছে, পুরনো। বিছানা পাতা। কাঠের আলমারি আছে একটি বড়, অন্যটি খাটো। কাচ বসানো পাল্লা। বই ভর্তি। পার্টি-লিটারেচার এবং মার্ক্স, এঙ্গেলস, স্তালিন মাও-সে-তুং। লেনিন। মাও-সে-তুঙের রচনার সংখ্যা খুবই সামান্য। একখানা বই আছে মাত্র। মলাটের রঙ লাল নয়। দেওয়ালে বড় ঘরটিতে দুজন পার্টি নেতার ফটো ছাড়া স্তালিন, লেনিন এবং মার্ক্সের ফটো আছে। ছাত্রদের ঘরে আছে খুদিরাম শরৎচন্দ্র এবং লেনিনের ছবি।

চন্দ্রিমা প্রথম ঘরটির কাছে এসে দাঁড়ায়। এই ঘরটিতে কমরেড জি. এস অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারি তথা পার্টির সর্বোচ্চ নেতার একখানি ফটো, তাও ছোট ফ্রেমের— এ ছাড়া আর কোন কিছু ছিল না, সম্প্রতি মা-ও-সে-তুঙের রঙিন একখানা ছবি, ছোট ফ্রেমে বাঁধান হয়েছে। ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পায় না চন্দ্রিমা। ফটোর উপর চোখ পড়ে।

কমরেড জি. এস. এবং মাও-সে-তুং। দু জনের মুখের আদলে আশ্চর্য মিল আছে। মাথার টাক একই ধরনের, সামান্য চুলের যত্ন করে পিছনে টেনে আঁচড়ানো মসৃণতা। কমরেড জি. এস. ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, মাও কালার্ড। মাও-এর চোখ সন্নিকটবর্তী, জি এস.-এর চক্ষুদুটি দূরাভিসারী। মাও হাস্যময়, জি. এস. ক্ষীণভাবে বিষণ্ণ, গম্ভীর.। কিন্তু চোখে স্বপ্নের দৃপ্ত নিবিড়তা। তবু এই বিষণ্ণতা কেন ?

কেউ নেই অফিসে। অফিসের চার্জে থাকে যে চৈতন্য, তারও দেখা নেই। চন্দ্রিমা বেঞ্চের উপর বসতে যাবে এমন সময় আশ্চর্য হয়ে দুয়ারে প্রাণদার ছায়া পড়তে দেখে আর বসতে পারে না, উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—তুমি এসেছ, খুব ভাল হয়েছে ! বস, বস ! ভেরি গুড আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

ছোট টেবিলটার ওপাশে চেয়ারটায় বসে পড়েন সেক্রেটারি। বেঞ্চটা তাঁর কাছাকাছি একটি প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। ইশারায় কাছাকাছি সরে আসতে বলেন প্রাণকিশোর।

—প্রোগ্রামের কথা পরে তোমাকে বলছি ! বলে প্রাণকিশোর এক মিনিট চোখ বন্ধ করে কী যেন ভেবে নিতে থাকেন। চশমাটা টেবিলে শুইয়ে রেখেছেন। মাথার চুলে পিছনে টেনে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলেন— খবর কিছুটা পেয়েছি চন্দ্রিমা, তোমার শ্বশুর মশাইয়ের ! ভাল নয়।

—কী হয়েছে ! প্রবল শঙ্কায় চন্দ্রিমার বুকের ভিতরটা গুরু গুরু করে ওঠে। চোখ খোলেন প্রাণকিশোর। কিছুক্ষণ দম ধরে অর্থহীন চন্দ্রিমার মুখের দিকে নিস্পলক চেয়ে থাকেন। তারপর হেসে ফেলেন। নিঃশব্দে।

তারপর শান্তস্বরে বলেন— দমদম এবং প্রেসিডেন্সি জেলে দু' দুবার পাগলী হয়েছে। ডি. এম. আমাকে বললেন। কড়া সার্কুলার এসেছে বহরমপুর জেলে। যদিও এই জেলে কখনও পাগলী হয়নি। কিন্তু এই ডি. এম কে আমি বিশ্বাস করি না।

—পাগলী ?

—হ্যাঁ, চন্দ্রিমা ! কিছু কয়েদী এসকেপ করার চেষ্টা করেছিল ! পাগলাঘন্টি বেজেছে। কোথাও পাগলী হলে অন্য জেলগুলিও সতর্ক হয়ে যায়। এই জেলে চারটা ডিভিসন, বিচ্ছিন্ন, সেপারেট। বড় কোন নেতাও এখন এখানে বন্দী নেই। এসকেপ হবে না। সেকথা ওই ডি. এম-ই বলল। বলে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রাণকিশোর।

॥ ৯ ॥

চন্দ্রিমা গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে জেলা সম্পাদকের মুখের দিকে চেয়ে ছিল, তার পলক পড়ছিল না। শ্বশুর মশাইয়ের কী হয়েছে কে জানে, প্রাণদা কি সাংঘাতিক কিছু বলতে চাইছেন !

প্রাণকিশোর ফের কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলেন। তারপর চোখ খুললেন। বললেন—নানাভাবে চেষ্টা করে অবশেষে কিছুটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি চন্দ্রিমা। একটা ইন্টারভিউ যাতে করে হয়, তোমাতে আমাতে যাব—আমাদের উকিল-কমরেড সুশান্তকে পাঠিয়েছিলাম, ডেপুটি জেল-সুপার ওর ক্লাসমেট, কথা দিয়েছে, আজ আমরা চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারব। এমনিতে সপ্তায় যে একদিন ইন্টারভিউ ডেট থাকে, সেটা বন্ধ করে দিয়েছে জেলের কর্তারা। তুমি তোমার শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করছ, তাতে করে কাজটা ভাল হবে। সেই কারণে আমি তোমার কথা ভেবেছি।

—কখন যাব আমরা ?বলতে গিয়ে চন্দ্রিমার গলা সহসা অসম্ভব কেঁপে উঠল।

—এখনই যাব, দেরি করব না। প্রথমেই তোমায় বলে রাখছি, শ্বশুরের সামনে কোন ধরনের উত্তেজিত হবে না, শান্ত থাকবে, পার্টি-কমরেড হিসেবে এটাও তোমার একটা পরীক্ষা ! বাড়ি ফিরে গিয়ে সকলের সঙ্গে খুব ভেবেচিন্তে কথা বলবে। তুমি আমাদের অত্যন্ত ডি-ডি-ডিপেন্ডবল কমরেড ! চৌধুরী ফ্যামিলিতে অত্যন্ত অশান্তি হচ্ছে জানি, ঝড় বইছে, আর সেটাই স্বাভাবিক।

বলে আবার থেমে পড়লেন প্রাণকিশোর। চন্দ্রিমা হঠাৎ কেমন ঈষৎ কাতর-কণ্ঠে বলল—আমি কী করব প্রাণকিশোরদা !

কণ্ঠস্বর শুনে প্রাণকিশোর চকিতে কেমন একটু বিহ্বল হয়ে চন্দ্রিমার মুখের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন। চন্দ্রিমার এই কণ্ঠস্বর তাঁকে মুহূর্তে বিষণ্ণ করে তুলল। চোখ দু'টি তাঁর সরু হয়ে গেল দণ্ড দুই চার, তারপর নিজেকে সিধে করে চেয়ারে নড়ে বসলেন তিনি। বিষণ্ণতা চোখ থেকে ঝেড়ে ফেললেন, যেমন করে পাখি তার ডানা থেকে মৃদু ঝাপটায় বর্ষার কষাটে জল ফেলে দিয়ে পরিচ্ছন্ন হতে চায় সেইরকম।

বললেন—সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে তুমি, সমস্তই সামাল দিতে হবে, ভেঙে পড়লে তো চলবে না। চল আমরা একটা রিকশা করে নি। যেতে যেতে কথা হবে।

রিকশায় উঠতে গিয়ে জুতো-পরা পাখানি রিকশার পাদানি থেকে নামিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশের পান-অলার দোকানের দিকে চেয়ে দেখে প্রাণকিশোর বললেন—আমি একটা পান খাব। তুমি খাবে ? আচ্ছা, তুমি তো কিছুই খাওনি বোধ হয়। একটু সন্দেশ খাবে ?

—না।

—তবে কী খাবে, একটা অন্তত কিছু...জেলের ওখান থেকে ফিরে এসে তুমি আমার

বাড়িতে দুপুরে ভাত খাবে।

—তাই খাব। এখন কিছুই খাব না। আপনি পান নিয়ে চলুন। বলে চন্দ্রিমা রিকশায় উঠে বসে পড়ল চট করে মুহূর্তে। প্রাণকিশোর একটু নিঃশব্দে হেসে পানের দোকানের সামনে এগিয়ে গেলেন। পানের খিলি তৈরি হয়ে হাতে আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন আর ভাবতে থাকলেন, কী কথা কেমন করে বললে মেয়েটি মনে জোর পায়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যে কঠিন, তা তিনি নিজেও যথেষ্টই বুঝতে পারছেন। কী অবস্থায় সাদা চৌধুরীকে তাঁরা দেখতে পাবেন জানা নেই, মেয়েটির মনে সেই দৃশ্যের যে কী প্রতিক্রিয়া হবে তাই বা কে জানে! প্রাণকিশোর কথা খুব সাজিয়ে বলতে পারেন না। ঝটিতি একটা কথাকে তিনি মনের অনুভূতি দিয়ে সুন্দর সুচারু করে গঠন করতে পারেন না, এসব পারে আদিত্য সিংহ। রঘুনাথগঞ্জের একটি কর্মী বৈঠকে গেছে সে গত পরশু, ওর এলাকা, আজ ভোরে ওর ফেরার কথা ছিল, কেন ফিরল না বোঝা যাচ্ছে না। ও থাকলে চন্দ্রিমাকে নানাভাবে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলতে পারত। এই রকম শিক্ষিত, নানা রকম পুস্তক-পড়া কর্মী সংগঠক কমরেডদের সামনে অনেক সময় প্রাণকিশোর অসহায় বোধ করেন। আদিত্য এক্ষেত্রে উপযুক্ত। কিছুদিন আগে, আদিত্য দু'জন উগ্র নকশাল কর্মীকে পর্যন্ত বশ করে ফেলেছে। যাকে বলে, একেবারে 'যাদুকরী' ক্ষমতা! সে নেই, সত্যিই অসহায় লাগে এক লহমা।

পান মুখে পুরে প্রাণকিশোর রিকশার কাছে ফিরে আসেন। হঠাৎ দেখেন, একটা রিকশা এসে সামনে দাঁড়াল, তার থেকে ঝাঁপিয়ে নামল আদিত্য, হাতে ওর একটা ভি. আই. পি. ব্যাগ। কালো ফুলপ্যান্ট, সাদা ফুলশার্ট, গলায় নেকটাই। বিদ্যুতের মত ঝলসাচ্ছে চোখ মুখ, জ্ঞানের পরিমিত তীক্ষ্ণ ব্যবহারে অসম্ভব পারঙ্গম এই তরুণ নেতাটি শাণিত অস্ত্রের মত চকচকে, অথচ স্বভাবটি ভারি মিষ্ট, কণ্ঠস্বর নাটকীয় কিন্তু সংযত। আসলে আদিত্য এক রাজপুত পরিবারের ছেলে, বহুকাল তার পিতৃপুরুষ বাংলায় বসত করেছে, ফলে সে পুরো বাঙালি হয়ে গেছে, ওর বাংলাভাষা ষোলআনা বাঙালির মত, সমস্ত কেতাও তাই।

—আরে! আপনিও রয়েছেন দেখছি, বুনবন কোথায়? আসেনি? প্রাণদা, বৈঠক খুব সাকসেসফুল! শরৎ সেন্টিনারি প্রোগ্রাম এই জেলায় একটা হ্যায়ক সাড়া ফেলে দেবে মনে হচ্ছে! আই অ্যাম শিওর! আপনি দেখবেন! তা, এখন কোথায় যাচ্ছেন দু'জনে?

—জেলে যাচ্ছি!

—জেলে যাচ্ছেন? তার মানে! আদিত্য ক্ষীণ শঙ্কায় সহাস্য উদ্বেগ প্রকাশ করে।

এবার প্রাণকিশোর হা হা করে হেসে ফেললেন। চন্দ্রিমাও কষ্টের মধ্যে না হেসে পারল না। তারপর প্রাণকিশোর যথেষ্ট গম্ভীর এবং বিষণ্ন হয়ে গেলেন।

—চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার! জেলের ভিতরে মাঝে মাঝেই মারপিট হচ্ছে শুনেছি। যাকে তুমি বল, ক্রিম অফ দি সোসাইটি, অথচ মিসগাইডেড সেই সব সোনার ছেলেরা কী দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছে ভাবা যায় না। এই জেলে বেলডাঙার আধমরা ছাগলের মাংস দেয়, রবাট। খেতে দেয় না। ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী পর্যন্ত ঢুকিয়ে ডি এম. মারধর করাচ্ছে। শোনা কথা। অবিশ্বাস করি না। জেল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। কারা মারছে, পুলিসের ইনফর্মার কারা সব খবর পাই আদিত্য। দুঃখ লাগে, সাদা চৌধুরীর মত একজন সৎ মুরুব্বি মানুষকে ললিতের পার্টি জেলে ঢুকিয়ে দিল!

প্রাণকিশোর খানিক স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বাকি দু'জনও নিস্তব্ধ। হঠাৎ প্রাণকিশোরই

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—আর একখানা রিকশা নিয়ে তুমিও সঙ্গে চল, ঠিক আছে তুমি এই রিকশায় ওঠো, আমি দেখছি !

বলে দ্রুত প্রাণকিশোর আর একখানা রিকশার জন্য সামনের দিকে ক'এক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

এই তরুণ তপ্ত আশ্চর্য উজ্জ্বল নেতাটির সান্নিধ্য চন্দ্রিমার অত্যন্ত ভাল লাগে। চোখ দু'টি মেধার আলোয় সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে, দেখায় আত্মমগ্ন, কিন্তু সবদিকে সতর্ক চোখ থাকে, ঠোঁট দু'টি সর্বক্ষণ হাসিমাখা, প্রসন্ন নির্লোভি, হাসি যখন বেজে ওঠে, স্বরে রয়েছে মধুর মাদকতা—আদলে কোথায় যেন রাহুলের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছিল চন্দ্রিমা। অবাক হচ্ছিল নিজেও খুব। এভাবে মিল আবিষ্কার করা যথার্থ না-ও হতে পারে। বরং রাহুল কিছুটা অধিক গম্ভীর। কিন্তু কণ্ঠস্বর এবং হাবেভাবেও কিসের যেন একটা ঐক্য আছে। আদিত্য রাহুলের তুলনায় অন্তত বারো-চৌদ্দর মত বয়েসে বড় হবে। বুলবনের চেয়েও বয়স্ক। অন্তত সাত-আট বছরের মত অনুমান হয়। আবার মনে হয় এত তফাত না-ও হতে পারে। আদিত্যর তারুণ্য, দৃঢ়তা, সপ্রতিভতা তার কারণ বলেও মনে হয়। আদিত্যকে তার বয়স কত জিজ্ঞাসা করতে চন্দ্রিমার লজ্জা করে। সুন্দর মানুষদের বয়স জানতে চাওয়া কেন যে সংকোচের বলা যায় না, একজন সুন্দরী মেয়ে কেনই বা জানতে চাইবে। তা ছাড়া, পার্টিতে তারুণ্য জিনিসটা অন্য এক মাত্রায় প্রতিভাত হয়, ব্যঞ্জনায় ধরা হয়, বয়সের মাপে তারুণ্যের বিচার যেন স্থূল ব্যাপার।

এই পার্টিতে বয়স্ক প্রায় প্রবীণের সঙ্গে সদ্য যৌবন-প্রাপ্ত মেয়ের প্রেমের স্বীকৃত ঘটনার কথা চন্দ্রিমার জানা আছে। কৃষ্ণদা এবং ললিতার কথা বলা যায়। ওদের ক্ষেত্রে মনের বয়েসটাই আসল। কৃষ্ণ যেন তারুণ্যে টগবগ করছেন। হঠাৎ এসব ভাবনার মানে খুঁজে পেল না চন্দ্রিমা। কেবল আদিত্যর চোখেমুখে রাহুলের আদল উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

—আচ্ছা, কমরেড সিন্‌হা, আপনি কখনও রাহুলকে দেখেছেন ?

—রাহুল ? কে রাহুল ? আমাদের কোন কর্মী ?

—না। তাহলে ওকে আপনি দেখেননি। আমার দেবর। কলেজে পড়ে। অত্যন্ত রাশভারি ছেলে। এখন ওইই তো বাড়ির গার্জেন।

এক রিকশায় এরা দু'জন, আদিত্য আর চন্দ্রিমা। সামনের চলমান রিকশায় প্রাণকিশোর একা। এরা দু'জন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। এদের রিকশার চালক বুড়ো মানুষ, ধীর গতির বার্দ্ধক্য যেন চলতেই চাইছে না। আদিত্য এই মন্থরতায় মনে মনে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে বলল—আমাদের লোক সামনে চলে গিয়েছেন, একটু জোরে দাদু !

চালক কোন সাড়া না দিয়ে, যেমন চলছিল সেই একই স্থির গতিতে চালাতে থাকে। বার্দ্ধক্য কিছুতেই বিচলিত হয় না, যতই মারো কাটো, সে অবিচল, সুকঠিন ধৈর্যে অটল, কারণ তার কোন উপায় নেই। বৃদ্ধের এই নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে আদিত্য আর কোন কথা বলল না, তার নিজের দৃঢ় থুতনিতে সে একবার হাত বুলিয়ে চেপে ধরল আপন হাতের আলগা মুঠোয় এবং ঘাড় ঘুরিয়ে চন্দ্রিমাকে প্রশ্ন করল—গার্জেন কি রকম ! বলে সে রাস্তার পাশের দেওয়াল লিখনের দিকে চোখ রাখে। নতুন ওয়ালিং নয়। 'প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচি সফল করুন।' 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য জিন্দাবাদ।' আরও একটি অদ্ভুত দেওয়াল-লিখন চোখে পড়ে বিপরীত দিকের দেওয়ালে। 'জেলখানা বধ্যভূমি, একঝাঁক গুলির সামনেই একজন কমিউনিস্টের সত্যিকারের পরীক্ষা হয়।' তারপরই রিকশা বাঁক নিতেই চোখে পড়ে, ছন্দ মেলানো দু'টি লাইন।

শুধু জেনো একদিন গুদোমের গর্ভ অন্ধকারে
আদমসুমারী মোর শেষ হবে বেদম প্রহারে ॥

সেদিকে চোখ পড়ে চন্দ্রিমারও। তার হৃদয় বুকের ভিতর ছলাৎ করে লাফিয়ে ওঠে একবার। শরীরটা হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য যেন হিম হয়ে আসে। চন্দ্রিমা অনুচ্চ একটু ভেজা গলায় বলে—আসলে শ্বশুর মশাই নেই কি না, তাই। কথাটি আর সে গুছিয়ে বলতে পারে না। কেমন এলিয়ে যায়।

চন্দ্রিমা বলে—এরা তো সব ছেলে মানুষ ! আমার ছোট দেবরটি কী বলে জানেন, ভেবো না বউদি, আমি তো রয়েছি, আমি তোমাদের খাওয়াব পরাবো ! মণিকে দেখেছেন আপনি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার দেখেছি কোথায় যেন। বোধহয় পার্টি অফিসেই বুলবনের কাছে এসেছিল বা মিটিংে কোথাও ! পাগল ছেলেটি ভারি চমৎকার, কথায় কথায় সাদা দাঁত বার করে হাসে !

—আপনিও পাগল বলছেন !

চন্দ্রিমা কেমন এক গভীর ব্যথাহত অথচ খাদের শান্ত স্বরে বলে ওঠে।

আদিত্য লজ্জিত স্বরে বলে—দুঃখিত, আমি বোধহয় ভুল করলাম !

চন্দ্রিমা বলল—মণিকে পাগল বললে শাশুড়ি-মা খুব রাগ করেন, রাহুল সহ্য করতে পারে না। আপনি যদি আদর করেও ডাকেন, তবু। কোনভাবেই ওকে পাগল বলা যাবে না। অথচ সবাই ওকে পাগল বলতে চায়। শরম আলি বলে একজন, ললিতমোহনের বডিগার্ড, এক রাতে সেদিন মণিকে 'পাগলা' বলে ডেকে উত্তেজিত করে, তারপর বেচারি ক্রোধে অসহায়তায় সত্যিই পাগল হয়ে গেল। নিজেরই হাত কামড়াতে লাগল, প্রায় চেতনা হারিয়ে ফেলল।

—স্ট্রেঞ্জ !

—হ্যাঁ। অথচ বাড়িতে মণিই একমাত্র খাটিয়ে ছেলে, দম ফেলে না, দিনরাত চরকির মত কাজ করে চলেছে। চাষবাস দেখাশুনা, সংসারের খুঁটিনাটি, সব ওরই সাহায্যে চলছে। অবশ্য ওই সব কাজ সে ভালও বাসে। পড়াশুনা পছন্দ করে না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমরা তো ওর উপরই আছি, খাচ্ছি দাচ্ছি ! ও আমাকে আশ্বাস দিয়েছে। আমাদের দু'জনের তো কোন রোজগার নেই।

চন্দ্রিমার কথা শুনতে শুনতে আদিত্য বেশ অসোয়াস্তিতে পড়ে যায়। কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলে—আমার খুব খারাপ লাগছে কমরেড !

—আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনি তো জেনে বুঝে বলেননি, মণির স্বভাবে সত্যিই একটা সুন্দর পাগলামি আছে, ওর হাসিটাই ওর পাগলামির লক্ষণ ! তা মণিই বা কী করবে !

—আচ্ছা, বুলবনের চাকরির কী হল তাহলে !

চন্দ্রিমা এবার কিছুক্ষণ অদ্ভুত রকমের নিশ্চুপ হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠে বলে—হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করলে চাকরি কী করে হবে বলুন ! স্কুল কমিটি বুলবনের কাছে ম্যারেজ-সার্টিফিকেট দেখতে চেয়েছে !

—সেকি !

—হ্যাঁ।

রাজপুত যুবা, তরুণ নেতাটি নির্জন এই ছায়াচ্ছন্ন গাছপালার পথের উপর হা হা করে

হেসে ফেলে নিজেই কেমন বোকা হয়ে গেল। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলল—হাসছি বটে, কিন্তু হাসা উচিত নয়।

আদিত্য একটু দম নিয়ে বলল—এটাকে আপনি নিছক ধর্মবোধ বা গোঁড়ামি ভাববেন না।

—না। আমি তা ভাবিনি! এই চাকরির পিছনে, আমার ধারণা ললিতমোহনের কলকাঠি নাড়ার ঘটনা আছে!

—আলবৎ আছে।

—তাহলে এই সমাজে আমার জায়গাটা কোথায়? আমি তো কেবল কোন মুসলমানের বউ হয়ে থাকব বলে আসিনি, হিন্দুর মেয়ে হয়েও থাকিনি।

চন্দ্রিমার কণ্ঠস্বর সহসা কেমন হাহাকার করে উঠল। আদিত্যর ফর্সা মুখে একটি রক্তের ছায়া খেলে গেল। মাথাটা একদণ্ড নীচু করে থেকে মাথা তুলল আদিত্য। তারপর বলল—সংগ্রাম তো সবে শুরু কমরেড! একটা কথা বলব আপনাকে?

সামনের পথের দিকে চেয়েছিল চন্দ্রিমা, অনেক ছায়া পড়েছে পথের উপর। সামনে জ্বলজ্বল করছে বিশাল স্কোয়ার ফিল্ড। সেদিক থেকে চোখ টেনে এনে সে এবার আদিত্যর মুখে দৃষ্টি স্থির করে।

আদিত্য বলে—ট্রাডিশনাল পলিটিক্স, রাজা-উজির-শোষক-শাসিতের রাজনীতি যতভাবে এই দেশের ধর্মগুলিকে অপমান করে, করেছে, একজন নিষ্ঠুর অত্যাচারী জমিদার কখনও তার দরিদ্র দুর্বল প্রজার ওপর সেই অপমান করতে পারেনি এবং আপনারা দু'জন বিয়ে করে কণামাত্র অসম্মানও করেননি ধর্মগুলির, কোন অন্যায় করেননি আপনারা। তাই না?

—হ্যাঁ!

—আহা! জোরের সঙ্গে বলুন কথাটা। পার্টিকে আজ আপনাদের বিয়ের এই ঘটনা 'ফেস' করতে হচ্ছে, এ তো শুধু আপনাদের দু'জনের বিষয় নয়, অবশ্য তার জন্য আপনার ব্যক্তিগত সংকোচের কোন কারণ নেই।

আদিত্য অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় কথা বলছিল। কথায় কথায় পার্টির কথা এসেছে। কিন্তু চন্দ্রিমা একটা আশ্চর্য রকম ধাক্কা খায় মনে মনে। পার্টিকে আলাদা করে না দেখালেই কি চলত না এই মুহূর্তে! পার্টি একটি বৃহৎ সত্তা, সে কথা ভেবে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা সঙ্কুচিত হতেই পারে, পার্টি তো কারো ব্যক্তিগত কারণে কোন কিছু 'ফেস' করে না। অবশ্য সেই কথাই বুঝি বলতে চাইল কমরেড সিন্‌হা। তবু আপন মনে কষ্ট পায় চন্দ্রিমা। এবং সেই কষ্টকেও সে মনের অতলান্তে লুকিয়ে ফেলতে চায়। তার সংকোচকেই সে চোখেমুখে এবং অন্তরে আড়াল করতে চায়, চোখ নামায় এবং ঘাড় ডাইনে কাত করে ফেরায়, দিগন্তে চেয়ে থাকে।

—আপনি কি আমার কথায় কোন রকম...বলে ওঠে আদিত্য।

—না, তা কেন! সসংকোচে জবাব করে চন্দ্রিমা, সে দিগন্তেই চেয়ে থাকে। আর কোন কথা হয় না। লাল সুরকি পেটানো পথে নেমে পড়ে রিকশা, জেলের কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়েছে তারা। হঠাৎ চন্দ্রিমার মনের পাতায় ছবি হয়ে আসেন শাশুড়ি আয়েষা। আঁচল খুলে দশ টাকার একখানা নোট তিনি এগিয়ে ধরেন। খন্দ অর্থাৎ রবিশস্য বিক্রির টাকা।

খানিক এসে রিকশা থেমে যায়। সামনে প্রাণদা রিকশা থেকে নেমে পড়েছেন।

আদিত্য আর চন্দ্রিমাও নেমে পড়ল। ব্যাগ থেকে চন্দ্রিমা মনিব্যাগটা বার করতেই, ওদিক থেকে দ্রুত ছুটে এসে 'থাক থাক' করে ওঠেন প্রাণকিশোর, বলেন—তুমি কেন দেবে ?

চন্দ্রিমা মূক হয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না। মনিব্যাগটা সে বোকার মত হাতে ধরে থাকে। জেলা-সম্পাদক পয়সা মিটিয়ে দিতে থাকেন।

হঠাৎ চন্দ্রিমা দরিদ্র-গলায় বলে ফেলে—শাশুড়ি-মা আমাকে ভাড়ার টাকা দিয়েছেন প্রাণদা ! আমি দিতে পারতাম !

—কত দিয়েছেন ?

—দশ টাকা !

আদিত্যর প্রশ্নের জবাব করল চন্দ্রিমা। তারপর ঘাড় নীচু করল। প্রাণকিশোর চন্দ্রিমার একটা হাত ধরে চলবার জন্য টানলেন সামনের দিকে। বললেন—রাখো তোমার কাছে।

—বাবার জন্য কিছু ফলটল কিনে নিলে হত না ? এখানে কোথায় পাব ?

—এখানে আর পাওয়া যাবে না। এসো। বলে চন্দ্রিমাকে টেনে নিয়ে চলতে লাগলেন প্রাণকিশোর। আদিত্য এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল, চন্দ্রিমা কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়েছে !

চন্দ্রিমা মাঝখানে, তার দুইপাশে দুই নেতা। চন্দ্রিমা একটি লোহার গেটের সামনে আসে। গেটের পাশে জাল দেওয়া ঘরটির কাছে সরে আসে। সে একটি ফর্ম পেয়েছিল, তাতে সে শ্বশুরের নাম লিখে নিজের নাম সই করেছে, কেননা চন্দ্রিমা সাক্ষাৎপ্রার্থী। এগারোটা থেকে বারোটা এবং বিকেল তিনটে থেকে চারটে, সাক্ষাৎ করার সাধারণ নিয়ম। এখন সেই নিয়ম নাকি রদ করা হয়েছে। কোনভাবেই সাক্ষাৎ করা যাচ্ছে না। নেতার মুখেই চন্দ্রিমা শুনেছে, দমদম কিংবা প্রেসিডেন্সি জেলে 'পাগলী' হয়েছে। তবু আজ সাক্ষাৎকার সম্ভব হল প্রাণকিশোরের চেষ্টায়।

সাদা চৌধুরীর আসল পুরো নামটি লিখে বন্ধনীর মধ্যে 'সাদা চৌধুরী' ডাক নামটিও লিখেছে চন্দ্রিমা। নামটি এখন হেডক্লার্কের কাছে থেকে জমাদারের মাধ্যমে 'মেট'-এর হাতে চলে গিয়েছে, তারপর ওয়ার্ডমাস্টারের কাছে। কোন্ ওয়ার্ডে বাবা আছেন ? তা কি খুবই খারাপ জায়গা ? বাবার সঙ্গে কি কদম আলির মত চোর ছ্যাঁচোড় গুণ্ডাষণ্ডা, যাকে বলে জন্ম-অপরাধী, কথাটা অত্যন্ত বাজে কথা যদিও, তারাই কি আছে ? বাবা কি এখনও সেই ইসমাইল লুঙ্গি, সেই চকচক করা জুতো, সেই সানফ্রাইজের জামা, সেই বেনিয়ান জ্যাকেট পরে আছেন ! এই পোশাকটির বর্ণনা বাড়িতে কতবার শাশুড়ির মুখে শুনেছে চন্দ্রিমা। দেওয়ালে টাঙানো শ্বশুরের একটি পুরনো ফটো দেখেছে। সাদা চৌধুরী সেখানে এক উত্তম জওয়ান। তরতাজা যুবক। মুখের আদলে বুলবনের ছাপ। মিলিটারির কড়া পোশাক-পরা, পিছনে ঝোলানো বন্দুক, কাঁধের পাশে খাড়া হয়ে রয়েছে।

প্রৌঢ় তো নয়ই, প্রায় বৃদ্ধই তিনি, প্রৌঢ় নয়, যথেষ্ট বুড়ো না হতে পারেন, তবে কেমন তিনি ! চুল দাড়িতে নিশ্চয়ই পাক ধরেছে। অবশ্য মুখে কোন দাড়ি নেই। প্রত্যেক দিন তিনি সকালবেলা দাড়ি কামাতেন নিয়ম করে। গোঁফ কামিয়ে ফেলতেন। যথেষ্ট বৃদ্ধ না হলেও, তিনি একজন বৃদ্ধ। শাশুড়ি বলেছেন, মিলিটারি তো, গোঁফদাড়ি কামিয়ে ফেলেন, শৌখিন লোক। গোঁফটা কেন রাখেন না ? ফটোয় তো আছে। তা উনি বলেন কি শুনবে, বাচ্চাদের পড়াই, শিশুরা গোঁফ দেখে ভয় পাবে। চাষীবাসী মানুষরা পর্যন্ত তাঁর এই গোঁফদাড়ি কামানো, ফের রোজ 'সেভ' করেন দেখে অবাক মানে। চয়ন মৌলবি,

শিশাডিহার ছোট মসজিদের খতিব, বলে কি জানো দোলা ? বয়েস তো হল পনর-আনা, এইবার দাড়িটা রাখেন চৌধুরী ! তা উনি কি বলেন শুনবে ! বলেন, এই রাখি ! কোথায় আর রাখেন ! প্রায়ই বলেন, আরো ফর্সা হোক, ঝরঝরে হোক ! চয়ন বলে, বুঝলাম না আপনার এই লজ্ ! আরে ভাই, না বোঝার কী আছে ! সেই যে তিনি, মালেক-উল-মৌৎ, ফর্সা না হলে তাঁকে দেখব কী করে ? এখনও যে সংসারের সুর্মা পরে আছি হে ! চোখেই পড়ে না, সামনের পথটা কত দূর, সেই তিনি হাতছানি তো দেন না ! ছেলেপুলে মানুষ হয়নি, চাকরি বাকরি পায়নি ! আগে সেসব হোক। দেখি, কতটা কেমন গুছিয়ে ফেলতে পেরেছি। চয়ন ভাই, দ্বীনধর্ম বড় জিনিস, কিন্তু দুনিয়াটাও সিধে জিনিস না ! ফর্সা যখন হবে, ঠিক বুঝতে পারব। তখন আর 'সেভ' করব না। গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রেখে আরবী আদত চালু করে দেব। আমি আমার বাঙলার মাটিকে আমার ছেলেবেলা, আমার যৌবন দিয়ে খায়েস করি, চেখে চেখে দেখি, বুঝলে ! এসব বড় ভাবের কথা, চয়নের বোঝার কথা নয়, মানুষটা ফের গান গাইতেন কিনা ! 'উদাসি পথিক শুনেছি তোমার ব্যাকুল বাঁশির কামনা !' কথায় কথায় পথিক, কথায় কথায় মুসাফির। নজরুলের আগাগোড়া ভক্ত ! কবি নজরুল বলতে অজ্ঞান ! দু'জনই মিলিটারি দু'জনই গাইয়ে, ওই আদতের মিল, তার বেশি না। একজন মুরশেদ, আর একজন মুরিদ ! মুরশেদ বোঝ মা দোলা ? মুরিদও তবে বোঝ না ! পথ দেখান যিনি, তিনি মুরশেদ, যিনি তাঁর চেলা, তিনি মুরিদ, ভাব-শিষ্য ধরে নাও। তো, তোমরা কী বলবে ? লিডার ? না মা ! বলেছে চন্দ্রিমা। বলব, গাইড অ্যান্ড ফিলসফার ! আয়েষা বলেছেন, তাহলে তাই ! আর চৌধুরীকে কী বলবে, তুমি তো মা তাঁকে দেখতে পেলে না !

তাঁকেই এবার দেখতে পাবে চন্দ্রিমা। হঠাৎ জোরালো, কিন্তু অস্পষ্ট একটা আওয়াজ কানে এসে বেঁধে, 'ফাইল লাগাও, ফাইল মে বৈঠো !' ওখানে বোধহয় কোন গোনা গুনতি চলছে। ছোট একটা লোহার গেট খোলার শিকল নড়ার শব্দ হয় তারপর। চোর যেমন সিঁধ দিয়ে ঢোকে ; একটা প্যাসেজ পেরিয়ে এসে তিনি উবু হয়ে ঝুঁকে গেট পার হয়ে আসেন সামনের প্যাসেজে। কোমরে কানি পরে রয়েছেন শীর্ণকায় তিনি, স্বাস্থ্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। মুখমণ্ডল সাদা দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন। খুব লম্বা হয়ে নামেনি এখনও। খোঁচা খোঁচা ভাব নয়, থুতনি ছাড়িয়ে নেমেছে মুঠোয় ধরা যাবে এমন শুভ্রতা। একজন সেপাই সঙ্গে এসেছে। সাদা চৌধুরীর চোখে আভাসময় অশ্রু সর্বক্ষণ ছলছল করছে। সমস্ত দেহে অত্যাচারের শিটে দাগ এবং ঘা। কপালে দাদের পোড়া চাকা, ভুরুর উপর।

তাঁকে দেখবা মাত্র চন্দ্রিমার শরীর শক্ত হয়ে যায়। জালের ফোঁকরে তার দু'তিনটি আঙুল ঢুকে গিয়ে জালটাকেই সে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। হঠাৎ এই সময় জেলের কোন একজন কর্তাব্যক্তি সাদা চৌধুরীর পিছনে এসে দাঁড়ান, ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি মারেন।

বলেন—প্রাণকিশোরবাবু, এখান থেকেই দেখা করে যান। ভিতরে এসে অফিসে বসে কথা বলবার ব্যবস্থা করতে পারিনি, পরে একদিন আসবেন। সুশান্তকে বলে দিয়েছি। প্রেসিডেন্সিতে এসকেপ করেছে কিছু কয়েদী, ফলে এর বেশি করা গেল না। বলে কর্তাব্যক্তিটি আর দাঁড়িয়ে থাকেন না। জেল-সেপাইটা অবাঙালি মনে হচ্ছে। বাংলা সমস্ত ভাষা কি বুঝতে পারে ! নিশ্চয়ই পারে না।

প্রাণকিশোর বলেন—বুঝলে আদিত্য, চৌধুরীর নামে কোন চার্জ নিশ্চয় আছে।

আদিত্য বলে—বিনে চার্জেই তো আটক করা সম্ভব। মিসা ইজ মিসা ! আজ কোথাও

কোনও আবেদন চলে না।

—আপনাকে কোথায় রেখেছে এরা ? জেনারেল ওয়ার্ডে ! চৌধুরী সাহেব ? আপনি একটু কথা বলুন, আমাদের সঙ্গে ! প্রাণকিশোর বলে ওঠেন। সামান্য বিচলিত দেখায় তাঁকে। অতঃপর প্রাণকিশোরের আবেদনে সাদা চৌধুরীর ঠোঁট দু'টি থরথর করে কেঁপে উঠল। তাঁর চোখ দু'টি প্রাণকিশোরের চোখ থেকে সরে এসে চন্দ্রিমার মুখের উপর স্থির হয়। প্রাণকিশোর চন্দ্রিমাকে স্পর্শ করে বলেন—আপনার বউমা ! হ্যাঁ, আপনার বউমা ! বুলবনের ওয়াইফ !

—অ ! আবেগে প্রায় রুদ্ধস্বর যেন ছাড়া পায়। একটু পিছন দিকে সরে যান তিনি। আবার এগিয়ে আসেন। তারপর নির্বাক চেয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠেন—আমি ভাল আছি, আমার জন্য ভাববেন না। একটা সেলের মধ্যে পুরে রেখেছে, খুব খারাপ, সামনের ছোট ড্রেন দিয়ে কুষ্ঠস্রোত বহে, ঘা, গা থেকে খসে পড়া মাংস দেখতে পাই। আর একপাশে একটা পাগল থাকে, খালি চেঁচায়। লাইফার বোধ হয়। বলে কাহিল করে হেসে ওঠেন সাদা চৌধুরী !

তারপর বলেন—তবে গান শুনতে পাই, উই স্যাল ওভার কাম...নকশাল ফাইল থেকে ভেসে আসে। আমি শেষে রাজদ্রোহী হলাম প্রাণবাবু ! গান্ধীভক্ত লোক আমি, ললিত আমাকে কমরেড বানালো। মণি কেমন আছে, মণি ? আমার ছোটমেয়ে নূপুর ওর মাকে জ্বালাতন করে নাকি বউমা ! আমার ভাগ্য মা, আমি তোমাকে এই অবস্থায় দেখছি। এমন হবে ভাবিনি কখনও ! গায়ে আমার চিল্লোড় হয়েছে, সাদা সাদা উকুন, চোখে প্রায় দেখাই যায় না, বড্ড জ্বালা ! কম্বলে কুটকুট করে ঘোরে। যেখানে খাই, সেখানেই পায়খানা পেচ্ছাব। সওয়া যায় না। তাছাড়া আর সব বলা যাবে না মা ! এখান থেকে আমাকে ডি. আই. বি অফিসে নিয়ে গিয়েছিল মা গো ! মেরেছে। এখন সেলে ভরে রেখেছে। বলেছি, মুই জানু না। কিচ্ছু জানু না ! তোমরা চলে যাও, এরা সব শুনতে পাবে। আমার মিতপোর খোঁজ তোমরা পেয়েছ ? রাহুলকে বলবে...

এই সময় সেপাইটা হঠাৎ 'চলিয়ে' বলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সাদা চৌধুরীকে ধাক্কা দেয়।

রাহুলকে বলবে... একটা কথা বলতে দাও আমাকে... আমি কোনভাবেই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিনি... জেল ভেঙে পালাইনি... আমি 'ফালতু' নই, আমি নম্বর নই... আমার বউমা এসেছে... কেন এভাবে টানছ আমাকে ?

এবার আরও জোরে ধাক্কা দেয় সেপাইটা ! জল্লাদের মত স্বভাব ! সাদা চৌধুরী তার স্বর আরও ঈষৎ উচ্চে তোলেন—আমি জে. পি.-র লোক নই, সি. এম.-এর লোক নই, জি. এস.-এর লোক নই। আমি কালটিভেটার, গরিব টিচার জমাদারবাবু !

আর্তনাদ একবার সরে এল, আবার সরে চলে গেল। এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেল সব।

এই সময় হঠাৎ অস্ফুট স্বর বার হল চন্দ্রিমার কণ্ঠে, 'বাবা !' অন্তরের কোন প্রত্যন্ত দেশ থেকে উঠে এল স্বরটা। সে নিজেই কেমন চমকে উঠল। আদিত্য আশ্চর্য হল। প্রাণকিশোর বিমূঢ় ভঙ্গিতে চন্দ্রিমার মুখের দিকে চাইলেন একবার। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দ্রুত তিনি ছুটে জেলের বহির্ভাগের চাতাল পেরিয়ে পথে নেমে পড়লেন। চন্দ্রিমা আর আদিত্যও পথের উপর চলে এল ধীরে ধীরে। আদিত্য অনেকক্ষণ মাথা তুলতে পারল না।

রিকশায় এবার প্রাণকিশোরের পাশে নিজে থেকেই উঠে বসল চন্দ্রিমা। অন্য একটি

রিকশায় চড়ল আদিত্য সিংহ। এই আচরণটি কেন করল চন্দ্রিমা তা সে নিজেও জানে না। প্রাণকিশোর চন্দ্রিমার মনের অবস্থা টের পাচ্ছিলেন। তিনি একবার চন্দ্রিমার কাঁধে হাত রেখে নিঃশব্দে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। তারপর হাত টেনে নিয়ে চুপ করে রইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, চন্দ্রিমার সংগ্রাম ক্রমশ কেমন কঠিন হয়ে উঠছে।

—তুমি কী বলবে বাড়ি গিয়ে ?

—আপনিই বলুন !

দু'জন দু'টি মাত্র কথা বলল এক সময়, তারপর চুপ করে রইল। রিকশা অন্য সড়ক ধরে চলেছে। মোহন সিনেমার কাছে বাঁক নিতেই প্রাণকিশোর জানতে চাইলেন—মিতপো কে চন্দ্রিমা ?

চন্দ্রিমা একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তার সোনাইয়ের কথা মনে পড়ল। বলল—সে একজন বটে ! চৌধুরী ফ্যামিলিতে এসে কিছুদিন ছিল, নাম মুমতাজ আলি। বাবুকে ওর জন্যই অ্যারেস্ট করেছে থানা। শেলটার দিয়েছিলেন সেই অজুহাত দেখিয়ে, আমি মাত্র এইটুকু শুনেছি ! বুলবন আর রাহুল দুইভাই একদিন বলাবলি করছিল !

—হুঁম ! অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিলে চন্দ্রিমা ! বলে ওঠেন গম্ভীর স্বরে সম্পাদক। তারপর বলেন—এই অঞ্চলের ওই মিতপো একজন সাংঘাতিক নেতা, পুলিস ওকে ধরতে পারলেই মেরে ফেলবে। তোমার শ্বশুর যে বললেন, 'মুই জানু না, কিচ্ছু জানু না', শুনলে তো ! তোমাদের ফ্যামিলিতে ওর ছায়া পড়েছে সামান্য, তা-ও প্রশাসন সহ্য করবে না। তোমাকে এবং বুলবনকে এখন খুবই সতর্ক থাকতে হবে চন্দ্রিমা ! ওদের জনযুদ্ধ সর্বত্র প্রায় নিবে এসেছে, কিন্তু হঠাৎ এই জেলায়, আচমকা জেগে উঠতে চাইছে, শেষ জোয়ারের মত।

—এখন এমারজেন্সি প্রাণদা !

—হ্যাঁ, তবু ! এত অত্যাচার, তবুও। খুব কষ্ট হয় ! তোমার সঙ্গে আদিত্য কথা বলবে এখন। চল, আমার বাড়ি চল ! খাওয়া দাওয়ার পর পার্টি-অফিসে আসা যাবে। আলোচনা দরকার। খুব দরকার !... চল ভাই, একটু জোরে চালাও। বলে রিকশাঅলাকে নির্দেশ করেন প্রাণকিশোর। রিকশার গতি বেড়ে ওঠে।

চন্দ্রিমা খেতে বসে খেতে পারে না। আদিত্যও একই সঙ্গে প্রাণকিশোরের বাড়ি খেতে বসেছিল। খেতে খেতেই একবার হঠাৎ আদিত্য চন্দ্রিমার উদ্দেশে প্রশ্ন করে—চৌধুরীর জে. পি. বোঝা যায়। জয় প্রকাশ। কিন্তু সি. এম. ? এবং আশ্চর্য হই, যখন উনি জি. এস. বলেন ! বুলবনের মুখে নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, আমরা সর্বোচ্চ নেতাকে কমরেড জি. এস. বলি। আর ওই চেয়ারম্যানের পার্টির বড় নেতা সি. এম.। কমরেড সি. এম.।

চন্দ্রিমা বলল—আমরা যেমন আবেগের সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধায় বলি কমরেড জি. এস. বলেছেন এই অমুক কথাটা। মন্মথ তেমনি আবেগের সঙ্গে বলত, তুই কমরেড সি. এম.-এর রাজনীতি বুঝবি না দিদি। আমি বলতাম, কোন একটা দেশের 'বিপ্লব' কপি করে কি আর একটা দেশে বিপ্লব হয় মন্মথ ? ও বলত, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদ কথাটা তাহলে তুই বুঝিস না দিদি ! আমি বলতাম কমরেড মাও-সে-তুঙ তোদের চেয়ারম্যান কিসের ? ও হাসতে হাসতে বলত, ওই যে বললি 'কমরেড' মাও-সে-তুঙ, ওইখেনে। ওই 'কমরেড' কথাটার মধ্যে সব আছে। আমি বলতাম, এভাবে হয় না মন্মথ। ও বলত, এইভাবেই হয় !

—তারপর ? খেতে খেতে জানতে চায় আদিত্য।

—তারপর আর কী, এখন একজন সাদা চৌধুরীকে দেখতে হল আমাকে ! আবার মনে হচ্ছে, মন্মথর সঙ্গে আর একবার দেখা হবে আমার।

—সেকি ! আপনি যে বলেছিলেন মন্মথ পুলিশের গুলিতে...

—হ্যাঁ, বলেছিলাম ! মন্মথরা যে আবার জন্মায়, 'এইভাবেই হয়' বলে যে বারবার তারা শুরু করে, ইতিহাসে এই একটা ধারা... কবে থেকে...

—আবার দেখা হবে কেন ?

—হবে। আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এবার তাকে আমি মরতে দেব না। কিছুতেই না। বলে অর্ধভুক্ত খাবার থালায় ফেলে রেখে চন্দ্রিমা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই নেতাই বড় আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

—বসুন, ওভাবে উঠে পড়লেন কেন, খেয়ে নিন ! বলল আদিত্য। চন্দ্রিমা কিছুতেই আর বসতে চাইল না। ওর খেতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। শরীর গুলিয়ে উঠছিল বারবার।

॥ ১০ ॥

কবির সেই ডোঙাটিকে এক প্রত্যুষে কোদালকাটির ওয়াটার গেটের জলতরঙ্গের আকর্ষণের বাইরে, শান্ত ঢেউয়ের মৃদু দোলনের উপর দুলতে দেখতে পায় রাহুল। তার মনের মধ্যে নানান বিচিত্র ভাবনা তৈরি হচ্ছিল ক্রমাগত। ডোঙার প্রকাণ্ড মাথাটির ভিতর উঁকি দিতেই ওই গহ্বরে বাতা দিয়ে তৈরি একটা মাচা দেখতে পায় ক্ষুদ্রাকৃতির। তাক মতন দেখায়। আসলে বাতার তৈরি বর্গাকার একটি পায়াবিশিষ্ট মাচা, যাকে বাতার অনুচ্চ টুল বলা যেতে পারে, বাইরে থেকে তোয়ের করে নিয়ে গহ্বরের মাপ মিলিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে, এঁটে বসে আছে মাচাটি। শক্ত আঁটো হয়ে থাকা চৌকোনা মাচাটির উপর ভাঁজ করা চাদর। চাদরের ভাঁজে লুকনো একখানা লাল বই, সভাপতির পাঁচটি দার্শনিক প্রবন্ধ। ডোঙাটি লগিতে শক্ত মিহি দড়ি দিয়ে বাঁধা, ঢেউয়ের স্বল্প তাড়নায় দুলছে। কবিকে কোথাও দেখা যায় না।

এত সুন্দর, মজবুত, সযত্ন ডোঙা, লেজের দিকটায় টিনের নিশ্ছিদ্র পাত দিয়ে জল আটকানোর ব্যবস্থা, এপাশে কড়া এঁটেল এবং বোধহয় সিমেন্টিং করাও আছে, এত সতর্ক, নিরাপদ ডোঙা আগে কখনও দেখেনি রাহুল। কোন দক্ষ কারিগর এমন ডোঙা বানিয়ে দিয়েছে !

জলে দোলায়মান ডোঙা রেখে বাঁধের উপর উঠে আসে রাহুল। প্রণামপুর, নটখুলি, দৌলতপুরের পথটির দিকে চায়, হালকা কুয়াশা ঠেলে এগিয়ে আসছে একজন। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝতে পারে, আগন্তুক আসলে কবি ছাড়া কেউ নয়।

খুব কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায় কবি। চোখে চোখ রাখে। স্থির চেয়ে থাকে। সুদৃঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে রাহুল গম্ভীর স্বরে বলে— মার্চ করছিলে বুঝি !

কবি রাগ না করে বলল— আর বলো না, সময়টা যে কী করে কাটছে ! আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে খুঁজছি।

—মিথ্যে কথা ! তুমি নিশ্চয়ই কিছু একটা খুঁজছ, তবে আমাকে নয়। তালতলায় ডোবার ধারে খড়গাদার ভিতর কোন কিছু নিশ্চয়ই লুকনো আছে ! আমি গোরাবাজার মেসে ফিরে যেতাম, তোমাকে ধরব বলে যেতে পারিনি ! বল, পেয়েছ খুঁজে ? আমাকে

বললে, তোমার কোন ভয় নেই। আমি নিজেও অনেক ভেবেচিন্তে তোমার গতিবিধি দেখে বুঝতে পারি, তুমি খুঁজছ, কিন্তু পাচ্ছ না ! আমার সাহায্য ছাড়া তুমি ওটা খুঁজে পাবে না।

কবি এবার খপ্ করে রাহুলের একখানি হাত জড়িয়ে ধরে। একটি হট্টিটি পাখি মাথার উপর দিয়ে আচমকা চিৎকার করতে করতে উড়ে চলে যায়। সেদিকে ওরা দু'জনই অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। অস্বাভাবিক প্রবল আর্তনাদ কেন ছড়িয়ে গেল পাখিটা ! অন্য কোন শত্রু পাখি কি তাকে আকাশপথে তাড়া করে আসছে ?

কবি আবেগ-কম্পিত গলায় অসহায় সুরে বলল— বল, কোথায় রেখেছ ! আমায় দিয়ে দাও, আমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব !

— খুব বিপজ্জনক !

— না। কোন বিপদ নয়। গুলি ভরা নেই। আমি এই জলের উপর দিয়ে দ্রুত চলে যেতে পারব। কেউ দেখবে না। যাক ! আমাকে বাঁচালে রাহুল ! আমি যথেষ্ট খুঁজেছি, খড়ের মধ্যে কোথায় যে তলিয়ে গিয়েছিল ! মুমতাজ বারবার বলেছে, ওটাকে হটিয়ে ফেলতে।

খানিকক্ষণ কী যেন চিন্তা করে রাহুল। তার চোখমুখ কেমন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কবির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অনেকটা তফাতের জলোচ্ছ্বাসের দিকে চায়, জলের শব্দে নিজেদের স্বর ভাল শোনা যাচ্ছিল না। হঠাৎ কিছু না বলে রাহুল জলের দিকে নেমে যেতে থাকে। তার পিছু পিছু হেঁটে আসে কবি। ডোঙার কাছে এসে রাহুল কোন কথা না বলে পা বাড়িয়ে চড়ে পড়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে, কোমর সামান্য একটু টলে মাত্র। লগিতে হাত রেখে সামাল দিয়ে দাঁড়ায়।

তারপর ডাকে— এসো, চলে এসো।

— আমি ঠিক বুঝলাম না। কবি বলে ওঠে।

— আমিও কি বুঝতে পারছি কিছু ! তোমার ওই জিনিসটা কি বন্দুক ? রাহুল নির্লিপ্ত স্বরে কথা বলে যায়।

— তার মানে ? তুমি হেঁয়ালি করছ কেন রাহুল !

— আমি জিনিসটা এখনও চোখে দেখিনি।

— কী বলছ !

— হ্যাঁ। এসো, পা বাড়াও।

কবি এবার বোকার মত ডোঙায় উঠে পড়ে। তার চোখ দু'টি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

— তাহলে !

হতাশ হয়ে কবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর ডোঙার কানাত দু'হাতে আঁকড়ে খোলের মধ্যে বসে পড়ে। অসহায় চোখে রাহুলকে বারবার দেখতে থাকে। রাহুল ডোঙা চালিয়ে দিয়েছে জলের উপর। জলোচ্ছ্বাসের টানের বাইরে এনে ফেলে ডোঙা। এখনও সূর্যোদয় হয়নি। পুব আকাশ রাঙিয়ে দিচ্ছে হিম উষা। জলের উপর দিয়ে নানা রকম ছোট ছোট পাখি জল মাপতে মাপতে উড়ে চলেছে। সাদা বক দু'চারটি দেখা যায়। আশ্চর্য স্নিগ্ধ প্রকৃতি, এত নির্মল তার রূপ !

— তুমি এই বন্দুকটা কোথায় নিয়ে যেতে ?

— এলাকায়।

— কেন ?

— আমার উপর তাই নির্দেশ আছে।

— এই বন্দুক এখানে এল কী করে ?

— ছিনতাই করা হয়েছিল সওদাবাদের কাছে, তিনজন পুলিস পাহারা দিচ্ছিল ! অত্যন্ত সহজেই কাজটা হয়। ভয়ে পুলিস কোন উচ্চবাচ্য করেনি, ঘাবড়ে গিয়েছিল। মুমতাজ যখন তোমাদের বাড়ি আসে, রাত্রে, সঙ্গে আনে। পরে যখন চলে যায়, সঙ্গে নিতে পারে না। যেভাবে রেখে গেছে, সেটা খুব কনভেনশনাল হয়েছে, ঠিক হয়নি। ওইভাবে খড়ের মধ্যে রাখা খুব রিস্কি।

— তল্লাসি হলে সহজেই পুলিসের হাত পড়ে যাবে ওখানে ?

— হ্যাঁ।

— এবং তখন কিছুতেই আর প্রমাণ করা যাবে না, সাদা চৌধুরী নির্দোষ !

— বিশ্বাস কর, একথা আমরা ভেবেছি ! মুমতাজ যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে ফেলতে বলেছে, আমি কিন্তু পেরে উঠিনি। তোমরা যাতে কিছুতেই টের না পাও, আমার উপর সেই সতর্ক নির্দেশ ছিল !

— এখন তাহলে কী করবে ভাবছ ?

— আমাকে দাও, আমি নিয়ে এলাকায় চলে যাই।

— দ্রুতই আমি তোমাকে সেটা দিতে চাই, কিন্তু জানি না সেটা কোথায় আছে ! কবির মুখটা আরও কালো হয়ে গেল। সে রাহুলের কথাগুলি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। অথচ সে যে বিশ্বাস করতে পারছে না, সেকথা মুখে উচ্চারণ করতেও পারছিল না। জলের অনেক গভীরে চলে এসেছে ডোঙা। রাহুল লগি মেরে আরও এগিয়ে যেতে চায়, ডোঙা একটু একটু দুলছে।

— এরকম ডোঙা তুমি কীভাবে জোগাড় করলে ?

— এ তো কমরেডরাই ব্যবস্থা করেছে। এলাকায় যোগাযোগের পক্ষে ভাল। জল ওঠে না, খুব গতি আছে। এটি মুমতাজের প্ল্যান ছিল যে, দরকার হলে, জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারবে। এই জল খুব উপকারী।

— অবশ্যই। এতে ভাল ফসল হয়, মাছ হয়। কিন্তু তুমি আমাকে যেভাবে সব বলে দিচ্ছ, তোমার কোন ক্ষতি হবে না ?

— না।

— কেন ?

— তোমাকে সব বলবার জন্যই আমি এসেছি। ক্রমশ মনে হচ্ছে, তোমাকে না বললেই এখন ক্ষতি হবে।

— এটা তোমার এই মুহূর্তে মনে হল। যাই হোক, বন্দুকটা আর ওখানে নেই, এটা নিশ্চয়ই ভাল হল না কবি। বাড়ির যদি কারও হাতে গিয়ে পড়ে যায়, ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাব আমরা। এটা আরও ভয়ংকর হবে, যদি বাড়ির বাইরের কোনও কারো হাতে জিনিসটা চলে গিয়ে থাকে, তবে হ্যাঁ, সেটি ঘটবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তথাপি, এটি খুব উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

— এলাকায় পৌঁছে দিতে পারলে আর কোন চিন্তা ছিল না। আমি যে কী অপদার্থ তোমাকে বোঝাতে পারছি না ! শুধু একটা ফ্যামিলিই নয়, এলাকারও ক্ষতি হতে পারে, ভাবতেই পারছি না !

— ফ্যামিলির ক্ষতি আর নতুন করে কি-ই বা হবে ! ও যা হওয়ার হয়ে গেছে। বউদি

জেলের বাপুকে দেখে এসেছে, দেখে এসে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। বাপু যীশুর মত লেংটি পরে আছেন, জাস্ট থিঙ্ক ইট, বাপুর পরনে সেই ইসমাইল লুঙ্গি নেই, গায়ে সানফ্রাইজ জামা নেই, বেনিয়ান জ্যাকেট নেই, পায়ে চকচক করা জুতো নেই। হাত পা কাঁপছে, গায়ে শিটেপড়া দাগ, দাদ-হাজা, সাদা উকুন গায়ে।

বলতে বলতে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাহুল। ডোঙা চালনায় হঠাৎ খুব মনোযোগী হল। লগি তোলা ফেলায় মন দেয় এবং ডোঙার দু'পাশ দিয়ে কীভাবে জল কেটে চলেছে স্থির নিবিড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। জলের দিকে চেয়ে থেকেই শান্তস্বরে ধীরে ধীরে বলতে থাকে— বউদি প্রথমে বলতে চায়নি। ভেবেছিল, আমরা বাপুর দুরবস্থার এমন মূর্তিটা সহ্য করতে পারব না। মা জেদ ধরে পড়েছিল, বলতেই হবে, কী দে[illegible] এলে। চাপে পড়ে একটু একটু প্রকাশ করেছে বউদি।

জল থেকে চোখ তোলে না রাহুল। জলের বিস্তারের যেন শেষ নেই, আরও অ[illegible] দূর ঠেলে গেলে তবে গ্রামের ঠিকানা। এক সময় রাহুল লগি চালনা থামিয়ে ডোঙাটিকে জলে ছেড়ে দেয়। মনে হয় তারা জলের মধ্যবর্তী কোন একটা ভাগে এসে পড়েছে। এখানে জল অত্যন্ত নিস্তব্ধ, খুব তলে একটা গোপন টান আছে। নানান ধরনের পাখির একটু একটু ডাক শোনা যায়। জলের উপর জল-মাকড়শা জাল বুনে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

হঠাৎ রাহুল বলল— এবার বল, আমাকে কী করতে হবে। তুমি কে ? আমি একদিন কলেজে তোমাকে খুঁজেছিলাম, কবি নামে কেউ আমাদের কলেজে পড়ে না। কেউ বুঝতেই পারল না, আমি ঠিক কাকে চাইছি। আমি বলেছিলাম, যাকে খুঁজছি, সে এই জেলার ছেলে নয়, হাওড়ায় বাড়ি।

— হ্যাঁ, হাওড়ায় আমাদের একটা ওষুধের দোকান আছে। বাবা চালায়। মামার এখানে এসে কিছুদিন খুব একলা একলা ঘুরেছি। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার মাথাটা যেন অকেজো হয়ে যাচ্ছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি একটি 'বিন্দু' খুঁজে পাই।

— বিন্দু ?

— হ্যাঁ, এই শব্দটা কমরেড সি. এম. ব্যবহার করতেন। আমার আসল নাম তিলক। কলেজের খাতায় 'কবি' নামটা তুমি পাবে না। আচ্ছা, তুমি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড় বলেছিলে ! পরে জেনেছি, তুমি হিস্ট্রি অনার্স পড়।

— হ্যাঁ, পলিটিক্যাল সায়েন্স আমার ইলেকটিভ কম্বিনেশন। সঙ্গে ফিলজফি। অনার্সটা হিস্ট্রিতে। সেদিন তোমাকে ভেঙে বলার তাগিদ ছিল না। তাহলে 'বিন্দু'টা কী বল ?

— বলব নিশ্চয়ই। আগে আমাকে বন্দুকটা উদ্ধার করে দাও, যেদিন দেবে সেই দিন থেকে আমরা একটি 'বিন্দু' রচনার কাজে হাত দেব।

— এই যে বললে, তুমি একটা 'বিন্দু' খুঁজে পেয়েছ ?

— পেয়েছি বইকি ! একটা 'বিন্দু' ভেঙে আর একটা 'বিন্দু' সৃষ্টি করা যায়। একটার থেকে নিয়ে আর একটা, এভাবে আর একটা। এই বন্দুকটাকে তুমি একটা বিন্দু ধরতে পার। বিন্দু থেকে বিন্দু, এটাই হল বিন্দুগুলির চলমানতা। একটি বন্দুককে ঘিরে আমরা পাঁচজন বিপ্লবী জড়ো হতে পারি, একটা গ্রাম, একটি তল্লাট জেগে উঠতে পারে।

— এই বন্দুক ছাড়া কি একটি 'বিন্দু' সৃষ্টি করা যায় না ?

— না। কিছুতেই যায় না। পাঁচজন ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে চা খাচ্ছে আর পলিটিক্যাল বুকনি ঝাড়ছে বা ধরো বি.ডি.ও-র কাছে পাঁচ দশটা কিষান মজুরকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডেপুটেশন দিয়ে সদরঘাটে মাচা বেঁধে মাইকে বিপ্লব হাঁকাচ্ছে, এটা পাতি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ, একে আমরা বলি টক টক ঝাল ঝাল মিস্টি মিস্টি. রেভল্যুসন !

রাহুল এবার হা হা করে হেসে উঠল। কবি সেই হাসির সমর্থনে মিস্টি করে নিঃশব্দে হেসে বলল— কিন্তু যদি পাঁচজন গরিব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরের বুকের মাঝখানে একটি আগ্নেয়াস্ত্র রেখে কাজ শুরু কর, সেই সশস্ত্র সংগ্রামটা তখন আর বুকনি থাকে না, অস্ত্রটাকে আগলাবার সামর্থ্যের জন্য, তাকে সক্রিয় করে তোলার কর্মসূচি ছকতে বাধ্য হতে হয়, ইতিহাসে এই পরীক্ষা হয়েছে। মাচাবাঁধা বিপ্লবীদের অস্ত্র হল বিমূর্ত, আমাদের অস্ত্রটা মূর্তিমান। ওরা বঁটি টাঙি তরোয়াল প্রদর্শনী করে, লাল রুমাল গলায় বাঁধে, আমরা রীতিমত প্রয়োগ করি। কোনটা প্রদর্শনী আর কোনটা প্রয়োগ বুঝতে শত্রুর কিন্তু অসুবিধা হয় না। তুমি তোমার বাবার দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পার !

বলে আশ্চর্য রকম স্তব্ধ হয়ে যায় কবি। কবির প্রতিটি কথা অস্ত্রের প্রয়োগের মতই রাহুলের চেতনা বিদ্ধ করে যায়। সে শিহরিত হয়ে ওঠে। এমন উত্তেজনা জীবনে কখনও অনুভূত হয়নি তার। সর্বাঙ্গে একটা গভীর আবেগ তাকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে। হঠাৎ এক অপূর্ব প্রলম্বিত শায়িত হাওয়া জলের উপর দিয়ে বহে এসে খাড়া হয়ে ওঠে তাদের শরীর বেয়ে।

দু'জনই চুপ করে রইল অনেকখানি মুহূর্ত। তারপর কেমন এক আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে থেকে রাহুল বলল— বাবার চুলদাড়ি সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। বউদি এই প্রথম জেলে বাবাকে দেখল, বউয়ের সঙ্গে শ্বশুরের এই প্রথম দেখা হল, মা যখন এই দৃশ্যটার কথা চিন্তা করে, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে মা। বউদি তো জানে না, সম্পূর্ণ সাদা চুলদাড়ি বাবার কখনও ছিল না। পাক ধরেছে অনেক, কিন্তু সম্পূর্ণ সাদা, এই বর্ণনা শুনে মায়ের আঘাতটা আমিও বোধ হয় সংবরণ করতে পারিনি। ক্রোধ হয়েছে, দিশেহারা লাগে, বোধ হয় কান্নাও পায়।

— রাতারাতি চুল সাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা কার্ল মার্কসের জীবনেও ঘটেছিল কমরেড। তোমাকে আমি কমরেড বলে ফেললাম, তুমি আপত্তি করবে না তো ! কবি সলজ্জভাবে বলে ওঠে। রাহুল দণ্ডভর চুপ করে থেকে বলে— তোমার প্রাণ চাইলে নিশ্চয়ই বলবে, আপত্তি কেন করব ! তবে আমার প্রাণটা তো আর তোমার মত নয়। আমি সর্বক্ষণ বাবার কথা ভাবি। ফ্যামিলির কী হবে ভাবতে পারি না। এমন কি জানো, বউদির জন্যও চিন্তা হয়।

— এইভাবে চিন্তা কর বলেই তো, তোমাকে কমরেড বলে ডাকা যায় রাহুল ! যার কষ্ট হয় না, সে আবার মানুষ কিসের ! কার্ল মার্কস যে বিপ্লবী ছিলেন সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই কারও সন্দেহ নেই, তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তানটি যখন মারা গেল অনাহারে, দুধের শিশু, বাবা দুধ পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেন না, সেই ঘটনার কথা স্ত্রী জেনি মাকর্স লিখেছেন, খুবই প্যাথেটিক রাহুল ! বিশ্বাস কর, আমি পড়তে পড়তে কেমন যেন হয়ে যাই, কেঁদে ফেলি। মানুষ ভাবে, যারা বিপ্লব করে, তারা বুঝি কাঁদতে জানে না। বন্দুকের নল থেকে যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে, তারা তো নিষ্ঠুর, কঠিন, তাদের চোখে জল কি মানায় !

— তুমি আমাকে এভাবে অনর্গল বোঝাতে চাইছ কেন, আমি তো বুঝব না। আমি

কাজের মেয়ে ফুলভানু, যাকে আমি ভুলভানু বলে ডাকি, যার প্রথম স্বামী জমির লড়াইতে গলায় লাল রুমাল বেঁধে মরেছে, সেই ভুলভানুর কথা ভাবি, আর ভাবি ওর স্বামীর গলায় ওইভাবে লালরুমাল কেন বাঁধা হয়েছিল ! এটা কি শুধুমাত্র প্রদর্শনী ছিল ? লাল রুমাল তো চোখে দেখা যায়, ওটা তো বিমূর্ত কিছু ছিল না !

কবি এবার গলায় একটু জোর দিয়ে বলল— না, ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল না। চোখে যাতে দেখা যায়, তার জন্যই ওর গলায় নেতারা লাল রুমাল বেঁধে দেয়, ওটা পার্টি নেতৃত্বের নির্দেশ ছিল, কোন নেতা রুমাল বাঁধার প্রোগ্রাম চালু করে, তা-ও আমরা জানি। লোক দেখানো বিপ্লবের জন্য লাল রুমাল গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয় আর প্রকৃত বিপ্লবের জন্য 'রেডবুক' লুকিয়ে রেখে পড়তে হয়। চৌধুরীর নামে একটি পার্টি ইস্তেহার C/o হয়ে আসে, টুনটুনির ছবির মোড়কে, তবু তাঁকে জেলে যেতে হল ! তিনি জানতেন না কিছু, তবু !

শুনতে শুনতে একটি হরিদ্রাভ আগুনের শিখা রাহুলের বুক ভেদ করে অন্তরে ঢুকে পড়ে। সে নড়ে ওঠে। মুখে বলে— আমি ফুলভানুর জন্য কষ্ট পাই। বাবার চুল সাদা হয়ে গেছে শুনে ফুলভানু ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, কারণ বাবা তাঁকে জীবনের উপর থিতু করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। ওর কান্না আমি সহ্য করতে পারি না।

—জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে ! বলে আবার অনেকটা সময় কবি মাথা নীচু করে ডোঙার খোলার মধ্যে বসে থাকে। এরকম প্রণত ভঙ্গিমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাহুল বলে— ঠিক আছে। আমাকে বল, তোমার ইমোশনকে আমি ইগনোর করতে পারি না।

কবি মাথা নীচু করে থেকেই বলল— আমার মায়ের ক্যানসার রাহুল। মায়ের সঙ্গে কখনও আমার আর দেখা হবে না।

কবির কণ্ঠস্বরে কী ছিল কে জানে, রাহুলের মন এসময় যথেষ্ট ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সে শুধু নিজের কথাই ভেবে চলেছে ভেবে মনে মনে সংযত হয়, কবিকে চেয়ে দেখতে দেখতে পরিপূর্ণ এক মায়ায় মন প্লাবিত হয়ে পড়ে। মায়ের কাছে বেচারি কখনও আর ফিরতে পারবে না, কথাটি শুধুমাত্র কোন উচ্চারণের ছলনা নয়, তার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তার মধ্যে নিরাকুল বেদনা টনটন করে বেজে উঠেছে, যা রাহুলকে বিচলিত করে।

রাহুল এবার আগ্রহের ঘনীভূত স্বরে বলে— বল, বলবে না !

কবি মাথা তোলে। রাহুলকে দেখে নেয় সহজ দৃষ্টিতে। বলে— হ্যাঁ, বলব। আমরা যাকে বলি দারিদ্র্যরেখার নীচে থাকা, মানুষ সেইভাবে থাকে, গরিব মানুষ। মার্কস কখনও গরিব ছিলেন না, আদর্শ এবং প্রজ্ঞা, তাঁর দর্শন এবং অনুশীলন, তাঁকে দরিদ্র করেছিল। ওকালতি পড়বার তাঁর শখ ছিল, ওকালতি ব্যবসায় ভাল পয়সা আছে, সেসব তাঁর কিছুই হল না। তাঁকে অর্থনীতি আর দর্শন আকৃষ্ট করল, যাই হোক, এত বড় একজন সমাজবিজ্ঞানীর অনটনের কথা ভাবতে কষ্ট হয় যে, তিনি তার শিশুর জন্য দুধ জোগাড় করতে পারেন না পয়সার অভাবে, অথচ সেই সময় তিনি অর্থনীতির গভীর তত্ত্বগুলি উদ্ভাবিত করার অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন। দুধ শুধু নয়, মুখের খাবারও জোগাড় হয় না। জেনির শরীর খাদ্যাভাবে এতই কাহিল যে বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে। ওঁদের সবগুলিই মেয়ে, কনিষ্ঠতমটি পুত্র। মায়ের বুকের দুধ সে পাচ্ছে না। জেনি বর্ণনা করেছেন, খোকা তবু আমাকে শোষণ করতে চায় বাঁচার জন্য। শেষ বিন্দুটুকু সে বুক থেকে নিঙড়ে নিতে চেষ্টা করছে, আমি তাকে দিতে পারছি না। দেব কোথা থেকে, আমার যে নেই। খেতে না পেলে দেব কোথা থেকে। দুধের বদলে শিশু আমাকে শুষে

নিতে নিতে দেখি কি রক্ত চেটে খাচ্ছে, শিউরে উঠি আমি। ওর ঠোঁটের স্তনাগ্র ফেটে গিয়ে, শোষণের তীব্রতায় আর ক্ষুধার পাগলামীতে— এতটুকু শিশু কী বুঝবে, ওর ঠোঁটে দুধ নয়, রক্ত লেগেছে, তাই সে বেহুঁশ হয়ে পান করতে চাইছে, তাই দেখে আমি কাঁদবার চেষ্টা করি, কিন্তু চোখে জল আসে না, দেহ এত দুর্বল যে কাঁদতে পর্যন্ত পারি না। সমস্ত শুকিয়ে গিয়েছে, এই কি মায়ের দেহ! মায়ের বুকের রক্ত খেয়েও কি শিশু বাঁচে, মা যে সেই চেষ্টাও করে। করে না?...

বলতে বলতে কবি একদণ্ড চুপ করে যায়। তারপর বলে, এইভাবে বলে গিয়েছেন জেনি মার্কস। তাঁর কলমটি অত্যন্ত সহজভাবে বর্ণনা করেছে তাঁদের সঙ্কটের কথা। তিনি মা, তিনি তো সহজ করেই লিখবেন।

রাহুল শুধাল— মার্কসের মাথার চুল রাতারাতি সাদা হয়ে যায় কী করে?

কবি বলল— চূড়ান্ত সৎ একজন মানুষের পক্ষে তখন আর কিছুই করার ছিল না, এত সত্ত্বেও শিশুটি যখন মারা গেল। তোমার কথাটা শুনে হয়ত খটকা লাগতে পারে, তবু বলছি তোমাকে, মার্কস নিশ্চয়ই একজন মার্কসিস্ট ছিলেন, তদুপরি তিনি ছিলেন হিউম্যানিস্ট। শিশুটি মারা গেল, বাবা মা কিছুই করতে পারলেন না। এমনকি মৃত শিশুর কফিন জোগাড় করার ব্যবস্থাও নেই। সমস্ত রাত মার্কস ভেবেছেন, শিশুর কফিন কীভাবে জোগাড় করবেন তিনি! জেনি লিখেছে, সেই সঙ্কটের রাতটি কী করে কাটল, সমস্ত রাত ছটফট করেছেন আমার স্বামী। ঘুম দূরের কথা, তাঁর দু'টি চোখের পাতা এক হয়নি সারা রাত। ভোরে যখন উনি ঘরের বাইরে আলোয় এলে দাঁড়ালেন, চেয়ে দেখি, তাঁর সমস্ত মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। গায়ের কোটটি তাঁকে কফিনের জন্য বিক্রি করে দিতে হল।

জলের উপর ডোঙাটি ভাসতে ভাসতে ক্রমশ সরে আসছিল ওয়াটার গেটের দিকে, কিন্তু এত নিঃশব্দে যে তার সরে আসা বুঝতে সময় লাগে। বিলের জলের তলে এত তফাতেও কোথায় একটা গোপন টান আছে দূরবর্তী নদী-প্রবাহের যে, ঠাহর হয় না। জলের বিশাল ঘূর্ণির কোঁ কোঁ করা ডাক যেন নদীর হৃদয়ের আর্তনাদের মত গুমরে উঠছে। সেই ডাকে কবি সচেতন হয়ে চুপ করে গিয়েছে, অকস্মাৎ বাঁধপথের উপর আর এক উচ্চকিত আর্তনাদ জেগে ওঠে। চমকে উঠে রাহুল সেদিকে চায়। দুটি ছোট ছোট বাচ্চা পিছনে করে ছুটে চলেছে একজন উদভ্রান্ত রমণী, গলায় আছড়ে পড়ছে কান্নার চকিত ঘোলানো আকাশ বিদীর্ণ করা আর্তনাদ। সেই ব্যাকুলতা যে কী বস্তু যে না শুনেছে সে বুঝবে না! বুক আর কপাল চাপড়ে চাপড়ে কী যে দুর্বোধ্য ফরিয়াদ করছে মেয়েটি বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে রাহুল কবিকে গম্ভীর সুরে বলল— ডোঙাটা কিনারে নিয়ে চল কবি। নাও, লগি লাগাও।

বলে রাহুল কবির দিকে হাত বাড়ায়। খোল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে খানিকটা সরে গিয়ে কবি লগি হাতে করে শুধায়—কী হয়েছে!

রাহুল কোন কথা না বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পথের উপর কান্না ছড়াতে ছড়াতে ছুটে চলা বউটিকে দেখতে থাকে। বুঝতে পারে, বউটি আর কেউ নয়, হাওয়া বিবি, কদম আলির বউ।

বউটির কী সর্বনাশ হল কে জানে! এই কান্নাটিকে সহজ কোন কান্না বলে মনে হয় না। বাচ্চা দু'টি পিছু পিছু ছুটছে, বউটি পাগলের মত সবেগে ধেয়ে চলেছে। সূর্যালোকে বেলা এখন উজ্জ্বল। এত ভোরে কী ঘটনা হতে পারে!

কবি প্রশ্ন করে—তুমি মেয়েটিকে চিনতে পার ?

—হ্যাঁ। ওর একটি ন্যালাখ্যাপা ছেলে আছে, ওই বাচ্চাদু'টি ওর নয়। মনে হচ্ছে, ললিতের বাড়ির দিকে যাচ্ছে, ওর ছেলে ললিতের বাগাল। গরু চরায়। তাছাড়া চাষবাসও করে বোধ হয়। তোতলা। ফিটের ব্যামো আছে। সব কথা বোঝা যায় না। সেই ছেলেটার কিছু হয়নি তো ?

কদমের দুই ভাই এবং এক বৃদ্ধ ছুটে চলে গেল পথের উপর দিয়ে। রাহুল হাঁকল—কী হয়েছে জিন্নাত ?

দুই ভাই অনেক এগিয়ে গেল মুহূর্তে। বৃদ্ধের পায়ে গোদ, হাতে লাঠি, ওদের চাচা, জোরে হাঁটতে পারে না, তবু ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। রাহুল হাঁকে— চাচা !

কিনারের দিকে তীরবেগে ছুটেছে ডোঙা। এত দূর থেকে হেঁকেছে রাহুল যে ওরা শুনতেও হয়ত পায়নি। কিন্তু ডোঙাটি অনেক পথ ভেঙে আসার পরও ডেকে ওঠা গেল, ওরা শুনল না। কিনারে ভিড়ে আসা মাত্র লাফ দেয় রাহুল। তারপর আর থামে না। কবি ডোঙার উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যায়। পথের উপর দিয়ে ছুটে চলা এমন দীর্ণবিদীর্ণ উচ্চ মথিত কান্না শুনে কবি হতবাক হয়ে যায় মনে মনে। রাহুল নিশ্চয়ই এমন কান্নার সঙ্গে পরিচিত। কান্নার প্রকৃতি সে বুঝে ফেলেছে।

রাহুল ছুটতে ছুটতে বুঝতে পারে তার পায়ের চটি ডোঙায় থেকে গেল। পরনে পাজামা, গায়ে হাওয়াই শার্ট এবং চাদর। চাদরখানা সে কাঁধের দু'পাশ দিয়ে ফালি ভাঁজ করে ফেলে দিয়েছে। যাতে জোরে ছুটতে পারে। পথেরই উপর বৃদ্ধ চাচাটিকে ধরে ফেলে সে। মৃদু হাঁফ ছেড়ে শুধায়— কী হয়েছে চাচা !

গোদ পায়ের চাচাটি লাঠিতে ভর দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এর নাম মোসলেম। মোসলেম কষ্টেসৃষ্টে শ্বাস টেনে টেনে বলল— শশাঙ্ক শুনছি, ছোঁড়াকে বেঘাত মেরেছে। বাঁচেই কি না ! গরুর পায়ে ফাল নেগেছে। যাও পারভিচ, দ্যাখো দিকিন, ছাওয়ালডা আছে কি নাই ! ন্যালখ্যাপার জান ! দাম আছে ?

রাহুল আর দাঁড়ায় না। মোহড়াঘাটের কিনারে বাতার জলমাচা, যা কিনা সাঁকো, তলে যার নদীর জল বইছে, তারই মুখে এসে পৌঁছায়। এখান থেকেই দেখতে পায় ওপারে নদীর পাড়ের জমিতে লোকের ভিড়। বাতার সাঁকোয় পা ফেলতেও রাহুলের কেমন বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সে পা বাড়িয়ে থেমে যায়। এপারে পথের উপর ছইতোলা একখানা গরুগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ললিতের বড় কিষেন বংশী গাড়ির মোহড়ায় বসে আছে, গাড়ি ছাড়বে। মনে হচ্ছে, এখনও ক্ষ্যাপা তোতলা ছেলেটি মরে যায়নি। একজন কাঁধে করে অর্ধমৃত কিশোরটিকে এপারে তুলে আনছে। মুখে গ্যাঁজলা ঝরছে। চোখদুটি ঘোলানো, আধবোজা। মুখের রঙ নীল হয়ে এসেছে। খুব লম্বা অত্যন্ত জোয়ান তালেবের কাঁধে ঝুলছে ইমানি। মাচার ওই মুখে তালেবকে দেখা যায়। মায়ের আর্ত দীর্ণস্বর থেমে গিয়েছে কেন বোঝা যায় না। নিশ্চয়ই কেউ ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। তালেব টলতে টলতে টলায়মান মাচায় ধীরে ধীরে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। ওকে অনুসরণ করছিল একটি জটলা। মাচায় সকলকে উঠতে নিষেধ করা হল। একা এগিয়ে আসতে লাগল তালেব। ওর কাঁধে ইমানি লটকে ঝুলছে। রাহুলের পাশ দিয়ে তালেব নামছে মাটিতে, সাঁকোর মুখে রাহুল নিস্তব্ধ হয়ে যেন মাটিতে গেঁথে গিয়েছে। তালেব যখন নামছে, একটা ঝাঁকুনি খায় ইমানির দেহ, রাহুলের গায়ে গ্যাঁজলার ফেনা পড়ে টুপিয়ে। রাহুল শিউরে ওঠে। মনে হল, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করল।

রাহুল পাশে একটু সরে দাঁড়াল। মানুষের মুখের লালা, ফেনামাখা হিম মৃত্যুর মত হালকা গ্যাঁজ, কিন্তু এখন তা যেন শরীরে বিঁধে গেল। রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল মুহূর্তে। তা যেন সীসের মত ভারী।

এবার হাওয়া বিবিকে আগলে ধরে জলমাচা পার করে আনল একজন। ইমানির দেহ ছুইয়ের মধ্যে ঢুকল। হাওয়া মৃদু ফোঁপাচ্ছে, কান্নাকে বারবার চাপছে। জল ঝরছে চোখে, নাকেও ঝরছে সর্দিমাখা কান্না। কালোপাড় শাড়ি, ময়লা। রক্ত, কালি এবং কষাটে অনেক দাগ। মেয়েটার নাকের ফুটোয় অলংকার বলতে বাবলা কালো কাঁটা, হাতে কাঁচের দুটি দুটি চারটি সব্জে চুড়ি। শাড়ি খাটো, কিন্তু ছেঁড়া নয়, শীত পড়েছে কিছুটা, গায়ে তবু জামা নেই, গা ঢাকছে না ন'হাতি সাড়ে ন'হাতি কাপড়ে। ঘোমটা টেনেছে, আধখানা মুখ দেখা যায়। চোখ কিছুটা, নাক কিছুটা, তবু সবই যেন চোখে পড়ে যায়, কানেরও বাবলাকাঁটা অদেখা থাকে না। মেয়েটির গায়ের বাসি গন্ধ, যা দারিদ্রের প্রকট গন্ধ, নাকে লাগে রাহুলের। মেয়েটার ঋতু হয়েছে, পিছনের কাপড় রক্তময়। মধুময় বঙ্গভূমির এও একটা ছবি। রাহুল ভাববার চেষ্টা করল। জেনি মার্কসের মত এও একজন মা, এরও সন্তান হয়, নাড়ী ছিঁড়ে পড়ে। ঋতুপুষ্পময় এই নারী এখন কাঁদতেও পারছে না ভয়ে।

লোকের জটলা ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নানাখানায়। নদীর পাড়ের ক্ষেতে এখনও লাঙল পড়ে আছে, একটা গরু এখনও লাঙলের জোঁয়াল কাঁধে করে নির্বিকার দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত ছেড়ে পাড়ার লোকেরা বিভক্ত হয়ে একদল সাঁকোর ওপারে সাঁকোরই মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, একদল ফাল-লাগা গরুটাকে দেখবার জন্য ললিতের গরুপালাঙ্গায় গোয়াল-ঘরের কাছে জড়ো হয়েছে, দু'একজন উঠেছে বৈঠকখানায়, যেখানে শশাঙ্কমোহন ফুঁসছে এবং হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ধুতি আর শার্ট পরে নিয়ে তৈরি। এখন শিশির-রক্ত-মাটি মাখা পা ধুয়ে সাফ করছে ক্রোধী, খর মানুষটা। জমিতে নেমে ফাল-লাগা গরুটাকে সে-ই প্রথম দেখে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়ে। ইমানিকে এ' সংসারে আমানি বলে ডাকা হয়। শশাঙ্কমোহন মানুষের চেয়ে গরু ভালবাসে। গরুর কোন ধরনের কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সে মানুষকে যে ঘৃণা করে তা-ও নয়। তবে সে কুকুর, রাজহাঁস, গরু ইত্যাদি অধিক ভালবাসে।

শশাঙ্কমোহন গরুর রক্ত দেখে খুনে উন্মাদনায় মাথাটি আর ঠিক রাখতে পারে না। খুন করেই সে জেলে গিয়েছিল এবং মাঠের উপর, জমির উপর সেদিন মানুষের রক্ত ঝরে পড়েছিল। জেল থেকে ফিরে সে কিন্তু মোটেও লজ্জিত বা দুঃখী হয়নি, কোন অনুশোচনাও তার নেই। কেননা সে মনে করে, মাটির জন্য রক্তপাত ঘটালে কখনও মানুষের চরিত্র নষ্ট হয় না। গরুর প্রতি মায়াবশত মানুষকে দু'চার ঘা মারলে কোন অন্যায় হয় না। তাছাড়া আমানি দু'ঘা পাচনবাড়ি খেয়ে তাকে গাল দেয়। আমানি যে ন্যালাখ্যাপা তা সে জানে। কিন্তু তাই বলে মুখ করবে কেন ! আমানি যে অত্যন্ত খারাপ গালিগালাজ প্র্যাকটিস করেছে, ওর মুখে কিছুই আটকায় না, ওর কোন পাত্রাপাত্র বোধ নেই, তার গালি দেওয়াটা এক ধরনের এনার্জি, ওইতে তার প্রবৃত্তিগত নেশা, গালি বন্ধ করলে সে বাঁচার উৎসাহ পাবে কোথায় ? দু'চার ঘা খেয়ে আমানি শশাঙ্কমোহনকে মা তুলে গালি দিয়ে ফেলে।

ঈশ্বর এবং মনিবকে যে গালি দিতে নেই সেকথা হাওয়া বিবি তার ন্যালাকে কত করে বোঝায়। তোতলার কথা মানুষ বুঝতে না পারলেও, গালিটা বুঝতে পারে। অন্তত হাওয়া বিবি তাই মনে করে। ভয়ে সে ছেলেকে শতমুখে সাবধান করেছে। কিন্তু ন্যালা

জানত, তার গালিগালাজ স্বাভাবিক জিনিস, মুখে আসে তাই সে বলে, ইচ্ছে করলে সে খারাপ কথায় ঈশ্বরের মায়েরও গর্ভসঞ্চার করতে পারে, খোদার যে মা নেই, তা-ও সে জানে না। এরকম ঈষৎ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পাগলের কথায় শশাঙ্ক যে এমন ক্রুদ্ধ হয়ে পড়বে, মার খেতে খেতে স্বয়ং আমানিও তা উপলব্ধি করতে পারেনি। খুব নিরপেক্ষতার সঙ্গে রাহুল এই সব চিন্তা করে এবং যথারীতি উষ্ণ হয়ে ওঠে। একজন মাঝারি জোতদারের গরুর প্রতি ভালবাসা অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বাগাল পিটিয়ে সেই প্রেম জাহির করার দৃশ্যটি যেরকম প্রহারের সঙ্গে ঘটেছে, তা কল্পনা করতেও মনের অমানুষিক জোর দরকার।

একদল লোক মাচা পার হয়ে এল। ছইয়ের মধ্যে আধমরা, রোগা, মৃগিগ্রস্ত, তোতলা, অবুঝ আমানিকে ঢোকানো হল। নাড়া বিছিয়ে তার উপর কাঁথা ফেলে দেওয়া হয়েছে। হাওয়া বিবি গাড়ির মধ্যে ঢুকল একা। বংশীর গাড়ি এবার ফুঁপিয়ে উঠে চলতে শুরু করল। এই হঠাৎ উচ্চকিত ফোঁপানির ধাক্কা রাহুলের বুকটাকে মোচড়াতে থাকে। সে সাঁকো ছেড়ে গাড়ির কাছে চলে এসেছে। এবার গাড়ির পাশে পাশে খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল, আমানি যদি না বাঁচে!

গাড়ি কয়েক রসি পথ চলে আসার পর পিছনের দিকে একবার ফিরে দেখে রাহুল। মোসলেম আর জিন্নাতকে দেখা যায়। এত কষ্ট সত্ত্বেও মোসলেম কেন গাড়ির পিছু পিছু আসতে চাইছে! ন্যালা আছে কি নেই চোখে দেখতে পায়নি বেচারি। ন্যালার প্রতি এই মানুষটির মায়া অধিক, কারণ নিজেও সে খুব অক্ষম ব্যক্তি। মাঝে মাঝে ভিক্ষেয় বার হয়, হাঁটাচলার ক্ষমতা কম বলে ভিক্ষেও কিছু করতে পারে না। সারাদিন শেষে দেখা যায়, ঝুলিতে সামান্য দু'মুষ্টি চাল জোগাড় হয়েছে, তারই সঙ্গে একত্রে মসুরি আর গম দু'মুঠি মিশে গিয়েছে, এই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি নেই, তার আছে শুধু ক্ষুধার স্থুল জৈববোধ, তার জিহ্বা গম বা চাল এবং ডালকে আলাদা করে না, তার দর্শনে সবই খাদ্য মাত্র ; রাহুল ওর ঝুলির ওই অবস্থা দেখে একদিন অত্যন্ত কষ্টবোধ করেছে, অথচ মুখে কিছুই বলতে পারেনি। দেখেছে, মা অনেক দিন উঠোনের ছায়ায় বসিয়ে মোসলেমকে থালায় করে খেতে দিয়েছেন, মোসলেম দালানের বারান্দায় কিছুতেই উঠতে চায় না। মানুষের সঙ্গে এমন এক অসহায় দূরত্ব বেচারি নিজে থেকে গড়ে রাখে, কোন সংকোচে বা ভয়ে অথবা অস্তিত্বের কারণে, তা চোখে দেখে অনুভব করার জিনিস।

রাহুল আর একবার পিছনের দিকে চাইল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল ক'সেকেন্ড। দেখল, চকচকে হাম্বার সাইকেল গড়াতে গড়াতে শশাঙ্কমোহন এদিকে আসার তোড়জোড় করছে, হাত নেড়ে নেড়ে জিন্নাতকে কী যেন বলছে, পিছনে মানুষের বিচ্ছিন্ন ছোট ভিড়, লোকটার হাত নাড়ার ভঙ্গিমা দেখে গা জ্বালা করে রাহুলের। কোন অনুশোচনা নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই। শশাঙ্ক হয়ত ভাবছে, আমানি এ যাত্রা হাসপাতাল থেকে বেঁচে ফিরবে। অথবা সে বোঝাচ্ছে, তার কোন দোষ ছিল না, ন্যালা ওভাবে মুখ না করলে, সে ওর গায়ে হাত তুলত না।

ছইয়ের পিছনে সামনে কোন পর্দা নেই। ন্যালার ফেনাতোলা নীলবর্ণ মুখটা পিছনে বার হয়ে আছে। রাহুল এবার গাড়ির পিছু পিছু হাঁটে। হঠাৎ দেখে, ইমানি হেঁচকি তুলছে সর্বাঙ্গময়, অল্প অল্প। গা কাঁপছে। তা দেখে হাওয়া বিবি আর্তস্বরে কেমন করে ওঠে, হায় বাপ! কষ্ট হয় ইমান! বাপজান কষ্ট হয়!

রাহুল দেখল, হাওয়া বিবির বাপজানটি মায়ের এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা কণামাত্র শুনতে পাচ্ছে না। মৃত্যুর কঠিন তমসার ঘোরে আমানির চেতনা তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এই

খিঁচিয়ে ওঠা দেহ দেখে যতটা প্লুতস্বরে আকাশ ফাটানো আর্তনাদ করার কথা হাওয়া তা করছে না। এমনকি বাঁধপথের উপর যেভাবে কপালে বুকে তাকে করাঘাত করতে দেখা গিয়েছিল, সেই বিদীর্ণ মূর্তিটা এখন নেই।

রাহুল গাড়োয়ানকে হেঁকে বলল— তাড়া লাগাও বংশী, আমানির অবস্থা খারাপ।

বংশী বলল— আর তাগাদা কেন করেন, মরবার থাকলে মরবে!

রাহুল বলল—জীবন অত শস্তা নয় বংশীলাল! এভাবে যদি আমানিকে তোমরা মারো, তবে আমি কিন্তু ছাড়ব না তোমার মনিবকে! গরিবের জীবন তোমার মনিবের হাত তোলা নয়, দান খয়রাতের জিনিস না।

—তাগদ থাকলে লড়বেন, কে মানা করছে! বংশীর কথায় নির্বিকার প্রস্তাব। ভয়ানক চমকে উঠল রাহুল। এরকম মুখের ভাষা সে কল্পনা করতে পারেনি। বংশী যেন তার সঙ্গে শ্রেণীযুদ্ধের আহ্বান জানাল। কিছুক্ষণ আগের কবির বলা কথার সুর এখনও তার কানে স্বতত গুঞ্জন করছিল। মনে হচ্ছিল জেনি মার্কস যেন তাঁর সন্তানকে নিয়ে কোথায় চলেছেন! তিনি কাঁদতে পর্যন্ত পারছেন না। দেহে বল থাকলেও মনে সাহস নেই।

—বাপটা তো জেলে আছে আপনার। নির্বিকার সেই কণ্ঠ ফের মন্তব্য করে।

—হ্যাঁ আছে!

—লড়াই তো আপনারা কম করলেন না, ফল কী হল? এ হল পাঁতির খেলা, বাঘ আর বক্‌রি।

—মুখ সামলে কথা বল বংশীলাল! আমার গায়ে সাদা চৌধুরীর রক্ত বইছে, আমাকে লড়াই শেখাতে চেও না! দাস অনেক দেখেছি, তোমার মত কেনা গোলাম এ দিগরে দেখি না। নমক খাচ্ছ, গীত গাইছ। কিন্তু লড়াই কিসের শুনি!

—ক্ষ্যামা করেন দাদা! খোদার কাছে ন্যালার হায়াৎ চাও, তক্ক কেন করেন! আমি মুখ্‌খু।

—তা কিন্তু মনে হয় না। খুব তেজ তোমার! চালাও গাড়ি। যদি জোরে না চালাও, আমি তোমাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেব বলছি! অ্যাই মেয়ে, খুব তো রাস্তায় চিৎকার করে কপাল চাপড়াচ্ছিলে, এখন কাঁদতে পারছ না? কী গো!

এবার বিবির গলা হুহু করে সুর ধরে ডুকরে ওঠে।

রাহুল বলে— কাঁদো, পথের মানুষ শুনবে, গাঁয়ের মানুষ দেখবে।

কাঁদতে কাঁদতে কান্না থামিয়ে হাওয়া বলল— বাবু যে কাঁদতে মানা করেছে পারভিচ, লোক জাগালে বাবুর বদনাম হবে। খুদা এখন মানীর মান রাখলে বাঁচি! ও বাপ! মানিক! কষ্ট হয়? কথা কও বাপ রে। এই তো হাসপাতাল এসে গেল সুনা!

এই কণ্ঠস্বর শুনে রাহুল অবাক হয়। তার মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার যেন কোন যোগই নেই। এই প্রহার যেন স্বাভাবিক নিয়ম। কপাল চাপড়ে ছুটে আসাও নিয়ম। তারপর মানীর মান রক্ষার জন্য এই শীতলতা, এমন নীরবতা নিয়মেরই বোধহয় অন্তর্গত।

'লোক জাগালে বাবুর বদনাম হবে'—এই উক্তি তথাপি রাহুলের খুব মর্মান্তিক মনে হয়।

এই সময় শশাঙ্কমোহন পিছন থেকে সাইকেল তাড়িয়ে এসে রাহুলের পিছনে ধীর আবর্তে প্যাডেল করে। হাওয়া বিবি কাঠ হয়ে যায়।

—তুমি কোথায় চলেছ হে রাহুল মিঞা !

—হাসপাতাল।

—কেন, কে আছে সেখানে ?

—আছে আর কে ! আমানি যাচ্ছে, তাই যাচ্ছি !

—কেন ?

—কেন আবার কী, যাব না ?

—না।

—আমি দেখতে চাই, আমানি বাঁচে কিনা, আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করব।

—কেন হে শালা, তুমি দেখা করবে ? তোমার অত টসকাচ্ছে কেন, আমার বাগাল, আমি বুঝব তার ভালমন্দ ! তুমি তোমার বাপটার জন্য তদ্বির কর গিয়ে, যাও !

—সে তদ্বির তো ললিতমোহনের করার কথা !

—তাই নাকি ! শালা তোমার চোপা দেখে হাসি পাচ্ছে, মনে হচ্ছে দু'ঘা বসাতে পারলে সিধে হও।

এই কথায় তীব্র এক যন্ত্রণায় পথের উপর হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল। তারপর বলে— বাপের সাক্ষী তোমার যথেষ্ট হয়নি শশাঙ্ক ! আমানি মরে গেলে, আমি কিন্তু...

—হ্যাঁ, তা যা পারবি করবি, ভয় দেখাস কিসের ! অ্যাই বংশী হাঁকা গাড়ি। ওরে জিন্নাত, এই চৌধুরীর ব্যাটাকে মানা করে দে, ও যেন না আসে !

জিন্নাত ততক্ষণে পিছন থেকে ছুটে এসেছে দ্রুত পায়ে। বলল সে গম্ভীর থমথমে গলায়— পারভিচ্, তুমি বাড়ি যাও !... রাহুল এই কণ্ঠস্বর বিশ্বাস করতে পারল না।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে পথের উপর বিস্ময়-বিদ্ধ সে দাঁড়িয়ে থাকে। গরুগাড়ি মন্থর চাকায় নরম কালো মাটির রেত মেখে মেখে সামনে চলে যেতে থাকে। বিস্ময়াবিষ্ট রাহুলের চোখদু'টি সরু হয়ে গাড়ির টাপুরের গোল শূন্যবৃত্তে পলক হারায় এবং হঠাৎ ধক করে জ্বলে ওঠে। আদৌ কি বাঁচবে আমানি ? মরে যাবে না তো ? ওর মুখের উপর মৃত্যুর নীলছায়া লেগেছে। কষে মৃত্যুর ফেনার গন্ধ। গরুর মত নির্বোধ আধবোজা চোখ। মা তার কেঁদে উঠতে পারে না। কিছুতেই ফুঁপিয়ে উঠে ঊর্ধ্বনাদ করে না জননী।

বুকের ভিতরে রি রি করে কী একটা বিপন্ন বোধ। এই যে প্রত্যূষ-বাংলার অতর্কিত অভিজ্ঞতা তা রাহুলকে মূঢ় বোবা বিমর্ষ করে তোলে। এই গ্রামের সঙ্গে তার নতুনতর এক পরিচয় হয় ক্রমান্বয়। সে এগিয়ে এসেছে। ছুটে এসেছে। অভিজ্ঞতার অন্তরালে আমানির মায়ের মুখখানি কষ্টের প্রতিমার মত জাগে। রাহুল ভাবে, সে কি ফিরে যাবে ? বস্তুত এ পথ কোন্‌দিকে গেছে ?

গরুগাড়ি আরও চলে গেছে দূর দিগন্তের কোলে। রাহুল পিছনে ফিরে আসে পায়ে পায়ে এক রসি। ফের ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর সম্মুখে গরুগাড়ির দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে ছুটতে থাকে ঊর্ধ্বপ্রাণে।

শশাঙ্কমোহনকে ভয় ধীরে ধীরে গ্রাস করতে পারে, সেকথা সহসা উদিত হয় শশাঙ্কমোহনের মনে। আমানির দেহ হাসপাতালের চত্বরে পৌঁছনোর আগেই হাম্বার বাইক তাড়িয়ে সে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছে যায়। তার নিজের দলের ডাক্তার আছেন, তাঁর কাছেই ওঠে। সমস্ত ঘটনা অকপটে বলবার তার মত সাধু লোক এ সংসারে কমই আছে। কিন্তু আজকের দুর্ঘটনার বেলা সে যে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সেই সাধু স্বীকারোক্তি করার পর বারংবার ন্যালার স্পর্ধার কথা উল্লেখ করতে করতে কেমন যেন দমে যেতে থাকে। অতঃপর রাগের মাথায় যা হওয়ার হয়ে গেছে, ঘটনা যে তুচ্ছ সে কথাও বলতে বলতেই কেঁপে ওঠে অহেতুক। সে বর্ণনা করে গরুর পায়ে ফাল-লাগার রক্তাক্ত বিবরণ। সেই দৃশ্য তাকে কিভাবে বিদীর্ণ করেছিল, সে কথা বলতে গিয়ে তার স্বর কতবার রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

শশাঙ্কমোহন বলে—আমরা চাষী মানুষ, আমাদের রোখ খারাপ প্রদীপবাবু!

প্রদীপবাবু বলেন স্টেথোয় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা গলায়—সে কি আর না জানি শশাঙ্কবাবু! আপনার বড্ড ঘাট হয়েছে কিন্তু!

—আজ্ঞে, একশো বার! কিন্তু গরুর রক্তে আমার জমি ভিজে গেছে ডাক্তার!

—হ্যাঁ, খুব খারাপ ঘটনা। তবে সাধ করে তো কেউ ফাল মারে না!

—খুব বজ্জাত ছেলে জানেন! মুখ করে, আমার মায়ের নামে যা বলেছে, আমি সে কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারব না।

—ঘা খেয়ে মানুষ কত কি বলে! গরিবের মুখের ভাষার দোষ ধরতে নেই! ওরা যদি অতই ভাব-ভাষা জানবে, তাহলে ওই গরুর সঙ্গে রাত-দিন কথা বলে কেন? আমি গরুর সঙ্গে মানুষকে কথা বলতে দেখেছি! সেই গরুকে কেউ ইচ্ছে করে ঘায়েল করবে না। যান, আপনি হাসপাতালে গিয়ে বসুন, আমি আসছি!

—আমার কথা আপনার বিশ্বাস হল না তাহলে?

গলার স্বর হঠাৎ গরম করে তোলে শশাঙ্কমোহন। প্রদীপ ডাক্তারবাবু এই স্বর শুনে কিঞ্চিৎ অপমানিত বোধ করলেও সেই ভাব গোপন করে পাতলা হেসে বলেন—রুগী এসে পৌঁছল কি না দেখুন! আমি যা বিশ্বাস করি, আপনাকে সে কথা বলেছি, আগে ছেলেটাকে বাঁচাই, তারপর কথা হবে। যান, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভয় পাওয়ার যে তেমন কিছুই নেই সে কথা শশাঙ্কমোহন ভালই জানে। সোভান আলিকে খতম করে সে জেলে গিয়েছিল, ভেবেছিল তার বুঝি ফাঁসিটাসি হয়ে যাবে, সে সব যখন কিছুই হল না, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গৃহে ফিরে শশাঙ্ক আরও বেশি সাহসী হয়ে উঠল। মাঝে মাঝেই বাগাল-কিষেনকে জুৎ করা মানুষের একটা চমৎকার অভ্যাস। বউ মারলে যেমন মানুষের পাপ নেই, গরিব মারলে মার্কস সাহেব রাগ করতে পারেন কিন্তু যাকে মারা হয়, সে কখনও রাগ করে না, অতএব সেই মারেও তেমনই কোনও পাপ নেই।

শশাঙ্কমোহন এইভাবে বিচার করতে ভালবাসে। চমৎকার সেই অভ্যাসবশেই আজকের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তুচ্ছ, তুচ্ছ! ন্যালাক্ষ্যাপা ছাগল পাগল জীব, মার খেয়েছে তো হয়েছে কী!

ভাবতে ভাবতে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখে শশাঙ্কমোহন। তারপর চমকে ওঠে। এদিকে কঠিন চোখে চেয়ে রয়েছে রাহুল! ঠাঁই

দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাপ ফাটক খাটছে, তবু তেজ মরেনি ! জিন্নাত মানা করল, তথাপি ওই আহামক তেড়ে এসেছে এত দূর। মনে মনে বিড়বিড় করে উঠল শশাঙ্কমোহন।

—কী দেখছেন, অমন করে ?

—ইবলিশের ছ্যানাটা এসেছে এখানে।

প্রদীপ ব্যানার্জি হাসপাতালে ডিউটিতে বার হবেন, খাতা এসেছিল, সই করেছেন, গরুগাড়ি এসে পৌঁছে গিয়েছে, সকালটা আজ শুরু হল অন্য রকম। এই সব আর ভাল লাগে না। অন্তরে এক প্রবল অসহিষ্ণুতা ঠেলে উঠতে চাইছে। গ্রামের প্রকৃতির দিকে চাইলে মানুষের মাথায় কবিতা আসে, কিন্তু গ্রামের অন্তরের দিকে চাইলে স্টেথোর নলে কান পাতা যায় না, মনে হয় মরু ঝড় বইছে, হাহাকার করছে পৃথিবী, নিত্য এই রক্তপাত, নিয়ত অন্যায় যুদ্ধ দেখে দেখে গ্লানিতে মন ভরে ওঠে। লোকটা এসেছে, তার কৃত পাপের অংশভাগী করতে, জঘন্যতম অন্যায় করেও সেই অন্যায়ের সমর্থন চাইতে কোনও কুণ্ঠা নেই এদের, অত্যন্ত সরল গলায় এরা প্রস্তাব করবে, এমন প্রস্তাব যা অত্যন্ত সাধু আর নিরীহ মনে হবে, মানুষ মেরে ফেলাটাও সাধুতামাত্র, সে কারণে কণ্ঠস্বর খুব সাবলীল, সিধা। কেননা এরা এদের নেত্রীর নামে কথা বলে, এমারজেন্সির নামে কথা বলে, থানার নামে কথা বলে। অতএব শুনতে হয়।

হাসপাতালে এসে প্রদীপবাবু ন্যালাকে বেড দিতে পারলেন না, সব ভর্তি। ন্যালাকে বারান্দার মেঝেয় কাঁথা পেতে শুইয়ে পেটে, আসলে নাকের ফুটোয়, অক্সিজেনের নল ঢুকিয়ে দিলেন, ন্যালা টানতে পর্যন্ত পারছে না।

রাহুল বলল—আপনি রেসপেকটেড ডক্টর, আপনাকে বলছি ! আমানি যদি মরে যায়, সেই ডেথ-সার্টিফিকেট আমার হাতে দেবেন ! বহরমপুর মর্গে যাবে ডেডবডি, ময়নাতদন্ত হবে। চিৎপুরের সাধারণ মানুষ সেই রিপোর্ট দেখতে চায়। মাস-কালেকশন করে মামলা চলবে। যদি থানা এবং কোর্ট মোকদ্দমা না নেয়, তাহলে মাস-জাজমেন্ট হবে।

—তুই এইসব বলবি আর অমনি হয়ে যাবে, এই বুদ্ধি তোর কোথা থেকে হল ! তোকে এখানে কে আসতে বলেছে ! শশাঙ্কমোহন মুখ বাঁকা করে বলে ওঠে।

রাহুল আমানির দিকে আরও একবার চেয়ে দেখল। ডাক্তার রোগীর চেয়ে দশ হাতের মত তফাতে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে একটি ছোট জটলা।

প্রদীপবাবু বললেন—আমাকে চেষ্টা করতে দাও, আগেই মৃত্যুর কথা বলছ কেন ! পেশেন্টের রিলেটিভরা আছে, তারা তো তোমার মত করছে না ! তুমি কে ? আমানি তোমার কে হয় ? তুমি এভাবে জাঁক করলে, পেশেন্টের ক্ষতি হবে। ওহে, কে আছো, রোগীর মাকে রোগীর কাছে থেকে সরে আসতে বল ! আর তুমি ভাই, রোগীর কাছে এসে হামলা করবে না। মনে হচ্ছে, তুমি কথা মুখস্থ করে এসেছ ! মুমূর্ষু অবস্থা, এসব তোমার ঠিক হচ্ছে না। যাও, কোথাও শান্ত হয়ে বস। প্রয়োজন হলে, আমি তোমাকে ডাকব !

কথা শেষ করে প্রদীপবাবু ডাক্তারদের ঘরে, নার্সদের কাছে ঢুকে পড়লেন। জিন্নাত শীতল দৃষ্টিতে রাহুলকে দেখল এক লহমা। তারপর বলল—তুমাকে খবরদারি করতে হবে না রাহুল। যাও, বাড়ি যাও। বাবু আছে, ললিতবাবুকে সম্বাদ দিইছি, তেনারা যা ভাল বুঝছেন করছেন, তুমার পণ্ডিতি কথাবার্তার দরকার নাই।

—আমি কোন খারাপ কথা বলিনি জিন্নাত ! আমি মুখস্থ করে কথা বলি না ! বাবুরা মেরেছে, বাবুরাই দেখবে, ঠিক কথা ! কিন্তু আমানি বাঁচলে ভাল, অক্সিজেন নিতে পর্যন্ত পারছে না, যদি অঘটন ঘটে, তখন কী করে দেখবে বাবুরা ! মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এত

আহ্লাদ ভাল শোনায় না। ন্যালার মাকে পর্যন্ত কাঁদতে দিচ্ছ না তোমরা! জিন্নাত, তোমাকে আমার কিন্তু ভাল লাগছে না!

জিন্নাতের দেহে হঠাৎ যেন চাষীর কৃষি-রক্ত নড়ে উঠল। সামান্য গলা চড়িয়ে বলল—ভাল লাগছে না মানে? কী বুলতে চাহ, শুনি! এত ধন্দ কিসের তুমার!

রাহুল গম্ভীর গলায় বলল—না জিন্নাত, ধন্দ তোমার স্বভাবে, এমনকি সন্দেহ পর্যন্ত হয়! তুমি দালানি কর, কথা বিক্রি কর, বিশ্বাস কে করে হে! আমি অন্তত করি না। তোমাদের সন্তান তাই তোমরাই বুঝবে! তবে কার হয়ে এমন নির্লজ্জ ওকালতি করছ! খুনীর এত সম্মান কেন বুঝতে পারছি না। ধন্ধ বিস্তর আছে।

—তার মানে? তুমি কী বুলতে চাহ? মুখ সামলে কথা, মুখ সামলে!

—ন্যালা বাঁচলে অনেক ভাল হয় জিন্নাত। ওর বাঁচা দরকার। আমি যা চাহি, তুমি তা চাহ না। কেন চাহ না, সেটাই ভাবছি। আমি এই হাসপাতাল ছেড়ে যাব না। আমি রইলাম। মুখ সামলে কথা বলতে পারি, কিন্তু তাতে জীবনটা সামাল পড়বে না।

বলে রাহুল দ্রুত বারান্দা ছেড়ে গেট পেরিয়ে হাসপাতালের বাইরে গাছপালা ছড়ানো ছায়ায় একটি কাঠের মস্ত পড়ে থাকা গুঁড়ির উপর বসে পড়ে। তারপর হাতে করে একটি শিশির-ভেজা ভোরের নাড়ার নর আঙুলে জড়াতে জড়াতে হাসপাতালের দিকে চায়। হঠাৎই মনে হয়, জিন্নাত যথেষ্ট সন্দেহজনক, এ মানুষ স্বাভাবিক নয়। শশাঙ্কর হয়ে সব কথা বলতে চাইছে, মানুষের এই 'রকমটা' কখনও ভাল হয় না। হয়ত জিন্নাত শশাঙ্কর চেয়েও পাপী। একজন তুচ্ছ দালাল লোক। কষাই। নিশ্চিত ন্যালা মরে যাবে, জিন্নাতও বুঝতে পারছে, তবু কী চাহ, কী বুলতে চাহ, এই ধরনের বাক্যস্ফূর্তি দেখে কথার গন্ধেই লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না রাহুল। ফের, ধন্দমন্দের কথা, সেই কথা নিজে মুখেই উচ্চারণ করে ফেলেছে বান্দাটি। কেন? এমন পাকমারা কথা মনে এল কেন লোকটার! আঙুলে জড়ানো এখন শুকিয়ে ওঠা নাড়ার নরটি ফেলে দেয় সে। সিধে হয়ে বসে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আনমনা। একাই সে হাসপাতালে দৌড়ে ছুটে এসেছে। বাড়ি যায়নি। পায়ের চটি ডোঙায় রয়েছে, আসার পথে বাঁধের রাস্তায় উঠে ডোঙাটি আর চোখে পড়েনি। চোখে ঝলসে উঠেছে শশাঙ্কর সাইকেলের ঝকঝকে রিমের ঝলসানো সূর্যালোকের রশ্মিফলাকা, চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

এখন ধন্ধ কথাটি ক্রমশ আর নিরর্থক মনে হয় না। তা ছাড়া ডাক্তারের কথা শুনে তার পিত্তি আরও তেতো হয়েছে। সে নাকি কথা মুখস্থ করে এখানে বলবার জন্য এসেছে, এমন সংলাপ রাহুল জীবনে শোনেনি। তার ভাষার মধ্যে কি কোন রাজনীতির ঘ্রাণ এসে লাগল তখন! নল ঢোকাচ্ছে দেখেই মাথাটি খারাপ হয়ে যেতে চাইল, কথা তো আপনিই তৈরি হয়ে এল জিভের ডগায়। সে যেন দাবিসনদ পেশ করে ফেলল, চিৎপুর গ্রামটি বোধহয় এমন করে কথা বলে না? চিৎপুর কি কখনও লাল রুমাল গলায় বাঁধেনি?

তাই তো, চিৎপুর তো ন্যালার প্রহারে এতটুকু কঁকিয়ে ওঠেনি, হাওয়া বিবির মতই চুপ করে আছে। কোদালকাটির জলোচ্ছ্বাস কেন তবে একলা রাহুলের বুকের মধ্যে গুমরে মরছে! তাই কি জিন্নাত রাহুলের আচরণে ধন্দ দেখতে পায়? হতে পারে, বেচারি জিন্নাতকে অতিরিক্ত সন্দেহ করছে রাহুল! করছে না কি? রাহুল ভাববার চেষ্টা করে।

এভাবে সারাটা দুপুর গাছের তলে বসে থাকে রাহুল, দু-একবার উঠে গিয়ে রুগীকে দেখে আসে। নল এখনও ঢোকানো আছে, ক'এক বোতল স্যালাইনও টেনেছে আমানি, মনে হচ্ছে বেঁচে যেতেও পারে। শরীরে অনেক রোগ আছে ছেলেটার, মারের চোটে সেই

সমূহ রোগ তাকে অধিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলবার চেষ্টায় চোখের পাতা নড়ছে। শশাঙ্ক তাই দেখে হাসপাতাল থেকে নেমে প্রসন্নচিত্তে সাইকেল হাঁকিয়ে তৈমুরের দোকানে চলে গেল। যাওয়ার সময় রাহুলের দিকে সেই হিম দৃষ্টি বিঁধিয়ে দিয়ে শাঁ করে উড়ে, রিমের আলোয় ঝলমল করতে করতে চলে গেল।

রোগীর কাছে পায়ের তলায় বসে আছে মোসলেম ঘাড় গুঁজে, পাশে তার লাঠিটা ধূলায় মলিন, পড়ে আছে। মাথার চুলে, ভুরুতে ধূলার রেতি পড়েছে, নাকের ছিদ্রের বেরিয়ে থাকা চুলে ধূলার সূক্ষ্মকণা লেগেছে, শীতের রোদ তবু ঘামে মুখ তামাটে। আমানির মাথার কাছে ঘোমটা টেনে নিঃশব্দে কাঁদছে মা হাওয়া। দালাল ওরফে কষাই জিন্নাতকে হাসপাতালের কোথাও দেখতে পায় না রাহুল। অলক্ষ্যে কোথাও গেছে, হয়ত চা পান করতে এবং পান খেতে।

জিন্নাত আলি, হিম্মত আলি আর কদম আলি তিন ভাই। একজন চোর, একজন কষাই এবং হিম্মত ক্ষেতমজুর, মাঝে মাঝে ঝাঁকা করে মুরগি কিনে বহরমপুর চালান দেয়। বয়স কম, তাজা জোয়ান। হিম্মত চোরাচোট্টা নয়, মামুলি সাদাসিদে ছেলে, নতুনই বিয়ে করেছিল, বউ ভাত খায়নি, পরিবারে চোরের বদনাম আছে বলে ; বউটি রাঢ়ের কোন এক হাজী সাহেবের মেয়ে। সেই কারণে হিম্মতকে ইদানীং খুব দুঃখী দেখায়। সে হাসপাতালে এসেছে দেরিতে, ন্যালাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে কিছুক্ষণ, ডাক্তার এবং শশাঙ্কর সঙ্গে রাহুলের তপ্ততর্কের সময় সে এসে পৌঁছায়নি। রোগী দেখে সে আর দাঁড়ায়নি, গাছতলায় রাহুলকে দেখে এগিয়ে এসে বলে—আর কেন রাহুল ভাই! যান, চলে যান। এই কথা বলে কেমন ম্লান করে হেসেছে হিম্মত। তার মুখের ওই ম্লান হাসি, গলার স্বরের মৃদুতা এবং বক্র নিরীহ হতাশার মধ্যেই ন্যালার প্রহার যে বড়ই কৌতুকময় রাহুল অনুভব করেছে। ওই কথা বলে হিম্মত ধীরে ধীরে উদাস ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে গাছের ছায়া ছাড়িয়ে সড়কে উঠে চলে গিয়েছে। তবু সমস্ত দুপুর রাহুল হাসপাতালের বাইরে বসে রইল। বাড়ি ফিরে এল বিকেলের দিকে।

তার নিজেরই বলা হাসপাতালের কথাগুলি নিজের কানে ধ্বনিত হতে শুনতে পায় রাহুল। মনে মনে লজ্জা পায়। তিনদিন এভাবে কাটে। হাসপাতালে সে আর আসেনি। তিন দিন পর এসে একলা একলা হাসপাতালে ঢুকে বেডগুলি এবং বারান্দা দেখে ফেরে, কোথাও আমানির কোনও চিহ্ন পায় না। বুঝতে পারে, ন্যালাকে ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার। ডাক্তারকে বলা সেইসব—সেদিনের ডেথ সার্টিফিকেট চাওয়া, লাশ মর্গে পাঠানো, ময়না তদন্ত, ইত্যাকার দাবিগুলির অসারতা, অতিশয়োক্তি রাহুলকে এখন পাগল প্রমাণ করে দেয়। এমনকি মাস-জাজমেন্ট হবে বলে সে প্রায় স্পার্টাকাসের দ্রোহ জাগিয়ে তুলেছে নিজের মধ্যে, তা এখন কত নির্বোধের উক্তি বলে মনে হয়। এমনকি হাওয়া বিবিকে সে জেনি মার্কসের প্রতিমা করে তুলেছিল, তা-ও যে কি অবাস্তব বুঝতে পারে। ডোঙাটি একটি স্বপ্নের সাবমেরিন, চটি পড়ে আছে তার মধ্যে, তবু কবির কাছে যেতে তার মন চায় না।

কিন্তু বন্দুকটা কোথায় ? এটি যে সমস্যা। এক ভোরে ডোবায় মাছ ধরবে বলে রাহুল জাল ফেলে। জলে নামে। সাঁতরায়। জল ঘোলা করে। মাছ পায়। বন্দুক পায় না। নূপুর ডোবার ধারে বসে মাছধরা দেখে এবং ফড়িং উড়তে দেখে। হাসানপুর থেকে মণির সঙ্গে নাতাশা আসে বাড়িতে। এই ঠাণ্ডা জলে এত ভোরে মাছ ধরা দেখে বউদি আর নাতাশা। রাহুলকে সাঁতার কাটতে দেখে মা পর্যন্ত রে রে করেন। মণি হাসে। বউদি

অবাক হয়ে রাহুলের পাগলামি দেখে নাতাশার চোখে গম্ভীর বিস্মিত দৃষ্টি ফেরায়। ডুব পর্যন্ত দেয় রাহুল। পচা, বদ্ধ, নোংরা জল। রাহুলের কি ঘেন্না নেই! জলের তলে বাবলার কাঁটা পর্যন্ত আছে। এবং নির্ঘাত রাহুলের পায়ে ম্যাক করে একটি বাবলাকণ্টিকা বিদ্ধ হয়ে যায়। মাংসে ঢুকে পড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে জাল কাঁধে, সিক্ত বসন, লুঙ্গি সপসপে রাহুল মাছের খলুই হাতে করে উঠোনে এসে দাঁড়ায়, পিছনে নূপুর সুন্দরী।

আয়েষা বলেন—নাও, খুব হয়েছে বাপু!

রাহুল বলে—হ্যাঁ, একটা কাঁটাও ফুটেছে, বড্ড বিষ।

পায়ে কাঁটা ফুটেছে এবং যন্ত্রণাও হচ্ছে, তবু রাহুল যথারীতি ভেজা জাল বাঁশের ডালে মেলে দিল, স্নানের ঘরে ঢুকে সাবান মেখে স্নান করল, ভেজা লুঙ্গি মেলে দিল। নিজের ঘরটায় ঢুকে শুকনো পাজামা, গেঞ্জি পরল, মাথা আঁচড়ে দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় একটা বাঁশ-দড়ির মোড়ায় বসে নাতাশাকে ডাকল। নাতাশা মায়ের কাছে থেকে একটি সুতো পরানো মোটা ছুঁচ নিয়ে এল, সরু সোনামুখি এমব্রয়ডারির রুমালি ছুঁচ দিয়ে তো আর পায়ের কাঁটা খুঁচিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

মেঝেয় ছড়িয়ে বসে নাতাশা রাহুলের কাঁটাবেঁধা পাখানি কোলে তুলে নেয়। কাঁটা ইতঃমধ্যেই পায়ের গভীরে মাংসের তলে সেঁধিয়ে পড়েছে। পায়ের উপর ঝুঁকে, প্রায় মুখের কাছে পাখানি তুলে টেনে এনেছে নাতাশা। যেন সে পায়ে চোখ লাগিয়ে বসেছে অথবা নাতাশা যেন রাহুলের পায়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে, যাতে কেউ না শোনে তাই অমন করা। শুধু তাই নয়, নাতাশার মাথার চুল ঝাঁপিয়ে নামল রাহুলের পায়ের উপর, যেন চুলগুলি ওই কাঁটাটাকেই আড়াল করতে চাইছে।

নাতাশা খোঁচাতে শুরু করবা মাত্র একটি যন্ত্রণাক্ত মায়া সিরসির করে ওঠে। সেই মায়া পা বেয়ে শরীরে উঠে আসে রাহুলের। দোতলার রেলিঙে হালকা শীতের ওয়াড় পরানো কম্বল, নকশাদার কাঁথা মেলে দিচ্ছে চন্দ্রিমা, রোদ খাওয়ানোর জন্য। চন্দ্রিমার মনে হল, রাহুল যন্ত্রণাকে চেপে রাখতে পারে খুব। ভাইবোনের এই কাঁটা তোলার দৃশ্যটি বড়ই বিশিষ্ট। বোন তার শরীর দিয়ে ভাইকে ঘিরেছে, যন্ত্রণার চারপাশে বোনের হৃদয় ঝুঁকে নেমেছে স্নেহের সুষমায়।

—আহ্, সাবধানে তাশা! আস্তে!

—মোহর তোকে এক জোড়া গোল্ডেন কালার কলম দিয়েছে, আমার ব্যাগে আছে! ক্যাপের দিকটা অবশ্য সাদা, হাঁসের ডানার মত।

—দেখতে পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। অনেক ডিপে ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে বার করা উচিত ছিল, তুই এত কেয়ারলেস! একটা হল তোর ডটস রিফিল (ইয়ে)...মানে অন্যটা ফাউন্টেন।

—মানে বিন্দু। একটা থেকে আর একটা!

—মানে?

—মানে ডটস। কিছু না। সাদা ক্যাপ পরানো কলম। গোল্ডেন কালার।

—হ্যাঁ, তুই নিবি না?

—আলবাৎ নেব। কেন নেব না? দেখতে পাচ্ছিস, কতটা এসেছে? তুই আমার পা খুঁড়ে চলেছিস, আর আমার সেই কবিতাটা মনে পড়ছে?

—যথা?

—'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!'

—ধ্যাৎ ! তুই না, একেবারে যাচ্ছেতাই !

—হা হা হা ! কিন্তু তুই যে খুঁড়ে চলেছিস, একথা সত্য ! মোহরের বাবা জোতদার, না রে !

—কেন ?

—আহ্ ! তাই শুধোচ্ছি !

—তোর কিন্তু পাকামির আর শেষ নেই ! জোতদার তো কী হয়েছে ! আমার বন্ধু সম্পর্কে এরকম বাজে কথা বললে, আমি কিন্তু কাঁটা তুলব না !

—'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে !' তোলো তোলো পুষিরানী !

—কমল ! আমি পুষি ?

—হ্যাঁ, আমার এই শ্রীচরণ কমলেষু ! তুই তো কোলেই তুলে নিয়েছিলি বোন ! ঠিক হ্যায়, তুমি বেগম নাতাশা ।

—ভাল হবে না বলছি, ফেলে দেব তাহলে ! ধ্যাৎ ! বলে ঝামটা মেরে নাতাশা রাহুলের কাঁটাবেঁধা পাখানি কোল থেকে মেঝেয় টান দিয়ে নামায়। একটু তফাতে দাঁড়ানো রৌদ্র আলোকময় চন্দ্রিমা ভাইবোনের এই দৃশ্যে এখন আরও আমোদ অনুভব করে। একটি গোলাকার থাম ছেড়ে এদিকে বসন মেলতে সরে আসে। নতুন ব্লাউজ, শাল, শার্ট, শাড়ি সবই ভাঁজ করা, একটু ভাঁজ খুলে রেলিঙে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। থামের ওপাশে রইল কাঁথা, কম্বল, হালকা লেপ ।

তারপর নাতাশা রাহুলের মুখের দিকে গম্ভীর হয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অকারণ দন্ত বিকশিত করে দমকা সরব হাসি হেসে উঠে ভাইয়ের বিক্ষত পা কোলে তুলে নেয়। শান্তসুরে বলে—মণির পায়ে কিন্তু এখনই প্রচুর কড়া পড়ে গিয়েছে আর কী শক্ত ! তোর পা সত্যিই খুব নরম ।

এবার রাহুলের সত্যিকার যন্ত্রণা শুরু হয়। ছুঁচের খোঁচায় মস্তিষ্কের কোষে পর্যন্ত বিক্ষত আলোড়ন হয়। মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়তে শুরু করে। ঈষৎ মুখটা বেঁকে যায়। নাতাশা জোরের সঙ্গে হাত চালিয়ে দিয়েছে মনে হয়। ও যেন পুষিরানী বলার শোধ নিচ্ছে, বেগম বলার ঘা মারছে, কমলেষুকে বোঝাচ্ছে ; এ জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় খোকা ! এই দ্যাখ ! কাঁটা, কাঁটা, কাঁটা ! এই সবই মনে হয় রাহুলের। কাঁটা বার হয় এবং রক্ত ঝরে পড়ে। চোখ চিকচিক করে ওঠে ।

চোখের চিকচিক করা অশ্রু এবং মেঝেয় পতিত শোণিত লক্ষ্য করে চন্দ্রিমা। তার মনে হয়, রক্ত এবং চোখের জল যে-কষ্টের আড়াল থেকে আসছে, তা একটি কাঁটার দান নয়, ওর বুকে অন্য কষ্টও আছে। মোহরের কলম তাকে মোটেও আনন্দ দিতে পারছে না। মণির কড়া পড়া পায়ের প্রসঙ্গ তাকে ব্যথায় ভরিয়ে তুলেছে।

—ছেড়ে দে তাশা !

—দিই, এই নে ! হয়েছে ! দ্যাখ্, কত লম্বা ! ইস্ ! নাতাশা হাত তুলে দেখায় ।

রাহুল কাঁটার দিকে চেয়ে দেখে হাসতে হাসতে বলে—কন্টক ক্ষুদ্র হইলেও তাহার বিদ্ধ করবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এ তো ক্ষুদ্র নয় ।

—তাই কত বিষ ! রাতে তেল পলতের ছ্যাঁকা দেব, বিষ মরে যাবে ! এখন একটু পা পেতে হাঁটাচলা কর ! দাঁড়িয়ে ওঠ দেখি ! নাতাশা বলে রাহুলকে ।

—দাঁড়িয়ে ওঠা, এই দুই পায়ে, কী বলিস ! বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় কোমর সিধে করতে করতে রাহুল। বলে—ইতিহাসে মানুষের চার হাজার বছর লেগেছে ! আমি কিন্তু

দিব্যি দাঁড়িয়ে উঠলাম, মনেই হল না, কাজটা অত শক্ত ! তবে হ্যাঁ, এর পরও দু'পায়ের লাথি সহ্য করা ন্যালার কম্ম নয় নাতাশা, শশাঙ্ক ধসিয়ে দিয়েছে। কাজ কাম করে খেতে পারলে হয় !

—ন্যালা কে ? শঙ্কিত গলায় চন্দ্রিমা প্রশ্ন করে এবার।

রাহুল পা পেতে একটু হাঁটে, তারপর বলে—কদম আলির ছেলে। ইমান আলি নাম। আমানি বলে ডাকা হয়। ললিতের বাগাল। চাষ জুড়েছিল, গরুর পায়ে ফাল লাগে। সেই অপরাধে শশাঙ্ক তাকে পেটায় বেধড়ক। এত মারে যে ওর কিছুই আর আস্ত থাকে না। সেই যে বেহুঁশ হয়ে গেল, বোতলের অক্সিজেন টেনে তবে হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে। মাকে সব বলেছি। তোমাদের বলিনি বলে জানো না।

—হ্যাঁ, মা আমাকে বলেছেন সব। আমি আর বুলবন গত রাতে দেখে এসেছি। মা সঙ্গে গিয়েছিলেন। তুমি তখন চারাতলার মাচায় বসেছিলে ! 'ন্যালা' বললে বলে চট করে কম্যুনিকেট করতে পারিনি। আমার ধারণা হল, ওর কোন চিকিৎসাই হয়নি। ডাক্তাররা দেখেননি মোটে ! মন্তব্য করে চন্দ্রিমা।

রাহুল আরও দু'পা হেঁটে নেয়, এই প্রথম এতদিনে চন্দ্রিমার সঙ্গে সরাসরি কথা হচ্ছে ওর। ওরা কথা বলে চলেছে, অন্তত রাহুল সেসম্পর্কে সচেতন নয় এখন। ওর পায়ে রক্ত ঝরছে। চন্দ্রিমা লক্ষ্য করছে। হঠাৎ ছুটে গিয়ে ঘর মোছার একটি ভেজা ন্যাতা টেনে আনে কোথা থেকে এবং ডেটল আর তুলো এনে নাতাশার হাতে দিয়ে বলে—লাগিয়ে দাও। আমি মুছে দিচ্ছি। বলে ন্যাতা বুলিয়ে রক্ত মুছতে থাকে চন্দ্রিমা।

রাহুল আবার মোড়ায় বসে পড়ে। এই সময় ওদের মধ্যে আয়েষা এসে দাঁড়লেন। বললেন—বাপটি চোর, কোথায় আছে, কেউ জানে না ! মা লাট-কাটনি, মুরগি পালে। হাত-পয়া মেয়ে, বাড়ির মাচায়, চালে, উঠোনে সবজি ফলায়, এমন গরিবকে খোদা দেখেন, মানুষ তো দেখে না বউ মা। এখন অমন করে মেরেছে বলে ললিতরা দুই তিন ভাই মিলে হাওয়ার ভিটেয় পাক পাড়ছে ! এদিকে লোকে বলাবলি করছে, চাঁদির জুতো মেরে ললিত নাকি ওই ফ্যামিলির মুখ বুজিয়ে রেখেছে, কান্নাকাটি পর্যন্ত নেই। ...

—কাঁদবে মা, সময় হোক ! বলে উঠল রাহুল। তারপর বলল—যখন হাওয়া বিবি গাড়ি করে ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি সঙ্গে ছিলাম, হাঁটছি। বললাম, হাওয়া বিবি, সুর করে কাঁদ, লোকে শুনবে। তবু বেচারি কাঁদতে পারে না। অথচ এদের কান্না অন্য সময় শুনেছি, ডাক ছেড়ে কাঁদে, তখন দুপর রাত অথবা ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। এই কান্না যে না শুনেছে, সে বুঝবে না।

আয়েষা বললেন—সময় সেইটে নয় খোকা। হাওয়া বুকে পাষাণ বেঁধে আছে, তাই কাঁদছে না। তাছাড়া ওর কান্নাকে পাহারা দিচ্ছে ললিতরা, কাঁদতে পর্যন্ত দেবে না। এই করলে খোদার আরশ তক কেঁপে যায় দোলা !

নাতাশা ভাইয়ের পায়ে ডেটল লাগাতে লাগাতে বলল—একটা কথা বলব মা ! তুমি রাগ করবে না ! বলে পিছন ফিরে একটি হাঁটুর উপর যা দেখতে 'দ' আকৃতির, তাতে ভর দেয়, অন্য পা মেঝেয় পাতা, নাতাশা চোখ মেলে মায়ের উপর। এবং বলে ওঠে—আরশ কাঁপে, নাকি রাহুল ? কিন্তু ভূমিকম্প না হলে চিৎপুর সুনসান। ন্যালা যদি ললিতের ছেলে হত !

রাহুল এক তীব্র বিপন্নতায়, অবরুদ্ধ ক্রোধে, অসহায়তায় বলল—থাক বউদি, আর মুছতে হবে না।

রাহুলের মনে হল, বউদির আন্দোলিত হাত তার শরীরের রক্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতড়াচ্ছে শুধু।

আয়েষা বললেন—দু'ফোঁটা রক্ত পড়েছে, কিন্তু তাইতেই বিষ কম না বাপু !

নাতাশা বলল—তুমি দ্যাখনি মা, দু'ফোঁটা নয়, এই দ্যাখ কাঁটার চেহারা ! আয়েষা কাঁটা দেখে আঁতকে উঠলেন, তারপর বললেন—রাহুল সহ্য করতেও পারে বউমা। ওই ডোবায় নামবার দরকার কি ছিল ! ওতে বাবু কাঁটা ফেলেছেন। ফুলভানু ওকে মানা করল না পর্যন্ত, আমি কতদিকে চোখ রাখব ! যখন পানিতে নামল কত করে বলেছি, কে শোনে কার কথা !

ফুলভানু খড়ের ঝাঁটা হাতে করে এদিক ওদিক আপন তালে ঘুরে মরছে, দোতলায় কেন এসেছিল সেই জানে, মায়ের মন্তব্য গোচর হয় তার, অমনি মুখে কথা ফুটে ওঠে—আ মরণ ! আমি কি চোকের মাথা খালাম নাকি, হায় হায় ! পারভিচ ভাইরে ক' বলনু, নামোনি, পায়ে ম্যাক হবে, ভাই রে পুছো দিকিন ! তুমার খালা মুকের আটাকাঠা নাই !

—নে হয়েছে, আমি তোকে কিছু বলিনি ফুলভানু, খ্যামা দে ! তুই বলেছিস, রাহুল শোনেনি, হল তো ?

—হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা ! কথার লিকে কথা, কথা গড়গড়ায়। না হলে কথা ধাক্কা খায়। জানু না মুই ! বলে মুখে কেমন ঝামটা দিয়ে ওঠে ফুলভানু। তারপর মেঝেয় ঝাঁটা চালাতে চালাতে আপন মনে কথা বলে যায়—শশাঙ্ক বুলে কি আমানি মুক করেছে তেনার মায়ের নামে। তুমি ভদ্দরনোক, তোমার লিক আর আমানির লিক কি এক ? বোজেন মহাজন !

ঝাঁটা থামিয়ে রাহুলের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ফুলভানু। রাহুলের সামনে এসে একটা হাত দরবারের প্রার্থনার মত, কুর্নিশের ভঙ্গিমা যেনবা কিছুটা, পাতে।

—আমি মহাজন নই ফুলভানু ! গম্ভীর স্বরেই বলে উঠল রাহুল।

আয়েষা বললেন—একদিন দেখছি ওইটে হয়েছে ফুলির কথার ধরতাই, কোথায় মহাজন আছে ওই জানে।

এই এতটুকু কথাতেই ফুলভানুর মুখটা বেদনায় টসটস করে ওঠে। ওর বোধহয় বাবুর কথা মনে পড়ে গিয়েছে। চোখ ছলছল করে। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ বোজে। ধরা গলায় বলে—মহাজন আছে খালা ! যে কাঁদে না সে কি দরবার করে না ? মরদ ক্যাকন মরল, কাঁদনা ত্যাকন গলায় ছেলো না দিদি ! চন্দ্রিমার দিকে চেয়ে ফুলভানু সসম্ভ্রমে দিদি ডেকে বলল—কাঁদিনি। মুকে কাঁদনা নাই, বুকে তো আছে। নাই ? হাওয়া বিবি ধুকধুকে ছেলেকে ছাড়ে এক ডণ্ড নড়ে না। চোকের সামনে বাছা শুকায়ে যায়, ধড় মরে, গলার ধুকধুকি থামে যায় হঠাং করে, ফের দম পড়ে, কথা ফুটে না দিদি ! এমন মরণ আগলাবার জন্যি নারীলোকে জম্ম লিয়েছে মায়ের কোখে। কদম আলি ফেরার ! বোজেন মহাজন ! বলে আবার রাহুলের সামনে প্রার্থনার হাত পাতে ফুলভানু।

আয়েষা বলেন—এ কদিন ফুলি কদমের বাড়িতে গিয়েই এবেলা ওবেলা পড়ে থাকছে, কাজে মন নাই।

ফুলভানু সঙ্গে সঙ্গে বলল—মুনের মাথা খাই মুই। মুন থাকলে তো মুন দিব ! বলে সে ঝাঁটা হাতে রাহুলের ঘরে গিয়ে ঢোকে। আবার আপন মনে বকতে থাকে। বারান্দা থেকে ওর কথা শুনতে পাওয়া যায়। আমানির মুমূর্ষু জীবন তাকে কতখানি উতলা করেছে, শশাঙ্কর মার তাকে কীভাবে বিদীর্ণ করেছে, তার উৎসারিত ভাষায় সেই বেদনা

ধকে ধকে উঠছে। কোন এক মহাজনের উদ্দেশে সে বকে মরছে, রাহুলের সামনে হাত পেতে দাঁড়ানোয় রাহুল ধাক্কা খেয়ে সিধে হয়ে বসে, রাহুল বিচলিত বোধ করে।

চন্দ্রিমা বিস্ময়-মূঢ় স্বরে শুধায়—লিক কী মা ?

আয়েষা হেসে ফেলে বলেন—লিক হল পথের রেখা। গরুগাড়ির পায়ার দাগে লিক বসে, মাথার সিঁথি হল লিক। সামনের গরুগাড়ির লিকে পিছনের বলদ হাঁকায় কিষেন, নইলে কাদাখন্দের পথে চাকা দেবে যায়। ন্যালার কথার লিকে ন্যালা চলবে, শশাঙ্ক কেন সেই লিকে এসে পড়ল ! ফুলভানুর ভাষার আলাদা দিশা দোলন !

রাহুল আচমকা মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—আমি আসছি ! বলেই দোতলার বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল।

—যাস না মেজখোকা ! পায়ে রক্ত পড়বে !

—পড়বে !

—ধুলো কাদায় ঘা হবে, পুঁজ হবে। সেপটিক হবে।

—হবে না, বউদি ডেটল দিয়েছে।

—কোথা যাস !

—আসছি !

খালি পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাহুল অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে কদমের কুটিরে পাকাটি ঘেরা উঠোনে এসে দাঁড়ায়, এই সকালের আলোয়। রোদ চড়েছে। দুপুর হতে দেরি তখনও। নীচু মাটির দাওয়া, উঠোন থেকে একবিঘত খাড়া, ঝাপ্পি দোচালা, চালে কুমড়ার ফলানো লতা, ফুল, কুমড়ো—ঘরটা হুমড়ি খেয়ে উঠোনের দিকে ঝুঁকেছে। লাউ, ঝিঙে, বরবটি, শশার মাচা উঠোনের ডাইনে বাঁয়ে, চালের পিছনে কচি একটি কাঁটাল গাছ খাড়া হয়েছে। ছায়ায় শীতল উঠোন ঝিম ধরে আছে। প্রচুর পেঁপেগাছের ছায়াও সন্নিহিত। দাওয়ায় কাঁথার উপর শুয়ে আছে ইমান আলি। শিয়রে নির্বাক মা। দাওয়ার নীচে ছায়ার মধ্যে একবিঘত উঁচু মোড়ায় চুপচাপ বসে ললিতমোহন। শরীরের চাপে মোড়াটি আলগা ঝুঁটির মত একপাশে এলিয়ে কাত হয়ে ভার সইছে, যেন লোকটি মানুষের মাথার উপর চেপে বসেছেন নির্বিকার। অত্যন্ত ফর্সা মানুষ, পা দু'খানি ধবধব করছে। যেন রক্তে চোবান।

রাহুল পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখেন। ফর্সা মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে। দুই চোখে জেগে ওঠে তীব্র অসহিষ্ণুতা। বিদ্বেষে ভরে যায় চোখ। সাদা হাফ শার্ট এবং ধবধবে ধুতি পরে আছেন তিনি। তবু তিনি অত্যন্ত সংযত স্বরে ডেকে ওঠেন—এসো রাহুল, দ্যাখো ছেলেটাকে !

রাহুল কোন কথা না বলে দাওয়ার খুঁটি ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায়। পনর-ষোলর কিশোর ন্যালার মুখ শুকিয়ে সরু হয়ে এসেছে, দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে, তার সেই আগের বলিষ্ঠতা আর নেই। ইমানের দেহে রাহুলের অদৃশ্য ছায়া লাগে। ছেলেটা চোখ মেলে আপনা থেকে। মা ঝুঁকে পড়ে ছেলের দিকে।

—বল বাপু। কথা কহ।

—মা গো !

—হ্যাঁ, বল্ আমানি ! কী খাবি ? ললিতমোহন সস্নেহে জানতে চান।

—আমাকে জিইরে রাখ মা, বাঁচিয়ে দে ! আমি আর কুকথা বুলব না, সোন্দর সোন্দর কথা কহিব মা রে ! আল্লার কালামের কিরা বড়বাবু। বুক দিয়া ফাল ঠেলব বাবু গো !

সুনা বন্ন ধানক্ষ্যাত মা, লোহু দিয়া আগলাব জননী। গরুর শাপে মানুষ মরে নাকি রাহুল চাচা! গরুর চোকে পানি ঝরে মা। কান্দে! কেন মুই ফাল নাগানু চাচা?

কান পেতে ভাল করে শোনার চেষ্টা করে রাহুল। তোতলা বটে, মন দিয়ে শুনলে ভাষা দুর্বোধ্য নয়। যেমন সে রাহুলকে লাহুল, 'আল্লার'কে আল্লাল, সোন্দরকে সোন্দল উচ্চারণ করছে। সোনাকে ছুনা বলছে। আগলাবকে আগলাল উচ্চারণ করছে। কিরাকে কিলা বলেছে, তবু অবোধ্য তো নয়! রাখোকে লাকো বলেছে তবু তাকে রাখবার মানুষ কে আছে। মারবার জন্যই তো বসে আছে ললিতমোহন। রাহুলের গলায় বেদনা দলা পাকিয়ে উঠল। ইমানের কষ্টের সামনে সে আর দাঁড়াতে পারছিল না।

দুটি একটি গরিব মানুষ, দু'চারটি ভিখিরি ইমানকে দেখতে আসছে সারাদিনই। দু'একজন মাঝারি মোড়ল, চাষী গেরস্ত, মোল্লামৌলবি, স্কুলের মাস্টার, ক্ষেত খামারের মানুষও একটু আধটু উঁকি দিয়ে যায়। করুণাঘন ম্লান এই মৃত্যু, এই অপঘাত, অজগর যেভাবে গ্রাস করে, তা চোখে দেখার সত্যিই কষ্ট আছে। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু সব কথা মুখে ফুটে বলার স্পষ্ট সাহস কারও হয় না। কেউ বলে, এ মরতই, জন্মরোগা মানুষ! কেউ বলে, হাসপাতাল এমনিই ছেড়ে দিয়েছে, দেখেনি। কেউ বলে, ললিতবাবুদের আর কী দোষ, এরা চেষ্টা তো কম করছে না, ভাল ডাক্তার এনে দেখিয়েছে! ওষুধপথ্য দিচ্ছে! হায়াত না থাকলে বাঁচে কী করে। কেউ বলে, আহা! গরিবের ছেলে গো! বড়ই ফাঁপরে পড়ে পরাণডা গেল!

গেল সত্যিই। রাহুল বাড়ি ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করল সেদিন। কিন্তু খেতে পারল না। রাতে ঘুমোতে পারল না। সারারাত বিছানায় ছটফট করল। ভোরে উঠে চা খেতে খেতে ভাবল, সে গোরাবাজার চলে যাবে। কবির সঙ্গে একবার তার দেখা করতে ইচ্ছে করল। কেন যেন উৎসাহ পেল না। মোহরের উপহার দেওয়া সোনালি কলম দুটি নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। ইতিহাসের সেই বইখানি খুলল। বাবাকে যখন পুলিসের কালোগাড়ি উঠিয়ে নিয়ে যায়, তখন এই বইখানি তার হাতে ছিল। এর পৃষ্ঠায় মৃত ধান-পতঙ্গের নষ্ট ডানার দাগ অক্ষরগুলিকে বিক্ষত করেছে, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ভারতবর্ষ একটি ভুল সভ্যতার দেশ। এর ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস নয়। আমানির সঙ্গে এই ইতিহাসের কোন যোগ নেই। রাজারাজড়ার যুদ্ধের কাহিনী, অস্ত্রের ঝনঝনা, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, সেই উচ্চ নিনাদ, সেই ঐশ্বর্যশালী যুদ্ধযাত্রা হাওয়া বিবির কণ্ঠস্বরকে কোথায় অশ্রুত রেখে বিজয় ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে, ইতিহাসের ভাষা ইমানের উপভাষাকে দাবিয়ে দিয়ে চেপে মেরেছে পলে পলে। ইমানের কণ্ঠস্বর রাহুলকে নিস্তার দিচ্ছে না। ঘুমাতে দেয় না। 'মানুষ যদি হই'—কখনও ভুলব না এই ঘটনা। মনে মনে বিড়বিড় করে রাহুল।

জামাকাপড় পরে সে বহরমপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল, এমন সময় দা হাতে করে দোতলার সিঁড়ির মুখের কাছে এসে দাঁড়াল হিম্মত আলি। অবাক হয়ে গেল রাহুল।

—কী হল হিম্মত ভাই!

হিম্মত বলল—আর কী হবে বলেন! দাফন কাফন হবে, কবর খুঁড়ব। বাঁশ লাগবে যে! মাকে বলেন, কাটি একখান, মাটিতে শোয়াব ন্যালাকে! বাঁচল না!

কবর যখন খোঁড়া হচ্ছে, শশাঙ্ক বলল—বাঁশ কোথা থেকে এল হিমু!

হিম্মত বলল—বাবুর বাঁশ, কেনে গো বাবু!

শশাঙ্ক বলল—উঠাও ! আমার কি বাঁশ-বাখারি নাই ! হিন্দুর জিনিসে দোষ থাকে তো বল্ তরফদারের বাগান থেকে বংশী কেটে এনে দিচ্ছে ! এই বাঁশ কবরে দিও না !

চয়ন মৌলবি বলবেন—বাঁশগুলি এক ধরনের ঘাস। গোর হল, বাঁশ মাটির পালকি, শশাঙ্কবাবু ! ঘাস নির্দোষ জিনিস, এতে ধর্মের দোষ লাগে না। আপনার বাঁশ দিয়েই গোর গাঁথা হবে। নাও, উঠাও হিম্মত, বাবু যা বলেন, তাই কর !

রাহুল চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মনে মনে বিড়বিড় করে উঠল, 'মানুষ যদি হই' এই ছবি, এই পালকি চিরকাল বুকের মধ্যে হুম্ হুম্ করবে, হুম হুমা হুমা হুমা...ঘাস মাটির পালকি, চয়নজি এ কোন্ কথা শোনালেন আপনি !

মিন্‌হা খলকনা কুম
অ ফিহা নঈদু কুম
অ মিন্‌হা নখরে জু'কুম
তারা তন উখরা ॥
ইস মিট্টি সে বনা হুয়ে হম,
ইস মিট্টি সে মিলনা হ্যায় হমে
আউর ইস মিট্টিসে উঠেঙ্গে হম ॥

[এই মৃত্তিকার তুমি, তোমাকে সেই মাটিতেই রাখা হল, আবার এ মৃত্তিকা থেকেই তোমাকে জাগিয়ে তোলা হবে]। কবরে তিনমুষ্টি মাটি ফেলল রাহুল। স্তব করল শ্লোকমালিকা। দূরে এক উঁচু ভিটের উপর চুপচাপ বসে আছেন ললিতমোহন। ঘাড় নীচু। পায়ের তলায় মাটির ছোট একটি দলা আঙুলে গুঁড়ো করে ফেলছেন। মাটিরই উপর বসে আছেন তিনি।

বুলবন রাহুলের পাশে এসে দাঁড়াল। দাফনের উচ্চারিত মন্ত্রটি শুনতে শুনতে হঠাৎ অন্যমনস্ক মুদ্রায় ভাবতে থাকল—এই মাটি ছাড়া বলশেভিক বাঁচে না, এই মাটিই তার জোরের জায়গা। তাকে মাটি ছাড়া করলে সে হীনবীর্য হয়ে যায়। হঠাৎ তারপর রাহুলের গায়ে হাত রেখে বলল—চ। বাড়ি চ।

রাহুল বলল— দাঁড়াও, আমাকে দেখতে দাও। তুমি দাফনের সুরাটা বুঝতে পার !

বুলবন বলল— তুই কি জানতিস না ?

রাহুল কথা না বলে চুপ করে রইল।

বুলবন বলল—সাড়ে তিনহাত জমি তো সবার জন্যই থাকে রাহুল !

—অ। দাঁড়াও। এতক্ষণে হাওয়া বিবি কাঁদছে ! মেয়েটা আর চুপ করে থাকতে পারল না। রাহুল আবেগজড়িত হয়ে বলে উঠল।

বুলবন বলল—এখন যে চোখের আড়ালে চলে গেল আমানি ! তাই হয়। রোজ ওই গোরের কাছে এসে কাঁদবে মেয়েটা ! আর নয় রাহুল ! এবার চল্। পারবি না। সইতে পারবি না।

রাহুল একটু দূরে সরে এসে দাঁড়িয়ে বুলবনের মুখে অতি স্পষ্ট চোখে চাইল এবারে। কথা বলল না। তারপর দৃঢ় পায়ে সমান পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলল।

—কোথা যাস রাহুল !

কথা বলে না সে। এগিয়ে যায়।

—কোন পাগলামি করিস না। এত লোক ! মাথা ঠাণ্ডা রাখ।

—নাহ্ !

রাহুল ললিতের সামনে এসে অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে সটান দাঁড়ায়। প্রথমে তার পায়ে চোখ পড়ে ললিতমোহনের, ধীরে ধীরে চোখ তোলেন তিনি। শিউরে ওঠেন রাহুলকে দেখে। কিন্তু স্থির থাকেন। বিমর্ষ স্বরে বলেন—কিছু বলবে রাহুল।

রাহুল এবার ঝুঁকে আসে ললিতের মুখের কাছে।

—আমার বাবা কোথায় ললিতবাবু। সাদা চৌধুরীকে কোথায় রেখেছেন ?

—আছে ভাল আছে।

—দেখেছেন আপনি ?

—না। কাল পরশু একবার...তাছাড়া বুলবনের চাকরিটা...

—তাছাড়া আমানির মৃত্যু, এটাও বলুন !

—কী বলব, দেখতেই তো পাচ্ছ !

—আচ্ছা ! ঠিক আছে। চলি !

—শোন রাহুল। আমাকে এভাবে ভয় দেখাবে না। খবরদার, এভাবে হুমকি দেবে না।

—তাই নাকি !

—হ্যাঁ, একদম ভয় দেখাবে না আমাকে।

রাহুল আর কোনও কথা না বলে তাদের ঝাড়ের বাঁশখানি যা কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে, কাঁধে তুলে নিয়ে বলে—ভয় আমারও কমেছে, ভয় আমাদেরও দেখাবেন না ললিতবাবু ! জুজুর ভয় আর করি না।

রাহুল এগিয়ে চলে সামনে।

॥ ১২ ॥

বুলবন তাদের বিয়ের সার্টিফিকেট, কোর্টের সিলমোহর করা একখানা চোথা মাত্র, চোখের সামনে মেলে ধরে দেখে অনেকক্ষণ। জমি যেমন রেজিস্টারি হয়, সম্বন্ধও রেজিস্টারি করে আদালত। একে বলা যেতে পারে শাদি-সনদ। সম্বন্ধ যখন ভাঙা হয়, আদালত সেই বিচ্ছেদকেও আইন দিয়ে সমর্থন করে। কিন্তু জীবনের অদ্ভুত পরিহাস, এমন এক বিয়ে সে করেছে, যাকে অবিশ্বাস এবং পক্ষান্তরে উপহাস করার মত ঘটনা যে হতে পারে, কল্পনাতীত সেই ঘটনাটি ঘটে যায় চাকুরির নামে। সে যদি চাকুরি না চায়, তবু সন্দেহ ঘোচে না। সমাজ যেন সন্দেহ করার জন্যই বসেছিল এতদিন। আদৌ বিয়ে হয়েছে কি না তাই যেন তীব্রতম কৌতূহলের বিষয়। সমাজ ভাবে, কমরেডদের বিয়ে না করলেও চলে। বিয়ে না করেও পার্টিতে যৌন অনাচার চলতে পারে, নেতা যদি মুখে বলে দেন, অমুক আর অমুক তোমরা দুটি বরবউ, তাহলেই হল।

মুসলমানের বিয়ে সামাজিক চুক্তি, সে কথা ধর্মশাস্ত্র লিখেছে। হিন্দুর বিয়ে মন্ত্রপুত সম্বন্ধ, সেই নির্বন্ধ প্রজাপতির অভিপ্রায়। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে যাই থাক, বিয়ে তো লোকাচারও বটে। সমাজ যদি সামাজিক চুক্তিকে ধর্মের সুরা-কালামের আবহে না দেখতে পায়, তাহলেই তার রুষ্ট হওয়ার কারণ ঘটে। হিন্দু যদি বা মন্ত্রকে, ছাঁদনাতলাকে, শুভদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে, সেই দৃষ্টান্তে সমাজের মাথাব্যথা সামান্যই হয়, কিন্তু লোহা-সিঁদুর শাঁখাটি তার দৃষ্টিশোভিত না করলে চমৎকার কলহ তৈরি হতে পারে। সামাজিক চুক্তির বেলা

সমাজ অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সুরা-কালাম আর লোহা-সিঁদুর শাঁখা— দুটি ধর্মসম্প্রদায়-গোষ্ঠীর বিয়ের প্রায় অলঙ্ঘ্য সামাজিক আবেগ। বুলবন এবং চন্দ্রিমা এই আবেগটির প্রবল ধাক্কার সামনে কিসের জোরে দাঁড়িয়েছে ! কোর্টের চোথা কি সেই আবেগের সামনে নিতান্তই এক টুকরো কাগজ নয় ! তবু নাকি তাই দেখিয়ে জীবিকার সন্ধান মিলবে, এমন প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছেন হিফাজত ডাক্তার।

চন্দ্রিমা আর তার সম্বন্ধ যে একেবারেই অবৈধ নয়, তারই প্রমাণ দাখিল করতে হবে। ভাবতে ভাবতে বুলবন চোথাটিকে হাতের মুঠোয় খামচে ধরল। যেন সে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ডকে দলিত করছে।

চন্দ্রিমাকে তাঁর মা অনুচ্চ দুর্বল কণ্ঠে বলেছেন— অন্তত সিঁদুরটা সিঁথিতে দিস মা ! নইলে কারো হোক বা না হোক বুলবনের অকল্যাণ হবে।

এমন করে বলো না মা, আমি পারব না !

আমি তাহলে তোর জ্যেঠা-কাকাদের কী বলব দোলন ! বলব যে তোর শ্বশুর-শাশুড়ি পছন্দ করে না ! কাকী জ্যেঠিরা তো বলবে নানাখানা করে ! একফোঁটা সিঁদুর কি তোর পার্টির সহ্য হবে না ! আমাকে একদিন তোর লেলিন সরণির অফিসে নিয়ে চ ; আমি বলব নেতাদের !

নেতাদের কী বলবে ! এই কলকাতায় কত মেয়েই তো সিঁদুর না পরে স্বামীর ঘর করছে !

তারা আমাদের জাতের লোক না দোলন !

তারাও মানুষ।

হোক মানুষ ! আমি তাদের বুঝতে চাই না ! তুই আমার মেয়ে, তুই আমার কথা শুনবি না !

বিয়েটা আমি আমার নিজের মত করেছি। তোমাদের কারও কথা তো শুনিনি মা !

কেন করলি। পার্টি বলল বলে করলি ! মানুষের বিয়ে হবে, তার উপর পার্টি খবরদারি করবে ! পার্টিই তোর সর্বস্ব হল, মা বাবা কেউ না ! এই জন্যে তোকে পেটে ধরেছিলাম দোলা। তোর বাবার মুখ চেয়ে এক ফোঁটা দে মা কপালে, টিপটা দে আগে ! স্বামীর মুখ মনে করে তারপর একটুখানি সিঁথিতে ছোঁয়া !

না মা, হয় না ! আমি যদি বুলবনকে বিয়ে না করে, পার্টির বাইরের কোন ছেলেকে বিয়ে করতাম, সেই স্বাধীনতা আমার নিশ্চয় ছিল, তবু আমি শাঁখা সিঁদুর পরতাম না।

কেন রে !

আহ্ মা ! ছাড়ো আমাকে ! আমি তোমার সঙ্গে তক্ক করতে চাই না।

স্বর্ণময়ী এবার ধরা গলায় প্রায় ডুকরে উঠলেন—এভাবে আমি বরবাদ হয়ে যাব, কখনও ভাবিনি ! শখ করেও তো দিতে পারতিস চন্দ্রিমা !

না।

এই পার্টি তোর সব শখ-আহ্লাদ কেড়ে নেবে বলে দিলাম। রক্তখেকো পার্টি ! রক্ত ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না।

এই সিঁদুরও কিন্তু রক্তই মা ! রক্তখেকো মানুষই এই রক্তের রেখা নারীর কপালে জোর করে এঁকে দিয়েছে। এটা কিন্তু এত শোভার জিনিস না। এতে কোন ধর্মও নেই। পুরুষের বলপ্রয়োগের চিহ্ন এসব। বুলবন আমাকে কোনকিছুতে কখনও জোর করেনি। করবেও না কখনও ! সিঁদুর যদি পরি তা-ও কিছু বলবে না। আর পার্টি ? তারও কোনও

হুকমনামা নেই যে, আমি সিঁদুর শাঁখা পরতে পারব না। এ আমার নিজস্ব অভিরুচির ব্যাপার! বলতে বলতে চুপ করে যায় চন্দ্রিমা।

স্বর্ণময়ী কঠিন চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—বেশ! তবে তোমার অভিরুচিই সার্থক হোক! কিন্তু একটি কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি দোলন। সিঁথি শূন্য করে এই বাড়িতে তুমি এসো না! সঙ্গে বুলবনও যেন না আসে।

কেন মা!

না। তুমি আসবে না। আমাদের অসুবিধা আছে!

কী অসুবিধা, আমি মেয়ে নই তোমার! সিঁদুর পরি না বলে আমি তোমার পর হয়ে যাব!

এই জয়েন্ট ফ্যামিলি আলগা হয়ে গেছে, কিন্তু বাড়ি তো একটাই। একত্রে থাকতে হয়। কাকা-জ্যাঠার বিবাহযুগ্যি মেয়ে আছে। তাঁরা বলেছেন.....

কী বলেছেন?

সেকথা তুমি আর শুনতে চেও না!

চন্দ্রিমার মুখের রক্ত মুহূর্তে কিসের তাড়সে যেন শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। এমন একটি মুখচ্ছবি কল্পনা করতে পারে বুলবন। সমস্ত ঘটনাই সে চন্দ্রিমার মুখে শুনেছে। সেই মুখটি বারবার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। শুকনো, সাদা, রক্তশূন্য এবং সিঁদুরহীন। আহত, নিষ্প্রাণ। চোখে অসহায় চাউনি, সকরুণ। গভীর কঠিন ব্যক্তিত্বময়ী মা প্রায় আছাড় দিয়ে সিঁদুরের কৌটো ড্রেসিং টেবিলের উপর সশব্দে রেখে দিলেন। চন্দ্রিমা সেই শব্দে চমকে উঠল। ঢাকনা খুলে গিয়ে কিছু গুঁড়ো টেবিলে এবং মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে, মা লক্ষ্য করেন না। চন্দ্রিমা কেন যেন কেঁপে ওঠে মনে মনে।

বুলবন সবই মনের চোখে অবিকল দেখতে পায়।

আমি তোমাকে এত ভাল বেসেছি কেন দোলন! মনে মনে বিড়বিড় করে বুলবন।

তোমার অসম্মান যাতে হয়, তা যে আমি কিছুতেই পারি না! মনে মনে একথা বলে সার্টিফিকেটটা মাঝ বরাবর দুভাগ করে ধীরে ধীরে ছিঁড়ে ফেলে। এই জিনিস দেখিয়ে চাকরি, এ অন্যায় দোলন! অত্যন্ত কুৎসিত! বুলবন আবার ছেঁড়ে দ্বিতীয় দফা। ছিঁড়তে ছিঁড়তে মনে হয় বুকের উপর থেকে একটা কিসের যেন ভার নেমে যাচ্ছে। আর না, এভাবেই থাক এই বিচ্ছিন্ন প্রমাণপত্রখানি। দেখে যাতে বুঝতে পারে চন্দ্রিমা। হৃদয় ছাড়া আর কোনকিছুর বাঁধন রইল না। শাঁখাসিঁদুর নয়, খোদার কালাম নয়, এমনকি কোর্টের সাক্ষ্যপ্রমাণদিও নয়, শুধু আদর্শ, শুধু আদর্শ, শুধু হৃদয়। 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।'

নীচের এই ঘরে এখন কেউ নেই, এই মধ্যাহ্নে। আছে বুলবন একা আর চন্দ্রিমার গভীর হৃদয়। চন্দ্রিমা দোতলায় শাশুড়ির ঘরে শুয়ে আছে। ওর জ্বর হয়েছে। হালকা একখানি লেপ গায়ে চাপিয়ে কাত হয়ে শুয়ে বালিশে মাথা রেখে স্বল্প জ্বরের গায়ে চন্দ্রিমা শরৎচন্দ্র পড়ছে। জ্বর হয়েছে বলে পার্টি-প্রোগ্রামে বহরমপুর যেতে পারেনি। অবশ্য এমন জ্বর গায়ে করে পার্টির কাজ করার ক্ষেত্রে তার কোন ওজর নেই, আয়েষা প্রায় জোর করে আটকে দিয়েছেন। মাকে অযথা চটিয়ে দিয়ে লাভ নেই ভেবেই দোলন আর জেদ করেনি। করলে সে জেদই করত, মাকে উপেক্ষা করত না। তার জেদ করার ভাষাটিও নরম, স্বভাবটিও মধুর।

বুলবন ভাবে, এই মাধুর্য এবং কোমলতা চন্দ্রিমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলেও, সে যে অসহায় তা বোঝা যায়। বুলবন নয়, এই ফ্যামিলিই ক্রমশ তার নির্ভরতার কেন্দ্র হয়ে উঠছে, সামান্য অর্থের প্রয়োজনেও তাকে শাশুড়ির কাছে হাত পাততে হবে একথা তার মত আর কে বোঝে !

রাহুলের মেসের খরচ জুগিয়ে তবে তো মা দেবেন ! নাতাশাকেও হাত-খরচ দিতে হয়। হুকুম আলির মাসিক বেতন আছে। ফুলভানুরও সামান্য হলেও কিছু দরমাহার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে হয়। মুনিষ পাটের মজুরি টানতে হয়। এতদিন বাপের চাকুরির মাসিক বেতনের টাকা এবং জমির খোরাক আর উপার্জন মিলে সংসারের যে স্বচ্ছলতা ছিল, তা যে আর রইল না। মা যে নিয়ত বুলবনের চাকুরির জন্য হাহাকার করছেন তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। রাহুলের কটাক্ষও অকারণ নয়। শত শতবার একথা ভেবেছে বুলবন এবং যেদিন অন্ধকার রাতে চন্দ্রিমাকে সঙ্গে করে প্রায় চোরের মত এ বাড়িতে ঢুকল সে, এ বাড়ি তাদের অত্যন্ত সাদরে ডেকেছে এমনও নয়, তবে বাবা থাকলে সবই যেন মানিয়ে যেতে পারত একথাও না ভেবে পারেনি। ওরা এসে পড়েছে, ঘরের বউ, বরণ করে নাও, লজ্জা পাচ্ছে ওরা, তাই সুন্দর—এভাবে বাবা গ্রহণ করতেন, একথা চন্দ্রিমার সঙ্গে শতমুখে মা পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার উৎসাহ দেখে বুলবন লজ্জা পেয়েছে, তারা এসে পড়ায় বিপদ যে ঘনীভূত হয়েছে, মা যেন সেই কথাই বলতে চেয়েছেন বারংবার। নানান প্রসঙ্গে এই কথাই উঠছে কেন বারবার ! রাহুল যে কষ্টেসৃষ্টে চালায় সে কথা যখন রাহুল নিজেই মায়ের সামনে বলে, তখন অধোমুখ হয়ে বসে থাকে বুলবন।

তোমরা তো চাষবাস করতেও পারবে না বড়খোকা ! কলেজ ছাড়িয়ে এনে রাহুলকে তো আর চাষে জুড়তে পারি না ! মা বলেছেন। এবং বলেছেন— পার্টি পলিটিক্সের কাজ, তোমরা জোড়বেঁধে করবে, আমার সংসারে এ প্রায় বিলাসিতার জিনিস ! তবু মানায়, যদি তোমরা একটা চাকরির জোগাড় দ্যাখ ! তোমাদের পার্টি তো আর চাকরি বাকরি দেয় না।

বুলবন সেদিন মুখ ফসকে বলে ফেলল—আমরা মা, তোমার উপর সত্যিই কি খুব অত্যাচার করছি !

আয়েষা ছেলের টেবিলের উপর ভর্তি চায়ের কাপ রেখে ভেজা হাত আঁচলে মুছতে মুছতে বললেন—তোমাদের ইজ্জতের বিঘ্ন ঘটাই এমন হীন দরিদ্র ঘরের মেয়ে আমি নই বাবা ! চামেলির পেটে তেমন শিক্ষা বাপমা দেননি। বাবুর ছেলে কোন্ সাধে আমার ওপর অত্যাচার করবে। তোমাদের অবস্থার কথা কি আমি এককোঁটাও বুঝি না !

মায়ের একথা শুনতে শুনতে বুলবনের বুকের মধ্যে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। দোতলার বারান্দায় এইসব কথা হয় সেদিন, আমানির মৃত্যুর চারদিন পরে, রাহুল যখন গোরাবাজার মেসে চলে যাচ্ছে, মায়ের কাছে টাকা নিল হাতখরচের, সামান্য অর্থ, তাইতেই আবার সঙ্কটের চোরা চাপা বিক্ষত মুখটা বেরিয়ে এল। সেই সময় মণিও এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে মা সকরুণ চোখে চেয়ে রইলেন নির্বাক, তাই যথেষ্ট, বুলবন আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

গত রাতে বিছানায় পাশে শুয়ে স্বল্পস্ফুটস্বরে চন্দ্রিমা বলেছে, আমি ভাবছি, বহরমপুরেই থাকব।

কেন ?

আমি চোখের সামনে থাকলে মায়ের মনে চাপ পড়ে। প্রাণদার সঙ্গে সমির মামার

কথা হয়েছে, মামার গোরাবাজারের বাড়িতে থাকব। ওখান থেকে পার্টিপ্রোগ্রাম করব। মা যদি বোঝেন, আমার দায়িত্বটা পার্টির, তাহলে খানিকটা হালকা বোধ করবেন।

বুলবন কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল— তাইতেই কি মা খুব খুশি হবে ভাবছ! নাতাশা মামার গ্রামের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছে, মায়ের তাই নিয়ে সংকোচ আছে। ফের ঘরের বউ থাকবে তারই কাঁধের ওপর। মায়ের কাছে এ হবে আর এক বিড়ম্বনা!

ঠিক আছে, আমার তাহলে অন্যত্র ব্যবস্থা হবে! কিন্তু মামা প্রাণদার সামনে নিজেই এই প্রস্তাব দিয়েছেন কদিন আগে। মামা বলেছেন, চন্দ্রিমা গোরাবাজার এসে আপাতত থাক, পরে দেখা যাবে।

তা উনি নিশ্চয়ই বলবেন। কিন্তু প্রাণদা এখনও সমস্যাটাকে খুব সহজ মনে করছেন!

মোটেও না। বরং উনিই চান, আমি খানিকটা দূরে থাকি, মা সাইকোলজিক্যালি যাতে কিছুটা রিলিফ বোধ করেন, এ যুক্তি তাঁরই। আদিত্যবাবু পর্যন্ত একথা সঠিক বলে মনে করেন, আপাতত কিছুদিনের জন্য থাকি গিয়ে!

মায়ের সাইকোলজির তাহলে কিছুই বোঝা না তোমরা!

আমি যাব না?

না।

তোমার কষ্ট হবে!

অ। এই কথা?

অ্যাই, রাগ করলে? আমি তো একেবারে চলে যাচ্ছি না, মাঝে মাঝে আসব। তাছাড়া বিভিন্ন পার্টি প্রোগ্রামে আমাদের দেখা হবে।

কলকাতায় আগে যেমন হত! বেশ, তাই হোক। মনে করব যে, আমাদের বিয়েই হয়নি। এখনও আমাদের পূর্বরাগ চলছে। এই সময়টা যত লেংদি হয়, ততই সুন্দর।

রাগ ঠিক করেছ তুমি! কিন্তু এছাড়া উপায় কি বল!

উপায় তো প্রাণদা স্থির করেছেন, আমার বলবার কী আছে! তাছাড়া তোমার মনেও খুব চাপ পড়ছে বুঝতে পারছি, তোমারই রিলিফ দরকার!

কক্‌খোনো না!

তাই।

বেশ, তবে তাই। আমি চলে যাব। তুমি চাকরির চেষ্টা কর!

এই কথার পর ভয়ানক গম্ভীর হয়ে যায় বুলবন। তার হঠাৎ মনে হয়, চাকরি নইলে কোন অধিকারই যেন প্রতিষ্ঠা হয় না। সন্তানও যেন মায়ের হয় না, স্বামীও যেন স্ত্রীর হয় না। একথা তীব্রভাবে নিঃশব্দে বুকের কপাটে আঘাত করে যায়। সারারাত সে কাঠ হয়ে থাকে, কিন্তু ঘুমাতে পারে না। তারপর আজ এই মধ্যাহ্নে বুলবন তাদের ম্যারেজ-সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। রাত্রে বার কতক নিজের দিকে চন্দ্রিমা বুলবনকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কাঠের মত শক্ত হয়ে থাকে বুলবন। তাকে সামান্যই আন্দোলিত করতে পারে চন্দ্রিমা, হাত দিয়ে টানবার চেষ্টা করলে বিরক্তি আর মৃদু উষ্মা প্রকাশ করে স্বামী। তাতে দুচারবার চেষ্টার পর আহত এবং অপমান বোধ করে চন্দ্রিমা। বুলবন কিছুতেই তার দিকে মুখ ফেরায় না। কাত হয়ে ওপাশে মুখ করে স্ত্রীকে পিছনে রেখে প্রায় নির্বিকার পড়ে থেকে যায়।

ছেঁড়া চোথা শক্ত কাগজের ঈষৎ হলুদ খামের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটিকে হাতে করে বুলবন দোতলায় এসেছে ; যে-ঘরে শুয়ে জ্বরগায়ে চন্দ্রিমা নভেল পড়ছে, সেখানে এসে খাটের

পাশে দাঁড়ায়। চন্দ্রিমা জানে, এই খামের মধ্যে কী আছে! কিন্তু তা যে আস্ত নেই, তাই বা জানবে কেন! খামটা হাতে দেখে বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে চোখ সরিয়ে একবার স্বামীকে দেখে। চন্দ্রিমার চোখের কোণ দুটি সামান্য কুঁচকে ওঠে মুহূর্তে। চন্দ্রিমা যে তাকে দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়েছে সে কথা বুলবন অনুভব করতে পারে। তার হঠাৎ এখন মনে হয়, সে যে সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে ফেলেছে, এতে আহ্লাদিত হওয়া বা কষ্ট পাওয়ার কিছু কি আছে! তাহলে সে এমন বিচ্ছিন্ন কাগজের টুকরো খামে ভরে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন! স্ত্রীর সামনে এসে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়ার মানে কী? চন্দ্রিমাকে ঘটানাটি না জানাতে পারলে তার কি সোয়াস্তি নেই। এ নিয়ে নাটক না করলেই কি নয়? চন্দ্রিমা বলেছে, বিয়েটা তারও। সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরি যোগাড় করলে অপমান তারও হবে। এমনকি, কথাটার তাৎপর্য এরকম ছিল যে, অপমান যদি বুলবনের নাই হয়, না হতে পারে, কিন্তু চন্দ্রিমার হবে!

এখন যদি চন্দ্রিমা বলে, এই বস্তুটি যখন তোমার একার নয়, তা ছিঁড়ে ফেলার অধিকার কি কারও একার হতে পারে? এটা ছেঁড়া কি নীতি বা আইনসম্মত হয়েছে? চন্দ্রিমা কি আইনের কথা তুলবে? বুলবন নিজেকেই নিজে মনে মনে আশ্বস্ত করল, রাষ্ট্রের আইনকে অত সম্মান করার মত কোনও ধৈর্য চন্দ্রিমার নেই। এ তুচ্ছ, এ ঘটনা সামান্য। অতএব বেশ করেছি।

—কিছু বলবে? আস্তে করে শুধাল চন্দ্রিমা।

—না। অত্যন্ত ভীরুকণ্ঠে জবাব করে বুলবন। তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বারন্দায় বেরিয়ে এসে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল দুদণ্ড। অতঃপর সে ফের চন্দ্রিমার খাটের কাছে আসে। তার কাণ্ড দেখে চন্দ্রিমা এবার জ্বরের গায়ে শব্দ করে হেসে ফেলে।

—হাসছ!

—কেন হাসব না! ওই জিনিসটা নিয়ে এত যন্ত্রণা তোমার, তাই দেখে হাসছি!

—অ, তাই নাকি! তাহলে তোমার হাসিও পায়!

—দুঃখও লাগে।

—করুণা?

—তাও হয়! কেন হবে না! তুমি এখন যা করছ, তা দেখে সত্যি বলতে কি, আমার বেশ ঘেন্নাই হচ্ছে! দাও, আমাকে দাও ওটা, আমি রেখে দিচ্ছি, যখন চাইবে, আমি বার করে দেব।

বলে খাট ছেড়ে নেমে পড়ে চন্দ্রিমা, ওর বালিশের তলে চাবির গোছা ছিল, সেটি দেখিয়ে বলল— নীচের ঘরে স্টিলের আলমারিতে রেখে দিচ্ছি!

—না!

—কেন!

—রাখতে আমিই কি পারি না? কিন্তু এই চোথাটি.... থাক তোমায় বলে লাভ নেই, আমার যন্ত্রণা বুঝলে তুমি কখনও পালিয়ে যেতে চাইতে না। পার্টি প্রোগ্রাম আর যেন কেউ করে না! মামার বাড়িতে থেকে পার্টি করবে, এত আয়েসের জিনিস পার্টি নয় দোলন! এই গ্রাম তোমার ভাল লাগে না, বুঝতে পারছি, এই ফ্যামিলিও তোমার পছন্দ নয়। আমাকে না জানিয়ে আদিত্যবাবু, প্রাণদা তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কী করে গ্রহণ করেন? আমার ধারণা, এ তোমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত!

—এখানে আমার কী কাজ বলে দাও ! বাড়ির এই অবস্থায় তুমি নিজে কী করছ, তোমার কাজ কোথায় ?

—আমি কাজ সৃষ্টি করতে চাই। সদরঘাটে আমি যোগাযোগ করছি, ওখানে শরৎজন্মশতবর্ষের মাস-প্রোগ্রাম হবে।

—আর এই গ্রামে ?

—তা-ও হবে।

—কী, সেটা ?

বুলবন এবার চুপ করে যায়। কীভাবে সে গ্রামে কাজ শুরু করবে ভাবতে পারছে না।

—তুমি জান না ! চন্দ্রিমা মন্তব্য করে। চন্দ্রিমার এই মান্তব্যকে মোকাবিলা করার মত কোনও বাক্য সাজিয়ে তুলতে না পেরে বুলবন অসহায়ের চোখে মেঝের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ চন্দ্রিমা বলে—আমি পালিয়ে যাব বলে সত্যিই আসিনি বুবন। আমি শুরু করতে চাই। কিন্তু যে-সঙ্কটের মধ্যে এসে পড়েছি, তার জন্য প্রস্তুত তুমিও কি ছিলে !

—তাই যদি বোঝো, তবে আমার যন্ত্রণা দেখে তোমার হাসি পায় কেন ? এ যন্ত্রণা তোমার নয় ? আমি জানি, এ আমার একান্ত নিজস্ব কষ্ট। হ্যাঁ, আমার নিজের, আমার একার। অপমান তোমাকে যত লেগেছে। বাবুর ছেলে হয়ে আমার লেগেছে তার শতেক গুণ। আর সেকথা তুমি বুঝবে না ! তোমার তো ঘেন্না হবেই। ঘেন্না করেই তুমি খালাস, ব্যস !

চন্দ্রিমা বুলবনের অবস্থা দেখে ফের হেসে ফেলে, কিন্তু নিঃশব্দে। সেই হাসিও চোখে পড়ে যায় বুলবন চৌধুরীর। এ হাসিটা যে কত সকরুণ বুলবন অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। এই হাসির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ছিল না, ছিল সংযোগ, তা কিন্তু বুলবনের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না এ মুহূর্তে।

—এ তোমার একার লড়াই যদি মনে কর, করতে পার। কিন্তু তোমাকে পেতে গিয়ে আমাকেও একটি সমাজ ছেড়ে আসতে হয়েছে, সেকথা নিশ্চয় তুমিও মানবে।

—এ তর্ক নতুন করে কেন তুলছ চন্দ্রিমা ! তুমি ছেড়ে এসেছ, কিন্তু আমাকে প্রবেশ করতে হচ্ছে।

বলতে বলতে বুলবন এবার বাস্তবিক রেগে যায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে আসে। স্বামীর জন্য এতক্ষণে এক অপরিসীম মায়া অন্তরে ঘন হয়ে ওঠে চন্দ্রিমার। সে পিছুপিছু নেমে আসে নীচে। বুলবন একটি ট্রাঙ্কের ডালা তুলে খামটা ফেলে দেয় জামাকাপড়ের ভাঁজের এককোণে। দেখতে পায় চন্দ্রিমা। সে স্বামীর পিছনে এসে চুপিসাড়ে দাঁড়িয়ে বলে—আমরা শুরু না করতে পারলেও, একজন কিন্তু শুরু করে দিয়েছে বুলবন !

—কে ?

—রাহুল !...এসো, তোমাকে দেখাই। বলে স্বামীকে দোতলায় রাহুলের ঘরে টেনে আনে চন্দ্রিমা। টেবিলের সজ্জিত বইগুলির ভিতর থেকে টেনে বার করে বিশেষ কিছু পার্টি-ইস্তেহার। একটি পত্রিকা বার করে। একখানা লালবই পায়।

—যার জন্য বাবাকে এতদূর ভূগতে হচ্ছে, তাকেই ঘরে টেনে তুলল রাহুল। বিড়বিড় করে বলে উঠল বুলবন।

চন্দ্রিমা বলল—তুমি কোথায় প্রবেশ করবে, ও হয়ত অনেক দূর প্রবেশ করে

গিয়েছে।

—কী বলছ তুমি ?

—আস্তে বুবন, কেউ শুনতে পাবে। শোন, আমি আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। এই দ্যাখো, ওর ডায়েরিতে রাহুল কী লিখেছে!

স্ত্রীর কথায় ডায়েরির উপর ঝুঁকে পড়ে বুলবন। দেখতে পায় রাহুল লিখে রেখেছে অনেকখানি।

রাহুল লিখেছে, "মৃত্যু জীবনে অবশ্যম্ভাবী, একথা কৌম-মানুষও বুঝত! সেই 'ক্ল্যানএজের' কথা। গোষ্ঠী-মানুষের উপলব্ধি ছিল, মৃত্যু অনিবার্য। তাই সে তার আপন প্রজাতির সুখ আর সমৃদ্ধির জন্য আত্মবিসর্জন করাকে জীবনের ধর্ম মনে করেছিল। তার প্রবৃত্তির মধ্যেই গঠিত হয়েছিল আত্মবিসর্জনের শিক্ষা। প্রজাতিকে রক্ষা করার তাগিদে সে তার জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাত। সে তার বাসস্থানের চারপাশে পাথরের দেওয়ালে এঁকে রাখত তারই শিকারী-জীবনের নানান অভিজ্ঞতার বিবরণ। একটি দেশের বিপ্লবের জন্য আত্মবিসর্জনের এই প্রবৃত্তিগত প্রবণতাকে সচেতনভাবে বিপ্লবী শিক্ষার আলোকে এই সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে জড়ো করে তুলতে হবে। এবং ছড়িয়ে দিতে হবে। এটাকেই বলে বিন্দু ভাঙার কাজ। আমাদের রাজনীতি ব্যক্তিগত এই উদ্যোগ এবং আত্মবিসর্জনের রাজনীতি।"

আর পড়তে চাইল না বুলবন। ডায়েরির পাতা বন্ধ করে দিল। রাহুল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে কম্পিত কণ্ঠে বলল—আমি দুঃখিত কমরেড! ভেরি সরি! একটা চাকরির জন্য এত উতলা হওয়া আমার ঠিক হয়নি। আচ্ছা, এখন কী হবে বল তো! রাহুল তো মেসে চলে গেছে। ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। তুমি এইসব দেখেও চুপ করে আছ ?

চন্দ্রিমা চুপ করেই রইল। ডায়েরি, বই, পত্রিকা ইত্যাদি আগের মতই গুছিয়ে রাখতে শুরু করল আপন মনে। দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে এ বাড়ির। বুলবন গেঞ্জির উপর একটি পশমী মেশানো মসৃণ নস্যি রঙের জামা, ফুলশার্ট, মাথা দিয়ে গলিয়ে নেয়, শাদা পাজামা পরে, চটি গলায় পায়ে। তারপর বেরিয়ে পড়ার মুখে চন্দ্রিমাকে বলে—আমি তোমার জন্যে ওষুধ আনতে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হতে পারে।

চন্দ্রিমা বলল—ওষুধ কী দরকার! ঠাণ্ডা লেগেছে ও অম্নিই সেরে যাবে। আমি বাবার মেডিসিন বকস থেকে ওষুধ খেয়েছি।

—তাই নাকি, সারবে তাতে ?

—দেখা যাক!

—তার মানে, তুমি নিজের ডাক্তারি নিজেই করতে পার, এ তথ্য নতুন ঠেকছে! জানতাম না।

—আজ জানলে তো! আমি একটু পারি! তাছাড়া নিরীহ কিছু হোমিও মেডিসিন আমার মুখস্থ আছে।

—কাজে লাগাও।

—ফুলভানুর ঠাণ্ডাজ্বর আমিই সারিয়েছি।

—শ্বশুরের দাতব্য ডিসপেনসারি তুমিই তাহলে চালিয়ে নাও। বাবার কিছু বইপত্তর আছে, দেখে নিতে পার!

—আমি সেকথা ভেবেছি! আমানির মাকে আমি গতকাল ওষুধ দিয়ে এসেছি! তুমি ফেরবার পথে ওর একটু খবর নিয়ে এসো! কেঁদে কেঁদে মেয়েটা শেষ হয়ে গেল!

—যাব ! হাওয়ার বাড়ি হয়ে আসব ।

—একটা কথা তোমার মনে আছে !

—কী ?

—কমরেড জি.এস.-এর হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বেশ কৌতূহল ছিল, উনি হোমিওপ্যাথির মূল দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে বলতেন, ইট ট্রিটস দ্য পেশেন্ট, নট দ্য ডিজিজ-! রোগের নয়, রুগির চিকিৎসা। তার জন্য আসল রোগটা খুঁজতে হবে।

—হ্যাঁ, তাই নাকি ?

চন্দ্রিমা আঁচল দিয়ে শ্বশুরের চকচকে ওষুধের কাঠের বাক্স মুছে নিতে নিতে ঘাড় ঘুড়িয়ে বলল-হ্যাঁ, উনি বলতেন, রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, এর নানান ব্যাধি, বেকারি, ক্লোজার, ছাঁটাই, লকআউট, বিচিত্র অসুখে জর্জরিত। এই রাষ্ট্র বৃদ্ধ। পঙ্গু এবং জরাগ্রস্ত। মূল রোগটি পুঁজিবাদ। বিপ্লব ছাড়া এর কোনও চিকিৎসা নেই। সংসদীয় রাজনীতি এর ছোটখাট রোগ সারাতে পারে, তাতে রাষ্ট্রের প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসা। শুধু কোন পলিটিকস নয়, রেভ্যুলিউশনারি পলিটিক্স।

চন্দ্রিমা বলতে বলতে সহসা থেমে গিয়ে বলে—অ্যাই দ্যাখ, আমি কিন্তু ভাষণ দিয়ে ফেলেছি বুলবন ! মা শুনলে ভাববে, আমি স্বামীকে শিক্ষা দিচ্ছি !

বুলবন চন্দ্রিমার সলজ্জ ভঙ্গিমা দেখে মুগ্ধস্বরে বলে—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমরাও বোধহয় কোন একটা অসুখ হয়েছে।

চন্দ্রিমা এবার চমকে উঠে স্বামীর মুখের দিকে চাইল। বুলবন ম্লান এবং মধুর করে বলল—সদরঘাটে আমাদের একটা ঠেক দরকার ! ওখানকার কিছু তেমন লোকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমি এখন যাচ্ছি। তুমি ভেবো না, রোগ যাই হোক, আমি মরব না।

বলে মাথা নিচু করে বুলবন। তারপর ঘর ছেড়ে পথের উপর নেমে আসে। সাইকেল করে সদরঘাট পৌঁছতে সময় লাগে পঁচিশ মিনিট। সে যখন তৈমুরের দোকানের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে প্যাডেল মেরে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই কে যেন মেঠাইয়ের দোকান থেকে গলা তুলে হাঁক দেয়। 'ও বেটা, আরে ও বুলবন বাপজি ! শুনো, শুনো !'

বুলবন ব্রেক করে নেমে পড়ে সাইকেলের আসন থেকে, ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন চায়। একটু একটু পিছনে সাইকেল গড়াতে গড়াতে দোকানের কাছের সরু পাকা সড়কের উপর দাঁড়ায়। এই বাজারটির ভিতর দিয়ে নানানদিকে পাকা সড়ক আছে, হাসপাতালের দিকে, ঘাটের দিকে, সেনপাড়া, ধোপা পাড়ার দিকে। ফুটবল ময়দানের দিকে, হাইস্কুলের দিকে। সর্বত্র গেছে পথ, প্রধান সড়কে গিয়ে মিশেছে, বাস চলাচলের পথে, রিকশা এবং বাসস্ট্যাণ্ডের সঙ্গে জুড়ে গেছে, নেতাজী পার্কেও নেমেছে এই বিচিত্রমুখী পথরেখা।

বাঁশের খুঁটিতে হাত রেখে সামনে ঝুঁকেছেন শঙ্করপুরের হিফাজত ডাক্তার।

—আমি তোমাকে ডাকছি বাবা !

বুলবন লক্ষ্য করল, মেঠাইয়ের দোকানে খদ্দের দুএকটি একদিকের বেঞ্চে বসে প্লেটে করে মেঠাই খাচ্ছে। বাকি দুটি বেঞ্চে বসে রয়েছেন ললিতমোহন, প্রদীপ ডাক্তার এবং নাটা তরফদার। শরম আলিও কঠিন চোখে তাকে দেখছে।

বুলবন বলল—বলুন, কী বলবেন !

—ওপরে একটু উঠে আসবে না ? তোমার সঙ্গে কথা ছিল দুই নোক্তা ! তোমার

সার্ভিসের ব্যাপারে। আসো, আসো! আরে বাপু, তোমার মা আমার বহিন হয়, চামেলিবুবুকে শুধাবে, এই নাটা যেমন তোমাদের আত্মীয়, আমারও আত্মীয়, পর ভাবছ কেন বাপজি!

বুলবন বলল—মুসলমান সবার আত্মীয় ডাক্তারসাহেব! ধরলে ললিতবাবুও লতাপাতায় কৌমের লোক! আমার বাপঠাকুরদ্দার আগের জেনারেশন তো হিন্দুই ছিলেন। ওই প্রদীপবাবুও রিলেটিভ বটে।

হাসপাতালের ডাক্তার প্রদীপবাবু বললেন—আপনি ঠাট্টা করছেন দেখছি। আসুন, এই চেয়ারটায় এসে বসুন, কথা আছে!

বুলবন সাইকেলখানা দোকানের দেওয়ালে কাত করে রেখে উঠে আসে উঁচু ভিটার দোকানটিতে। চেয়ারে বসে পড়ে।

হিফাজত বলেন—তুমি কি তাহলে মাদ্রাসার চাকরি করবে না?

বুলবন গম্ভীর স্বরে বলল—না, ডাক্তারবাবু! আপনাদের দেখানোর মত কোন চোথা আমার নেই।

ললিত বললেন—দেখালে পারতে।

এই সময় ওখানে তিমির এসে ওঠে। প্রশ্ন করে—কী দেখাতে বলছেন!

—সার্টিফিকেট। বিয়ে করেছে কিনা তাই! মাদ্রাসা কমিটি চাইছে তিমিরবরণ। বললেন ললিতমোহন।

তিমির বলল—এটা ঠিক যে, সমাজ একবার অবিশ্বাস করলে, তাকে আর কনভিন্স করা যায় না। আমাদের দেশে যে বুর্জোয়া-বিপ্লব হয়নি, এটা তার প্রমাণ। আমরা সেইজন্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলি।

বুলবন সহসা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। কোন্ কথা থেকে তিমির কিভাবে পার্টির থিওরিতে চলে গেল! আশ্চর্য! বুলবন বক্রসুরে বলল—সেই বিপ্লবের কথা তো আর সোভান আলিদের বলছেন না আপনারা! সেকথা এখন ললিতবাবুকে শোনাচ্ছেন দেখছি। ললিতবাবুর দলের মধ্যে বরাবরই আপনার দল প্রগতিশীলতার ঝোঁক খুঁজে পায়। ইন্ডিকেট সিন্ডিকেট লড়াইয়ের সময় আপনাদের ভূমিকা তো খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এখন তো গুহার মধ্যে রয়েছেন আপনারা। দল কোথায় আপনার? জমির লড়াই তো জে. এল. আরও করবেন, তাই না?

তিমির বলল, আপনার কচকচি বাদ দিন তো! ও খুব দেখা গেছে? আপনি তো বিয়ে করেই দেশে বিপ্লব ডেকে আনবেন দেখছি! বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরি চাইতে আপনার লজ্জা করে না? হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করে এনেছেন ঘরে, তার কোন সম্মান নেই? যদি পারেন, ওই মহিলার সম্মান রক্ষা করুন, হিফাজত সাহেব, আপনি আর এর কাছে সার্টিফিকেট দেখতে চাইবেন না। কমিটিকে বলুন গিয়ে ওর কোন সার্টিফিকেট নেই। পার্টির বিয়েতে সার্টিফিকেট কিসের!

হিফাজত বললেন—অ্যাই তিমির, তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছ!

ললিত তিমিরকে বললেন—তুমি থামো তো! সব কাঁচিয়ে দিও না! বিপ্লব তোমরা কে কত করবে সব আমার জানা আছে। আমরা জমির সিলিং বেঁধে দিচ্ছি দাঁড়াও, সব হচ্ছে। তরফদারকে পর্যন্ত আমরা রেহাই দেব না। আগে আমাদের জয়প্রকাশের বিপ্লব ঠেকাতে হবে। এই লোকটাই ললিতনারায়ণ মিশ্রকে গুম করে দিয়েছে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের মামলা আমার নেত্রীর মুখ কালো করে দিয়েছে। একমাত্র গ্রিন রেভ্যুলুশনের

দ্বারা সেই মুখ উজ্জ্বল হবে। দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য নেত্রীকে এমারজেন্সি ঘোষণা করতে হয়েছে। এই জিনিস অফ হয়ে যাবে। তিমিরের দল ভাগজোতের লড়াই বাধাবে তখন। দাঁড়াও, দাঁড়াও। তার আগে ওই রাহুলটাকে সামলে রাখ বুলবন, প্রদীপবাবুকে ওই ছেলে অপমান করে গিয়েছে।

প্রদীপ বললেন—আমার কাছে হামলা করেছিল। আমানির ডেথ-সার্টিফিকেট আমায় কেন দিতে হবে! ন্যালা তো বাড়িতে মারা গেল। আমি কি মেরেছি, বলুন।

তিমির বলল—রাহুল খুব নকশালি করছে। ও মাস্তানি এ দিগরে চলবে না। মনে হচ্ছে, তারক গাঙ্গুলির ভাগ্নেটা ওর সঙ্গে আছে। ভাল ছেলে, রাহুলের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি একবার তারক মাস্টারকে বলুন ললিতবাবু!

নাটা তরফদার এবার মুখ খুললেন—তোমাদের সকলের কথা ভেরি অ্যাটাকিং তিমির। হিফাজত ওকে ডেকেছে কথা বলবার জন্য। ওর বাপ মিলিটারি মনে রেখো। বাবুর জেল হওয়াটা অন্যায়। রাহুল কিন্তু ছাড়বে না। ভেরি ডেঞ্জারাস ল্যাড।

হিফাজত বললেন—চল বাপজি, অন্য কোথাও কথা বলি তোমার সাথে। কাম, কাম! বলে তিনি প্রায় লাফ দিয়ে পড়লেন পথের পর। হাত ধরে টেনে বুলবনকে পথের উপর নামিয়ে আনলেন। মতিলালতলায় এসে পৌঁছলেন তাঁর সাইকেল গড়াতে গড়াতে। বুলবনও সাইকেল নিয়ে চলে আসে চুপচাপ। প্রবল এক ঘৃণায় তার হৃদয় দগ্ধীভূত হচ্ছিল। সে যেন আর কোনও কথা কানের পর্দায় স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল না।

হিফাজত তার চোখের সামনে 'জনমত' নামের একটি জেলা-সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা মেলে ধরে বললেন—বেগমপুর জুনিয়র হাইতে একটা পোস্ট ভ্যাকান্ট হয়েছে বুলবন। এই চাকরিটা তোমাকে আমি দেব, বাই হুক অর বাই ক্রুক। আমি ওখানকার কমিটির মেম্বার। বাপজি তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।

—করি না ডাক্তার সাহেব! ভাবছি, একটি পলিটিকাল পার্টি-লিডারের এই যদি স্ট্যান্ডার্ড হয়, যে কিনা বামপন্থী! যে কিনা জঙ্গী আন্দোলন করে মাঠে-ময়দানে!

—আমার কথা শোন বুলবন। আমি রাজনীতির চাটু নই বাবা! আমাকে ঘেন্না করো না। আমি প্রশংসা চাই না। বিপ্লবও চাই না। তোমার সম্মান চাই।

—আপনি ললিতের লোক!

—হ্যাঁ, লোক। কিন্তু চাটুকার নই। সাদা চৌধুরী আমার বন্ধু! এই পেপারে অ্যাড দিয়েছে কমিটি, দেখে রাখ। একটা দরখাস্ত করে দিতে হবে, আমি সেটা মুসাবিদা করেছি, বয়ান আমি লিখেই এনেছি। তুমি সই করে দাও। হ্যাঁ, এখানে দাও দেখি একটা সিগনেচার। এই দরখাস্ত নিয়ে আমি তোমার বাড়ি যেতাম বাবা! দেখা হয়ে ভালই হল, কমিটির লাইফ মাত্র আর এক মাস, তাই এত তাড়া। দাও দিকিন, হাত বাড়াও।

বুলবন অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে হিফাজতের চাপে দরখাস্তে সই করে দেয়। এতই কি তাড়ার জিনিস চাকরি, ভাবতে তার সাহস হয় না, তবু সে সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরিত করে।

রাত হয় ক্রমে। বুলবন ভৈরব নদীর ব্রিজের উপর একলা দাঁড়িয়ে থাকে। তার আর কিছুই ভাল লাগে না। বুঝতে পারে, এক কঠিন আবর্তের মধ্যে আজ সে প্রবেশ করল। রাহুলের জীবন ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠছে।

টর্চ জ্বেলে সাইকেল চালিয়ে সে হাওয়া বিবির বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির বাইরে পথের সীমানায় কবর হয়েছে ইমান ওরফে আমানি ওরফে ন্যালার। এখানে দাঁড়িয়ে তার বুকটা হাহাকার করে উঠল। কবরের কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ফিকে

জ্যোৎস্নার মধ্যে। কাছে এগিয়ে আসে বুলবন। দেখে, হাওয়া বিবি। বুলবন আর সাহস করে তাকে ডাকতে পারে না।

এমন সময় ফিকে জ্যোৎস্নাটুকুও মেঘের আড়ালে চলে যায়। রাস্তার উপর পাণ্ডুর আলো পড়ে মোটর বাইকের। বুলবন বুঝতে পারে, ললিত ফিরছেন। ওই আলো দেখে, শব্দ শুনে হঠাৎ ডুকরে ওঠে হাওয়া—বাপরে, ইমান আলি ! মুখের জুবান তোর জান লিলে বাপ গো ! কী কথা কইলি বাপ ! সুনার মুখে ওই ধারা বুলে নাকি বাপজান। কী করলি, এ তুই কী করলি সুনারচাঁদ ! হায় নবীজি, তুমার উম্মত যে জহরে কহরে যায়। আমার পাঁজরে দুশমনের হাওয়া লাগে খোকা !

ললিতের হাত কাঁপে। হৃদয় কাঁপে। এই গোর পার হতে গিয়ে তার রক্ত চঞ্চল হয়। তীব্রভাবে শ্বাস বয়। এমনকি মাথার ভেতরটা ঘুরে ওঠে। শশাঙ্ক কি মানুষ হবে না !

—শশাঙ্কবাবু আমারে মারে ক্যান্ বড়বাবু ! গরু কান্দে, আমো কান্দি। ও ললিতমোহন ! দাঁড়াও। আমি আসছি !

—কে ? কে ডাকে ? বলে চমকে ওঠেন ললিতমোহন।

শরম আলি বলে—কেউ না চলেন।

—না, রে ! ডাকছে মনে হচ্ছে।

মোটর বাইক থামিয়ে দেন ললিতমোহন। সামনের টর্চের আলোয় এই রাতে কবিকে দেখা যায় সামনে। তাকে দেখে কেমন অদ্ভুত চমকে ওঠেন ললিত।

কবি সামনে এসে বলে—মামা ! আমাকে চিনতে পারেন। আচ্ছা, রাহুলদের বাড়ি কোনটা বলুন তো ! নদী দেখতে এসে রাত হয়ে গেল ! এই বাড়িটায় একটা ছেলে মরেছে, মালিক মেরে ফেলেছে, তাই না ?

ললিতমোহন ফের শুনতে পান আমানি কবর থেকে বলছে—অ, বড়বাবু ! দাঁড়াও আপনি ! আমি আসছি।

ললিতের মোটর বাইক কিছুতেই কথা না শুনে নিঃশব্দ হয়ে যায়। গর্জে উঠতে গিয়ে কেবল গোঙায় মুহুর্মুহু।

॥ ১৩ ॥

চন্দ্রিমা নিপাট নিটুট করে সাজাতে ভালবাসে। ঘর সাজানোটা অবশ্যই শিল্প। নিজেকে সাজানোর চেয়ে ঘর সাজানো অধিক জরুরি। ঘরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারলেই ঘর প্রায় অর্ধেক সেজে ওঠে। জামাকাপড় বিছানাপত্র ধবধবে থাকবে, তা হলেই ঘরের আসল সজ্জা হয়ে গেল, ঘরে যেন ধূলাবালি না জমে ওঠে।

বুলবুল বলল—যেভাবে ঘর পরিষ্কার রাখো তুমি, বাবা দেখলে হাদিস আউড়াতেন, বলতেন ধর্মশাস্ত্রের দোহায় দিয়ে, 'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।'

নাতাশা উবু হয়ে নীচের ঘরের মেঝেয় ন্যাতা দিচ্ছিল জলসিক্ত কাপড়ের টুকরো বুলিয়ে, ডোলে করে জল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। হাত থামিয়ে বাঁ হাতে কানের ঝুলন্ত চুল ঠিক করে গ্রীবা সটান করে রেখে বলল—হ্যাঁ, আব্বাজি ঠিক ওই কথাটাই বলতেন বউদি !

চন্দ্রিমার মনে জেলবন্দী শ্বশুরমশাইয়ের যিশুমূর্তি ভেসে ওঠে। গায়ে সাদা উকুন হয়েছে। মন থেকে সেই দৃশ্য ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে সে বলে—পরিচ্ছন্নতা বিপ্লবেরও অঙ্গ ! নেতাজী যুদ্ধ পরিচালনা করতে চলেছেন, একটু বাদে তাঁর হয়ত মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে, তবু ফৌজিটুপিটা ঠিক মত মাথায় বসেছে কিনা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছেন তিনি। চুলটা আঁচড়ে নিয়েছেন ঠিকঠাক। এটাকে বলতে পার রেভ্যেলুশনারি স্পিরিট। কমরেড জি এস খারাপ, বানান ভুল, অযত্নে করা দেওয়াললিখন দেখলে চটে যেতেন। বলতেন, যারা সুন্দর বাক্য-গঠন করতে পারে না, তারা উন্নত সমাজ গঠন করতে পারবে না। ওয়ালিং দেখে যেন মনে না হয় দেওয়াল নোংরা করা হয়েছে !

রাহুল কখন দোতলা থেকে নীচে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ কেউ খেয়াল করতে পারেনি। রাহুল বলল—তা হলে কি বলছ, যারা সযত্নে ঘর গুছিয়ে রাখতে পারে, তারা বিপ্লবটাও গুছিয়ে তুলতে পারবে ! পরিচ্ছন্নতা দিয়ে ঈমান-ধর্ম রক্ষা পেলেও পেতে পারে, সব সময় বিপ্লব রক্ষা পায় না।

রাহুলের এই আকস্মিক আক্রমণের মুখে পড়ে এরা সবাই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। মেস থেকে রাত্রে ফিরেছে রাহুল, ভোরেই এই কাণ্ড। বুলবন দুর্বল কণ্ঠে বলল—তুই এত রেগে আছিস কেন রাহুল, রাগের কী হয়েছে !

রাহুল গম্ভীরস্বরে বলল—অনেক কিছুই হয়েছে ! আমার পড়ার টেবিল গুছিয়েছে কে ?

হাতের ঝাড়ন থামিয়ে ঈষৎ ভীতস্বরে চন্দ্রিমা বলল—আমি।

বুলবন এবং চন্দ্রিমা পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। চন্দ্রিমা নাতাশার চোখে চায়। প্রত্যেকেই রাহুলের উত্তপ্ততা দেখে বিস্মিত এবং অভিভূত হয়েছে। রাহুল সাধারণত এভাবে রেগে ওঠে না। ঝাড়নটা বিছানায় ফেল চন্দ্রিমা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসে। রাহুলের ঘরে ঢুকে দেখে, টেবিলের উপর থেকে তামাম বইপত্র রাহুল মেঝেয় ফেলে দিয়েছে। সমস্ত বিশৃঙ্খল করে তুলেছে। বাস্তবিক ভয় পেয়েছে চন্দ্রিমা, তার চোখেমুখে অপরাধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। রাহুল চাপা ক্রোধে অতিশয় গম্ভীর হয়ে চৌকির উপর বসে মেঝের দিকে চেয়ে দেখছে।

চন্দ্রিমাকে দেখে গজগজ করে ওঠে। তারপর মেঝেয় বসে কতকগুলো বই হাতে করে গোছাতে থাকে। সেগুলি চন্দ্রিমার দিকে বাড়িয়ে ধরে রাহুল বলে—এ সমস্ত বই, ম্যাগাজিন আমার টেবিলে রাখবার মানে কী ?

—ভুল হয়েছে আমার। ভেবেছিলাম, তুমি হয়ত ওগুলো পড়তেও পার। চোখের সামনে থাকলে, মানুষ তো টেনে দেখে পড়ে, পাতা ওল্টায় !

—মাই গেস্টস আর ফিউ, বাট সিলেকটেড। পৃথিবীতে অজস্র বই লেখা হয়, সবই কি আমায় পড়তে হবে ! চেয়ারম্যানের লিটারেচারের সঙ্গে এগুলো এমন করে মিশিয়ে রেখেছ ! এ ভাবে কি গেলানো যায় কাউকে ! তা ছাড়া আমার পড়ার বই সবাই ঘাঁটবে, এ আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। বিশেষ বই সম্বন্ধে মানুষের বিশেষ সেন্টিমেন্ট থাকে, থাকতেই পারে। পারে না !

—পারে।

—তা হলে রাখলে কেন ? নাও, ধর !

চন্দ্রিমা হাত বাড়িয়ে বইগুলি ধরে নেয়। চটি চটি বই।

—পাতি বুর্জোয়া ক্লাশের বই কেন পড়ব আমি ?

—পাতি বুর্জোয়ারাই তো বই লেখেন রাহুল ! কিন্তু দেখতে হবে কাদের জন্য লিখেছেন ।

—সত্যকে আড়াল করবার জন্যও বই লেখে এই শ্রেণীটা, লেখে না ? বিপ্লবের নামে বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য যত বই লেখা হয়েছে তার সংখ্যা নির্দেশ করাও কঠিন ।

চন্দ্রিমা ক্ষীণ একটা শ্বাস ফেলল । তারপর বলল—তুমি এতই যখন বোঝো, এই চটি বই ক'খানা পড়ে দেখলেই পারতে । ফেলে দিলে কেন ?

রাহুল ঠোঁট সামান্য বাঁকা করে হেসে বলল—ফেলে দিয়েছি, পুড়িয়ে তো দিইনি ।

চন্দ্রিমার স্বর ঈষৎ দৃঢ় হয়ে ওঠে—মূর্তি ভেঙে, বই পুড়িয়ে চিন্তাকে হত্যা করা যায় না রাহুল, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি ! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে ।

—একই বাড়িতে যখন রয়েছি, নিশ্চয় কথা হবে । কিন্তু এইভাবে কখনও আর বই রাখবে না । আমার ডাইরি খুলে পড়বে না । বলে রাহুল বাকি বইগুলি দ্রুত গুছিয়ে তুলতে শুরু করে ।

ধরা গলায়, অত্যন্ত নরম আর খাদের সুরে চন্দ্রিমা উচ্চারণ করে—আচ্ছা ! বলে সে চকিতে দুয়ার ছেড়ে সরে আসে । সেই সুরটা রাহুলের কানে লাগে, বউদি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছে বুঝতে পারে । একবার সে দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো চন্দ্রিমাকে চোখ তুল দেখার জন্য দরজার দিকে চায় । বউদি দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে চোখদুটি একটু মুছে নেয়, তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় ।

শ্রেণীঘৃণারও ভুল বর্শামুখ থাকে, যাকে বিদ্ধ করার কথা নয়, তাকেই সে বিদ্ধ করে বসে । এ কথা চন্দ্রিমাই ভাবতে শুরু করে দেয় । আবার ভাবে, তার চোখে সহসা কান্নাই বা আসছে কেন ? এই অবমাননা কি একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল ? মন্মথ কি রাহুলের মতই তাকে কতবার আঘাত করেনি ? তবু এ ভাবে চোখ চিকিয়ে ওঠা ঠিক নয় । অথচ বিস্ময়কর, অশ্রু বারবার এ ভাবে এসে পড়তে চাইছে ।

নীচে নেমে চন্দ্রিমা পার্টি-পুস্তিকাগুলি টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে দমন করার চেষ্টা করে অশ্রু । শুধু তাই নয়, চোখদুটিকে আড়াল করার জন্য দেওয়াল-ঘেঁষা আলনার ঝুলন্ত জামাকাপড়ের কাছে সরে আসে দ্রুত । জামা কাপড় নাড়াচাড়া করতে থাকে আনমনা । দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে । বুলবন বুঝতে পারে না, দোতলায় রাহুলের সঙ্গে চন্দ্রিমার চড়া কোন কথা হল কি না !

—বইগুলো কোথা থেকে আনলে ? বুলবন শুধায় ।

—উপরে ছিল ।

—রাহুল রেগে গেছে কেন ?

—কী জানি ! বলে চন্দ্রিমা আর কোন কথা বলতে চাইল না ।

বুলবনের মত নাতাশাও বুঝতে পারছিল, রাহুল তার বউদির সঙ্গে কোন মধুর ব্যবহার করেনি । নীচের এই ঘরখানি মোছা শেষ করে এনেছিল নাতাশা । ডোল হাতে করে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর বাইরের বৈঠকখানায় উঁকি দিয়ে বলল—বউদি, তোমার পেশেন্টের লাইন পড়ে গিয়েছে । ওই দ্যাখ ! আমি ঝাঁট ফেলে ন্যাতা করে দিচ্ছি, তুমি আর দেরি না করে বাইরে গিয়ে চিকিৎসা শুরু কর ।

বুলবন বলল—এইভাবে রোগী জড়ো হতে থাকলে, সামলাতে পারবে শেষে ? ওষুধের দাম নিচ্ছ নাকি দোলন !

—হ্যাঁ, চারআনা আটআনা করে ! শুনেছি, বাবা কিছুই নিতেন না ! আমি কী করে পারব ! বলতে বলতে আলনা থেকে একখানা ভাল শাড়ি টেনে নেয় চন্দ্রিমা। একটা ব্লাউজও তুলে নেয়। তারপর বলে—চিকিৎসার এ বি সি ডি জানি না, তবু মনে হল, বাচ্চাদের সর্দিজ্বর তো সারাতে পারি। মানুষের সঙ্গে মেলামেশার আর কোনও সুযোগ আমার নেই।

দোতলায় এসে শাশুড়ির ঘরে ঢুকে শাড়ি ব্লাউজ বদলে নেয় চন্দ্রিমা। শাশুড়ির চিরুনিটাই চুলে বুলিয়ে নেয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নেয়, চোখে কোনও জল আছে কি না।

আয়েষা নূপুরকে কোলে করে ঘরে ঢুকে কী যেন খুঁজছিলেন। রাহুল মায়ের কাছে আর একবার চা চেয়েছে। এ বাড়িতে চায়ের নেশা সবারই, সবার মধ্যে বুলবনের নেশাটাই কম। চা ছাড়া অন্য নেশা নেই। রাহুল মাঝে মাঝে শখ করে বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট টেনেছে দুচারদিন, ওর মনে হয়েছে, তামাকের নেশা তাকে ধরে ফেলতেও পারে। ধূমপান নাকি চিন্তাশীল নেশা, এটা বাজে কথা, কিন্তু ও রকম একটা রঙ লাগায় কেউ কেউ। তবে সিনেমার অভিনেতারা সিগারেট বা পাইপ টেনে খুব আর্ট ফলায়।

—তোমাকে আর এক কাপ দেব নাকি দোলা ? শস্তার ওষুধ, এরপর আর ভিড় ঠেকাতে পারবে না।

—তাই দেখছি। হাওয়া বিবির অবস্থা অনেক সেরেছে কিন্তু। আলতা বউয়ের খোকা ভাল আছে।

—তোমার হাতযশ। বলে হেসে উঠলেন আয়েষা।

—আর লজ্জা দেবেন না মা, আমি কি আর ডাক্তার ? বলে চন্দ্রিমা সলজ্জ প্রত্যুত্তর করল।

আয়েষা দোতলারই রান্নাঘরে চলে যান, যেখানে রান্না হয় না, ভোরের নাশতা চা হয়, সেখান থেকে কাপে করে চা এনে চন্দ্রিমার জন্য টেবিলে রাখলেন। বাষ্প উঠছে। সেদিকে চেয়ে বললেন—তোমার শ্বশুরও ডাক্তার নয়। বাবুকে স্কুলের ছেলেমেয়ে তবু ডাক্তার মাস্টার বলে। কোন্ মাস্টার ? না, উনি হলেন ডাক্তার মাস্টার। তোমার শ্বশুরের হরেক নাম। কোন কোন মানুষের সব রকম বাতিক থাকে। চক কালীতলার বিশ্বাসবাবুরা তাঁকে ফের গানের মাস্টার বলে মান দেন আজও। পূরী বাবুদের এক বোনকে উনি গান শেখাতেন এককালে। তবে চাষীদের কাছে উনি বাবু ! তরফদারের কাছে মিলিটারি। এত রকম রোখ মানুষটার।

চন্দ্রিমা তৈরি হয়ে গিয়েছে, স্টেথোটা হাতে চেপে ধরল। চামড়ার মেডিসিন-বক্স হাতে ঝুলিয়ে নেয়। পিছুপিছু এগিয়ে আসেন নীচে পর্যন্ত আয়েষা। রাহুল বউদির হাতে স্টেথো এবং ওষুধের বাক্স দেখেছে। দোতলার বারান্দার উপর দিয়ে হেঁটে গেল বউদি। বাবার ঘর থেকে উপরে উঠেছে ওই কালো বাক্স আর স্টেথো, তার মানে বউদি ডাক্তারি করছে, বাক্সগুলি উপরে নীচে ওঠা নামাও করছে, নাকি বাবার ঘর থেকে নিজের ঘরে মা তুলে এনেছেন ওই সব ! বাবার ডাক্তারির ব্যাপারে মায়ের আগ্রহ সীমাহীন। বাবার বন্দুক ছোঁড়া, বাবার গান গাওয়া কোন বিষয়েই বা এই জননীটির পর্যাপ্ত আগ্রহ ছিল না ! এই দুটি মানুষকে মাঝে মাঝে রাহুলের খুব অদ্ভুত মনে হয়। মা এবার বউদিকে ডাক্তার করে তবে নিস্তার দেবেন ! বাবা সমুখে নেই, তবু যেন বাবা রয়েছে, বাক্সগুলি ওঠা নামা করছে, পুরিয়া বাঁধা হচ্ছে, রোগী এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে জনসেবার এই সরল লোভটুকু সুন্দর

বইকি, মা তাই বউদিকে উৎসাহিত করে স্বামীর কাজ চালিয়ে যেতে চাইছেন।

রাহুলের ভাল লাগছিল এই কথা ভেবে যে, নাটা তরফদার ওই বাক্স ফেরত দিয়ে চিকিৎসার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এক মস্ত অপমানের ধাক্কায়, এখন মনে হচ্ছে বাবুকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল যে সামন্ত-অহংকার, অত্যন্ত অশক্ত চেষ্টা দিয়ে মা সেই বাবুকে আবার মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান। বউদি তাঁর সহায় যেন বা। রাহুল খুশি হয়ে ওঠে, মানুষের মিছে অহংকারেরও গরিব জবাব দিতে চেষ্টা করে।

চন্দ্রিমার উৎসাহে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করছিল বুলবন। লাইনে মাত্র পাঁচজন রোগী, তা-ও কেউ ফের ঘরের শিশুর জন্যে ওষুধ চাইতে এসেছে, নিজে রোগী নয়। তার জন্য এত সাজগোজের কী দরকার ছিল! অবশ্য লাইনটা যে লম্বা হয়ে বারান্দা ছাড়িয়ে যাবে দু চার দিনেই, বুলবনের সন্দেহ নেই। চার আট আনার চিকিৎসায় গরিব-গ্রামের দুস্থ মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা যে ভিড় জমিয়ে তুলবে, তাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া, নিশ্চয়ই দ্রুত খবর হয়ে যাবে, বাবুর বদলে বউমা চিকিৎসায় বসছেন। নাটার বৈঠকে নয়, বাবুর বারান্দায়। অতএব চন্দ্রিমা সে কথা ভেবেই, গুরুত্ব দেবার জন্যই, চেয়ারে বসে টেবিলে বাক্স রেখে পুরিয়া মুড়তে বসেছে। স্টেথোটিও টেবিলে ফেলে রেখে পরিবেশকে যথাযথ গম্ভীর করে তুলেছে। এখন মনে হচ্ছে, বাবা যেন বউমার জন্য একটি জন-সংযোগ সূত্র রেখে তবে জেলে গিয়েছেন। ভাবতে গিয়ে সহসা বুলবনের চোখে সামান্য অশ্রু-ইশারা চিকচিক করে ওঠে। তার এই অশ্রু-সজলতার মুহূর্ত কেবল নিজেই সে অনুভব করে, তার চোখে জল এসে পড়া যে বিচিত্র নয়, তা কেউ বুঝবে না। যেমন, চন্দ্রিমার চোখ দুটি কেন অত ব্যথিত হয়ে উঠল কিছুক্ষণ আগে, তা-ও কারও জানা নেই, হয়ত তারও কোন নিভৃত কারণ আছে, যা চন্দ্রিমা প্রকাশ করবে না। শুধু কোনও স্থূল আঘাতে হঠাৎ করে কেঁদে ফেলার মেয়ে চন্দ্রিমা নয়।

বুলবন এই সব ভাবতে ভাবতে দোতলায় রাহুলের ঘরের দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়ায়। রাহুল সমস্তই প্রায় গুছিয়ে তুলছিল। বুলবন বলল—কী হারিয়েছে? খুঁজছিস কী!

রাহুল বলল—কিছু না। এই একটু গুছিয়ে রাখছি! আমার টেবিলে যে-কেউ হাত দেবে, একদম ভাল লাগে না!

—তোর বউদি তো গুছিয়েই রেখেছিল!

—জানি।

—রাগ করছিস কেন?

—আমার কনটেন্ট অন্যের জানার দরকার কি?

—এত গোপনীয়তাই বা কিসের রাহুল! তোর ডাইরি আমি পড়েছি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুই ঠিক কী করতে চাইছিস! আমার অনেক প্রশ্ন আছে!

—কী ব্যাপারে?

—তোর সম্বন্ধে, মানে তোর অ্যাকটিভিটির কনটেক্সটে! আমরাও তো একটা রাজনীতি করি!

—আমি তো কোন আপত্তি করিনি।

—না, আমি সে কথা বলছি না।

—তবে কী বলছ! আমার অ্যাকটিভিটির কী দেখলে! আমি আমার ডাইরিতে নিজস্ব কিছু উপলব্ধির কথা লিখেছি।

—সেখানে কিছু করবার কথাও আছে, কী করতে চাস? বাবা জেলে, এই বাড়িতে মুমতাজ আলি এসেছিল ! মায়ের গেরস্তালিকে আর কি ডিসটার্ব করা উচিত হবে !

—অ। এই কথা ! রাজনীতি করবে অথচ ডিসটার্বড হবে না, সংস্কারপন্থী পলিটিক্সের এটাই মূল ধারা। আমাদের বামপন্থী চৌদ্দ পুরুষরা তো সেই রাজনীতিই করে আসছে দীর্ঘকাল ! এখন তাদের বিশ্রামের কাল। তাই না ? তোমার দলও এখন শরৎজন্মোৎসব করছে, একেবারে আন-ডিসটার্বড অ্যাকটিভিটিজ ! কিন্তু ললিত এই ফ্যামিলিকে সুস্থ থাকতে দেবে বলে মনে হয় তোমার ! তাছাড়া বিপ্লব কোন ভোজসভা নয়। যে তোমাকে ডিসটার্ব করছে তাকেও পাল্টা ডিসটার্ব না করলে পলিটিক্স কখনও এগোয় না। মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকলে রুখে দাঁড়ানোটাই হিসেব।

—তুই কতকগুলো কথা এরই মধ্যে মুখস্থ করে ফেলেছিস। বিপ্লব ভোজসভা নয় !

—হ্যাঁ, করেছি। তোমরা তো শরৎচন্দ্রের মস্ত মস্ত ডায়ালগ পর্যন্ত মুখস্থ করে রেখেছ। একজন মোমিন মুসলমান একদম না বুঝে তামাম কোরান কণ্ঠস্থ করে রাখে।

—পলিটিক্সে কিন্তু গাইড টু অ্যাকশন বলে একটা কথা আছে রাহুল !

—চেয়ারম্যানের কথা মুখস্থ করে কোন পুণ্য সঞ্চয় হয় বল শুনিনি ! তবে একজন অত্যাচারী প্রশাসকও অনেক সময় চেয়ারম্যানের উক্তি মুখস্থ রাখে, শুনে মনে হয়, লোকটার গাইড টু অ্যাকশন হল একখানা রেডবুক। বহরমপুর জেলে অত্যাচার চালানোর সময় ওই ডি এম মাও-সে-তুঙ থেকে কোট করে আর সোকল্ড উগ্রপন্থীদের চাবকায়। জাস্ট সি, বাবুকে চাবকেছে শালারা ! বলতে বলতে রাহুল থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখ দুটি মুহূর্তে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ধকধক করে উঠল চোখের তারা, মুখের চামড়া রক্তাক্ত হয়।

উদ্ধত উদ্বিগ্ন কাতর রাহুলের মুখের দিকে চেয়ে বুলবন বলল—এত ক্রুদ্ধ হলে চলবে কী করে রাহুল ! ইটস এ লং প্রসেস। সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে, তার প্রস্তুতিও ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়। চটজলদি একটা কিছু করলেই তো হল না।

—তোমার প্রস্তুতি কোথায় ?

—চেষ্টা চলছে !

—একটা কথা বলব তোমাকে, কিছু মনে করবে না ?

—বল্।

—আমানির মৃত্যু কবরের মাটিতে জুড়িয়ে আসছে ! তোমার কষ্ট হয় না ?

—হয়।

—কী করে বুঝব ? তোমাদের স্বামীস্ত্রীর দুজনেরই শ্রেণীঘৃণাটা খুব কম ; খুব মহাশয় ধরনের শ্রেণীঘৃণা দিয়ে শান্তিকল্যাণ হতে পারে, যেমন দু পুরিয়া ওষুধ, তাই না ! তার বেশি না।

—কী বলছিস তুই !

—যত কম ঘৃণা, তত কম ভালবাসা !

—সি.এম. বলেছেন ?

—বলেছেন, বাজিয়ে দেখে তবেই বলেছেন। আমি আজ ফিল করি ! চোখের সামনে দেখলাম, কী করে একজন গরিব অসহায়কে মেরে ফেলা হয়। তার চিকিৎসার সামান্য সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়ে হাসপাতাল তাকে ফেরত পাঠায়। কেন তার চিকিৎসা হল না ?

হাসপাতালে বেশিদিন রাখলে লোক জানাজানি বেশি হত, হাসপাতাল বাধ্য হত আমানির নাম অ্যাডমিশন খাতায় তুলে নিতে। ভাবতে পার, আমানির নাম ভর্তি-খাতায় তোলেনি ডাক্তার। অক্সিজেন, স্যালাইন করে একটু সুস্থ হওয়া মাত্র ছেড়ে দিয়েছে। মরবে, বাড়ি গিয়ে মরবে। তার কোন দায়িত্বই কারও নয়। ললিত আর শশাঙ্ক ন্যালাকে পাহারা দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল। সে কথা বলতে জানত না, এই তার অপরাধ। যে সুন্দর বাক্য-গঠন করতে পারে না, সে-ও কিন্তু বিপ্লব করতে পারে বুলবন। খালি তীব্র ঘেন্নাটা বুকের মধ্যে দরকার। এ নিয়ে বক্তৃতা করাটা আরও ঘৃণ্য, যা সমস্ত দলগুলি পছন্দ করে। আমাকে তাই, আমার মত চলতে দাও!

এক নাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর রাহুল থামে। বুলবন দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌকাঠের ওপারে। দাদার দেহের পাশ দিয়ে দ্রুত পা ফেলে রাহুল চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দা এবং সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচে চলে আসে। ওর হাতে ইতিহাসের বই, বইয়ের ভিতর পাতার ফাঁকে হাতে লেখা নোটের ফুলস্ক্যাপ সাইজ পাতাগুলি অক্ষরসজ্জিত এবং ভাঁজ করে গুঁজে রাখা। রাহুলের মনে পড়ছে না, কিসের নোট এভাবে গুঁজে রেখেছে সে, কোন সে অধ্যায়।

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রাহুল। বউদি চেয়ারে বসে রয়েছে, সামনে টেবিলে ওষুধের বাক্স। কোন রোগীপত্র নেই। যারা এসেছিল, ওষুধ নিয়ে ফিরে গেছে। বারান্দা খালি। তবু বোকার মত বসে আছে কেন বেচারি! ভাবছে, কেউ যদি ফের এসে পড়ে।

রাহুলের দিকে স্পষ্ট চোখ তুলে চাইতে পারল না চন্দ্রিমা। এইভাবে বসে থাকা যে বিসদৃশ তা বুঝতে পারে চন্দ্রিমা নিজে, লজ্জা সেকারণেও। হঠাৎ চন্দ্রিমার এ মুহূর্তে মনে হয়, তার এই ডাক্তারি এক ধরনের পাগলামিই বটে। সত্যিই যে কজন তার কাছে ওষুধ নিতে আসবে সন্দেহ আছে। তবে যে কজন আসবে তাতেই তার কাজ হবে। জীবনে জীবন যোগ করার আর কোনও পন্থা সে খুঁজে পাচ্ছে না।

রাহুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলল—সেবাই যদি করতে হয়, তাহলে ওই চার আনা আটআনা না নেওয়াই ভাল। বাবু নিতেন না। তরফদার ওষুধ কিনে দিতেন। এখন পয়সা নিলে বদনাম হবে। রুগিও আসতে চাইবে না।

কিছু পয়সা টেবিলের উপর পড়েছিল, সেদিকে চেয়ে দেখে রাহুল মন্তব্য করে এবং বারান্দা ছেড়ে সদর দরজার দিকে চলে যায়। এ রকম শুনে চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে চন্দ্রিমা কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে মনে মনে। মনে হয়, সত্যিই তো সামান্য পয়সা সে নিচ্ছে কেন! তবে সামান্য হলেও, ওষুধ কেনার পয়সা তো ওই ওইটুকু থেকেই জোগাড় হবে, তাছাড়া সে পারবে কী করে? তার নিজের যে কোনও রোজগার নেই। বুলবনের চাকরি থাকলে এ সমস্যা হত না। ভাবতে ভাবতে কেমন অবশ লাগে। চন্দ্রিমার মনে হয়, রাহুল বোধহয় তার এই চিকিৎসার আহ্লাদ পছন্দ করছে না।

রাহুল চারাতলায় এসে মাচায় বসে বই খুলেই চমৎকৃত হয়। ফুলস্ক্যাপের পৃষ্ঠাভর্তি নোটস। নোটস অন মুসলিনি। আশ্চর্য সমৃদ্ধ ভাষা, নানান তথ্যে ঠাসা খুব সুন্দর সুলিখিত ইতিহাস। হাতের লেখাটিও খাসা। বউদির নোট, বউদিরই হাতের লেখা।

পড়তে পড়তে রাহুল যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করে। মনে হচ্ছে, বউদির কাছে আরও এ রকম পরিশ্রমলব্ধ 'নোট' বা 'এসে' রয়েছে। সাবজেক্ট ছিল ইতিহাস। সে পরীক্ষা দেওয়ার পরও নোটগুলি ফেলে দেয়নি। এমনকি সঙ্গে করে এনেছে ভবানীপুর থেকে চিৎপুর মোহড়া গাঁ। এমনভাবে লেখা যে, এ আর তৈরি করতে হবে না। শুধু আত্মস্থ

করতে পারলেই হল।

বউদি নিয়ে এল কেন ? বুলবনের কাছে নিশ্চয়ই জেনেছে, তার দেবর ইতিহাসের ছাত্র। দেবরের কাজে লাগতে পারে ভেবে এই পূর্ব-সঞ্চিত বিদ্যা-সম্ভার বয়ে আনা খুব কুশলী বুদ্ধির পরিচয়, মেয়েরা পারেও বটে। যে কি না এ ভাবে পারে, সে তবে পুরিয়া মোড়াতে অযথা সময় অপচয় করবে না। জনজীবনে প্রবেশ করার সতর্ক বুদ্ধি নিজের মস্তিষ্কের ভিতর থেকেই সে জোগাড় করে নিতে পারবে। কিন্তু তারপর ?

এখন আর ভাবতে চাইল না রাহুল। বউদি যে এভাবে দিতে চাইছে, হতে পারে এ রকম চুপ করে গোপনে গুঁজে দেওয়া তার হৃদয়ীভূত স্বভাব, মানুষকে দেবার সময়ও সে লজ্জা পায়, কোথাও তার 'দিয়েছি'-র অহংকার থাকে না। তবে সে সেজেগুঁজে ডাক্তারি করতে বসেছে কেন ? সরল বুদ্ধি থেকেও মানুষ অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে যায় রাহুলের। বাবা প্রায়ই বলতেন, হাদিস বলেছে, 'তুমি যখন দাও, ডান হাত দিয়ে দিলে, বাঁ হাত যেন জানতে না পারে।' তারপর বাবা বলেন, দানের অহংকারের চেয়ে অসুন্দর কিছু নেই। বুদ্ধি সতর্ক হোক ভাল, কিন্তু হৃদয় যেন কখনও তর্ক করতে না শেখে।

রাহুলের মনে হচ্ছিল, বউদি যেন নোটখানি তাকে দান করেছে গোপনে, ঠিক সেই রকম সুন্দর এক প্রাপ্তির আনন্দ হয় এখন। এবং এতে হৃদয়ের উত্তাপ টের পায় সে। এই দানের মুহূর্তে নিশ্চয়ই বউদির হৃদয় সতর্ক ছিল না। নইলে সে এত লাজুক আর ভীরুর মত গুঁজে রাখত না।

অবশ্য পড়ার টেবিলটাই তার উন্মুক্ত মস্তিষ্ক। এখানে অন্যের হাত এসে লাগলে রাহুল সহজেই কাতর হয়ে পড়ে। এখানেই রয়েছে গোপন এক মহাদেশ, এখানে যেন একটি যুদ্ধ শুয়ে আছে।

রাহুল আচমকা চিন্তা করল, তা হলে বন্দুকটা কোথায় ? বই থেকে চোখ তুলে সামনে চাইল সে। দেখল, কাঁধের উপর লেপ চাপিয়ে মাঠের ভিতর থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মণি। একটু ঝুঁকে, লেপের ভারেই যেন বা ঘাড় কাত করা একদিকে, মাটিতে পথে চোখ রেখে কেমন নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে আসছে। তাকে এই শীতের রাতে একলা রাত কাটাতে হয় মাঠে, কুঁড়েতে, হুহু হাওয়ার দাপটের মধ্যে। মাঠে শীতেও হাওয়া থাকে। মণির প্রায় এই একলা লড়াই কত কঠিন কেউ জানে না। মাঠে হুকুম পর্যন্ত যায় না রাত্রিতে, গেলেও গিয়ে চলে আসে। স্যালো মেশিনে করে ধান খেতে জল নিতে হয় রাতভর। পাম্পমেশিনটা, নাম 'গঙ্গা', চমৎকার নাম, এ গাঁয়ে ওই নামে আর কোনও মেশিন নেই, স্যালো টিউবওয়েলে নিয়ে গিয়ে বসাতে হয়, প্রকাণ্ড যন্ত্রটি, যা অন্য মেশিন অপেক্ষা বৃহৎ, তার তোলাপড়ায় মেহনত আছে, হুকুম সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু মাঠে রাত্রিবাসের একাকী সংগ্রাম মনে হয় তীব্র এক হিম রক্তপাত। পালিতে জল চলে মৃদু কলস্বরে, যেন মাঠের ধমনীতে রক্ত বইছে। আল কেটে জল বেরিয়ে পাশের ভুঁইতে চলে যায় কি না রাত জেগে সেই পাহারা দিতে হয়, বারবার আল রক্ষার জন্য কোদাল চালাতে হয়, মাটি কেটে পালিতে চাপতে হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া, ঠাণ্ডা জল, রক্ত জমে যেতে চায়। মণি দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে।

—আচ্ছা ! মণি কি জানে বন্দুকটার কথা ? মনে হচ্ছে মণিই একমাত্র জানে, আর কেউ নয়।

ভাবল রাহুল। মনে মনে বলল এইসব ভাবনার কথা। সে যদি জানতই, তবে তাকে

কি বলত না ? একটা বন্দুক সে যখন নাড়াগাদার মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে দেখতে পায়, তখন সে কী করে, এই মণি চৌধুরী ? সে কি ভয় পায় ? ভয়ে কি অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে ? তারপর কী করে কিশোরটি ? ডোবার জলে ফেলে দেয় !

দেয় না। তা হলে কোথায় রাখে ?

—মণি !

মণি রাহুলের সামনে মাচার সন্নিকটে এসে খাড়া হয়। আহ্লাদ করে নিঃশব্দে হাসছে। দন্তরাজি কুন্দকলিকার ন্যায় শুভ্র। শ্রমে ম্লান, কিন্তু কাতর নয়। মণির মনে হল, দাদা তাকে এমনিই ডেকেছে। অতএব সে হাসি হেসে বাড়ির দিকে এগোয়।

—মণি ?

ডেকে ওঠে রাহুল। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায় মণি। ফিরে আসে।

—পড়াশুনা করছ !

—হ্যাঁ। জবাব করে রাহুল।

—তাই কর। চাকরি বাকরি দরকার !

—তুই করবি না ?

—করব, বাবু ফিরে এলে ভর্তি হব আবার। এখন মাঠ দেখবে কে ? সমস্যা বেধেছে। আমার ওপর ভর দিয়ে থাক।

—আচ্ছা, মণি !

—বল।

—বন্দুকটা কোথায় রে ?

—কিসের বন্দুক ?

—নাড়াগাদায় যেটা ছিল !

—কে বলেছে ? সাবধান রাহুল ভাই, মুমজাত আলির জিনিস !

—তুই কী করে জানলি ?

—আমি জানি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলবে, জিনিস ঠিক আছে। দেখা যে করছ, বাড়ি যেন না জানতে পারে।

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল রাহুল। তারপর বলল—ঠিক আছে, তুই যা।

রাহুলের মনে হল, চাষেবাসে নিষ্ঠ মানুষ অনেক বেশি সাবধানী হয়। চাষী মণি যেন তার ভাই নয়, অন্য এক পরিণত বুদ্ধির লোক। মণি এই সময় পরম আশ্বাসের হাসি হেসে চলে যায়। মুমতাজ কদিনই বা এখানে ছিল, তাইতেই মণিকে স্পৃষ্ট করে চলে গিয়েছে।

রাহুল আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পায় না। বেশি জানতে চাইলে বলতে হবে। আশ্চর্য হচ্ছিল সে, এমনকি বন্দুকটাও মণির কাঁধে ভর করে আছে। চাষীর কাঁধেই তো বন্দুকটা রাখবার কথা, তাই-ই প্রকৃত স্থান। এই হিম হাওয়ার খেতে, ফসলে, জলে, কুটিরে ওই বন্দুকটাই বুঝি মণির সত্য-উষ্ণতা। মুমতাজ দিয়ে গেছে মণিকে, কেউ জানতে পারেনি, একটি স্ফূলিঙ্গ ফেলে রেখে গেছে।

কবির সঙ্গে দেখা করা দরকার। কুমারস হস্টেলে গিয়ে কবির দেখা মেলেনি। এই রহস্যময় ছেলেটিকে খুঁজে বার করা কঠিন ; কখন কোথায় থাকে কে জানে। ঠিক করে কলেজ করে না। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। ওইভাবে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই হয়ত ওর কাজের কোন পদ্ধতি রয়েছে। দুএকটি রাত চৌধুরী মেসে রাহুলের কাছে গিয়ে থেকেছে। রাহুল বলেছিল, 'আমাকে একবার মুমতাজ আলির ওখানে নিয়ে চল।' সে

কথায় কবি কোনও উৎসাহ দেখায়নি, এড়িয়ে গেছে। শহরের মধ্যে কতকগুলি শেলটারের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। ও যোগাযোগ রক্ষা করে, সেটাও তার কাজ।

—বন্দুকটা, তুমি আমাকে দিলে না!

—আমি ভাবছি, কোথায় আছে!

—আর ভেবে কী হবে, তোমার চেষ্টাই নেই! ওটা নিয়ে গিয়ে আমি এক খেতমজুর কমরেডের বাড়ির উঠোনের ভাঙা কবরের মধ্যে শুইয়ে রাখতাম, কবরটি বেলি ফুলের ঝাড় দিয়ে ঢাকা। ওই এলাকাটি নিশ্চিন্ত। একটা ছোট কাজও আমি পারি না।

—প্রণামপুর, নটখুলি, দৌলতডিহা, বীরকুচি, সব জেলেদের জায়গা। মুসলিম জেলে।

—হ্যাঁ, যাদের বলে মাহেফরাস।

—এই মাহেফরাসদের সঙ্গে ললিত-নাটার জল নিয়ে হরসন বিসম্বাদ হয়, কোদালকাটির জল গেট তুলে ছেড়ে দেয় ললিত, জল বেরিয়ে গেলে মাছের ব্যবসা মার খায়। পুরনো হুজ্জোত। গুমানির জলে রক্তপাত নতুন নয়।

—জানি।

—অনেক মাহেফরাসের রক্ত গুমানি খেয়েছে। জল সরে গেলে কালোমাটি জাগে। কুচকুচে কালো, অসম্ভব কৃষ্ণ সেই মৃত্তিকা। মোষের মত।

—আমি দেখিনি।

—বাবার স্কুলের পথ ওইদিকে পড়ে, রঘুনাথপুর! গেছি আমি ওই মাটির উপর দিয়ে কতদিন। মোষের মত মাটি। রক্ত পড়লে টকটক করে। ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা রেখা চলে যায় গ্রাম পর্যন্ত। কিসের রক্ত বোঝা যায় না। বাবা বলেছিলেন, একটা আহত মোষ এই পথে গেছে। মানুষের গায়ের রক্তও তো এই রকমই বাবু! বাবা বলেছিলেন, হ্যাঁ রাহুল, এই রক্ত মানুষের কি না কে জানে!

—আই সি! বলে মধ্যরাতে চৌধুরী মেসের বিছানার পাশে শোয়া কবি তড়াক করে উঠে বসে। রাহুল আশ্চর্য হয়।

রাহুল বলে—এ একটা নিতান্তই বিবরণ কবি!

কবি অভিভূত স্বরে বলে ওঠে—না, তা নয়! আমি খুব অবাক হচ্ছি।

রাহুল বলল—এ মাটি এত উর্বর যে, এতে কেমিক্যাল সার দিলে ধানের দামপাটি ঝাড়ালো গাছ হয়, ধান হয় না। এই জমিতে সার দিতে নেই। একটু আধটু ঠাণ্ডা কমপোস্ট ঢালতে পার। তাই খুব।

কবি বলল—এইজন্যেই ললিত-নাটার রোখ!

রাহুল বলল—হ্যাঁ, কোদালকাটির চতুষ্পার্শ্বের জমি নাটা তরফদার আর কিছুটা ললিতের। পরিমাণ কিন্তু অনেক। সিলিং-এর অনেক উপরে জমি। বিশেষ ওই নাটার সম্পত্তি খুব গোলমেলে। শোনা যায়, লালা ভোলা নামের দুটি কুকুরের নামেও ওর জমি আছে। তা নিয়ে গত সন প্রণামপুরের ইয়াকুব মিস্ত্রী ভারবোল বেঁধেছিল!

কবি বিস্ময়মূঢ় স্বরে বলল—তাই নাকি!

রাহুল বলতে থাকে—হ্যাঁ, শোন যা বলছি। জল এবং মাটি...

কবি শুধালো—ভারবোল কাকে বলে?

রাহুল বলল—ও এক ধরনের পৌষল্যার গান। গরিব মানুষ বাঁধে। সামাজিক অসংগতিকে ছন্দে সুরে ঠাট্টা করে গরিব চাষীরা। তোমাকে শোনাব একদিন। বরিন্দের

যেমন গম্ভীরা, এই ভড় এলাকায় ভারবোল।

—ভড় ?

—হ্যাঁ গো ! পদ্মার অববাহিকা, গঙ্গাভূমি, কিছুটা নীচু ঢাল জমি, মারাত্মক উর্বর। সব ফসল হয়। রাঢ় বাড় ভড়। আর কালান্তর। জমি চার প্রকার।

—তুমি দেখছি সবই কালচার কর !

—বাবার মুখে শুনেছি। তা জল এবং মাটির সম্বন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। রাহুল বলতে বলতে থেমে গেল।

কবি প্রশ্ন করল—তারপর ?

সেই প্রসঙ্গ সেই রাতে শেষ হয়নি। কবির সঙ্গে দেখা করা জরুরি। ওর কাছে রাহুলের একজোড়া নতুন স্যান্ডেল রয়েছে। মাচা থেকে নামে রাহুল। পায়ে গলায় হাওয়াই চটি। জুতোর অভাবে শস্তা এই চটি কিনেছে সে। পায়ে হিম লাগে।

কোদালকাটির ওয়াটার গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। চেয়ে থাকে গম্ভীর জলের দিকে। একটি ডোঙা করে শরম আলি প্রণামপুরের দিক থেকে এল। সঙ্গে আনিসুল। আনিসুল একজন অদ্ভুত মানুষ। ওকে বলা যেতে পারে গ্রামের সাংবাদিক। একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র চালায়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। ডোমকলে ওর একটা ছোট প্রেস আছে। লেটার প্রেস। লজঝড়ে ছাপা, অজস্র বানান ভুলে ভরা সংবাদ পাক্ষিক। সেই সংবাদদাতা, সেই-ই সম্পাদক এবং প্রকাশক। ও সেন্সরশিপের তোয়াক্কা করে না। একজন কমপজিটার আছে, তিনশ টাকা মাইনে, পার্ট-টাইম কাজ। কমপজিটারের নাম নিতাই সাহা। মূলত খেতমজুর অথবা বেকার। আনিসুল নিজেও মূলে চাষী, দুচার বিঘা জমি আছে ওর। হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ শ্রেণীর হায়ার সেকেন্ডারি) পাশ করেনি, বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় ওর চূড়ান্ত ঘেন্না। সর্বক্ষণ পান খায়, ছোট ছোট খিলি। একটা টিনের আয়ত ক্ষুদ্র বাক্সে সৈনিকদের মত শুয়ে থাকে ছাচি পানের মাথা।

আনিসুল ডাকল—হ্যাল্লো ! তারপর ডোঙা ছেড়ে নেমে এল। পা-ছেঁড়া পা-জামা, গায়ে বাংলা ফুলশার্ট। পায়ে রবারের জুতো। জল ঢুকে পচাপানি পচাপানি শব্দ হয়।

শরম আলি নামল। কাছে এল না। রাহুলের দিকে কটমট করে চাইল দূর থেকে। বলল—তোমাকে খুঁজছে তারক গাঙ্গুলির ভাগ্নে। শালা নাকি নদী দ্যাখেনি। এদিকে চরে বেড়ায় খালি। কী করে বলতে পার ? রাত্তিরে এসে তোমার তলাশ করে ক্যানে ?

—জানি না। কোন দরকার নিশ্চয়।

—কী দরকার ?

—একই কলেজে পড়ি আমরা। ডোঙায় চড়া শখ !

—শখ একদিন বেরিয়ে যাবে গুমানির পানিতে।

—কেন ?

—তাই বলছি ! বলে রাহুলের দিকে খুব ঘোর করে চায় শরম। ডোঙা বেঁধে বাঁধপথে উঠে চলে যায়।

অনিসুল কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বলে—গোঁয়ার ! ভাষাটি জানে না। ললিতের পাণ্ডা।... নাও, কিছু মনে করো না।

তরুণ মুনি-ঋষিদের মতো দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন আনিসুল। চোখে চশমা। কাচের রঙে একটা কালো আভা। কিছুটা গর্তে-বসা চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঝকঝক করছে। গায়ের রঙ

শ্যামলা। ছোট কপাল, চুলে ঢাকা। লম্বাটে মুখের গড়ন, যাকে আম-দিঘল বলে। গাল ঈষৎ বসা, গালের হাড় একটু উঠে আছে ঠেলে। সেই সব শীর্ণতা সত্ত্বেও আনিসুলের মুখটি মিষ্ট এবং আকর্ষণীয়। আনিসুল তার পত্রিকার একটি কপি রাহুলের হাতে দিয়ে বলে—নাও, পড়ে দেখো পয়সা লাগবে না। তোমার ফ্যামিলির সংবাদ আছে। এই বলে কাগজটি হাতে গুঁজে দিয়ে আনিসুল আর দাঁড়ায় না।

রাহুল পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখ রেখে চমকে ওঠে। পড়তে পড়তে শরীরে সামান্য কাঁপুনি লাগে। আনিসুল ততক্ষণে অনেক দূর হেঁটে চলে গেছে। খুব ক্ষিপ্র তার গতি। আনিসুল আস্তে হাঁটতে পারে না। রাহুল একবার তাকে ডেকে ওঠে। পরক্ষণেই আর ডাকে না। মনে হয়, আনিসুল তার নিজের কাজ করেছে, ওকে দোষ দেওয়া যায় না।

রাহুল 'আজান' নামের এই পত্রিকাখানি হাতে করে বাড়ির দিকে ছুটে আসে। বাড়ির কাছাকাছি এসে, মনে হয় 'মিরাজ' পত্রিকাখানির সঙ্গে এই পত্রিকার তফাত অনেক। 'মিরাজ' আর 'আজান' নামদুটি কিছুটা কাছাকাছি, আর কোনও মিল নেই।

কিন্তু এই পত্রিকা বাড়ির কাউকে কি দেখানো যায়! না, ঠিক নয়। খবরের শিরোনামটাই সহ্য করতে পারবে না কেউ। স্পৃষ্ট হবে। সংকুচিত হয়ে পড়বে সমস্ত পরিবার। সব দিক থেকে একটি করাল কালো ছায়া নামছে এখন। কী দুর্ভেদ্য এই জীবন, কি দুরধিগম্য! কী হচ্ছে নিয়ত! কত কী ঘটে চলেছে নিরন্তর। যে কোনও দুর্ঘটনাও এখন ঘটনা মাত্র! দেখে মনে হয়, সংবাদটা কিছু বিকৃত, কিন্তু জীবনের বিকৃতিও যে সংবাদ কোন কিছুই যে স্বাভাবিক নয়, তাই-ই এখন স্বাভাবিকতা। এমন সংবাদ ছেপে আনিসুলের যেন আহ্লাদের সীমা নেই, তাই সে পত্রিকা গুঁজে দিয়ে বীরের মত ছুটে চলে গেল। আয়েষা এই সংবাদ দেখলে কী প্রতিক্রিয়া হবে! বুলবন এবং চন্দ্রিমা মাথা তুলতে পারবে না। রাহুল পত্রিকা ভাঁজে ভাঁজে সংকুচিত করে মুঠোয় চেপে ধরে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে তার স্যাণ্ডেল পালিশ করে সযত্নে রাখা। কবি এভাবে এসেছিল কেন? উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে রাহুল। বউদির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়। সে ভাববার চেষ্টা করে, এই পত্রিকা তাহলে কী করবে রাহুল? ফেলে দেবে?

॥ ১৪ ॥

মণি সমস্ত দিন সংসারের কত কী টুকিটাকি কাজ যে করে চলে ইয়ত্তা নেই। অলস সময় কাটানো ওর ধাতে সয় না। কোনও কাজ না পেলে সে বড় তকলি বা টাকুরে করে পাটের নরি দিয়ে দড়ি পাকায় সুতলির। অথবা মণি সবার পায়ের জুতা জড়ো করে বুরুশ দিয়ে পালিশ করতে বসে। কিংবা দুধ দোয় গাভির। বাছুর ধরে ফুলভানু। ওর এই ধরনের অজস্র 'কিংবা' বা 'অথবা' রয়েছে। শীতের লেপ বা তোশকের জন্য ধুনুরি ডেকে আনার কাজটাও তার। কাঠ চেলা করা মেহনতের হলেও কুড়ুল বাগিয়ে ধরতে মণির তৎপরতা কম নয়। হুকুমকে হুকুম করাটাও কাজ। অবশ্য হুকুমও মণিকে হুকুম করে সময় বিশেষে। হুকুমের আদেশ নির্দেশ উপেক্ষা করার মনিবত্ব মণির নেই।

মণির পা ফেটে গেছে, হাঁ হয়ে আছে। কোন কিছুর খোঁচা লাগলে ধাঁ করে মস্তিষ্কে তীব্র অসহ্য ধাক্কা লাগে। যন্ত্রণাটা পা থেকে মাথায় উঠে যায়। এই কষ্টের সময় তার বাপুকে মনে পড়ে। বাপুর উপর অত্যাচার করেছে পুলিস, মনে হয়, প্রতিটি চাবুকের

ঘায়ে বাপুর কষ্টের মূর্তিটা সে দেখতে পাচ্ছে।

জ্যোৎস্নার আভাপাণ্ডুর সেই রাত্রিতে বাঁশতলির মণি পালের কাছে ব্যাঞ্জো শিখে ফিরে আসছে মণি। হেঁড়ে গলায় গান করছে, 'এমন চাঁদনি রাত বৃথা যদি যায়।' এক লাইনের একটা সুর, বার কতক গাইল। একটু থেমে অন্য সুরে অন্য গান ধরল। 'নিশীথে জাগিও ফুলবনে রে ভোমরা, নিশীথে জাগিও ফুলবনে।' এক লাইন গাইতে না গাইতে সুর কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা গান গলায় এসে পড়ল। 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে, চুপিচুপি বাঁশি বাজে বাতাসে।' গলা খেলিয়ে তুলতে গেলেই দম ফক্কা হয়ে যায়, অথচ রাহুল দাদা গাইলেই মনে হয় গলায় সুরগুলি দাদার পুষ্যি।

কদম আলির বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা পল্লীগান ধরে মণি : 'আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া লো বুবুজান, আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া ... !' ফের থেমে পড়ে। একলা পথের উপর শব্দ করে আপন মনে কথা বলতে থাকে— বাড়ি যাব, খাব। তারপর লেপ কাঁথা কাঁধে লাঠি বাগিয়ে, লণ্ঠন ঝুলিয়ে মাঠ পাহারায় চলে যাব। আলতাপাটি, শিম, মাগুর মাছের ডিম। ইলাটিং বিলাটিং থাট্টি ফোর ! অনর্থক এই নির্জন সংলাপ। এই সময় সহসা একটা কাতরানি কানে আসে মণির। মেয়েলি গলা। ওর 'তোরে যাবে লইয়া', আর গেয়ে ওঠা হয় না।

অদ্ভুত এক কাতরানি। কখনও কোন নারীকে অমন কাতরাতে শোনেনি মণি। সোহাগ মেশানো যন্ত্রণার মত। নিগ্রহের যন্ত্রণা, নিগ্রহের আনন্দ। খুব কষ্ট হচ্ছে এবং সুখও বুঝি হচ্ছে। মেয়েটা যেন ফাঁদে পড়ে গিয়েছে, অসহায়। অথচ উচ্চকিত আর্তনাদ করছে না। কাউকে ডাকছে না। গলার মধ্যে কান্না এবং সুখানুভূতির দুর্বোধ্য স্বর। অমন করছে কেন হাওয়া বিবি !

গলা যেন ভয়ে, অত্যাচারে, সুখে, আহ্লাদে, একটা সকাতর মত্ততায় আকুল হয়ে উঠছে। কী যেন তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে, চেপে চেপে ধরছে। নিজেকে ছাড়াতে পারছে না হাওয়া।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ডাকা হিমেল রাত্রিতে ঝিম ধরে যায় রক্তে। রক্ত কেমন করছে এখন ! কেমন করছে বুঝতে পারছে না মণি। বোঝার কথাও নয়, কারণ এমনভাবে অদ্ভুত মাখো মাখো, যন্ত্রণাদীর্ণ, অসহায়, এমন গড়িয়ে পড়া স্বর, যেন নারীর সমস্ত দেহ কাঁদছে, অঙ্গ কাঁদছে, তৃষ্ণার্ত এবং ভীত, আবার দলিত, প্রায় থ্যাঁতলানো হচ্ছে তাকে, এভাবে যা এখন ঘটছে, সেই অভিজ্ঞতার কোন রহস্যই কখনও জানে না কিশোর মণি, শোনেনি। সে ভেবে পায় না, কী করবে তাহলে !

বাড়ির ভিটের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। যন্ত্রণা এবং আনন্দের সীমারেখা চুলের মত সূক্ষ্ম। একটু কঁকিয়ে উঠল। কঁকাল ঈষৎ, কিন্তু উচ্চ আর্তনাদ করল না। পাকাটির বেড়ার কাছে এল মণি। নারীর গলার স্বর আবেগে কাঁপছে, শ্বাস প্রগাঢ়, উঠোনে পেঁপে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শুনতে পায় এই কিশোর। ভাবে, হাওয়া বিবির নাম ধরে ডেকে উঠবে কিনা।

—আহ্, বাবু ! ছাড়েন !

এই উক্তি কানে আসে।

একজন বাবু তাহলে হাওয়া বিবির ঘরে এই এত রাতে ঢুকে পড়েছে। কুপির মোটা শিখার বাতি হিলহিল করছে। দু'জনের ছায়া পড়েছে সাদা মাটির দেওয়ালে। লোকটা মেয়েটার বুকের উপর বসে আছে। সিনেমায় একটা ভিলেন এরকম করে। মেয়েটা বাধা

দেয় প্রবল। কিন্তু মেয়েটা এই ছায়ার মধ্যে, কম্পমান আলোয় সেরকম করছে না। সিনেমায় হলে একটি তীব্র আর্তনাদ রাত্রির আকাশকে বিদীর্ণ করে দিত এবং গ্রাম জেগে উঠত।

—আহ্! ছাড়েন বাবু, পাপ হয়!

মেয়েটি চেষ্টা করছে না কেন, বাবুকে ছাড়িয়ে ঠেলে ওঠার! তবে খুব যে বিপন্ন তা ওর 'পাপ হয়' বলার মধ্যে রীতিমত স্পষ্ট। কিন্তু এই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে মণি হত-বিহ্বল হয়েছে।

—সোয়ামি আছে আমার। সনঝায় আসেছে। কুদালকাটির বাঁধে যায়েছে গো! মেয়েটি এবার কেঁদে ফেলল। লোকটি তবু কোন কথা বলল না।

—বাঁধে এই রেতে মারামারি হবে। মাহেফেরাসরা লাঠিসুটা আনবে। হুজ্জোত হলে সোয়ামির কী হবে খুদা জানে! নাটার কিষেন ডাকে লিয়ে গেল। বাবু, আমারে ছাড়ে দ্যান!

—চোপ! লোকটা হাঁকড়ে উঠল দমভর চাপাস্বরে। তারপর পুরুষ ছায়াটা লম্বা শেয়ালের মাথার ছায়ার মত তলের ছায়াটির মধ্যে ডুবে যেতে চাইল। আবার সেই স্বর। দেওয়ালে মেয়েটির বুক উঠে আছে। সেই মাখো মাখো, দীর্ণ, লালায় বুজে যাওয়া আহ্লাদ এবং আর্ত শিহরিত স্বর। ছায়ার বক্ষভূমির বসন বিস্রস্ত হয়, মণি সেদিকে চোখ রাখতে পারে না। আকাশে মিটমিটে তারার দিকে চোখ তোলে। কুয়াশায় ভেজা চাঁদ মেঘের তলায় ডুবে আছে। জ্যোৎস্না ফেটে যাচ্ছে কখনও।

—বাবু! ইমান আমারে দেখছে বাবু! গোরে শুয়ে সব দ্যাখে! ছাড়ো আমাকে! পায়ে পড়ি! আহ্! আবার কাতরতা এবং কান্নায় তৃষ্ণার্ত 'আহ্!' ফলে গলা নিবে তলিয়ে যায় সুখের পঙ্কিল গর্তে।

—ইমান মুখ করে, তুমি তারে মারো! হায় বাবু!

—চোপ্ হ্যবা বিবি। কথা ক'স না।

—আমি গরিব, আমার কী আছে! ঘরে তুমার 'উপসী' বৌ। নাদুস, গোল, হিমানিমাখা, আমার যে গন্দ বাবু!

মণির ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে বাবুটাকে টেনে আনে বাইরে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় উঠোনে। সাহস করতে পারে না। হাওয়ার সমস্ত কথায় মধ্যে প্রতিবাদ ছিল, ঘৃণা ছিল, অসহায়তা ছিল আবার আহ্লাদ ছিল, এমনকি বিস্ময়াবিষ্টতা ছিল। দুঃখ এবং সুখের এমন তীব্রতার ধাক্কা মণিকে নিশ্চল করে রেখেছিল।

— ইমান দেখছে, হ্যাঁ বাবু। পাপ হয়! সোয়ামি আছে আমার! সনঝায় আসেছে।

অদ্ভুত এই কষ্ট এবং পাপ হয় বটে, কিন্তু কিছুই করতে পারে না কদমের বউ। মণি হঠাৎ উঠোন ছেড়ে বাইরে চলে এসে কবরের কাছে দাঁড়ায়। ইমান দেখতে পাচ্ছে, একথাটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। 'আমার যে গন্ধ বাবু!'— এই কথাটিও অসহ্য ছিল। এবং তীব্র অসহনীয় ছিল হাওয়ার মাখো মাখো বিদীর্ণ সুখ! দেওয়ালের ওই ছায়া পথের উপর নেমে এসেও চোখের সামনে থেকে কিছুতেই নড়তে চাইছিল না। একটি হেলে সাপ যেন একটি ব্যাঙকে ক্রমশ গ্রাস করছিল নির্দয়ভাবে, অথচ ব্যাঙটি গ্রাসিত হওয়ার আনন্দে স্বরকে কেমন যে করছিল, তা মণি কখনও কারুকে বলে বোঝাতে পারবে না। এ সে কী দেখল! এমন করে দেখতে হল! একটু একটু অদ্ভুত বোধ, স্বল্প স্পষ্টতা মণির হয়।

শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে। দম বইতে চাইছে না। আকাশে জ্যোৎস্না, দূরে নক্ষত্র, বাতাসে নিশিপুষ্পের ঘ্রাণ, কী ভারী এই রাত্রি ! সহসা খেয়াল হয়, কবরের কাছে একটি কুকুর বসে আছে, একটু লক্ষ্য করে চমকে ওঠে মণি, এ যে শেয়াল ! মুর্দাকে মাটির তলা থেকে টেনে তোলবার জন্য আসে বোধহয়। গন্ধ পায়। আহা বেচারি ন্যালা, মরেও সুখ নেই তোর ! মানুষ তোকে পাহারা দিয়ে মেরেছে, তোর মরা দেহকে পাহারা দিয়ে বসে থেকেছে পশু। এই শেয়ালটা গন্ধ পায়। শবের গন্ধ। পায় না কি, ভাবে মণি চৌধুরী।

এরকমই আর একটা গন্ধ পায় শশাঙ্কমোহন হ্যাবা বিবির গা থেকে। কিন্তু এই সব গন্ধের উপলব্ধি মণির জীবনে এই প্রথম। তার মনে হল, মুমতাজ আলির বন্দুকটায় টোটা ভরে ওই উঠোনে এসে দাঁড়াতে পারলে কেমন হয় ! বন্দুকটার তো মানে আছে ! এরকম বন্দুক এ গ্রামে প্রথম এসেছে, কোন কালে এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য মণি ইতিহাস জানে না। তার গাঁয়ের ইতিহাস কিছু জানে। ওর পড়াশুনা ভাল লাগে না। তবে বন্দুকটা ব্যবহার করতে ইচ্ছা হয়। একটি গুলির শব্দে দেওয়ালের খাড়া হয়ে বসা ছায়াটা তলের ছায়াটির মধ্যে ডুবে যেতে পারে। মণি ভাবে, মণি ভাবতে পারে, এবং এভাবে এই পর্যন্ত তার ক্রোধ জাগ্রত হয়।

শেয়ালটার চোখ জ্বলজ্বল করছে, নীল আলো, তীব্র। আধুলি ইঁট তুলে তাড়া করে মণি। জীবটা তেমন ভয় পায় না। মণির মনে হল, শেয়ালটা কি ইমানের চোখ খেয়ে ফেলার জন্য এখানে এসেছে। ওরে ! এ যে মাটি পর্যন্ত খুঁড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। হঠাৎ আরও শিউরে ওঠে মণি, শেয়াল নয়, এটা হায়না। কী লম্বা ! সামনের পা খাটো, বুক ভারী, তীব্র হিংস্র, আগুনের মত লেলিহ।

পা বাড়াতে গিয়ে পা মচকায়, হাঁ পায়ে অসম্ভব লাগে মণির, প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চায়।

—ইমান দেখছে ! মুখ করে ইমান ! বিড়বিড় করল মণি। হায়নাটা নড়তে চাইছে না। মণি এবার একটি নিশিন্দার ডাল ভেঙে নেয়। এ বোধহয় অন্য কোন জীব। একটু নড়ে উঠে সরে যায়। একটা ইট ছুটে গিয়ে পশুটার কপালে লাগে, ঠিক তখনই ওয়াটার গেটের ওদিকে উচ্চকিত সোরগোল রাত্রির বাতাসে ভেসে ওঠে। পশুটা মণিকে রেহাই দেয়, শশাঙ্কমোহন হাওয়া বিবির বুকের উপর থেকে নেমে যায় সম্ভোগ শেষে।

শশাঙ্কমোহন পথে নেমে এসেছে দেখতে পেল মণি। মণির পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। পা টেনে নিয়ে চলতে পারছে না। তবু পথের ওই লোকটার দিকে এগিয়ে যায়। ওকে বোঝানো দরকার, আমি তোমাকে দেখে ফেলেছি, আমি বুঝতে পেরেছি। মনে মনে একথা ভেবে মণি হাঁটতে থাকে। লোকটা ছুটে চলে যাচ্ছে। মণি আর অত জোরে ছুটতে না পেরে পিছনে ফিরে আসে। ওর ইচ্ছে হল, একবার বিধ্বস্ত কদম আলির বউটিকে ভিটায় উঠে গিয়ে দেখে। মন বলছিল, কিন্তু সে আর ভিটেতে উঠতে পারল না। সেই অদ্ভুত কামার্ত স্বর, শীৎকৃত ধ্বনি, যা তার কাছে দুর্বোধ্য, যা অভূতপূর্ব ছিল, সে শুনে ফেলেছে, সেই স্বর মাথার মধ্যে গুঞ্জন করছে। দলিত দুঃখের, লাঞ্ছনার স্বর কি যে উচ্ছ্রিত সুখের মতন শোনায় !

লজ্জা করে, অপমানিত লাগে নিজেকে। মণি চুপচাপ পথেরই উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারে না। ওয়াটার গেটের সোরগোল থেমে গেল। প্রতি বছর এই রকম হয়। হঠাৎ মনে হচ্ছে, গোলমালটা অন্য দিকে কোথাও। গেটের ওদিকে নয়। তাহলে কোনদিকে ? সোরগোল আবার উঠল, আবার থেমে গেল।

হ্যাবা বিবি একটু একটু করে কাঁদতে শুরু করেছে। ও বাপ ইমান রে ! কুন্‌থে গেলি বাপ !

এই হয়েছে মুশকিল, মেয়েটা এতক্ষণে কান্না জুড়ল ! ওর গলা থরথর করে কাঁপছে। ভয় পেয়েছে। কী করবে দিশে পাচ্ছে না। পাপ হয়, কিন্তু কাকপক্ষী টের পায় না। হায়না জানতে পারে বলে ইমানকে খেতে আসে। একথা ভেবে মণির একটা বীভৎস অনুভূতি হচ্ছিল। ক্রমশ ভাবতে ভাবতে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, শশাঙ্কমোহন কী ঘটনা ঘটিয়ে চলে গেল। কী শস্তা জীবনটা ! ফের, বউটা তো কোন প্রতিবাদও তেমন করল না। বউটারও ইচ্ছে ছিল। তাহলে কাঁদছে কেন এখন ! বলাৎকার শব্দটা এক মুরুব্বির মুখে একদিন শুনে মণির মনে হয়েছিল বড়রা খুব অশ্লীল হয়। সোনাইকে সে বলেছে, বলাৎকার মানে কী রে ! ডিকশনারি দেখে শব্দ করে পড়তে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। এখন মণি বুঝতে পারে, মেয়েরা হয়ত বলাৎকার পছন্দ করে।

আচ্ছা, বউদি কি বলাৎকার পছন্দ করবে ? বুলবন ভাইকে দেখে মনে হয়, দাদা এই জিনিস বোঝেই না। ছিঃ, ছিঃ ! এসব সে কী ভাবছে ! পাপ হয়। বউদি যে বিদ্যাদেবীর মত পবিত্র ! ছিঃ ! ছিঃ ! কত পাপ হয় এই অকাট্য রাতে, বিদ্যা হল সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম বোরখা, ভাবির দেহে জড়ানো— বড় পাপ মা গো ! দুই কাঁধে না কি দুই ফেরেস্তা, তারা মানুষের চিন্তার শব্দ অবধি শুনতে পায়। নেকি আর বদি, পাপ আর পুণ্য ! মা বলেন, দুই ফেরেস্তা দুই রকম লেখে। পাপ করলে পাপ লেখে। শুধু কত পাপ করল বান্দা, একজন তারই হিসেব লিখে চলে। চিন্তার পর্যন্ত পাপ আছে। পাপ মারলে তবে পুণ্য হয়। মনের পাপকে মারার জন্যই নাকি বাপু নামাজ পড়তেন মাঝে মাঝে। মণি ভাবল, সে তো নামাজই জানে না ঠিক। আচ্ছা, ভাইয়া ওই খারাপ শব্দটা কি কখনও অভিধানে পড়ে দেখেছে ?

ওর এখন ক্রমাগত পাপ হচ্ছে। পাপে সে ভরে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। তার শরীর পর্যন্ত কেমন করছে। মণি ছুটতে ছুটতে চলে আসে মোহড়াঘাট। জলের কাছে এসে মুখেচোখে জলের ঝাপটা দেয়। তারপর মাচার উপর এসে চুপচাপ বসে থাকে। ওই তো ওখানে বন্দুকটা আছে। ওই তো ! এই বন্দুকটার তো সত্যিই একটা মানে আছে। বন্দুকের কথাটা ভাবা যাক। মনে পাপ, হাতে বন্দুক, অসম্ভব ! এই অবস্থায় বন্দুকটার কথা ভাবতেও সাহস হয় না।

—কে ? কে ওখানে ?

—আমি !

—তুমি কে ?

—আমি ফুলভানু। তুমি ইখানে কী করছ মণিসোনা !

—ধ্যাৎ !

—রাগে না। আসো। বাড়ি চল, রেতের আবস্তা খারাপ, মাঠে যাবা না ?

—না।

—রাগ করে খালি !

—তুমি বাইরে কেন, সোমত্ত বউ, তোমার বরকে গুলি করে মেরেছে শশাঙ্ক ! শালা পাপী।

—গালি দিওনি, ন্যালা ওই করে মরল। আসো। খাবা না ?

—তুমি কথা বল না ! ঘেন্না হয়।

—ক্যানে গো, আমার মণিমাণিক্য !

—হয়। তোর ওপর, হাবার ওপর, এই সংসারটার ওপর। বন্দুক আছে, কিন্তু তাক করবার লোক নাই।

—বন্দুক কিসের, মাথাডা গেছে ! ওইডা ছুঁড়্যা ছেল শশাঙ্কবাবু, মরদ রে মারে, জিভ বাহিরে যায়। গলায় রুমাল বাঁদা।

—চোপ !

—খালি বকে।

—অ্যাই, তুমি লাভারের মত সুর করবে না বলছি ! ইস্ ! মাণিক্য !

—লাভার মানে ভালবাসা, আমি জানি। হিহি ! হিহি করে হেসে ফুলভানু সরে যেতে থাকে লেবুবনের ঝোপের দিকে।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—পেসাব করব, দেখছ বদনা হাতে ! আল্লাদ ! আহ্লাদিত গলায় রসে ভরিয়ে তোলে গলা হুকুমের বউ। এই আহ্লাদ শব্দটা অর্থহীন তান মাত্র, অযথা। বিশ্রী লাগে মণির। অবশ্য যার যেমন ভাষা। বেশি বকলে বেশি বকাবে এই লাটের বিটি। স্বামী মরে বিকার হয়েছে। প্রস্রাব করবে বউটা নির্লজ্জের মত। এখন বসে থাকলেও পাপ হবে ভেবে মণি ঝাঁপ দেবার ভঙ্গিতে মাচা ছেড়ে নামে। আবার সোরগোল বেধে ওঠে কোথাও।

মণি নাটার বাড়ির দিকে দৌড়তে শুরু করে দেয়। তার ঠিক সমান্তরাল রেখায় মাঠের মধ্য দিয়ে সেই হায়নাটা তারই অভিমুখে ছুটে চলেছে। ভূতগ্রস্তের মত ছুটছে। কুয়াশা, পাণ্ডুর চাঁদের ঘোলা বানজলের মত জ্যোৎস্নায় রক্তের হিংসা ছুটে মরছে, কাউকে নিশ্চয় খাবে।

মণি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

নাটার বাড়িতে এসে কোন কিছুই সে দেখতে পায় না। কোন লোকজন চোখে পড়ে না। ওখান থেকে ছুটে আসে ওয়াটার গেটের বাঁধপথের উপর। মাহেফরাসদের কোন চিহ্ন নেই। এই গেটের পাল্লা তারা এখন বসিয়ে দিতে চায়, নাটবল্টু যন্তরমন্তর যা লাগে গেটের কপাট তুলতে বা বসাতে, তা থাকে নাটা তরফদারের গিন্নি ব্যথা বিবির হাতে, গেটের চাবি থাকে। কপাট না বসালে সব জল বেরিয়ে চলে যাবে নদীতে। জল চলে গেলে মাছ বেরিয়ে যাবে এবং জলের অভাবে মাছ বাড়বে না। নটখুলি, দৌলতপুর, দৌলতডিহা, বীরকুচি, প্রণামপুর, রঘুনাথপুর, সাগরদিঘি, বাঁশতলি— তামাম গ্রামগুলির মানুষ অধিকাংশ মুসলমান জেলে। মাহেফরাস। অবশ্য হিন্দুও রয়েছে, চাষীও আছে সামান্য সামান্য।

চাবিটা কাছে রাখার অধিকার নাটার কী করে হয় মাহেফরাসরা ক্রমশ দিনে দিনে সেই প্রশ্ন তুলেছে। গেটের আশেপাশের জমি নাটার এবং কিছুটা ললিতের। নহর-অংশ সরকারি, অধিগৃহীত জমি। এখানের জমি, শোনা যায় নাটার জবরদখল খাস। সেই জমিতে ধান হয়। বাকি সমস্ত বিল গরিব জেলেদের। কুম জমি। জমির মাঝে মাঝে বড় গর্ত করা। মাছ সংরক্ষণের গর্ত। নদীর মাছ বন্যার জলে ভেসে এসে জমে।

বাঁধ বা গেট জল-নিয়ন্ত্রণ করে না। জল-নিয়ন্ত্রণ করে চাবি। কপাট খুলে দেওয়া অথবা বন্ধ করার অধিকার জেলেদের নেই। বন্যা যখন আসে, কপাট খোলা হয় ধানের বাড় দেখে, বেতাই ধান জলের উপর গলা ভাসিয়ে যাতে থাকতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কপাট ওঠে। কিন্তু জলস্রোত প্রবলপ্রবাহিনী না হলে মাছ কুমে পৌঁছায় না, যদি

হয় তাতে ধান ডুবে যেতে পারে। কুম না ভরলে জেলের সংসার চলে না। এই বাঁধ এবং জলগেট জেলের স্বার্থের কথা ভেবেই তৈরি, নহর কেটেছে তারাই।

বন্যা সব বছর তো উপচে আসে না। সে বছর জলের প্রথম তোড়ে গেট খুলে না দিলে বিলে মাছ ভরবার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। পর্যাপ্ত মাছ পেতে হলে নদীর জলের চরিত্র বুঝে গেট খোলা দরকার। কিন্তু নদীর জলের চরিত্র নাটাও যে বোঝেন না এমন নয়, কিন্তু ফসল রাখতে হলে জলকে গেটের কপাটে বেঁধে তাকে ফুসলে রাখার পক্ষপাতী তিনি। সময় পার করে দিলে জেলে মরে শুকিয়ে, গ্রামগুলোয় হাহাকার পড়ে যায়। এই গ্রামের দিকেই চলে গিয়েছিল মুমতাজ আলি। বিল পারের গ্রামগুলি পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় মণি অপলক চেয়ে থেকেও এই রাতে আর খুঁজে পায় না। ওয়াটা-গেট কেবলই আর্তনাদ করে চলেছে। ললিতমোহন নাটার কিষেন এবং চারজন মুনিষ সঙ্গে করে এসে কপাট আরও ঠেলে উপরে তুলে দিয়ে চলে গেছেন, মণি জানে। জল নামছে নদীতে, গুমানিকে প্রবল আকর্ষণে টানছে ভৈরব। জল এবং প্রায় সমস্ত সাদা মাছ মাহেফরাসের ভাগ্যের আশ্রয় ছেড়ে উন্মত্ত বেগে ক্রীড়াতৎপরতায় ভেগে চলেছে উধাও অনির্দেশ্য পথে। নদীর খাটানে গিয়ে নাটার তাঁবেদার ধনী জেলের জালে গিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। একটা চাবিই আসলে সব। গেটের জমি যার, চাবি তার। নদীর ছোট খাটালটির মালিক শশাঙ্কললিত।

মণি তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝেছে, গরিব চড়া গলায় দাবি করলেই বাবু মহাজনরা, লাটবেলাট, জোতঅলা বড়মানুষরা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়। চাবি চাইলে ব্যথার মুখ হরসন ব্যথায় ভরে যায়। আসলে এ চাবি মাঠ-আগলদার লক্ষণ দাসের হিফাজতে থাকার কথা।

—দাও গো মা কপাট খুলে!

—কপাটে মাথা ঠুকলেই তো পারিস বাছারা। তাইতে কি খুলে না। এ বছর ভয়ানক বান ডাকবে মোসলেম পাঁজিতে লিখেছে, তোরা তো নামাজরোজার ধার ধারিস নে, পাঁজির কি বুঝবি!

—পাঁজি আমাদের লাগে না মা। ভয়ানক বলছেন যখন ভয়ঙ্কর হবে তাহলে! দাও মা খুলে!

—আলহাম দো সুরাটা বল দেখি তমিজ! চাবি পাবি।

—সাতপীরের দোহাই মা, তুমিই তো মুশকিলআসান জননী।

—পারব না।

গেটের চাবি নয়, আঁচলের গাছচাবি পিঠে ঝনাত করে ফেলে দোরের কপাট ঠেলে বন্ধ করে দেন ব্যথা।

—মা!

—আমার জমিতে তোদের তেরো ঘরের বাস, ভুলে যাস না। ঠেলে তুলে দিলে কোথায় যাবি! জবরদখল কে করে, তরফদার না তোরা!

—এই সন বানের পানিতে ভাসিয়ে দাও ব্যথা-মা, ভেসে যাই, কপাট বন্ধ রেখো না, মা ফতিমার সহায়। দে মা! নক্ষণ হাতে করে আমাদের সনগে যাক!

—না। না। না। তরফদারের মানা আছে। পারব না। চলে যাও।

মণি এই দৃশ্য কবে থেকে দেখছে। এই ধরনার যেন অন্ত নেই, যেন হত্যে দেয় জেলে-মনষ্যিরা। কপাট তো আর লাথির ঘায়ে খোলে না।

মণি বাঁধপথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গৌর ঘোষের ভিটার কাছে আসে। পিছনে জলোচ্ছ্বাস ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পথ নির্জন। কদম আলি তাহলে কোথায়? মাঝে মাঝেই ওর জেল হয়। ও কি বাবাকে দেখেছে? ও কি আমানির মৃত্যুতে কাঁদেনি? ও কি জানে তার ছেলের কবরস্থ লাশ চিবিয়ে খাওয়ার জন্য শেয়াল বা হায়না ঘুরে বেড়াচ্ছে! ওই তো, পথের উপর ওটা কী? সেই জন্তুটা। চোখ জ্বলছে। একটা গন্ধ লাগছে নাকে। আমানির মায়ের গন্ধের মত, সোঁদা, মেটে এবং দুঃখী।

—হ্যাবাভাবী, তোর লজ্জা নাই? মায়ের জাত, তোর লজ্জা করে না? প্রায় উচ্চারণ করে একলা কথা বলে ফেলে মণি।

—তোর গন্ধও তোকে বাঁচায় না! আমি এখন বুঝতে পারছি। গরিবের ডায়ালগ তো, মানে বুঝতে সময় লাগে। আমার তাশা দিদির গায়ের গন্ধ বকুলের মত। মায়ের গন্ধ খোরমা সুর্মা তছবীহের মত। বউদির গন্ধ দেবীর মত। আমার নিজের গন্ধ শুকনো ধুলার মত, গন্ধই নাই।

আপন মনে হাসি পায় মণির। তারপর ভাবে, আর ভাবব না। এইভাবে পথে পথে এবং মাঠের মধ্যে তার রাত কেটে যায়। ভোরে সে নদীতে মুখ ধুতে আসে। দেখতে পায় দূরে ভারী এবং স্থির জলের উপর পানার দঙ্গল, যাকে বলে বাতরাজ, তার উপর ডানা ছড়িয়ে মেলে রোদ পোয়াচ্ছে অসংখ্য বক, যেন গুচ্ছ গুচ্ছ টগর ফুল শিশির শুকিয়ে নিচ্ছে। মণির দাঁতের মত সাদা। মণি ভাবে, কালো মুখে দাঁত তো সাদাই লাগে।

এই ভোরে আবার সম্মিলিত আর্তনাদ শোনা গেল। ভোররাতের দিকেও একবার উচ্চকিত রব শুনতে পেয়েছিল মণি। ধান ক্ষেতের ঝুপড়িতে তখন মণি একটুখানি শোয়ার চেষ্টা করছিল। বুঝতে পারেনি কোথায় কী হচ্ছে? রবটা আসছে ফরাজি পাড়ার দিক থেকে। পথের উপর দিয়ে কিছু লোক ওই দিকে দৌড়ে গেল।

মণি আর স্থির থাকতে পারল না। সে-ও ছুটতে শুরু করল। ফরাজি পাড়ায় থাকে কদম আলি, মোসলেম, জিন্নাতরা। ওদের কুটিরগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো। মোসলেমের দুয়ারে উঠোনে ভিড় জমেছে।

ভিড়ের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ে মণি চৌধুরী। দৃশ্য দেখে ভয়ংকর আঁতকে ওঠে। হায়নাটা চিৎপুরের সবচেয়ে অসহায় দুর্বল মানুষটির পা খেয়েছে রাত্রিতে। মোসলেমকে খুবলে দিয়েছে। ওর পায়ে গোদ এবং ঘা। লোকটা ঘায়ে ভরা পাখানিতে প্রচুর ন্যাকড়া জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে রাখত। ওর কোন চিকিৎসা ছিল না। চিকিৎসার কথা ভাববার মত সাহসও বেচারির ছিল না। সামর্থ্য না থাকলে সাহস কোথায় পাবে! ঘেয়ো সেই পা'খানিকে খেয়ে গিয়েছে।

চেয়ে দেখা অত্যন্ত কষ্টের। লোকটা বেঁচেই আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। উঠোনে শেতলপাটির উপর শোয়ানো, ওর পা'খানা কোনওমতে ন্যাকড়া দিয়েই জড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। সেই পায়ের তলায় বসে আছে হাওয়া বিবি। কিসের লতাপাতা বেঁটে পায়ে লাগানো হয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে রক্ত বন্ধ করা যায়নি। ন্যাকড়া লাল হয়ে গেছে। হাওয়া মৃদু সুর করে কাঁদছে।

বংশীর সেই গরুগাড়ি এল। মোসলেমকে গাড়িতে তোলা হল। নিঃসাড় বিক্ষত ভিখিরির দেহের পাশে বসল হাওয়া। হাসপাতালের দিকে এগোতে লাগল বলদ জোড়া। একটু একটু রোদ উঠেছে।

—কী করে হয়?

—হয়।

—কিসে খায় বেচারাকে!

—হায়নায়। সন্দ হয়, একটা হায়না ঘুরছে দ্যাশে।

শুনতে শুনতে মণি বলল—আমি দেখেছি।

—কোথায় দেখলি ? কে একজন অবাক সুরে জিজ্ঞাসা করে।

মণি চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। রিমে সূর্যের আলো ঝলমল করছিল সাইকেলটার। শশাঙ্কমোহন সাইকেল গড়াতে গড়াতে এগিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে একবার চেয়ে দেখে মণি। তারপর বলে—হ্যাবাভাবীর ঘরের দিকে রাতে উঠেছিল। ন্যালার কবরের কাছে দেখতে পাই। তুমি দ্যাখনি ভাবী ?

হাঁটতে হাঁটতে ছইয়ের পিছনে চলমান মণি সজোরে হাওয়াকে প্রশ্ন করে বসে।

হাওয়া অপ্রতিভের স্বরে বলে—না ভাই, দেখিনি আমি।

মণি বলল—ওই যে তুমি বললে, পাপ হয়, সোয়ামি আছে। আমার যে গন্ধ গায়ে ! হায়নাটা কী বলল তখন ?

রিম থেমে গেল মুহূর্তে। স্নানশুদ্ধ সাদা পোশাক পরিহিত শশাঙ্কবাবু চমকে উঠল। —চোপ শালা, বলে কি রে ! মণিকে খেঁকিয়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ।

মণি এবার হা হা করে হেসে ফেলে ঘুরে দাঁড়ায়। এবং অত্যন্ত শান্ত গলায় নরম করে বলে—আপনার বাইকে এক আঁচল চড়তে দিবেন !

কটমট করে চেয়ে থাকা শশাঙ্কমোহন সহসা নরম হয়ে যায়। একবার সে হাওয়ার দিকে দেখে নেয়। তারপর সাইকেলটা ছেড়ে দেয় মণির হাতে। হাওয়া বিবি সিঁটিয়ে পড়েছে।কোনও কথা বলতে পারছে না। মণি সাইকেল চালিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটে চলে। ধারালো শীতের হাওয়া লেগে চোখে জল কাটে মণির। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল, হায়নাটা রাত্রের কুকীর্তি দেখার পর তেড়ে এসে মোসলেমকে আক্রমণ করেছে। পাপ হয় কথাটা কতবার বলেছে হাওয়া। যেন রাত্রির বাতাসই সেকথা বলছিল। এই ভাবে একটি পাপের কথা মণির বুকের মধ্যে থেকে যায়।

বেলা হলে মণি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। পান্তা খেতে বসে নীচের রান্নাঘরের বাইরের চাতালে। নীচের বুলবনের ঘরের এদিকে বাইরের বারান্দায় ডাক্তারি করার পর মোড়ায় বসে উল বুনছে চন্দ্রিমা। ওর পায়ের কাছে ওষুধের ছোট বক্সটা আছে, কেউ হঠাৎ এসে পড়লে কাঁটা থামিয়ে বউদি ওষুধ দেবে। খুব ভোরে বুলবন বহরমপুর পার্টি অফিস গেছে। রাহুল নেই। গত পরশু মেসে চলে গেছে। একটু বাদে নাতাশাকে গরুগাড়ি করে চৌধুরী হাসানপুর রেখে আসবার জন্য মণি যাত্রা করবে। আজ বেলা হয়ে ঝাঁট পড়ছে, ফুলভানু চোখের সামনে ঝাঁটা হাতে খুব ব্যস্ত।

মা রান্নাঘর থেকে মণিকে শুধোন—তুই দেখলি ?

—হ্যাঁ।

—অনেক খেয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কতটা ?

—অনেক। ঘা ছিল তো, খুবলে ঘেঁটে রক্তারক্তি করে দিয়েছে পশুটা। লোকটা নাকি কাতরেছে, কেউ শুনতে পায়নি। মোসলেম যে একটা মানুষ, তাই কেউ মনে করে না।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— এই সেদিন আমার কাছে এসে খেতে চাইলে, ওই শিউলিতলায় বসল। খেতে খেতে ওর পাতে দু'টো শিউলিফুল ঝরে পড়ল। ও বললে, মা গো, ফুল ঝরে!

ফুলভানু বলল—আমি ফেলে দিনু পাত থিকে তুইল্লে!

মা বললেন—বাঁচবে না!

মণি বলল—পা পচে না যায়!

ফুলভানু ঝাঁট দিতে দিতে যে কোন ধরনের মুদ্রিত বা লিখিত কাগজ পেলেই হাতে উঠিয়ে তোলে। তারপর টানটান করে হাত দিয়ে যুৎ করে এবং ভাঁজ করে কোন ফাঁকে ফোঁকরে, গরুঘরের চালের বাতায় গুঁজে রাখে। দরকার মনে করলে কাউকে দেখিয়ে নেয়। এই ডা কি নাগবে বাবু? কাজের কাগচ কি না দ্যাখেন তুমি!

—না। ফেলে দে!

তবু ফেলে দিতে বাধে। গুঁজে রেখে দেয়। এই স্বভাব দেখে মানুষ হাসাহাসি করলেও ফুলভানু কোন কাগজকেই উপেক্ষা করতে পারে না। সাদা চৌধুরী বলেছেন—ফুলিবউ ভালই তো করে, দেখিয়ে নেয়, ফেলে না। ওরে বহিন, তুই তাই করবি!

—জি বাবু, তাই করব।

তা শুনেও সবাই হেসেছে। ফুলভানু আজ রাহুলের দুমড়ে ফেলে দেওয়া 'আজান' পত্রিকার পাতাটি ঝাঁটার মুখে ধাক্কা দিতে গিয়ে কুড়িয়ে তোলে। কী ভেবে টানযুৎ করতে করতে উলবোনা চন্দ্রিমার চোখের সামনে মেলে ধরে বলে—লাও! পড়ে দেখে ফেলে দাও, দিদি।

কাঁটা চালাতে চালাতে চন্দ্রিমা বলল—ধরে থাকো, আমি দেখি।

—হ্যাঁ, দ্যাখ!

চন্দ্রিমা দেখে, শিরোনাম অদ্ভুত। 'বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরি'। সে অবাক হয়। কাঁটা ফেলে কাগজখানা ছোঁ মেরে নেয়।

—কাজের কাগচ দিদি?

—হ্যাঁ। চন্দ্রিমা ফুলভানুর চোখে চোখ মেলে সবিস্ময় মূঢ়তায় জবাব করল। ঠিক তখনই এবাড়িতে উদ্ধত বেগে ঢুকে আসেন ব্যথা বিবি, ব্যথা তরফদার। তিনি পাড়া বেড়ানো মেয়ে নন, নিশ্চয়ই খুব দরকারে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে মোহর।

নাতাশাকে দেখে মোহর বলল—তুমি এসেছ কবে। জানিই না কিছু।

নাতাশা বলল—আজ, এখনই ফিরে যাচ্ছি। এসেছি ক'দিন!

মোহর বলল— মামী, আমি তাহলে তাশার সঙ্গেই ফিরে যাই! মণি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, অতখানি রাস্তা একলা যেতে ভোঁ ভোঁ করে!

ব্যথা বললেন—হজরত গরুগাড়ি করে তোমাকে রেখে আসবে। আজ যেও না। এখন আমার কাজটুকুনই করতে দাও! আয়েষাবুবু!

আয়েষা রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। মণি কলতলায় খাওয়া শেষ করে মুখ ধুচ্ছে। চন্দ্রিমা 'আজান' পত্রিকা মুঠোয় করে উলবল, কাঁটা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে গুছিয়ে নেয়। আয়েষা এসে ব্যথাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে ঘরের মধ্যে আসতে বলেন। নাতাশা সেজেগুজে তৈরি। মোহরের একখানা হাত আবেগে চেপে ধরে টেনে বুলবনের বিছানাপাতা চৌকিতে বসবার জন্য একটু ঠেলে আসে শরীরে স্পর্শ দিয়ে।

মোহর মৃদুস্বরে বলে— দেখা হল না !

নাতাশা বলে—পরশু চলে গেল ।

ব্যথা বললেন— রাহুল রাগ করে ডিসপেনসারি তুলে এনেছে। আমি বলেছি একটা কথা, ভাল করে শোন চৌধুবীর বউ !

আয়েষাকে লক্ষ করে বলে ওঠেন ব্যথা। ক্ষুণ্ণস্বরে ঘটনা বলে যান। —বাবু চার আট আনা ধার্য করলেন কেন, বুঝলাম না। তাইতে তরফদারের অভিমান হয়ে গেল। গরিব মানুষের কাছে পুরিয়া দিয়ে পয়সা চাওয়ার জন্যে তো ডিসপেনসারি করা হয়নি বুবু !

—না।

—ওষুদ তো আমার পয়সার জিনিস। তুমিও জান না, পয়সা আমার মায়ের দেওয়া জমির পাটখন্দ বেচা মালমাত্তা বলতে পার। বেগারে না দিলে এই গরিব-সেবা কিসের ! এখন শুনছি, সেই ওষুদ তোমার বউমা গরিবের কাছে বিক্রি করছে। এ যে ভাল শোনায় না আয়েষাবুবু ! বউ-ছেলে বেকার, তাই বলে আমার ডিসপেনসারির বদনাম করে দেবে তোমরা ! দাও, আমার বাক্সপত্তর দিয়ে দাও, আমি নিয়ে পালাই। বাবু গেল জেলে, তোমরা তার মান সম্মান লুটিয়ে দিয়ে বসলে।

কথা শুনতে শুনতে আয়েষার চোখ অন্ধকার হয়ে আসছিল। টেবিলের কোণটি আঁকড়ে ধরলেন তিনি। স্তম্ভিত হয়ে চৌকির উপর বসে পড়ল মোহর। নাতাশা মোহরের,কাঁধ খামচে ধরল।

চন্দ্রিমা আহত সুরে বলল— আমি চিকিৎসা জানি না। চার আট আনার চিকিৎসায় পেট ভরে না কারও। বেকার আমরা, কিন্তু ওই পয়সা চিকিৎসার দাম নয়, ডাক্তারি ভিজিটের ফি নয়, কিছুই নয়। আপনার ওষুধ আপনি নিয়ে যান, আমরা বেকার আছি, বেকারই থাকি। বড়লোক হলে, অপমান করতে মানুষের একফোঁটা বাধে না।

—এইসব কথা তোমার শ্বশুরও বলেছিল !

—কী কথা ব্যথা ! আয়েষা বিমর্ষ ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন।

—এই যে চিকিৎসার দাম নয়, ওষুধের দাম। রাগ করো না বউমা, কিছুই নয় ঠিক কথা, কিন্তু চারআনা পয়সাও গরিবের অনেক। আমি কি বাবুর বউমাকে অপমান করতে পারি মা ! রাগ করো না, তুমি আমারও বউ দোলন বিবি !

—বিবি ! চন্দ্রিমা চমকে উঠল। মোহর বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

ব্যথা বললেন—কেন, বুলবনের বিবি নও তুমি ! মুসমানকে নিকে করনি ? যাই হাক, আমি আসল কথা বলি। বাবু না আসা পর্যন্ত তুমি আমার বাড়ির বারান্দায় বসবে, চিকিৎসা চালাবে। ওষুধের ব্যবস্থা আগের মতনই হবে, আমি তোমাকে মাইনে দেব। হাত-খরচ !

—কত টাকা দেবেন ? চন্দ্রিমা দৃঢ়স্বরে জানতে চায়।

—যা হোক পাবে। ধর, পঞ্চাশ ষাট সত্তর একশ, কত নিবে তুমি ? ডাক্তারি তো জান না বললে।

—না, জানি না। আপনার ওখানে যেতেও পারব না। তবে যেতে পারি, ওষুধ আমার, চিকিৎসাও সাধ্যমত আমারই। আপনি রাজী আছেন ?

—কোথায় পাবে পয়সা, ওষুদের দাম জানো ? আর সবই যখন তোমার, তাহলে আর আমার ওখানে কেন ? তুমি দেখছি তক্ক করতে পার ! পার্টির মেয়ে, না ! ধার খুব।

—আপনি আর অপমান করবেন না। চলে যান।

—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, এত আস্পদা তোমার ! কোন ঠাকুরের মেয়ে তুমি গো। আয়েষাবুবু, এই মেয়ে তোমাকে নিধন করবে বলে দিলাম। অ্যাই মোহর, বাক্স ওঠা। চ। তোমার বাড়ি থেকে আমি অপমান হয়ে ফিরে গেলাম বুবু, এর ফল ভাল হবে না।

ব্যথা ওষুধের ছোট বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড দাপুটে পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে নেমে চলে গেলেন। মূক আয়েষা কোন কথা বলে উঠতে পারলেন না। তাঁর মনে হল রাহুল এবং বুলবন যখন একথা জানবে, তখন কী হবে।

মণি এসে বলল—বাক্স আমিই দিয়ে আসছি মোহর বুবু ! তুমি চলে যাও। এই বাক্স বাবুর !

মোহর কিসের একটা ঠেলা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর চোখ ছলছল করছে। বলল—থাক মণি ! থাক। তুমি আমাকেও নিয়ে চল। আমি যাব আর আসব, নাতাশা ! গাড়ি ছেড়ে যেও না। বলে মামীর পিছুপিছু ছুটে যায়, হাসানপুর চলে যাওয়ার জন্য মামাবাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে আসতে। মোহর রাহুলের দেখা পাবে ভেবে এসেছিল। মামী তাকে এখানে কেন সঙ্গে এনেছিল, সে জানত না। কিন্তু তার বারবার মনে হতে লাগল, রাহুল তাকে বিশ্বাস করবে না।

মোহর দ্রুত ফিরে এল নাটার বাড়ি থেকে। ও যে রাহুলের জন্যই হঠাৎ করে চিৎপুর এসেছিল নাতাশা বুঝতে পারে। গাড়ি যখন গড়াতে শুরু করেছে, চন্দ্রিমা দেখল, মোহরের চোখ ঈষৎ চিকচিক করছে। মোহর কী যেন তাকে বলতে চাইল, পারল না।

চন্দ্রিমা ভাবছিল, মোসলেমের পা খেয়ে গেছে হায়না। তার হাতে 'আজান' পত্রিকা। অতর্কিতে মানুষ এখানে মানুষকে খুবলে নেয়। কী অসম্ভব অন্ধকার এখানে, এত ভারী, এত পুরুষ্ট, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় যেন। সে তবে কোন্ বিবি ? কিসের সঙ্গে তার লড়াই বেধে উঠেছে, বিক্ষত এই মনটা সে এখন কোথায় রাখবে !

পত্রিকাখানির দুমড়ানো পাতাটি চোখের সামনে মেলে ধরে চন্দ্রিমা। পড়তে পড়তে মনে হয় ল্যাম্পের শিখা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি অক্ষর—হলুদ, পাংশু, রক্তাক্ত। প্রতিটি অক্ষরে অপমান লুকিয়ে আছে। এই চিঠি সে বুলবনকে দেখাতে পারবে না। এই পত্রিকা কি তবে পার্টির জেলা-সম্পাদককে দেখাবে ! ছিঃ ? বুলবন ! তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ !

॥ ১৫ ॥

চন্দ্রিমা টেবিলের উপর পড়ে থাকা ডাকে আসা শঙ্করপুর শাখা পোস্ট অফিসের সীলমোহর চিহ্নিত খামটি স্পর্শ করল না। খামের বাঁ দিকে প্রেরক, ডাক্তার হিফাজত তরফদারের স্বহস্তলিখিত নামটি দেখেই চন্দ্রিমা আর কোনও উৎসাহ বোধ করেনি।

—তোমার একখানা চিঠি এসেছে, টেবিলের উপর রেখেছি। স্বামীকে অনাসক্ত সুরে বলেছে। বুলবন চিঠিখানা পড়তে পড়তে চৌকির উপর বসে পড়েছে, স্ত্রীর মুখের দিকে এক ঝলক দেখেছে, কী একটা বলবার ইচ্ছে হয়েছে তার, বলেনি। তারপর চিঠিখানা ওর পুরনো বড় ডায়েরির পাতার ফাঁকে গুঁজে স্টিলের আলমারির কোথাও ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

বুলবন বুঝতে পারছিল, চন্দ্রিমা তার চাকরির ব্যাপারে আর কোনও কথা বলতে চায় না। তাকে যথেষ্টই ভুল বুঝেছে, সে যে বিয়ের সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছে, তা-ও চন্দ্রিমা টের পায়নি। ট্রাঙ্কের ভিতর জামাকাপড়ের স্তূপের মধ্যে সেই ছিন্ন সনদ পড়ে আছে, যেদিন জানবে, নিশ্চয় অবাক হবে। ভুল বুঝলেও বুলবনের কিছু করার নেই। এত স্পর্শকাতর হলে কি আর কোনও কথা বলতে উৎসাহ থাকে! ভয়ও করে এ কথা ভেবে যে, সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলাটাও চন্দ্রিমাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

হিফাজত যেভাবে লিখেছে, তা খুব সাধু। তিনি বুলবনকে বেগমপুরের নতুন জুনিয়র হাইস্কুলে চাকরি দিতে চান, মৌখিক সে কথা তিনি সদরঘাটে পথের উপর দরখাস্তে সই করাতে করাতে বলেছেন, এই চিঠি তারই লিখিত সমর্থন। ওই স্কুলের পরিচালক সমিতির প্রভাবশালী মেম্বার তিনি। মাদ্রাসার চাকরিটি বুলবনকে অপদস্থ করেছে, তার জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। তিনি সমাজের চাপে পড়ে ওই রকম একটি হীন প্রস্তাব করেছিলেন। সমস্তই তাঁর এই ব্যক্তিগত পত্রে উল্লেখ করেছেন হিফাজত। এমনকি এ কথাও জানাতে তিনি পুনরায় বাধ্য হয়েছেন যে, বর্তমান স্কুল কমিটির লাইফ মাত্র আর এক মাস। এরই মধ্যে উপযুক্ত রেজল্যুসন করে তিনি কাজ পাকা করে ফেলতে চান। সেই কাজ সম্পন্ন হতে চলেছে—সত্বর যেন বুলবন তাঁর সঙ্গে শঙ্করপুরের বাড়িতে দেখা করে।

সেই চাকরির প্রস্তাব বুলবনকে প্রলুব্ধ করল। কেন যেন আর একবার হিফাজতকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল তার! হিফাজত চিঠির শেষে লিখেছেন, সাদা চৌধুরী মান্য ব্যক্তি, আয়েষা তাঁর আত্মীয়, এ কথা তিনি মনে করেন, বুলবনদের বর্তমান সাংসারিক বিপর্যয়ে তিনি ব্যথিত।

সরল মনে আর একবার বুলবন দেখতে চায়, বিপর্যয়ের শেষ কোথায়, এই চিঠি কি কোন চালাকি! কোন কূট প্রলোভন! তা ছাড়া দরখাস্তটা ওই ভাবে সাইকেলে ঝুলন্ত ব্যাগ থেকে বার করে সই আদায় করে নেবেন ডাক্তারটি, বুলবন ভাবেনি, সে সেদিন খুব হত-চকিত হয়ে দরখাস্তে সই করে দেয়।

বুলবন বেগমপুরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ার আগে স্ত্রীকে বলল—চন্দ্রশেখর নামে আমার এক বন্ধু আছে চককালীতলায়। কলকাতায় এম. এ পড়বার সময় ওর সঙ্গে খুব ওঠাবসা সংস্কৃতি চর্চা করেছি। তোমার মনে আছে বোধহয়, 'নজরুল সমিতি'র মেম্বার ছিল শেখর। মাঝে মিশেলে লেনিন সরণির পার্টি অফিসেও এসেছে। বড়লোকের ছেলে, ওর বাবার রেশমের ব্যবসা। সদরঘাটে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খাগড়া বয়েজে ও চাকরিতে ঢুকেছে।

চন্দ্রিমা বলল—নজরুল সমিতি করত, পার্টি সম্পর্কে ওর কোন ইন্টারেস্ট গ্রো করেনি।

—না। তা করার কথাও নয়। কিন্তু নজরুল সমিতির সুবাদে সদ্ভাব বজায় ছিল বলে সদরঘাটে আমাদের একটা ঠেক জোগাড় হয়ে গেল। নীচের তলায় রেডিমেড পোশাকের দোকান। ভাড়া খাটছে। দোতলায় একটা মস্ত ছাদসহ দু' খানা ছোট ছোট দশ বাই এগারো পাশাপাশি ঘর। আমি বললাম, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়ার মত ক্যাপাসিটিও আমার নেই। শেখর বলল, আপাতত, কিছুই তোমাকে দিতে হবে না। পরে সংগঠন হোক, তখন যা হোক একটা কিছু ঠিক করে নিও, আমি বাবাকে বলে রাখছি, তবে ভাড়ার ব্যাপারটা অনন্ত ঠিক করবে, আমার ভাই।

—প্রাণকিশোরদা জানেন?

—হ্যাঁ, গতকাল বহরমপুর অফিসে কথা হল, উনি খুব খুশি। বললেন, এবার কাজে নামো, চন্দ্রিমাকে আর শহরে আসতে হবে না। আচ্ছা, আমি এখন তা হলে যাচ্ছি!

—কোথায়?

—শঙ্করপুর। এই নাও চাবি। সদরঘাট গিয়ে এখন এক আধঘণ্টা করে বসতে হবে। ওটা যে আমাদের নতুন অফিস হয়েছে, লোকের জানা দরকার। 'শরৎ জন্মশতবর্ষ কমিটি, সদরঘাট শাখা।' এই ব্যানারটা আমি লাল সালুতে চৈতন্যকে দিয়ে সাদা কাগজ কেটে অক্ষর বসিয়ে করিয়ে এনেছি। যাওয়ার পথে টাঙিয়ে দিয়ে শঙ্করপুর চলে যাব। দেখেই চিনতে পারবে, কোনটা আমাদের অফিস হয়েছে।

বলে সাইকেলখানা ঘর থেকে বাইরের প্রাঙ্গণে নামিয়ে ফেলে বুলবন।

চন্দ্রিমা বলল—আনিসুল করীম বলে একজন একখানা পত্রিকা বার করে। নাম 'আজান'। দেখেছ?

—না! সাইকেল একটু গড়িয়ে থেমে অবাক সুরে বলল বুলবন। তারপর শুধাল—কেন, কী হয়েছে?

—হয়েছে অনেক। যথেষ্ট হয়েছে। ফিরে এস, তারপর বলব। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

—কিসের! বলতে গিয়ে বুলবনের চোখ সরু হয়ে উঠল।

—কিসের নয় বল! সমস্ত কিছুর! সমস্ত জীবনটার! আমি কেন এখানে এলাম, আদৌ এখানে থাকতে পারব কি না!

—বেশ! গম্ভীর আর আহত স্বরে বলে ওঠে বুলবন। এবং বলে—আমি চেষ্টা করছি সমস্ত গুছিয়ে তোলার। এত সত্ত্বেও যদি এখানে ভাল না লাগে, তুমি বহরমপুর চলে যেও, আমি আটকে রাখব না। বলে আবার সাইকেল গড়ানোর চেষ্টা করে বুলবন।

চন্দ্রিমা আর কোনও বিবেচনা না করেই বলে ফেলে—আটকে কি রাখবে তুমি, সেই চরিত্রের জোরই তোমার নেই! সার্টিফিকেট হাতে করে যেভাবে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালে এ তো ছাপোষা মানুষরা করে বুলবন! এত ভীরু তুমি! সার্টিফিকেট দেখিয়ে হিফাজতের কাছে তুমি গ্রেস মার্ক চাইতে যাচ্ছ!

—হ্যাঁ, তাই! প্রচণ্ড ক্রোধে, অভিমানে, আশ্চর্য বেদনায় বুলবন যেন ঝংকৃত দীর্ণ হয়ে বেজে ওঠে। তার পায়ের তলার মাটি বুঝি দুলছিল।

—মণির যা জোর, তা-ও তোমার নেই!

—না, নেই। আমি ভীরু, কাপুরুষ। ঠিক বলেছ! এই মানুষকে ভালবাসা তোমার ঠিক হয়নি চন্দ্রিমা।

—তুমি সব পার! বলে চন্দ্রিমা যেন অশ্রুস্পর্শে বিপন্ন হয় এই মুহূর্তে।

বুলবন বলল—পাগল হয়ে গেছ! না জেনে, না বুঝে, তুমি পরের মত করছ!

—আমি তোমার কেউ নই, কেউ নই। যাও! বলে চন্দ্রিমা বারান্দার থামে পিঠ ঠেকিয়ে গলা তুলে কান্না রোধ করে। বুলবন আর দাঁড়ায় না, চলে যায়।

চন্দ্রিমা ঘরে ঢুকে এসে বিছানায় বালিশ আঁকড়ে ভিতরের আবেগ রোধ করার জন্য উপুড় হয়ে যায়। তার সমস্ত অন্তর জুড়ে ঘৃণার স্রোত বইছিল। বুলবন যে এমন করবে কখনও সে কল্পনাও করেনি। সামান্য একটা চাকুরির জন্য মানুষ তার অন্তর্গত সংগ্রামকে কী হীন পন্থায়, কত নির্লজ্জের মতো বিসর্জন দিতে পারে। 'আজান' পত্রিকা মন্তব্য করেছে, "একজন বামপন্থী নেতৃস্থানীয় কমরেড বিবাহের সার্টিফিকেট দর্শাইয়া চাকুরি

চাইবে তাহা দেখিয়া রঙ্গভূমি ভারতবর্ষকে আশ্চর্য দেশ বলিয়া মনে হলেও, চাকুরির জন্য মানুষ কী না পারে ! ধর্মের নামে এইরূপ খেমটা নাচও বড় একটা দেখা যায় না। কমিটি তলে তলে চাকুরির জন্য লোক ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, অথচ বুলবন চৌধুরী নামক আগমার্কা পার্টি কমরেডকে সার্টিফিকেট চেয়ে খ্যাপাইয়া তুলিয়াছে, চৌধুরী-পুত্র বাস্তবিক এক্ষণে কী করিবে তাহা আলমতলা যেমন বলিতে পারে না, ছাঁদনাতলাতেও তার খবর নাই। পার্টি অফিসের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিকৃতির সামনে তাহাদের জুলুয়া হয় অর্থাৎ শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান হয় বলিয়া নিন্দুকরা রটাইতেছে, কলিকাতার 'মিরাজ' পত্রিকা উক্ত খবর ছাপাইয়া বিস্তর রসিকতা করিয়াছে, কিন্তু স্কুল কমিটির রসিকতা সবকে ছাপাইয়া গিয়াছে। ধিক ধর্ম, ধিক মনুষ্যত্ব, ধিক কার্ল মার্কস।"

পড়তে পড়তে কেঁপে উঠেছে চন্দ্রিমা। পত্রিকার সম্পাদক যে কঠিন বামপন্থায় অনুরক্ত তা তার ধিক্কারে স্পষ্ট। কিন্তু একটি অক্ষরকেও সহ্য করতে পারছিল না সে। একটি অক্ষরকেও নয়। সে কি তবে এই সমাজে আদর্শের টানে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এখানে আসার তার কি কোনওই অধিকার ছিল না ? যে হিফাজত বুলবনকে এমন নির্মম রসিকতা করেছে, তার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল চৌধুরীপুত্র, এই আচরণ যে কত কুৎসিত, তা-ও বেচারি বুঝল না। মামাকে লেখা বুলবনের অসমাপ্ত চিঠিগুলির কথা মনে হয় চন্দ্রিমার। সেই চিঠির ভাষায় ছিল চরিত্রের আশ্চর্য দোদুল্যমানতা। এই মানুষ সংসারের যোগ্য হলেও হতে পারে, পার্টির নেতা হতে পারে না। পার্টির কাছে বুলবনের সমস্ত আচরণ বিবৃত হওয়া উচিত। এই মানুষের হাতে পার্টির নেতৃত্বের ভার থাকলে পার্টি ডুববে, রক্ষা করা যাবে না। সংস্কৃতির জগতে আপোসহীন এক যোদ্ধা ছিলেন শরৎচন্দ্র, তাঁর মূল্যবোধকে আত্মস্থ না করে পথ চলা যায় না। পদে পদে এমন ভীরুতা, এমন ন্যুব্জ ভিখিরির দশা, এ কাকে সে ভালবেসে বরমাল্য দিয়েছে ! সাহস করে কোনও কথা স্পষ্ট দৃঢ়তায় প্রকাশ করতে পারে না। একখানা লাল সালুতে শরৎচন্দ্রের নাম লিখে এনে টাঙালেই কি চন্দ্রিমা খুশি হতে পারে ; তাই কি যথেষ্ট ! বুলবন যে খুব মস্ত একটা কাজ করে ফেলেছে, তাই সে বলবার চেষ্টা করল।

ভাবতে ভাবতে কান্না পেয়ে যাচ্ছিল চন্দ্রিমার। হঠাৎ দেখে, বুলবন ফিরে এসে তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে বলছে—প্রাণকিশোরদা দু'টো নাগাদ সদরঘাটে আসছেন। সকালে ডোমকল গেছেন। ফেরার পথে আমাদের পার্টি অফিস দেখে যাবেন। আমি শঙ্করপুর থেকে সত্বর ফিরব, তুমি দেরি করো না।

বলেই আবার নেমে চলে গেল বুলবন। চন্দ্রিমার বুকের মধ্যে অসহ্য উত্তাল তরঙ্গ বইছিল, এক সংক্ষোভ হাহাকার করছিল ক্রমান্বয়, মনে হল, প্রাণকিশোরের সঙ্গে দেখা না হলে সে আর বাঁচবে না।

এই সময় একটি ন্যাতানে বউ দুয়ারে দাঁড়িয়ে চন্দ্রিমার কাছে ওষুধের জন্য প্রার্থনা করে। মোহর হাসানপুর চলে যাওয়ার সময় ব্যথা বিবির জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া ছোট কালো মেডিসিন বাক্সটা ফেরত এনে দিয়ে গেছে। দেওয়ার সময় মোহরের চোখ দু'টি ছলছল করছিল। বিছানায় উঠে বসে টেবিলে হাত বাড়িয়ে কালো বাক্সটি কোলের উপর টেনে নেয় চন্দ্রিমা। মোহরের মুখটা আবার মনে পড়ে। মেয়েটি কী ভালই না বাসে রাহুলকে ! ওর ভয়, পাছে রাহুল তাকে ভুল বোঝে !

মোহর ধরা গলায় বলেছিল—বউদি ! আজকের ঘটনার কথা রাহুল যেন না শোনে, আমার দোষ হবে, বিশ্বাস করুন ! আমি কিছুই জানতাম না।

—জানি বোন।

—রাহুলের কাছে আমি গান শুনতে এসেছিলাম।

—তা-ও জানি।

—আমার খুব খারাপ লাগছে বউদি! মামার বাড়ি আসতে আমার আর ইচ্ছে হয় না। আমি যদি আপনাকে ওষুধ দিয়ে সাহায্য করি, আপনি নেবেন? আপনার চ্যারিটিতে আমি পার্টিসিপেট করতে চাই। মানে, একটু সাহায্য মাত্র। যদি খারাপ না মনে করেন!

—কেন করব! তবে রাহুল তোমার সাহায্য যদি পছন্দ না করে, ও যে ভীষণ মোহর! আমি ভাবছি, একাই চালাব। দেখি পারি কি না!

—আমি তা হলে রাহুলকেই বলতে পারি! ও কি সত্যিই রেগে যাবে?

—এই চিকিৎসা বাবুর সম্মানের বস্তু। তুমি জান, রাহুল তার বাবার চ্যারিটির ব্যাপারে খুব কেমন হয়ে গিয়েছে।

—মামীই ওই বাক্সপত্র ফেরত দেয়, মানুষের কী মন দেখুন! মাঝে পড়ে আমি খুব ছোট হয়ে গেলাম বউদি! একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর মোহর বলল—তা হলে আমি আসি!

আর কোনওকথা চন্দ্রিমা বলতে পারল না। মনে হচ্ছিল, মোহর যে ওষুধ দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল, তা গ্রহণ করলে মোহর অত্যন্ত খুশি হত। কিন্তু রাহুলের কথা ভেবে গ্রহণ করতে সাহস হল না। এমনকি, আয়েষাও এই সাহায্য চাইবেন না। গাড়ি গড়াতে শুরু করেছে। চন্দ্রিমা দেখল, মোহরের চোখ ঈষৎ চিকচিক করছে। মোহর কী যেন তাকে বলতে চাইল, পারল না।

ওষুধ দেয় চন্দ্রিমা বউটিকে। তারপর ঘণ্টাখানিক রাহুলের হিস্ট্রির নোট সাজিয়ে গুছিয়ে লেখে। মনে মনে বলে, আশা করি এগুলি তুমি ফেলে দিতে পারবে না।

আচ্ছা! চন্দ্রিমা ভাববার চেষ্টা করে, বুলবন 'আজান' পত্রিকা দেখেনি। তা হলে এই পত্রিকা কোথা থেকে এল। এই পত্রিকা কি রাহুল দেখেছে? চন্দ্রিমার মনে হল, রাহুল দেখে থাকলে কী ভেবেছে সে মনে মনে? পাতিবুর্জোয়া বলাটা ওর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন ছিল মন্মথর। মধ্যবিত্তের আপোসপন্থাকে সুতীব্র আঘাত তো ওরা কেবলই করেছে, নিয়ত নিরন্তর। রাহুলের সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়ানো কি সম্ভব কখনও! যাকে সে রক্ষা করতে চায়, তাকে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে কী বলবে? কোন্ কথা? রাহুলের ঘৃণার সামনে দাঁড়ানোর কি সাহস হবে তার?

পারবে না। কিছুতেই পারবে না চন্দ্রিমা। রাহুলের ঘৃণার মধ্যে আমানির মৃত্যুর ঘৃণা মিশে আছে। ঘৃণার মধ্যে মিশেছে পিতার বিদীর্ণ মূর্তির তাপ, অপমান। মিশেছে মুমতাজের রোমান্টিক উপমা, অ্যাডভেঞ্চার! সব বুঝতে পারি রাহুল। কিন্তু কীভাবে তোমার সামনে দাঁড়াই? চন্দ্রিমা অসহায় হয়ে আপন অন্তরে আকুল হয়, কলম থেমে পড়ে।

হিস্ট্রির নোটগুলি ঢেলে তৈরি করা নিবন্ধগুলির একটি মোটামুটি আপাতত তৈরি হল আজ। চন্দ্রিমা দোতলায় রাহুলের ঘরে টেবিলে সে সব গুছিয়ে রেখে নীচে নামল। স্টিলের আলমারিটা খুলে ভিতরের ছোট বাক্সটির ডালা খুলল চাবি দিয়ে, বার করল তার নিজের অলংকারগুলি, একটি ভেলভেটের রঙিন কাপড়ে পুঁটুলি করে বাঁধা। সমস্তই সোনার জিনিস। স্নান করে খেয়ে সদরঘাটে বার হওয়ার সময় সঙ্গে নিল ওইগুলি। সঙ্গে নিল 'আজান' পত্রিকার পাতাটি।

পথে নেমে ওয়াটার গেটের দিকে চলে আসে। কিছু লোক ওখানে জড়ো হয়েছে। শশাঙ্কমোহনকে দেখতে পায় দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রণামপুরের দিক থেকে জন পঞ্চাশ জেলে গেটের বাঁধ-পথে কেউ খাড়া হয়ে আছে, কেউ বা বসে পড়েছে উবু হয়ে। চন্দ্রিমা বুঝতে পারে, জল নিয়ে হাঙ্গামা হতে পারে। জলের তোড় এখন আরও সাংঘাতিক হয়েছে। কপাট আরও তুলে দেওয়া হয়েছে। নদীটা খলবল করে ছুটছে, নদীর খাটানে জালে মাছের শুভ্র লাফালাফি চোখে পড়ে। জেলেদের অনেকের কাঁধে কোদাল, ওরা বাঁধ কেটে সব জল নামিয়ে দেবে বলে তড়পাচ্ছে ; তাতে যে আপন পায়ে কুড়ুল মারা হবে, তা হোক, তবু তারা ছাড়বে না। সাদা মাছ যে ওদের কপালে নেই, তা বুঝতে পারছে তারা, ললিতমোহন কপাট তুলে দিয়েছে।

—আমাধেরে হাতে গেটের ছুড়াং দিতে হবে। অ্যাই নক্ষণ ছুড়াং ফেইলে দে।

একজন চিৎকার করল। মাথায় পাগড়িবাঁধা, হাতে ভারি লাঠি লক্ষণ নামের মাঠ-পাহারাঅলা লোকটি নীরব। ঘাড় গোঁজ করে মাটির দিকে চেয়ে আছে। ওর বাড়ি গোকুলদানা গ্রামে। তাকে মাঠ-পাহারাদার সাব্যস্ত করেছে গ্রামের মজলিস। সেই মজলিসে প্রণামপুর, নটখুলি, বীরকুচি, দৌলতডিহা ইত্যাদি গাঁয়েরকোনওপ্রতিনিধি নেই। কে একজন সে কথাও গজগজ করে বলতে চাইছে।

—ছুড়াং দে শালা ! বলে একজন তেড়ে এল লক্ষণের কাছে। উল্টো একটা ধাক্কা খেল চিৎকৃত ঢ্যাঙা মানুষটি শরম আলির হাতে। মারামারি বাধবার জোগাড় হয়।

চন্দ্রিমা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গলার স্বর চড়িয়ে বলে—থামুন আপনারা ! আমি বলছি, একটু দয়া করে শুনবেন।

—দয়া ? দয়াধর্মের কথা বলছেন ! শুনুন দিদি ! দয়া এরা করে না। আপনার কথা দয়া করে শুনব, কিন্তু আমাদের কথা দয়া করে কে শুনবে ? বলে উঠল থুতনি পর্যন্ত লম্বা একটি তৈল-মসৃণ চকচকে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ; অতিরিক্ত ফর্সা, একখানা পা অতি শীর্ণ, লিকলিকে, মরা, নেতিয়ে থাকা, মৃদু রোমে উজ্জ্বল এবং লাঠিতেই জড়ানো—এক যুবক। মুখের থুতনিতে চারনরি দাড়ি আছে, গোঁফও তেল করে কাটা নয়, তৃণ-কোমল গোঁফ, দাড়ির সঙ্গে মিশেছে। চোখ দু'টি বুদ্ধি মাখানো, ধকধক করছে। গোলমাল থামানোর উদ্দেশে হাত তুলল—অ্যাই রোক্কে ! দাঁড়াও !

একেবারে নেতার মত হাত নাড়ার ভঙ্গি। যেন সে হাত তুলে তরঙ্গ শাসন করল।

—আমার নাম ইকবাল। ইকবাল ভুঁইয়া। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের ছাত্র। কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম প্রি ইউনিভার্সিটি কোর্সে, বাপু হস্টেল খরচ চালাতে পারেনি, দু' মাস ক্লাস করার পর ছেড়ে দিয়েছি, এখন ছেলে-মেয়ে টিউশানি করি আর একটা মনোহারি দোকান করেছি। প্রণামপুরে বাড়ি। আমার পা নেই দেখছেন, লাঠি ভরসা। তবু এসেছি। কেন এসেছি বুঝতেই পারছেন। পানি সমস্ত নেমে চলে যাবে, জেলেরা বাঁচবে কী করে ! প্রতি সন এই রকম হবে ! কখনও এর প্রতিকার হবে না ? জল ঢোকাবে খুশি মতন, ছেড়ে দেবে আপন মর্জিতে ! বলুন !

বলতে বলতে লাঠিটা বুকের সঙ্গে নিবিড় করে চেপে ধরে ইকবাল। চন্দ্রিমার চোখ চলে যায় কালো রঙের দোহারা গড়ন মানুষটির উপর, শশাঙ্কর কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে তীব্র নগ্ন দৃষ্টিতে চন্দ্রিমাকে দেখছে, হিমেল দৃষ্টিতে কৌতুক মেশানো, একটু আপাঙ্গে বক্র। একটা ভারিক্কি নেতা নেতা ভাব, জঙ্গি তেরিয়া কথা বার হয় মুখ দিয়ে—খুব লেকচার ! তাই না আকু ! প্রি ইউনিভার্সিটি কোর্স শুনে মনে হচ্ছে শালা হাকিম ! কে তোদের

ক্ষ্যাপায় রে ! সব জিনিসের একটা প্রস্তুতি লাগে, আন্দোলন এমনিই হয় না, মানুষকে পলিটিক্স দিতে হয়। ছুড়াং চাইলেই কি ছুড়াং পাওয়া যায় মহরম !

তারপর জঙ্গি নেতাটি চন্দ্রিমাকে উদ্দেশ করে—শুনুন মিসেস ! আপনি এই সব গ্রাম্য ঝামেলার মধ্যে থাকবেন না। যেখানে যাচ্ছেন চলে যান।

—কেন যাব। এই গ্রাম তো আমারও। এর ভালমন্দ আমিও বুঝতে চাই। আপনারাই শুধু পলিটিক্স করবেন তা তো হতে পারে না। আমরাও যে আছি ! বলে ওঠে চন্দ্রিমা।

—করুন ! আপনিও করুন। তবে ভদ্দরলোকের রাজনীতি এখানে চলে না, তাই বলছি। এ হল মাহেফরাস আর চাষার যুদ্ধ। মাহেফরাস একটা জাত, শুনেছেন কখনও ? এরা মুসলসমান ! মছলিভজা, বুঝলেন ! অ্যাই লক্ষণ, ছুড়াং থাকলে দিয়ে দে।

—না, তিমিরবাবু, নাই ! বলে ওঠে লক্ষণ দাস।

—দে। না হলে হাঙ্গাম বাধবে ! তিমিরবরণ বলে।

—নিশ্চয় বাধবে ! জোর গলায় বলে উঠল ইকবাল। স্বর আরও উপরে তুলল সে। বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন দিদি ! আমরাও আছি, আমাদের রাজনীতি আছে।

লক্ষণ সভয়ে বলে—ব্যথা মা রাখেছেন চুড়াং। দেন নাই। দিলে পর হাঙ্গাম আর ঠেকানো যায় না এই গেটের সোতায়। কাড়ে লিবে।

ইকবাল বলল—এই জল ব্যথা মায়ের পয়দা নয় লক্ষণ দাস। এতে চাবি মারবার হক তার নাই।

চন্দ্রিমা বলল—আপনারা একথা বি ডি ও-র কাছে গিয়ে বলুন ! আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি। আমি মনে করি, ওই চাবি মাহেফরাসদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। অন্তত গেটের গার্ড বা মাঠ-প্রহরী আপনাদেরই প্রতিনিধি হওয়া দরকার।

ইকবাল বলল—আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা এই দাবি অনেক দিন যাবৎ করে আসছি। ললিতকে সেকথা শোনানো যায়নি। উনি ওঁর নদীর খাটানে মাছ আর নদীর খাঁড়িতে জল ইচ্ছে মতন টেনে নেন, পরোয়া করেন না। উনিই এই গেট তুলে দিয়েছেন। আমরা বলছি, আমরা ছাড়ব না।

এই সময় সোরগোল উচ্চকিত হয়ে উঠতে চাইলে আবার হাত নেড়ে ভঙ্গি করে তরঙ্গ শাসন করে ইকবাল। কিন্তু উত্তেজনা তার কণ্ঠে দ্বিগুণ হয়। ওর গলার শিরা ফুলে ওঠে, ফর্সা গ্রীবায় নীল শিরা দেখা যায়।

—এই তিমিরবাবু একদিন খাস জমির লড়াইতে সোভান আলিকে শহিদ করেছে। সেই কিনা শশাঙ্কর হয়ে চোপা নাড়ছে, মাঠে ময়দানে কাজ নাই এদের এখন, ইন্ডিকেটের সাপোর্টার্রি। থুঃ ! তোমার রঙ চেনা যায় না তিমিরবরণ। থুঃ ! থুঃ ! এমারজেন্সির দালাল ! বিশ দফার সমর্থক। থুঃ !

ইকবালের এই চড়াসুরে গেটের ঘূর্ণি কোঁ কোঁ করে ওঠে। থুৎকারে বমন হচ্ছে যেন।

—অ্যাই হারামি, লেঙড়ু, নকশালি করিস না নিকিরির পুত, মুখে মুতে দিব ! বলেই শরম আলি ইকবালকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এক পায়ে ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় ইকবাল ভুঁইয়া। একজন মাহেফরাস ঝাঁপিয়ে পড়ে শরমের উপর। শশাঙ্ক চোখের ইশারা করতেই দু'জন তাগড়া জোয়ান কোদাল কেড়ে নিয়ে ইকবালের মাথায় আঘাত হানে, মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে পঙ্গু ছেলেটির। শশাঙ্ক মুহূর্ত দেরি না করে নদীর কাছে নেমে জলে দোলায়মান একটি ডোঙার কাছে যায়। মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তি

বেধে গিয়েছে, চন্দ্রিমা তবু দেখতে পায়, শশাঙ্ক ডোঙার শোয়ানো একটি ডোঙারঙের বন্দুক তুলে নিয়েছে; লোকটা এই বন্দুক দিয়ে সোভানকে হত্যা করেছিল ? চরম স্পর্ধায় গ্রীবা টান করে শশাঙ্কমোহন, আকাশে গুলি ছুঁড়ে দেয়। মুহূর্তেই মারপিটে ব্যস্ত মানুষরা থেমে পড়ে। ভয় পেয়ে মাহেফরাস গোষ্ঠীর লোকেরা বাঁধপথ ধরে পালাতে শুরু করে। দূরে সরে গিয়ে তারা ডোঙায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, জলেও কেউ কেউ ঝম্প দিয়ে বসে, ভীতু কে নয় ? তখন এদের দেখে চন্দ্রিমার মায়া জাগে, বুঝতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধে এরা এসেছে, গুলি হবে একথা তারা ভাবতে পারেনি। কিন্তু শশাঙ্ক প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, গুলি ছুঁড়তে হবে তা সে জানত। ডোঙায় বন্দুক শুইয়ে রাখার ঘটনায় চন্দ্রিমা বিস্ময় বোধ করে।

তিমির দ্রুত তৎপরতায় লক্ষ্মণকে পথের উপর বসায়। লক্ষ্মণ দাসের মাথা ফেটেছে। কখন কে মেরেছে বোঝা যায়নি। লক্ষ্মণকে শশাঙ্কর সাইকেলে তুলে ক্যারিয়ারে পিছনে বসিয়ে নিয়ে তীব্রবেগে হাসপাতালের দিকে ছুটে যায় তিমির। তিমিরের ঠোঁটে শ্বেতীর দাগ দেখতে পায় চন্দ্রিমা। দেখতে পায় সাইকেলের রিম সূর্যালোকে ঝলমল করছে, চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। নদীর ডোঙায় গিয়ে বসে শশাঙ্কমোহন এবং শরম সহ অন্য তিনজন। চলে যায় রণতরী। পথের উপর পড়ে থাকে পঙ্গু ইকবালের রক্তাক্ত দেহ। চলে যাওয়ার আগে সরু পাখানি ভারি জুতো তুলে শশাঙ্ক মাড়িয়ে দিতেই অর্ধচেতন, চোখে মুখে রক্তলিপ্ত, ইকবাল কঁকিয়ে উঠে মাটিতে ফের শুয়ে যায়। ধূলায় মুখটা ঘষড়ায় আহত যুবকটি।

দু'চার বিশ দণ্ড কাটে নিঃশব্দে। দুই চারিটি মাহেফরাস জল থেকে উঠে আসতে থাকে। ডোঙা বাঁধে ডাঙায়। সমস্ত দৃশ্য চক্ষু বিস্ফারিত করে বাঁধের এক কোণের কদমতলায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে চন্দ্রিমা। শশাঙ্ক যখন ইকবালের সরু পা মাড়াচ্ছে, আমানির মুখটা তখন মনে পড়ল। ইকবালের দিকে এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে। রাস্তা, বাঁধ, সরব জলরাশি নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। স্রোত আর্তনাদ করছে, তবু যেন শব্দ নেই।

এই গ্রামে এসে এত অসহায় কখনও লাগেনি চন্দ্রিমার। এই তবে গ্রাম ! ওই তবে জঙ্গী নেতা তিমিরবরণ ! কী রহস্যময় রাজনীতি ! কী দুর্বোধ্য সংগ্রাম এখানে ! তাদের রাজনীতিকে ভদ্রলোকের রাজনীতি বলেই যেন ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় তিমির। যুক্তির এমন নির্মল অভিব্যক্তি কখনও শোনেনি চন্দ্রিমা। চাষার সঙ্গে মাহেফরাসের যুদ্ধ, তা-ও কখনও দেখেনি চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়।

দেখা যায় দূর থেকে জলের উপর একটি বিলপথে সুন্দর ডোঙা ভেসে এল। আরোহী মাত্র একজন, সে-ই চালক। কবি গঙ্গোপাধ্যায়। ছেলেটাকে চিনতে পেরেছে চন্দ্রিমা। এই ছেলেটি রাহুলের বন্ধু, কলেজের সহপাঠী। ডোঙা চালনা শেখে, কারণ এরকম বিল ছাড়া ডোঙা চালনা নাকি শেখা যায় না। নদীস্রোতে ডোঙা ঘুরে যায় হাওয়া মোরগের মত।

কবি জল থেকে উঠে এসে ইকবালকে কাঁধে তুলে নেয়। চন্দ্রিমাকে যেন সে চিনতেই পারে না। কোনও কথাও বলে না। ডোঙায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়। তারপর ডোঙাটিকে একা ঠেলে নিয়ে চলে গোকুলদানা গ্রামের দিকে, ওইদিকে বোধহয় কোনও ডাক্তার থেকে থাকবে অথবা ওইদিকে হাসপাতাল যাওয়ার সড়ক আছে বিলধারে কোথাও। কবি ডোঙা ঠেলতে ঠেলতে গলা তুলে মাহেফরাসদের উদ্দেশ করে বল—যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, গাঁয়ে চলে যাও ! আমার ফিরতে দেরি হবে।

রক্তমাখা ধুলোর দিকে চেয়ে থাকে চন্দ্রিমা। কী আশ্চর্য ! কত চকিতে, প্রায় নৈঃশব্দ্যে ঘটে গেল সব, মাত্র একটি গুলির শব্দ হল ! কবি তাকে চিনতেও চাইল না, রাহুলের চটি হাতে করে রাত্রে সেদিন এসে পরিচয় দিয়েছে, বউদি বলে ডেকেছে। মনে হয় জলেরই আড়ালে কোথাও বিন্দুবৎ দূরে লুকিয়ে ছিল কবি। চন্দ্রিমার কাছে সে আর গোপন রইল না। পাতি বুর্জোয়া বলেই কি তার সঙ্গে কথা বলল না ওই ছেলে ? ভদ্রলোকের রাজনীতি করে, তাই। অথবা সে হয়ত আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত বলে কথা বলতে চাইল না এখন। মনে কেমন এক ধরনের গ্লানি জমছিল চন্দ্রিমার। মনে হল, সে কিছুই করতে পারল না।

সে ভুগছে একটি অদ্ভুত আপোসে, তীব্র জ্বালায়, মাথা তুলতে চেয়ে সে দম পাচ্ছে না। কোথায় তাকে টেনে নিয়ে চলেছে বুনবন ! সদরঘাটে এসে দেখে, লাল সালুতে শরৎচন্দ্র জ্বলজ্বল করছেন।

বুনবন হিফাজতের বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে একটি ঝাড়ালো কুলগাছের গায়ে হেলান দিয়ে সাইকেলটা রাখল। ডাক্তারদের বৈঠকখানাটি আশ্চর্য চেহারার। গোলাঘরের চালের মত চাল, গোল বৃত্তের মত। এটি বৈঠকখানাও বটে, ডিসপেনসারিও বটে। এই ঘরটিই খড় ছাওয়া। বাড়ির অন্য অংশ পাকা দালান, এই গোল ঘরটি বিচ্ছিন্ন, প্রাঙ্গণের কোণে। শঙ্করপুর হাই মাদ্রাসা থেকে বেগমপুর জুনিয়র হাইস্কুল মাত্র দু'মাইল তফাতে অবস্থিত। হিফাজতের বাড়ি এই দুই শিক্ষায়তনের মধ্যবর্তী ডিহির উপর।

কুলগাছটির প্রায় গোড়াতেই গোবরের ডাঁই। ডালিতে করে বয়ে এনে একটি মোটা গোল বউ ছড়ছড় করে গোবর ফেলছে, লম্বা করে ঘোমটা টেনে কাজ করছে। বৈঠকের বাইরে সংকীর্ণ বারান্দায় একটি টুলের উপর বসে পরনের লুঙ্গির উপর কোলে মেলে ধরে খবরের কাগজ পড়ছেন ডাক্তার হিফাজত। পাশেই একটি আড়াই-হাতি লম্বা, সোওয়া বিঘত চওড়া ছোট বেঞ্চে বসে রয়েছে একজন।

বুলবনকে দেখে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন হিফাজত। হিফাজতের গায়ে ঢিলে পশমী রঙের পুরু পাঞ্জাবি, চোখে গোল কাঁচের চমশা, ডাঁটি দু'টি রূপার তারের, একটু স্প্রিং করে। মুখ কামানো, চকচকে। বয়েস পঞ্চাশ উত্তীর্ণ করেছে। বাকি যে লোকটি বেঞ্চে উপবিষ্ট, তার বয়েস চল্লিশ ছুঁয়েছে হয়ত। গায়ে শীতের ফুলহাতা পুরু গেঞ্জি, বাইরে তুলো তুলো, মনে হচ্ছে তুলো ঝরে পড়বে, অথচ লেগেও আছে। পরনে গণমুকুলা খয়ের রঙের লুঙ্গি। লোকটির চুল পিছনে টেনে আঁচড়ানো, স্বাস্থ্য ভাল। ওর পাশে একটি লম্বা খাতা পড়ে আছে।

চিঠিতে হিফাজত লিখেছেন, এলাহি ভরসা। দোয়াবয়েষু বুলবন বাবাজীবন। সম্ভ্রম এবং স্নেহ টসটস করছে প্রতিটি অক্ষর-কণায়। বাবাজীবন কথাটি বড়ই আদরের, খাতির-সৌজন্যের অভাব চোখেমুখে কোথাও দৃষ্ট হয় না, এমন লোককে অবিশ্বাস করাটা অপরাধ মনে হচ্ছিল বুলবনের। মানুষটির হাতে সাপ্তাহিক 'মিরাজ' পত্রিকা। তা দেখেই বুলবনের মন যথেষ্ট অপ্রসন্ন হয়ে গেল। তবু সে একটি সালাম জানিয়ে বারান্দায় উঠল।

—এসো, বাবাজীবন ! ভাল সময়েই এসেছ তুমি। এই দ্যাখ, ধনঞ্জয়, এই যে ধানু দেবনাথ, স্কুলের পিয়ন, মিটিঙের খাতা এনেছে আমার সই করাতে, দেখে নাও ! আমার সই হলে তবে কোরাম হবে, রেজল্যুসন অ্যাডাপ্ট হয়ে গিয়েছে, সব তৈরি ! গড়গড় করে বলে গেলেন হিফাজত।

ধনঞ্জয় বলল—হ্যাঁ, দেখুন। মিটিঙ শেষ, সই সারা। মিটিঙের দিন ডাক্তারবাবু উপস্থিত থাকতে পারেননি, বলেছিলেন, রেজল্যুসন করে নিতে, পরে সই করে দেবেন।

খাতার ভিতরের পাতায় চোখ রেখে বুলবন বলল—সেই জন্যে খাতা এনেছেন এখন?

—আজ্ঞে!

বুলবন দেখল, বাবাজীবন ডাকটি মিথ্যে নয়। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিটি সে খাতার পাতা থেকে টেনে তুলে ডাক্তারের মুখের উপর মেলে ধরল। তারপর নিঃশব্দে হাসল। মনে মনে সে বলল, গ্রেস মার্কসই বটে চন্দ্রিমা, ধর্মের মানুষও কত মহাপ্রাণ হতে পারে দেখে যাও।

হিফাজত বললেন—আমার এক শালার ছেলেকে শঙ্করপুরের মাদ্রাসা চয়েস করেছে বাবা! তোমার জায়গায়। লোকে বলছে, আমি স্বজনপোষণ করছি! কিন্তু আমি যে দিয়ে তবে নিচ্ছি, সেকথা তো কেউ বলছে না। ওই হামবাগ ছোকরা, আনিসুল ওর লোকাল পেপারে লিখেছে, আমি নাকি তোমাকে ভাঁওতা দেবার জন্যে তোমার ম্যারেজ সার্টিফিকেট চেয়েছি। ছেলেটা নকশাল বুঝলে!

হিফাজতের সম্মুখস্থ টুল থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল বুলবন। কেমন এক অবিশ্বাস জেগে উঠল তার মনে। যদিও সে রেজল্যুসন স্বচক্ষে দেখল, তবু। এবং অবিশ্বাস কেন তা সে জানে না। মানুষকে তার ইদানীং ভয় করে। 'মিরাজ' পত্রিকার পাঠককে বুলবন বিশ্বাস করতে পারে না।

অবিশ্বাসই যে খাঁটি, তাই-ই প্রমাণ করে এই মধ্যাহ্ন। ধূলা উড়িয়ে আকাশ-ভিন্ন-করা সশব্দ বুলটে হাঁকিয়ে হিফাজতের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন ললিতমোহন। বাইক স্ট্যান্ড করে সিধে হিফাজতের উন্মুক্ত রেজল্যুসন খাতাটির সামনে এগিয়ে এসে বললেন—দাঁড়ান, সই করবেন না। শুনলাম, আপনার কাছে খাতা এনেছে ধনঞ্জয়! আপনি মিটিঙে উপস্থিত ছিলেন না, কোরাম হয়নি, সই করে অ্যাটেন্ড্যান্স দেখিয়ে কোনও চাকরির প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না।

—কী বলছেন! আমি তো বলেই ছিলাম পরে সই করে দিব, সেই মুতাবিক কাজ হচ্ছে, লিগ্যালি তাহলে কোরাম হয়ে যাচ্ছে! আপনি কেন এভাবে বলছেন!

—বলছি, কারণ এ চাকরি হবে না! আবার মিটিঙ কল করতে বলেছি সেক্রেটারিকে। দ্যাট ইজ ফাইন্যাল। আমার কথা আপনি শুনুন! অ্যাই ধনঞ্জয়, তুমি খাতা নিয়ে চলে যাও। দিন, খাতা নিয়ে দিন আপনি। সই করবেন না বলে গেলাম।

কেমন ক্ষিপ্ত, ক্রোধী, স্ফীতগণ্ড ললিত যেন সমস্ত সংসারকে পিষে দিয়ে বুলেট মেরে চলে যান পথে। হিফাজত কলম থামিয়ে চোখ থেকে চশমা নামিয়ে ফেলেন।

ধনঞ্জয় এবং হিফাজত পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন। ক্রমশ অসহায় হয়ে ওঠে দু'জনের মুখ। বুলবনের দিকে আর এই ডাক্তারটি চোখ তুলে চাইলেন না পর্যন্ত। বুলবন কী করবে এখন! চোখের সামনেই বিলীন হয়ে গেল কুহকিনী প্রত্যাশা। ধীরে ধীরে পথে নেমে এল বুলবন চৌধুরী, মান্য পিতার সন্তান, কয়েদখাটা বাপের ছেলে।

ডাঙায় উঠে মাছটি জলে পড়ে গেল। চাকুরি কি স্বর্ণ মরীচিকা; মা এই ললিতের কাছে চাকরি চাইবেন বলেছিলেন! সমস্ত গ্রামমণ্ডলকে যে হেলায় শাসন করে, পুলিস থানাকে যে চালিয়ে নিয়ে ফেরে, যার দাপট নয়কে হয় করে এবং হয় নয় হয়, সশ্রদ্ধায় বারংবার তারই চরণ চুম্বন করে ভারতবর্ষ, মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষ চিরতমসার দেশ। এমারজেন্সির ললিতকে যে দেখেনি, সে ভারতবর্ষ চেনে না। মনের মধ্যে এই চিন্তা

মুহুর্মুহু বুলবনকে পীড়িত করতে থাকল। সে মেনে নিতে পারছে না যে, এই চাকরিটি তার আর হবে না। একটু আগে অবিশ্বাস করছিল হিফাজতকে, এখন সে ললিতের আবির্ভাবকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে ললিত আসেনি বুলেট মেরে, ভুল দেখল সে। অর্থাৎ বুলবন যা দেখল, তা ঠিক নয়। অথচ যা ঘটল তাই-ই চিরতমিস্রার উপমহাদেশে বাস্তব ছিল এবং আগামীতেও থাকবে, ভারতবর্ষে এমারজেন্সি কখনও ফুরাবে না—নানান ঘটনায়, বিচিত্র নামে, বিচিত্র ছত্রতলে, মসনদের নীচে ফিরে ফিরে আসবে। সেই চাপে কতবার মানুষের বিক্ষোভ দানা বাঁধবে, গমকে গমকে আন্দোলন ফেটে পড়তে চাইবে, কিন্তু বিপ্লব হবে না, যদি না সঠিক বিপ্লবীদল এবং নেতৃত্বের জন্ম হয়—একজন যুবক তারই মত, যার চাকরির বড়ই প্রয়োজন ছিল, কোনও দিন কোনও এক মুহূর্তে নিশ্চয়ই একবারও অনুভব করেছে সেকথা।

পার্টিরই কত বক্তৃতায় একথা শুনে আসছে বুলবন। লজ্জা! সীমাপরিসীমাহীন এক বিক্ষত লজ্জা বুলবনকে হানতে থাকে। সে চন্দ্রিমার মর্যাদাকে ধুলায় ফেলেছে। কেন সে হিফাজতের কাছে এল, দরখাস্তে সই করল! পেল না বলে নয়, হারাল বলেই নিজের উপর ঘেন্না হয় তার। এমন গ্লানি তো কত যুবক যুবতীকে জীবন রক্ষার জন্য কতভাবে বহন করতে হয়। চন্দ্রিমা কি সেকথা বুঝবে না! 'আমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছি এখন—তুমি কি আমাকে আশ্রয় দেবে না?' বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে থাকে বুলবন। সদর ঘাটের দিকে সাইকেল ছুটিয়ে দেয়।

ইকবাল ভুঁইয়ার সরু পঙ্গু পা-খানি চোখের উপর বারবার ভেসে ভেসে উঠছিল চন্দ্রিমার। মৃদু রোম, লিকলিকে, হাড়ের বাতা। দেখেই কেমন মায়া জাগে। সেই পায়ের উপর ভারি জুতো তুলে দিয়েছে শশাঙ্কমোহন। কঁকিয়ে উঠে রক্তাক্ত ইকবাল মাটির উপর থেকে ঘাড় তুলল একবার, পারল না। মাটিতে পড়ে গেল রক্তাক্ত মাথা; চোখে মুখে, গালে, থুতনি পর্যন্ত রক্তের দাগ।

সেই দৃশ্যে চন্দ্রিমার বুকের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। এই মুহূর্তে সেই-হত আচ্ছন্ন রক্তমাখা দৃশ্য চোখে ভাসতেই চন্দ্রিমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। শ্রেণীঘৃণা যে কী বস্তু চোখের সামনে না দেখলে বিশ্বাসই হত না; মানুষ মানুষকে কী চোখে দেখে, কী নির্মম সেই অনুভূতি! এবং একথাও খুব সিধা নয় যে, ওই শশাঙ্ক শুধু ভাষার দোষে ন্যালাকে পিটিয়ে ফেলেছে। এত অত্যাচারের মধ্যেও মানুষ টিকে থাকে এই দেশে। হায়না গরিবের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে চলে যায়, তবু সেই মোসলেম বেঁচে থাকে। এমন এক পৃথিবী চন্দ্রিমার চেনা ছিল না।

চন্দ্রিমার মনে হল, মুক্তির সরণিটি কোনদিকে তবে, কীভাবে শুরু করবে সে? এই সংসারে মন্মথরা তাদের আত্মত্যাগের রাজনীতি দিয়ে ইকবালদের অন্তরে এক নীবন দুঃসাহসী ঘৃণার অগ্নিকুণ্ড জ্বালে, ঘৃণা নিবে যাতে না যায়, তার জন্য তারা ক্রমান্বয় আত্মত্যাগ করে যায়। যেমন রাহুল সেই পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘৃণা জাগবে, কিন্তু মুক্তি কি সম্ভব!

অপর পক্ষে বুলবন কী করছে? পার্টি অফিসে বসে প্রাণকিশোরের সামনে তার মনে হল, বুলবনের সমস্ত দুরবস্থার কথা নেতাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। চন্দ্রিমা ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে 'আজান' পত্রিকার পাতাটি বার করে নেতার সামনে এগিয়ে দিল।

প্রাণকিশোর চশমা চোখে লাগিয়ে অবাক সুরে জানতে চাইলেন—কী এটা !

চন্দ্রিমা বলল—পড়ে দেখুন !

—ও, আচ্ছা ! বলে প্রাণকিশোর পড়তে শুরু করলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মুখ গম্ভীর এবং কঠিন হয়ে উঠল।

অর্ধস্ফুট স্বরে প্রাণকিশোর হঠাৎ মন্তব্য করে উঠলেন—ছিঃ ! ছিঃ !

চন্দ্রিমা কেঁপে উঠল। তার চোখের উপর ইকবালের সরু পা বুঝি ভেঙে যাচ্ছে, কোদালকাটির ঘূর্ণিস্রোত বুকের অতলে আবর্তিত হচ্ছে কেবলই।

পত্রিকার পড়া শেষ করে পত্রিকাখানিকে ভাঁজ করে বুক পকেটে রাখলেন প্রাণকিশোর। কোনও কথা বললেন না অনেকক্ষণ ! হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠলেন।

চন্দ্রিমা শুধাল—বুলবন এখনও ফিরল না !

প্রাণকিশোর থমথমে গলায় বললেন—এ চাকরি হবে না। বুলবনকে সারেন্ডার করাতে চাইছে, আরও ইনসাল্ট করবে। চরিত্রের অ্যাসিড টেস্ট এইভাবেই হয় চন্দ্রিমা। দুঃসময়ে যার মাথা ঠিক থাকে না, সে কমরেড কিসের ! ও কেন ওভাবে ছুটে মরছে, তাকে নিয়ে খেলা করছে ওরা, তা-ও সে বোঝে না !

—আমি তাকে বোঝাতে পারিনি। শুধু বলেছি, আমার অসম্মানের কথা !

—নিশ্চয়।

চেয়ার ঠেলে টেবিল হটিয়ে দৃঢ় পায়ে প্রাণকিশোর ঘর ছেড়ে অফিসের ছাতে এসে দাঁড়ালেন।

—জেনারেল পিপল্ এরকম করতে পারে, আমরা পারি না। বুলবন আমার কাছে ওর চাকরির কথা স্পষ্ট করে বলেনি কখনও। তুমি আদিত্যকে ইনফর্ম করেছিলে। মনে করেছি, সার্টিফিকেট দেখতে চাওয়াটা নস্যাৎ করেছে বুলবন, এ খুব ইস্টারেস্টিং ! এখন দেখছি, ইট ইজ সিরিয়াস ম্যাটার। মর্যাদার প্রশ্ন। মর্যাদা হারিয়ে কোনও কিছু পাওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। কমরেড জি এস কতভাবে একথা বলেছেন !

—ও সার্টিফিকেট ছাড়তে পারে না, আগলে ফেরে ! অদ্ভুত লাগে আমার !

—তাই নাকি ? স্তম্ভিত কণ্ঠে প্রাণকিশোর বলে উঠলেন। ছাদ থেকে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামলেন। তারপর বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন—আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না চন্দ্রিমা। ফিরে গিয়ে একটা মিটিঙ আছে জি বি-র। তোমার গহনা আমার কাছে রইল। এই নাও, তিনশ টাকা, এখন এই দিয়ে ওষুধ কিনে নাও ! আমার কাছে আপাতত আর নেই। আমি এভাবে গহনা নষ্ট করতে বলব না, তোমাকে ধার দিলাম। গহনা ফেরত পাবে। গো টু দ্য মাসেস অ্যান্ড অরগানাইজ দেম। তোমার হাতযশ হোক। তোমাকেই হাল ধরতে হবে চন্দ্রিমা ! বুলবনকে রক্ষা করতে হবে। বুলবন ফিরলে বলো, আমি এসেছিলাম, ও যেন সত্বর দেখা করে !

প্রাণকিশোর বাসে উঠে পড়লেন। জানলা থেকে গলা বাড়িয়ে বললেন—শরৎ সেন্টিনারি প্রোগ্রাম তোমাদের মর্যাদাবান করবে আশা করি, একথা বোঝানোর দায়িত্ব তোমার। তবে খারাপ সংবাদ শুনলাম, 'আজান' পত্রিকা আমার কাছেই রইল। এই রিপোর্টের মোকাবিলা বুলবনকেই করতে হবে। চন্দ্রিমা দেখল, বহরমপুর থেকে আসা একটি বাস থেকে রাহুল নামছে।

রাহুলকে দেখেই পায়ে পায়ে বাসটার কাছে এগিয়ে আসে চন্দ্রিমা। ভিড়ের মধ্যেই তাকে দৃষ্টি চালনা করে অনুসরণ করতে করতে ডাক দেয়— 'রাহুল' !

রাহুল মেয়েলি মিষ্ট স্বর শুনে প্রথমে বুঝতে পারে না, কে তার নাম ধরে ডাকছে। এদিক ওদিক দেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় একটি পানবিড়ির দোকানের সামনে, এখানে বাসযাত্রীদের চাপ নেই। আবার ডাক শোনে এবং সামনেই চন্দ্রিমাকে দেখতে পায়। চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বউদিকে দেখে।

—এখানে কী করছ ? রাহুল প্রশ্ন করল।

—তুমি বাস থেকে নামছ দেখে... চন্দ্রিমা বাক্য সম্পূর্ণ করে না। আরও সামনে এগিয়ে আসে। মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে পাশে সরে যায়। ঘাড় সামান্য বাঁকিয়ে বউদির মুখে ঈষৎ তির্যক দৃষ্টি ফেলে রাহুল বলে— তুমি বাড়ি ফিরবে আমার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ, তাছাড়া কী করব, বুলবন ফিরল না !

—কোথায় গেছে ?

—শঙ্করপুর। হিফাজত ডাক্তারের চিঠি পেয়ে দেখা করতে গেছে, চাকরির ব্যাপারে !

—অ। বলে রাহুল কাঁধের পিছনে লটকানো ব্যাগটা একটু ঝাঁকিয়ে নেয়। গম্ভীর হয়ে যায়।

—তুমি হঠাৎ চলে এলে যে !

—কলেজে ক্লাস হচ্ছে না, ফালতু পড়ে থেকে লাভ কি ! চলে এলাম।

—আমাদের নতুন পার্টি অফিসটা দেখেছ ! শরৎ সেন্টিনারি প্রোগ্রামের জন্যে ভাড়া পাওয়া গেছে।

বউদির দৃষ্টি অনুসরণ করে রাহুল দোতলার উঁচু রেলিঙে চোখ তোলে। লাল সালুতে উজ্জ্বল সাদা অক্ষরগুলি পড়ে ফেলে। এখান থেকে স্পষ্টই চোখে পড়ছিল।

—শরৎচন্দ্র খুব পপুলার রাইটার।

—বাড়িটার নাম শরৎ পাঠাগার রাখব ভাবছি। শুধু পপুলার বললে ঠিক বলা হয় না। অতীতের শিল্পী মনীষীদের মূল্যায়ন প্রয়োজন আছে। তাছাড়া পার্টির পলিটিকাল অ্যাকটিভিটিজ যেহেতু এখন নিষিদ্ধ— স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, ফলে...

—তাই বল !

—না, শুধু সে কারণে নয়, আমরা মূল্যায়নের কথাও বলছি। আমাদের একখানা নতুন বই বেরিয়েছে, তুমি পড়বে ? কমরেড জি. এস.-এর করা মূল্যায়ন সেটা !

—না। অত্যন্ত গম্ভীর আর চাপা বিরক্তিতে 'না' করে ওঠে রাহুল। তারপর বলে আমরা চাই নতুন যুগ, নতুন লেখক। বুলবনকে একদিন আমি সেকথা বলেছি। ঠিক আছে, তোমার সঙ্গেও কথা হতে পারে। এসো, বুলবন না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি। চা খাই !

—ও হয়ত আরও দেরি করবে। ঠিক আছে।

ওরা দু'জন একটি ছোট চায়ের দোকানে এসে বসে। একটি বেঞ্চিতে। দোকানের টিনের চালের নীচে বেঞ্চিটা পড়ে আছে। বসে পড়ে চায়ের জন্য দোকানদারকে বলে রাহুল। তারপর কী মনে করে বলে ওঠে— আমরা তো চা তোমার ওই পাঠাগারে গিয়ে বসে খেতে পারি, এখানে কথা বলা অসুবিধা।

দোকানদারটি রাহুলের সহপাঠী ছিল স্কুলে। নিতাই ওর নাম। নিতাই ভট্ট। ক্লাস এইট পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে।

নিতাই বলল— তোমার বউদি ? লাল সালু টাঙিয়ে ওখানে কী করছেন বউদি ? বউদিই বলছি আপনাকে।

ছোটখাট, গোল মুখ,ফর্সা, শীর্ণকায় নিতাই, গেঞ্জি আর ধুতি পরে আছে। লুঙির মতন ভাঁজ করে ধুতিটা পরেছে— খুব সহাস্য মুখমণ্ডল। চন্দ্রিমার উদ্দেশে বাক্য শেষ করল। চন্দ্রিমা হৃষ্টভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তার সম্বোধন মেনে নেয়।

রাহুল বলল— দু' কাপ চা ওই পাঠাগারে পাঠিয়ে দিবি ? ওটা পাঠাগার হয়েছে।

—ও। ভাবছি, কোন পার্টির অফিস হল বুঝি ? ঠিক আছে, দিচ্ছি ! যান বউদি, চা যাচ্ছে, কাজের ছেলেটা এলেই পাঠিয়ে দেব। রাহুল আমার ক্লাসফ্রেন্ড। একসাথে পড়েছি সদরঘাটের হাইস্কুলে। ফ্রেন্ড বোধ হয় বলে না, কী বলে রে রাহুল। বলে রাহুলের মুখে নিতাই তৃষ্ণার্ত বন্ধুরই মত চায়।

রাহুল বলে— ক্লাসফ্রেন্ডই বলে, আমরা এক ক্লাসের ছেলে। এক ক্লাসের লোক।

—যাঃ ! তুমি এখন আলাদা ক্লাসের মানুষ। অনার্স পড়ছ, তাই না ! তুমি অনেক বড় হবে রাহুল। তোমার ব্রেন হাইক্লাস ব্রেন। আমার হল ডাউন-ব্রেন, ঘোলা। সরস্বতীর কৃপা পাইনি। না হলে চায়ের দোকান করতে হয় ! আচ্ছা, তোমার বাবা, জেল থেকে ছাড়া পাবে না ? আপনার শ্বশুরের কথা বলছি বউদি !

বলে টিনের সাদা কুলোর মত পাতের উপর ফেলে কেতলির গরম জল দিয়ে খলবল করে কাপ ধুতে শুরু করে নিতাই। তারপর নিজে থেকেই বলে— জীবনটাই এখন আঘাটায় পড়েছে, ললিতের রাজত্বি।

চন্দ্রিমা বলল— ঠিক আছে, চা এখানে বসেই খেয়ে নিই। আমি কিছু ওষুধ কিনব। তারপর পাঠাগারে গিয়ে বসব।

—কী ওষুধ ? রাহুল শুধাল।

—হোমিওপ্যাথি। কতকগুলো ওষুধ নেই। হিফাজত হোমিও হলে পাওয়া যায় না ?

—যায় বোধ হয়। হোমিও হল খুব বিখ্যাত এখানে। রাহুল বলল। চা খেয়ে ওষুধ কিনল তারপর। ওরা যখন ওষুধ কিনতে বাজারে ঢুকেছে, বুলবন এসে পৌঁছায় তখন। অফিসে ওঠে। তালা ঝুলতে দেখে বুঝতে পারে, প্রাণদা এসে চলে গেছেন। চন্দ্রিমাও তবে বাড়ি ফিরে গেছে। তার জন্য অপেক্ষাও করেনি। একা এখানে বসে থাকাও কঠিন। বুলবন ছাদ থেকে নেমে সাইকেল নিয়ে তাড়িয়ে চলে নদীর পথ ধরে বাড়ির দিকে।

ওষুধ কিনে ফিরে আসে রাহুল আর চন্দ্রিমা। পাঠাগারে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা বলার ধৈর্য হয় না, তার আগেই বলে ওঠে— মনে হচ্ছে, বুলবনের কোনও অঘটন হয়েছে। মন্তব্য করে চন্দ্রিমা। রাহুল উঠে দাঁড়ায়। এক মুহূর্ত চিন্তা করে এবং বলে— আমরা যখন ওষুধ কিনতে গেলাম, তখন ও এসে আমাদের দেখতে না পেয়ে চলে যায়নি তো ?

চন্দ্রিমাকে খুব চিন্তিত দেখাল।

রাহুল বলল— বেলা পড়ে এসেছে।

—চল ! এটুকু খালি উচ্চারণ করে চন্দ্রিমা। তারপর ঘর ছেড়ে ছাদ এবং সেখান থেকে নীচে নেমে পড়ে সিঁড়ি ভেঙে, ওরা হাঁটতে শুরু করে। রাহুল বুঝতে পারছিল, বউদি বুলবনের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। হাঁটতে হাঁটতে

ওরা বাজারের মধ্য দিয়ে সড়ক অতিক্রম করছিল। পোস্ট অফিসের কাছাকাছি পৌঁছতেই পোষ্ট অফিসের ভিতর থেকে তারক গাঙ্গুলি বার হয়ে এসে পথের উপর দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক ধুতি আর বাঙলা ফুলশার্ট পরে আছেন, পায়ে কোলাপুরি চটি। হালকা নীল রঙের শার্ট। স্বাস্থ্য ভাল, ভরাট গর্দান। ঘড়ি পকেটে কালো ডোরে বাঁধা পুরনো পীত ডায়ালের ঘড়ি রাখেন। এখন সেটি বার করে হাতে নিয়ে সময় দেখছেন, সাড়ে চারটা বেজে গিয়েছে। ঘড়ি থেকে চোখ তুলে বারবার রাহুলদের দেখছিলেন। রাহুলরা তাঁরই দিকে এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে। রাহুলের মনে হল, লোকটি তাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছেন। লোকটির নাকের ছিদ্র এবং কান দুটি রোমশ। এবং ভুরুও ভারি রোমযুক্ত, কাঁচাপাকা। মাছি গোঁফে দেখায় কিছুটা সতর্ক, চালাক এবং কঠিন।

—কিছু বলবেন ? নরম সুরে রাহুল বলে উঠল।

তারক বললেন— অবশ্যই বলব। তোমার কাছে তিলকের খবর জানতে চাই।

—তিলক ? ও, তিলক ! আপনার ভাগ্নে। ওর খবর তো আমি জানি না।

—মাঝে মাঝে তোমার গাঁয়ে তিলক যায়। নদী দেখতে। তুমি ওর বন্ধু।

—হ্যাঁ, চেনাজানা। কলেজে দেখা হয়।

—পুলিসের খাতায় ওর নাম ছিল, আমি সেই নাম কাটিয়েছি। ছেলে ভাল নয়। ওর মায়ের কষ্ট দেখে আমি ওকে এখানে এনে কলেজে ভর্তি করি। মেসে রাখি। ওর মায়ের ক্যানসার। জানো ? কিন্তু ওই ছেলে সিধে হবার নয়। মেসে এবং কলেজে, কোথাও তাকে পাওয়া যায় না। কবে তুমি ওকে কলেজে দেখেছ, লাস্ট ?

—পরশু।

—মিথ্যে কথা। ও বহরমপুরে নেই। আমি খুঁজে এসেছি, পাইনি। দরকার হলে, আমিই ওকে পুলিসে দেব। আমি পারি। মোড়ক যতই থাক, আমি ঠিক জেনে যাব। আমার ফ্যামিলি আছে। আমি আর কোনওভাবেই বিপন্ন হতে চাই না। তুমি তিলককে বলবে, আমি অত্যন্ত ক্রুয়েল। হৃদয়হীন। আমি স্টেটের চাকর। বাগী-বজ্জাতদের টলারেট করি না।

—আচ্ছা, বলব !

—বলবে ?

—হ্যাঁ। কেন বলব না, আপনি যে ক্রুয়েল, আমার মত কেউ তো জানে না। স্টেটটাকেই যখন ঘৃণা করেছি, চাকর তো আরও ঘৃণ্য মাস্টারমশাই। খারাপ লাগে, আপনাদের মাস্টারমশাই বলে ডাকতে হয়। ললিত আবার মাস্টার !

—রঙ্গ করছ !

—হ্যাঁ, করছি। আপনি তো একটা খোলা মোড়ক আমাদের কাছে। সেই কথাটাও এই বেলা জানিয়ে রাখি। আপনি আমার বাপকে জেলে ভরেছেন।

—কে বললে ?

—বললাম তো। মোড়ক খুলতে আমরাও জানি। এসো বউদি, চলে এসো। এই চাকরটার সঙ্গে আর কথা বলব না। এসো ! বলে দ্রুত এগিয়ে চলল রাহুল।

রাহুলের এই অতর্কিত আক্রমণে তারক গাঙ্গুলি সহসা ভয় পেয়ে যান। মুখটা কেমন শুকিয়ে ওঠে। কোনও কথা আর খুঁজে পান না বলবার জন্য। চুপচাপ পথের উপর দাঁড়িয়ে স্থাণুবৎ নিশ্চল থাকেন, ঠোঁট দুটি ঈষৎ হাঁ হয়ে থাকে, পলক স্থির, মুখের ভাঁজে

মৃদু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। চন্দ্রিমা রাহুলকে অনুসরণ করে।

'মা' বলে চন্দ্রিমাকে ডেকে উঠতে গিয়ে তারক দেখলেন কোনও কথা ঠিক বার হতে চাইছে না, ভাবলেন তিনি, তাছাড়া এত কাতরই বা হবেন কেন, যাক ওরা, 'মা, মা' করলে ভাববে মাস্টার ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারক মা বলতে গিয়ে মুখ হাঁ করলেন, হাঁ করেই রইলেন।

অনেকক্ষণ রাহুল আর কোনও কথা বলে না। মানসিক উত্তেজনায় সে দ্রুত হেঁটে চলেছে। কাঁধের ঝুলন্ত পিঠে লাগোয়া ব্যাগটা চলার ছন্দে দুলে দুলে উঠছে। কাঁধের ফিতেয় টান পড়ে গ্রীবা উদ্যত হয়েছে, তারক গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলার চাপা ক্রোধই যেন রাহুলকে চালিত করে চলেছে। পায়ের তলায় একটি শক্ত মাটির ডেলা পড়েছে, ধাক্কা লাগতেই রাহুল ক্ষেপে গিয়ে সক্রোধ লাথি মেরে ডেলাটাকে পথের একদিকে কাত করে দেয়। কিছুটা গুঁড়ো হয়ে যায় জুতোর উচ্চণ্ড আঘাতে।

চন্দ্রিমাকে কত পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে রাহুল। বউদির কথা এখন হয়ত ভুলেই গেছে! শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাটা শুরু হতেই পারল না। এই পথের উপরই শুরু হতে পারত, বাদ সাধল তারক গাঙ্গুলি। যে ছেলেটি রাত্রে সেদিন রাহুলের চটি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারই নাম তিলক। কিন্তু কবি নামে পরিচয় দেয়। কবি তাহলে টেকনেম। বা ডাকনাম। মন্মথরও ওই রকম একটা নাম ছিল, ছোটন। ডাকনাম। বন্ধুরা কখনও মন্মথ বলে ডাকত না। পুলিসের খাতাতেও ছোটন নামটিরই উল্লেখ ছিল। সেটাই হয়েছিল টেকনেম।

—অ্যাই রাহুল, একটু আস্তে চল!

রাহুল শুনতে পেল না। চন্দ্রিমা জোরে কথা বলতে পারে না। ওর স্বর খুব নরম। জোরে ডাকলে স্বর ভেঙে যায়। জোরে কথা বলা, বকবক করা, অনাবশ্যক বাক্য খরচ এক ধরনের অশিষ্টতা। স্লোগান দেবার সময়ও চন্দ্রিমা গলা চড়াতে পারে না।

আবার ডাকে— রাহুল! শোন প্লিজ! আমি অত জোরে পারব না। রা-হু-ল! রাহুল এবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

—তুমি হাঁটতেই পার না।

—পারি না।

—লংমার্চ কী করে করবে?

—সত্যি বলব?

—হ্যাঁ, বল!

চন্দ্রিমা রাহুলের কাছাকাছি এসে একটু দম নিয়ে বলল— আমাদের এখানে, লং মার্চের প্রয়োজন হবে না। এখানকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরনো চীনের চেয়ে অনেক উত্তম। প্রভিন্সগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন নদীর উপর ড্যাম এবং ব্রিজ হয়েছে। উত্তরের হিমালয়ের চূড়া থেকে দক্ষিণের সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত পুলিস-মিলিটারি যখন তখন দাবড়ে ফিরতে পারে। এই দেশে একটা 'মোস্ট সেন্ট্রালাইজড ন্যাশনাল আর্মি' গড়ে উঠেছে। চীনে, অর্থাৎ প্রাক-বিপ্লব চীনে সেরকম ছিল না। গোটা চীনে একটা অখণ্ড সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। সার্বভৌম পার্লামেন্টের অস্তিত্ব সেখানে তখন কল্পনাও করা যায় না। আমি বলছি, সমস্ত অঞ্চলগুলি ছিল ওয়ার-লর্ডদের দ্বারা শাসিত, বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো। ... আচ্ছা, আমি আর একটু বলব?

রাহুলের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ মেলে চন্দ্রিমা খুব মিষ্টি করে, যেন

প্রার্থনার সুরে অনুমতি চায়। পাছে রাহুল বিরক্ত হয়ে ওঠে তাই সে অমন করে চোখ মেলেছে। চোখে চোখ রেখে দণ্ডভর চুপ করে থেকে রাহুল নিঃশব্দে হেসে ফেলে।

চন্দ্রিমা সাহস পেয়ে বলল— ওই সমস্ত Warlord বা সমরনায়কদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল। প্রায়শই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়ে রাখত। নানকিং-এ নামকে ওয়াস্তে একটা সংযোগ রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল বটে, কিন্তু ওয়ারলর্ডরা সেই সরকারকে মানত না। মাঝেমাঝেই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। এই অবস্থায় কোনও সেন্ট্রালাইজড ন্যাশনাল আর্মি গড়ে উঠতেই পারে না। এই বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতি বিপ্লবীদের সুবিধা করে দিয়েছিল। আবার এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গেরিলা জনযুদ্ধকে অন্যত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য লংমার্চ ছিল অভিযানের মত। তাছাড়া সংগ্রামের বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলোকে জড়ো করে সংহত করার দরকার ছিল। পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তোলবার সেটা, ওই লংমার্চ ছিল কর্মপন্থা। আমি বলছি, প্রি-ক্যাপিটালিস্ট ডিসেন্ট্রালাইজড মেডিইভ্‌ল্‌ নেচারের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় লংমার্চ ছিল অ্যাডিকুয়েট প্রোগ্রাম অফ রেভল্যুসন। আমাদের কি তাই ?

চন্দ্রিমার কথাগুলি রাহুলের বুকের মধ্যে কিছুক্ষণ স্পন্দিত হয়। সহসা চন্দ্রিমা রাহুলের বুকের জামা খামচে ধরে বিপুল আবেগে বলে ওঠে— আমার কথা তুমি একটু মন দিয়ে শুনবে না ?

নির্জন পথের উপর রাহুল বউদির হাতটা বুকের উপর যেভাবে লিপ্ত তা আশ্চর্য চোখে চেয়ে দেখে এবং একটু বাদে বাঁ হাত দিয়ে সে হাতটি তুলে নরমভাবে সরিয়ে দেয় ধীরে ধীরে। ঘুরে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে। চন্দ্রিমা তার নিজেরই এই আকস্মিক আচরণে নিজেই কেমন লজ্জা পায়। এতক্ষণ সে যেন মন্মথর জামার কাপড় আঁকড়ে ধরেছিল।

রাহুল বলে— রানীনগর থানার পুলিস কিন্তু ডোঙায় চড়তে পারে না বউদি।

চন্দ্রিমা বলল— চিৎপুরে কিন্তু ব্ল্যাকভ্যান এসেছিল।

রাহুল চলতে চলতে ঘুরে দাঁড়ায়, কথা বলে না। আবার হাঁটতে শুরু করে।

চন্দ্রিমা হঠাৎ বলে ওঠে— কোদালকাটির সমস্ত জল কিন্তু নেমে চলে যাচ্ছে।

রাহুল এবার আচমকা কেমন হয়ে গেল। থেমে পড়ল। বলল— গেট বন্ধ করে দিতে হবে।

—পারবে না।

—পারতেই হবে ! জোর দিয়ে যেন প্রতিজ্ঞার সুরে বলে উঠল রাহুল। আপন মনে বলতে থাকল— এই জল যুদ্ধের জন্য দরকার।

—কী বলছ ?

—জল চলে গেলে মাহেফরাস বাঁচবে না। একথা প্রকাশ্য বলে। এবং নীরব হয়ে আবার আপনমনে নিঃশব্দে বলল রাহুল, যুদ্ধে এই জল বড়ই জরুরি। নইলে সংগ্রামের বিন্দুটা নড়ে যাবে। এই জল মেডিইভ্‌ল নেচারের, আদিম এবং প্রখর। বিপ্লবী মহৎ হিংসার সঙ্গে এর সম্পর্ক। জল ফুরালে পুলিস নামবে, বউদিরা নামবে শরৎজন্ম পালনে। প্রণামপুর, নটখুলি, বীরকুচি, দৌলতডিহা ঝিমিয়ে পড়বে।

চন্দ্রিমা বলল— ললিত গেট তুলে দিয়েছেন।

রাহুল বলল— আমি বন্ধ করে দেব। আই মাস্ট হ্যাভ টু ডু ইট। যেভাবেই হোক।

আবার তেড়ে ছুটতে শুরু করে রাহুল। আবার পিছিয়ে পড়ে চন্দ্রিমা। রাহুলকে

ডেকে উঠতেও তার এখন লজ্জা করে। চন্দ্রিমার নিজেকে অসহায় লাগে। কেননা রাহুল তার কথা মন দিয়ে বুঝতেও চাইছে না। কোদালকাটির জলরাশির দিকে চেয়ে রাহুলের মনে হয়েছে এই জল তার গোপন সংগঠনকে রক্ষা করবে, বোঝা যায় না, কতদূর সেই সংগঠন বিস্তৃত !

রাহুল অনেক দূর এক তালে হেঁটে এসে থামে। মনে করে, বউদিকে এভাবে অনেক পিছনে ফেলে তেড়ে ছুটে চলা ঠিক হচ্ছে না। চন্দ্রিমা রাহুলের বুকের কাছে এসে আবার দাঁড়ায়।

চন্দ্রিমা বলে— ইকবাল ভুঁইয়া আহত হয়েছে ওয়াটার গেটের বাঁধের উপর। শশাঙ্কর দলের সঙ্গে সকালে মাহেফরাসদের হাঙ্গামা হয়েছে। ধস্তাধস্তি, কোদালের বাঁট দিয়ে মাথায় ঘা মারামারি, রক্তপাত সমস্ত দেখেছি। শশাঙ্ক আকাশে গুলি ছুঁড়ল। আমি এমন দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম। তবে মরেনি কেউ।

শুনতে শুনতে রাহুল অত্যন্ত গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে উঠল। চোখ দুটি কঠিন হয়ে দিগন্তে প্রসারিত করল দৃষ্টি।

চন্দ্রিমা শুধাল— তিলক আর কবি কি একজনেরই নাম ? আমাকে বল, আমি তোমার কোনওকাজে বাধা দেব না।

অন্যমনস্ক সুরে রাহুল বলল— হ্যাঁ, একই লোক।

চন্দ্রিমা প্রশ্ন করল— মুমতাজ আলির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

—না। বলে দিগন্তেই চেয়ে থাকে রাহুল। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে।

চন্দ্রিমা হঠাৎ বলে ফেলে— ইকবালকে তুমি দেখেছ ? ওর সরু, পঙ্গু পায়ের ওপর শশাঙ্ক ভারী জুতো তুলে দিয়ে এমন করে দলিত করল যে, মনে হল পাখানা মট্ করে ভেঙে দু'খানা হয়ে যাবে।

—থামো বউদি, আর বলো না ! বলে থেমে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল রাহুল। তার চোখ দুটি চকচক করছে চাপা অশ্রুর করুণায়, অপমানে। জ্বলে উঠছে ঘৃণায়। ঘৃণার রশ্মি চোখ ঠেলে বার হয়ে আসছে।

—মানুষের পাশে দাঁড়াতে না পারলে জীবনটাকে কেমন ব্যর্থ মনে হয় বউদি !

—সবারই হয় রাহুল ! তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে। অন্তত আমি তোমার শ্রেণীশত্রু নই ! দু'জনের জীবনের লক্ষ্যই তো এক, আমার কথাও শুনতে হবে তোমাকে। আমি তোমার সমস্ত কথা শুনব।

কোন কথা না বলে আবার চলতে শুরু করল রাহুল। ধীরে ধীরে। ঘাড় কিছুটা গুঁজে পথের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এগিয়ে চলতে থাকল।

চন্দ্রিমা বলল— তারক গাঙ্গুলি বিপজ্জনক।

রাহুল বলল— অপোগণ্ড, চাকর !

চন্দ্রিমা বলল— থানার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। ললিতের মুরুব্বি। ওর সঙ্গে ওভাবে কথা বলা ঠিক হল না।

রাহুল বলল— ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলা যায় না।

চন্দ্রিমা বলল— কবির আরকোনওশেলটার নেই মনে হচ্ছে !

রাহুল বলল— হ্যাঁ।

ওদের আর কোনও কথা হয় না অনেকক্ষণ। নীরবে এগিয়ে চলে দু'জন। সীসাডিহার কাছে এসে চয়ন মৌলবির সঙ্গে দেখা হয়। মৌলবি হেসে উঠে দন্ত বিকশিত

করে বলে—সালাম বাপজি !

রাহুল ছোট্ট জবাব করে—সালাম !

চয়ন বলে—বউদিকে নামাজ রোজা দোয়াকালাম শেখাও কিছু, কৌমিয়াতের কাজ বাপ। আখেরাতের কথাও কিছু ভাবতে হবে।

রাহুল বলল— তার জন্য তো আপনারাই আছেন মিঞাজি !

চয়ন বলল— আছি বলেই তো বলছি। সাদা চৌধুরী নেই, থাকলে আমি নিজে গিয়েই বউমাকে কালমা পড়িয়ে আসতাম। কই, কিছু বল, একটু শুনি।

—না ! আপনার রগড় মন্দ নয় ! সব সময় ধর্মচিন্তা করেন, তাই না ?

—করি।

—সাদা চৌধুরী যাতে বেঁচে ফেরে খোদার কাছে সেই মোনাজাত করুন মিঞা ! এখন প্রচারকার্য একটু বন্ধ রাখুন। ধর্মেই ধর্মের বিনাশ, জবরদস্তি করবেন না। এসো বউদি চলে এসো ! বলে রাহুল চন্দ্রিমার হাত ধরে টেনে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে।

—শাদিটা কি ঠিক মতন হয়েছে বাবা ? এই অনাচার খোদা সইবে না !

—ঠিক আছে, সে আমরা বুঝব।

—বুঝতে আমাদেরও হবে পারভেজ চৌধুরী। নাটা তরফদারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

—তাই নাকি ! বেশ, তাহলে বোঝার চেষ্টা করুন। বলেই আরও জোর পায়ে রাহুল সামনে এগিয়ে বাঁক ঘুরে চয়নকে আড়ালে ফেলে পদক্ষেপ দ্রুততর করে। চন্দ্রিমার বুকের ভেতরটা সহসা কে যেন খামচে ধরেছিল, অনেক দূর নিঃশব্দে হেঁটে এসে সে স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলে ভাবল, কী বিচিত্র এই দেশ ! এখানে লিন পিয়াও এবং চয়ন একসঙ্গে অস্ত্রে শাণ দিতে থাকে। ধর্মেরও বোধ হয় গেরিলা অ্যাকশন আছে, কখন কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে বোঝা যায় না। সমস্ত নির্বিশেষ শাস্ত্রধর্মই আফিম এবং নিষ্করুণ হৃদয়হীন পৃথিবীতে মানুষের সহৃদয় আশ্রয়। চয়নের উপর রাগ করতেও পারে না চন্দ্রিমা। মনে পড়ে, মা তাকে সিঁদুর পরতে বলে কী অসম্ভব নাটক সৃষ্টি করেছিলেন !

—তুমি কিছু মনে ক'রো না বউদি। এরা এইরকম !

—হ্যাঁ, জানি। আমার মত কেউ জানে না !

—ক্রমশ আরও কত জানবে। আমিই কি জানতাম, কবর হল মাটি আর বাঁশের পালকি ! আমানির মৃত্যুর দিন জেনেছি ! চয়ন যখন সেকথা বলল, মনে হল, লাঞ্ছিত এই মৃত্যু চলমান অস্তিত্ব। বিশ্বাস কর, তাই মনে হল তখন। কতক উপলব্ধি হয়, অত্যন্ত গভীর। কাউকে বোঝানো যায় না। ওয়াটার গেটের জলের দিকে চেয়ে যে উপলব্ধি হয়, তা-ও তুমি বুঝবে না।

—আমারও হয়েছিল একদিন।

—কী ?

—খুব কেমন করছিল মনটা।

—এই জলেই মাহেফরাসদের জীবনের অস্তিত্ব। ইকবালের পায়ে পা তুলেছে শশাঙ্ক। এই ঘটনা আর থামবে না। এই জলকে যে যেমন চোখে দেখে, তাই তার চেতনা। আমার মন শুধু কেমন করে না, আমার মধ্যে একটা তীব্র উত্তেজনা হয়। তুমি যে বললে মেডিইভ্ল্ নেচার, এই জল সেই মধ্যযুগের হিংস্র জল, এর চাই অনিবার্য ব্যবহার, যদি মধ্যযুগই না হবে, তাহলে শশাঙ্ক ইকবালের অসহায় পায়ের উপর পা তুলে

দিতে পারত না ! কবি কি আর এসেছিল ?

—না। বলল চন্দ্রিমা।

গেটের কাছে পৌঁছে চন্দ্রিমা অবাক হল। কোনও শব্দ নেই জলে। জলের গেটের সমস্ত কপাট নেমে গিয়েছে। স্রোত সম্পূর্ণ স্তব্ধ, বিলের মত নদীও প্রায় নির্বিকার, নদীর খাটানের জাল শূন্যে উঠে থেমে পড়েছে।

সদর দোর দিয়ে ঢুকতে গিয়ে বাইরের বৈঠকখানা সংলগ্ন বারান্দায় সন্ধ্যার হ্যারিকেনের আলোয় চেয়ারে উপবিষ্ট কবিকে দেখতে পায় রাহুল। টেবিলের উপর টলটলে কাঁচের আলো সাদা পতঙ্গের মত জ্বলছে। দরজা দিয়ে না ঢুকে বারান্দায় উঠে আসে সে। কবি রাহুলকে দেখে চোখ তোলে।

রাহুল সবিস্ময় প্রশ্ন করে— তুমি এখানে !

কবি বলল—এসেছিলাম বউদির কাছে, গায়ে কেমন ব্যথা ব্যথা করছে, জ্বরও আছে।

—তোমার !

—হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে কবির কপালে হাত দিয়ে রাহুল উত্তাপ টের পায়।

কবি বলে—জলে জলে থাকা, অভ্যাস নেই তো।

রাহুল বলল—আচ্ছা, দাঁড়াও দেখছি। জ্বর আছে, বেশ জ্বর আছে। বলতে বলতে চিন্তিত সে বারান্দার গা-লাগা দুয়ার ঠেলে ঘরে ঢুকে বউদির কাছে আসে। বউদি জামা-কাপড় ছেড়ে আটপৌরে একখানা শাড়ি আলনার কাছে দাঁড়িয়ে পরে নিচ্ছিল। বলল—তুমি একটু বসতে বল, ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। আলোয় দেখলাম কবির চোখমুখ অন্য রকম, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ। তুমি একটু বাইরে যাও।

দোতলা থেকে বুলবন এই সময় নেমে আসে। রাহুল তখন দুয়ার পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। রাহুলকে দেখেই বলে উঠল—তোর বউদি এখনও সদরঘাটে থেকে গিয়েছে, সাইকেলটা নিয়ে একবার যাবি !

—আমরা একসঙ্গেই এলাম। ওই তো বউদি।

—ও। কোথায় ছিলি তোরা ?

—ওষুধ কিনছিলাম।

—ভালই ডাক্তারি ব্যবসা করছে তোর বউদি। একজন দেখলাম বসে আছে ওখানে।

—একজন নয়। ওর নাম কবি। আমার বন্ধু।

—হ্যাঁ, তোমার চটি এনে দিয়েছিল সেদিন রাত্তিরে। তারক মাস্টারের ভাগ্নে। বুঝি ! সব বুঝতে পারি ! যত তাড়াতাড়ি হয় ওষুধ দাও, চলে যেতে বল।

রাহুল অবাক হল। একটু চুপ করে থেকে বলল—তুমি হঠাৎ এত বিরক্ত হচ্ছ কেন ?

বুলবন বলল—হঠাৎই অনেক কিছু ঘটে যায় কিনা। ছেলেটা হঠাৎ হঠাৎই আসে। রাত-বিরেতে পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে। তোমার পায়ের চটি ওর কাছে থাকে। রাত দশটায় ওকে পথের উপর দেখা যায়। ওর কাজটা কী তবে ? নদী দেখতে আসা ? ও সেই কথাই বলেছিল সেদিন। চন্দ্রিমা আমাকে বলেছে। আমি বিশ্বাস করি না। আমি আর কারুকে বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি ওকে চলে যেতে বল।

রাহুল বলল—ও আমার বন্ধু। নদী দেখা, ডোঙায় চড়া এসব ও করে। ওর জ্বর হয়েছে, ও এসেছে।

বুলবন বলল—সদরঘাট চলে যাক, ওখানে ভাল ডাক্তার আছে। দোলন কী এমন চিকিৎসা জানে ! ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। বলে বুলবন ঘরের অর্ধ উন্মুক্ত বাইরের দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়।

চন্দ্রিমা বলল—দাঁড়াও। এভাবে কারুকে বলতে যেও না। আমি যা জানি, তাই হবে। জ্বরের ওষুধ দেব।

—না। আমিই অসুস্থ, আমাকে আগে ওষুধ দাও। আমার জ্বর। দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো ! বলে চন্দ্রিমার একখানা হাত চেপে ধরে বুলবন। পাগলের মত আচরণ করে।

সত্যিই বুলবনের দেহ তপ্ত ছিল। তবু স্বামীকে ঠেলে সরিয়ে ওষুধের বাক্স হাতে করে বাইরে আসে চন্দ্রিমা। একটা কথা ছুঁড়ে দেয় স্বামীর উদ্দেশে—কালই প্রাণদার সঙ্গে দেখা করবে তুমি।

রাহুল দোতলায় এসে নিজের ঘরে কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে দেয় খাটের উপর। নেমে আসে নীচে। বাইরের বারান্দায় এসে দেখে বউদি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। কবি নেই।

—কবিকে ছেড়ে দিলে কেন ?

—ওষুধ না নিয়েই চলে গেছে ! আমাদের সমস্ত কথা ওর কানে গেছে।

—সবারই তো মান অপমান বোধ আছে বউদি ! তাছাড়া, তোমায় বলছি, আমরা কোনভাবে ডিসটার্বড হই, তা কবি চায় না। বুলবনের জ্বরের ওষুধ দাও তুমি, আমি দেখছি। বলে রাহুল সন্ধ্যার অন্ধকারে পথের উপর নেমে চলে যায় নিমেষে। রাহুল ওয়াটার গেটের দিকে ধেয়ে চলে অত্যন্ত দ্রুত। আকাশে কুয়াশালিপ্ত তারকা মিটমিট করছে।

কোদালকাটির জলগেটের কাছে ছুটে আসে রাহুল ঊর্ধ্বশ্বাসে, কবির নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডেকে ওঠে। কোনও সাড়া পায় না। অন্ধকারে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে তার হৃদয় কেমন করতে থাকে। গায়ে জ্বর নিয়ে কবি এই পথেই তো ছুটে এসেছে। ভাবতে ভাবতে রাহুলের অত্যন্ত কষ্ট হয়। হ্যারিকেনের আলোয় কবিকে কী রকম শুকনো দেখাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি ছিল অসম্ভব বিষণ্ণ। একা সে জলের প্রান্তরে পড়ে আছে। কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। ভাল ছেলে নয়। কবি কখনও 'গুড়বয়' হতে পারল না। কবিরা কখনও সুপুত্র হয় না, কখনও 'গুডবয়' হয় না। জীবন 'বিরান' করবে বলে মাকে ছেড়ে এসেছে। মায়ের ক্যান্সার, তবু সে মায়ের কাছে ফিরতে পারবে না। খারাপ লাগছে যে, বুলবনও কবির উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না। রাহুল ভাবল, বুলবনরা সহ্যই বা করবে কেন !

রাহুল ফের ডেকে উঠল—কবি ! কবি-ই-ই ! কবি-ই-ই-ই-ই !

জলের বেগ নেই, শব্দ নেই, জলের গর্ভপূর্ণ- নৈঃশব্দ্য স্থির। কদমতলার কাছে আগুনের ফুলকি চোখে পড়ে। পায়ে পায়ে সেখানে এসে দেখে একজন মাহেফরাস মাছের ঝাঁকা পায়ের কাছে রেখে কদমগাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে লম্বা বিড়ি টানছে ; এ হল পেটে বিড়ি, মোটা, কড়া, দারুণ ধকালো। জলের মানুষের হালকা নেশায় চলে না। পাট-কাচার মুনিষরা খায় জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তাই এর নাম পেটেবিড়ি, পেটেজোঁক বলেও একটা কথা আছে। পেটেবিড়ি বললেই রাহুলের পেটেজোঁক কথাটা মনে আসে। এই জোঁক সাংঘাতিক ! শোষক পদবাচ্য এই জোঁকের উপমা কখনও যে মানুষ, সেকথা এই বিড়িটানা লোকটিও জানে।

লোকটি বলল—আস্তে পারভেজ ! তিনি আছেন। ডোঙা ওই পানে আছে, আনতে গেছে।

রাহুল এবার ছপছপ শব্দ শুনতে পায়।

কবি ডেকে উঠল—এসো হরবোলা।

ঝাঁকা হাতে করে মুখের বিড়ি ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হরবোলা। বাঁধের নীচে নামতে নামতে বলে—আসেন।

হরবোলা দীর্ঘ লগি হাতে নেয় ডোঙায় চড়ে। ঝাঁকাটি ডোঙার মুণ্ডে ঝুলিয়ে দেয় টুপির মত।

কবি বলে—বড্ড শীত করছে, রাহুল। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?

রাহুল ডোঙায় চেপে বলল—তুমি ওইভাবে চলে এলে যে বড়।

কবি বলল—তোমার দাদা বিরক্ত হয়েছেন, আমার জ্বর এমনি সেরে যাবে।

—এ তোমার উচিত হল না। বউদি ওষুধ দেবার জন্য বাইরে এসে দেখে তুমি নেই। এখন কোথায় ওষুধ পাবে ?

—নটখুলিতে পাব। ডাক্তারদা ওখানে আছেন। বিশ্বরঞ্জন। ওই দিকে প্রচণ্ড আন্ত্রিক হয়েছে, তাই উনি এসেছেন। মাহেফরাসদের অত্যন্ত আমাশয় হয়। আমাদের সঙ্গে যিনি যাচ্ছেন, ভেবো না মাহেফরাস, আসলে উনি হরবোলা খতিব। ওই ঝাঁকাটি অন্যের। আমরা নিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ্য করনি, ওটি নতুন বানানো। হরবোলা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। হরবোলার সঙ্গে আলাপ করলে তোমার ভাল লাগবে।

অবাক হচ্ছিল রাহুল। ওষুধ না পাওয়ার অপমান কবির যেন গায়েই বেঁধেনি, ওই প্রসঙ্গে সে আর ঢুকতেই চাইছে না।

রাহুল আশ্চর্য সুরে জিগ্যেস করে—আপনার নাম হরবোলা কেন ?

হরবোলা এ কথায় মিষ্টি করে হেসে ফেলল। তারপর বলল—আর কেন বলেন মিঞা ! গতিকে ওই নাম হয়েছে। খতিব-মৌলানাদের নানা রকম কণ্ঠ হয়। ওয়াজ-নসিহত, দোয়াদরুদ, পুঁথিকালাম গাওনা করে বলে কত না তানবান থাকে, কেউ হলেন কোকিল-কণ্ঠ, কেউ তোতাসাহেব। তোতাসাহেবের নাম শোনেননি !

—না। ঘোর অবাক কণ্ঠে রাহুল জবাব দেয়। অন্ধকারে হরবোলার সঠিক আকৃতি, রঙ, পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই ঠাহর না, তবে কণ্ঠস্বর যে মিঠে তা শ্রবণেই প্রতীতী হয়।

হরবোলা ফের হেসে উঠে বলল—তাহলে আর কি। উনি হলেন তহিদুর রহমান ফিরদৌস ইসলামপুরী আদবে পাক, পাক জুবান তোতাসাহেব, ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ডিনাজপুর। আসল সাকিন গাইবান্দা, জয়বাংলা। উনার মুরিদ আমি। তাঁরই হিফাজতে পেন্নামপুরের মাহেফরাসী ছোটডিহির মসজিদে এসেছি। এলাম কখন শুনবেন ? এমারজেন্সি ঘোষণা হল কতই জুন যেন ! তারপর হপ্তাবাদে। আছি, উনি তোতা, আমি হরবোলা। মাহেফরাসরা রসিক, তাই ওই নাম দিয়েছে।

অন্ধকারেও রাহুল রঙিন আর মিষ্ট মানুষটির নানা রকম আন্দাজ করছিল। ডোঙা ছুটছে তিরতির করে, ছপছপ করছে শান্ত জলের অন্ধকার প্রকৃতি। দূরে দীন কুটিরের আলো গ্রামের দিগন্তলগ্ন নিশানা জাগিয়ে তুলেছে ক্ষীণ দৃষ্টির সীমানায়। হরবোলা বলল—আমি ইকবাল ভুঁইয়ার আশ্রিত। আপনি তারে চেনেন ?

মহা বিস্ময়কর এই নিশা অন্তহীন বিদিশার রাত, ততোধিক সঙ্গোপন জল, তমিস্র কুহকে আচ্ছন্ন কুয়াশার ডোঙাটি চলমান। সম্মুখে মাঝি হরবোলা খতিব। কোন্ সে

দিগন্তরে আজ এই অভিযাত্রা শুরু, জরুরি অন্ধকার ঠেলে, লগিতে উৎক্ষিপ্ত জলের রেণু গায়ে পড়লে শিহরিত হয় জ্বর। কবি একটু একটু কাতরে ওঠে। এই অস্ফুট কাতরতায় ভারতের অন্ত্র কম্পিত হয়, ধমনীতে ক্রান্তীয় তমসার স্বর উদ্বেলিত।

হঠাৎ হরবোলা পুথির পয়ার ত্রিপদী ছন্দে ছড়াগান ধরে, তর্জার সুরে—রাহুল অবাক।

শুনেন সবে তাজ্জব হবেন শুনেন দিয়া মন
ন্যালার কাহিনী এক করি গো বর্ণন
ন্যালায় কহে যাহা—
ন্যালায় কহে যাহা বুঝে তাহা মাতা হাওয়া বিবি
সেই কথা আর বুঝেছে পেন্নামপুরের কবি
কবি আসগর আলি—
কবি আসগর আলি সন্ধ্যাবুলি শোনায় হেথা হোথা
গরিব্ কাঙাল খুব শুনেছে ন্যালার এই কবিতা
ছিল মোহড়াগ্রামে—
ছিল মোহড়াগ্রামে ইমান নামে অবোধ ন্যালা ভোলা
সেই ছেলেকে সঙ্গে করে বিবি থাকিত একেলা
ন্যালা বাগাল ছিল—
ইমান বাগাল ছিল, ন্যালা হল জোত টানিতে গিয়া
দুঃখের কাহিনী শেষ না হয় লিখিয়া
বাপজি কদম আলি—
বাপটি কদম আলি মুখে কালি পুলিসের দালাল
বউ আর ছেলে ভিটায় ফেলে কাটায় কত কাল
হাওয়া একা কাঁদে—
হাওয়া একা কাঁদে পরাণ বাঁধে ছেলেকে পাইয়া
ছেলের মুখে ভাষা শুনে উঠে শিহরিয়া
বলে একি বাপধন—
বলে একি বাপধন বচন-বন্ধন বুঝ না বুঝ না
কুকথা কহিলে বাপ রে জীবন ফানাফানা
কথা শুদ্ধ কর—
কথা শুদ্ধ কর লাঙল ধর চাষে দাও রে মন
তুমার কথা শুনে যেনে সাধু-সভাজন
মনিব রাজার রাজা—
মনিব রাজার রাজা দিবে সাজা কুকথা কহিলে
গরু দিয়া চাষ ন্যালা জুড়িল সকালে
সেদিন ফজর বেলা—

এই অবধি এসে সহসা হরবোলা খতিব থেমে গেল। ডোঙার আঁধারে বসে দোলায়মান তিমিরপুঞ্জে চোখ রেখে রাহুল বিস্ময়াবিষ্ট এবং নীরব। গলার কাছে বেদনা ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকল। পয়ারে ত্রিপদীতে বাঁধা বা ভাঙা পয়ারে, ভাঙা ত্রিপদ ছাঁদে আন্দোলিত সুর যেমন আর্তির সঙ্গে জড়িয়েছে মানুষের কাহিনীকে, তা যেন থামতে চাইছে না।

'দুঃখের কাহিনী শেষ না হয় লিখিয়া।'

একথা ভাবলে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। রাহুলের গায়ে পশমের জামা। জামার তলে সোয়েটার আছে। তবু শীত করছে। ডোঙা এগিয়ে চলেছে। গ্রামের আলো আরও দু'-একটি চোখে পড়ছে।

—বন্দুকটার খোঁজ পেয়েছ? কবি আচমকা শুধায়।

—হ্যাঁ। ছোট উত্তর রাহুলের এবং আর কোনও কথা সে বলে না। ডোঙা ছপছপ করে।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসল বুলবন। টেবিলের ল্যাম্পের শিখা উসকে দিল। দেখল, চন্দ্রিমা জেগে। চোখ মেলে বিছানায় চেয়ে রয়েছে। ঘড়ি দেখল বুলবন। সোয়া একটা।

চন্দ্রিমা বলল—রাহুল ফেরেনি। কাল তুমি অতি অবশ্য বহরমপুর যাবে।

বুলবন বলল—মণি! মণি কোথায়? বলে সে নির্বাক হয়ে গেল। চন্দ্রিমা স্বামীকে স্পর্শ করার জন্য হাতটা তুলল কিন্তু ফের নামিয়ে নিল বুকের কাছে।

॥ ১৭ ॥

ইকবাল ভুঁইয়ার সঙ্গে অনেক কাল পর দেখা হল রাহুলের। ইকবালের মাথায় ব্যান্ডেজ। মাঝে মাঝে দাড়িগোঁফ রাখা এবং কেটে ফেলার রোখ আছে তার। সবল বুদ্ধিমাখা চোখ দুটির দিকে চেয়ে রাহুল কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কথার বদলে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল ক্ষীণরেখায়। আহত ইকবাল বিছানায় উঠে বসেছে। হাসির জবাবে হাসিই শ্রেষ্ঠ। ইকবাল নীরবে হেসে চুপ করে রইল।

রাহুল একে একে সকলকেই দেখছিল। হ্যারিকেনের কাঁচটা গোল। ঘরটি চারচালা। বাইরে ছোট মনোহারী দোকান। ভিতরে দু'খানা শোবার ঘর। পাশেই ছাগলের ক্ষুদ্রাকার ঘর রয়েছে, গন্ধ আসছে। ছাগলের ঘরের পাশেই মুরগির খাঁচা। এই ঘরটিতে একখানা কালো কুচকুচে রঙের ভারি চৌকি। ঘরে দুটি মাটির গোলা। তাতেই ঘরটা ভরে গিয়েছে, চৌকি অনেকটা আড়ালে পড়ে গিয়েছে। দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালে চৌকিতে কে আছে হঠাৎ করে ঠাহর হয় না। ছোট ছোট দুখানি মোড়ায় বসেছে কবি আর রাহুল। ইকবালের মাথার কাছে চৌকির উপর বসে রয়েছেন ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন। তিনি ছিলেন গোকুলদানা গ্রামে। ডোঙায় করে ইকবালকে কবি সেই গ্রামে নিয়ে যায়। ব্যান্ডেজ করে আনে। পরে বিশ্বরঞ্জন এখানে এসেছেন।

দেখতে দেখতে ঘরটা ভরে উঠল মানুষে। ইকবালের পায়ের কাছে বসে থাকা হরবোলা খতিব বলল—এশার নামাজের টাইম জলের উপর পার করেছি। এখন তাহাজুদ পড়ব। দশটা বাজে।

বিশ্বরঞ্জন হরবোলার দিকে চেয়ে বললেন—সে হবে'খন। তোমার নামাজ পালিয়ে যাচ্ছে না।

—কাজা পড়তে হবে। এশার কাজা। মানে আপনার তামাদি নামাজ। তারপর তাহাজুদ।

—সব তোমার মুখস্থ !

—আজ্ঞে ! বলে হা হা করে সুন্দর হাসলেন হরবোলা ।

—ছোটডিহিতে নামাজী লোকের সংখ্যা কেমন ? মসজিদে যায় ? প্রশ্ন করলেন বিশ্বরঞ্জন ।

—যায় । দু'চারটি ।

—কেন ?

—মাহেফরাস খাটিয়ে জীব । খোদাকালাম খুব একটা বোঝে না । খুব তাড়ি খায় । দাঁড়কেপুঁটির চাট । এখানে চোলাইকে বলে সন্ধ্যামণি, অর্থাৎ সঞ্জীবনী সুরা । খুব টানে । তেরোঘরার কলোনিতে মচ্ছব হয় । সে একটা স্থান বটে, দেখবেন একবারটি ?

—দেখব ! কেন দেখব না, দেখতেই তো এসেছি ! আমার সঙ্গে রাহুলও দেখবে । মানুষ দেখবারও একটা নেশা আছে । নেশা কথাটা খারাপ অর্থে নিও না রাহুল ! প্রশাসনের পক্ষে সবচেয়ে অরক্ষিত এলাকাগুলিই আমাদের টার্গেট । এই জল দেখে পুলিস ভয় পায় । যতদিন জল আছে, ততদিন এই অঞ্চল ওয়েল- প্রোটেকটেড । পুলিসের যা ডিজঅ্যাডভান্টেজ, আমাদের তাই অ্যাডভান্টেজ ।

বলতে বলতে দৃপ্ত চোখে রাহুলের দিকে চাইলেন বিশ্বরঞ্জন । ডাক্তারের চোখে তীব্র আগুন উল্কার মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠল এবং নিবে গেল । একটি লহমা সময় । কী যেন হয়ে গেল রাহুলের । সে অভূতপূর্ব একটা উত্তেজনা অনুভব করল ।

—জল আমাদের আশীর্বাদ ! জলের প্রতিটি বিন্দুকে বিপ্লবের কাজে লাগাতে হবে । বললেন বিশ্বরঞ্জন । ইকবালের চোখ দুটি চকচক করে উঠল । কবি অকারণ তার হাতটি নিঃশব্দে আকাশে ছুঁড়ল ।

—জলই জীবন ! বিশ্বরঞ্জন এ কথা বলবা মাত্র সমবেত অন্যান্যরা, যারা মাটিতে খেজুর পাতার চাটাইতে উপবিষ্ট, সবারই চাদরে সম্পূর্ণ মাথা এবং মুখের অর্ধাংশ ঢাকা, তাদের গলায় চাপা আবেগ ছলছল করে উঠল, অবদমিত তীব্রস্বর হিসহিস করল । রাহুল শুনল প্রশ্বাস আবেগময়, জীবনটাই যেন বন্দী হয়ে ছটফট করছে । আবার মুক্তির কাল্পনিক স্বাদ সেই প্রশ্বাসে গন্ধের মত মিশেছে ।

—প্রতিটি জলের ফোঁটায় মাহেফরাসের শ্রম সংযুক্ত । নদী কেটেছে তারা, বিলের নহর তাদের, সমস্ত মেহনত তাদেরই, এই জলের অধিকার তার ন্যায্য । গেটের চাবি ঘোরবার অধিকার ললিতকে কে দিয়েছে ?

—আমরা দিইনি ! কে একজন বলে উঠল চাদরের ভিতর থেকে ।

—প্রতিবাদ হয়েছে, তাই আজ জলের কপাট নেমেছে ! কিন্তু রক্ত না ঝরলে অধিকার যে কায়েম হয় না, সেই দৃষ্টান্ত আমরা চোখের সামনে দেখলাম । ইকবাল প্রমাণ করল, রক্ত দিলে অধিকার পাওয়া যায় । কিন্তু তার পঙ্গু পায়ের উপর যে অত্যাচার শশাঙ্ক করেছে, এর জবাব আমরা দেব । ইকবালের আজ চলাফেরা করার সাধ্য নেই । ওকে বেশ কিছুদিন এইভাবে শুয়ে থাকতে হবে । মনের জোরে উঠে বসেছে এখন ।

রাহুল লক্ষ্য করল, ইকবালের পা কাঁথার তলে লুকনো । সেই দিকে হরবোলার একটি হাত অগ্রসর হতে গিয়ে থেমে গেল । টেনে নিল জ্যাকেটের পকেটে । জ্যাকেটটি নানান বিচিত্র রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে সেলাই করা । সেই দিক থেকে চোখ টেনে নিয়ে ঘরের বেড়ার মাটি লেপা দেওয়ালে চোখ পড়া মাত্র রাহুল চমকে উঠল । ভাঙাচোরা অক্ষরে একটি পোস্টার সাঁটা । সে বিশ্বাস করতে পারছিল না । 'কমরেড সাদা চৌধুরী

জিন্দাবাদ।' অসম্ভব এই কথাটি এরা লিখেছে কেন ? এ সে কী দেখছে ! কিছুতেই তার মন মেনে নিতে পারছে না। এই শব্দগুলি কি ইকবালের প্রেরণা ! বাবার নামে এমন স্লোগান কেন উঠবে ? বিশ্বরঞ্জন কত উদ্দীপ্ত কথা বলে চলেছেন, কোনও কথাই স্পষ্টত আর রাহুলের কানে প্রবেশ করছে না।

—অতএব আমরা প্রাথমিক আদি অস্ত্রগুলিই ব্যবহার করতে পারি। যেমন দা, কোদাল, কাটারি, বল্লম, হেঁসো। শশাঙ্কর বন্দুক ছিনিয়ে নিতে পারি।

কথাগুলি একটু একটু কানে আসে রাহুলের। সমস্ত অক্ষর সঠিকভাবে কানে এসে পৌঁছায় না। রাত্রে ইকবালের পাশে পৃথক কাঁথার তলে শুয়ে থাকতে হয় রাহুলকে। ইকবালের পায়ে যন্ত্রণা হয়। ঘুমের মধ্যেও বেচারি কাতরায়। সেই ক্লিষ্ট কাতরানি রাহুলের ঘুম চটিয়ে দেয়। বাতায় ঝুলছে ক্ষীণ আলো। অস্পষ্ট ছায়ার আড়ালে পোস্টারটি জেগে আছে। এক পয়সার আলোয় নিরানব্বই ভাগ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চোখদুটি জাগ্রত থাকে রাহুলের। অদ্ভুত কষ্ট হয় বুকের মধ্যে।

—শুধু মাটি নয়, জলের উপরও আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জলের প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগাতে হবে।

বিশ্বরঞ্জনের কণ্ঠস্বর সহসা এই অন্ধকারে কানে গুঞ্জন করে উঠল। এই মানুষটি মুমতাজ আলির নামে বাবার c/o করে একটি টুনটুনি আর বেড়ালের প্রচ্ছদ মোড়া ইশতেহার পাঠিয়েছিলেন চিৎপুর, সেই ঘটনা আজ রাহুলকে ইকবাল ভুঁইয়ার ঘরে শুইয়ে রেখেছে। সূত্রপাত আশ্চর্যজনক। নিশ্চয়ই সেটি এক ধরনের হঠকারিতা ছিল, বাবার নামের পোস্টারটিও আর এক অসতর্কতা এবং লঘুচিত্ততা। কেন এমন হবে ! এইভাবেই কি জড়িয়ে পড়বে জীবনটা ? যদি তাই হয়, হোক ক্ষতি নেই। কিন্তু বাবা যা নন, তাঁকে সেইভাবে একটি রেভলিউশনারি মিথে পর্যবসিত করা কেন ! এ যে চাতুরি। এই চাতুর্য কি ঠিক ? বাবা একজন পুওর টিচার, একজন সামান্য কালটিভেটার, গান্ধীবাদী লোক। বাবা মাটির মানুষ, কবি বা বিশ্বরঞ্জন যে তা নয় ! বাবার নামকে এ ভাবে ব্যবহার করা অন্যায়। ভাবতে ভাবতে রাহুল ছটফট করে ওঠে। আবার কাতরে ওঠে ইকবাল।

ইকবালের গলার ভিতের চুঁইয়ে যে কাতরানি নামে ওঠে, সেই যন্ত্রণা বারবার বিদ্ধ করতে থাকে রাহুলকে। মনে হয় তার হৃদয় ছুঁচ দিয়ে ফুঁড়ে চলেছে কেউ। একই মুহূর্তে আমানি এবং বাবার মুখ মনে পড়ে। সকাতর এই সুর চেতনার গভীরে ঢুকে চোখ থেকে সমস্ত ঘুম কেড়ে নেয়। বাবাকে সে কতদিন দেখেনি। লালবাগের সাব-জেলে ক'দণ্ডের দেখা, বাবা মুমতাজ আলিকে সাবধান করে দিতে বলেছিলেন। সেই মুমতাজের সঙ্গে রাহুলের দেখা হয়নি।

—মা ! মা গো ! ইকবাল তার অদৃশ্য মৃতা মাকে ডাকছে। ইকবালের জীবিতা মা একজন তীব্র যুবতী, অতি তরুণী এবং সৎ। প্রৌঢ় পিতা দ্বিতীয়বার নিকা করেছে। পাশের ঘরে স্বামীস্ত্রী শুয়ে আছে। একবারও তারা ছেলের কাছে আসছে না। ইকবালের সহোদরা তালাক হওয়া রুকসানা, ডাকনাম রুকু বারান্দায় শুয়েছে, সেই-ই ভাইকে দেখে। রুকসানার জীবনের পরিণাম কী হবে কেউ জানে না।

খুব সকালে ছোটডিহির মসজিদ থেকে এসে পৌঁছেছে হরবোলা খতিব। ইকবালকে কাঁধে ভর নিয়ে নামাল সে। তারপর প্রায় কাঁধে করেই নিয়ে চলল মাঠের দিকে। এই গ্রামে মাঠ বলতে তেমন কিছু নেই। ওইদিকে একটা পুকুর পাড়ের বাঁশবনে নিয়ে গেল ইকবালকে। ওখানে প্রাতঃকৃত্য করাবে, চোখে এই কষ্ট সওয়া যায় না। সরু পায়ে

ব্যান্ডেজ, পা পাততে পারছে না, কুঁকড়ে কিছুটা বেঁকে রয়েছে। স্পষ্টত রাহুল বুঝতে পারছিল, হরবোলা সত্যিকার ধার্মিক। বিচিত্র মানুষটা। কবিয়াল আসগর আলির ছড়াগান মুখস্থ করেছে। আমানির মৃত্যু আশ্রয় পেয়েছে ওই গানের মধ্যে। কবর জুড়িয়ে যাবে, কিন্তু গান জুড়বে না। মুমতাজ আলি, বিশ্বরঞ্জন, কবি ওরফে তিলকের রাজনীতির গতিপথও বড়ই বিচিত্র!

জর্দার গন্ধমাখা খেজুর গুড়ের চা করে দিল রুকসানা। সকালের শিশিরমাখা সাদা পদ্মের মত রূপ মেয়েটির। এই মেয়ে কেন তালাক হয়! তালাক কেন হয় রাহুল জানে। সুন্দরের এত অবহেলা এখানে হয় যে, সে কাহিনী চন্দ্রিমা বউদিও বিশ্বাস করতে পারবে না। হয়ত রুকুর বর একখানা রবিনহুড বাই-সাইকেলের যৌতুক পায়নি বলে রুকুকে তালাক করে দিয়েছে। রুকুর কাহিনী রুকুকেই একবার শুধিয়ে জানতে ইচ্ছে হল। রাহুল পারল না! রাহুলের দিকে রুকসানা বারংবার চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মোহরের মুখটা চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে মিলিয়ে গেল। মোহর যে কলম জোড়া দিয়েছে, বিনিময়ে একখানা চিঠি মোহরের পাওনা, রাহুলের উৎসাহ আসে না কেন, রাহুল বুঝতে পারছে না। অথচ ইচ্ছেও হয় লিখে ফেলতে।

হরবোলার সঙ্গে তেরোঘরায় আসে রাহুল। খোপরার চাল ছাওয়া এক কলোনি। মেয়েরা সব বিড়ি বাঁধছে। নাটার জমিতে এরা প্রায় জবর দখল নিয়েছে। এখানকার মেয়েদের দু'বার তিনবার করে বিয়ে হয়েছে। তালাক হয়, বিয়ে হয়, আবার সম্বন্ধ ভেঙে যায়। অনেকের দুই তিন তরফের সন্তান আছে। এখানে মেয়েগুলি বর্তমানে যে-বরের সঙ্গে থাকে, তারা জলের মাছ ধরে বেচে আসে। এদের কারও কুম নেই। জল নেমে গেলে প্রায় বেকার হয়ে যায়। অন্য গ্রামে জন খাটতে যায় বটে, কিন্তু সেই কাজের মেহনত এরা পছন্দ করে না। এরা পানির মাছে বাঁচতে চায়। অভাবের সময় বরগুলো অনেকেই কোথায় কোথায় পালিয়ে যায়। বউগুলির বিড়ির রোজগারে পেট ভরে না।

একটি কাঁঠাল গাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রাহুল হঠাৎ চমকে উঠল। দেখল, শরম আলি তার সঙ্গী আরও দুজন মস্তানকে নিয়ে কলোনির একটি কুটিরে এই সকালে এসে ঢুকে যাচ্ছে। রাহুলকে খেয়াল করতে পারেনি। রাহুল হরবোলার একখানি হাত ধরে একটু টেনে বলল—চলুন! এখানে ওরা কেন?

খতিব বলল—আসে! খারাপ উদ্দেশ্যেই আসে। তাড়ি খাবে, মজা লুটবে।

—আপনারা আসতে দেন কেন?

—কী দিয়ে রুখব! ধর্ম দিয়ে তো হয় না। ওরা ডিঙি মেরে আসে। একবার একটা বউকে তুলে নিয়ে গেল, কোথায় কে জানে। পরে বউটা ফিরলে স্বামী আর নিল না। স্বামীটাই ভেগে চলে গেল। তারপর সেই মেয়ে ডোমকল আজিমগঞ্জে বেপাড়ায় চলে গেল। মাঝে মাঝে আসত, অন্য মেয়েকে খারাপ পথে পিছলে দেবার জন্য, সেটা ইকবাল রুখে দিয়েছে। কিন্তু শরমকে দমাবার জোর তেরোঘরা পাবে কোথা?

—আপনি খতিব।

—হ্যাঁ।

—আপনি পারেন না?

—তোতোসাহেব পারেননি, আমি তো ছার!

—চলুন! 'আমানির মৃত্যুর জবাব চাই, সাদা চৌধুরী জিন্দাবাদ'...এই পোস্টার কে টাঙিয়েছে? ওখানে, ওই যে, গাছটায়, ওদিকে বেড়ার উপর। কেন?

—এই সওয়াল আপনি করছেন ! খানিক বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল হরবোলা।

—ঠিক আছে, আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। বলে রাহুল ইকবালের ঘরে ফেরে। ইকবাল একটা হাত চিঠি এগিয়ে দেয়। বিশ্বরঞ্জন লিখেছেন।

প্রিয় কমরেড রাহুল,

তোমার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনার আছে। আমি গোকুলদানা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছি, সেখান থেকে সন্ধ্যা নাগাদ সদরঘাটে পৌঁছাব। কবি আমার সঙ্গে আছে। তুমি অবশ্যই সদরঘাটে আসবে। ঠিক সদরঘাটের নয়, ডোমকল লাইনের ত্যানাচুরা বাসস্টপের কাছে। কালভার্টের উপর থাকব। ঠিক পাঁচটায়। আগেও নয়, পরেও নয়।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ ডাক্তারদা।

চিঠিতে কোনও তারিখ দেননি বিশ্বরঞ্জন। কখন চলে গেলেন বোঝাই গেল না। রাত্রিতে ইকবালের বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছিলেন কেউ বলছে না। কবিই বা কোথায় ছিল রাত্রিবাসের জন্য প্রশ্ন করতে পারল না রাহুল। চিঠি থেকে মুখ তুলে দেওয়ালের পোস্টারটির দিকে চাইল সে।

একটু ইতস্তত করার পর বলল—এই পোস্টারটা ঠিক হয়নি ইকবাল !

—কেন ?

—না।

দুয়ারের মুখে দাঁড়িয়েছিল রুকসানা। সেদিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর বলল—বাবার নামের আগে কমরেড লেখা অনুচিত। তুমিই লিখেছ নিশ্চয়।

ইকবাল বলল—হ্যাঁ, আমিই লিখেছি ! কিন্তু তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—না বোঝার কিছু নেই। সাদা চৌধুরী কমরেড হতে পারেন না। প্রকাশ্যবাদীরা এইভাবে পোস্টার লেখে।

—আমি আমার ঘরের ভিতর লিখেছি। এই দেখে মানুষ প্রেরণা পায়।

—বাইরেও লিখেছ ! সাদা চৌধুরী জিন্দাবাদ।

—হ্যাঁ, অবশ্যই। সঙ্গে আমানির কথাও আছে।

—ঠিক নয়। এভাবে উন্মোচিত হলে বিপদ আছে। তাছাড়া বাবা যা নন, তাঁকে তাই করা হয়েছে ইকবাল !

—প্রকাশ্যবাদীরা কী লেখে জানি না। সংগঠনের জন্য এর প্রয়োজন আছে। আমি মার খেয়েছি, জানি তারও যেমন দরকার, তেমনি দরকার ওই পোস্টার। তুমি ডাক্তারদাকে প্রশ্ন করতে পার ! বলে উঠল ইকবাল ভুঁইয়া।

রাহুল একটুখানি নীরব থেকে বলল—ঠিক আছে, ডাক্তারদাকেই বলব। আমি চলি। বলে আবার রুকসানাকে দেখে নেয় এবং পা বাড়ায়।

রুকসানা বলল—আমার কথাও একবারটি ভাবনা করবেন পারভেজ ভাই ! বাপ তো দেখে না। খালি বুলে, তেরোঘরায় চলে যা। ভাই আমারে রাখেচে, কিন্তু ভাইয়ের তো রোজগারপাতি তেমন নাই ! তেরোঘরায় কি মানুষ যায়, বলেন ! বাপের ভিটায় ঠাঁই হয় না আমার, এমনই কপাল ! লজ্জার মাথা খেয়ে বুলছি আপনি আমার একখান শাদি দেখবেন ! গরিব মিশকিন বাউল দরবেশ যা হোক...

—চুপ কর রুকু, হায়া কর ! তেরোঘরায় কেন যেতে হবে তোকে ! আমি নাই, আমি কি মরেছি !

—তুমি তো আছো, কিন্তু পঙ্গু মানুষ কত আর পারে বলেন পারভেজ ভাই ! ওকেই

কে দেখে ! একখানা পা তা-ও যদি ভেঙে আনো, তুমি কি আর মানুষ থাকবে ভাবো !

—আমার ভাল পাখানা ভাঙেনি। আমি ওই দিয়ে দাঁড়াব। পারব না রাহুল ! কী হরবোলা সাহেব বলুন ! এ লেম ম্যান ক্যান ডু এভরি থিং, যদি তার একখানা লাঠি থাকে। আমাকে মুমতাজ বলে গিয়েছে। মুমতাজের একটা চোখ নাই। তো, সে কী বলেছে জানো ? থাক রাহুল, তোমার সময় হয়েছে ডাক্তারদাকেই তুমি তোমার কথা বলবে।

রাহুল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে আসে। ডোঙায় চড়ে। হরবোলা খতিব ডোঙা ভাসায় জলে। রাহুলকে চালিয়ে নিয়ে চলে দ্রুত ধাক্কায়। রাহুল সমস্ত জলপথ প্রায় চুপ করে থাকে। আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতার মধ্যে ঢুকে পড়ছে জীবন। সেই যে শুরু হল কদমের কথা দিয়ে, "আসো রাহুলদাদা, দুমুঠা খাই", সেই যে কালোগাড়ি তুলে নিয়ে গেল বাবাকে, তারপর কত কিসে এই একটি ডোঙা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। এই জল যে এমন জল তা কি সে জানত ! কবি তাকে এই জল চেনালো। একটি চোখ নেই তার, সেই মুমতাজ আলির, কী আশ্চর্য, সে কথাও এই প্রথম শুনল রাহুল। ইকবালকে কী বলে গেছে সেই দুর্মর স্বপ্নদর্শী যুবকটি ? সরু শুকনো পায়ের উপর শশাঙ্ক আঘাত হানলে তা কি উষ্ণ হয়ে ওঠে, সেই পায়ে কি রক্ত চলাচল দ্রুত হয় ?

বাড়ি ফিরে মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে রাহুলের। সকাল দশটা। বুলবন বহরমপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়েছে রাহুল। চোখে চিন্তার বিপন্ন ছাপ। মা এসে তাকে দেখে গেলেন। কথা বললেন না। রাহুলও চুপ করে রইল। বউদি নীচে বহির্বারান্দায় রোগী সামলাচ্ছে। এ ভাবে কি পারবে ? লাইন অনেক দীর্ঘ হয়েছে। ওষুধ কেনার সামর্থ্য কোথায় পাবে !

হঠাৎ খাট ছেড়ে নীচের রান্নাঘরে নেমে আসে রাহুল। মাকে বলে—তুমি বউদিকে ওষুধ কিনে দিচ্ছ !

—না। মাথা নেড়ে আয়েষা জবাব করলেন।

—তাহলে ওষুধ কিভাবে জোগাড় হবে ?

—সেই হয়েছে চিন্তা মেজখোকা।

—বউদি গতকাল ওষুধ কিনল দেখলাম।

—বউকে আমি টাকা পয়সা দিইনি।

রাহুল আর দাঁড়ায় না। রান্নাঘরের দুয়ার ছেড়ে সরে আসে। সিঁড়ির মুখের কাছে বুলবনের সামনাসামনি পড়ে যায়।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ ? রাহুল প্রশ্ন করল।

বুলবন বলল—বহরমপুর। আমার ওই চাকরিটা হল না রাহুল ! এই গ্রামে আমার কোন বন্ধু নেই। তোকে যে কিছু বলব, সাহস পাই না। তুইও কেমন নিষ্ঠুরের মত করিস। রাত্রে কোথায় ছিলি ?

রাহুল তার দাদার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যভাবে বলে—চাকরি যে হবে না, সে আমি আগেই জানতাম। কিন্তু তুমি এই চাকরির ধান্দায় পড়ে অনেক ছোট হয়ে গেলে। হিফাজতকে বিয়ের সার্টিফিকেট শো করতে গেলে কেন ? তোমার দলের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে ! পার্টিই তো তোমার বিয়ে দিয়েছে।

বুলবন বলল—তুই কোথায় শুনলি আমি ম্যারেজ-সার্টিফিকেট শো করেছি, দ্যাট ইজ রং ইনফরমেশন। আমি ওই জিনিস ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

—সেকি !

—হ্যাঁ।

—বউদি জানে ?

—না। কেউ জানে না। তোকেই বললাম। বউদিকে বলবার দরকার নেই। দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি। জিনিসটা ছিঁড়ে ফেলতে আমার একটু কষ্ট যে না হয়েছে তা নয়। হয়েছে। বলে ট্রাঙ্কের তলা থেকে খামটা বার করে এনে রাহুলের হাতে দেয় বুলবন। রাহুল খুব স্তম্ভিত হয়ে যায়।

রাহুল বলে—আমি যা শুনেছি, তা হলে তা ঠিক নয়। ঠিক আছে, এ আমি কী দেখব।

—দেখে রাখ ! তারপর ফেলে দিস। আমি চলি। ভাবছি, এখন থেকে মণির সঙ্গে চাষবাস করব। আমাদের তুই তাড়িয়ে দিবি না তো ! চাষবাসও কি আমি পারব ! বাপু পেরেছে, বাপুর কোনও যোগ্যতাই আমার নেই। লোকে যদি দেখে, আমি আজ এই করলাম। বিয়ের সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ভাইয়ের হাতে দিয়ে খুব বাহাদুরি করলাম, তা হলে হাসবে। তাই না ?

—না, মানে...এইটুকু উচ্চারণ করে রাহুল অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বুলবন বলল—তুই-ই আমার বন্ধু, আর তো কেউ নেই। তোকেই বলছি, আমার খুব অভিমান হয়েছে। খুব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার হয়ে গেল। নিজের মধ্যেই থাকি তো, কারুকে বলতে পারি না।

—বউদিকে বলতে পারতে !

—না রাহুল ! আমার অভিমান যে কী, কেন, বউদি বুঝবে না। এই সমাজের পাল্‌স, হার্টবিট ও জানে না। চন্দ্রিমা খুব কঠিন। আমাদের এই পলিটিক্যাল প্র্যাকটিস অনেক সময় মানুষকে খুব নিষ্করুণ করে দেয়। ঠিক তোকে বোধ হয় বোঝাতে পারছি না। দ্যাখ, তোর বউদিকে আমার খুব ভয় করে।

বুলবনের এই কথায় রাহুলের চোখে মুখে কতকগুলি তরঙ্গ খেলে যায়। খানিক দম ধরে থাকে, তারপর বলে—অভিমান কার উপর করবে, সমাজের উপর ! এইটা কি মানুষের সমাজ ভাব ? ন্যালাকে পিটিয়ে পাহারা দিয়ে মারে যে সমাজ, বিয়ের সার্টিফিকেট চায় চাকরির জন্যে, তার উপর অভিমান করা মূর্খতা।

—জানি। আমি মূর্খেরই মত হিফাজতের কাছে গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, তিনি কোন রাজনীতির চাটু নন। যাক গে, চলি। তুই বউদিকে কোন কথাই বলিস না কিন্তু। বলে বুলবন চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—তোকে পলিটিক্যাল সেন্স দেবার সাধ্য আমার নেই। তবু বলছি, রাজনীতি একটি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি তো আরও উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। আমার দল সে কথা বলে। তোর কী মনে হয় ?

—হয়।

—কিন্তু গতিকে পড়ে সেই হৃদয় নিষ্করুণ হয়ে যেতে পারে।

—এই কথা আমাকে বলছ কেন ? তোমার সঙ্গে বউদির কী হয়েছে জানি না। তোমাদের ব্যাপার তোমারই বুঝবে। মনে হচ্ছে, কোথাও এই চাকরির ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, পার্টির কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বল। বউদিকে ভয় পাচ্ছ, কথাটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে।

—ঠিক আছে, আমাদের ব্যাপার আমরাই বুঝবো। দে, খামটা আমাকে দে! বলে বুলবন রাহুলের হাত থেকে খামটা ছিনিয়ে নেয়। তারপর ফের ওই সার্টিফিকেট ট্রাঙ্কের তলায় রেখে এবার তালা বন্ধ করে চাবিগাছা তোশকের তলায় হাত দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়। বাইরে চলে যায় বুলবন। নেমে যায় রাস্তায়। বুলবন চলে যেতেই ওযুধের বাক্স আর স্টেথো হাতে বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে আসে চন্দ্রিমা।

সিঁড়ির মুখে তখনও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাহুল। 'তুই-ই আমার বন্ধু'—এ কথা আগেও বলেছে বুলবন। মানুষটি খুব নিঃসঙ্গ, নিজেরই মধ্যে থাকে, সে কথা তো ঠিক, সেই-ই যখন হৃদয়ের নিষ্করুণতার কথা উচ্চারণ করে তখন ভয় হয়। এখন হঠাৎ রুকসানার কথা মনে পড়ে রাহুলের, ওই পদ্ম পুষ্পময়ী অষ্টাদশীর ভবিষ্যৎ ভেবেও ভয় হয়। ভয়ের বিচিত্র ধারা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে।

রাহুলের একবার মনে হয়, তোশকের তল থেকে চাবিগাছা বার করে ট্রাঙ্ক খুলে সার্টিফিকেট খামটা তুলে নেয়। পরক্ষণেই মনে করে, সে কাজের আবশ্যকতা নেই। 'আজান' পত্রিকার ধিক্কার মনে পড়ে। এই সমাজের ধর্মান্ধ বিবেক বুলবনকে বিক্ষত করেছে, কিন্তু এই পত্রিকা সেই যন্ত্রণার উৎসে ইন্ধন ঢেলেছে মার্ক্সবাদের সততার নামে।

সামান্য চাকরি, তারও যন্ত্রণা এত! বুলবনের জন্য অত্যন্ত মায়া হয় রাহুলের। সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলার সকরুণ পাগলামির কথা ভাবলে সেই মায়া আরও বেগবান হয়ে ওঠে। বউদি জানেই না, তার স্বামীটি এখন সত্যিই কেমন আছে! সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা বউদিকে জানানোর সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে বুলবন, কারণ সে জানে, এই পাগলামি চন্দ্রিমাকে সন্তুষ্ট না করে বিরক্তই উৎপাদন করবে। মানুষ অসহায় হয়ে তার প্রতিবাদের উপায় হিসেবে যা করে, অনেক সময় তার মানে থাকে না, নিজেকেই সে ছিন্ন করে ফেলে—এই সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলা যেন সেই রকমই একটা ঘটনা।

রাহুল ভাবল, ঘটনাটি বউদিকে সে বলে। পরক্ষণেই ভাবল, না, কিছুই সে বলবে না। একই দলের রাজনৈতিক আদর্শের তলে দাঁড়িয়ে দুজন সহযোদ্ধা একান্ত পাশাপাশি থেকেও কী করে দুজনই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমাবেগও যূথ সম্বন্ধকে রক্ষা করতে পারে না, সেই কথা ভাবছিল রাহুল। কী সর্পিল এই পথ!

হঠাৎ মনে হল, তারও তো সেই একই পথ। তবে, রক্ষা এই, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আত্মত্যাগের রাজনীতি অনেকটাই স্বাধীন, উপরের নেতৃত্ব তাকে যে-চোখে দেখে, সেই চক্ষু স্লুইস গেটের দিগন্তপ্লাবী জলের মতই বিস্তৃত। তথাপি, বাবার নামটি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা যে কত অনুচিত, ইকবালকে তা বোঝানোই গেল না। এমন যদি হয়, বোঝানোর কোন উচ্চ স্থান এই পার্টিতে নেই, তা হলে কী হবে!

চন্দ্রিমা রাহুলকে ওইভাবে সিঁড়ির মুখে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। বুলবনের সঙ্গে রাহুলের কথা হচ্ছিল বাইরের বারান্দা থেকে চন্দ্রিমা অস্পষ্ট শুনেছে, কথার অবয়ব ধরতে পারেনি। রাহুল হঠাৎ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল।

চন্দ্রিমা বাক্সপত্র রেখে রাহুলের ঘরে আসে। রাহুল খাটে শুয়ে চিৎ হয়ে তীরবর্গার দিকে চেয়ে আছে।

—রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি। আমরাও ঘুমাতে পারিনি। বলে ওঠে চন্দ্রিমা। তারপর নিজেরই কথার রেশ ধরে বলে—যেখানেই যাও, আমাকে অন্তত বলে যেতে পারতে।

—কেন? তোমাকে বলে যাব কিসের শর্তে বউদি! তুমি কি আমার নেতা?

—নেতা! এভাবে বলছ কেন? তা হলে তুমি কাউকেই কিছু বলবে না? অন্তত বলে

যেতে পারতে, রাত্রে তুমি ফিরবে না। আমার ঘুম হয়নি, সে কথা বিশ্বাস করার মনও যে তোমার নেই! ভাবছ, বলে গেলে আমি তোমার ক্ষতি করব।

আশ্চর্য স্পৃষ্ট হয়ে রাহুল এবার খাটের উপর উঠে বসল। বউদির গলায় সে অভিমানের সুর শুনতে পেয়েছে। খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল, তারপর চোখ তুলে বলল—ক্ষতি তুমি করবে না জানি। কিন্তু প্রতিটি আচরণবিধি তোমার কাছে প্রকাশ করাও যাবে না। তোমার দলের কোড অব কন্ডাক্ট আছে, 'বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি প্রসঙ্গে' বইটা আমি পড়েছি। উপরের নেতৃত্বের কাছে তোমাদের সমস্ত কার্যাবলী খোলা বইয়ের মত স্পষ্ট, সেই স্পষ্টতা বিধান করার দায়িত্ব কর্মীর, খাওয়া পরা ওঠা বসা পর্যন্ত নেতা জানতে পারেন। তোমরা নেতার কাছে সারেন্ডার কর, নেতৃত্বের বিমূর্ত মহাভাবের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাও। নেতৃত্বের এমন পূজা আমরা করতে পারি না। নেতার কাছে সারেন্ডার করা নয়, বিপ্লবের কাছে আত্মোৎসর্গ করি আমরা। ফলে সমস্ত কোড তো আমরা কাউকেই বলি না, কন্ডাক্টও বলি না।

চন্দ্রিমা শুনতে শুনতে নিঃশব্দে হেসে ফেলল। তারপর বলল—আমি তোমার সঙ্গে থিওরি নিয়ে তর্ক কবর না। তবে একটা কথা না বললেই নয়। কমিউনিস্টরা ব্যক্তিপূজার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরাও সর্বোচ্চ নেতাকে মোহন্ত ভাবি না। তবে নেতা ছাড়া বিপ্লব হয় না রাহুল! দেশের মাটিতেই দলের সর্বোচ্চ নেতা সৃষ্টি করতে হয়। নেতা যৌথচিন্তার ফসল, পুজো করার পাথর নয়। অন্য দেশের নেতাকে চেয়ারম্যানের চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দেওয়াটাই পূজা, কোনও সেটা প্রক্রিয়াই নয়।

রাহুল বলল—তুমি ভুল করছ বউদি! আমাদেরও নেতা আছেন।

চন্দ্রিমা বলল—জানি আছেন। কিন্তু তিনি চেয়ারম্যান নন। সাধারণ মানুষও জানে, তোমাদের সভাপতি চীনে থাকেন। কিন্তু একটা পার্টির সভাপতি থাকবেন চীনে, সম্পাদক থাকবেন ভারতে, এই কি পদ্ধতি? কিছু মনে করো না, আন্তর্জাতিকতাবাদও কিন্তু পূজার সামগ্রী নয়, সেখানেও রয়েছে দ্বন্দ্বমূলক সম্বন্ধ, তাতে অন্যের চেয়ারম্যানকে নিজের চেয়ারম্যান করা যায় না। বিস্তৃত আলোচনা তুমি শুনতেও চাইবে না, ফলে তোমাকে আমি বোঝাতেও পারবে না।

—অভিজ্ঞতাই আমাদের আলাদা করেছে বউদি। একটা কথা বলি, তোমাদের সমস্ত আচরণ পার্টি-নেতৃত্ব জানে, কী করছ না করছ, কিন্তু এ কথা কি জানে যে তোমরা স্বামী-স্ত্রী কত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ? বুলবন তোমাকে ভয় পায় কেন?

—ভয় পায়! আশ্চর্য হয় চন্দ্রিমা।

—নয় তো কি? সে থাকে আপন মনে। বিয়ের সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে আপন মনে। কষ্ট পায় আপন মনে।

—ছিঁড়ে ফেলে?

—ইয়েস! আর সে কথা কেউ জানতেও পারে না। তুমি কী রিপোর্ট করেছ পার্টির কাছে? সব রিপোর্টই তো তোমাদের করতে হয়! আমি তোমায় বলে যাইনি, কিন্তু বুলবনও কি তোমায় সব কথা বলে! তোমাকে ভয় পায়। এ ভাবে সম্বন্ধই না শুকয়ে যায়! খারাপ লাগছে, ভীষণ খারাপ লাগছে আমার!

বলতে বলতে রাহুল খাট ছেড়ে নেমে ঘরের বাইরে চলে যায়। বাথরুমে ঢুকে যায় নীচে নেমে এসে। থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রিমা। এমন সময় বাইরে যেন কার গলা শোনা যায়। নীচে নামে। বাইরের বারান্দায় আসে। পিওন দাঁড়িয়ে। পোস্ট অফিসের

পিওন একটা রেজিস্টারি খাম এগিয়ে দেয় চন্দ্রিমার সামনে। ছোট হলুদ খাম। সই করে অ্যাকনলেজমেন্টে। খাম খোলে, চিঠি।

ভবানীপুরের বাড়ি থেকে লিখেছে। চন্দ্রিমার কাকার মেয়ে পুতুল। এম. এ. পাশ করেছে চন্দ্রিমা। কলকাতায় এসে সে মার্কসসীট নিয়ে যেতে পারে। যেন দেরি না করে। ছোট চিঠি। রেজাল্ট কেমন হয়েছে, পুতুল সে কথা লেখেনি। পরীক্ষার ফলের খবর হাতে পেয়েও মন ভরে না চন্দ্রিমার। আনন্দ হয় না তেমন। এই আনন্দের সংবাদ কারুকে বলতেও ইচ্ছে করে না। চন্দ্রিমার মন রাহুলের কথায় কেমন বিষাদে ভরে যায়। বুলবন তাকে ভয় পায়, আপন মনে থাকে, সম্বন্ধ শুকিয়ে যায়, এ যদি সত্য হয়—তা হলে কোথায় সে ভুল করল! সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছে বুলবন, কেন এমন হল! সত্যিই তো, সে কথা জানতে পারল না কেন সে? প্রাণদার হাতে 'আজান' পত্রিকা পৌঁছে দিয়ে সে কি তবে ভুল করেছে! প্রাণদা বুলবনকে কী কথা বলবেন! বুলবন কি পার্টির কাছেও হেয় প্রতিপন্ন হবে? হিফাজত কি বুলবনকে এমনই তীব্র অপমান করেছেন যে, বুলবন বেসামাল হয়ে সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছে! কী হয়েছে বুলবনের ভিতর?

ভাবতে ভাবতে ঘরের চৌকির উপর অবসন্নের মত বসে পড়ল চন্দ্রিমা। বিকেলে সামনে দিয়ে রাহুল গম্ভীর হয়ে রওনা দিল কোথায়, বলে গেল না।

টেবিলের ওদিকের চেয়ারে পার্টি অফিসের ছোট ঘরটিতে একাকী বসেছিল আদিত্য সিংহ। বুলবন বেঞ্চের প্রান্তে টেবিলেরই নিকটবর্তী একা। কোনও কথা না বলে 'আজান' পত্রিকার কপিটা টেবিলের উপর রেখে আদিত্য বলল—পড়ে দেখুন! চন্দ্রিমা সংগ্রহ করে এনেছে।

এই দুটি প্রাণী ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। 'বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরি' শিরোনাম দেখে বুলবন শিউরে উঠল। পড়তে পড়তে তার মুখ কালো হয়ে গেল। পড়া শেষ করে আরক্ত মুখটা তুলল বুলবন। ক্রোধে আর ঘৃণায় তার মুখ দিয়ে কোন কথা বার হতে চাইল না।

আদিত্য বলল—আমাদের চরিত্র হনন করবার জন্য সবারই খুব উদ্যোগ দেখতে পাই। পত্রিকার রিপোর্টি দুই পক্ষকেই যথারীতি আক্রমণ করেছে।

"একজন বামপন্থী নেতৃস্থানীয় কমরেড বিবাহের সার্টিফিকেট দর্শাইয়া চাকুরি চাইবে তাহা দেখিয়া রঙ্গভূমি ভারতবর্ষকে আশ্চর্য দেশ বলিয়া মনে হলেও, চাকুরির জন্য মানুষ কী না পারে!"

পড়তে পড়তে কেঁপে উঠল বুলবন। হিফাজত ডাক্তারের বাহির প্রাঙ্গনের দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠল। গোবরের ডাঁইতে ডালি থেকে প্রক্ষিপ্ত গোবরের ছড়ছড় শব্দ, বুলেট মোটর বাইকের গাঁ গাঁ শব্দ কানে আসে। ললিতের রক্তচক্ষু ভাসে।

—না, এ ভুল! মিথ্যে কথা। কাঁপা স্বরে বুলবন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

—আপনি সার্টিফিকেট শো করেছেন! আপনি কি বুঝতে পারেননি কিছু! আদিত্য শান্তস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে।

—আপনার বিয়ের সার্টিফিকেট আপনি শো করতেই পারেন। কিন্তু চন্দ্রিমার কনসেন্ট দরকার ছিল। বলল আদিত্য সিংহ। এবং বলে ওঠে—কমিটি তলে তলে লোক ঠিক করে রেখেছে চাকরি দেবে বলে, আপনি কি জানতেন!

—না।

—তা হলে দেখুন, কমিটির সেক্রেটারিকে আপনি চেনেন না। ওদের আপনি কখনও

চিনতেই পারবেন না। আপনার কলেজ ইউনিভার্সিটির বিদ্যে দিয়ে এদের কোন কিছু ব্যাখ্যা করতেও পারবেন না। এদের ফাঁদে পা দিলেন কেন আপনি! আপনি চন্দ্রিমার কাছেও খুব ছোট হয়ে গেছেন!

—অ্যাঁ! অস্পষ্ট একটা বোধ বুকের তল থেকে প্রশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসে বুলবনের মুখে। সব দিশেই যেন হারিয়ে ফেলেছে বুলবন। কী বলবে বুঝে পাচ্ছে না। বুলবন বলল—আমি বুঝিনি, বুঝতে পারি না! আমি কী বোকা!

আদিত্য বলল—কিন্তু এই সারল্য তো এ সংসারে অচল! আপনি একজন নেতা, আপনার এই সরল বুদ্ধিকে কেউ তো বিশ্বাস করবে না! 'আজান' পত্রিকা লিখেছে, পার্টি অফিসের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিকৃতির সামনে আপনাদের জুলুয়া অর্থাৎ শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান হয়েছে। এ একপ্রকার সত্য। প্রতিকৃতির সামনে হয়নি বটে, কিন্তু রাজ্যনেতা কমলদা সেদিন উপস্থিত ছিলেন। আপনাদের বিয়ের সিগনিফিক্যান্স আলাদা, এর মর্যাদা স্বতন্ত্র!

—আমি জানি। কিন্তু আপনিও কি আমাকে বিশ্বাস করবেন না?

—কেন করব না! আপনার এবং চন্দ্রিমার সম্বন্ধ একটা পরীক্ষা জানবেন। শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি, শ্রীকান্ত আর রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধ কী উচ্চ মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কু রাজলক্ষ্মীর সন্তান, রক্তের সম্বন্ধে নয়, রাজলক্ষ্মী সৎ-মা। এথিক্যালি সে মা। এই বঙ্কুই শ্রীকান্তের সঙ্গে তার মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজলক্ষ্মীর এথিক্যাল মাতৃত্ব এমনই একটা স্তরে রয়েছে যে তার প্রেম শ্রীকান্তের সমস্ত সত্তার তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও বিয়ের পরিণামের দিকে অগ্রসর হতে পারছে না। বিয়ে করলে প্রত্যক্ষত বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু বিয়ে করে সে তার মাতৃত্বকে খাটো করতে পারবে না। একদিকে নৈতিক মাতৃত্বের নারীমন, অপর দিকে তার প্রেমাস্পদের প্রতি নিবিড়তম আকর্ষণ তাকে ছিন্নভিন্ন করেছে, আর এই অবস্থায় শ্রীকান্ত তার সমস্ত বাসনা সমস্ত আশ্রয়, যা ওই নারীর মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে, সব রইল পিছনে, ফিরে যেতে হচ্ছে তাকে—এই সংবরণ দেখবার মত। প্রেমের এই মর্যাদা একটা দৃষ্টান্ত বিশেষ।

শুনতে শুনতে কোমর সিধে করে বসল বুলবন। বলল—আর কেন লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে! শ্রীকান্তও খুব সরল ছিলেন কমরেড। তিনি সমগ্র জীবন বড় প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য পালিয়ে ফিরেছেন। আমি অত মহৎ নই আদিত্যবাবু। চন্দ্রিমার মানসম্মান পার্টিই রক্ষা করবে। তার প্রেমকে খাটো করার সাধ্য আমার নেই। তার শুভদৃষ্টির কথা মনে আছে। মনে থাকবেও সারাজীবন। চলি। তবে বিশ্বাস হারালে মর্যাদার প্রশ্ন অবান্তর। এই পত্রিকাটি আপনার হাতে তুলে দেওয়ার আগে সে আমায় দেখাতে পারত। আমি প্রেমকে শো করাবার মত আহাম্মক নই আদিত্যবাবু। সার্টিফিকেট আমি কোথাও দেখাইনি। এ ভুল, মিথ্যা রিপোর্ট। চলি।

বলে কাঁধের ব্যাগটা কাঁধে গলাতে গলাতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল বুলবন। মুহূর্তে পুরু লেন্সের আড়ালে দৃপ্ত চোখ দুটি পরম এক ব্যাথায় ভরে উঠল আদিত্যর। হাত বাড়িয়ে বুলবনকে ধরে ফেলল সে।

—কমরেড, প্লিজ! আপনি একটু বসুন! কোথাও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে আমাদের! বলে আদিত্য সুনিবিড় মমতায় বুলবনের হাতটিকে এবার নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

বুলবন দাঁড়িয়ে থেকেই বলে—এই অবিশ্বাস কেন আসে বলতে পারেন? জুলুয়া জিনিসটা খুব সুন্দর। খুব সংকোচ, দ্বিধাজড়িত চোখ, কত আশঙ্কা এবং কত তৃষ্ণা, তাই না?

—কী বলছেন আপনি ?

—হ্যাঁ। এই দ্বিধা কখনও কি ঘুচবে আমার ! চন্দ্রিমার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারব তো ?

—সেকি ! প্লিজ, এমন বলবেন না !

—হ্যাঁ, আদিত্যবাবু ! আমাকে এখন যেতে দিন ! পরে আসব। আমি সদরঘাটে কাজ শুরু করেছি। শিগগির এলাকাটি জেগে উঠবে। সমস্ত রিপোর্ট আমি টাইম টু টাইম জানিয়ে যাব। তবে একটি কথা, রাহুলের প্রতিটা দিন বড় সাংঘাতিক। সে পাগলের মত ধেয়ে চলেছে, তার কাছে বিশ্বাস বা আস্থা অর্জনের ক্ষমতাও চন্দ্রিমার নেই। প্রসেস মেকস এ ম্যান। কিন্তু এখন যদি দেখা যায় প্রসেস মেকস এ মেশিন, তা হলে ? মেসিন কান্ট কনভিন্স এনিবডি। তাই না ! সমিরমামাকে বোঝানো যায়, কিন্তু রাহুল কি অত সহজ ?

বুলবনের কথা শুনতে শুনতে আদিত্য দেখল এ অত্যন্ত ভুল ট্রিটমেন্ট হয়েছে। চন্দ্রিমা এবং বুলবনের সম্বন্ধ খুবই জটিল আকার ধারণ করেছে। বুলবনের তিক্ত ভাষাটি খুব অসুন্দর হয়ে যাচ্ছে, সে এখন পার্টিকেই আক্রমণ করে বসেছে। এমনই হয়, ভুল করে মানুষ। আদিত্য সহিষ্ণুস্বরেই আসল কথাটি বলবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

—রাহুলকে আপনিই কনভিন্স করবেন, উইথ ফুল রেভলিউশনারি স্পিরিট অ্যান্ড টেস্ট ! উইথ উওর সিমপ্লিসিটি। আপনার রুচির উপর আমাদের আস্থা আছে। আমি আপনাকে মোটেও ভুল বুঝিনি। আপনি এত কঠিন হয়ে যাচ্ছেন কেন ?

রাস্তায় নেমে রিকশায় চড়ে চলতে চলতে বুলবনের মনে হল, আদিত্য তাকে ঠাট্টা করল কোনও ! রেভলিউশনারি টেস্ট, সিমপ্লিসিটি বলাটা কি মেসিন বলার সূক্ষ্ম ভদ্র প্রতিবাদ ! তার সারল্য, তার রুচি কি সন্দেহজনক ? এ ভাবে বুলবনের মনটি ক্রমশ বাঁকা হয়ে ওঠে। আবার মনে হয় আদিত্য নিষ্করুণ ঠাট্টা করার লোক নয়। না। নয়।

ডোমকল লাইনের ত্যানাচুরার কালভার্টের কাছে রাহুল পৌঁছায় ঠিক পাঁচটায়—আগে নয়, পরেও নয়। বুলবনের রিকশা এগিয়ে চলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে। রাহুল দেখে বিশ্বরঞ্জনের চোখে কালো চশমা।

॥ ১৮ ॥

মুমতাজ আলির একটি চোখ নেই, কিন্তু দৃশ্যত তার চোখটি আছে। কুপির আলোয় সেই চোখটির দিকে কয়েকবার চেয়ে চেয়ে দেখে নেয় রাহুল। আকৃতিগত বিচারে, দৃশ্যে এটি চোখ, দৃষ্টির অন্ধত্বে এটি চোখ নয়।

অবাক লাগল, মুমতাজ বয়স্ক ব্যক্তি নয়, রাহুলেরই মত উত্তীর্ণ-কৈশোর, কিন্তু কিছু বয়স্ক এক প্রত্যয়বান, দৃঢ় থুতনি, ধারালো যুবা। মুমতাজ বলল—প্রথমেই বলে রাখি, আমরা কিন্তু দু'জনই দু'জনকে 'তুমি' করে বলব। আপনি আজ্ঞে করার সময় আমাদের হাতে নেই। সব ব্যাপারেই আমরা সময়কে ত্বরান্বিত করতে পারি। আচ্ছা, ত্বরান্বিত শব্দটা কেমন ! যেমন সাধু তেমনি স্বাদু। জানো নিশ্চয়, ভাষার কোন শ্রেণী-চরিত্র হয় না।

—হয় না ?

—না।

—কেন ?

—ছোটলোকের ভাষা বলে কিছু নেই। ওটা উপরতলার লোকরা বানিয়ে প্রচার করে। আর উপরতলার মুখ খুব খারাপ। এত খারাপ যে তুমি ভাবতে পার না ! তাদের মেয়েরা পর্যন্ত মুখ করে। মাঝে মাঝে তাহারা ইংরাজি ভাষা সহযোগে সেক্স চর্চা করিয়া থাকে, উহা তাহাদের বিশেষ সংস্কৃতি। ভাষার শ্রেণী-চরিত্র না থাকলেও, সংস্কৃতির শ্রেণী-চরিত্র আছে। সংস্কৃতি ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দ্যাখো, এ খুব জ্ঞানের কথা হয়ে গেল কিন্তু। যদিও এই জ্ঞান কোন বাহুল্য নয়।

বলেই উচ্চকিত শব্দে মুমতাজ হা হা করে হাসতে লাগল। মেঝেয় একটি শীতলপাটি পাতা, একখানা সাদা লেপ, দু'টি ছোট ছোট বালিশ। সমস্ত ঘরে দ্বিতীয় আর কোন আসবাব নেই। ভীষণ সাদা দেওয়াল, কবরের মত খাড়া, সিলিং অনেক উচ্চে। রাহুলের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। রাত দশটা বেজে গিয়েছে, এতক্ষণ পর্যন্ত কোনও খাবার আসেনি। খালি লাল চা আর দু'চারটি ঠাণ্ডা ক্যাঁট ফুলুরি এসেছে, বেশ কয়েকবার।

চায়ে একটা সটান সশব্দ চুমুক দিয়ে মুমতাজ বলল—ভুল বলেছি তোমাকে, ছোটলোকের ভাষা বলে একটা জিনিস হয় বোধ হয়, নইলে ন্যালা মরল কেন ? যদি বল ভাষার দোষ, তাহলে বলব সেটা তার ভাগ্যেরও দোষ। ভাল ভাষায় কথা বলতে কোন্ ছোটলোকেরই না ইচ্ছে হয় বল ! সাধ্যে কুলোয় না। 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা', রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা অতি চমৎকার ! রবীন্দ্রনাথ এই ন্যালাদের মুখেই ভাষা জোগাবার কথা বলেছিলেন বোধ হয়। কিন্তু সেই ভাষা দিয়ে ন্যালার জীবন বাঁচত বলে মনে হয় না।

—কেন ? ... আচ্ছা, ঠিক আছে ! বলে রাহুল তার বিস্ময়াবেগ দমন করল। শুধু তাইতেই প্রখর বুদ্ধিমান মুমতাজ রাহুলের রবীন্দ্র-প্রীতির গন্ধ পেয়ে গেল। ঠোঁট টিপে একটু একটু হাসতে হাসতে মুমতাজ ইচ্ছে করেই রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল—তুমি আছগর আলি ছড়াদারের ছড়া শুনেছ ? ও আমার কাছে আসে। ওকে আমি ন্যালার কাহিনী কবিতায় লিখতে বলেছি, গাইবার জন্যে। হরবোলার খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি কি শুনছ না ? চা খাও।

—হ্যাঁ !

—তুমি কি রবীন্দ্র-ভক্ত ?

—কী করে বলি এখন ? বলে রাহুল হেসে উঠল।

—তোমার অনেক দ্বিধা, তাই না ?

—হ্যাঁ, অনেক।

—মরতে ভয় পাও ?

—না। একদম নয়। সেটা যত ত্বরান্বিত হয় ততই সুন্দর। তবে পাখির পালকের মত হালকা মৃত্যুর কথা কে ভাবে ! পাহাড়ের মত ভারি একটা মৃত্যু নিশ্চয়ই কামনা করি।

—সাদা চৌধুরীর মৃত্যু হলে, সেটা শত্রুদেরও পাহাড়ের মত ভারি ঠেকবে।

—কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরিকল্পনাটা আমরা জানি না, তিনি কী চান ! এমনকি তাঁর নামে স্লোগান দেওয়া পর্যন্ত উচিত নয়। আমি ডাক্তারদাকে সেকথা বলতে চাই তাজ।

—ঠিক আছে, চা খাও !

দুইজনই চুপচাপ চা খেতে থাকে। শব্দ হয়। রাত্রি গভীর নির্জন বলে চা খাওয়ার

শব্দ প্রকট শোনায়।

—তোমার খিদে পেয়েছে! বলল মুমতাজ।

রাহুল উত্তর করল না।

মুমতাজ ফের বলল—খাবার পেতে পারি, না-ও পারি। বরাতের উপর নির্ভর করছে। আমি পরান্নজীবী, আমার রোজগার নেই। পাড়ার একটি বউ আর আমার এক ভাবী আমাকে চুপিচুপি খেতে দেয়। লুকিয়ে।

হঠাৎ কার পেটের নাড়ী যেন কলকল করে ডেকে উঠল।

মুমতাজ সহাস্য মুখে বলল—আমার না তোমার ?

রাহুল বলল—তুমি তো ভারি আশ্চর্য! পেট ডাকছে আর তুমি হাসছ!

একথা শুনে মুমতাজ আরও জোরে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গেল।

—হাসি দিয়ে খিদে দমন করা যায় না। রাহুল মন্তব্য করে।

—যায়। বলে ওঠে মুমতাজ। এবং হাসি থামিয়ে বলে—আর একটু চা খাও।

—এইভাবে মারবে!

—উপায় নেই। তন কি হাবস মন কো গুনাহ্‌গার বনা দেতী হ্যায়/ভুখ ইনসান কো গদ্দার বনা দেতী হ্যায়।

—মানে ?

—লালসা মানুষকে গুনাহ্‌গার করে, কিন্তু পেটের খিদে বিদ্রোহী করে। দু'টোই ক্ষুধা। কিন্তু দু'টির অভিব্যক্তি আলাদা। বর্শামুখ ভিন্ন। চৈতন্য স্বতন্ত্র।

—আচ্ছা! অবশ্যই।

—হ্যাঁ, রাহুল। তো, মৃত্যুর কথা হচ্ছিল এখন ; রবীন্দ্রনাথের কথা! মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। মৃত্যুরও একটা মাদকতা আছে। আহ্লাদ আছে। 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে।' জেলে, রাস্তার উপর, ময়দানে। এই মৃত্যু দিয়েই মারতে পারি। মৃত্যু, মৃত্যু! মৃত্যুর এক পরম্পরা চলেছে। আশ্চর্য আহ্লাদিত মৃত্যুর বেগবান স্রোত। মৃত্যু এক চরম উত্তেজনা, মহত্তম আবেগ। নাড়ী যে ডেকে উঠছে, তাই দিয়ে তুমি ন্যালাকে উপলব্ধি করতে পারবে, তার বাপ কদম আলিকে বুঝতে পারবে। আগে তোমার নাড়ী কখনও ডেকেছে ?

—না।

—ডাকেনি ?

—না।

—তোমার নাড়ীই ডাকছে তাহলে! বলে আবার হাসতে লাগল মুমতাজ। সীমাহারা বিস্ময় এবং মুগ্ধতার দৃষ্টি মুমতাজের চোখের উপর নিবন্ধ করে রাহুল।

—তুমি কি পাগল! বলে ওঠে রাহুল পারভেজ।

মুমতাজের হাসি আরও বিহ্বল হয়ে কণ্ঠে চারিয়ে যায়। হঠাৎ হাসিরই ভেতর মুমতাজ জিগ্যেস করে—তুমি প্রেম করেছ! লভ। ভালবাসা! প্রণয়! করনি!

রাহুল এমন এক ভঙ্গিমায় মাথা নাড়ল যে, তার অর্থ হ্যাঁ অথবা না, দুইই হয়।

মুমতাজ বলল—করেছ।

রাহুল চুপ করে রইল। সে ভাবছিল নাড়ীর ভিতরে ক্ষুধার জল কাটছে, আসলে দু'জনের পেটেই খিদের নখর আঁচড়ে চলেছে। কখন কার ধমনী চিৎকার করছে দু'জনই

তারা বুঝতে পারছে না।

—আমার বাবা হেকিম। দরবেশ মানুষ। তোমার বাপুকে এক কঠিন ব্যধির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই থেকে দু'জনের বন্ধুত্ব। বলে মুমতাজ।

—বাপুর তো বাঁচার আশা ছিল না। আসল নামে দু'জনেরই মিল। একই নাম। সেই জন্যে আমরা দু'জন মিতপো। বলল রাহুল।

—হ্যাঁ।

—তোমার জন্যেই আজ বাপুর প্রাণ বিপন্ন, কিন্তু বাপু একবারও সেকথা মুখে উচ্চারণ করেননি। বরং বারবার বলেছেন, মুমতাজ আলিকে ব'লো, ও যেন সাবধান হয়। বাপু বোধ হয় তোমার রাজনীতিটা আঁচ করতে পেরেছেন। কোনও কোনও মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধ খুব তীব্র হয়।

—বাপের সম্পর্কে তোমার ভক্তিসম্মান খুব উচ্চ। এই গুণটিকে আমি শ্রদ্ধা করি রাহুল। বাপুর সম্মানকে তুমি কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ করতে চাও না। বাপকে তুমি সব সময় আলাদা করে রাখতে চাও।

—চাই এই জন্যে যে, বাপু যা করেছেন, সবই কৃতজ্ঞতা বশে করেছেন। তুমি যে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, থেকেছ, বাপু থানায় সেকথা অস্বীকার করেননি, এমনকি বলেছেন, তাঁর অনেক ঘাট হয়েছে। ঘাট হয়েছে, কিন্তু তাঁর উপায় ছিল না, কারণ বোধ হয় তাই যে, তোমার হেকিম বাপটি চৌধুরীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, অতএব শিকদারের ছেলেকে রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। বাবার সেই কণ্ঠস্বর, সেই অসহায়তা আমিই কেবল দেখেছি। ফলে...

মুমতাজ আশ্চর্য হয়ে সমস্ত কথা শুনছিল। রাহুল বলতে বলতে থেমে পড়েছে। রাহুলের ক্রমাগত এক ধরনের ভাবোদয় হচ্ছে মনের প্রদেশে, মনে হচ্ছে, মুমতাজকে সে কিছুই বোঝাতে পারল না। তার কুণ্ঠাও হচ্ছে, নিজের পিতা সম্পর্কে এরকম করে বলতে। অথচ সে বলতেও চাইছে।

মুমতাজ মেঝের উপর কাপটা রাখে। মাথা নীচু করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তাপর মুখ তোলে। পেট কলকল করে উঠতেই এবার তার দেহটা কেমন চমকে নড়ে উঠল। দেখে খুব মায়া জাগে রাহুলের। দাঁতে দাঁত চেপে এ এক মস্ত জৈব লড়াই সে চালাচ্ছে, কতদিন কে জানে! তবু মুখের হাসি সমান অটুট।

মুমতাজ শান্তস্বরে বলল—বুঝতে পারছি, তুমি চাও না, সাদা চৌধুরীর নামটা আমাদের কাজের মধ্যে জড়িয়ে যাক। তাই না?

রাহুল বলল— না, তা-ও নয়। জড়াবে কি জড়াবে না, তা কাজের পদ্ধতি অনুযায়ী স্থির হবে। কতটা জড়াবে না জড়াবে তারও মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ওইভাবে পোস্টার দেওয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া বাপু কী চান আমরা জানি না। তাঁর কৃতজ্ঞতার স্বরূপটা তুমি বুঝতে পারছ না। আমি তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি।

রাহুলের কথার বাঁধুনি দেখে মুমতাজ বিস্মিত এবং খুশি হয়। রাহুল অতঃপর মণির ডেঙ্গু জ্বরের প্রসঙ্গ তোলে এবং বলে—মণির ধারণা অমিই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এই ধারণাটা জন্মে গেলে আমরা কী করতে পারি! বাপুর হয়েছে তাই! বাবার মনের সেই অবস্থাটা তোমাকে বুঝতে হবে তাজ! বাপু গান্ধীবাদী লোক। সঠিক জানি, তিনি হিংসার রাজনীতি পছন্দ করেন না। এমনকি তুমি শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবে যে, বাপু নাটা তরফদারের সঙ্গে কোনও ধরনের বিরোধে যেতে চাইবেন না।

মুমতাজ এবার গম্ভীর স্বরে বলল—তাই বলে আমরা সাদা চৌধুরীর নামটা আমাদের কাজে ব্যবহার করব না, তাই যদি সিদ্ধান্ত করি, তাহলে আমাদের এখন পিছিয়ে আসতে হয়।

—না।

—না, কেন ! তাই হতে হয়। ঠিক আছে, কাল ভোরে ডাক্তারদার সঙ্গে কথা হবে। আমরা চাইলেই এখন পিছিয়ে আসতে পারি না রাহুল। মনে রাখবে, শশাঙ্কর হিংসাকে সাদা চৌধুরী বরদাস্ত করেননি। এটাও তাঁরই মন, যে-মন খুব কৃতজ্ঞ !

—কিন্তু বাপু, প্রতিহিংসাও পছন্দ করেন না।

—সেই হিংসা যদি মহৎ হয় !

—বাপুর বিচারে, কোন হিংসাই মহৎ নয়। আমি বাপুকে চিনি।

মুমতাজ এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—তোমার বাপুটি, শুধু তোমারই বাপু নয় রাহুল ! ন্যালার ওই মৃত্যু চোখের সামনে দেখলে সাদা চৌধুরীর মনে হিংসার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও আস্থা তৈরি হত কিনা আমর জানি না। গান্ধীজীর চোখেরই ওপর তাঁর সাধের অহিংস ভারতবর্ষ একদিন হিংসার সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি অহিংসার মন্ত্র দিয়ে দাঙ্গার বীভৎসতা রুখতে পারেননি। চৌরিচৌরার ব্রিটিশ-পীড়ন আর সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখেও তিনি চুপ করে ছিলেন। তাঁর কি সেদিন মনে হয়নি, অহিংসা অক্ষমের অহংকার ! তাঁর অহিংস নীরবতা একদিন ইতিহাসে হিংসাকেই প্রশ্রয় দিয়ে গেছে।

—ও কথা থাক।

—থাক তবে। কিন্তু বাপু সম্পর্কে তুমি একা সিদ্ধান্ত করতে পার না।

—আমি সেই চেষ্টাও করিনি তাজ। তুমি আমাকে ভুল বুঝছ ! বাপু এমারজেন্সিতে আটক হয়েছেন। কালো আইন, ভারতরক্ষা আইন, কোনও আইনই এই দেশে অহিংস হয় না। এমারজেন্সি আমার বাপুর এক কানাকড়ি উপকার করেনি। কিন্তু বাপু জ্ঞানত তোমার রাজনীতির সমর্থক নন।

—কিন্তু ললিতমোহন তাঁকে তাই বানিয়েছে। তুমি আমার রাজনীতিকে সমর্থন করেছ মন তোমার ক্ষুব্ধ হয়েছে বলে।

—না, শুধু তাই নয় তাজ। আমি হিংসা দেখেছি, আমি তাই তোমার মহৎ প্রতিহিংসা সমর্থন করি। হিংসা নীতিসম্মত বলেই করি। সোভানের মৃত্যু ফুলভানুর মধ্যে বেঁচে আছে। ন্যালার মৃত্যু হাওয়ার বুকে স্থির হয়ে আছে। ইকবালের পঙ্গু পায়ে আঘাত করেছে শশাঙ্ক, সেই হিংসাও বুঝি। কিন্তু আমি এক, বাপু যে ভিন্ন, সেকথা গুলিয়ে ফেলে আমি তোমার পলিটিক্স সাপোর্ট করি না। তুমি যেকোন ভাবে কাজকে ত্বরান্বিত করতে চাও, এখানে আমার আপত্তি আছে। তুমি বন্দুকটা কার কাঁধের উপর রেখে এসেছ, তুমি সেকথাও জান না।

মুমতাজ অতিশয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল—আমি যথাস্থানেই রেখে এসেছি। আমার হিংসা লক্ষচ্যুত হবে না।

—এ তোমার প্রফেসি হয়ে গেল। তুমি আনতে পারনি বলেই বন্দুকটা ফেলে এসেছ, কাউকে দিয়ে আসনি।

মুমতাজ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—ঠিক আছে। পোস্টার স্লোগান বন্ধ করে দাও। কাল ভোরে ডাক্তারদার সঙ্গে কথা বলব আমরা। এখন এসো !

রাহুলের হাত ধরে বাইরে টেনে আনে মুমতাজ আলি। বলে—আমার নাম তাজ। মুমতাজ কেউ বলে না। দাদিমার দেওয়া নাম। দাদিমা বলতেন, তাজ মরদ বাজ ঘুসড়ু মরদ ফুসড়ু। এই যে নাতি আমার, এই যে পোতা আমার, তুমি হলে বাপু বাজ। বজ্র। মানুষটি কেমন হবে তুমি ! বাজের মতন হবে। হাঃ হাঃ হাঃ !

উঠোনে দাঁড়িয়ে তাজ হাসতে লাগল। তারপর আবার ডাকল—এসো !

ওরা পায়ে পায়ে এসে পৌঁছাল একটি রাত-জাগা চায়ের দোকানের সামনে। একটি কামিনী, একটি কৃষ্ণবকুল, একটি কদমগাছ পেরিয়ে এই দোকান। মাটির উপর দেড় বিঘত উঁচু টানা বাঁশমাচায় বসল ওরা।

—তোমাকে ডাক্তারদা বাস থেকে কোথায় নামিয়ে দিলেন, মনে আছে ?

—চুনাখালির মোড়ে।

—তারপর কী করলে ?

—একজন রিকশাঅলাকে বললাম আমি হাতিনগর যাব। তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে ভাত-ঘুমের রাত হব হব করছে। আটটা বেজে গেছে, চারিদিকে কুয়াশা। চাঁদ আছে আধখানা। কিন্তু সব কেমন ঝাপসা। রিকশাঅলাকে তোমার নাম বলতেই ও বললে, আপনি রাহুল !

—হ্যাঁ, তোমাকে সুলতান চেনে, গোয়াসের লোক। তাছাড়া রিকশাঅলাদের আরও অনেকেই আমাদের ওয়ার্কার।

রাহুলের মনে পড়ল, মণি যেদিন তার মেসে বহরমপুর এসেছিল এবং জেলের প্রাচীরে ইট ছুঁড়ে মারতে মারতে উত্তেজিত হয়ে পড়ায় এক পেয়াদার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধল, সেদিন এই সুলতান তাদের বাসস্ট্যান্ড পৌঁছে দেয়। সেকথা তাজকে শোনায় রাহুল।

মুমতাজ বলে—ঠিকই, সুলতান আমাদের কুরিয়ার, গোপন সংবাদ সরবরাহ করে। আরও অনেকে আছে। কাশিমবাজার পর্যন্ত ওদের যাতায়াত আছে। ওই যে পাকা দোতলা দালান দেখছ, ওর মালিক চাহরাম খাঁ, টেকনেম কানাই, গেরস্ত। ব্যাঞ্জো বাদক। মণি মাঝে দু'একবার এখানে এসেছে।

—মণি এসেছে !

—কেন, আসতে পারে না ! কানাই চাচার বউকে বলেছি চার ছ'খানা রুটি দিতে, উনি আমার ভাণ্ডার, টাকা পয়সাও নিই। আশা করছি, রাতে ঠিক খেতে পাব। বলে আবার স্বল্প করে হাসল মুমতাজ। তারপর দোকানদারকে উদ্দেশ্য করল—আমার মেহমান ফুলচাচা ! চা দাও। দেখে রাখ, এর নাম পারভেজ ! আসল নাম সত্যসুন্দর সিংহি, মাহেষ্য, সত্য বলে ডেকো।

—তালে সোন্দর বলেই ডাকব, সেইডে সলগ হয়। বলে কুপির ঢিমে আলোয় ফুলচাচা দাঁত বার করল একটুখানি। কালো মানুষ, অদ্ভুত দেখালো।

—সহজকে চাচা ফিরা সলগ কহে। বলে মুমতাজ হেসে ওঠে সুন্দর কণ্ঠে। এবং সে স্ফূর্তস্বরে বলে—তোমার সেই রবিঠাকুরের পদটা শোনাও তো ফুলচাচা ! সত্যসুন্দর শুনতে চাইছে !

এবার চাচা হ অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে অনেকক্ষণ আয়েস করে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে কাপ ধোয়। ছাকনি নাচিয়ে র-লাল চা ঢালে। হাসি তখনও ফুরায় না। ঘন কালো মানুষ, কুপি জ্বেলে বসে আছে। খদ্দের নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে, এই চা খাওয়ার লোক কোথাও আছে।

ফুলচাচা পদ বলে :

সলগ কথা যায় না কহা সলগে

সলগ কথা বুলতে মোকে কহ যে !

—শুনলে রাহুল ! বলে মাচায় উপবিষ্ট পার্শ্বস্থ রাহুলকে দেখে মুমতাজ। রাহুলের চোখ কুপির আলোয় চকচক করে ওঠে।

—সলগ কথাটি তবে বল শুনি !

—ইনকেলাব !

—কিন্তু সলগে কহা যায় না কেন ?

—মাছি লাগে, বিশ্বাসঘাত হয়। শোধনবাদ ঢুকে পড়ে। সলগ কথা, কিন্তু সড়ক যে সিধা লয় খোকা ! ডাইনে সাপা বাঁয়ে শৃগাল ধীরে চালাও পা।

—হ্যাঁ।... আর ? চাচা কিন্তু ডান আর বাম-বিচ্যুতির কথা বলছে রাহুল !

—ও ! রাহুল পরম বিস্মিত হয়।

ফুলচাচা বলে—ডাইনে সাপা বাঁয়ে শৃগাল

ধীরে চাল্লাও পা,

ও রে মা সারেভান—

খোকন কেন রণে যায় না।

বলতে বলতে বার তিনচার হাত দিয়ে আপন বুকে আঘাত করে জারি গানের সুরে।

—রণে যায় না কেন ফুলবাপ ?

—যায় না ক্যানে ! জয়নালের রণ বাবা, বিষাদ-সিন্ধু ! কারবালার রণ কিনা ! যায় না বুলেও যাতে হয়। মা কান্দে, বাপ কান্দে, যোবতী মাগ কান্দে, সুনার সংসার কান্দে। সব রণে সিমার থাকে, এজিদ থাকে। জ্ঞাতি লড়াই থাকে। কমুনিস্ট যে কমুনিস্ট নিধন করে। দানশা ফকিরের অভাব নাই দ্যাশে। এই দ্যাশ-দিগরেই মিরণ জন্মায়। ললিতের পার্টি চাকরির লোভ দেখিয়ে মিরণ পয়দা করে। আর দানশা ফকিরের কেচ্ছা সোন্দর বাপটির কি জানা নাই ?

বলতে বলতে ফুলচাচা রাহুলের দিকে বাষ্প-সংকুল উষ্ণ কাপটি এগিয়ে দেয়। তারপর বলে—মায়ের মুখটি মুনে হয়। খোকা রণে ভঙ্গ দেয়।

দ্বিতীয় কাপটি এগিয়ে ধরে ফুলচাচা। হাত বাড়ায় মুমতাজ।

চাচা বলে যায়—সোন্দর বউডারে মুনে পড়ে। খোকা রণে ভঙ্গ দেয়। বাপডারে এই বুড়াকালে কুথা ফেললাম, রণ ভঙ্গ হয়ে যায়। ওই অমুক যোবতীর সাথে আশনাই, আর তবে রণ নাই।

—আর ? বলতে বলতেই চায়ে চুমচুক দেয় মুমতাজ আলি।

—আর ? সলগ কথা যায় না কহা সলগে বাপজি। কাল ছিল বিল খালি, আজ জলে যায় ভরে। জুয়ার আসবে বাপ।

রাহুল বলে উঠল—ওহো, বুঝেছি ! কাল ছিল ডাল খালি/আজ ফুলে যায় ভরে।

—হ্যাঁ ! বলে ফুলচাচা সাদা দাঁত আবছা আলোয় বিকশিত করে। শীর্ণ কালো মানুষটির হাসি দেখে রাহুলের এখন মণির মুখটা মনে পড়ে যায়। এখানে মণি আসে। তারই কাঁধের উপর বন্দুকটা আছে। ব্যাঞ্জোবাদক চাহারামের সঙ্গে কি মণির সদ্ভাব হয়েছে ! একটি জারিগানের সংকেতে দক্ষিণ আর বাম-বিচ্যুতির প্রসঙ্গ রাহুলকে অবাক করে দেয়। কানে বাজতে থাকে, 'ডাইনে সাপা বাঁয়ে শৃগাল ধীরে চালাও পা।'

চা খেয়ে বাড়ির দিকে পা ফেলতে গিয়ে চমৎকার এক আবেগ যেন রাহুলকে পাখির পালকের মত হালকা করে তুলেছে। সে যেন ভেসে যাচ্ছে। বাপুর মুখটা মনে পড়ছে, তাই বলে কি সে রণে ভঙ্গ দিতে পারে ! তার নাম কী করে যে সত্যসুন্দর হয়ে যায়, সে যে আর বুঝতেই পারছে না।

রাহুল, সিহি পদবী এই প্রথম শুনল। মুমতাজের বলার কায়দাটিও চমৎকার, সিহি যে মাহেষ্য কিনা কে জানে, তবে রাহুল মুমতাজের প্রত্যয়পূর্ণ অর্থহীন জাতিবাদী উচ্চারণে সচকিত হয়েছে। মুমতাজ নিশ্চয়ই কোনওই কেতাবী ধর্মে বিশ্বাস করে না। কোনও আসমানী ধর্মে তার কোনও বিপুল আগ্রহ নেই।

রাহুল তথাপি বলল—আমাকে সিহি বলবার মানে কী !

মুমতাজ বিস্ময়মুগ্ধ তরল কণ্ঠে বলল—ওহো ! তুমি দেখছি বর্ণগোত্রে খুব উৎসাহী, আগে জানলে তোমাকে একটা বামুনের টাইটেলই না হয় দিতাম !

—আমার কোনও টাইটেল দরকার নেই, পদ-পদবী গোত্রসূত্র প্রয়োজন করে না। আমি রাহুল, ব্যাস। হরবোলা খতিবের খতিব পদটাই যেন পদবী হয়ে গিয়েছে, অথচ খতিব কোনও পদবী নয়, পদও বোধ হয় নয়। যে-মানুষটি মসজিদে নামাজ পড়ায়, খুতবা পাঠ করে তাকে বলে খতিব। খুতবা হল ধর্মোপদেশ। তা, সেদিন ইকবাল বললে, উনি আমাদের হরবোলা খতিব ! তোতা সাহেব ওকে এনেছে !

—হ্যাঁ, তোতা ওকে নিয়ে গেছেন ! মৌলবী তোতাজি আমাদের স্ট্রং কমরেড। শুনলে তুমি অবাক মানবে, তোতা আগে আলকাপ করতেন ! ছন্দগান, চিঠেলি করতেন, ভারি চমৎকার পুঁথি পড়েন। এসে বললেন একদিন, আমাকে লোক দাও, আমি দেখি কী করতে পারি !

—তো ?

—ডাক্তারদা বললেন, দেব বটে আপনাকে, কিন্তু আপনার এলাকায় দেবার মত লোক কোথায় ! আপনার এলাকা মুসলিম এলাকা।

—তবে একটা হিন্দুই দ্যান, আমি লিজে তেনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।

—হরবোলা হিন্দু ! সেকি !

—হ্যাঁ। বলে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে মুমতাজ হেসে উঠল। অতঃপর তাজ গম্ভীরস্বরে বলল—উনি দেবপ্রতিম। একজন কলেজ-শিক্ষক, যাকে বলে প্রফেসর। বিস্ময়কর মেধা। উনি ছিলেন রাঢ়ে। আত্মগোপন করবার জন্যই তাঁর স্থানান্তর এবং খতিবী। মনে রাখবে রাহুল, আজ দেবপ্রতিম তাঁর ব্রাহ্মণত্ব ভুলে গেছেন, উনি হঠাৎ একদিন আই হেট বুর্জোয়া এডুকেশন বলে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি তাঁর যে-পরিচয় নিজেই মনে করতে পারেন না, তাঁর সেই অতীতটি তুমি জেনে গেলে, যদি কখনও এই দল ত্যাগ করে যাও, তবু খতিবকে খতিব বলেই জানবে, যদিও তিনি খতিবও নন, তিনি সি. এম.-এর ছাত্র। ভয়ংকর হবে, যদি অন্যথা হয় !

জ্যোৎস্না-শিশিরে নিষ্পন্দ বাতাসে স্থির, আচ্ছন্ন, কৃষ্ণবকুলের নীচে দাঁড়িয়ে রাহুল মনে মনে কেমন কেঁপে উঠল। বলল—আমায় না বললেই পারতে তাজ !

মুমতাজ বলল—বললাম এই জন্যে যে, সি. এম.-এর রাজনীতি মানুষকে কত না বিপরীতসূত্রে বেঁধেছে ! তোমার বাবাকেও তাই !

একথা শুনে অনেকক্ষণ মূক হয়ে থাকে রাহুল।

মুমতাজ বলল—আমি হিন্দু-মুসলমান মানি না, আমি সেক্যুলার, একথা মুখে বলা আর

বিপ্লবের আঁচে পুড়ে সত্যের গ্রাসরুটে প্রবেশ করে দেখানো, দুটি আলাদা জিনিস। তোমার বউদি আজও সেই গ্রাসরুটেই যেতে পারেননি, আমরা সমস্ত খবর রাখি রাহুল !

রাহুল এবার স্বল্পস্বরে অনুচ্চ হেসে ফেলে—তোমার কথায় খুব রোমাঞ্চ হচ্ছে, কিন্তু দেবপ্রতিমকে তাঁর ছদ্মবেশ রক্ষা করছে, বউদি আর বুলবনের লড়াই অনেক সরাসরি, অনেক নগ্নভাবে করতে হচ্ছে, তুমি আমকে এ ব্যাপারে বোঝাতে পারবে না। আনিসুল করীম তার পত্রিকায় কী লিখেছে, তুমি জান না।

—জানি।

—কী করে জানলে ?

—আনিসুল আমাদেরই টাচের ছেলে।

—অ। ঠিক আছে, আমি আর কোনও কথা বলব না।

—কিন্তু দেবপ্রতিমের লড়াইটা সহজ নয় পারভেজ !

—আমি রোমাঞ্চিত সেকথা তোমাকে বলেছি।

—এ রোমাঞ্চ নয়। দেবপ্রতিম একটা গোঁড়া হিন্দু ফ্যামিলির ছেলে। বিপ্লব তাঁর হিন্দুত্ব কেড়েছে, অথচ বিপ্লব তাঁকে মুসলমান সাজিয়েছে, ওঁর মন এখন এই লড়াইয়ের মধ্যে এক ধরনের অসোয়াস্তি অনুভব করে। মাঝে মাঝেই এখানে এসে তিনি বলেন, আমি আর পারছি না ডাক্তার ! আমাকে একটা অ্যাকসান করতে দাও, আমি বেরিয়ে আসি। তুমি নিশ্চয়ই জানো রাহুল !

—কী ?

—মানুষের মুণ্ডুটা কেটে ফেললে, সেটা আর গজায় না।

—না।

এই 'না' শব্দটি দ্ব্যর্থক। তার অর্থ যেমন হ্যাঁ, তেমনই সেটি না-সূচক। মুমতাজ রাহুলের উচ্চারণের অর্থ করতে পারে না। অথচ দ্বিতীয়বার প্রশ্নও করে না। সে ভাবে, রাহুল দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধার অন্যতম কারণ তার বউদি। এবং তার বাবা। এখান থেকে মুক্ত না হলে রাহুল কখনও সিধা, স্পষ্ট, সত্যসুন্দর হয়ে উঠবে না।

মুমতাজ ডাকল—এসো, যাই !

এগিয়ে চলতে চলতে, পায়ের তলায় জ্যোৎস্নাহত ভিজে পাতা মাড়াতে মাড়াতে মুমতাজ আবার বলল—তুমি দেবপ্রতিমের কথা বুঝলে না !

রাহুল বলল—আমি পূজার পৌরহিত্যে রাজী আছি তাজ। বিপ্লবের কাজে যা বল তাই, আমার কোনও কুণ্ঠা হবে না। আরতি করতে, পূজার মন্ত্র আওড়াতে আমার গলা এক তিল কাঁপবে না। তুমি বুঝতেই পারছ না, আমি বাবার কাছেই এমন একটা জোর পেয়েছি যে, ধর্মের কোনও ভয় আমার নেই। বাবা অধার্মিক নয়, কিন্তু ধর্ম আমাদের ফ্যামিলিতে বৈঠকখানার চেয়ারে বসে, রান্নাঘরের পিঁড়িতে বসতে পায় না কোনওদিন। কিন্তু বউদির লড়াই আলাদা।

মুমতাজ এবার ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলল— বারংবার এই আলাদা শব্দটা ব্যবহার করছ কেন ? নানাভাবে নানান কথায় বাপ, বউদি আলাদা থাকবেন, এই যেন তোমার প্রতিজ্ঞা !

—তাঁরা আল্লাদা কিনা !

—তোমার আমার চেয়েও দেবপ্রতিম কিন্তু কম অলাদা নয়। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে একসময় তাঁর সর্বাঙ্গে ঘা হয়। তিনি রাঢ়ের এমন এক এলাকায় থাকতেন যে, তাঁকে মৃত গরুর ভাগাড়ের মাংস খেতে হত। ডাক্তারদা পরে তাঁর চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলেন,

এখনও ওষুধ দেন। শেষমেশ প্রফেসর হন হরবোলা খতিব।

—বাবারও সর্বাঙ্গে ঘা হয়েছে তাজ!

—তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার কথা আবার বলছ!

—বিপ্লবেরও যে অহংকার থাকে আগে তা জানতাম না মুমতাজ আলি!

—দুঃখিত। তুমি খুব রেগে যাচ্ছ! কালই তোমাকে বোমা ছুঁড়তে হবে।

—ইয়েস্! ইয়েস্!

—কালই।

—অবশ্যই। 'কিন্তু কমরেড সাদা চৌধুরী,' এই কথাটি বাদ দিতে হবে।

—বেশ। ভোর হোক। কথা হবে। এসো আমরা খেতে পাই কিনা দেখি। তোমার আর পেট ডাকছে? বলেই মুমতাজ হাসতে হাসতে এগিয়ে বাড়ির উঠোনে পৌঁছে যায়।

রাত্রে তিনখানা সাদা ছোট কয়েদরুটি খেতে পায় রাহুল। তরকারি আর আখের গুড়। তরকারি বলতে মিঠে কুমড়োর মালিশ, একে বলে শালুন। শালুন হল তরকারি। রাহুলের এত খিদে পেয়েছিল যে, এই ধরনের খাদ্যেও সে খুব স্বাদ পায়। খাদ্য অপেক্ষা ক্ষুধাই যে মিষ্ট সেকথা সে বুঝতে পারে। ভোরে উঠেই রাহুলকে ঠেলে জাগিয়ে তোলে মুমতাজ।

—চলো! মাঠ সেরে আসি। তারপর ডাক্তারদার ওখানে।

—চা?

—হবে। ফুলচাচার ওখনে চলো!

মাঠ থেকে ফিরে ওরা রওনা দেয়। তার আগে রান্নাঘরে খড়ের চালে ডালিতে মেলে রাখা শিশির খাওয়ানো মেহেদিপাতা পেড়ে নামায় মুমতাজ। বিস্ময়কর ঘটনা।

মুমতাজ বলে—দুলিয়ার উপহার।

—দুলিয়া কে?

—আমার ভালবাসা।

—কী করে?

—মেহনত।

—মানে, কোথায় থাকে?

—সেখানেই তো যাচ্ছি! চলো!

প্যান্টের পকেটে মুমতাজ পাতাগুলি ঢোকাতে ঢোকাতে বলে—তুমি নেবে কিছু?

—কেন?

—বা রে! নেবে না?

—দাও।

—ভালবাসাকে দিও! তোমার কাছে কখনও চায় না?

—মেহেদি?

—হ্যাঁ!

—না।

—কী চায়?

—কিছুই না। বরং দিতে চায়।

—তোমারটা তাহলে উচ্চবর্গের ভালবাসা! অ্যাই, কিছু মনে করো না কিন্তু। ঠাট্টা করলাম। নাও, পকেটে রাখো!

মেহেদিপাতার গোছ পকেটে ঢুকিয়ে রাখে রাহুল। তার অত্যন্ত লজ্জাও করছিল।

—লজ্জার কী আছে ?

—কিছুই নেই।

—তবে ? ভালবাসা যখন করবেই, বি এ রোমান্টিক হিরো। মেহেদিপাতাকে বল, বকুলফুলকে বল, কামিনীকে জানিয়ে দাও। মাঠ প্রান্তরকে সেই খবর রাষ্ট্র করে দাও। আমার প্রেমিকা থাকে গাছের তলে, তার কুটিরও নেই। আর এই চৈনিক ফটোটা তোমাকে দিলাম, তুমি ওই তাকে উপহার দিও।

ফটোটার দিকে চেয়ে দেখল রাহুল। খুবই আকর্ষক এই ছবিটা। চোখ জুড়িয়ে যায়। একজন চাষীর ছবি, পিঠে তার বন্দুক ঝুলছে, সে বসে আছে একটি পাথরের পাটাতনে, বোঝা যাচ্ছে সে বিশ্রাম করছে, কিন্তু বিশ্রামের মধ্যেও রয়েছে তার সতর্ক তন্ময়তা। পায়ের কাছে বসে তার ছোট ছেলে আড় বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। বিভোর হয়ে শুনছে চাষী। মুহূর্তে তাকে যুদ্ধে নামতে হতে পারে। কিন্তু বাঁশিটি তার চাই।

—আশ্চর্য !

—হ্যাঁ, বন্দুকই শুধু প্রেরণা হতে পারে না। বাঁশিও চাই।

—কে বলেছেন ?

—কেউ না। আমিই বলছি। বলছি, কেন না আমাদের কাজটা নীরস পদার্থ নয়। দ্যাখ, এই বাচ্চাটা কিন্তু শিঙা বাজাচ্ছে না, হাতে রয়েছে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার আড়।

—তুমি অদ্ভুত !

—হাঃ হঃ হাঃ ! চলো !

মাঠের পথ ভেঙে ওরা দ্রুত এগিয়ে চলে। যেতে যেতে মুমতাজ বলে—আমাদের কিন্তু ত্রিভুজ প্রেম, বুঝলে ! এক বাহু আমি, অন্য বাহুটি এক সাঁওতাল যুবা। দুলিয়া ঠিক করতে পারছে না কার সঙ্গে সেট্‌ল্ করবে। আমার তো নিশ্চিন্দি নেই, মরে যেতে পারি, জেলে যেতে পারি। তাই দুলিয়া দোটানায় পড়েছে, বুঝলে ! আমি বলি কি, তুমি দুইজনকেই ভালবাস। তাকেও বাস, আমাকেও বাস। আমি গেলে, সে থাকবে। তা কিন্তু শুনবে না দুলি, কেঁদে ফেলবে। ইস্ ! ভেবে দ্যাখো তাহলে ! বলে হো হো করে হাসতে লাগল মুমতাজ। মানুষটি যেন ঝড়ের মতন, উচ্ছ্বাসে আবেগে এক প্রপাতময় মানুষ, দিগ্‌দিশাহীন তার ভালবাসা, অফুরন্ত তার বেগ, থামতে জানে না, জীবনের সমস্ত রস পূর্ণ করে ছড়িয়ে দেয় পথেরই উপর। ত্রিভুজ প্রেমকে মধ্যবিত্ত ভয় পায়, তাজ আনন্দে মজে। কী অদ্ভুত !

বাঁশবাগানের মোড়ের কাছে পৌঁছতেই দুলিয়া তাঁবুর ভেতর থেকে মুমতাজকে দেখে ছুটে আসে। দুলিয়ার শরীর ছন্দোময়, স্বাস্থ্যে নিটুট, ছেনি দিয়ে কেটে বসানো কালো পাথরের মত ধারলো দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে আবেগে এবং অত্যন্ত চঞ্চল দুটি তারা যৌবনের স্বপ্নে মদির, লাল ব্লাউজ পরেছে দুলিয়া, যেন আগুন লেগেছে যৌবনের আদিম তটরেখায় কোন নদীবাহিকার তীরে, কালো কেশের খোঁপায় সাদা পুষ্পকলিকার গুছি এই ভোরেই সেজে উঠেছে, দুলিয়ারা গেরস্তর কাজে যাবে, স্নান করে, কাপড় পরে তৈরি।

মেহেদিপাতা চোখের উপর মেলে ধরল মুমতাজ। কী করে বেটে হাতে লাগাতে হবে তারও বিশদ বিবরণ পেশ করে গেল চার দণ্ড। শুনতে শুনতে দুলিয়া হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল বারংবার।

মুমতাজ রাহুলকে দেখিয়ে বলল—আমার দোস্ত !

দুলিয়া হাসি দিয়ে রাহুলকে অভ্যর্থনা করল, বারবার মাথা দোলাতে লাগল তারপর বলল—দোস্ত বটে ! হাঁ—

হাসির বেগ আরও উচ্চকিত হল। আর কোনও কথা হল না। দু'হাতে অঞ্জলি নেওয়া মেহেদিপাতা, দৃশ্যটি যে কী অপূর্ব দেখায় রাহুল ভেবে পায় না। মোহরকে বারবার মনে পড়তে থাকে। একবার তাকে দেখতেও ইচ্ছে করে। সামান্য এই দৃশ্যটি কখনই আর সামান্য থাকে না।

ওরা মাঠ পেরিয়ে অনেক দূর চলে আসে। কোনদিকে চলেছে রাহুল জানে না। দৃশ্যটিই কেবল মনের মধ্যে জেগে থাকে। তারও পকেটে রয়েছে মেহেদিপাতা, এমন পাগলামি করতে হবে রাহুল ভাবতেও পারে না। অবশ্য পাগলামি না থাকলেই বা প্রেম কিসের !

পাকা সড়কের উপর ওঠে ওরা। পথের দু'ধারে দেওয়াল তোলা, পথটি বেঁকেছে, কেমন রহস্যময় পথ। এই দিকে পুরনো কাশিমবাজার। পথটি বাঁক নিচ্ছে ঘন ঘন। অসম্ভব নির্জন।

হঠাৎ পিছনে বা সামনের বাঁকে মোটর সাইকেলের উচ্চ কর্কশ শব্দ তেড়ে আসছে মনে হয়, দেখা যায় না।

একটু বাদে পিছনে ঘুরে দাঁড়ায় তাজ আর রাহুল। রাহুল নাটা তরফদার এবং ললিতমোহনকে দেখতে পায়। মোটর বাইকটি কাছে এসে থামে। নাটার কাঁধের পিছনে বন্দুক ঝুলছে। ললিত ড্রাইভ করছেন। এ এক অতি চেনা দৃশ্য।

নাটা এই পথে রাহুলকে দেখে অবাকই হয়েছেন। বললেন—এই সড়কে তুমি কেন বাপ !

—এদিকে এক বন্ধুর বাড়ি চলেছি ! আপনারা কোথায় যাবেন ?

—চতুর্ভুজ আসওয়ালজির আড়তে, কাশিমবাজার গো মেলেটারির ছেলে ! পাটের দাম পাব। হয়রান, হয়রান, হয়রান। তা বাপজি ! বলে দম ধরেন নাটা।

—বলুন !

—তোমাদের বাড়ি হয়েই আসছি। আয়েষা বহিন, হিন্দু-বউমা, বুলবন সবার সঙ্গেই কথা হল গো ছেলে ! আমরা দু'টিতে আজ আড়ত হয়ে বহরমপুর যাব। সেন্ট্রাল জেলে বাবুর সঙ্গে দেখা করব ভাবছি। তোমার ব্যথাখালা বজ্জাত খুব, বউমার কাছে গিয়ে ওষুদের বাক্স নিয়ে জেহাদ করে এসেছে। আরে বাবা, বাবু হলেন মানী লোক, মেলেটারি এবং ডাক্তার। তেনার বউমা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক...

—রাস্তার উপর ঘরের কথা থাক তরফদার চাচা !

—তোমার ব্যথাখালা তোমাকে পছন্দ করে ডাক্তারের ছেলে ! ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে বাড়ি এসে কাঁদতে বসল। অহংকার ! অহংকারে মানুষ কাঁদে, বুঝলে ! বউমাকে আমার বৈঠকে এসে ডিসপেনসারি চালাতে বলেছে, বউমা, রাজী হয়নি, তাই কান্নাকাটি। তুমি বাপুকে দেখতে চাও না ? চলো, যাই !

—না।

—কেন, বাপজি ! আমরা কি খারাপ ! যাবে না সঙ্গে ? বাইকে জায়গা হবে। বাপকে দেখবে না, কেমন ছেলে তুমি ?

—আমি খুব খারাপ !

হঠাৎ ললিত কেমন সন্দেহের গলায় মুমতাজের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বললেন—এই ছেলেটি কে ? বাড়ি কোথায় ?

রাহুল মৃদু উষ্ণস্বরে বলল—কেন, আপনার তাতে কী প্রয়োজন ?

—প্রয়োজন আছে বইকি !

—আমার বন্ধু !

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি ! তারক গাঙ্গুলির ভাগ্নেও বন্ধু শুনি। এই ভাগ্নেটা চীনের পার্টি করত, এখন ফের সেই দলেই ঢুকে পড়েছে কিনা মামাও বুঝতে পারছে না। প্রণামপুরে চীনের পার্টি পোস্টার সাঁটছে নাকি বউমার পার্টি মাহেফরাসদের ক্ষ্যাপাচ্ছে, বুঝলেন তরফদার সাহেব, খুব রহস্য। মাহেফরাসরা বউমার ফের পেশেন্ট হয়েছে, বুঝলেন ! তা হোক, তা হোক। অমি আবার ওয়াটার গেট খুলে দেব, দেখি কে ঠেকায় !

মুমতাজ বলল—আপনি পথের উপর যুদ্ধ করতে চাইছেন ! আমার পরিচয় না জেনে কথা বলছেন।

—আমার আমল !

—হ্যাঁ। নিশ্চয়। কিন্তু চীনের পার্টিরও আমল এটা। তবু বলছি, কোথায় কে পোস্টার সাঁটছে আমরা বলতে পারব না। একটা কথা বলতে পারি, মানুষ সাদা চৌধুরীর নামে পোস্টার ফেলবে তার জন্য কোনও দলের প্রয়োজন হবে না।

—কী করে বুঝলে ! তুমি জানো, প্রণামপুরে কতজন পোস্টার লিখতে পারে। তুমি কোথায় থাক ? তুমি কে ?

—ধমক দিয়ে কথা বলবেন না, আপনার আমল ঠিক কথা, কিন্তু সেই আমলেরও **কিন্তু শেষ** আছে। বলে ওঠে মুমতাজ।

—চীনের পার্টিরও দফা রফা করব, বলছি আমি। আই সে...ওই বউমাকেও ঘরে বসেই ডাক্তারি করতে হবে। আমি দেখতে চাই, আমি বিনে ওই সাদাকে জেল থেকে কে ঘরে আনে ! চাকরি কে দেয় ! বলেই ললিত বুলেট বাইকে স্টার্ট দেবার জন্য তৈরি হন।

নাটা বলেন—ঘরে আনব বলেই তো যাচ্ছি খোকা ! তুমি রাগ ক'রো না। রাহুল ! বাপজি, খারাপ রাজনীতির মধ্যে সাদাবাবুর ফ্যামিলিকে ফেলে দিও না। তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকো। ওই তিলকের সঙ্গ ত্যাগ কর।

—তিলক কোনও রাজনীতি করে না বলেই জানি। ও আমাকে চীনের পার্টির কোনও কথা বলেনি, পলিটিক্স করবার জন্যও সাধেনি। আমি কী করব, তা আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। বাপুকে আপনারাই চীনের পার্টির লোক বানিয়েছেন। আপনি বলুন চাচা, বাপু গান্ধীজীর চেলা, তাঁর কেন জেল হয় ?

—সেকথা প্রশাসন-পুলিস বলবে ! বলে ওঠেন ললিত।

—আপনার আমল, আপনি বলবেন না ? রাহুল উত্তেজিত হয়। তারপর বলে—আপনি নিজে অম্বরীশলালকে সঙ্গে করে খুলান থেকে বাপুকে অ্যারেস্ট করালেন আর প্রশাসন-পুলিস বলবে কেন শুধু ! এর জবাব যেভাবে সম্ভব আমি আদায় করে নেব। ছাড়ব না।

—তাই ক'রো ! বেশ। বলেই ললিত বাইক গর্জে তুললেন।

নাটা সহসা রাহুলের হাত ধরে কাতর গলায় বললেন—যাবে না বাপসোনা। আমি ঘরে আনব বাপুকে। দুপুর নাগাদ জেলের সামনে এসো। আমরা থাকব। কতদিন সাদাবাবুকে দেখিনি !

নাটার কথা শেষ না হতেই বাইক চলে যায়। রাহুল ভাবে সে কি যাবে জেলের বাপুকে দেখতে ? যাবে কি ?

॥ ১৯ ॥

ডাক্তার বিশ্বরঞ্জনের বাড়ি চাঁচের বেড়া দিয়ে তৈরি। মাত্র একখানি ছোট ঘর। এই ঘরটির গা-লাগা একচালার একটি রান্না করবার জায়গা, রান্নাঘর। শোবার ঘরটির মধ্যে একখানা সাধারণ খাট এবং চব্বিশ ঘণ্টা তাতে বিছানা পাতা। ঘরে দু'খানা টিনের ছোট ছোট চেয়ার। টিনেরই একটা বুকসেলফ দেওয়ালে ঝুলছে। ডাক্তারি ইংরেজি বাংলা বই সাজানো রয়েছে সেলফটির তিনটি থাকে। অপ্রশস্ত একটি টেবিল আছে সেলফের নীচে, তাতেও বই ভর্তি হয়ে আছে। কিছুটা সাজানো, কিছুটা অগোছালো। বিছানার উপর খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, চালে মাথা ঠেকে যাওয়ার উপক্রম হয়, তা ছাড়া বাঁশের ঝুলন্ত বর্গায় মাথা ধাক্কা খায়।

বিশ্বরঞ্জনের দু'টি শিশু আছে, বধূটির স্বাস্থ্য ভাল, উজ্জ্বল শ্যামলী রঙ, মুখমণ্ডল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে পুষ্ট। চোখ দু'টি বড় বড়, বুদ্ধিমাখানো এবং যাকে বলে কাজল-কালো চোখ। শিশুদের বড়টি ছয়-সাত বছর বয়েস, পুত্র। ডাক্তারদার মত ফর্সা, কিন্তু মায়ের আদলে গড়া, তার চোখ দু'টিও মায়ের মতনই উজ্জ্বল, দেখেই সোহাগ করতে ইচ্ছে হয়। ছোটটি শ্যামাঙ্গী, কন্যা। তিন চার বছর। গিন্নিগিন্নি ভাব। মাথায় অনেক চুল। ঝুঁটি করা। দাদার মত ফর্সা না হলেও কন্যাটি তার নিজেরই মতন হয়েছে, বাবা-মায়ের আদলে যায়নি।

তাকে দেখে রাহুলের নূপুরকে মনে পড়ে গেল। কোলে নিতেও সাধ হল। আর ঘটনাও ঘটল চমৎকার। বিছানাতেই বসতে হল পা ঝুলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে নূপুর-প্রতিম শিশু কন্যাটি রাহুলের কোলে এসে বাস্তবিক বসে গেল। তারপর রাহুলের থুতনি, তার একটি কচি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে থাকল, রাহুলের ঠোঁট স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে। শিশুপুত্রটি বোনের দেখাদেখি মুমতাজের কোলে এসে সেঁধিয়ে পড়ল। তারপর তারা দু'টিতে ক্রমান্বয়েই দু'টি কোলই অদলবদল করার খেলা খেলতে শুরু করে। একবার কন্যা যায় মুমতাজের কোলে একবার রাহুলের কোলে। ছোট্ট দাদাটিও ক্রোড় থেকে ক্রোড়ান্তরে যায় আসে, একবার রাহুলে, একবার মুমতাজে। তাদের খেলাটি এতই বাস্তব ছিল যে, মনে হয় না, রাহুল এই প্রথম এখানে এল।

আসলে যে-সমস্ত শিশুদের বিচিত্র ধরনের মানুষ দেখার এবং মানুষকে স্পর্শ করার নিয়ত অভ্যাস থাকে এবং বাবা-মা যাদের প্রতিটি মানুষকে স্পর্শ করার সমান অধিকার দেন এবং সমস্ত মানুষই যেখানে সমান সমাদৃত হন, এই সমতা-সাম্যের সংস্কৃতি শিশুদের এমনই সচ্ছল স্বভাব দান করে। শিশুর এই অনিয়ন্ত্রিত অধিকার কোনও কঠিন শাসন পায় না বলেই এমন একটি খেলা তারা সহজেই শুরু করে দিতে পারে।

—অত দুষ্টুমি করো না ! সুরঞ্জনা বউদির এইটুকু সোহাগ-মিশ্রিত শাসনে শিশু দু'টি সামান্য শান্ত হয় বটে, কিন্তু খেলা বন্ধ করে না। সুরঞ্জনা একটি পেতলের ছোট থালায় করে তিনকাপ চা এনে খাটের বিছানায় বসাতে বসাতে রাহুলের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসে এবং দুষ্টুমি না করার কথা বলে ছেলেমেয়েকে। হাসি এবং নিষেধ এতই কোমল আর

শান্ত যে, রাহুলের মনটা ভরে ওঠে।

তুহিন আর খোদা বক্‌স আসে এই সময়। তুহিন খুব লম্বা, স্বাস্থ্যের তুলনায় তার দৈর্ঘ্য অধিক, মুখটা লম্বা গলার উপর খাড়া হয়ে আছে, যেন একটি দীর্ঘ লাঠির উপর বসানো। খোদা বক্‌স কালো, দোহারা গড়ন, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই উদ্যত বলিষ্ঠতা চোখে মুখে ঠিকরে পড়ছে, যে কোন শক্তিমান মানুষকেও মাথায় তুলে আছড়ে ফেলতে পারে এমনই তাকত তার বাহুতে দৃপ্ত হয়। ওরা এসে পড়ায় শিশুদের খেলার ছক ভেঙে যায়। পুত্রটি ছুটে এসে খোদা বক্‌সের কাঁধে চড়ে। তুহিনের কাঁধে কন্যাটি কিছুতেই উঠতে না পেরে কান্না শুরু করে। তুহিন কন্যাকে মাথায় উঠতে না দেওয়ার জন্য গলা সটান এবং কাঁধ টান এক বিচিত্র ভঙ্গিতে বসে থাকে। এও যেন খেলারই অঙ্গ।

সুরঞ্জনা এবার দু'জনকেই একটু কঠিন শাসন করে তাড়িয়ে নিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। ঘরের বাইরে সরু বারান্দায় চট পেতে কিছুক্ষণ বাদে বাচ্চাদের পড়াতে বসায় বউদি। বাচ্চারা নিরস্ত হয় এভাবে।

তিন কাপ চা পাঁচ কাপ হয়। বাড়িতে ঢোকার আগে মুমতাজ রাহুলকে একটি মাত্র অদ্ভুত উক্তি করেছে, বউদি জিয়াগঞ্জের এক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মেয়ে এবং ডাক্তারদার লাইফ-স্টাইল ততটা হ্যাপিলি নিতে পারে না, ডাক্তারদার তো ভাল করে প্র্যাসটিস করতে পারেন না, খুব অভাব।

ডাক্তারদা প্রথমেই বলেন—কাজের কথা হোক তা হলে! বলেই তিনি চেয়ার টেনে নিয়ে মেঝেয় একটু দূরে বসে পড়লেন। চেয়ারটা নড়বড়ে। মুমতাজ খাট ছেড়ে নেমে অন্য চেয়ারটির দখল নিয়ে ঘরের একটি কোণে সরে গিয়ে বসতে বসতে বলল—একটু আগে কাশিমবাজারের রাস্তায় ললিত আর নাটাকে মোটরবাইকে যেতে দেখলাম। সঙ্গে বন্দুক। রাহুল বলল, বন্দুকটা নাকি নাটার কাঁধেই থাকে।

—কার কাঁধে ?

—নাটার কাঁধে ?

—ওটা ছিনিয়ে নিতে হবে। এ দিকে কোথায় গেল ? মুমতাজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ডাক্তারদা তুরন্ত সিদ্ধান্ত করলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—খোদা এবং তুহিন, সঙ্গে আরও দু'জন, এই রাস্তাটা পাহারা দাও। আরও দু'জন কে কে, আমি ভেবে বলছি।

—আমি আর রাহুল ! প্রশ্ন করল মুমতাজ।

—না, তোমাদের অন্য কাজ আছে। তোমরা দু'জন আজ মোহন সিনেমায় টকী দেখবে, 'হকিকৎ'।

ডাক্তারদা বাদে, বাকি চারজন খুব অবাক হয়। বাইরের দিকে একটু ঝুঁকে বিশ্বরঞ্জন বউকে বললেন—সুরঞ্জনা, তুমি একটু ওদের সামলাবে !

বউদি গম্ভীরস্বরে বলল—হ্যাঁ, আমি এদেরকে পুলের ওদিকে নিয়ে যাচ্ছি ! চল্ খোকা, আমরা বেড়িয়ে আসি। আয় বিন্দু, এসো মা !

কেমন একটা করুণ সুরে ছেলেমেয়েকে সম্বোধন করল বউদি। বাচ্চাদের আর পড়াশুনা হল না। এভাবে অনেক দিনই পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়ে পুলের ওদিকে চলে যেতে হয় বাচ্চাদের নিয়ে, মুমতাজ জানে। চারজনই এই ঘটনায় পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল এবং স্তব্ধ হয়ে রইল। বউদি বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেলে, তবে কথা বললেন ডাক্তারদা।

—সিনেমায় দেখবে চীন-ভারত যুদ্ধ। চীনকে এই সিনেমায় আগ্রাসনবাদী এক হিংস্র শক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং ভারতের সৈনিকদের বীরত্বগাঁথা প্রচার করা হয়েছে, উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হয়েছে। আমরা সিনেমা হলের বাইরের দেওয়ালে ছোট একটা পোস্টার সেঁটে সিনেমা-মালিককে 'শো' বন্ধ করার দাবি জানাই। কিন্তু শো বন্ধ করেনি। ওই পোস্টারের সঙ্গে একটি পুরনো স্লোগান ছিল, চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হয়েছে, বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত করুন। চীন আক্রান্ত হতে পারের জায়গায় 'হয়েছে' লেখা হয়েছে। ব্যাস ! কমরেড সি.এম.-এর কথাকে সামান্য পালটে ব্যবহার করেছি।

রাহুল বলল—তা হলে সেই সিনেমা দেখব কেন আমরা ?

ডাক্তারদা বললেন—দেখবে এবং তোমাদের কাছে দু'টি হাতবোমা থাকবে। হাই-সাউন্ডিং বোমা। লক্ষ্যবস্তু আমি তাজকে বলে দেব। তাজ যখন বলবে, রাহুল তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে মারবে।

একটু থেমে ডাক্তারদা রাহুলের দিকে দৃঢ় চোখে চেয়ে থাকলেন নিমেষ কতক, তারপর বললেন—এটা তোমার অ্যাসিড-টেস্ট রাহুল ! এই অত্যন্ত নিরীহ কিন্তু সতর্ক অ্যাকসানের সময় যদি কোনও কথা নিতান্তই বলবার দরকার হয়, দু'জন তোমরা পরস্পরকে কী নামে ডাকবে ঠিক করেছ ?

মুমতাজ বলল—আমি সঞ্জয় ও সত্য।

ডাক্তারদা হেসে ফেলে বললেন—চট করে মাথায় আসেও তোমার ! ভেরি গুড।

—না, চট করে নয়। রাতেই রাহুলের নামটি ঠিক করেছি আমরা, সত্যসুন্দর সিহি। মাহেষ্য।

ঘরের সকলেই এবার হেসে উঠল নামটির উত্তাপে এবং মাধুর্যে। হাসি থামলে ডাক্তারদা বললেন—এখনও তুমি ফিরে যেতে পার, রাহুল !

সপ্রতিভ গম্ভীর রাহুল বিস্মিতকণ্ঠে বলল—কোথায় !

তার এই কোথায় উচ্চারণটি এমনই তীক্ষ্ণ হয় যে, রাহুলের আত্মত্যাগের কঠিন উত্তাপটি সেই সতর্ক অভিব্যক্তিতে ছড়িয়ে জড়িয়ে এক আশ্চর্য প্রতিরোধ রচনা করে, অনির্দেশ্য এই 'কোথায়' শব্দটি তাকে যে কোথাও ফেরাতে পারে না, তার পথ সম্মুখে, তারই দ্যোতনা নিঙড়ে দিয়েছে চকিত দৃঢ়তায়।

—তা হলে তুমি সিনেমায় যাচ্ছ !

—হ্যাঁ। এবং বন্দুকটি ছিনতাই হওয়ার পর গ্রাম উত্তাল হবে, আমি জানি আমার আর ঘরে ফেরা ঠিক হবে না। বলে উঠল রাহুল।

ডাক্তারদা বললেন—নাটা এবং ললিতের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এই বন্দুকটি ছিনতাই হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি।

একটু দম নিয়ে ডাক্তার বললেন—আজকের এই দু'টি কাজ আমরা যদি আজকালের মধ্যেই করে উঠতে পারি, তা হলে প্রশাসনকেও কিছুটা দুর্বল করা যাবে। ভাল হয়, যদি এই দু'টি কাজ একদিনে ঘটে যায়। এই জেলার উন্মত্ত প্রশাসক প্রতিদিন পুলিস আর বি.এস.এফ নামিয়ে দিচ্ছে শহরের পাড়ায় পাড়ায়, ভদ্র নিরপরাধ ছেলেদের ভ্যানে তুলছে, জেলে ভরছে। গ্রাম থেকে মানুষ ধরে আনছে।

ডাক্তার থামলেন এবং বললেন—আমরা যে নিষ্ক্রিয় নেই, সেটি দেখাতে হবে। নইলে প্রশাসনের অত্যাচার রোধ করা যাবে না। তা ছাড়া বন্দুক ছিনতাই না করলে ললিত থামবে না। সন্ত্রাসের তীব্রতা বাড়াতে পারলে বিন্দু রচনার কাজ ত্বরান্বিত হয়। বিন্দু

ভাঙার কাজও। এটা কমরেড সি.এম-এর পরীক্ষিত সত্য।

রাহুল বলল—আমি এই সত্যটি যে সত্য কিনা, কাজ না করে হয়ত বুঝব না। তবে একটি জিনিস ভেবে দেখলাম, ললিতরা বুঝতে পারছে না, প্রণামপুরে বাবার নামে যে পোস্টার পড়েছে, কারা তা লিখেছে! বউদির নির্দেশে মাহেফরাসরা লিখেছে কি না, কারণ ইকবালকে শশাঙ্ক যখন দলিত করে, সেই ঘটনায় বউদি উপস্থিত ছিল, জেলেরা বউদির কাছে ওষুধ নিতে আসে। ফলে এই ধোঁয়াশাটা বন্দুক ছিনতাই হলে কেটে যাবে।

—না। ছিনতাই হচ্ছে কাশিমবাজারের এই রাস্তায়, চিৎপুর-প্রণামপুরের সঙ্গে এর যোগসূত্র কল্পনা করা যায়, কিন্তু নিশ্চিন্ত কি হতে পারে কেউ? বললেন বিশ্বরঞ্জন। তারপর বললেন—তুমি বড্ড বেশি বাপের কথা ভাবো!

রাহুল বলল—বোমা ছোঁড়ার ব্যাপারে আমি একবার ভাবব। দ্বিতীয়বার নয়। কিন্তু বাপুর কথা বারংবার ভাবতে হবে।

—ন্যালার কথা? ডাক্তারদা যুক্তিটা আবেগের সঙ্গে পেশ করেন।

রাহুল শান্তস্বরে বলল—সমগ্র জীবন।

—ন্যালার মৃত্যুর তো একটা পলিটিক্যাল সিগনিফিক্যান্স চাই! সেটা বন্দী সাদা চৌধুরীর নামের সঙ্গে প্রণামপুর ইত্যাদি গাঁয়ের মানুষই যুক্ত করে ফেলেছে। তুমি কেন বিচ্ছিন্ন করতে চাইছ?

ডাক্তারের কথার পৃষ্ঠে রাহুল বলল—এইভাবে যুক্ত হওয়া ঠিক নয়।

ডাক্তার শুধালেন—কেন?

রাহুল বলল—এটা পদ্ধতি হতে পারে না।

ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন ক্ষীণ হেসে বললেন—পদ্ধতিটা তা হলে কী হতে পারে আমাদের বুঝিয়ে বল!

রাহুল বলল—সেই জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু বিন্দু ভাঙার কাজ সম্পর্কে আমার প্রশ্ন আছে।

—কী প্রশ্ন?

—আমি ভেবে দেখতে চাই।

—সিনেমায় যাওয়ার ব্যাপারটা?

—কেন আবার এ কথা তুলছেন! আমি ইয়েস করেছি। ইয়েস মানে হ্যাঁ, কখনওই না নয়। আমার ইয়েস, অলওয়েজ ইয়েস। বলতে বলতে ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে রাহুল।

মুমতাজ এবার খোদা বক্স এবং তুহিনের দিকে দৃষ্টি স্পষ্টত চালনা করে বলল—কাশিমবাজারের রাস্তায় আজ এবং কাল দু'দিন তোমাদের পাহারা দিতে হবে। এই পথের উপর আমাকে এবং রাহুলকে নাটা-ললিত হেঁটে আসতে দেখেছে। ছিনতাই হয়ে গেলে ওরা আমাদের কথা মনে করবে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারবে না। রাহুল যে ধোঁয়াশার কথা বলছে, সেটি আরও ঘন হবে।

রাহুল মাথা নীচু করে কী যেন ভাবছিল। ডাক্তারদার কোন কথাতেই সে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। বাপুকে সে এই সমস্ত ঘটমান ঘটনা এবং পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঘটনা—কোন ঘটনা থেকেই যে আলাদা করতে পারবে না, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছিল।

রাহুল বলল—তারপর এই বন্দুকটার কী হবে? কোথায় রাখবেন?

ডাক্তারদা বললেন—সেটি কাপাসডাঙার দিকে চলে যাবে। ওই দিকে ভাটাতলার

জঙ্গলে ব্যবস্থা আছে, কেড়ে নেওয়ার পর প্রথমে সেখানে থাকবে। এই সমস্ত বিষয় আমরা ভাবব, রাহুল! তুমি চিন্তা করো না।

রাহুল বলল—চিন্তা যে হয় ডাক্তারদা! মণির কাঁধের উপর একটা বন্দুক ফেলে রেখেছেন, সেটা কীভাবে কাজে লাগাবেন?

ডাক্তারদা বললেন—এত প্রশ্ন কেউ করে না রাহুল! সবাই কাজ করে! ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আত্মত্যাগের গোপন রাজনীতি বন্দুকের ব্যবহার কাউকে হাতে ধরে শেখায় না। আমাদের সমস্ত সেন্টার এবং শেলটারের কথা তোমাকে বলে দিতে পারি না! তোমার কাজ তাজ তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। ছিনতাই হওয়ার পর বন্দুকটা কোথায় যাবে, সেই প্রশ্ন তোলাই তোমার ঠিক হয়নি। তুমি শুধু তোমার কাজটাই বুঝে নিতে পার।

—ঠিক আছে! রাহুল আহতস্বরে চুপ করে যায়।

ডাক্তারদা বললেন—ম্যাটিনি 'শো'-তেই তোমরা সিনেমা দেখবে। 'হকিকৎ' একটি পুরনো ফিল্ম, নতুন রিলিজড় নয়। কবি তোমাদের জন্য টিকিট কেটে রাখবে। খোদা বক্‌সের বাড়ি রাহুল খাবে। দশটা এগারোটা নাগাদ। খোদা বক্‌স ওর বিয়ের সাইকেলটা দেবে, ওতে চড়ে প্রেক্ষাগৃহে যাত্রা। সিনেমা হলের গ্যারাজে নয়, চায়ের দোকানে থাকবে সাইকেল। কবি থাকবে সেখানে। ঠিক আছে?

রাহুল চোখ তুলে দৃষ্টি দিয়ে সায় দেয়। কথা বলে না।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কী তাকে করতে হবে। কিন্তু রাহুল একটা দুর্বোধ্য স্তরে ঢুকে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার পর সাইকেল নিয়ে বার হয় দু'জনে। সামনে রডের উপর বসে আছে রাহুল, নতুন ঝলমলে সাইকেলটা চালিয়ে নিয়ে চলেছে মুমতাজ।

রাহুল অন্যমনস্কের মতো শ্লথ উচ্চারণ করে—উগ্র জাতীয়তাবোধ! জাতির প্রতি ভালবাসা। দেশপ্রেম।

মুমতাজ বলল—এসব হল তুক।

—মানে!

—দেশটা কি আমানির? নাকি তোমার আমার?

—জানি। উগ্র জাতীয়তাবোধ হিটলারের জন্ম দেয়। সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ একমাত্র উপায়, যার সাহায্যে যুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদের হাত থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করা যায়। আমরা মনে করি না, চীন ভারত আক্রমণ করেছিল বা চীন আগ্রাসনবাদী শক্তি।

—চীন সম্পর্কে একটা মিথ্যা ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এই সিনেমা। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, চেয়ারম্যানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাশিয়া একটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত। শোধনবাদ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্বকে গ্রাস করেছে। বলতে বলতে মুমতাজ সাইকেলের গতি আরও একটু বাড়িয়ে দেয়।

রাহুল বলল—একটা সিনেমা বন্ধ করে দিলেই কি যাবৎ সমস্যার সুরাহা হবে! তুমি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবে না সঞ্জয়!

মুমতাজ বলল—না, ভুল বুঝছি না। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট ঘন ঘন মত বদলালে সে আর সঠিক কমিউনিস্ট থাকে না। চেয়ারম্যানের কথা।

রাহুল এবার একটু হেসে ফেলে বলল—দ্যাখ, সঞ্জয়! সাধারণ মানুষ কিন্তু ফ্যাসিবাদও বোঝে না, শোধনবাদও বোঝে না। এমনকি লিন পিয়াও কে, তা তারা জানে না। আন্তর্জাতিকতাবাদ তাদের কাছে আরও জটিল বিষয়। তবে তারা বুঝতে পারবে সেদিন,

যেদিন রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। চীন আমাদের আক্রমণ করেছে এটা বোঝা সহজ। কিন্তু চীন আগ্রাসনবাদী নয়, বোঝানো কঠিন।

মুমতাজ বলল—এমারজেন্সির মানুষ ফ্যাসিবাদ বুঝতে পারছে। শোধনবাদ জিনিসটা পার্টি নেতৃত্ব বুঝবে। আমরা আজ এই মুহূর্তে শুধু এইটুকু বোঝাতে পারি যে, সিনেমাটা মিথ্যা! আমরা তো মিছিল করে গিয়ে বলতে পারি না, সিনেমা বন্ধ কর। এখন মিছিল মিটিঙ বন্ধ। ফ্যাসিবাদ এখন রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রহরী। বলা বাহুল্য যে, বোমার আঘাতটা সঠিক স্থানেই পড়বে। নাও, তুমি একটু চাল্যবে?

—দাও।

রাহুল এবার সাইকেল চালাতে শুরু করে। সিনেমা হলে পৌঁছনোর আগে সাইকেলটা সেন্ট্রাল জেলের বাইরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। নাটা বা ললিত কাউকে দেখতে পায় না রাহুল।

—কনভেনার ভাঁওতা দিয়েছে মনে হচ্ছে! চলো! বলে রাহুল মোহন সিনেমার মোড়ে সাইকেল চালিয়ে আনে। চোখে পড়ে নাটা-ললিত একটি চায়ের দোকানে বসে আছেন চুপচাপ। নাটার কাঁধে বন্দুকটা নেই।

—এরা এখানে কেন? মুমতাজও অবাক মানে। ওদের দেখে নাটা এগিয়ে আসেন সামনে। কেমন সলজ্জ হেসে বললেন—বাপের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না রাহুল। জেলের গেট খুলল না। জেলর লোকটা খুব একগুঁয়ে, ডি.এম-কেও পরোয়া করে না। ললিতকে পর্যন্ত চিনল না! জেলার প্রেসিডেন্ট সঙ্গে ছিল, ললিতের দলের।

রাহুল বলল—এসব আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? আপনি ডেকেছিলেন বলে এসেছিলাম।

—দেশটার হল কি? বিস্ময় প্রকাশ করেন নাটা তরফদার। ঘৃণায় রাহুলের অন্তর দপ্ করে জ্বলে যায়। ছিটকে সে সরে আসতে যাবে এমন সময় নাটার কণ্ঠে শুনতে পায়—হোটেলে খেলাম। খড়কে কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে মনে হল, সিনেমাটা দেখি। বাবুর সম্মান তো হল না, আমার নিজের ছেলের সম্মানটা করি। হকিকৎ আমার মেজ ছেলে। তুমি যেমন বাবুর, হকিকৎ তেমনি আমার। ছেলের নামে সিনেমার নাম, তাইতেই ললিত রাজী হয়ে গেল। দেখবে নাকি তোমরা!

রাহুলের মনের তামাম আকাশ হিংসার ধোঁয়ায় লেপে যায়, তার মনের সমস্ত সংশয় সেই ধোঁয়া, একটা জ্বালামুখ রচনা করে ঢেকে ফেলে। ঘৃণা আর ক্রোধ এবং ক্রোধ আর ঘৃণা 'হকিকৎ' শব্দটির দ্বারা উদ্গীরণ ঘটায়। সে ভেবেও দেখে না আর, বোমা নিক্ষেপ করার তাৎপর্য আছে কি নেই! মনে হয়, বোমাটি সঠিক স্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছবে। কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগে হাত ঢুকে যায়। রাহুল উত্তাপ টের পায়। বস্তুটি মেহেদিপাতার উপর বসে রয়েছে, পকেটের সমস্ত পাতা সে কাঁধের ব্যাগে রেখে দু'টি হাতবোমা রেখে দিয়েছে পাতার নরম শয্যায়। পরপর মোহর, ন্যালা, মণি, কদম আলি, ফুলভানুর মুখ ভেসে ওঠে। রাহুল ছটফট করে ওঠে। ক্রোধে আত্মহারা সে ক্রোধ দমন করতে করতে ক্রোধকেই বোমায় পর্যবসিত করে মনে মনে। তার বিমূর্ত ভাব রূপান্তরিত হয় মূর্তিতে, বিস্ফোরক দাহ্য সশব্দ বস্তুপিণ্ডে।

'তুমি যেমন বাবুর, হকিকৎ তেমনি আমার'। ক্রমাগত এই সংলাপ কানে বাজতে থাকে। এবং তেড়ে আসে নাটার কণ্ঠ, 'বাবুর সম্মান তো হল না।'

রাহুল ছিটকে এসেছে একদিকে। বলল—চল সঞ্জয়! টিকিট কোথায় দেখি!

মুমতাজ পা বাড়ানোর আগে ললিতের চোখে দৃঢ় তরোয়ালের মত দৃষ্টি হেনে বলল—তা হলে আপনাদের সম্মানে আমরাও দেখি বইটা। বুড়া মানুষের রস থাকলে ছোকরারা সেই রস নিবৃত্ত করবে। তবে বইটায় বেডসিন নেই কাকা ! চলি !

ওরা দু'জন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। টিকিট কাউন্টারে চোখ চলে যায়। ওখানে টিকিট নিয়ে হুজ্জোত বেধেছে, মানুষের কাঁধে মানুষ চড়েছে, কাউন্টার মানুষের দেহের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। চারজন পুলিস লাঠি চালাচ্ছে বেঘোরে। খুব গোলমাল ! হুজ্জোত শুধু নয়, মারপিটও হচ্ছে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কবিকে দেখতে পায় রাহুল। কী করে ছুঁচের মতো কাউন্টারের চাপের মধ্যে গলে গিয়ে বেরিয়ে এল কবি, হাতের মুঠোয় টিকিট। ফোর্থ ক্লাশ। সামনের চেয়ার। পর্দার কাছে। ডাইনে দোরের কাছে। কবির জামা ঘামে ভিজে গেছে। কপালে ঘাম।

মুমতাজ টিকিট দু'খানা হাতে নেওয়ার সময় মণিকে দেখতে পায়। মণি ঠিকই চিনতে পারে। মণিও তাকে দেখতে পেয়েছে, সাংঘাতিক লড়াই করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল ছেলেটা। কপালে পুলিসের লাঠি পড়েছে, গোল ছোট বলের মতো ফুলেছে। হাত ছড়ে গেছে। তবু মণির সেই সাদা হাসি জ্বলজ্বল করছে। সে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে বটে, কিন্তু রাহুলকে দেখে তার সমস্ত উৎসাহ নিবে যায়, হাসি আর থাকে না।

—ভাই !

—তুই এখানে ?

—নাটা চাচা আর ললিত আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। সকালে।

—তো ?

—বললে, বাপুকে দেখতে আসছে শালারা।

—খারাপ করে নয়, ঠিক করে বল।

—লোভ দেখালো ! এ দিকে মা আহ্লাদে গলে গিয়ে বললে, মণি যদি যায়, দেখতে পাবে ? ওরা বললে, কেন পাবে না !

—বুঝতে পারছি, তুই ওদের সঙ্গে এসেছিস।

—না। একা এসেছি। নাটার পঞ্চাননতলার বাড়িতে পয়লা আসি। বাড়িটা এখন ছাত্রদের মেস। নাটা ফ্রি দিয়েছে থাকতে। ওখানে এসে বসেছিলাম। পরে ওরা এল। বুলেট তাড়িয়ে। মাকে বলেছিলাম, আমি যাব না। তবু মা শুনল না। কনভেনারের চাল মা কি বুঝতে পারে ! ললিত কোন চেষ্টাই করল না। এখানে ওখানে ফোন করল দু'বার। ব্যস !

মণির কথা শুনতে শুনতে রাহুল আর মুমতাজ পরস্পর নিঃশব্দে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। বুঝতে পারে, মণি যা বলছে একটুও মিথ্যা নয়। জেলে বন্দী বাপুর সামনে দাঁড়ানোর নাটক ললিতের পক্ষে অসম্ভব নয়। নিশ্চয়ই দেখতে চায় মানুষটি কতখানি শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে ! সেই দুর্গত বাবুটিকে দেখে এরা আনন্দ উপভোগ করতে এসেছে। মণিকে লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছে। মণি রোখা ছেলে, খুব রেগে গেলে বাপু তাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে শান্ত করেন। রাগ প্রশমনের এই দৃশ্যটি চকিতে ভেসে উঠে রাহুলের চোখের উপর মিলিয়ে যায়। কথা বলতে বলতে মণি খানিকটা কেঁপে উঠেছিল।

—তুই জেলের ওখানে গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ। কেরানিবাবুকে বললাম, বাপুকে দেখতে দাও। বললে, পারমিশান লাগবে।

বললাম, কনভেনার এসেছে। বললে, কে কনভেনার ! তখনই নাটাচাচা বলল, বাদ দাও ললিত। আগেই কাদাইয়ের ওদের অফিসে বসে ললিত ফোন করল কাকে যেন। হল না। তারপর বলল, জেলের বাবুদের গিয়ে বলে দেখি, চল। তা সেখানেও কোন ব্যবস্থা হল না।

একটু থেমে চুপ করে থেকে মণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—বাপুকে আর ছাড়বে না রাহুলভাই। ললিত কোন চেষ্টাও করবে না। আমি এখন সব বুঝতে পারছি !

—তুই সিনেমা দেখবি ?

—হ্যাঁ। নাটাচাচা টাকা দিয়ে বলল, টিকিট কাটতে পারবে ? ললিত বলল, গায়ে সাত পালোয়ানের জোর, কেন পারবে না ! ব্যালকনির টিকিট আগেই শেষ, ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছে। এমন কখনও দেখিনি। ওদের জন্য দু'খানা ফার্স্টক্লাশ কেটে দিয়েছি। এখন নিজের পয়সায় গান্ধী ক্লাশ কাটলাম। তুমি যদি বল, বাড়ি চলে যাব। ভাবলাম....

—হ্যাঁ, বল্ ! রাহুল সাগ্রহে ভাইকে বলবার জন্য বলে। মণির এমন কঠিন করুণ নৈরাশ্যের সামনে তার কথাও যেন ফুটতে চাইছে না।

—ভাবলাম যুদ্ধের বই, দেখে যাই। ক'জন ওখানে বলাবলি করছে, চীনকে হারানোর ক্ষ্যামতা ভারতের নাই। এই বইটা নাকি গুজব। তাই নাকি, রাহুলদাদা ? পরে নাকি চীন ভারতের দখল করা মাটি ছেড়ে দিয়েছে ? নাটাচাচা কিন্তু সিনেমার পোকা, তোমাকে বলে রাখছি।

এই কথায় কবি এবং মুমতাজ সামান্য হেসে উঠল। রাহুল গম্ভীর সুরে মণিকে বলল—তুই চলে যা মণি। এই সিনেমা দেখতে হবে না ! কপালটা ফুলেছে। চলে যা !

কিছুক্ষণ কী ভেবে 'আচ্ছা' বলে মণি মাথা নাড়ল। তারপর ছুটে গেল ভিড়ের মধ্যে, টিকিটটা বেচে দিল, পয়সা গুনতে গুনতে বার হয়ে এল। আর না দাঁড়িয়ে সবেগে রাস্তার দিকে ছুটে চলে গিয়ে কী ভেবে ফিরে এসে ডাকল মুমতাজকে, আস্তে, সাবধানে, চোখ মাটিতে রেখে। মুমতাজ তার দিকে সরে গেল।

মণি বলল চাপা গলায়—আছে। ভাববেন না। আমি টোটা জোগাড় করে নেব। বর্ডার এলাকায় বীচি বিক্রি হয়।

—বীচি ? অবাক হল মুমতাজ। তারপর নিজেই বুঝতে পারল, বীচি অর্থ টোটা। অতঃপর বলল—ঠিক আছে, যাও ! আচ্ছা, নাটার কাঁধের বন্দুকটা কোথায় বলতে পার ? মণি বলল আছে। মেসে রেখে এসেছে। যাবে যখন, নেবে।

বলেই মণি দণ্ডমাত্র দেরি না করে জনস্রোতে মিশে গেল। মুমতাজ ফিরলে রাহুল শুধলো—কী বলছিল, মণি !

মুমতাজ বলল—কিছু না। সেকেন্ড বেল পড়ে গিয়েছে, চলো, ঢুকে পড়ি !

পর্দায় যখন প্রচণ্ড কামান গর্জন চলছে, বুকটা দুরুদুরু করছে অন্ধকারলিপ্ত প্রেক্ষাগৃহ দর্শকদের, তখনই মুমতাজ বলল—বীচি মারো !

—মানে !

—ছুঁড়ে দাও !

দর্শক মিনিট খানেক বুঝতেই পারে না, চোখের সামনে কামান কোথায় উধাও হয়ে গেল নিমেষে। ভয়ংকর শব্দ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। উদ্‌ভ্রান্ত দর্শক সোরগোল পাকিয়ে তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে কিছু দর্শক। মুমতাজ রাহুলের হাত

ধরে টেনে দরজার কাছে আসে। গেটম্যানকে কানে কানে বলে—বোমা। ফাটিয়ে দিয়েছে। খেল খতম, পয়সা হজম। চল হে সত্যসুন্দর।

ওরা বাইরে চলে আসে। চায়ের দোকানে সাইকেল নেয়। —মেজ ছেলে-মেজ ছেলে, যুদ্ধটা কেমন জমল বল দেখি! শুধাল মুমতাজ। বিদ্যুদ্‌বেগে সাইকেল ছুটিয়ে দিল।

রাহুল চুপ করে ছিল, কথা বলছিল না।

—তুমি চুপ করে আছো যে!

—ভাবছি।

—শোন, রাহুল! কবিকে বলে দিলাম, প্রণামপুরের সমস্ত পোস্টার যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়।

—না, আমি সে কথা বলছি না!

—তা হলে?

—জীবনে এই প্রথম আমি একটা বোমা ছুঁড়লাম। সিনেমায় যুদ্ধের দৃশ্য। নাটার গেঁয়ো ব্যঙ্গ, ললিতের তঞ্চকতা, সহ্য হচ্ছিল না আর! মণির করুণ মুখটা চোখের উপর ভাসছিল। 'চলে যা' বলামাত্র সে চলে গেল। ললিত আমার মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত চালাকি করেছে! মণি যেমন একদিন জেলের প্রাচীরে ইট ছুঁড়েছিল, আমি তেমনি বোমাটা ছুঁড়ে দিলাম।

—অ।

—তুমি ঠিক বুঝবে না তাজ!

—এখন নাটার মালটা চোপাট হলেই ডবল ইমপ্যাক্ট্। দেখবে, কনভেনার কিছুটা সিধে হবে। কাল ভোরে, আমি তোমাকে তাজা পাতা দেব। মেহেদি। ও.কে.!

রাহুল কোন সাড়া দিল না। তার মনটাই এখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু পরে চাহরামের বাড়ির দোতলায় একটি নিভৃত ঘরে একা বসেছিল রাহুল। খোদা বক্‌স একলা এল। চুপচাপ সামনে এগিয়ে এল একটি কুপি হাতে করে। তাকে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—বন্দুক কেড়ে নেওয়ার পর নাটাকে গলা ধাক্কা দেব, তুহিন মানা করল। বললাম, সিনেমা কেমন দেখলেন চাচা! মুখে পাতলা দাড়ি, শনের মত উড়ছিল। তখনও তেজ মরেনি, বললে কি জানেন, আমার জিনিস কাঁধে করে বয়ে দিয়ে আসতে হবে বলে গেলাম! জামার পকেটে মহাজনের দেওয়া পাটের টাকা ছিল, তুহিন বলল, নিও না।

রাহুল চুপচাপ শুনে গেল, কোনওই জবাব করল না। রাত্রে একলা শুয়ে থাকল। ঘুমাতে পারল না। খুব প্রত্যুষে উঠেই বাস ধরল। মুমতাজ মুঠোভর্তি মেহেদি পাতা এনেছিল।

—তুমি কাজটা খুশি মনে করতে পারনি মনে হচ্ছে! বলে পাতাগুলি জোর করে রাহুলের কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয় মুমতাজ। তারপর বলে—তুমি এগুলি আর ফটোটা তাকে দিও। একবার যাও তার কাছে। প্রাণ যদি নিজে থেকে বলে তবেই আবার এসো! গুডবাই!

বাস চলতে শুরু করলে বারংবার 'গুডবাই' ধ্বনিটা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। প্রাণ তার প্রবল আর্তনাদ করে ওঠে। সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না মুমতাজের কথা। মুমতাজের স্বর তাকে ধিকৃত করছিল, বিক্ষতও করছিল যুগপৎ। সে অনুভব করছিল,

আত্মত্যাগেরও একটি হঠকারি নেশা রক্তে ঘুমিয়ে থাকে, শ্রেণীঘৃণা তাকে উগ্রভাবে জাগিয়ে তোলে। হঠকারিতাকে পাগলামি বলা হয়। কিন্তু এই পাগলামিরও একটি দীর্ঘ অতীত ইতিহাস আছে। কিন্তু এত ভাবনা কিসের তার ! মৃত্যুর টিকিট তো তার কাটা হয়ে গেছে। অন্তর্গত রক্তের ভিতর এ এক অন্য চলচ্চিত্র শুরু হয়ে গেছে।

বাস চলছিল। দূর হাওয়া থেকে কানে ভেসে আসছিল মাইকের গান। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। আপনমনে বিড়বিড় করল রাহুল, আবার এসেছি ফিরিয়া। বড়লাটকে মারতে চাইল ক্ষুদিরাম। মরল এক নিরীহ ভারতবাসী। শহিদ ক্ষুদিরাম, তবু তো অবজ্ঞেয় নয়, পূজিত। সিনেমার পর্দায় ছুড়ে মারা বোমাটি কি তা হলে অর্থহীন ছিল না গতকাল ! রাহুল আপন মনে গুনগুন করে—'আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো !'

মুমতাজ যে এক কঠিনতম প্রাণ, একই মুখে একই মুহূর্তে সে যুদ্ধ এবং ভালবাসার কাহিনী শোনাতে চায়। সে মেহেদিপাতা দিয়ে হাতবোমা ঢেকে রাখে। এই মানুষটিকে কি কখনও আর ছাড়তে পারবে রাহুল !

হঠাৎ বটতলায় এসে গাড়ি স্টপেজে দাঁড়াতেই, ঝপ করে নেমে পড়ল রাহুল। এ কেমন হল ! মোহর তাকে অভূতপূর্ব আবেগে অদৃশ্য সংকেতে হাসানপুরের দিকে টানতে থাকে। রাহুল একটা ঘোরের মধ্যে পা চালিয়ে দেয়। দু' ঘণ্টা হেঁটে মোহরদের পুকুরপাড়ের সিঁথিপথে পৌঁছে যায়। ঝলমলে সূর্যালোকে নাটার বাড়ির পায়রা ওড়ানো দৃশ্যটা মোহরদের ছাদের উপর দেখবে ভাবে, টঙ আছে। পায়রা উড়ছে। ছাদে মোহর নেই। ছাদে থাকবে কেন, বেলা হয়েছে, সকাল আটটা বাজে। টঙ থেকে পুকুরের জলে চোখ নামিয়ে রাহুল থেমে পড়ে। জলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদা সালোয়ার কামিজ উড়নির মোহর। চোখে তখনও ঘুমের মাদকতার রেশ লেগে আছে। রাহুলকে দেখে মোহর বিশ্বাস করতে পারে না। তার হৃদয় লাফিয়ে ওঠে হৃদয়ের মুকুরে।

বাতাসের শীতের তুলনায় পুকুরের সিঁড়ি ভাসানো জল ছিল উষ্ণ। আলতামাখা, চাপা হালকা নূপুর-পরা মোহরের পা দু'খানি সিঁড়ির জলে সামান্য ডুবে গিয়েছে, জলের তলে আয়নার মত সেই পা দেখা যায়, জলভেজা সিঁড়ি থেকে শুকনো সিঁড়িতে পা বাড়ায় মোহর। রাহুল এগিয়ে যায়। ভেজা পায়ের দিকে চেয়ে কোমল রাঙা পা দু'খানি স্পর্শ করতে সাধ হয়। দৃষ্টির স্পর্শেই মোহরের উদ্ভিন্ন পুষ্পিত যৌবন মৃদু শিহরিত হয়। সিঁড়ির তলের ধাপে নামে রাহুল। নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে পড়ে মোহর।

কাঁধের থলে থেকে মুঠোয় করে মেহেদিপাতা বার করে রাহুল পারভেজ। চকিতে দুলিয়ার সহাস্য উচ্ছল মুখটা মনে পড়ে যায়। ভাল তাকেও বেসো, আমাকেও বেসো, ত্রিভুজের প্রেম সেটা। কিন্তু সম্মুখে দাঁড়ায়ে প্রেম, সে তো শুধু তারই। এরকম কতক কথা মনে ভারি আনাগোনা করে রাহুলের। দু' হাতে অঞ্জলিবদ্ধ মেহেদিপাতা সামনে এগিয়ে ধরে সে। প্রেমেরই সে এক অনন্ত বিস্ময়। রাহুল আসবে এবং এভাবে, মোহর কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে ! অবশ্য স্বপ্নে মানুষ এই রকমই ভাবে অথবা দেখে।

হাত বাড়িয়ে ধরে নেয় মোহর। পাতা। অদ্ভুত, মন কেমন করা ঘ্রাণ ! কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ মোহরের একথা মনে করার কারণ নেই, মোহরের রঙ অতি উজ্জ্বল শ্যামা। এই রঙটির একটি মজার ব্যাপার আছে। রঙটি সকাল বিকেল দুপুর, মেঘে, আলোয় এবং সাঁঝে-প্রত্যূষে বদলে বদলে যায়। ঋতুর স্পর্শে বিভিন্নতা পায়। এখন তাকে কেমন অসম্ভব ফর্সা দেখাচ্ছিল। সোনার সঙ্গে রঙের তুলনা রাহুলের একদম পছন্দ

নয়। 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার' গানটি গাইতে যদিও অত্যন্ত ভাল লাগে, কিন্তু গোল্ডস্ট্যান্ডার্ড কথাটার সঙ্গে ভারতের এবং পৃথিবীর পুঁজির অদ্ভুত সম্বন্ধের কথা ভেবে, সোনার মেয়ের স্বর্ণসাধ কেমন যেন উবে যায়। সুবর্ণ কঙ্কনপরা ফর্সা রমণীদের কথা, যে রমণীদের দেখে হৃতদরিদ্র কবির বিস্ময়তৃষ্ণা এবং দারিদ্রকেই মনে পড়ে, মনে হয় সেই রমণীরা যেন স্বপ্নের সুখের আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা, তাদের দূর থেকে দেখতে হয়, কাছে যাওয়া যায় না, কবিকে গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে সেই ঐশ্বর্যশাসিত সুবর্ণবলয় দেখে থেমে থাকতে হয়, এভাবে হতমান কবির চোখে দু'টি আলাদা জগৎ ভাগ হয়ে যায়, সেই কষ্টের কথা কবিতায় পড়েছে রাহুল। তাই মোহর নামটিই যেন দূরত্ব রচনা করে এই সকালে। মোহর তো সোনারই মেয়ে, দুলিয়াকে দেখে সেই স্বর্ণউদ্ভাসিতা দুর্লভকে মনে পড়ে না। মাটি আর শস্যের এবং শ্রম আর শোণিতের কথা জাগে।

—তুমি কে গো, এমন করে চেয়ে আছো! বলতে গিয়ে সংবরণ করে রাহুল। অঞ্জলি পেতে মেহেদিপাতা ধরে নেয় মোহর। পুকুরঘাট নির্জন, পুকুরপাড় নির্জন, গাছপালা আকাশ প্রকৃতি শুধু স্বল্পস্ফুট পাখির স্বরে ঈষৎ আলোড়িত। সেই পাখিরাও পাতার আড়ালে গোপন। জলে শান্ত স্তব্ধতা, কেবল জল-মাকড়সা জলের চিরল মিহি সূক্ষ্ম তরঙ্গ ছড়ায় আপন মনে। লাফিয়ে পড়ে জলের সেই সূক্ষ্মতরঙ্গের ধাক্কায় জলেরই প্রসারিত সূর্যালোকের রাঙা আলোকতরঙ্গে। জলের আলোই যেন প্রেম, মোহরকে দিয়েছে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অধিকার। সে বারবার কেঁপে উঠছে।

—বাড়ি থেকে আসছ বুঝি!

—না।

—কোথায় পেলে? আমি হাতে বেটে লাগাব। আমি জানি। খুব সুন্দর দেখায়। তুমি থাকবে আজ?

—না।

মুহূর্তে মোহরের উজ্জ্বল মুখ ম্লান হয়ে যায়। সেই অবস্থাটি চোখে পড়ে যায় রাহুলের।

—আচ্ছা! বলে আহত মোহর সিঁড়ি ভেঙে পুকুরপাড়ে ওঠে। এবারে রাহুল ওর পিছু পিছু হাঁটে।

হঠাৎ পিছন ফিরে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে মোহর বলে ফেলে—আমার রাঙা হাত দু'টি তুমি দেখবে না! কেন তবে এনেছ এগুলি? মেহেদিপাতার মানে জানো?

—না।

—ঠিক রক্তের মত। এই দিয়ে রাঙালে রক্তের অধিকার জন্মায়, আমার রাঙা ফুপুমা বলেছে।

পথের উপর এবার দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল। বলে—আমি আর যাব না মোহর!

—কেন? আমি কি অন্যায় বললাম?

—না।

—কেন তবে যাবে না! এলে কেন তবে? আমার বুঝি কষ্ট হবে না! এ ভাবে ছুটে আসার কী দরকার ছিল! তোমাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে!

—হ্যাঁ। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি! নাও, এই ফোটোটা রাখো! আমি যাই! বলে ফোটোটা অঞ্জলিবদ্ধ পাতার উপর রেখে দেয় রাহুল। সেই দিকে চেয়ে অভিভূত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মোহর। যখন সে রাহুলের দিকে চোখ তোলে, তখন তার চোখ জলে ভরে

গিয়েছে। সহসা রাহুল আবৃত্তির ঈষৎ ঢঙে বলে ওঠে :

"ভালবাসার কাছেই ছিল নদী
ভালবাসার পাশেই রণস্থল
জীবন আমার উধাও সঙ্ঘে স্রোতে
যুদ্ধে আমার থোড়াই সংশয় !"

—যুদ্ধ ! অস্ফুটস্বরে ভেজা গলায় বিস্ময়-ব্যথিত সরু চোখে রাহুলকে দেখে মোহর।

রাহুল বলে—কাল পথের ওপর একজনের বন্দুক ছিনতাই হয়েছে মোহর ! আমি চলে যাচ্ছি ! যুদ্ধের কবিতাটি হঠাৎ যে কেন মনে পড়ে গেল ! বলেই রাহুল দ্রুতবেগে হাঁটতে শুরু করে। অশ্রুসজল মোহরের চোখ দিগন্ত অবধি রাহুলকে বিন্দুবৎ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত চেয়ে দেখতে থাকে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

॥ ২০ ॥

বুলবনের চোখে রাহুল ক্রমশ অধিক রহস্যময় হয়ে উঠছিল। আবার রাহুলের চোখে তার দাদাটি যেন কেমন অদ্ভুত, বেখাপ্পা এবং ঈষৎ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল দিনে দিনে। দাদার কথা বলা কমে যাচ্ছে, তার আত্মকুণ্ঠ ভাবটি আরও বেড়েছে। বউদির সঙ্গে সম্বন্ধ আর আগের মত নেই। চাকরির হতাশা, অসম্মানই কি এর কারণ ? দাদার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে রাহুলের। হাসানপুর থেকে বাড়ি পৌঁছতে তার দুপুর হয়েছে।

কাঁধের ব্যাগটা টেবিলের উপর ফেলে খাটে এলিয়ে পড়ে। পিঠের তলে বালিশ রেখে খাটের বাজুতে মাথা ঠেকিয়ে চিৎ হয়ে পায়ের উপর পা রেখে আধশোয়া তার এই বিচিত্র ভঙ্গিটি পুরনো। পুরনো এবং প্রিয় ভঙ্গিও বটে। এইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে চিন্তা করা এবং চিন্তা ও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। নূপুর এসে তাকে জড়িয়ে পাশে শোয়ার চেষ্টা করেছিল, আপন চাঞ্চল্যেই কিছুক্ষণ বাদে সে নেমে কোথায় চলে গিয়েছে। রাহুল আজ বোনটিকে তেমন তীব্র উষ্ণতায় স্পর্শ করতে অন্তরের তাগিদ পেল না, তার মনে এক ধরনের চাপ ক্রমাগত ভার হয়ে উঠেছে।

আয়েষা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন— তুই কি ঘুমিয়ে পড়লি মেজখোকা !

মায়ের কথায় বন্ধ চোখ খুলল রাহুল। তারপর বলল— না। কিছু বলবে !

—তোর সঙ্গে বহরমপুরে মণির দেখা হয়েছিল ? নাটা-ললিত মণিকে ডেকে নিয়ে গেছল।

—শুনেছি।

—বাবুর সঙ্গে ওরা দেখা করবে বললে !

—সবই শুনেছি মা।

—তাছাড়া নাটা বললেন, বুবনের একটা চাকরির ব্যবস্থা উনি করবেন। বউমাকে ওঁর বৈঠকে বসে ওষুধ বিলি করতে হবে। বাবুর মতন। আমি সেকথার কোন জবাব করিনি। খালি মণিকে পাঠিয়ে দিলাম, যদি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারে !

—ঠিক করনি। ওরা দু'জনই এই পরিবারটার সঙ্গে খেলা করতে চাইছে। ললিত প্রতিহিংসাপরায়ণ। ক্ষমা করতে জানে না। কেন মণিকে পাঠিয়েছিলে ! তুমি জেনে রাখো, ওরা আমাদের আরও বিপদে ফেলতে চাইছে।

—ব্যথা এসে হঠাৎ সেদিন বাবুর ওষুধের বাক্স জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেল। বউমা ওর বৈঠকে যেতে চায়নি বলে, চাকরের মত করে হাত-খরচ দেবে বলে লোভ দেখাল। বাবু নেই দেখে যত রকম দুঃখ দেবার তাই আমাকে দিচ্ছে ওরা। আমরা কি আর মানুষ আছি ওদের কাছে! বলতে বলতে আয়েষার গলা ধরে এল। উনি আঁচল তুলে মুখের উপর চাপলেন। নিজেকে একটুখানি সংবরণ করে বললেন— তোকে চা দেব, নাকি গোছল করে নিয়ে ভাত খাবি?

—চা দাও আগে।

—তোর পরীক্ষা পাশের জন্যে বউমা উঠে পড়ে লেগেছে। রাত জেগে জেগে নিজেই লেখাপড়া করছে। তোকে খুব ভালবাসে। দুঃখ হয় বাবা, আমার সংসারে এসে অমন সুন্দর মেয়েটা কোনও সুখ পেল না। খোদা ওর নসীবে সোয়াস্তি লেখেনি। শান্তি নাই। বুবনের কাণ্ড দেখে আমার ভয়ানক কষ্ট লাগে রাহুল। মণির সঙ্গে ক্ষেতে খামারে যাচ্ছে, কোদালে পা কেটে ফেলেছে! বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়েছে, বউমা বললে ইনজেকসন করতে, কান করল না।

এভাবে কাতর বিবরণ দেওয়ার পর আয়েষা রাহুলের মুদিত চোখ দুটির দিকে চেয়ে রইলেন দণ্ডভর। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে বাইরে চলে গেলেন। মায়ের ছায়া সরে যেতেই রাহুল মুদিত চক্ষু উন্মীলন করল। কথা শুনতে শুনতে সে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল। কথা সহ্য করতে না পারলে রাহুল অনেক সময় চোখ বন্ধ করে ফেলে। বিশেষ করে মায়ের বক্তব্য শোনার সময়।

চা নিয়ে এল চন্দ্রিমা। খাবারও এনেছে কিছুটা। সুজির হালুয়া, আলুর তরকারি আর পাতলা হাতরুটি।

রাহুল বলল—শুধু চা। খাবার নিয়ে যাও।

—এত বেলায়....বলে চন্দ্রিমা কথা অসমাপ্ত রাখে।

রাহুল থালার কিনারা থেকে কাপ উঠিয়ে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলে— এই চা খাওয়া নিয়ে তোমাদের পার্টির ছেলেমেয়েদের একটা বদনাম আছে। তারা নাকি চায়ের দোকানে চা চাওয়ার পরই এক গেলাস জল চায়। আর একটা লক্ষণ হল কাঁধের ঝোলা, মেয়েরাও কাপড়ের ব্যাগ ঝোলায়। এটা কি পার্টি ইউনিফর্ম?

কথার জবাবে চন্দ্রিমা রাহুলের চোখে চেয়ে হাসল কেবল। এক মিনিট পর বলল— মন্মথ, দেখেছি ইস্ত্রি করা জামা কাপড় পরত না। দাড়ি চুল কাটত না। কেমন অপরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসত। তোমাদের মেয়েরা শুনেছি, মুখে কোনও প্রসাধন ব্যবহার করে না।

—আমি সেসব জানি না বউদি! তবে চুলদাড়ি কখনও ছদ্মবেশ, কখনও সময়াভাব। যাক গে, চাষীবাসিরা খুব ফিটফাট লোকেদের দেখে মিশতে ভয় পায়। কিন্তু আমি পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন তুলব না।

—আমি তুলব। তোমার মাথার চুল খুব বড় হয়েছে। জামা কাপড় ময়লা করে রেখেছ। আমি খানিক বাদে জামা কাপড় ইস্ত্রি করে রাখব তোমার জন্যে। পরবে না? আমি কেচে রেখেছি।

—নিশ্চয়ই পরব।

—আচ্ছা!

চুপ করে থাকে চন্দ্রিমা। রাহুল ঘনঘন চায়ে চুমুক দিয়ে বলে— তুমি নাকি আমার জন্যে রাত জেগে পড়াশুনা করছ, মা বলছিল। কিন্তু আমি কি আর পরীক্ষা দিতে পারব!

—কেন ! শঙ্কিত গলায় বলে ওঠে চন্দ্রিমা।

রাহুল একবার সিনেমা হলের উচ্চশব্দসম্পন্ন বোমাটির তীব্র আওয়াজ শুনতে পায়। পর্দা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মুহূর্তে, সব অন্ধকার। দৃশ্যটি চোখে ভাসে। কাশিম বাজারে নাটার বন্দুক ছিনতাই হয়েছে। চিৎপুর মোহড়া গাঁয়ে সেই খবর কি এখনও রাষ্ট্র হয়নি ! কেউ তো কিছুই বলছে না ! রাহুল সেই সব ভাবতে ভাবতে বলে— পড়াশুনা করে কী হয় বল ! চাকরি হয় ?

—তবু তো মানুষ করে।

—বোকারা করে ! এবং উপায় নেই বলে করে। দাদা করেছে, তুমি করেছ। সেই বিদ্যা মানুষকে পথে বসায়। পার্টির লেজ ধরতে পারলে লাথিঝাঁটা খেয়ে চাকরি হতেও পারে। ফের হয়ত লাথিঝাঁটাই চাকরির সার সংকলন। তাই কি না ?

—তোমার দাদার কোদালে পা কেটেছে।

—জানি।

—আর বুলবন তোমার হিস্ট্রির নোট করছি দেখে হঠাৎ রাতে রেগে গেল। বললে, রিস্ক্যু হবে না। আলো নেবাও।

বউদির কথায় এবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রাহুল। চায়ের কাপ প্রায় নিঙড়ে শেষ করে টেবিলে রাখা থালায় রেখে দিয়ে বলল— তবু তুমি আলো নেবাওনি। রাত জেগে লিখেছ আমার জন্যে। তোমাকে বলি বউদি, আমার জন্যে তোমার খাটনি নিরর্থক ! চেষ্টা করো না।

—আমি এম. এ. পাস করেছি রাহুল ! বলে চন্দ্রিমা কেমন আর্ত হাহাকার করে উঠল। এবং বলল— আমি কারুকে পাসের খবর বলতে পারিনি। লজ্জা করল বলতে। ছেলেবেলায় পাস করলে কী যে আনন্দ হত !

চন্দ্রিমার কথা শুনতে শুনতে রাহুল স্তম্ভিত হয়ে যায়। অসম্ভব এক তীব্র কষ্ট তার বুকে বেজে ওঠে। দাদা-বউদির মধ্যে সে এই দেশের বেকারত্বের অন্তিম হীনতা প্রত্যক্ষ করে। শিক্ষিতের চূড়ান্ত অবসাদ, চরমতম বেদনা অনুভব করে। পরীক্ষায় পাস করে ফেলা যেন এখানে লজ্জা, এখানে সাংঘাতিক অপরাধ, সে ভারি কলঙ্কের ব্যাপার !

পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট যেমন এরা লুকোতে চায়, বিয়ের সার্টিফিকেটও বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। দুটি বস্তুই আনন্দের বিষয় হতে পারত কোনও এক শোষণমুক্ত সুখী সমাজ-ব্যবস্থায়, এখানে তাই-ই বড় লজ্জার কারণ। বউদি তো সবই জানে, তবু তার স্বর এখন ভিজে উঠল কেন ! মানুষ সব জেনেও হঠাৎ কখনও যে হৃদয় সংবরণ করতে পারে না, কখনও এমনই হয়। এই বধূটির মস্তিষ্ক যতই উন্নত মেধার সামগ্রী হোক না কেন, তা যে মানুষেরই রক্তমাংসের প্রক্রিয়া, তারও কোষে কোষে স্বাভাবিক দুঃখ, স্বাভাবিক বেদনার কারণ ঘটায় ; অশ্রু ঘনিয়ে তোলে অমোচনীয় ব্যর্থতা।

বউদির সামনে আর স্থির থাকতে না পেরে রাহুল খাট থেকে নেমে পড়ে। ওর কষ্ট আরও বাড়ে, বউদি তার পাসের খবর দাদাকে পর্যন্ত বলেনি। এ কি শুধু আনন্দের ঘটনাকে অবিশ্বাস, নাকি নিজেকে লুকিয়ে ফেলার কঠিন বিচ্ছিন্নতা ! দু'জনই কেন দু'জনের মধ্যে সংযোগ রাখে না। এই অনাস্থা কেন ? প্রেমের শক্তিই পারে যে-কোন বিচ্ছিন্নতা রোধ করতে, মানুষের মধ্যের প্রেম চলে গেলে একটি বিপ্লবও মিথ্যে হয়ে যায়। কেন যেন রাহুলের অতি অবশ্যই মনে হয়, বিপ্লবেরও একটা প্রেমার্থ আছে। একথা বউদিকে বলতে ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু পারে না। বলতে ইচ্ছে করে— বুলবন আমার বন্ধু,

জানো বউদি ! ওকে কষ্ট দিও না ! রাহুল তথাপি চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে থাকে শান্ত হয়ে। তারপর ভেতরের গলায় বলে— দাদা কেন, বিয়ের সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছে তোমার বোঝা উচিত বউদি। তুমি তোমার পাসের খবর বুবনকে বলতে পারছ না, ঠিক আছে। কিন্তু মানুষটার মনের অবস্থা তোমার বোঝা আবশ্যক।

—আমার এখন কেমন ভয় করছে রাহুল !

বউদির একথায় রাহুল কেমন চমকে উঠল। আর কোনও কথা বলতে পারল না। নীচে, উঠোনে কিসের যেন একটা ক্ষুদ্র গোলমাল শুনতে পায়। ফুলভানুর তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে ওঠে। চন্দ্রিমা এবং রাহুল দু'জনই নেমে আসে নীচে। দেখতে পায় শিউলিতলায় মোসলেম এসে দাঁড়িয়েছে। হায়নায় দংশিত বিক্ষত পা-খানি পুরু ন্যাকড়ায় জড়ানো, লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে, পায়ে মাছির পুঞ্জ ভন ভন করছে।

মোসলেমকে দেখে রাহুলের মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে যায়। মানুষ যে এভাবেও বেঁচে থাকে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না ! চলতে পারছে না, তবু ভিক্ষেয় বার হয়েছে। পেট বড় বালাই ! মুমতাজ বলেছিল, 'ভুখ ইনসানকো গদ্দার বনা দেতী হ্যা'। ক্ষুধা মানুষকে বিদ্রোহী করে। কিন্তু মোসলেমকে দেখে কখনও একথা সত্য মনে হয় না। বুভুক্ষা এদের কখনও জাগ্রত করে না। যুগ যুগান্তর এরা যেন এমনই নিশ্চল। মরে যেতে পারে না, বেঁচে থাকতেও পারে না। এদের কখনও সঙ্গে পাবে না রাহুল। তবু এরা রাহুলকে ক্রমাগত সম্মুখে ঠেলবে।

মোসলেম শিউলিতলায় লাঠিতে ভর দিয়ে অনেক চেষ্টায় কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে। ক্ষত পা-খানি মেলে দেয়। মাছিরা সরব, তেড়ে তেড়ে আসছে, তাদের খেদিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করছে না মোসলেম। বোধহয় সে জানে, মাছিগুলি তাকে ছেড়ে কিছুতেই নড়বে না। যতবার তাড়াবে, ততবারই তেড়ে আসবে। রক্ত আর পুঁজের নেশা আছে মাছিদের।

মোসলেম বসে বসে মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ ধোঁকাতে থাকে। মানুষ নয়, এ যেন ত্রস্ত-তাড়িত একটা জীব। মানুষের কাঠামো সত্ত্বেও যখন কাউকে মানুষ নামে প্রত্যয় হয় না, তখন মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদনা আরও প্রগাঢ় হয়।

মোসলেম বললে— শুলুক গেটের পানি ফিরা ছাড়ে দিয়েছে গো পারভিচ চাচা ! সম্বাদ আনেছি। দু'মুষ্টি চিড়ামুড়ি দেও বউমা। আমাকে এক পুরিয়া ওষুধ দিও মা।

গ্রাম-দিগরে মোসলেমের এক অনন্য ভূমিকা আছে। সে হল কাসিদ। কোরিয়ার। সংবাদবাহক। রাহুলের আজ হঠাৎ মনে হয়, একে কী বিপ্লবের কাজে লাগানো যায় না ? এ কী তার বিশ্বাসী পাত্র হতে পারে ? সে সংবাদ বয়ে এনেছে, বদলে সে চায় দু'মুষ্টি খোরাক। এভাবে সে গ্রামান্তরেও চলে যায়। ওই পা নিয়ে এখনও কি যেতে পারবে ! এই মানুষের কাঠামোর মধ্যে ইনসানিয়াতের কোনও অবশেষ এখনও কি রয়ে গেছে কোথাও ? নাকি কোথাও কিছু নেই, শুধুই কাঠামোটা পড়ে আছে ! অথবা ছিল কি কখনও ?

প্রথম দিকে মোসলেম খালি ভিক্ষেই করত, জীবনের গতিকে এখন সে সংবাদ চালান করার কাজে অন্নসংস্থান করে। গোদে ভারাক্রান্ত পা হায়নায় দংশিত করার পর তার আর উপায় নেই। সে বুঝেছে, খবর বইতে পারলে সহজেই ভাত জোগাড় হবে। মানুষ কী ধরনের সংবাদ চায় তার কাছে ! বউঝিরা মায়ের বাড়ির কুশল জানতে চায়। কে কেমন আছে ! মানুষরা, জীবেরা, ছাগল-গরু, বৃক্ষরা— কেমন আছে ! গাছে বউল এল কি না !

ভুঁসি ঘরের চালা ভেঙে পড়েছে কি না ! নতুন বউয়ের ক'মাস চলছে, অথবা বাচ্চা হল কি না। বাচ্চার রঙ, মুখের আদল, পুচকে না তাগড়া, নোলার রঙ লাল বটে তো ! বউয়ের হাতে লাল ধাগা বা সূতা বাঁধা হয়েছে, কিংবা লোহা পরেছে বউ, সেই বিবরণ। কালো গাইটার সাদা বাছুর কী চমৎকার লেজ নাড়ছে সেকথা। একেবারে সংবাদ-প্রবাহ যাকে বলে। সমস্ত নিখুঁত, তামাম অনুপুংখ। কেউ মায়ের ঘরে থাকলে শ্বশুর ঘরের খবর চায়। ক'মন পাট, কত মন ধান। কত ধানে কত চাল সবই তার জ্ঞাতার্থ এবং জ্ঞাতব্য বিষয়। মানুষের সংসার, মানুষের শ্রমের বহর, সবই সে সংবাদ-ভাষ্যে গেরস্তের সমুখে খাড়া করে দেয়। বাচ্চাদের পাস ফেলের খবরও তার ভিক্ষার ঝুলিতে সংগৃহীত থাকে। বউ শুধালো, আমার ছোট ননদ পাশ করেছে বাপজি ! মোসলেম ত্বরিত জবাব করে, হ্যাঁ, মা ! করেছে। ভালই করেছে। তুমার দেওরের ইবার আট কেলাশ হল !

কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেনের মৃত্যুর সংবাদ বয়ে নিয়ে গেছে একটি ঘণ্টাবাঁধা তীরবিদ্ধ অশ্ব, হোসেন যার সওয়ার ছিলেন। তাই কাসিদের কোমরে ঘণ্টা বাঁধা থাকে। অশ্বই সেই দৃশ্যে কাসিদ, অর্থাৎ কোরিয়ার। মোসলেমকে মানুষের মৃত্যু-শোকের দুঃসংবাদও বয়ে নিয়ে যেতে হয়। কেবল তার কোমরে ঘণ্টা বাঁধা থাকে না। শোকধ্বনি তার অন্তরেই বেজে চলে হয়ত ! রাহুল এই সবই ভাবছিল। এই মানুষটির সঙ্গে চয়ন খতিবের বেঁচে থাকার কোথায় যেন একটা গূঢ় অন্বয় খুঁজে পায় রাহুল। সীসাডিহার অন্ধকার পাড়ের জমিতে ওই খতিব বিল থেকে কালিপড়া লণ্ঠন হাতে উঠে এল সেদিন, হাতে বদনা, বদনায় বেলে মাছ। বালির উপর লাফিয়ে পড়ল, সেই মাছ তুলে জল নিঙড়ে নিয়ে বদনায় ভরে ফেলল চয়ন। টগর বউকে ডেকে তুলল ঘুম থেকে। সেই মাছ টগরের উঠোনে বদনা উপুড় করে নামিয়ে দেয়। তারপর চয়ন তার দাওয়াত কবুল করিয়ে নেয় টগরকে দিয়ে, বউ চয়নকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই নেমন্তন্ন করে। খতিবের মান আছে, কিন্তু অন্ন জোগাড় করার পদ্ধতিটি ভিখিরির চেয়েও করুণ। অথচ মানুষ বাধ্য বটে, আবার করুণাও করছে, দুই সমান বাধক, আবার এ যেন জীবনেরই রেওয়াজ !

'জীবন লইয়া কী করিব'— এই প্রশ্ন হেথা উত্থাপন করা বৃথা। জীবন এখানে প্রশ্নহীন এবং নিরুত্তর। এর অন্তরে কোনও জিজ্ঞাসা নাই, কোনও কিছু নাই। অথচ রাহুল, ঠিক এখান থেকেই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাইছে। চয়ন করবে না, মোসলেমও হয়ত করবে না। অন্তরে জিজ্ঞাসা নেই দেখেই যে অন্তর হাহাকার করতে থাকে।

অবশ্য ন্যালার মৃত্যুর দিন মোসলেমকে রাহুল পথের উপর ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল— কী হয়েছে চাচা !

মোসলেম কষ্টেসৃষ্টে শ্বাস টেনে বলেছিল— শশাঙ্ক শুনছি, ছোঁড়াকে বেঘাত মেরছে। বাঁচেই কি না ! গরুর পায়ে ফাল নেগেছে। যাও পারভিচ, দ্যাখো দিকিন, ছাওয়ালডা আছে কি নাই ! ন্যালাখ্যাপার জান ! দাম আছে ?

এখানে কি সত্যিই কোন জিজ্ঞাসা ছিল না ? রাহুল আপন মনে কথাটিকে সাধুভাষাতেই প্রায় বঙ্কিমী কায়দায় সাজিয়ে ফেলে— জীবন লইয়া কী করিতে হয় মোসলেম না জানিতে পারে, কিন্তু কোনরূপ প্রশ্ন করিতে জানে না এবং কোনরূপে বিস্মিত হইতে জানে না, তাহা কী প্রকারে বলিব ! বরং বলিব, তাহারও হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা থাকিয়া গিয়াছে, অপরিমেয় জীবনের সন্নিধে সেই প্রশ্ন তুলিতেও তাহার ভয় করে, হৃদয় সাহসী হয় না। নহিলে সে ন্যালাখ্যাপার জান, দাম আছে, বলিয়া বিস্ময় ও বেদনা প্রকাশ করিত না।

রাহুল মোসলেমের কাছে এগিয়ে যায়। ঝুঁকে পড়ে। বলে—পানি ছেড়ে দিয়েছে!

—হ্যাঁ বাপ।

—তুমি দেখে এলে?

—জি।

—কী দেখলে, গেট অনেক তুলেছে?

—সামান্য। তাইতেই হা হা করছে পানি।

—আর কিছু জানো তুমি! বলে মোসলেমের কাছে উবু হয়ে বসে রাহুল। এভাবে কাছে ঘেঁষে বসতে দেখে লোকটি ঈষৎ সংকোচ বোধ করে। একটু গা টেনে নিয়ে সাবধানে চোখ মেলে রাহুলকে দেখে। তারপর বলে— মাহেফরাসরা তরফদারের পালাঙ্গায় মিটিন ডাকছে আজ সাঁঝে। উরা তিমিরবরণকে ধরেছে। বুবন চৌধরীকে মাঠের ভিতর একজন খবর করল শুননু। বুবন মিটিনে যাবে। এই তক কথা।

—হ্যাঁ। আর কিছু শুনলে?

—কী?

—তরফদার কী বলছে?

— জানু না।

— ব্যথা খালা?

— জানু না।

—তিমির কেন এই মিটিঙে আসছে!

— আছে। পার্টি বেকার হয়েছে। সে আছে। লক্ষ্মণকে হাসপাতাল লিয়ে যায় সেদিন, মাথায় ব্যান্ডেজ করে ডাক্তার। সবই তিমির করেছে।

— ন্যালা মরল, সেই ব্যাপারে তিমির বলে না?

— না।

—কিছুই বলে না?

—কহে, হায়াৎ ছিল না, বাঁচেনি।

—সোভান? তার হায়াৎ ছিল?

—জানু না বাপজি! হায়নায় খায় আমাকে, আমি সব কথা জানি না বাপ!

—তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি মোসলেম চাচা?

—জি! বলে মৃদু কেঁপে উঠল মোসলেম, কেমন দুর্বোধ্য ভয়ে।

বন্দুক ছিনতাই হয়ে গেল, অথচ গাঁয়ে কোনও খবর নেই, বড়ই আশ্চর্য ঠেকে। রাহুল ভাবছিল, মোসলেম খবর দিতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে, নাটা এবং ললিত ঘটনাটি চেপে যেতে চাইছেন। কিন্তু চেপে যেতে চাইছেন কেন তাঁরা? ভয়ে মানুষ এ রকম করতে পারে। সেকথা ঠিক। যদি তাই-ই হয়, তবে বলতে হবে ঘটনাটি ঘটিয়ে যথার্থ একটি পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন ডাক্তারদা। কিন্তু যদি ভয়ে বা সন্ত্রাসে এই নীরবতা না ঘটে, যদি এটা ললিতের কোন কৌশল হয়?

—তুমি নাটার বাড়ি যাবে একবার, চাচা? যাবে না?

—যেয়েছিলাম পারভিচ।

—আচ্ছা! বলে রাহুল স্থান ত্যাগ করে চলে আসে দোতলায়। চাপা এক অস্থিরতা তাকে হঠাৎ আক্রমণ করতে থাকে। এই ঘটনার যদি রটনা না থাকে, শত্রুপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া না থাকে, তাহলে এই চেষ্টা কী ব্যর্থ হয়ে গেল না? রাহুল ভাববার চেষ্টা করে,

এই নীরবতাও বোধ করি এক ধরনের ভয়। এই ভয় ছাড়া কমরেড সি. এম-এর রাজনীতির আধিপত্যের পথ প্রশস্ত হয় না। মাহেফরাসদের সাহসী করে তুলতে হলে এই ছিনতাই প্রোগ্রাম জরুরি। শশাঙ্কর হাতে বন্দুক ছিল বলেই তো সোভান আলি খুন হয়। বন্দুকের গুলি ছুঁড়েই মাহেফরাসদের ভয় দেখিয়েছে শশাঙ্ক। ইকবাল ভুঁইয়ার পায়ের উপর ভারী জুতা তুলে দিয়ে কঠিন আঘাত করেছে ওই বন্দুকের জোরে। নাটার বন্দুক ছিনতাই হয়েছে, বন্দুক যে ছিনতাই হয়ে যেতে পারে একথা শশাঙ্ক কল্পনাও করতে পারে না। এবার কল্পনা করতে শিখবে।

এই অবধি ঘটনা ঠিক আছে। কিন্তু তারপর ? তারপর যে কী, রাহুল জানে না। শুধু মনে হচ্ছে, বিপ্লবটা বোধহয় তাড়াহুড়ার জিনিস নয়। প্রণামপুর এলাকায় কাজ কতটা হয়েছে, হরবোলার সংগঠনের অবস্থা কী, সঠিক জানা নেই। হরবোলার আত্মগোপন রহস্যময়, কোনও একটি এলাকা তিনি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, আবার তিনি অ্যাকসান করে বেরিয়ে যেতেও চাইছেন। ঘাঁটি এলাকা এবং মুক্তাঞ্চল গড়তে হলে এই পদ্ধতিটা কি অ্যাডিকোয়েট হবে ? বাবার নামটিকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, অথচ অ্যাকসান করে বেরিয়ে চলে যাওয়ার কথাও বলা হচ্ছে ! রাহুল ভেবে পাচ্ছে না, কমরেড লিন পিয়াও বন্দুকের উপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা সঠিক কিনা !

ভাবনার মধ্যে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে রাহুল। সাদা চৌধুরী হঠাৎ এক শস্যগন্ধ-আমোদিত গ্রামের চারাতলা থেকে পুলিসের কালো ভ্যানে উঠে জেলে চলে গেলেন, এই ঘটনার এক অসহ আকস্মিকতা ছিল। অসহ আকস্মিকতা কথাটি অত্যন্ত যুৎ। রাহুল ভাবে, এই ঘটনার জন্য দায়ী ছিল সময়। ছিল এই দেশের ব্যবস্থা। সোভান আলির গলায় বাঁধা লাল রুমালের প্রদর্শনী করেছিল তিমিরবরণের দল, এই ঐতিহাসিক ভুয়া সংগ্রামের দায় সাদা চৌধুরীর কাঁধে চাপান হল ! তারপর একটি বন্দুক এল গ্রামে। সময় বন্দুকটিকে এনে ফেলেছে, কালো ভ্যান এবং বন্দুক এসে পড়ার জন্য বাপুর কোনও ভূমিকাই ছিল না। তাঁর জীবনে এই সমস্ত ঘটনার অসহ সংযোগ ঘটেছে। বাবা কখনওই এই সব ঘটনা কামনা করেননি। রাহুল এখন সেই ঘটনাবলীর কেন্দ্রে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়েছে। তার মনে হচ্ছে, ঘটনা এবং সময়ের এই উৎক্ষেপণ অপ্রতিরোধ্য।

কদম আলি যদি তাকে ওভাবে রাত্রির হোটেলে বাপুকে ধরিয়ে দিয়ে ঘুষের টাকায় ভাত খেতে না ডাকত, কিংবা শশাঙ্ক যদি আমানিকে পিটিয়ে মেরে পাহারা দিয়ে দিয়ে অসহায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিত, তবে হয়ত রাহুল বাপুর জেলের বন্দীত্ব মেনে নিত মুখ বুজে, সে মানুষের শ্রেণী অত্যাচারের ইতিহাস সম্বন্ধে কখনও হয়ত সজাগ হয়ে উঠত না। যত ঘৃণা, তত ভালবাসা, এই সত্যোপলব্ধি ঘটে যায় সি. এম-এর রাজনীতির প্রজ্ঞায়। রাহুল বিশ্বাস করে শ্রেণীঘৃণার উপলব্ধি তাকে তাড়িত করে চলেছে। এই ঘৃণার তীব্র উৎসার আকাশকে সমাচ্ছন্ন করে, ইতিহাস সেই উদ্গীরণ দেখেছে, ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে এমারজেন্সির তামাম প্রেক্ষাপট। কী করবে রাহুল ?

খাটে চিৎ হয়ে বাজুতে মাথা রেখে পিঠের তলায় বালিশ রেখে আধশোয়া রাহুল তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। সি. এম-এর 'ঐতিহাসিক আটটি দলিল' বইটি পাঠ করতে থাকে। অষ্টম দলিলের উপর চোখ রেখে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকে।

..."মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার সংগ্রামই আজকের দিনে কৃষক আন্দোলনের সবচেয়ে জরুরী, আর এই মুহূর্তের কাজ। মুক্ত অঞ্চল আমরা কাকে বলব ? যে কৃষক অঞ্চল

থেকে আমরা শ্রেণীশত্রুর উচ্ছেদ করতে পেরেছি সেই এলাকাকেই আমরা মুক্ত অঞ্চল বলব। এই মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য চাই কৃষকের সশস্ত্র শক্তি। এই সশস্ত্র শক্তি বলতে আমরা কৃষকের হাতে গড়া অস্ত্রকেও যেমন ধরি, ঠিক তেমনি বন্দুকও চাই। কৃষক রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা তা আমরা বুঝব কৃষক বন্দুক সংগ্রহ করতে অগ্রসর হল কিনা এর ভিত্তিতে। বন্দুক কৃষক কোথায় পাবে ? শ্রেণীশত্রুদের হাতে বন্দুক আছে এবং তারা গ্রামের মধ্যেই বাস করে।..... এই বন্দুক সংগ্রহ অভিযান যে এলাকায় আমরা সংগঠিত করতে পারব সেই এলাকা দ্রুত মুক্ত এলাকায় রূপান্তরিত হবে।"....

তাই কি সম্ভব ? সত্যিই কি এভাবে এই এলাকা মুক্তাঞ্চলে পরিণত হবে ? তুহিন এবং খোদা বক্স কি সত্যিই কোনও কৃষক ? অবশ্য খোদা বক্স হাল চষতে পারে, মাঝে মিশেলে জমিতে নামে। মুমতাজের মুখে তুহিনের পরিচয়ও শুনেছে। তুহিন ফিজিকস অনার্স পড়ত, এক রোড কন্ট্রাকটারের ছেলে, ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে। পড়াশুনা ছেড়েছে, প্রচণ্ড গাঁজা খায়। এরা তো গরিব কৃষক নয় ! খোদা বকস একটি রেডিমেড কাপড়ের দোকান চালায় চুনাখালি নিমতলায়, চাষবাস ওর শখের কাজ। তুহিন তো জামগাছ চিনতে পারে না ! খেসারিকে মটরশুঁটি মনে করে। তাহলে ?

হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছে চন্দ্রিমা। রাহুল হকচকিয়ে ওঠে।

—কি চাই ? রাহুলের এই প্রশ্নে অবাক আর ঈষৎ আহত হয় চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমা কিছুক্ষণ কোনও কথা বলত পারে না।

—আমি বুঝি আসতে পারি না ? তোমার কী হয়েছে রাহুল !

—কেন, আমার কী দেখলে তুমি ?

—গোপনীয়তা ভাল, কিন্তু এত গোপন করলে, কৃষক তোমাদের চিনতে পারবে না।

—ও। আচ্ছা ! তাই নাকি ! কিন্তু তোমরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী তো দু'জনকে আজ চিনতে পারছ না, তার কী হবে ! আগে ঘর সামলাবে, তারপর অন্যকে বলবে !

এবার এক চরম আঘাত এসে পৌঁছায় চন্দ্রিমার বুকের মধ্যে। সে প্রায় পাণ্ডুর হয়ে যায়। অত বুদ্ধিমতি চন্দ্রিমা এ মুহূর্তে প্রায় বালিকার মত নিরস্ত্র ভাষায় বলে ওঠে— আমি বুলবনকে ভালবাসি রাহুল ! বলেই সে ছিটকে বাইরে চলে যায়। সহসা তার গলা ক্ষীণভাবে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষ অসহায় হলে ভাষা বুঝি এমনই সরল হয়ে যায়। নীচে নেমে চন্দ্রিমা বিছানার উপর চুপচাপ বসে থাকে। কী প্রশ্নের কী জবাব করল সে ! অমন আক্রমণই বা করল কেন রাহুল ! আক্রমণ করার সুযোগই বা সৃষ্টি হল কেন ?

ভাবতে ভাবতে দুয়ারের খোলা পথে শিউলিতায় চায় চন্দ্রিমা। মোসলেম ছেঁড়া গামছায় শাশুড়ির দেওয়া মুড়ি বেঁধে নিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে ! ফুলভানু তাকে সদর দরজার দিকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে চন্দ্রিমা যেমন স্বামীর কথা ভাবে, তেমনই রাহুলের কথা না ভেবে পারে না। দু'জনকেই তার চাই। দু'জনই তার বৈপ্লবিক হৃদয়ের সমান কক্ষ। মন্মথ ওরফে ছোটনকে সে ছাড়তে পারবে না। আবার যে মানুষটির ভালবাসার টানে সে এত পথ ভেঙে এই অন্ধকার নিবিড় গ্রামটির হৃদয়ে পৌঁছে গেছে, সেই প্রেমকেও সে বিসর্জন দিতে পারে না। তার বোধ হয় মাথার ঠিক নেই, কথা কেমন অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে ! রাহুল যে ক্রমশ এক জীবন-জটিলতার দিকে এগিয়ে চলেছে, কোথাও কিছু ঘটিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, যেমন মনে হত মন্মথকে, সেই জটিলতা একাই কেন বহন করবে দেবরটি ! তার বিভ্রান্তি কি দূর হবে না ! মনে হচ্ছে, হৃদয় দিয়ে তাকে জড়াতে চাওয়া এক দুরূহ শক্তির

ক্ষমতা, তাকে সে বোঝাবে কী করে ? হঠাৎ মনে হয়, বুলবনকে হারালে সে রাহুলকেও পাবে না !

কোথাও যদি সি. এম. আর. জি. এস. না মিলেও থাকেন কখনও কোনও কালে—তার হৃদয়ের সরণিতে, কেবল তারই সূর্যোদয়ের পথে, দু'টি প্রবাহ হৃদয়েরই দুরূহ শক্তিতে এক হয়েগেছে। আজ তার দলের সর্বোচ্চ নেতার রাজনীতির প্রকৃত ক্ষমতাই রাহুলকে বলিষ্ঠভাবে টানতে পারে তার দিকে। বুলবনকে আরও ভালবাসার জোরই তার একমাত্র পথ, বুলবন রক্ষা না পেলে, রাহুলও রক্ষা পায় না। স্বামীর ছবিটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রিমা নিঃশব্দে কেঁদে ফেলে। ফটোটা সদ্য বাঁধানো হয়েছে, সামনের টেবিলে আয়নার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্রেমটি। ক্ষীণ হাসি মাখা মুখ।

ফটোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে মেঝের কোণ বরাবর ট্রাঙ্কটির দিকে চায়। উঠে দাঁড়িয়ে তোশকের তলায় হাত চালিয়ে চাবিগাছা বার করে। চাবি দিয়ে শান্ত মনে ট্রাঙ্কের তালা খুলে সার্টিফিকেটের খামটা তুলে নেয়। খামের ভিতর থেকে ছেঁড়া চোথাটি চোখের সামনে মেলে ধরে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রিমার হঠাৎই প্রবল কান্না পায়। কিছুক্ষণ একমনে ছিন্ন কাগজখানি দেখতে দেখতে কাঁপা কাঁপা হাতে খামেরই মধ্যে সেটিকে চালান করে দেয়। 'এভাবে ছিঁড়ে ফেললে কেন !'

বুলবনের উদ্দেশে স্বগতোক্তি করে চন্দ্রিমা। শাঁখা সিঁদুর পরি না, কাগজের সামান্য চিহ্নটুকুর উপর এত অশ্রদ্ধা জাগল কেন তোমার ! আমাদের সম্বন্ধের আর কোনও সাক্ষ্য নেই, কোনও প্রমাণ নেই কোথাও। তুমি কি তাহলে এতই বিড়ম্বিত হয়েছিলে, সমাজের সামনে আমাদের সম্পর্ককে উপহাসের সামগ্রী হতে না দেওয়ার বিপন্ন কোনও বোধ তোমাকে এতই বেসামাল করেছে যে, সামান্য কোর্টের সিলমোহর করা কাগজটাই তোমার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে ! এভাবে তুমি নিজেকেই আক্রমণ করে বসেছ, বুঝতেও পারনি ! অথচ তুমি হয়ত বুঝতে পারছিলে, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না !

পার্টি অফিস থেকে ফিরে এসে বুলবন বউকে কোনও মন্দ কথা বলেনি। কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করেনি। ক'দিন থেকেই সে গভীর রাত করে বাড়ি ফিরছে সদরঘাট থেকে। সেখানে নাকি অনেক সংযোগ তৈরি করতে পেরেছে শরৎ শতবর্ষের ব্যাপারে। চন্দ্রিমাকে বলেছে, সদরঘাটের বিভিন্ন পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে চন্দ্রিমা যদি কথা বলতে পারে, ফল ভাল হবে। কাজের কথা ছাড়া আর কোনও কথা বলেনি বুলবন। সাহস করে চন্দ্রিমা জিগ্যেস করতে পারেনি, বহরমপুর পার্টি অফিসে তার চাকরির বিষয়ে প্রাণদার সঙ্গে কী কথা হল ! 'আজান' পত্রিকার কথা নিশ্চয় উঠেছিল !

বুলবন বিষণ্ণ চোখে চন্দ্রিমাকে দেখে। তাকে কি ঘৃণা করছে বুলবন ? টেবিলের ফটোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রিমা আঁচল দিয়ে ছবিটার কাঁচে বুলিয়ে বুলিয়ে চলে, যেন সে স্বামীকে স্পর্শ করছে বারবার। সারাটা দিন মাঠের ক্ষেতে মণির সঙ্গে পড়ে থাকে এবং বিকেল হলে সাইকেল তাড়িয়ে সদরঘাট চলে যায়। ফিরতে ঢের রাত। ফিরে এসে ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে তলিয়ে যায়। খেতে খেতে দু'চারটি কথা হয়। তা-ও প্রোগ্রাম সংক্রান্ত। বুলবন কিছুতেই বলে না, প্রাণদা কী বলেছেন তাকে ! সেকথা তোলারও সাহস হয় না চন্দ্রিমার ! অথচ এ কোনও পার্টি-পদ্ধতি হতে পারে না। এই শীতলতা মারাত্মক ! আজও বিকেলে বুলবন বেরিয়ে চলে গেল। রাহুলকে দেখেও তার মুখে কোনও হাসি ফুটল না। একবার খালি বলল— মাহেফরাসদের মিটিঙে যেতে হবে।

রাহুল বলল—আমি কি তোমার সঙ্গে যাব ?

বুলবন বলল—খুব ঠাণ্ডা মাথার কাজ রাহুল ! তোর যাওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া আমাকেই ডেকে গেছে শরম আলি। তিমিরবরণের ডাকে এই মিটিঙ, ললিত আছে ঘটনার মধ্যে !

—আমি গেলে কি মিটিঙ বানচাল হয়ে যাবে নাকি ! ঠিক আছে, বউদি তোমার সঙ্গে যাক !

—না। তাকে ডাকেনি কেউ।

—বাঃ ! ডাকেনি বলে যেতে হবে না ? জলগেটের ওখানে মারামারির সময় তিমির যেমন উপস্থিত ছিল, বউদিও তো ছিল ! তাকে ডাকেনি, মেয়ে, সেই অজুহাতে। জানি, এটাই অজুহাত। কিন্তু ঘটনা সেই-ই দেখেছে, আমরা দেখিনি। বউদির সাক্ষী ছাড়া মাহেফরাসদের পক্ষে আর কিসের জোর আছে ! তুমি সেই সুযোগ চাও না ? কথা তো উঠবেই ! শশাঙ্ক বন্দুক ছুঁড়েছে, বউদি তা দেখেছে ! ওই বন্দুক বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। আমাকে যেতে দিচ্ছ না, আমি গেলে সেই দাবিই তুলতাম।

—সেকথা কি আর উঠবে না !

—কথা উঠবে। সরকার বন্দুক বাজেয়াপ্ত করুক, এই দাবি যদি সভাকে কন্‌ভিন্স করাতে না পার, তাহলে বলব, মিটিঙে যেও না। শুধু কথা তুলে লাভ নেই !

দুই ভাইয়ের তর্কাতর্কির মধ্যে আয়েষা এসে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। পিছু পিছু দোতলা থেকে চন্দ্রিমাও নেমে আসে।

আয়েষা বললেন—শশাঙ্কর ওই বন্দুক বাবা, সব ঘটনার মূল। সরকার ঘটনা ঘটাবার জন্যই তো ওই বন্দুক দিয়ে রেখেছে ললিতের হাতে। ওই জিনিস বাজেয়াপ্ত করাবি কী করে, বড় লোকের বন্দুক কেউ কাড়তে পারে না। ডাকাত দমাবার নাম করে সরকারি লাইসেন্স পায়, তারপর ওই দিয়ে মানুষ মারে ! যাও মা দোলা, তুমি এই কথা ক'টা মিটিঙে গিয়ে বলে দিয়ে এসো। ওই বন্দুক আমার সর্বনাশ করেছে ! একথা বললে যদি দোষ হয়, তাহলে তরফদারকে বলো, আমিই দায়ী। ব্যথার যেমন স্বামী আছে, সংসার আছে, আমার বুঝি থাকতে পারে না ?

বলতে বলতে মা ফুঁপিয়ে উঠলেন মুখে আঁচল চেপে। রাহুলের চোখ দুটি হঠাৎ ধক করে জ্বলে উঠল। মাকে তার এখন একবার প্রণাম করতে ইচ্ছে হল। মায়ের উপলব্ধি তার যেন রাজনৈতিক দর্শনের উপলব্ধি। মা যেন তার পার্টিরই মেয়ে। মানুষের জীবন থেকে শিখতে হয়, একথা যে কত সত্য, রাহুল এখন সেকথাই ভাবছিল। এমন মাকে সে কখনও দেখবে ভাবতে পারেনি। মা তলে তলে বাপুর কথা ভেবে ভেবে এই সত্যে পৌঁছেছেন যে, বন্দুকই আসল ক্ষমতা।

বুলবন মায়ের কথা গ্রাহ্য করেও বলল—ঠিক আছে। কিন্তু মিটিঙে প্রথম দাবিটা হবে গেটের চাবি। মাহেফরাসদের জীবনের এটা একটা প্রাথমিক দাবি, ন্যায়সঙ্গত দাবি। দ্বিতীয় দাবি হবে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করার দাবি। এক্ষেত্রে বন্দুকের দাবিকে অধিক জোরদার করলে একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচি বাধাপ্রাপ্ত হবে। আমি অনেক ভেবেই একথা বলছি। তোমাদের কথা আমি ফেলে দিচ্ছি না !

রাহুল ঈষৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল—প্রকাশ্যবাদী সংগঠনের এই একটা দোষ বউদি, তা মানুষকে উত্তেজনা দমন করতে শেখায়, মানুষকে মার খেতে শেখায়, মারতে শেখায় না। উত্তাপকে প্রশমিত করার মধ্যেই রয়েছে সংসদীয় রাজনীতির লক্ষ্য আর শোধনবাদের

কৌশল ! নেতারা না বুঝেও সে কাজ করে। মানুষের ক্ষোভ, যন্ত্রণা আর উত্তাপের বাজে খরচ অনেক হয়েছে, আসল কাজ কিছুই হয়নি।

চন্দ্রিমা এবার অত্যন্ত সংযত স্বরে বলল—আসল কাজটা চকমকির আগুন নয় রাহুল। সেটা অগ্নিকুণ্ডের আগুন, ক্রমাগত তাতে ঘি ঢালতে হয়, একটার পর একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র, বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। চাবি আদায় এবং বন্দুক কেড়ে নেওয়া পরস্পর পরিপূরক। কেড়ে নেবে সরকার, তাই হবে দাবি। মানুষের হাতে তুলে দিলে তার ব্যবহারের যোগ্য সংগঠন প্রয়োজন হবে। আমরা দাবি করব, 'বাজেয়াপ্ত কর।' মানুষের হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিলে ফল খুব ভাল হবে না। টিট ফর ট্যাট, ইট মারলে পাটকেল ছোঁড়ো, মাও-সে-তুঙের এই কৌশল বিশেষ সময়ে, বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য।

রাহুল কিছুতেই বউদির কথা মেনে নিতে পারে না। ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে গুমরে উঠতে থাকে। রাগত গলায় বলে—শরৎ-জন্ম পালনটা তাহলে কী বউদি ? মুভমেন্ট !

চন্দ্রিমা বলল—সাহিত্য-পাঠ কোনও বিলাসের কাজ নয়। শরৎ-সাহিত্য তো নয়ই। বড় সাহিত্যের গুণই হচ্ছে, তা মানুষকে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বদলে দেবার, উন্নত করার চেষ্টা করে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপায়ে সেটা মানুষের অন্তরে কার্যকরী হয়। দুনিয়াটা বদলাবার আগে মধ্যবিত্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সাহায্যে নিজেকে বদলে আরও উন্নতস্তরে নিয়ে যায়, এটাও আন্দোলন বই কি ! সেই পরিবর্তনের উৎস মার্কসের ক্ষেত্রে শেক্সপিয়ার যেমন, লেনিনের ক্ষেত্রে টলস্টয়। আমাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র। লেনিনের কথাই আছে, টলস্টয় আগে থেকেই রুশ-বিপ্লবের মানসক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর দল টেকনিক্যাল রেভ্যলুশনটা করতে সক্ষম হয়েছে। আমি কোনও বক্তৃতা করতে চাই না রাহুল ! আমি আমার বিশ্বাসের কথা বলতে পারি।

রাহুল বিস্ময়-ব্যথিত চোখে বউদি এবং দাদা আর মায়ের চোখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে নিতে অস্ফুট বলল—তো।

বউদি বলল—আমি দুটি দাবিই সমানভাবে উত্থাপন করতে চাই ! আমি মিটিঙে যাব। আমি যা দেখেছি বলব। বুলবন না চাইলেও যাব। ভদ্রলোকের রাজনীতিরও যে জোর থাকতে পারে, সেটা বোঝানো দরকার। ভদ্রলোকের পলিটিক্সেরও একটা অভদ্র দিক আছে। তবে সেটারও সংযম আছে। বিপ্লব একদিনে হবে না। বলে বউদি দোতলায় চলে গিয়ে ইস্ত্রি করার জন্য রাহুলের জামা কাপড় খুঁজে নিতে থাকে।

সন্ধ্যায় মিটিঙে লোক জড়ো হয়। সবাই জেলে। মোহড়াগাঁয়ের কিছু জনমানুষ আসে। নাটা, ললিত, শশাঙ্ক কারও দেখা মেলে না। তিমিরবরণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে একখানা সাইকেল নিয়ে বলে—আমি সদরঘাট থেকে ঘুরে আসি বুলবন। দেখি, তরফদার, ললিতবাবুরা ওখানে রয়ে গেলেন কেন ! মনে হচ্ছে কোনও গোলমাল হয়েছে।

চন্দ্রিমা বলে—আপনি ফিরে আসবেন তো ?

তিমিরবরণ বলে—মিটিঙ তো আমিই ডেকেছি ! চাষা আর মাহেফরাসের লড়াই সিধে জিনিস না দিদি। অপেক্ষা করুন। না ফিরলে জানবেন, এ মিটিঙ হচ্ছে না ! বলেই তিমিরবরণ টর্চ জ্বেলে সাইকেল ছুটিয়ে দিল।

রাত্রি বেড়ে চলল। ধীরে ধীরে কথা উঠতে লাগল, মিটিঙ হবে না। ধীরে ধীরে তিমিরবরণের কথার ইংগিত বুঝে উঠল সবাই। দু'চার জন চিৎকার করল প্রণামপুরী মানুষ। বুলবন বুঝতে পারল, মিটিঙের নামে একটা তামাসা করা হল আজ। অত্যন্ত

রহস্যময় সমস্ত বিষয় !

মানুষ ধীরে ধীরে উঠে চলে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল, শরম আলি নেই। কথার গুঞ্জন বিচিত্র হয়ে উঠল। উচ্চকিতও হল. কোনও কোনও কণ্ঠ।

এক সময় দেখা গেল, চন্দ্রিমা আর বুলবন বাদে দু' চারটি মানুষ বসে আছে। তারাও আর থাকতে চাইছে না। ব্যথা বিবি একবার মাত্র দুয়ার খুলে প্রাঙ্গণের সভাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তরফদার কোথায় আছেন তিনি জানেন না। বাড়ির ভিতর থেকে আর কোনও স্বর শোনা যায়নি। দুয়ার নীরব। বন্ধ। চাকরবাকররাও কোনও কথা বলতে চায়নি।

রাত দশটা বেজেছে। হঠাৎ ব্যথা বিবি চাকর বলে চন্দ্রিমাকে ডেকে পাঠালেন ভিতরে। চন্দ্রিমা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হাত ধরে সন্তর্পণে ব্যথা একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে অতি অনুচ্চস্বরে বললেন—একটা কথা তোমাকে আজ বলছি বউ। রাজনীতি করছ কর। আমাদের যন্ত্রণা দিও না !

—আমি কী করেছি ব্যথাখালা ! রাজনীতি আপনারা করছেন না ! তিমির কী করল এতক্ষণ !

—সে কথা তার কাছে বুঝে নাও। চাবি দেবার মালিক কি সে ?

—আপনি দিয়ে দিন !

—না। কখ্‌খনো না বউ। পার যদি কেড়ে নাও। আমি যা বলছি শোন। মন দিয়ে শোন। একথা দু'কান হলে আমি তোমাকে গাঁ ছাড়া করব। আমার স্বামীর বন্দুক ছিনতাই হয়েছে কাশিমবাজারের রাস্তায়। আমরা চেপে রয়েছি। তরফদার আমাকে বলেছে, এই বন্দুক ছিনতাইয়ের সময় মুখোস-পরা মণিকে চেনা গিয়েছে। অবশ্য সন্ধ্যার আঁধারে ভুল হতেও পারে। তোমাকে বললাম, আসল কথাটি আমার চাই। মণি কি ছিল সেখানে ? তোমাকে সেকথা বার করে আনতে হবে। যদি পার, বাবুর ফ্যামিলিকে আমি রক্ষা করব। কথা দিচ্ছি, কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে।

একথা শুনতে শুনতে চন্দ্রিমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। পথে নেমে মনে হয় মাটি কাঁপছে।

॥ ২১ ॥

ব্যথাখালা কী বললেন তোমাকে ? পথে অনেকক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে বুলবন চন্দ্রিমাকে এক সময় প্রশ্ন করে ওঠে। চন্দ্রিমা কোনও উত্তর দিতে পারে না। সে এতই হত-বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে, স্বামীর প্রশ্নটিও তার কানে স্পষ্ট পৌঁছায় না। ব্যথা যেভাবে মণিকে দোষী সাব্যস্ত করছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে জীবনটা কীভাবে সামাল পড়বে ! মণি কি সত্যই কাশিমবাজারের পথের উপর মুখোস পরে দাঁড়িয়েছিল ?

বুলবন ফের প্রশ্ন করে—কী হল, কথা বলছ না যে !

চন্দ্রিমা অসহায় সুরে বলল—কী বলব, তাই ভাবছি ! অমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

বুলবন ক্ষীণস্বরে হেসে ফেলে বলে—নাটা এবং ললিত সদরঘাটে তৈমুরের দোকানে এখনও বসে আছে, তিমির গিয়ে ওদের ফিরতে বারণ করে দিয়েছে। এই সব চাল বিশ্বাস করা বাস্তবিক কঠিন। ব্যথা কখনও চাবি ছাড়বে না।

চন্দ্রিমা বলল—হ্যাঁ।

বুলবন বলল—সেই কথা বলবার জন্যই বাড়ির মধ্যে ডাকা!

চন্দ্রিমা অন্যমনস্কসুরে আবার 'হ্যাঁ' বলে চুপ করে যায়। তার বেশি কথা বলারও ইচ্ছে হয় না এখন। বুলবনকে সমস্ত প্রকাশ করার বিপত্তি আছে মনে হয়।

বুলবন সহসা অদ্ভুত কথা বলে ওঠে—আরও কোনও কথা নিশ্চয়ই হয়েছে, যা আমাকে বলতে পারছ না। কিন্তু কেন, এরকম কেন হচ্ছে, আজকাল? যা আমার কাছে চেপে রেখে জিলা-কমিটির দরবারে পেশ করে আসছ, তা কিন্তু স্পাইং হচ্ছে, পার্টি-কমরেডের রিপোর্টিং হচ্ছে না।

স্তম্ভিত হয়ে বাঁশবাগানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে চন্দ্রিমা। ফোঁটা ফোঁটা গুচ্ছ গুচ্ছ মদির নীলালোক ভাসছে জোনাকির আঁধারে। সেই দিকে চেয়ে থেকে এক্ষণে চন্দ্রিমার চোখ নিঃশব্দে ভিজে ওঠে নিমেষে। গলার কাছে বেদনা দলা পাকিয়ে ওঠে। বুলবনের কাছ থেকে এই রকম আঘাত সে একেবারেই প্রত্যাশা করেনি। প্রথমে সে ভাবে, বুলবনের একথার উত্তরটি সহজ করে বলবে, রাগ প্রকাশ করবে না, কিন্তু বলতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ক্রোধ এসে পড়ে অতর্কিতে।

চন্দ্রিমা বলে—আমি পার্টির কাছে কোনও কিছু দরবার করিনি বুলবন। অন্ধকারে এই পথের উপর এভাবে, যা খুশি তাই বলতে পার না তুমি! সর্বত্র সব কথা বল যায় না, তুমি তা ভাল করেই জানো। শুধু স্বামিত্বের জোরে কথা আদায় করবে, তা হয় না। তাহলে পার্টির কোড অফ কন্ডাক্ট্ বলে কিছুই থাকে না।

—অত কন্ডাকটের কথা তুলবে না দোলন! অসহ্য!

—কী বললে, অসহ্য! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

—তাই মনে করেই তো পার্টির হাতে 'আজান' পত্রিকার খবর তুলে দিয়েছ তুমি। দাওনি?

—হ্যাঁ, দিয়েছি। কিন্তু...

—থাক, আর বলতে হবে না।

—আমরা কিন্তু একটা কাজে এসেছিলাম কমরেড। দু'জনে ঝগড়া করতে আসিনি!

—হ্যাঁ। ঠিক। সেই কথাই তো বলছি চন্দ্রিমা! ব্যথা তোমাকে কী বলল, একথা জানতে চাওয়া কি অন্যায়!

—না। তুমিই তো নেতা। তোমাকেই তো বলতে হবে। সেকথা না শুনে এভাবে আক্রমণ কেন করছ! যদি কোথাও ভুল করে থাকি, সে বিচারের জায়গা তো এটা নয়।

—আর কত সেন্স দেবে আমাকে! আদিত্যবাবু আমাকে প্রেমের মর্যাদার কথা শোনালেন। চাকরি চাইতে গিয়ে আমি তোমার প্রেমের অমর্যাদা করেছি। এই ব্যাপারে প্রাণদা, তুমি এবং আদিত্যবাবু সহমত পোষণ কর। কর না?

—তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি না বুলবন!

—তা কেন পারবে! আমি তো এখন চাষালোক, বুঝব যে, সেই বুদ্ধি কোথায়! চল। আর কথা বলতে হবে না।

—না। শোন তবে...

—না! আর কথা নয়। বলে চন্দ্রিমার গায়ে আকস্মিক একটা ধাক্কা দেয় বুলবন। চন্দ্রিমা স্বামীর এই আচরণে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে যায়।

—তোমার অনেক পতন হয়েছে বুলবন! তুমি ভুলে গেছ তুমি একজন

পার্টি-কমরেড। বলেই চন্দ্রিমা পাগলের মত ক্ষিপ্রবেগে সামনে ছুটে যেতে থাকে।

—দাঁড়াও! কঠিনস্বরে ডেকে ওঠে বুলবন।

চন্দ্রিমা দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—অন্ধকারে তুমি যা করলে, আমি কি পার্টিকে তা রিপোর্ট করতে পারি না? বল, পারি না?

মুহূর্তে পার্টির নীতিবোধ, পার্টি-বিবেক বুলবনের অন্তরে মহা মানবিকতায় সজাগ হয়ে ওঠে। তার সরল হৃদয় কি এতই কঠিন হতে পারে! একা, অসহায়, কেবল তারই প্রেমের মুখাপেক্ষী, সর্বস্ব ছেড়ে আসা চন্দ্রিমাকে অসভ্যের মত ধাক্কা দিল কেন? এই আচরণ যে সে-ই করেছে দণ্ড দুই আগে, নিজেই এখন বিশ্বাস করতে পারে না বুলবন। তার সমস্ত হৃদয় এক করুণ ভাবাবেশে মুহুর্মুহু মোচড়াতে থাকে। আপন মনে থাকা মানুষ কি এতই অশালীন হয়! এ সে কী করল!

পার্টির কাছে একথা পৌঁছালে সে তো আর কখনও মুখ তুলতে পারবে না! সে এসেছিল পার্টির কাজে। চাবি আদায় করতে, বন্দুক বাজেয়াপ্ত করার দাবি তুলতে, একটি সংগ্রামী কর্মসূচির গোড়াপত্তন করার কথা। কিন্তু তার সমস্ত ধৈর্য, সব প্রত্যয় কোথায় সে বিসর্জন দিয়ে বসেছে! স্বামিত্ব কি কঠিন প্রহেলিকা, পার্টির বিবেককেও উপেক্ষা করে, মনুষ্যত্বের আবরণে সে কি তবে বিষাক্ত সরীসৃপের মত লুকিয়ে থেকে যায়, কোথায় সেই স্বামিত্বের রোখ হীন-কন্দরে লুক্কায়িত থাকে? ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে বুলবন।

চন্দ্রিমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলে—আমরা কি এতই ছেলেমানুষ হতে পারি দোলন! আমায় ক্ষমা করে দাও!

—না। বলে আবার দ্রুত হাঁটতে থাকে চন্দ্রিমা, স্বামীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় কিঞ্চিৎ সবলে। এত ক্ষিপ্র ছুটে চলে যে, বুলবন অত জোরে অগ্রসর হতে পারে না।

রাত্রে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে বুলবন চন্দ্রিমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে গিয়ে বুঝতে পারে, অন্তরেরই মত চন্দ্রিমার দেহ শক্ত হয়ে রয়েছে, সে আকর্ষণ উপেক্ষা করে দেহেরই আলোড়ন দিয়ে, সামান্য ধাক্কায়।

শুধু বলে—চাষীও তার বউকে এমন করে না বুলবন!

—আমার ভুল হয়েছে দোলন!

—ঠিক আছে, ঘুমোও!

আর কোনও কথা হয় না। সকালে উঠে চন্দ্রিমা তার স্বামীটির দিকে চেয়ে অনিদ্রার কালো কালি চোখের তলায় জমেছে দেখতে পায়, চোখ দু'টি ভয়ানক বিষণ্ণ আর উদ্ভ্রান্ত। দু'টি ঠোঁট শুকনো, যেন ঘুমের মধ্যে তৃষ্ণা তাকে শুষ্ক করে তুলেছে। স্বামীর অসহায় এই মুখচ্ছবি চন্দ্রিমার অন্তরকে পীড়িত করতে থাকে, যেমন তরঙ্গরাশি নদীর কিনারাকে অথবা শিশু তার আহ্লাদের কুকুর-শাবককে অকারণ পীড়ন করে। মনে পড়ে কী সেই সকাতর উক্তিটি, কী বিষম অনুনয়!—'আমরা কি এতই ছেলেমানুষ হতে পারি দোলন!'

বিছানা ছেড়ে দোতলায় উঠে আসে চন্দ্রিমা। রাহুলের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে, এই ভোরে বিছানা খালি। উপরের রান্নাঘরে আয়েষাকে দেখে স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে এসে পড়ে।

—মা! রাহুল কোথায়?

—কাল বিকেলে তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার পর রাহুলও বেরিয়ে গেছে। রাতে ফিরেনি। ওর স্বভাব দেখে আমার আর ভাল লাগে না বউমা! তরফদারের বাড়িতে

মিটিং হয়নি শুনলে রাহুল ক্ষেপে যাবে।

—ললিতবাবু, তরফদার সাহেব, কেউ মিটিঙে উপস্থিত হননি।

—কেন হবে! নাও, চা নিয়ে গিয়ে বুলবনকে দাও! আমার মন কী বলে জানো, ব্যথা যেমন ঘরের চাবি আঁচলে বেঁধেছে, গেটের চাবিও বেঁধেছে, মানুষ যা আঁচলে বাঁধে, তা কি সহজে ছাড়তে পারে!

—উনি আমাকে বললেন, পার যদি কেড়ে নাও!

—এই কথা বলল ব্যথা! চায়ের ছোট ট্রে চন্দ্রিমার দিকে বাড়িয়ে ধরে আয়েষা গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং দোতলার রেলিঙের থামের কাছে বুলবনকে দেখে ট্রে নামিয়ে ফেলেন।

আয়েষা গলা তুলে বলেন—শুনছ বড়খোকা! ব্যথার বাক্য!

বুলবন রেলিং থেকে উঠোনে ঝুঁকে ফুলভানুর ঝাঁট দেওয়া দেখতে দেখতে থাম ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে সরে এসে বলে—কী বলছ মা!

—যদি পার চাবি কেড়ে নাও, একথা ব্যথা বলেছে! দাও, প্লেটে করে কাপ বসিয়ে বুলবনকে চা দাও দোলা! ট্রে আর লাগবে না। বিস্কুট দিব তোমাকে?

মায়ের জবাবে বুলবন বলল—বিস্কুট দিও না। তোমার বউমাকে বাড়িতে ডেকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই কথা বলেছে মা! আমরা আর ওই বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই রাখতে পারব না। তুমি দুঃখ ক'রো না।

আয়েষা বললেন—ব্যথা আর সম্বন্ধ চায় না বাবা!

চন্দ্রিমা স্বামীর হাতে চায়ের প্লেট-কাপ তুলে দেয়। বুলবন শুধু কাপটা তুলে নিয়ে বলে—প্লেট লাগবে না! মা আমার এত আদর করে কেন বুঝি না। একেবারে মেহমানের মত করছে!

—লেখাপড়া শিখেছ, সম্মান করব না! হিফাজত চাকরি দিতে পারেনি বলেই তো আর তোমার দাম কমে যায়নি। কাল একখানা চিঠি এসেছে সন্ধ্যায়, হিফাজত ডাক্তার দুঃখ করে লিখেছে। তোমাকে বেগমপুরের জুনিয়র হাইতে চাকরি দিতে চেয়েছিল, তা-ও সে পারেনি। কমিটির চাপে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বুলবন বলল—আমি তোমাদের বলিনি সেকথা। রাহুল শুনলে খুবই উত্তেজিত হবে। কমিটির চাপ নয়। একদম হয়ে যাওয়া চাকরি, রেজল্যুশন পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে এক নাটক মা, শুনতে চেও না!

—আমায় কেন বলনি, কখনও? অভিমানের সুরে বলে উঠল চন্দ্রিমা।

—কীই বা বলব তোমাকে! হাই মাদ্রাসার চাকরি যে আমি কিছুতেই নেব না, সেকথা শঙ্করপুরের কমিটি বুঝে গিয়েছিল। পরে হিফাজত ডাক্তার বেগমপুরের জুনিয়র হাইস্কুলে আমার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। ললিত সেই হয়ে যাওয়া চাকরি নষ্ট করে দিল আমারই চোখের উপর।

—একথা তুমি পার্টিকে বলনি কেন? চন্দ্রিমা বলে ওঠে।

—সেকথা কে শুনবে?

—আমি!

—তুমি তো বলেছ, আমার অনেক পতন হয়েছে! তোমাকে শুনিয়ে আমার কী এমন সুরাহা হবে! এটা একটা ফ্যামিলি ম্যাটার, মাকে তাই বলছি। মা শুনে আমার ব্যর্থতার কষ্ট বুঝতে পারবে।

—আমি তোমার কেউ নই ?

—দ্যাখ চন্দ্রিমা, এরকম কাঁচা কথা আর ব'লো না ! তোমাকে যতটুকু বলবার নিশ্চয়ই বলব, তুমি কমরেড, তোমার পক্ষে আমার ব্যর্থতার কথা না শোনাই ভাল ।

—আমি স্পাই, সে-কারণে, তাই না ! ঠিক আছে, আমি আর শুনতে চাইব না । অত্যন্ত চাপাস্বরে, আয়েষা যাতে শুনতে না পান, এমনই অস্ফুটে চন্দ্রিমা বলে ওঠে । এবং অতঃপর চন্দ্রিমা চায়ের কাপ হাতে করে নীচে নেমে চলে যায় । টেবিলে কাপটি রেখে চুপচাপ বসে থাকে । চা জুড়িয়ে যেতে থাকে ।

রাহুলের খাটে রাহুলকে না দেখে এই সময় হঠাৎ বুলবন মনে মনে উষ্ণ হয়ে ওঠে ।

—রাহুল কোথায় থাকে, আমরা কেন জানতে পারি না মা ! বলে কেন যায় না ? মায়ের কাছেই অভিযোগ উত্থাপন করে বুলবন ।

আয়েষা সেকথার কোনও জবাব না করে বলেন—বউমা রাগ করেছে বাবা ! বউমাকে চাকরির কথা বলনি, পার্টিও জানে না । তোমার বাপুকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পার্টি অপারগ, বুঝি । চাকরি দিতে পারবে না, তা-ও বুঝি । কিন্তু সব কথাই পার্টি জানবে কেন ? যা পার্টির সাধ্যের নয়, তা-ও জানবে ! না জানলে খুব কি ক্ষতি হয় ?

—হয় মা । তোমাকে চাকরির কথা বলছি, তুমি কি আমাকে চাকরি দিতে পারবে ? পারবে না । তবু বলছি কেন ! পার্টিরও একটা হৃদয় অছে মা ।

—আছে বুঝি ! বলে আয়েষা সংশয়জড়িত বিস্ময় প্রকাশ করেন ।

বুলবন কিছুক্ষণ পুবের দিগন্তে সূর্যোদয় দেখে । একটি পাখি উড়ে যাচ্ছে দেখতে পায় । সাদা একটি বক উড়ে চলেছে বিলের দিকে, তার ডানায় সোনার আলো চিকচিক করছে । সেই দিক থেকে শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মায়ের দিকে ফিরিয়ে এনে বলে—চন্দ্রিমা আর আমার কথা শুনে তোমার হয়ত মনে হচ্ছে, পার্টি বোধ হয় একটা যন্ত্র, তা কিন্তু নয় । তার একটা যেমন জ্ঞানের মস্তিষ্ক আছে, হৃদয়ও আছে ।

—তা কি মায়ের অন্তরের চেয়েও বড় ?

—এই তুলনা তুমি করছ কেন ?

—ঠিক আছে, করব না ! কিন্তু পার্টির কাছে প্রকাশ করা যায় না, এমন কাজ কখনও ক'রো না বাবা ! বউমা দুঃখ পাবে ।

—তুমি এই সব কী বলছ মা !

—তোমাদের সম্বন্ধ খারাপ হয়, আমি তা চাইব না ।

—খারাপ তো হয়নি !

—সেকথা তোমার পার্টিই বুঝবে বাছা ! বলে আয়েষা দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে চলে যান । বুলবন অনেকক্ষণ স্থাণুর মত রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । কাপের চা নিঃশেষ করে কাপটি মেঝেয় পায়ের কাছে, থামের গোড়ায় রেখে দেয় । তারপর নীচে নামে ।

ঘরে এসে দেখে চন্দ্রিমা বিছানায় লেপের তলে সেঁধিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে আছে । টেবিলে চা জুড়িয়ে শরবত হয়ে গেছে । চা খাওয়ার নাগরিক কড়া অভ্যাস আছে চন্দ্রিমার । চা না খেলে ভোরে চাঙ্গা হতে পারে না সে । চন্দ্রিমার এই সকাতর নীরবতা, হঠাৎ এভাবে ম্লান গুটিয়ে পড়া, এইরকম শয্যাগ্রহণ বুলবনকে ব্যথিত করে তোলে ।

—আমিই তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ চন্দ্রিমা । তুমি চা পর্যন্ত খেলে না ! বলে ওঠে

বুলবন।

চন্দ্রিমা বিছানায় নড়ে উঠে দেওয়ালের দিক থেকে মুখ টেনে গায়ের লেপ ফেলে দেয়। তারপর বিছানায় চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ।

—আমি একবার বহরমপুর যেতে চাই বুলবন ! আমার সঙ্গে রাহুল যাবে।

—কেন ? আমি যেতে পারি না ?

—না। রাহুলকেই দরকার।

—কেন ?

—রাহুলকে যদি নিয়ে যেতে পারি, আদিত্যবাবুর সঙ্গে রাহুলের দেখা হওয়া অত্যন্ত জরুরি, তাহলে হয়ত কাজটা ভাল হবে।

—রাহুল কি যাবে ?

—তুমি ওকে বল একবার ! দোহাই ! মায়ের সামনে আমাদের কোনও দুর্বলতার কথা আর ব'লো না।

—তুমিই তো রাগ করলে তখন ! এই রাগ তোমাকে মানায় না। আমার ইদানীং বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লাইন কেবলই মনে পড়ে। 'বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য বিধানের নাম জীবন।' আমাদের আচরণে সেই সামঞ্জস্য মানুষ দেখতে চায়।

—রাত্রে বাঁশবনের পথে তোমার আচরণের সামঞ্জস্য ছিল না, বুলবন। কেউ দেখেনি বলেই কি আমাকে অমন করে ধাক্কা দিলে ?

—ও। আচ্ছা ! ঠিক আছে। তুমি আবার সেই কথা তুললে ! তাহলে তো আর সামঞ্জস্যের কোনও আশা দেখছি না চন্দ্রিমা। শেষ পর্যন্ত আমরা এতটাই পর হয়ে গেলাম !

কথা শেষ করেই একখানা কোদাল কাঁধে করে লুঙ্গিপরা বুলবন গায়ে মোটা চাদর জড়িয়ে মাঠের দিকে চলে যাওয়ার আগে, হুকুম আলিকে ডেকে নিয়ে গেল।

রাহুল ফিরল সকাল নটায়। দুপুরে ফিরে এল মণি। একটু বাদে বুলবনও এল। চন্দ্রিমা প্রথমে মণিকে ছদের উপর ডেকে আনে। ঘামে ক্লান্ত মুখ। বউদি কেন তাকে হঠাৎ এমন করে ছাদে টেনে এনেছে মণি কিছুই বুঝতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে বউদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

চন্দ্রিমা সহসা সরাসরি শুধায়—আমি যা প্রশ্ন করব, লক্ষ্মী ভাই, ঠিক জবাবটি দেবে। গায়ে হাত বুলিয়ে দেবরকে সস্নেহ প্রশ্নের সামনে ফেলে দেয়।

—বল ভাবীজান !

—অ্যাই দুষ্টু, ইয়ার্কির কথা নয় কিন্তু। আচ্ছা ! তুমি বন্দুক ছিনতাই করেছ !

—না। কার বন্দুক ? আমি কেন করব !

—আমার মন ভাল নেই। সত্যি করে বল !

—না।

—করনি ?

—না, বউদি !

—মিথ্যে কথা বললে, আমি কিন্তু এই বাড়িতে থাকব না। তুমি কোনও বন্দুক ছিনতাই হওয়ার কথা জান না ?

এবার কেমন চুপ করে থাকে মণি। ছাদ থেকে ডোবার দিকে চায়।

—বল ! চুপ করে থেকো না !

—না। আমি জানি না কিছু !
—মিছে বলছ কেন ?
—বলছি, 'না' বউদি ! ছিনতাই আমি করিনি।
—তুমি সঙ্গে ছিলে ?
—না !
অত্যন্ত দৃঢ় আর শান্তস্বরে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করে মণি তালগাছটির দিকে অপাঙ্গে চেয়ে রইল। মণির বুকের কাছের জামা খামচে ধরা চন্দ্রিমার হাত ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেল।
—যাও ! বলে মণিকে ছেড়ে দিল চন্দ্রিমা। মণি কোনও কথা না বলে ঘাড় নীচু করে দোতলার ছাদ ছেড়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলে গেল অত্যন্ত মন্থর পায়ে। তার চোখে মুখে অস্ফুট উদ্বেগ ফুটে উঠেছে ক্ষীণ মাত্রায়।
অনেকক্ষণ অন্যমনস্কের মত ছাদের উপর দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রিমা। কী করবে ভেবে পেল না। হঠাৎ স্বামীর বলা সকালবেলার কথাটি বুকের মধ্যে অশ্রুর মত উদ্গত হতে লাগল—'শেষ পর্যন্ত আমরা এতটাই পর হয়ে গেলাম !' বারংবার এই কথাটি বুকের মধ্যে বেজে চলল। যতই সেকথা ধ্বনিত হতে থাকে, ততই চোখের জলকে দমাতে পারে না চন্দ্রিমা। কেন যেন কেবলই তার মণির কথা সত্য বলে প্রত্যয় হচ্ছিল, মণি তার সামনে মিথ্যে বলবে না, এই বিশ্বাস তার অন্তরে উৎপন্ন হয়েছিল।
—তুমি সঙ্গে ছিলে ?
—না।
এই 'না' শব্দটি এমনই যে, অবিশ্বাস করা যায় না। সরল, দৃঢ় এবং কিঞ্চিৎ বিস্ময়পূর্ণ। আজ যদি মণির কিছু হয়—এই আশঙ্কায় চন্দ্রিমা একা কেমন বিপন্ন বোধ করে। ছোট দেবরটির কিছু হলে এই পরিবারটিই আর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। এই পরিবারে সুখ দুঃখ এবং ভাল মন্দের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে পড়েছে চন্দ্রিমা। অথচ স্বামী তাকে পর করে দিতে চাইছে !
তীব্র অভিমান ছলছল করতে থাকে বুকের মধ্যে। বুকভরা অভিমান নিয়েও চন্দ্রিমা তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে। প্রথমে ভাবে স্বামীকে মণির বন্দুক ছিনতাইয়ের ঘটনার কথা বলে দেয়। স্বামীর দিকে এগিয়েও যায় পায়ে পায়ে। বলতে পারে না। তারপর ভাবে, সে রাহুলকে বলবে। কিন্তু বলতে পারে না। মণি যে কিছুতেই তার সামনে মিথ্যে বলবে না, এই বিশ্বাস চন্দ্রিমার সম্বল। ব্যথাখালার সমস্ত কথা এখন তার কানে বাজে। মণিকে এভাবে দায়ী করা কেন ? এই পরিবারটিকে কি ওরা একেবারেই ধ্বংস করে দিতে চায় ! শেষ করে দিতে চায় !
দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে মণি সবার জুতো পালিশ করছিল আপন মনে। বউদিকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে ওর হাতের বুরুশ থেমে গেল।
সোনাই বলেছিল, তুমি সব জানো ! হঠাৎ বলে উঠল চন্দ্রিমা। এবং বলল—তুমি একজন নেতাকেও দেখেছ।
—হ্যাঁ, মুমতাজ ভাইকে দেখেছি। কিন্তু আমি ছিনতাই করিনি বউদি, এক কথা কতবার বলব তোমাকে ! আমি কিছুই জানি না। খাটি খাই, চাষীলোক, বুঝলে না ?
—হ্যাঁ। তুমি আমার ছোটভাই, মণিসোনা।
—ওরকম ফুলভানুও বলে ! আমাকে ফুসলে লাভ হবে না বউদি। জানো, ওই ফুলি

ইংরেজি লাভার শব্দটার মানে জেনে গিয়েছে, কী সাংঘাতিক ব্যাপার ! আমাকে পাগল ভাবে তো, সব বলে দেয় !

—কী বলে আর ?

—কী বলে ? আচ্ছা, শোন তবে... বলে আবার বুরুশ চালাতে শুরু করে। কিছুক্ষণ চালিয়ে নিয়ে রাহুলের জুতো চকচকে করে তোলে।

চন্দ্রিমা বলে ওঠে—ফুলির কথা এখন থাক মণি ! তোমার দাদা মাঠে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারে ?

—হ্যাঁ, পারে তো ! তবে ভদ্দরলোক কিনা, কষ্ট হয়। ললিত, দাদার হওয়া-চাকরি নষ্ট করে দিল। ভাইয়া বলেছে। শশাঙ্ক বুঝলে ভাবী, তোমাকেই বলছি, আমানির মাকে খারাপ করে দিয়েছে।

—কী বলছ তুমি !

—কারুকে বলো না কিন্তু ! আমি স্বচক্ষে দেখেছি একটা সিন। সেদিন আমার খুব পাপ হয়েছে। তুমি রাগ করলে না তো !

—না। বলে চন্দ্রিমা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর সহসা বলে ওঠে—তুমি জামাটা গায়ে দাও।

—কেন ?

—আমার সঙ্গে তুমি একটা জায়গায় যাবে।

—আচ্ছা ! বলে মণি বুরুশ কালি রেখে দিয়ে উঠে পড়ে।

চন্দ্রিমা মণিকে সঙ্গে করে তরফদার বাড়ি আসে। মণি অবাক হয়ে বলে, এখানে কেন ?

চন্দ্রিমা কোনও জবাব না করে ব্যথাখালার সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির বউমারা এবং সন্ততিরা ঘরের গোল বারান্দায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ব্যথা নেমে এসে চন্দ্রিমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আসেন। চাপাসুরে বলেন—কেউ কিছু জানে না দোলাবউ ! তুমি তোমার শ্বশুরের সঙ্গে এই বাড়ির সম্বন্ধ জান না ! মিছে কইব না। সম্বন্ধ নষ্ট হতে দিব না, তোমাকে পাশে থাকতে হবে। অ্যাই মণি, সাচা কথা বলবি ! তুই কোথা ছিলি সেদিন ?

—কোথায় খালা ! মণি বিস্মিত স্বরে জানতে চায়।

—তুই প্রণামপুরে বাবুর নামে পোস্টার মেরেছিস ? তোর বাপ কমরেড ?

চন্দ্রিমাও এবার খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল—সমস্ত ব্যাপারে আপনি মণিকে জড়াচ্ছেন কেন মাসিমা ?

—আমি তোমার মাসিপিসি নই বাছা ! আমাকে খালা বলে ডাকবে।

—আমি আপনাকে মাসিই বলব। আমার পক্ষে জল আর পানি সমান কথা। কিন্তু জোর করে পানি বলাতে চাইলে আমি পানি বলতে পারব না।

—তাই নাকি !

—হ্যাঁ। মণি বন্দুক ছিনতাই করেনি। ও কোথাও মুখোস পরেনি।

—বেশ তো ! নে। কোরানের উপর হাত রেখে সত্য বল মণি ! হাত দিয়ে ভাল করে ধর দেখি ! এগিয়ে আয় !

—নাহ্ ! এ আমি পারব না খালামা ! আমাকে দিও না। জান কবুল করি, আমি মুখোস পরিনি। বলে প্রায় ডুকরে উঠল মণি। তার দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল।

তার এই অবস্থা দেখে মুহূর্তে চন্দ্রিমার মুখ শুকিয়ে উঠল।

—তুমি সরে দাঁড়াও বউ। মুসলমানের ছেলে কোরান হাতে করে সত্য কথা বলবে, আমি জবরদস্তি করব না। নিজের থেকে হাতে নিয়ে বল্ মণি, তুই ছিলি না! মুখোস পরে আমার স্বামীর বন্দুক কেড়ে নিসনি! কাশিমবাজারে সন্ধ্যার মুখে পথের ওপর ছিলি না তুই! তোকে বলতে হবে সমস্ত। আমি তোর বাপকে ছাড়িয়ে আনব। বুলবনকে চাকরি দেব। ললিত আমার হাতের লোক।

অত্যন্ত ভারী আর অভিজাত কণ্ঠে বলে উঠলেন ব্যথা তরফদার। চন্দ্রিমার মনে হল, সে এখান থেকে মণিকে টেনে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়, মারাত্মক এই পৃথিবী, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্যও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। মণির প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে উঠেছে। তার শরীর কাঁপছে ক্রোধে, বিস্ময়ে, অপমানে।

মণি বলল—না।

ব্যথা বললেন—হাতে নিবি না?

মণি পুনর্বার বলল—না খালা। আমি কোনও পাপ করিনি।

ব্যথা তীব্রস্বরে বললেন—তুই আমার স্বামীর সখের জিনিসে হাত দিয়েছিস। বাবু এই বন্দুক দিয়ে চা পাখি মেরেছে। মণি, দ্যাখ বাপজি! আন্দোলন পাকানোর চেষ্টা করবি না। এখনও সময় আছে, বাপু ফিরে আসতে পারে। আমি দেখব, তোদের ফ্যামিলিকে বাঁচাব! খোদার উপর ভরসা রাখতে হবে। না হলে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবি, বলে দিচ্ছি। নে, হাত বাড়া!

—নাহ্। মুখোস আমি পরিনি। পরবও না কোনদিন খালা। জোর করবে না, আমি সাদা চৌধুরীর ছেলে, উচ্ছেদ হয়ে যাব, কিন্তু মুখোস পরে ধোঁকা দেব না। যা করবার সিধেসাদা করব, প্রকাশ্য করব। আমার রাগ হয়, গা জ্বালা করছে। ছেড়ে দাও আমাকে।

—তোকে কোরান হাতে নিতেই হবে!

—না।

—নিবি না?

—না।

—দেখলে বউ! তোমার দেওর কতখানি তিয়র!

—থুঃ! বলে মণি অকস্মাৎ মেঝেয় থুতু ছিটিয়ে দেয়।

—কী! এত শয়তান! এত দূর আস্পদ্দা দোলাবিবি, তোমার দেওরের! ও রে কে আছিস!

—এমন করে না মণি! বলে চন্দ্রিমা নিষেধ করে উঠল। এবং অত্যন্ত সকাতর অনুনয়ে বলে উঠল—দয়া করে আমাদের যেতে দিন মাসিমা!

ব্যথার চোঁয়াড়ে মেজ ছেলে ঘরের মধ্যে শুয়েছিল। আজ দোকানের বন্ধের বার। মায়ের ডাকে ছুটে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকেই মণির মাথার চুল বলিষ্ঠ নির্মম আকর্ষণে খামচে ধরে দুই পায়ের কাছে নুইয়ে নামিয়ে মণির মাথাটিকে পায়ের ফাঁকে গলিয়ে নিয়ে গলার দু'পাশে জানুস্তম্ভ দিয়ে চেপে ধরল, তারপর বজ্রমুষ্ঠি আছড়ে ফেলল ক্রূর দন্তে, পেল্লাই একটা কিল বসিয়ে দিয়ে খাড়া করে তুলল চুল ধরে, আর মুখে এবং পেটে ঘুষি চালিয়ে দিল।

মণি টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না। মনে হল, ওর দম আটকে পড়েছে। এরপর

হকিকতের হাতের ধাক্কায় চেয়ারের উপর গিয়ে পড়ে গেল মণি। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রিমা ছুটে গিয়ে মণিকে বুক দিয়ে আড়াল করতে চাইলে তাকে হাত ধরে টেনে হকিকৎ অন্য দিকে সরিয়ে দিতে গিয়ে এমনই ধাক্কা দেয় যে চন্দ্রিমা তাল সামলাতে না পেরে একটি চেয়ারের হাতলে পড়ে গিয়ে কপালে তীব্র আঘাত পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বল হয়ে ফুলে ওঠে কপাল। মণিকে বাইরে টেনে এনে থামের সঙ্গে মোটা রসি দিয়ে বাঁধে মেজছেলে।

মাকে বলে—এবার ওর হাতে কোরান দাও, কথা বলবে। ঘর থেকে আমি ওর সব বাক্য শুনেছি! শালা, ইতরের বাচ্চা! মাকে পুলিস পর্যন্ত ভয় পায়। কার সঙ্গে রা করছিস!

কোরান হাতে দেওয়া হয় মণির। মণি ঘাড় গুঁজে কোরানের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চন্দ্রিমা থাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকে একটু দূরে। সে ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়ে দেখল এ বাড়িটি শত্রু দুর্গ, এখানে অশ্রুপাত বৃথা। এরা কোরান এবং বন্দুককে স্বশাসনে রেখেছে, এরা জেল পূর্ণ করেছে সহস্র মণিদের দিয়ে। জেলের পীড়ন যারা জানে, তারাও বোধ করি এই গোপন প্রহারের সঠিক দিশা সর্বত্র বুঝতে পারেনি। একটি বন্দুক তারা ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা প্রাণের ভয় করেনি, কিন্তু একটি পরিবার কীভাবে তাদের সংগ্রামের আবর্তে পড়ে গিয়ে গোপন যুদ্ধে শামিল হয়ে ইতিহাসের ক্রান্তিপর্বে শুধু মুখ বুঁজে সহ্য করে গেছে, তারও সমস্ত মাত্রা জরিপ করতে পারেনি আজও। ভুল রাহুল! গ্রামের শত্রুদুর্গের পরিধি বোধ হয় তোমারও জানা নেই। মণিকে এভাবে অপ্রস্তুত, অসহায়, নিরাবলম্ব করে রাহুল, তুমি কি জয়ী হবে কখনও?

দড়িবাঁধা ঘাড়গোঁজা স্তব্ধ মণি কোরান হাতে করে অবসন্ন গলায় বলল—আমি আবার বলছি খালা মা! আমি মণি পালের শিষ্য, ব্যাঞ্জো বাজাই। আমি যাত্রাদল গড়ব একটা। ধর্মের জয় হবে, অধর্মের ক্ষয় হবে। খুদা কসম, আমি মুখোস পরিনি। কিন্তু বউদিকে হেনস্থা করলে, খোদার বান্দা এই জিনিস ভুলবে না। কোরান তুলে নাও, আমি জ্বলে যাচ্ছি খালা!

কোরান অগত্যা তুলে নেওয়া হল; দড়ি, যা কুঁয়োর গায়ে পড়ে থাকা মুখভেজা রসি, জল খেয়ে কুঁয়োর গায়ের বালিতে মাখামাখি, সেই রসি খুলে দেওয়া হল। মণির ঠোঁট সামান্য রক্তাক্ত আর ফোলা, চোখের কোণে আঘাত লেগে চোখের কিছুটা লাল, লজ্জায় অবনত মণি বউদিকে সঙ্গে করে বাইরে চলে আসে।

ওদের পিছু পিছু ব্যথা তরফদার সদর দুয়ার পর্যন্ত আসেন। দুয়ারের পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে বলেন—বউমা! তুমি কিন্তু রাগ ক'রো না। হকিকৎ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, ছেলেটা আমার গোঁয়ার গোবিন্দ মানুষ, রোখা। মণি কোরান হাতে করে কিরে কসম করলে, আমি ভাবছি, তাহলে কারা এই কাজ করেছে! ঘটনা চেপে যাও বউ।

ব্যথার এই আহ্লাদিত কথার কোনও সদুত্তর দিতে ইচ্ছে হল চন্দ্রিমার। কিন্তু তার এতই অবাক লাগছিল, এতই ক্রোধ হচ্ছিল যে, কোনও কথা মুখ দিয়ে বার হতে চাইল না। এখনও তার অন্তর মৃদু কেঁপে চলেছে, অন্তর শুধু নয়, দেহও।

পথের উপর এগিয়ে যেতে যেতে কেউ তারা কারও মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাইতে পারল না। নিজেকেই চন্দ্রিমার কেমন যেন অপরাধী ঠেকছিল ক্রমে ক্রমে। মনে হচ্ছিল, এভাবে আচম্বিতে ডেকে না আনলে মণি মার খেত না। তারই দোষে, সিদ্ধান্তের ভুলে এই সমস্ত ঘটে গেল। ঠিক এই রকমই যে ঘটে যেতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি চন্দ্রিমা। সে তবে এই গ্রাম-জীবনের কিছুই জানে না। বুলবন কতবার বলেছে, এই

সমাজটাকে তুমি চেন না, এর নাড়ীর খবর জানা খুব কঠিন। সাহিত্যের ছাত্র বুলবন, ও অনেক অদ্ভুত তথ্য মাথায় রাখে। একবার সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে একটি তীক্ষ্ণ উক্তি সংগ্রহ করে শুনিয়েছিল। কতকাল আগে সাহিত্যিক উপলব্ধি করে ইংরেজিতে মন্তব্য করেছিলেন।

দি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ডাজ নট আন্ডারস্ট্যান্ড দি মাইন্ড অফ ইন্ডিয়া।

ব্যাথার আচরণের মধ্যে ভারতবর্ষ আছে। কমিউনিস্ট যদি ভারতবর্ষকে সঠিক চিনতে না পারে, তাহলে সে এই দেশটাকে বিপ্লবের আঘাতে বদলে দিতেও পারবে না। কোরানের স্পর্শে মণির দেহ জ্বালা করছে কেন, তা বোঝা কি মুখের কথা! 'তুমি সরে দাঁড়াও বউ! মুসলমানের ছেলে কোরান হাতে করে সত্য কথা বলবে।' সরে দাঁড়াও, কথাটি কী সাংঘাতিক! মুসলমানের ছেলে, কী নির্মম কঠিন উচ্চারণ! শত পবিত্র মনুষ্যত্বের কিরণে আত্মা বিধৌত হলেও কি হিন্দু-চন্দ্রিমা কখনও মানুষ নামে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? এখানের কমিউনিস্টরা ঘরে ঠাকুর-পূজার পীঠ রাখে, বাইরে সেকুলার। এদের রয়েছে মিটিং কা কাপড়া, ক্লাব কা কাপড়া, অন্নপ্রাশন কা ধোতি! নানা রকম রঙ এদের। এরা অত্যন্ত গেরস্ত ধরনের লোক। রাহুলের দলে নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। কিন্তু তারাও কখনও ধৈর্য ধরে ব্যথা বিবির অতি নিষ্ঠুর ব্যথা যে কী বস্তু, বুঝেও বুঝতে পারেনি।

চন্দ্রিমা ভাবল, রাহুল যে বুঝতে পারে না, একথা বললে, সে প্রায় খেয়ে ফেলবে তাকে। রক্ত যে দেয়, সে-ই যদি না বোঝে, তবে কি ওই গেরস্তরা বুঝেছে বলবে? এমন যুক্তি করলে তো ভাবাবেগ এসে যুক্তির পথ পিছল করে দেয় রাহুল!

চন্দ্রিমা যেন মনে মনে রাহুলের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে তুলেছিল। হঠাৎ দেখল, মণি ঘাড় গুঁজে হাঁটছে, মাথা তুলছে না লজ্জায়। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিপন্ন লাগে খুব। চোখ তুলে চাইতে চন্দ্রিমারও লজ্জা হয়। মণি দেখেছে, বউদির কপাল ফুলে আছে। বউদি সুন্দরী, এত সুন্দর মেয়েরা সাধারণত পার্টিতে আসে না।

মণি আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—আমি চর্মকার পাড়া হয়ে যাচ্ছি বউদি, মাঠের পথ ভাঙব। তুমি কাছারিপাড়া হয়ে চলে যাও! বাঁ হাতে কপালটা আড়াল করে নাও। কেউ শুধালে বলবে, পড়ে গিয়েছিলে, কপাটে ঠুকে গেছে! বলেই মাঠের দিকে দৌড়ে ছুটে গেল মণি।

বাঁশবনের পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দ্রিমা। এখানে রাত্রে বুলবন তাকে ধাক্কা দিয়েছিল হঠাৎ। এখানে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। মণি ছুটে যাচ্ছে দেখতে পায়। পরিণত মানুষের গলায় কথা বলে তাকে সাবধান করে গেল। কী বিচিত্র এই সংগ্রাম! এত কষ্টেও বুঝি আনন্দ থেকে যায় হৃদয়ান্তরালে। মণির পরিণত স্বর, আর এক সৌন্দর্য! সে হয়ত বারংবার বউদির মর্যাদার কথাই ভাবছে, তার নিজের মার খাওয়াটা যেন কিছুই নয়!

কিন্তু বাড়ি এসে আশ্চর্য সেই দৃশ্যটি দেখল চন্দ্রিমা। দোতলায় নয়, নীচে বাবার ছোট ঘরটিতে জলচৌকির উপর বসে নিজের হাত কামড়াচ্ছে পাগলের মত মণি! মুখে কেমন একটা গোঁ গোঁ চাপা আওয়াজ করছে। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। শৈশবের ডেঙ্গু আক্রান্ত মণির এই রোগটা চেনা। আগেও এমন হয়েছে। শরীরে কিসে যে ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে। ভয়ে চন্দ্রিমার মুখ শুকিয়ে যায়।

—ঘটনা চেপে যাও বউ!

—না। আমি পারব না।

—চেপে যাও!

—না। রাহুল। রা-হু-ল!

প্রথমবার আস্তে, দ্বিতীয়বার উচ্চে গলা তুলে রাহুলকে ডেকে উঠল চন্দ্রিমা। আয়েষা, রাহুল, ফুলভানু এবং হুকুম ছুটে এল। বুলবন সদরঘাট চলে গেছে। রাহুল অবাক হয়ে বলল—এমন কেন হল! বলেই ভাইয়ের গায়ে হাত দিল সে। তার চোখে চিন্তার ছাপ।

ক্রমাগত গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকে আশ্বাস আর স্নেহে ব্যাকুল হয়ে রাহুল বলতে থাকে—আমি আছি। তোকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছিল ভাই, তোর খুব জ্বর হয়েছিল ছেলেবেলায়। জলে একবার ডুবে গিয়েছিলি! তোকে যে বেঁচে থাকতে হবে! কেন অমন করছিস!

চন্দ্রিমা দৃঢ়স্বরে বলল—প্রশ্নটা আমারও! তোমাকেই করছি রাহুল!

চৈতন্য সুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তবু নিজেকে কঠিন চেষ্টায় জাগিয়ে রাখতে রাখতে মণি বউদির মুখে একটি হাত তুলে চেপে ধরে। কথা বলতে দেয় না। চন্দ্রিমার চোখ রাহুলের উপর ন্যস্ত, চাপা অশ্রু চিকচিক করছে। কানে ভাসছে, চেপে যাও। বাইরে এই সময় হঠাৎ প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ হয়, চন্দ্রিমার চোখ নেচে ওঠে ত্রস্ত চাঞ্চল্যে।

॥ ২২ ॥

আয়েষা চন্দ্রিমাকে শুধুমাত্র প্রশ্ন করলেন—মণিকে সঙ্গে করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে বউমা! চন্দ্রিমা প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই দরজায় প্রবল শব্দে কড়া নড়ে উঠেছিল, ফুলভানু সদর দুয়ারের পাল্লা খুলে দিয়েই আঁতকে উঠল। পুলিস! তিনজন পুলিসকে সঙ্গে করে ললিতমোহন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দরজা খোলা পেয়ে ওঁরা ঢুকে পড়লেন।

মণি নিস্পন্দের মত শুয়ে রয়েছে। চন্দ্রিমা ওর কপালে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। চন্দ্রিমার হাত থেমে পড়ল উঠোনে লোক ঢুকে এসেছে দেখে। আয়েষা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁকে দেখে ললিতমোহন বললেন—ইনিই চামেলি বিবি। দেখে রাখুন মেজবাবু! বাবুর ঘর দুয়ার একটু দেখে যান।

সমীর পুরকাইত রাহুলকে দেখে ক্রুর ভঙ্গিতে শীতল দৃষ্টি মেলে নিঃশব্দে হাসলেন। তারপর বললেন—তোমাদের বাড়ি একটু সার্চ করব আমরা!

—কেন, আমরা কী করেছি! রাহুল ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল। একবার সে মায়ের মুখের দিকে এবং পরে বউদির মুখে চেয়ে দেখে বলল—বাবাকে জেলে পাঠিয়েও আপনাদের ঘুম হচ্ছে না। এই ফ্যামিলির কতখানি সর্বনাশ হলে আপনারা চিশ্চিন্ত হতে পারেন!

মেজবাবু বললেন—আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারিনি বলেই তো এসেছি!

—কেন!

—এই গাঁয়ে, তোমাদের বাড়িতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা বন্দুক লুকনো আছে বলে আমরা খবর পেয়েছি! দোষ দিচ্ছি না মা! যদি কিছু পাই, সঙ্গে নিয়ে চলে যাব। ওহে, ধানের ওই গোলাটায় একজন ঢুকে দ্যাখ দেখি। আনাচ কানাচ সব দেখবে! মা! আমি একটু ঘরদোর দেখতে চাই!

পুরকাইত আয়েষাকে মা সম্বোধন করছিলেন।

আয়েষা বললেন—দেখুন! যত খুশি দেখুন! খালি একটা আর্জি আছে।

—বলুন!

—বাবুকে যেখানে রেখেছেন, আমাকে অ্যারেস্ট করে সেখানে নিয়ে চলুন। আমি যাব। দোষ আমিও দেব না কারুকে। আমার সংসার আজ ভেসে গিয়েছে, আর কোনও সুখ নেই আমার! ললিত যতদিন আছে আমানির মায়ের যেমন সুখ-সোয়াস্তি হবে না, আমারও হবে না।

মায়ের গলা ঈষৎ ভিজে এসেছে দেখে রাহুল বলল—তুমি আর কথা ব'লো না মা! ওদের সার্চ করতে দাও।

—তা তো তুমি বলবেই বাছা! মুখ বুজে সইতেই তো বলবে! আমি যে আর পারছি না! ললিতের কাছে আমি বুলবনের জন্যে একটা চাকরির আব্দার করব ভেবেছিলাম। আর সেই-ই কি না খোকার হয়ে যাওয়া চাকরি খেয়ে দিল! আর কত অবিচার করবে সে? তোমার রাগের শোধ কি হয়নি বাছা ললিত! তুমি তরফদারের সঙ্গে আমার ঘরের বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটালে! আর কী চাও!

—মা! তুমি চুপ করবে!

—কেন করব! আমার যে আর সবুর হয় না মেজখোকা! বলে আয়েষা রাহুলের কাছে থেকে সরে চন্দ্রিমার কাছে আসেন। পুলিস দোতলায় উঠলে রাহুল ওদের পিছু পিছু দোতলায় উঠে যায়। ফুলভানু ধানের ছোট গোলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মণি চুপচাপ শুয়ে আছে চোখ বন্ধ অবস্থায় বুলবনের ঘরের চৌকিতে। ক্রমশ তার চৈতন্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাড়িতে লোকজন এসেছে, কারা, তা বুঝতে না পারলেও, বাইরের মানুষ এসেছে টের পাচ্ছে।

তল্লাশি করল পুলিস। যতক্ষণ পুলিস রইল আয়েষা আর কোনও কথাই বললেন না। শুধু একমাত্র একবার চন্দ্রিমাকে শঙ্কিতস্বরে বললেন—রাহুলকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে না তো দোলা! আমার ঘরে বন্দুক কী করে আসবে?

চন্দ্রিমা চুপ করে রইল। কথা বলতে পারল না। পুলিস বেরিয়ে চলে গেলে অসহায় আয়েষা মণির শিয়রে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেললেন। চন্দ্রিমা তাঁকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝে পেল না। বুলবন সদরঘাট চলে গিয়েছিল, বাড়িতে থাকলে কী পরিস্থিতি হতে পারত সেকথা ভাবতেও সাহস হল না চন্দ্রিমার।

মণির ফুলো চোখমুখ দেখে আয়েষা বারবার জাতে চাইলেন—কী হয়েছে তোর, আমাকে বল! তোকে কেউ মেরেছে! বউমা! তুমি কথা বলছ না কেন?

হঠাৎ মণি বিছানায় উঠে বসল। রাহুল চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে নিয়ে বলল—আমাকে কেউ মারেনি। পড়ে গিয়ে লেগেছে। বলেই সে চৌকি ছেড়ে নেমে দোতলার ছাদের উপর চলে গেল।

আধঘন্টা বাদে আবার সদর দুয়ারের কড়া নড়ে উঠল। এবার চন্দ্রিমা নিজে হাতে পাল্লা খুলে দিতেই শরম আলি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। সিধে দোতলায় উঠে যায়। দোতলায় রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল মণি। সেখানে পৌঁছে মণিকে কী যেন বলল। মণি নীচে নেমে গায়ে জামা গলিয়ে নেয়। তা দেখে চন্দ্রিমা ওর কাছে ছুটে আসে। হাত ধরে শঙ্কাতুর কণ্ঠে বলে—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

মণি বলল—মেজবাবু ডাকছে।

—যাবে না। দাঁড়াও! কিছুতেই যাবে না এখন! কেন যাবে, ডাকলেই যেতে হবে! বলতে বলতে কঠিন চোখে থুতনি-কাটা ললিতের দেহরক্ষী বেহায়া গোছের শরমের দিকে চাইল চন্দ্রিমা।

—পুলিসে ডাকছে, যাবে না! গম্ভীর গলায় বলল শরম আলি।

—না! চন্দ্রিমা দৃঢ় এবং মৃদু উত্তেজক গলায় বলে উঠল।

—যাবে না?

—না, যাবে না।

—এর পরিণাম ভাল হবে না বৌদি!

রাহুল এবার শরমের সামনে এগিয়ে এল। বলল—তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। চোখ রাঙাবে না!

—কী বুললে! এত গুমোর! বিষদাঁত উপড়ে দিব কিন্তুক! পুলিসকে ডর নাই!

—কোন বাজে কথা বলবে না এখানে! মণি যাবে না। ব্যাস!

—পরিণাম খুব খারাপ হচ্ছে রাহুল!

—জানি।

—তোকে বাপের ভিটে ছাড়তে হবে বুলে গেনু।

—তা-ও জানি বইকি! যা, চলে যা শরম। এই দেশটা তোর একার নয়।

—তুই তুকারি করে কথা বুলবি না রাহুল চৌধুরী! আজ রাতেই উচ্ছেদ হয়ে যাবি। দাঁড়া, ব্যবস্তা হচ্ছে!

বলেই লাফাতে লাফাতে শরম আলি বাড়ির বাইরে ছুটে চলে গেল।

চূড়ান্ত এক উদ্বেগ আচ্ছন্ন করেছিল চন্দ্রিমার সমস্ত মন। তার শঙ্কা হচ্ছিল, আবার হয়ত পুলিস হানা দেবে। মণিকে যেতে দেওয়া হল না বলে পুলিস ছুটে আসবে তেড়ে। কিন্তু চরম উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ সত্ত্বেও সন্ধ্যা নেমে এল, পুলিস এল না। চন্দ্রিমা বুঝতে পারছিল রাহুলের দল কাশিমবাজারে বন্দুক ছিনতাই করেছে, মণি সেই ঘটনায় জড়িত কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এমনকি পুলিসও সন্দেহবশে হানা দিয়েছে এখানে। ললিত থানাকে চালনা করে এনেছে। কেউ নিঃসন্দেহ হতে পারছে না, কিন্তু ললিতমোহন মণিকেই ঘটনায় জড়িয়ে ফেলেছেন।

মণি বলল—বন্দুক আমি ছিনতাই করিনি মা! তোমার কিরা মা!

আয়েষা বললেন—তা হলে পুলিস কেন এল! বল বউমা! তোমরা রাজনীতির লোক! বাবুর ইজ্জৎ তো আর রইল না দোলন!

রাহুল কোনও কথা না বলে চুপচাপ মায়ের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিল। বউদির উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করছিল। মণির মুখমণ্ডলে একটি প্রকট ব্যথার আলোড়ন দেখছিল। শরম আলির আচরণ সে হজম করতে পারছিল না।

রাত্রে বুলবন ফিরলে আয়েষা বললেন—জামাকাপড় ছেড়ে ফেলো না বড়খোকা। আমি একবার তোমাকে সঙ্গে করে তরফদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি জানতে চাই, পুলিস কেন আমার বাড়ি চড়াও হয় বারবার।

কথা শেষ করেই আয়েষা লক্ষ করলেন বুলবনের পিছনে আদিত্য সিংহ একটি ভি আই পি ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে ঈষৎ লজ্জাবোধ করেন তিনি। মাথায় ঘোমটা টেনে নিয়ে বলেন—এসো বাবা! দেখে যাও, আমার সংসারের কী হাল হয়েছে!

আদিত্য বলল—পুলিস সর্বত্র হামলা চালাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জে গত সপ্তাহে আমাকে

ধরবার জন্য পার্টি অফিসে হানা দেয়। আমাকে না পেয়ে দুজন অন্য কমরেডকে তুলে নিয়ে গেছে। থানার কী করে ধারণা হয়েছে, আমি নাকি চেয়ারম্যানের পার্টির লোককে শেলটার দিয়ে রেখেছি এবং আমরা তাদের মদত দিচ্ছি! আমি সাহস করে একাই ডি এম-এর সঙ্গে দেখা করি তারপর। দেখা করে আমি আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্পষ্ট করে বলি। আমরা পুলিসি সন্ত্রাসের সমর্থক নই। আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন, কিন্তু জেলে যে অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখব। সর্বত্র যে অত্যাচার, দমন-পীড়ন হচ্ছে, সাধ্যে যতদূর পারি তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলব আমরা। ডি এম বলল, আপনারা যে শরৎ জন্মোৎসব করছেন, এটার মানে কী? এই মাস-প্রোগ্রামের হেতু তো বুঝি না! এর আড়ালে কোনও চেয়ারম্যানকে লুকিয়ে রাখছেন না তো! কী কঠিন ধূর্ত ম্যাজিস্ট্রেট ভেবে দেখুন বুলবন!

বলতে বলতে চৌকির উপর বসে পড়ল আদিত্য সিংহ। বুলবন মায়ের দিকে একদণ্ড দেখে নিয়ে বলল—পুলিস এসেছিল তাহলে! আসতে দাও। সদরঘাটে তৈমুরের দোকানে মেজবাবু বসেছিল দেখেছি। ওদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু মাহেফরাসদের আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়া। দৃষ্টিটাকে ওয়াটার-গেট থেকে চৌধুরী বাড়ির উপর ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে!

চন্দ্রিমা সামনে এসে দাঁড়ালে আদিত্য বলল—সমস্ত এলাকায় দ্রুত আমাদের কাজের নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছড়িয়ে দিতে হবে। আর বসে থাকা চলবে না। এ ছাড়া এই ফ্যামিলিকে রক্ষা করা যাবে না।

রাহুল দোতলার উপর থেকে নীচে নেমে এসেছিল। কোনও ভূমিকা সে করল না। সরাসরি বলে উঠল—এই ফ্যামিলির উপর লক্ষ্য সবার। কিন্তু দমন-পীড়ন যা হবার তা তো হচ্ছেই। আমি মনে করি বন্দুকের জবাব শরৎচন্দ্রের পুস্তক দিয়ে সম্ভব নয়।

আদিত্য ক্ষীণ হেসে বলল—আমি কোনও বই-পুস্তকের কথা বলছি না একেবারে। আমি বলছি, উপযুক্ত মাস-অরগানাইজেসনের কথা। সমস্ত এলকার মানুষ যেন এই ফ্যামিলির ভালমন্দে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, তার জন্য দ্রুত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

রাহুল বলল—কীভাবে গড়ে উঠবে বলুন!

আদিত্য বলল—তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারে আমি আলোচনা করব বলেই এসেছি। রাতটুকু থাকব এখানে।

—নিশ্চয়ই থাকবেন। কিন্তু কথা তো হবে না আপনার সঙ্গে! আমি এখনই চলে যাব।

—কোথায় চলে যাবে?

—আমার অনেক কাজ। আমার এক বন্ধু খুব অসুস্থ, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। দুঃখিত, আপনার সঙ্গে আমার কোনও কথাই হল না। তবে, যদি কখনও বুঝি, আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আমার, তাহলে নিজেই দেখা করব। চলি এখন!

রাহুলের কাঁধে ঝোলানো শুধুমাত্র কাপড়ের ব্যাগ ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নেই। তার চোখমুখ অসম্ভব থমথমে। আয়েষা তার কাছে সরে এসে অভিভূত স্বরে বলে উঠলেন সকরুণ চোখে দৃষ্টি মেলে ধরে—আমাদের এই রকম বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে এত রাতে তুই কোথায় চলে যাবি মেজখোকা!

—না মা! আমাকে যেতে হবে!

—আদিত্য এসেছে, তুই আগে ওর সঙ্গে কথা বলে তবে যেতে পারবি।

—সেই সময় হবে না। আমার সময় নেই মা!

—তুমি কি কাজ করছ বাছা, আমাকে কেন কখনও বলনি? তোমার পড়াশুনার কোন্ ব্যবস্থা তুমি করলে, কী হবে, কিছুই তো শুনি না আর? বউমার পরিশ্রমের দাম নেই? বল, কথা বল তুমি!

রাহুল তল-চোখে একবার চন্দ্রিমার মুখ দেখে, একবার বুলবনের শুকনো মুখের দিকে চায়। আদিত্যর চোখে চোখ তোলে না। মণি এসে সামনে না দাঁড়িয়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

শান্তস্বরে রাহুল বলে— সত্যিই আমার সময় হবে না।

আয়েষা বললেন—তোমার সব কিছুই খুব গুরুত্বপূর্ণ, যখন যা মনে কর। আমরা তো মানুষ নই! পেটের ছেলে হয়েও তোমাকে আমি চিনতে পারলাম না রাহুল!

এবার সহসা রাহুলের কণ্ঠস্বর কেমন ভারি শোনাল—বউদি! বলে একটু থেমে গেল সে।

সেই স্তব্ধতার ফাঁকে আয়েষা বললেন—তুমি তাহলে ভাত খেয়ে যাও।

—না। একটু কঠিনই শোনাল রাহুলের গলা।

আয়েষার মুখ দিয়ে এক্ষণে তুমুল দুঃসহ কথাটি অসতর্ক সুরে বার হয়ে এল। কেন তিনি এমনটি বললেন নিজেও জানেন না।

—তাহলে তুমি আর এ বাড়িতে এসো না রাহুল!

—মা! তুমি এই কথা বলছ!

—হ্যাঁ বলছি! মায়ের গলা ধরে এল সহসা।

অসম্ভব শান্ত হয়ে রইল রাহুল। তার চোখের কোণে ঘণীভূত ঈষৎ বেদনা টলটল করে উঠল অশ্রুহীন। চোখের পাতা ভারি হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তার মনে পড়ে গেল, দুদিন আগেই মা তাকে আহ্লাদিত স্বরে বলেছেন, বৌদি তার জন্য রাত জেগে পড়াশুনা করছে। সেই মা আজ অন্য কথা শোনালেন, তিনি বুঝে গিয়েছেন পড়াশোনার সঙ্গে রাহুলের বাস্তবিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

আবার বউদির দিকে চোখ তুলল রাহুল। বলল—তোমার করে দেওয়া হিস্ট্রির নোট আমার আর বোধ হয় কোনও কাজেই লাগল না বউদি। তুমি ভুল বুঝো না।

কথা খুব সামান্য, 'ভুল বুঝো না', তাইতেই চন্দ্রিমার বুকটা মুচড়ে উঠল। একদিন এমনি করেই মন্মথ চলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। কী আশ্চর্য! জ্যেঠিমা শাশুড়ির মত করেই বলেছিলেন, 'তুমি তাহলে আর এ বাড়িতে এসো না ছোটন!' শুধু অভিমান-আতুর মায়ের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল এভাবে, সন্তান তা কি বোঝেনি, তবু কত দূরে অদৃশ্য হাওয়ায় মিশে গিয়েছিল কেন?

রাহুল বলল—মা! তবু আমি একদিন আসব! আমার কিছু বই থেকে গেল টেবিলের উপর। ওইগুলো এখানে রাখা যায় না। একদিন এসে নিয়ে যাব। ওই বইগুলির মধ্যে একটি মুদ্রিত কবিতা আছে একখানি পত্রিকায়, 'মজুরের চোখে ইতিহাসের কেতাব।' বের্‌টল্ট ব্রেশ্‌ট লিখেছেন আদিত্যদা! নিশ্চয় আপনি পড়েছেন। আমাদের এক নতুন কবি ওটি অনুবাদ করেছেন। আমি বউদিকে বলেছিলাম, নতুন যুগে নতুন লেখক চাই আমাদের। তাই না? চলি তাহলে!

পুরু কাচের চশমার আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত আদিত্য সিংহের চোখ দুটি ব্যথায় ভরে উঠেছে,

যেন রাহুলের হৃদয়ে তারই প্রশ্বাস বইছে। দুজনের মুখের আদলে মিল আছে হাবেভাবে এবং গঠনেও। একজন বয়স্ক, পরিপূর্ণ যৌবনের শেষভাগে স্থিতধী। অন্য জন কৈশোর উদ্ভাসিত যুবা, বেগবান এবং চঞ্চল।

আদিত্য একটু নড়ে উঠে বলল—একটি কথা রাহুল। ওনলি ওয়ান লাইন। তোমার চেয়ারম্যানের কথা। বিপ্লবী-কর্মীরা জনগণের মধ্যে মিশে থাকবে, যেভাবে মাছ মিশে থাকে জলে। আমি সংগঠন বলতে কর্মীর এই অবস্থানের সচ্ছলতার কথা বুঝি। তুমি যেখানেই যাও, যেন তুমি স্বচ্ছন্দ হতে পার, আমার বিপ্লবী অভিনন্দন রইল। কিন্তু...

পা বাড়িয়েও আদিত্যের কথায় স্পৃষ্ট হয়ে থেমে পড়ে রাহুল।

—বলুন!

—জলের কিন্তু আর একটি রূপ হল বরফ। সেখানে মাছ থাকতে পারে না। যদি চাষী নিজের থেকে বন্দুক কাঁধে তুলে না নেয়, তাহলে জোর করে তুলে দিও না।

মুহূর্তের জন্য আদিত্যের কথায় মাথা নীচু করে রইল রাহুল। তারপর তার মোহরকে দেওয়া মুমতাজের চৈনিক ফটোর উপহারের কথা মনে পড়ে গেল। চাষী সেখানে আপন উৎসাহে বন্দুক কাঁধে করে রয়েছে, কেউ তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়নি। হঠাৎ অতঃপর মণির চোখে চেয়ে দেখল রাহুল। মণির ঠোঁটে ফুটে উঠল অত্যন্ত সবল নিঃশব্দ সচ্ছল হাসি। যেন ফিক করে হেসে উঠেছে পাগল ছেলেটা। না, ফিক করে নয়, ক্রমশ ধীরে ধীরে। শুধু এই হাসিই হয়ে উঠল রাহুলের প্রেরণা।

রাহুল বলল—বরফ কিন্তু জলের স্থায়ী রূপ নয় আদিত্যদা! উত্তাপ পেলে বরফ জলে পর্যবসিত হয়।

—হয়। বলল আদিত্য।

—এবং সেটা ন্যাচারাল। বলল রাহুল।

—হ্যাঁ। অবশ্যই। বরফ গলবার একটা ঋতু আছে। আগে নয়, পরেও নয়। আদিত্য দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

—আর তখন চাপা পড়া বীজও বরফ ঠেলে ওঠে। যুক্তি দেখায় রাহুল।

—বরফ ঠেলে নয়। বরফ সরে গেলে উপযুক্ত উত্তাপে...আদিত্য প্রতিযুক্তি স্থাপন করে।

—হ্যাঁ, উদ্ভিদ গজায়। উপামাটা আদিত্যদা মাছের নয়, বীজের।

—জলের উপমান হলে মাছের। বরফ হলে বীজের। ঠিক যেমন দেখবে তুমি।

—হ্যাঁ, এখন এমারজেন্সি। কিন্তু আমাদের বিলে জল এখনও জলই রয়েছে আদিত্যদা। আর নয়, এবার আমি যাব।

—আসার পথে দেখলাম রাহুল। পুলিস দাঁড় করিয়ে রেখে ললিতমোহন জলের কপাট তুলে দিচ্ছে। জল জলই বটে, কিন্তু সেটা স্থায়ী নয়।

—আপনি তারাশঙ্কর পড়েছেন? তাঁর একটা 'অভিযান' বলে উপন্যাস আছে।

—আছে।

—সেখানে আমাদের জলের একটা বর্ণনা আছে, পড়ে নেবেন। চলি।

—খোকা! মেজখোকা! রাহুল!

মায়ের হৃদয়বিদীর্ণ করা ডাকে বাইরে মদির জ্যোস্নালোকে দাঁড়িয়ে পড়া রাহুল একবার শুধু কঠিনস্বরে বলে উঠল—মা! তুমি তো আমায় চলে যেতে বলেছ! বলেই দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায় সে। আর ফিরেও দেখে না। মা এবার শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। দরজার

পাল্লা ধরে কেঁপে কেঁপে ওঠেন আয়েষা।

রাত্রি বেড়ে চলে। খেতে বসে আদিত্য খেতে পর্যন্ত পারে না। কারণ বুলবন খেতে পারছিল না একেবারে। আয়েষার মত চন্দ্রিমা না খেয়েই রইল। মণি কী খেল, না খেল, বোঝাই গেল না। ফুলভানু গজগজ করছিল। তার স্বামীটিকে সঙ্গে করে হালকা লেপ নিয়ে মণি মাঠে চলে গেল।

হেঁড়ে গলায় মণির গান ভেসে এল হঠাৎ দমকা বাতাকে। হঠাৎ-ই একটা হাওয়া বেবাক নড়ে উঠল যেন।

ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে...
ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে!
রইব না আর বেশিদিন
তোদের মাঝারে—

ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে।

মণির গান।

—কে গাইছে! আদিত্য শুধায়।

—মণি। বুলবন বলে।

মা! তুমি তো আমায় যেতে বলেছ! হঠাৎ এই স্পষ্ট স্বরটি স্পষ্টতর হয়ে বুলবনের কানে বেজে ওঠে। বুলবন বুঝতেই পারে না, এই স্বর বাতাস থেকে আসছে।

—কে? বলে চমকে ওঠে বুলবন। তারপর সে স্টিলের আলমারির মধ্যে পুরনো বাংলা ক্লাসিকস খুঁজতে থাকে। এখানে তার কিছু বই গচ্ছিত আছে। নানান রকম।

—কী খুঁজছেন আপনি? আদিত্য জানতে চায়।

—অভিযান। পাব কি?

চন্দ্রিমা বুলবনকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায়। বইখানি চন্দ্রিমাই খুঁজে পায়। বই খুঁজতে গিয়ে বুলবনের পুরনো বড় ডায়েরিখানা বার হয়ে আসে। সেটি টেবিলের উপর রেখে দেয় বুলবন। মনে পড়ে, ওই ডায়েরির পাতার ফাঁকে হিফাজত ডাক্তারের চিঠিখানা আছে।

বুলবন সেটি বার করে আদিত্যর হাতে দিয়ে বলে—পড়ে দেখুন। আমি ততক্ষণ জলের বিবরণটা বার করি। তারাশঙ্কর মানেই তো মাটি। তাতে যে জলের কথাও রয়েছে, রাহুল না বললে খেয়ালই হত না।

চন্দ্রিমা কাঁটা হয়ে আদিত্যের হাতের চিঠিখানি দেখছিল।

—আমাকে একটু পড়তে দেবেন আদিত্যবাবু!

—না। আপনার পড়বার দরকার নেই।

—কেন?

—না। এইটুকু শুধু বলে আদিত্য।

চিঠির প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যই বুলবন উচ্চারণ করে জল আর মাটির বিবরণ পড়ে যেতে থাকে।

"জেলা মুর্শিদাবাদের এই অংশটা নরম কালো মাটির দেশ। কাঁকর নাই, পাথর নাই, বালি যা আছে, তা-ও অত্যন্ত মিহি আর ঝিকমিক করে গুঁড়ো রুপোর মতো।"

পড়তে পড়তে থেমে পড়ে বুলবন। খানিকটা বাদ দিয়ে পড়ে—"ওই মাটির সমতল মাঠ। বর্ষার সময় জলে একবার ভরে উঠলে আর জল মরতে চায় না। গঙ্গার ধারে

খাল-বিল তখন ভরে ওঠে, সেই সব জলভরা বিলের চাপে মাঠের জল মরে না। বন্যাও হয় না, অথচ জলও মরে না। মাটিতে অফুরন্ত উর্বরতা, কাজেই ধান এখানে অমর।"

—জলও কি অমর, আদিত্যবাবু ! প্রশ্ন করে বুলবন।

—অমর কিনা জানি না, তবে এই জলের অন্তর্ধান আছে, সেকথা রাহুল বুঝতে চাইল না। বলে আবার চিঠির দিকে মনোযোগ দিয়ে আদিত্য চিঠি শেষ করে থমথমে মুখে বসে রইল।

হঠাৎ আদিত্য বলল—ওষুধের বাকস হাতে করে চন্দ্রিমা আপনাকে ডোঙায় চড়তে হবে। প্রণামপুর, নটখুলি, দৌলতডিহা যেতে হবে। ভয় করলে চলবে না। জলের মধ্যে মাছের মত মিশে যেতে হবে। আর দুজন কমরেডের সম্বন্ধ জলের মত স্বচ্ছল, বরফের মত কঠিন নয়।

বুলবন এবার উপন্যাসখানি টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—ভাবছি, রাহুল কি আর সত্যিই ফিরবে না !

বুলবনের এ কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তায় বুলেট মোটর-বাইকের প্রচণ্ড আওয়াজ ভেসে ওঠে। গর্জনটি বাড়ির খুব কাছাকাছি চলে আসছে মনে হয়।

—আমাদের এরা বাঁচতে দেবে না আদিত্যবাবু ! এই আওয়াজের দাপটে মানুষের সম্বন্ধ পর্যন্ত শিথিল হয়ে যায়।

বুলবনের উচ্চারণ অতর্কিত ছিল। সে কেবলমাত্র তার আপন উপলব্ধির কথা বলেছে। রাহুলের জন্য তার হৃদয়ে কষ্টের সীমা ছিল না। এই কষ্টের চাপে এবং চন্দ্রিমার কথা ভেবে, মায়ের কথা চিন্তা করে, সে যা বলে উঠল, সেই কথা কবিতার মত গূঢ়, কিন্তু দুর্বোধ্য ছিল না। চন্দ্রিমা কেঁপে ওঠে। ধীর পায়ে সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বাইরে গর্জন থামে এবং তর্জন শোনা যায়—অ্যাই শালা রাহুল, দুতলা থেকে নেমে আয় শালা শুয়োরের বাচ্চা ! আজাজিলের ছাওয়াল।

অকথ্য অশ্রাব্য সেই আক্রমণ, যেন মেদিনী কাঁপিয়ে চলেছে। ঘূর্ণিবাতাসের মত পাকিয়ে পাকিয়ে খাড়া হয়ে উঠছে। ঘরের দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়তে চাইল বুলবন। আদিত্য বাধা দিয়ে বলল—রাস্তায় যাবেন না বুলবন। কোনও উত্তর করবেন না।

—এইভাবে যা খুশি তাই বলবে ?

—বলুক বলতে দিন।

—এই ছেলেটার নাম শরম আলি। লঘু দফাদারের ছেলে ললিতের বডিগার্ড। ষণ্ডা।

আয়েষা এবং চন্দ্রিমা নীচে নেমে আসে। মদপ্রমত্ত গলায় হিংস্রস্বরে শরম বাবুর নামে নোংরা উচ্চারণ করে চলেছে। চন্দ্রিমা এবং বুলবনের সম্বন্ধ যে অবৈধ সেই প্রসঙ্গ অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় বলে যাচ্ছে। বুলবন এবং চন্দ্রিমার যদি কোনও সন্তান হয় তা হলে তা যে 'জারজ' বাচ্চা হবে সে কথা ধর্ম এবং সমাজের নামে দোহাই দিয়ে বলে চলেছে। বাড়ি থেকে রাহুলকে বার করে না দিলে এই চৌধুরী পরিবার যে রক্ষা পাবে না সে কথা তীব্রস্বরে ঘোষণা করে চলেছে।

চন্দ্রিমা সবার সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছিল না। আয়েষাকে বলল—আপনি উপরে চলুন মা !

আয়েষা বললেন—রাহুল যে আমার চলে গেছে, সেকথা মাতালটাকে বলে দিয়ে এসো—

বুলবন।

চন্দ্রিমা বলল—ওকথা বলার কি দরকার মা! রাহুলকে ভয় পায় বলেই অমন করছে! আপনি উপরে চলুন।

আয়েষা বলবেন—আমার আজ সমস্ত খারাপ। আজ আর কিছুই আমার ভাল নয়। আমাকে মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে!

আদিত্য এবার চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে—আমি দেখছি। বুলবন বা চন্দ্রিমা আপনারা কেউ আসবেন না!

চন্দ্রিমা বলল—আজ না হয় আপনি রয়েছেন। কিন্তু এর মোকাবিলা যে আমাদেরই করতে হবে আদিত্যবাবু! আমাকেও কিছু বলতে দিন! বলে চন্দ্রিমা বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

—আপনি আসবেন না চন্দ্রিমা! আগে আমি দেখি!

—না। আমিই বলব। চলুন!

চন্দ্রিমা, মাতাল শরমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল—রাহুল বাড়িতে নেই শরম আলি! আমার বিয়ের ভোজে তোমাকে নেমন্তন্ন করা হয়নি, তাই তুমি জান না আমি বিয়ে সত্যিই করেছি কিনা!

—করুন! জড়ানো গলায় টলতে টলতে বলে উঠল শরম।

—কী করব?

—জিয়াফত। নিকার খানা খাই! হি হি! খেঃ! খে খে...

পায়ে পায়ে বুলবন এবং তার মা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন।

আদিত্য বলল—তুমি তো আগে তিমিরবরণের দল করতে, তাই না? এখন ললিতের লোক!

—আজ্ঞা! লোক আমি যারই হই, খানা কিন্তুক খাব। রাহুলকে আমার চাই। আমি তার লোহু খাব। বুজলেন!

—কেন? সে কী করেছে! বলে উঠল বুলবন।

—সব করেছে। গাঁয়ে ক্যানে পুলিস ঢুকছে জানো না মেলেটারির পুত! ইবার কেলকেতায় ফিরা যাও বউ লিয়ে। ইখানে ইস্কেইলাহি চলবে না বুবন!

আদিত্য বলল—তুমি ভদ্রভাবে কথা বল শরম আলি। এই গ্রাম শুধু তোমার নয়। তুমি চলে যাও এখান থেকে।

আয়েষা হঠাৎ বলে উঠলেন—আমি তোকে জিয়াফত খাওয়াব শরম! আয়! রাহুল যে ভাত খেয়ে যায়নি, আমি তোর জন্যে রেখেছি। খেয়ে, তবে যেতে পারবি।

সহসা শরম কেমন চুপ করে যায়। আয়েষা তার হাত ধরে টান দেন।

—আয়! আমার ছেলে-বউয়ের বিয়ের খানা তোকে খেতে দেব। রাহুলের রক্ত খাবি! চলে আয় বাছা! বলতে বলতে পাগলের মত করে ওঠেন আয়েষা।

আদিত্য এবার কঠিনসুরে বলল—ছেড়ে দিন মা। ছেড়ে দিন! যাও! চলে যাও। শরম! তুমি জেনে যাও, এই গ্রাম বুলবনের নিজের গ্রাম। এখানে সে থাকবে।

এই সময় বেশ কিছু লোক চারাতলার মাচার কাছে জড়ো হয়ে এসেছিল। বুলবনের চাচা একজন; নাম হাকিম, তিনি এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বললেন—ভদ্রলোকের সাথে কথা বলা শিখতে হয় রে শরম! মদতাড়ি গিলে বাবুর বাড়ির সামনে মচ্ছব করলে আমরা সবুর করব না। ললিতের পার্টিকে ভোট

দিই আমরা, তাই বলে মাথা বিকিয়ে দিইনি। বুলবন আমাদের ছেলে তার ভালমন্দ আমরা দেখব। দরকার বুজলে বউমার দোয়াকালাম হবে। বাড়িতে মৌলবী ডেকে মিলাদ-নসিহত হবে। খানা খাবি, সেই ব্যবস্থাও হবে। বাবু যদি ফিরে আসে, সব হবে। ললিতকে বল, বাবুকে ছেড়ে দিতে। যা, সেইডে করে দেখা, বুঝব ক্ষ্যামতা!

হাকিমের দাড়ি অত্যন্ত কালো, ক্ষুদে মৌচাকের মত আড়া সেই নূরের। গায়ের রঙ কালো, পেটানো গড়ন, চোখ স্বচ্ছ, শিশিরের মত জ্বলজ্বল করছে। লুঙ্গি পরনে, গায়ে সাদা জোব্বা, কপালে সিজদার দাগ। হৃষ্টচিত্ত, ধার্মিক। তাঁর কথায় শরম দমে গেল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন জোয়ান ছেলে বলল—রাহুলের রক্তের অনেক কিমত শর্মা! ছুঁয়ে দেখিস, দাঁতের পাটায় আগে ধার দে!

—কে রে! আমাকে শর্মা ডাকে! মুখ ভেঙে দিব। আগা, আগা সামনে!

বলে তেড়ে যায় শরম। জোয়ানটি চুপ করে যায়। তারপর শরম এলোমেলো পা ফেলে ফেলে ললিতের মোটর বাইকের দিকে এগিয়ে যায়। একা এই রাতে সে মোটর-বাইক হাঁকিয়ে গ্রাম-শাসন করছিল।

চন্দ্রিমা বুঝতে পারছিল জীবনের আর কোনও নিস্তার নেই। রাহুল চলে গিয়ে ভালই করেছে। ভয় করছিল, মণি মাঠের মধ্যে ঝুপড়িতে শুয়ে থাকে। একা যদি কখনও আক্রান্ত হয়! শাশুড়ির পাশে শুয়ে তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সে নিঃশ্বাসের শব্দে বুঝতে পারছে, আয়েষা জেগে আছেন। জেগে থাকতে থাকতে মায়ের গা হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল।

—মা! অস্ফুট ডাকল চন্দ্রিমা। মায়ের দেহ আরও জোরে কেঁপে উঠল। চাপা অবরুদ্ধ কান্নার বেগ আয়েষাকে এতই উতলা করে তুলেছে যে, আর এই দেহ তাঁর বাগে নেই।

—মা রে! বলে আয়েষা চন্দ্রিমাকে পাশ ফিরে দুই বাহু দিয়ে বুকে টেনে ডুকরে উঠলেন হঠাৎ। সন্তানকে মানুষ এ ভাবে বুকের মধ্যে টেনে নেয় গভীর সঙ্কটকালে। চন্দ্রিমার মনে হল তার নিজের মা তাকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করে সন্তানের উত্তাপ পেতে চাইছেন। চন্দ্রিমার উপর রাতের জ্যোস্নালাগা পথের উপর খানিক আগে যে আক্রমণ হয়েছে, দুহাত দিয়ে শাশুড়ি যেন তাই প্রতিহত করতে চাইছেন। ভবানীপুরের কথা মনে পড়ে যায় চন্দ্রিমার। জ্যোস্নারাতে ছাদের উপর উঠে চাঁদ দেখার স্মৃতি নাড়া দেয়। শিশিরে হিমে জ্যোস্নায় নারকেল পাতার সরসর শব্দ। সামান্য হাওয়ার আলোড়ন। মণিকে দড়িবেঁধে, মেরে, হকিকৎ কোরান হাতে দিল। হাকিম চাচা কি তবে তারও হাতে কোরান তুলে দেবেন? শরম রক্ত চায়, হাকিম চান ধর্ম। এরই সঙ্গে রাজনীতি মিশেছে ওয়াটার গেটে কালো মাটির দেশে। কোন বিপ্লব পারে এই মৃত্তিকার উপর মানুষের রূপান্তর? রাহুলের রক্তেই কি এই সমাজের মানসিক ধর্ম-কুষ্ঠ সারে? ভবানীপুরের মা স্বর্ণময়ী বলেছেন, চন্দ্রিমা তার সমাজ-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে মুসলমানের বউ হয়েছে বলে জ্যাঠার মেয়েদের বিয়ে হবে না। এই অভিযোগ উঠেছে, ফলে ভবানীপুরে যাওয়ার পথ চিররুদ্ধ। বুলবনের প্রেমও যদি আজ পর হয়ে যায়, কোথায় দাঁড়াবে চন্দ্রিমা!

বড়ই কষ্ট এই হৃদয়ে।

—মা! মা গো! বলে চন্দ্রিমা এবার কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইল, কিন্তু এ ভাবে সে কাঁদতেও পারল না। শাশুড়িকে ছেড়ে সে বিছানায় উঠে বসল। শাশুড়ি-বউ রাহুলের খাটে শায়িত। নীচে রয়েছে আদিত্য-বুলবন। এখন চন্দ্রিমা টেবিলের ল্যাম্পটার অতি

ক্ষীণ শিখাকে মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে উসকে দেয়। 'মজুরের চোখে ইতিহাসের কেতাব' কবিতাটি হাতড়ে বার করে ফেলে। মনে হয়, ওই কবিতার মধ্যে কোথাও তার হৃদয়ের আশ্রয় আছে।

আয়েষা বললেন—আমাকে শোনাও বউমা !

চন্দ্রিমা আশ্চর্য হয়ে দেখল আয়েষার চোখে অপূর্ব তৃষ্ণা ছলছল করছে।

"কারা গড়েছিল থিবিস নগরীর সাত সাতটি প্রবেশদ্বার ?
ইতিহাসের কেতাবে লেখা হরেক রাজার নাম।
কিন্তু বড়ো বড়ো চাঙড়গুলো ঠেলে ঠেলে তুলেছিল যারা তারা কি রাজা ছিল ?

ধ্বংস হল ব্যাবিলন
কিন্তু প্রতিবার নতুন করে তাকে গড়ে তুললো যারা, তারা কারা ?
স্বর্ণ ঝলকিত লিমা নগরীকে গড়েছিল যারা—
নগরীর কোন্ গৃহটিতে তাদের বাসস্থান ?

যে সন্ধ্যায় শেষ হলো চীনা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ
সে সন্ধ্যায় কোন আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিল ক্লান্ত রাজমিস্ত্রির দল ?

সাম্রাজ্যিক রোম বিজয়-তোরণে ভর্তি,
কিন্তু সেগুলি গড়েছিল কারা ?
কাদের বিজিত করেছিলেন সম্রাটেরা ?

গানে গানে অমর হয়ে আছে বাইজান্টিয়াম
কিন্তু তার সব গৃহগুলিই কি ছিল রাজপ্রসাদ ?
যে রাত্রে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হঠাৎ প্লাবিত হল—
পুরাণ কথিত আতলান্তিস্ নগরী,
সে রাত্রে, সেই দিশেহারা প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়েও,
ডুবন্ত মানুষগুলো মালিকের মেজাজ নিয়ে ডেকেছিল
তাদের ক্রীতদাসদের ?
তরুণ আলেকজান্দার জয় করেছিলেন ভারতবর্ষ
জয় করেছিলেন কি তিনি একা ?
সীজার মেরে তাড়িয়েছিলেন গল্‌দের
কিন্তু একটি বাবুর্চিও কি ছিল না তাঁর ফৌজে ?

স্পেনের নৌবহর ধ্বংস হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেলে
কেঁদে ভাসিয়েছিলেন স্পেনের রাজা ফিলিপ,
কিন্তু আর কেউ কি কাঁদেনি ?
সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন মহামতি ফ্রেডরিক,
আর কারা জয়ী হয়েছিল তাঁর সঙ্গে ?
ইতিহাসের পাতায় বিজয় কাহিনী,

কিন্তু বিজয়োৎসবের খরচ জুগিয়েছে কারা ?
প্রতি দশবছর অন্তর একজন করে মহাপুরুষের আবির্ভাব,
কিন্তু কাদের গাঁটের শেষ কানাকড়ি টেনে নিয়ে
তৈরি হয়েছিল এই মহা আবির্ভাব-পথ ?

মনে আসে এই ধরনের নানা খুঁটিনাটি কথা,
এই ধরনের হাজারো রকমের প্রশ্ন ।

আয়েষা প্রশ্ন করলেন—ন্যালার মা কেমন আছে দোলা ? কদমের বউ ?

বই বন্ধ করে চন্দ্রিমা খাট ছেড়ে নেমে উত্তাল অজস্র প্রশ্নের ভিতর হৃদয়কে রেখে ক্রমাগত রাহুলের মুখচ্ছবির উদয়ের আঘাতে বিক্ষত এবং কবিতার স্পর্শে শুশ্রূষা পেতে পেতে দোতলার ছাদে চলে আসে। একান্তে সে কাঁদবে ভেবেছিল। দুহাতে মুখ ঢেকে ছাদের কোণে উবু হয়ে বসে শুনতে পায়—ন্যালার মা কেমন আছে দোলা ! কদমের বউ ?

ডুকরে উঠে চোখের উপর থেকে কার পায়ের শব্দে হাত সরিয়ে ফেলে। ছাদের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বুলবন। চন্দ্রিমার মনে হল, সে স্বামীর বুকের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'একবার খালি তুমি আমাকে ডাকো !' মনে মনে চন্দ্রিমা বিড়বিড় করল। সীমাহীন তৃষ্ণায় চাঁদের আলোয় স্বামীর দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল সে। বুলবন কিন্তু ডেকে উঠল না।

॥ ২৩ ॥

মণি বিশ্বাস করতে পারছিল না তার দুটি চোখকে। প্রথমে অদ্ভুত দর্বোধ্য আর্তনাদ করে উঠেছিল হুকুম আলি। তারপর স্যালো পাম্পের আলের উপর দাঁড়িয়ে হাহার্তস্বরে 'মণিচাচা ইদিকে আসো' বলে ডেকেছিল। ঝুপড়ির ভিতর থেকে মণির মনে হল, কোনও বিষাক্ত সাপ দেখেছে লোকটা ! একটা কিছু ভয়ংকর বস্তু দেখেই যে আর্তনাদ করছে স্বরের আন্দোলন শুনেই বোঝা যায়। শীতের সময় আলবোড়া কি বার হতে পারে !

অবশ্য কোনও সুদৃশ্য বস্তু দেখেও আর্তনাদ করা হুকুমের পক্ষে বিচিত্র নয়। সরল সিধা আবেগপ্রবণ মানুষরা আশ্চর্য সুন্দর কোনও দৃশ্য দেখেও হাহাকার করে ওঠে—যদিও আনন্দের অভিব্যক্তি যে হাহাকার নয়, তা হুকুমকে বোঝানো যায় না। হুকুমের গলায় চাপা ভয়, উদ্‌গত বিস্ময় এবং ঘোর গম্ভীর রহস্য ! একবারই শুধু 'আসো' বলে ডেকে থেমে পড়েছে, কুয়াশায় তাকে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। ভোরের এই অসম্ভব কুয়াশা ঠেলে আসছে বলেই কি হুকুমের স্বর অধিক বিপন্ন শোনালো ! অত্যধিক বিমূঢ় হয়ে পড়লে দ্বিতীয়বার ডেকে উঠতেও মানুষ ভুলে যায়।

তালপাতা আর নাড়া ছাওয়া এই কুটির বাঁশের মাচার উপর মাটি ছাড়িয়ে পৌণে দু'হাত উচ্চে অবস্থিত, সাতবিঘার কোণে। মণি লেপ ঠেলে চাদর জড়িয়ে ঝুপড়ি ছেড়ে নামে। পায়ে কাদামাখা বরারের জুতো।

রাত্রে বাড়ি ছেড়ে রাহুলদাদা চলে গেল, মানুষের সংসারে কত ঘাট হয়েছে আমাদের !

ভেবেছে মণি। ভাবতে ভাবতে হুকুমকে সঙ্গে করে মাঠের ঝুপড়িতে এসেছে। কিছুক্ষণ বাদেই জলগেটের ওদিকে সোরগোল শুনে হুকুম আর সে দৌড়ে ছুটে যায়। সেখানে প্রচুর লোকের ভীড় জমে। হাট-ফেরতা মাহেফরাসরা সন্ধ্যা থেকে সেখানে পাহরা দিচ্ছিল। জল-গেট তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন ললিত। তিনজন পুলিস ছিল সঙ্গে। মাহেফরাসদের উপস্থিতির কারণে গেট তুলতে পারছিলেন না তিনি। তিমিরবরণ বারবার ললিতকে জল-গেট তুলে দিতে নিষেধ করছিল। পুলিসরা বলছিল, দু'দিন বাদে গেট তোলা হবে। বড় দারোগা এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের উপস্থিতিতে গেট তোলা দরকার। এই সব বচসা হতে হতে রাত্রি বেড়ে গিয়েছিল। মজলিস ডেকেও নাটা এবং ললিত কেন উপস্থিত থাকেননি সেই প্রশ্ন বারবার উঠছিল।

মাহেফরাসরা কদমগাছের তলায় জড়ো হয়ে বসে পড়েছিল। রাহুল এসে সেখানে উপস্থিত হয়। ভীড়ের মধ্যে হরবোলা খতিব ছিল। তাদের দেখে মণি আর হুকুম সেখানে থেকে যায় রাত একটা দেড়টা অবধি। ললিতমোহন, শশাঙ্কমোহন, তাদের সাঙ্গপাঙ্গো সবাই থাকে।

গেটের ওদিকে ছুটে যাওয়ার আগে স্যালো টিউবওয়েলের পাম্প-মেশিন বন্ধ করে দিয়েছিল হুকুম। ঝুপড়িতে ফিরে এসে আর সেই যন্ত্রটি চালু করেনি। লেপ টেনে নিয়ে দু'জনই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মনে আছে, হরবোলা কদমতলায় বসে বসে হড়হড় করে বমি করছিল। গায়ে জ্বর। রাহুলদাদা পকেটের রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে হরবোলার কপালে জলপট্টি করছিল ক্ষণে ক্ষণে। তবু ওরা গেট ছেড়ে চলে যায়নি। মদ খেয়ে মোটর বাইক তাড়িয়ে সেখানে এল শরম। রাহুলকে দেখে 'অ্যাই শালা' বলে গালি দিয়ে উঠতেই পরিস্থিতি থমথমে হয়ে গেল।

রাহুল সিধে ললিতমোহন এবং পুলিসকে বলল—শরমকে সামাল দিন, নইলে আমাকে একটা চান্স দিন, আমি ছোটলোকটাকে সিধে করি একবার! মেজবাবু! আপনি কি আমার ভাই মণিকে ডেকেছিলেন!

সমীর পুরকাইত সেকথার কোনও জবাব না করে শরমকে তার মাতলামির জন্য ধিক্কার দিতে লাগলেন। শরমের তড়পানি সহজে থামতে চায় না। দারোগার কঠিন শাসনে ধীরে ধীরে নিরস্ত হয় এবং শশাঙ্কমোহন শরমকে মোটর-বাইকের ব্যাকে বসিয়ে নিয়ে চলে যায়।

লেপের তলে শুয়ে হুকুম আর মণি বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না। জল-গেটের ভীড়ের মধ্যে দূরস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মণির একবার মনে হয়েছিল, মেজ দারোগা তাকে হয়ত গ্রেফতার করে ফেলতে পারে, যদিও সে বাস্তবিক কোনকিছু ছিনতাই করেনি। ফলে সে দূরে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখেছে, সামনে যায়নি।

রাহুলদাদা হরবোলার জলপট্টি করছিল, সমীর দারোগা তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কী কথা ফিসফিস করে বলল। রাহুল মৃদু মাথা নাড়তে থাকল। মণি ঘুমে আচ্ছন্ন হতে হতে রাত্রে সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল। তারপর আর কোনও কথাই মনে নেই। ভোরেই হুকুম আলি দুর্বোধ্য আর্তনাদ করে উঠল।

আলের উপর গালে হাত ঠেকিয়ে হতভম্বের ভঙ্গিতে বসে আছে হুকুম। মণির চোখ সেদিক থেকে সরে যেই স্যালো আর মেশিনের দিকে আসে সে মূঢ়-বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মস্তিষ্কের কোষ শূন্য হয়ে দপদপ করতে থাকে। মুহূর্তে গলা শুকিয়ে ওঠে।

একটি ভয়ার্ত পাখি মাথার উপর দিয়ে ডেকে তীব্রবেগে ছুটে চলে যায় দিগ্‌ভ্রান্তের ডানায়। সেদিকে একবার চোখ তোলে মণি। কুয়াশা হালকা হচ্ছে ক্ষীণ সূর্যালোকে। স্যালোর উপরের অংশ নেই। 'গঙ্গা' নামের এই মেশিনটার কিছু অংশ উধাও। হুকুমের চোখ ছলছল করছে। সাহস করে মণির চোখের দিকে চাইতেও পারছে না।

স্যালো উপড়েই শুধু নেয়নি, লোহার পাইপের মাটির লাগোয়া মুখে ইট চাপিয়ে পুঁতে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। চাষীকে ভাতে আর পানিতে মারা কতই না সহজ কাজ!

হঠাৎ বিদ্যুতের দীপ্রতায় মাথার কোষে মণির একটি ঝলকানি হয়। ওয়াটার-গেটের ভীড়ে সে কদম আলিকে দেখেছে রাত্রে। শশাঙ্ক যখন শরমকে মোটর-বাইকের ব্যাকে বসিয়ে নিয়ে চলে গেল, ঠিক তার পরেই কদমকে আর সেখানে দেখা গেল না।

—তুমি এখানেই থাকো, আমি আসছি! বলে মণি দ্রুত মাঠের আল ধরে হাঁটতে থাকে পুবমুখো। হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে পথে নামে। পথে অনেকক্ষণ হেঁটে এসে কদমের বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। তারপর পথ থেকে উঁচা ডিহির পাকাটি ঘেরা বাড়ির উঠোনে পেঁপেগাছের তলে এসে দাঁড়ায়। সূর্য উঠেছে, কুয়াশা কেটে গিয়েছে।

উঠোনের মাটির উনুনের গায়ে ন্যাতা বুলিয়ে হাওয়া বিবি গোবর-ছড়া দিচ্ছিল। রান্না চড়ানোর আগে এই ধারা হালকা গোবর-ছড়া দেওয়া অনেক গৃহিণীর অভ্যাস আছে। গরিব-কাঙালরাও এই আচার মানে, মুসলমান হলেও এর ব্যত্যয় হয় না। যদি সে চোরের বউ হয় তবুও।

হাওয়া বিবি ঘাড় বাঁকা করে একটু পাশ ফেরে। মণিকে দেখে কেমন শঙ্কিত-ভীত আর বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ত্রস্তস্বরে বলে—ভাই!

—তোমার মরদ কই!

—বিহানের ঢের আগে চলে যেয়েছে। ক্যানে গো!

—কোথায় গিয়েছে?

—তা কি বুলে যায় মোকে! তেবে ফিরবে বুলেছে।

—কখন?

—বৈকালে।

—বলবে, আমি এসেছিলাম! রাতে আমাদের স্যালো চুরি হয়েছে।

—সেকি ভাইজান!

—হ্যাঁ।

—খুদা কসম! মুই কিচ্ছু জানু না।

—ঠিক আছে।

—শুনেন মণিভাই! মরদ ফিরলে আমি শুধাব।

—তোমার কাছে শশাঙ্ক আসে? রাত্তিরে?

—না।

—কাল এসেছিল কখন?

—আসে নাই। নবীর কিরা।

—ন্যালাকে শশাঙ্ক মেরে ফেলেছে। সেই লোক আসে কেন! ঘরে উঠতে দাও কেন?

—সেই সওয়াল পুছলে কী জবাব দিই বলেন তুমি!

—তোমাকে শশাঙ্ক ভালবাসে?

—ছিঃ ! ছিঃ ! কী বুলছ ভাই ! আমার মরদ নাই ? এই সব বুললে জিভ আপনার খসে যাবে মণি ! পাপ হবে !

—তোমার পাপ হয় না !

—হয় ! বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাওয়া এবং তার দু'টি চোখ ছলছল করে উঠল।

মণি বলল—সেই পাপে এই ভিটা তোমার থাকবে না হ্যাবাবিবি ! তুমি আর পাপ করবে না। করলে আমি দা দিয়ে তোমাকে কুপিয়ে কাটব। তুমি নষ্ট ? বল, তুমি নষ্ট হয়েছ ?

—না। এইসব মিছা কথা ! হঠাৎ হাওয়াবিবি তার মতি বদলে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর বলে—তোর মুখে কুষ্ঠ হয় চৌধ্রীর ছেলে। যাঃ ! যাঃ ! চলে যা ! আমার সোয়ামী তোর স্যালোর কী জানে ! বাজে কথা বুললে আমি চ্যাঁচাব, লোক ডাকব। পালা ! পালা ! না হলি বুলব, তুই গায়ে হাত দিইছিস !

সহসা এই এক রঙ্গমূর্তি ধারণ করে হাওয়া। মণি বড়ই আশ্চর্য হয়ে যায়। চোখে মুখে তীব্র বিস্ময়ই শুধু নয়, চাপা অপমান ফুটে ওঠে।

—যাঃ ! বলে এবার বউটা দূর থেকে সবলে গোবর-গোলার এঁটেল ছুঁড়ে মারে মণিকে লক্ষ্য করে। চোখের নীচে গালের উপর এসে আচমকা লাগে। বউটা তারপর হি হি করে হাসতে থাকে। মণি গালে হাত দিয়ে বদগন্ধ এঁটেলের ছোবড়া, যা ফেঁসের সঙ্গে জড়ানো, সেই গোলাজলের গুবরে পিণ্ড ফেলে দেয়। ক্রোধে কেঁপে ওঠে সে। আর এখন উঠোনেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

মণি দৌড়তে শুরু করে দেয়। হাওয়ার তীক্ষ্ণ জটিল হাসি তাকে তাড়া করতে থাকে। এই পৃথিবীর সকল মেয়ে কেন দেবী সরস্বতীর মতন পবিত্র আর সুন্দর হয় না ? কোনও কোনও মেয়ে এই রকম নষ্ট হয়ে যায় কেন ? আচ্ছা ! নষ্ট হওয়ারও কি আনন্দ আছে কিছু ! শশাঙ্ক কেন গরিবের বউ, চোরের বউকে নষ্ট করবে ? কেন সে চোরের মতন তার কাছে আসবে ? মণি ভাবে, সবাই জানে না, সে এখন অনেক ব্যাপার বুঝে ফেলতে শিখেছে। ভাল আর মন্দ ; সুন্দর আর অসুন্দর ; বড়লোক আর গরিব ; চোর আর সাধু সব সে ভাগ করতে পারে। তার হাতে কোরান তুলে দিয়ে সত্য বলাতে চাইলেন ব্যথাখালা, কিন্তু শশাঙ্কর হাতে গীতা তুলে দেবে কে ? হাওয়ার হাতে কোরান দিলে কী সে সত্য বলবে না ? কোরান কি সবার হাত স্পর্শ করার সাহস রাখে ? সকল ঘটনার কাছে কি পৌঁছায় কোরানশরীফ ! সোভান আলিকে মেরে ফেলেছিল শশাঙ্ক, কোর্ট তার হাতে ধর্মগ্রন্থ চাপিয়ে শপথ করিয়েছে সত্য বলার জন্য। শশাঙ্ক কি সত্য বলেছে ? তাহলে শুধু তাকে, অর্থাৎ মণিকেই কেন সত্য বলতে হবে ?

আকাশ থেকে বাপু মণিকে বললেন—তুমি সত্যই বলবে মণিখোকা ! কারণ, আমি যে সত্য বলেছি !

—সবাই যদি মিথ্যুক হয় বাপু গো !

—তবু তুমি সত্য বলবে ছোটখোকা !

—আমি যে ছিনতাই করিনি বাবা ! তবু খালা আমাকে কোরান হাতে চড়িয়ে পাপের ভাগী করল ! কোরান হাতে নিলে কার না ভয় করে বল ?

—তোকে ভয় দেখাবার জন্য করেছে মণি !

—বন্দুক দিয়ে শশাঙ্ক ভয় দেখায়। ব্যথা কোরান দিয়ে ভয় দেখালেন। তোমাকে

জেলে ভরে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে ওরা। স্যালো চুরি হয়ে গেল, এবার বাপু আমাদের অন্নের ভয় হবে। আমার আর যাত্রার দল গড়া হল না চৌধুরী সাহেব! আমি কী করে মুখ দেখাব মায়ের সামনে! রাহুলদাদা চলে গিয়েছে, এখন যদি আমার মূর্ছো হয়, আমি কি মরে যাব তাহলে? বাপু! তুমি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার জন্য কবে ফিরে আসবে। তুমি কি কখনওই ফিরবে না?

আশ্চর্য এক শূন্য করুণার মহাকাশে মণির মনটা উড়ে চলে যায়। কোথায় চলে যায় সে, কত দূরে, কোন সে সীমাহারা শূন্য দিগন্ত পার হয়ে অচেনা আকাশের নীলিমা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে মহান আকাশের কূলহারানো নীল কুঞ্চনের সন্নিধে, সে ঢুকে পড়ে আরও অন্তহীন নীল পুঞ্জিত নীলের হৃদয়ে। সে চলে যাচ্ছে, সে আর ফিরতে পারছে না। যেন সে আর বাপুরই মতন ফিরে আসতে পারছে না।

বাড়ির বাইরের চারাতলায় মাচার উপর চুপচাপ বসে পড়ে মণি। তার এখন বাড়িতে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না। একবাঁশ উপরে উঠে পড়ে সূর্য। বুলবন এবং আদিত্য বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। একটু বাদে চন্দ্রিমা আসে। মণি বুঝতে পারে, আদিত্য ফিরে যাচ্ছে বহরমপুর।

মণিকে দেখে ওরা তিনজনই মণির কাছে এগিয়ে এল। মণি এই তিনজনের কারও মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না। মোহড়াঘাটের দিকে চোখ মেলে অন্যমনস্কের মত বসে রইল। ওর অস্বাভাবিক থমথমে ভাব।

আদিত্য বলল—তোমার সঙ্গেও আমার কোন কথা হল না মণি!

মণি কোন উত্তর না দিয়ে যেদিকে চেয়েছিল সেইদিকেই চেয়ে রইল।

বুলবন বলল—এখানে এভাবে বসে আছিস কেন! আদিত্যবাবু তোকে কী বলছেন, শুনতে পাস না? হুকুম কই?

এবারও কোন জবাব করতে পারল না মণি। তার গলায় কান্না দলা পাকিয়ে তুলেছে। চোখে জল এসে পড়তে চাইছে। চোখ তুলে কারও দিকে চাইলে ধরা পড়ে যাবে ভেবে মাচা থেকে নেমে নিঃশব্দে যেন সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছে এমন ভঙ্গিতে দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটে গেল। তিনজনই খুব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আদিত্য বলল—বেচারির মন ভাল নেই। আসুন বুলবন! আমাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আপনি ফিরে আসবেন। চন্দ্রিমার আর আসার দরকার নেই! উনি রোগীদের দেখুন গিয়ে। ওষুধের দাম যা লাগে, পার্টি তহবিল থেকে দেওয়া হবে। রোগীদের কাছে থেকে কোনও পয়সাকড়ি নেবেন না। চন্দ্রিমা, আপনি প্রণামপুর যাবেন। মণিকে ডোঙা চালানোর জন্যে সঙ্গে নেবেন।

আরও নানান রকম নির্দেশ দেওয়ার পর আদিত্য বুলবনকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলল। চন্দ্রিমা কিছুক্ষণ চারাতলায় দাঁড়িয়ে থাকার পর বৈঠকখানায় ফিরে এসে ওষুধ বিলি করতে বসল।

মণি দোতলায় উঠে এসে মেঝেয় রেলিঙের গোল থামে হেলান দিয়ে বোকার মত বসেছিল। মা তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে আসেন। ছেলের চোখমুখে অসম্ভব কঠিন একটা নৈরাশ্য দেখে অবাক হন।

—কী হয়েছে তোর! রাহুল চলে গেছে বলে কি আমরা পথে বসেছি! আমাদের দেখবার লোক নেই নাকি! বুলবন নেই! বউমা নেই! তোর এত ভয় কিসের! এমন করে বসে আছিস কেন?

—মা !

—খাবি না ? খেয়ে নে। তুই মাঠে যাবি। তারপর তো হুকুম খেতে আসবে ! গরুদের জাবনা দিয়ে মাঠে যাস। চাষবাসে মন দে, আমাদের বাঁচতে হবে।

—আমরা বাঁচব, চাষবাস করব !...

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। শরমের ভয়ে আমরা মরে যাব নাকি ? কেউ যদি না দেখে, খোদা দেখবে। আকাশের ফেরেস্তা দেখবে খোকা ! রোজ ভোরে আমি নিয়ম করে কোরান পড়ছি এখন। তার সওয়াব আছে। সেই পুণ্যির জোরে আমার সংসার বাঁচবে।

মায়ের কথা শুনতে শুনতে মণি এতক্ষণে সংসার-অভিজ্ঞ বৃদ্ধের মতন নিঃশব্দে হেসে ফেলল।

—হাসছিস ?

—হ্যাঁ। হাসব না ? রাতে যে মাঠে স্যালো চুরি হয়ে গেছে মা !

—কার ? কার স্যালো ?

—সাদা চৌধুরীর মা। মেশিনের বাইরের পার্টসও চুরি করেছে।

—ও রে ! কী বলছিস তুই !

—তুমি দেখে আসো। মাঠে হুকুম পাম্পের কাছে বসে আছে।

আয়েষা কিছুক্ষণ একেবারেই থ হয়ে রইলেন। ছেলেকে কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ঘাড় গুঁজে বসে আছে মণি। তার যেন ঘাড়টা কে এক কোপে বুকের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছে।

—তুই থাকতে এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল মণি ! তুই দেখলি না ! আমাকে পথে বসিয়ে দিলি ? মুখপোড়া হুকুম কী করছিল ! তুই কোথায় যাস, কোথায় থাকিস ! তুই ছিনতাই করিস ! তুই চোর ! বলে আয়েষা পাগলের মত করে উঠলেন।

—মা ! বলে একটা মূঢ়-ব্যথিত আর্তনাদ করে উঠল মণি।

—হায় খোদা ! এখন আমি কার কাছে যাব ! চৌধুরীর টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে। তাঁর সই ছাড়া টাকাপয়সা উঠবে না। তিনি যে আমার হাতে কিছুই রেখে যাননি। সামান্য যা আছে, তাতে যে চাষের খচ্চা হয় না। হুকুমকে মাইনে পর্যন্ত দিতে পারিনি। ফুলির পরনের কাপড় ছিঁড়েছে, অবস্থা বুঝে সে মুখে ফুটে চাইছে না। ভাগ্য ভাল, রাহুলের পড়ার খরচ আর লাগবে না। সেই ভাল। খুব ভাল হয়েছে।

বারবার আয়েষা বিড়বিড় করতে থাকেন, তাঁর ভাল হয়েছে। বলতে বলতে তিনি নীচে নেমে বাইরের বৈঠকে চন্দ্রিমার কাছে চলে আসেন। সত্যি তিনি কার কাছে যাবেন বুঝে পাচ্ছেন না। চন্দ্রিমাকে ডেকে উঠতে গিয়ে চুপ করে যান। বউমা ডাক্তারি করছে দেখে এখন কেন যেন দৃশ্যটা তাঁর আর ভাল লাগে না। সেখান থেকে দ্রুত সরে চলে আসেন তিনি। তারপর একা মাঠের দিকে দৌড়তে শুরু করেন। রাস্তার লোক তাঁকে এই প্রথম দৌড়তে দেখে, কখনও তাঁকে কেউ এভাবে ছুটে যেতে দেখেনি কোনও কালে। ঘটনা গাঁয়ে গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে যায় বাতাসের তরঙ্গের সংকেত প্রবাহের মত।

রোগী বিদায় করে চন্দ্রিমা দোতলায় উঠে এসে একলা মেঝেয় নূপুরকে খেলতে দেখতে পায়। এই মেয়েটা ভারি চমৎকার। একা আপন মনে খেলা করে। পেটমোছা নূপুর খুব কচি, ওর সঙ্গে মণির বয়সের দূরত্ব দীর্ঘ। মেয়েটা পাড়ায় গিয়ে তার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলার আসর বসায় না। মায়ের আঁচলের তলায় ঘুরে বেড়ালেও ওর অস্তিত্ব এতই নীরব যে, আলাদা করে ওকে যেন দেখাই যায় না। বাপুটি জেলে চলে

যাওয়ার পর কচিটা আরও যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। সে আছে, অথচ আজকাল আর যেন একেবারেই কোথাও নেই, এমনই তার অস্তিত্বের ভাষা আর ছবিটি।

চন্দ্রিমা যখন নূপুরের কথা ভাবে, খুব কষ্ট পায়। নূপুর যে পড়াশোনাও করে না, সেই সম্পর্কে কারও কোন অসুবিধাও যে নেই। এই সংসারটা সত্যিই কেমন হয়ে গিয়েছে।

—মা কোথায় নূপুর ?

—মাঠে।

—মাঠে ! মাঠে কেন ?

—স্যালো চুরি করেছে। মা কাঁদছে।

ঠিক এই সময় দোতলার বারান্দায় মণিকে সরে চলে যেতে দেখে চন্দ্রিমা। যেন সে পালিয়ে যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে আসে চন্দ্রিমা, ঘরের বাইরে। রাহুলের ঘরের বাইরে। খাটের তলে পুতুল নিয়ে খেলা করছে নূপুর। স্যালো চুরি হয়েছে, কথাটি প্রথমে বুঝতে পারে না চন্দ্রিমা। স্যালো কেন চুরি হবে ! স্যালো-টিউবওয়েল, সেটা তো মাটিতে পোঁতা, তা কেন চুরি হতে যাবে !

মণি নীচে নেমে চলে গেল। তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য চন্দ্রিমা ছুটে নামে। ধরতে পারে না। মণি রাস্তায় চলে যায়। হনহন করে হেঁটে চলে গেল রাস্তার বাঁকটার দিকে।

সত্যিই তবে চুরি হয়েছে জলতোলার যন্ত্রটা। মণি তাই পালিয়ে যেতে চাইছে। বেচারি বউদির সামনে দাঁড়িয়ে কথা অবধি বলতে পারল না। বাড়িতে নূপুর ছাড়া কেউ নেই। একা তাকে রেখে কোথাও চলে যাওয়া যায় না। চন্দ্রিমা সমস্ত পরিস্থিতি ভেবে কেমন ভয় পেয়ে গেল। জীবনের সঙ্কটের এমন নির্মম আঘাত সে কল্পনা করতে গিয়ে অবশ হয়ে যাচ্ছে।

এক ঘণ্টা বাদে মা ফিরলেন, মণি ফিরল না। বুলবন ফিরেছে। হুকুম মাঠেই রয়ে গিয়েছে।

মা ফিরেই প্রথম তিনটি বাক্য বললেন বড়ই অদ্ভুত। বললেন—ললিত আমাকে উচ্ছেদ করতে চাইছে বউমা ! তোমাদের খাওয়ানো পারানোর সাধ্য কি ওই মণির আছে ! তোমরা আমাকে মাফ করে দাও।

বুলবন নিতান্তই অবাক হয়ে গেল। বলল—মাফ করে দেব ! তোমাকে !

—হ্যাঁ, বড়খোকা ! একবার আতর দালালের কাছে যাও। গত সনের পাটের টাকা এখনও কিছু পাব। তাই যদি আদায় করতে পার আর যদি কিছু আগাম দেয়, স্যালো জুৎ হয়, মেশিনের পার্টস আসে। নইলে আমি যে উরানবিরান হয়ে যাব বুবন ! তোমরা দু'টিতে দু'দিন পার্টি-পলিটিক্স বন্ধ রাখো। আমি আর পারছি না বউমা ! বলতে বলতে মায়ের গলা রুদ্ধ হয়ে আসে।

বুলবন কোনও কথা না বলে আতর দালালের কাছে যায় সাইকেল চড়ে। এক ঘণ্টা বাদে ফিরে আসে। দালালের দেখা পায় না। আবার যায়। আবার ফিরে আসে। সন্ধ্যায় যায়। রাত্রে ফেরে। সকালে যায়। পাঁচশ টাকা জোগাড় করতে পারে বুলবন। কলের মিস্ত্রি লাগিয়ে স্যালোর টিউব তোলা হয়। পাম্পের পার্টস যা খোয়া গেছে, হিসেব হয়। মিস্ত্রি বলে, দু'হাজার টাকাতেও কুলান হবে না।

কিন্তু কোথায় সেই টাকা ! আয়েষা বাড়ির পিছনের দু'টি নিমগাছ বিক্রি করেন। আতর দালাল পাওনা টাকা দিতে পারে না বলে গাছ দু'টি যায়। যখন এইভাবে টাকার জোগাড় হচ্ছে, তখন ধান শুকিয়ে না গেলেও থোড়গুলি ম্লান হয়ে আসে। জলের

দরকার। পার্টস কিনে এনে মেরামতির পর মেশিন চালু হতে সময় লাগে। থোড় সেই সময় অবধি তাজা থাকতে চায় না। মণির মস্তিষ্কে আগুন ধরে যায়।

মণি সেদিন দুপুরে অকারণ কাঠের বেলেটে হেঁসো শাণ দিতে থাকে। বালির ঘর্ষণে ফুলকি ওড়ে। মণির চোখে মুখে অকথ্য কাঠিন্য চকচক করছে। নগ্ন হিংস্র ধারালো হেঁসো বাতাসে সূর্যালোকে ঝলমল করে ওঠে তরোয়ালের মত, গোপন ছুরিকার মত ; গুপ্তির মত তীক্ষ্ণ সেই ঝলকানির রোষ, অতর্কিত উল্লাস সেই ঝলসানো রৌদ্রে। সেই দিকে চেয়ে সভয়ে চন্দ্রিমা চোখ বন্ধ করে ফেলে। মণি কাঁধে করে বয়ে এনেছে মেশিনের পার্টস। বাসের মাথায় তুলেছে টিউব, লোহার যন্ত্রাংশ। বহরমপুরের পি. কে. দাঁ-র দোকান থেকে বাসে এবং সদরঘাট থেকে গরুগাড়ি করে এনেছে। কাঁধে বয়ে মাঠে নিয়ে গেছে। মিস্ত্রি ডেকে এনেছে। দেখতে দেখতে মাঠের ফসল শুকিয়ে এসেছে। মণি তাই দেখে একা মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে ডুকরে কেঁদে ফেলেছে। ওর কাঁধে গরুর কাঁধের মত দাগ, সামান্য ঘা, কড়া।

সেই কাঁধে স্পর্শ করতে গিয়ে চন্দ্রিমা সাহস করে হাত বাড়াতে পারেনি। মনে হয়েছে, সহিংস দীপ্র ভারবাহী এই স্কন্ধ মানুষের নয়। এখানে তার অস্তিত্ব ভর করতে গিয়ে ব্যথিত হয়, লজ্জা পায় কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই। এমনকি সেখানে শুশ্রূষার পরশ দেবার সাহসও সে হারিয়ে ফেলেছে। স্বামীর মুখের দিকে চাইলে মনে হয়, এ যেন এক পরাশ্রয়ী জীব, বাইরের কেউ, জোর করে এই পরিবারে সে নিজেকে গুঁজড়ে দিয়েছে।

মিস্ত্রি নতুন করে পাইপ বসাচ্ছে এখন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ শেষ হল না। অথচ ফসলে আজই যদি জল না পড়ে তবে ধান হয়ে যাবে পাতান্। সন্ধ্যার পর চন্দ্রিমাকে সঙ্গে করে আয়েষা নাটার বাড়ি আসেন। ব্যথা তরফদারকে আয়েষা বলেন—আমাকে পানি দে বহিন তোর স্যালো থেকে, পাম্প মেশিন চালাতে বল্ হজরতকে। ঘণ্টা হিসেবে টাকা দিব, যা লাগে। আমাকে বাঁচাও ব্যথা !

কথা শুনতে শুনতে ব্যথার চোখ চকচক করে উঠল। নাটা বাঁশের মোড়ার উপর বসে বদনার জলে নল নিঙড়ে নখ ভেজাচ্ছেন নখ কাটবার জন্য। মাঝে মাঝে হালকা সাদা দাড়িতে হাত চুঁচে নামাচ্ছেন। মুখে মিষ্টি হাসি। চোখ তির্যক করে চাইছেন চন্দ্রিমার মুখে।

ব্যথা বললেন—পানি দিব বুবু। তার আগে দু'টি কথা কইব। সিধা জবাব করবা দোলাবউ। বলে তিনি একখানা আধ-ছেঁড়া পোস্টার সমুখে এগিয়ে ধরলেন। 'ন্যালার মৃত্যুর জবাব চাই, সাদা চৌধুরী জিন্দাবাদ।'

—এই পোস্টার কি তুমি লিখেছ দোলাবিবি ? এভাবে গাঁ জাগাতে চাইলে আমরা তো পারব না। মাহেফরাসরা আমার কাছে গেটের ছুড়াং চাইবে খেপে খেপে, তাদের তুমি উসকাচ্ছ, এই অশান্তি ক্যানে করবা !

বলতে বলতে স্বামীর মুখের দিকে নিরীক্ষণ করেন ব্যথা। তারপর জিজ্ঞাসু চোখে আয়েষার দিকে দৃষ্টি সম্পাত করেন।

—বউ কি বলবে ওই সব কথা ! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছি, মাটির পানি, তুমি কেন নদীর পানির হাঙ্গামার কথা তুলছ ব্যথা ! বলে উঠলেন আয়েষা।

—কী বলবে বউ তোমাকে ! ফের প্রশ্ন করেন আয়েষা চৌধুরী।

—তাহলে রাহুল এই কথার জবাব দিয়ে যাক। মন্তব্যটি বাঁকা হয়ে ওঠে ব্যথার

গলায়। তিনি নিজেরই কথার রেশ ধরে বলেন—রাহুল ওই জিনিস সেঁটেছে! ভাল হচ্ছে না আয়েষাবুবু! আমার সঙ্গে পাল্লা ধরতে আসে তোমার ছেলে! লোক খ্যাপায়। কিসের এত দেমাক! কারবালার হাসান হোসেনের মত তোমাকে আমি জহ্‌রে কহ্‌রে মারতে পারি চৌধুরীর বিবি, তুমি তা জানো? বউ ছেলে নিয়ে পলিটিক্‌স করবা এই তোমার দিগদারী! স্বামীকে জেল খাটাচ্ছ, তবু তোমার খায়েশ মরে না, এত তেজ!

—এসব তুমি কী বলছ ব্যথা! বলতে গিয়ে সমস্ত দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে আয়েষার। তিনি ঘরের থামটির গায়ে গা এলিয়ে চোখের জল দমাবার চেষ্টা করেন।

চন্দ্রিমা বলল—রাহুলকে এই সব ঘটনার মধ্যে খামোখা টানবেন না ব্যথাখালা! আমিই প্রণামপুরের মানুষকে ওই পোস্টার লিখতে বলেছি। হ্যাঁ বলেছি! রাহুল গোরাবাজার মেস থেকে এসে ওসব কথা লেখাবার ফুরসত পাবে কোথা! আপনি একবার মণিকে দোষ দিচ্ছেন, একবার রাহুলকে টানছেন। বলে রাখি, গরিব মুসলমান জেলেদেরও নিজের মগজ আছে মাসি ...

—তুমি ডাক্তারি করতে পাবে না চন্দ্রিমা মুখুজ্যে! থামো!

ধমক দিয়ে উঠলেন ব্যথা তরফদার। চন্দ্রিমাকে আর কথাই বলতে দিতে চান না তিনি। যেন তাঁর গায়ে কেউ বিছুটি মারছে, এতই অসহিষ্ণু দেখায় তাঁকে।

—ঘরের বউ হয়ে তুমি কথা বলতে শিখোনি! সাদা চৌধুরীর বউমায়ের এই হল চরিত্র! চাহিলে পানি, অথচ গলায় নম্রতা নাই। পানি চাহিতে জানো না, পানি! বলতে বলতে ব্যথার চোখ কঠিন হয়। সামান্য পাকিয়ে ওঠে। সেই চক্ষু দেখে চন্দ্রিমা বিষম আশ্চর্য আর ব্যথিত হয়ে ওঠে।

—আহা! দাঁড়াও। ওইভাবে তিরস্কার করবা না ব্যথা! তোমার বহিন তোমার কাছে ফসলের কারণে পানি যাচ্‌না করেছে, পর তো নয়। জ্ঞাতি বিবাদ করবা ক্যানে! বউমা ছেলে মানুষ, পোস্টার লিখেছে, ওসব ওর শহরের অভ্যাস। বেচারি বুঝতেই পারছে না, ওই ধারা লিখলে গান্ধীভক্ত শ্বশুরের মান থাকে না। মা! বলেই নাটা জলভেজা নখ থেকে নিজের যেন সহৃদয় চক্ষুদুটি চন্দ্রিমার মুখে মেলে ধরেন। তারপর মিষ্টি করে নিঃশব্দে হাসতে থাকেন।

—আসো মা! আমরা দুইজনে একটা জ্ঞাতিবুদ্ধি দিয়ে ঘটনা মিটিয়ে ফেলি। যত পানি লাগবে দিব। তুমি আর শ্বশুরকে ভাঙিয়ে পলিটিকস ক'রো না। বাবু হলেন আমার লোক। আমার কৌমের বান্দা। তেনার মুখ রক্ষা আমার কাজ। পানি দিব।

আয়েষার চোখ দু'টি অধিক তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। সেই চোখে চোখ রেখে নাটা দাড়ি চুঁচে বলেন—শর্ত কিছু না। জ্ঞাতিবুদ্ধির পরিচয়। বউমা ওষুধের বাক্‌স নিয়ে আমার বৈঠকে কাল থেকে বসবে। মাহেফরাসের সেবা আমিও করতে চাই। গেটের চাবি তোমার আঁচলে থাকবে বউমা! আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমার কাঁধে বন্দুক থাকত বটে। কিন্তু আমি সেটা চালাতে পারি না। চা পাখি! বুঝলে! তার বেশি নয় গো জননী। সেটাও বাবুই মেরেছে। কিন্তু বন্দুক আমার চাই। রাতে আমার ঘুম হয় না। সেই ব্যবস্থাও তোমাকেই করতে হবে!

—আমাকে!

—হ্যাঁ দোলন! পুলিস বলে গিয়েছে, বন্দুক ওই চৌধুরী বাড়িতেই আছে। সন্ধ্যার ঘোরে বারবার মনে হল, ছিনতাই পার্টির মধ্যে মণি। বুঝলে আয়েষা! কাশিমবাজারের পথের ওপর মণির ছায়া। যতবার মনে করি মণি কেন হবে; ততবারই মনে হয়, মণি,

মণি, মণি ! বন্দুক আমার শখের জিনিস, আমার নিদ্রা নাই। আমার অম্বল-ব্যাধি। ওষুদ দিবা, নিঁদ্ দিবা আমাকে। ইসলাম মানে জানো বউমা ? জানো না ? শুধালেন নাটা।

চন্দ্রিমা বলল—জানি। শান্তি।

—হ্যাঁ, বউমা ! তোর জ্ঞাতিজ্ঞান দরকার। তুমি আর হিন্দু নও। শান্তিই তোমার ধর্ম। তুমি কাল থেকেই আসবে। ও রে কে আছিস ! হজরত ! বাবুর জমিনে পানি দিগা যা। ওষুদের বাক্স নিয়ে আসবি। পানি দিবি, বাক্স আনবি। শর্ত কিছু না। জ্ঞাতিজ্ঞান ! মুসলমানের বেরাদরি তোমাকে বুঝতে হবে দোলা !

—নাহ্ ! কঠিন আর্তস্বর মথিত হয় চন্দ্রিমার গলায়।

—গান্ধীবাদ আর ইসলাম একই জিনিস বউমা। আঘাত করব না। হিসাবটা সহজ খুব। তুমি হিন্দু নও গান্ধীর বিচারে, বুঝলে। দেশাচার যাই হোক। নামাজ পড় ?

—না।

—পূজা দাও ?

—না।

—তাহলে পোস্টার কেন দোলা ?

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না তরফদার সাহেব !

—বুঝবা। ক্রমে ক্রমে।

আয়েষা অসহায় সুরে বলে উঠলেন—চন্দ্রিমা ! তুমি রাজী হও। আমার দেহ আলগা হয়ে যাচ্ছে বউ ! কেমন করছে ভেতরটা !

—মা !

চূড়ান্ত বিস্ময়, অনন্ত এক বধির-বিস্ময়, এক তুমুল বেগবান বিস্ময়, অসীম তীব্র যন্ত্রণা। এক লহমায় চন্দ্রিমাকে কুঁকড়ে দেয়। সে ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলে—ইসলাম কী বস্তু জানি না বটে, শুনেছি শান্তির ধর্ম। গান্ধীবাদ কী বস্তু, তা-ও জানি না হয়ত, তবে অহিংসার প্রয়োগ দেখেছি ক'দিন আগে। মণির হাতে, বেচারি বন্দুক ছিনতাই করেছে সন্দেহে, কসমকিরা করাবার জন্য কীই না করলেন, মারলেন পর্যন্ত ! মাসিমা, কোরান তুলে দিয়ে ধর্মের অহিংসার পরিচয় তো দিয়েছেন ! গান্ধী, মুহম্মদ, বুদ্ধ এই গাঁয়ে এসে সকলকে একাধারে দেখতে পেলাম। আপনাকে বলি, মহৎ মানুষদের এমন দুর্গতি দেখে মনে হচ্ছে, এই দেশটা সত্যিই তবে কী ?

—কী মা ! তুই বল ! আমি নন্-ম্যাট্রিক লোক !

—না, জানি না !

—ধর্ম তাহলে মানো না ? এই জন্যেই বুলবনের কাছে বিয়ের সার্টিফিকেট দেখতে চেয়েছি আমরা। দোষ তো নাই !

—ও। আচ্ছা ! ঠিক আছে ! বুকের ছাতি ফেটে মরে গেলেও জল আমি চাইব না তবে। না চাইব না। আপনাদের মত ধার্মিকের কাছে জল চাইলে পাপ হয়। ধানের জন্যই হোক আর প্রাণের জন্যই হোক—অত হিসাবের জল নিতে আমি রাজী নই। বলে ঘাড় নীচু করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চলে আসে চন্দ্রিমা।

থামের গোড়ায় নিথর হয়ে বোকার মত বসে রইলেন আয়েষা মিনিট দুই। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। শানবাঁধানো বারান্দা ছেড়ে পৈঠা দিয়ে উঠোনে নামলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দেহে আর কোনও বল অবশিষ্ট নেই। দেহের প্রতিটি গ্রন্থি আলগা হয়ে পরস্পরের সংবদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। মুখের চামড়ায় তাঁর মৃদু

ধরনের ঘাম জমে উঠেছিল।

সামনে এগিয়ে এসে ব্যথা দু'টি হাত আয়েষার দিকে বাড়িয়ে বললেন—তাহলে বউমাকে কাল থেকে পাঠিয়ে দাও। আর খুঁজে দেখো, বাড়ির আনাচে কানাচে কোথাও বন্দুক পাও কিনা! পেলে চুপচাপ আমাকে রাতে এসে দিয়ে যেও, আমি সমস্ত চেপে যাব! পুলিস ডাকব না। একটা কথা তোমাকেও বলি, বউকেও বলেছি, মণি যদি নাই ছিনতাই করে...

আয়েষা আর ব্যথার কথা শুনতে চাইলেন না। বললেন—বউমা কেন তোমার বাড়ি কিছুতেই আসতে চাইছিল না, এতক্ষণে সাফ বুঝতে পারছি ব্যথা! ছেলেবউ নিয়ে পলিটিক্স করা আমার নসীব।

অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন, তবু যখন ব্যথা ক্ষেতের জল দেবার জন্য হজরতকে সঙ্গে দিতে চাইলেন, সদরদোরে পৌঁছে পাল্লা ঠেলে সরিয়ে বাইরে এক পা বাড়িয়ে দিয়ে শান্তস্বরে রাহুলের মা বললেন—না বহিন।

—যাবে না?

—না।

বাড়ি এসে আয়েষা দেখলেন, মণি কাঠের বেলেটে বালি ঘষছে হেঁসোয়। ফুলকি উড়ছে।

—কী করবি বাপ!

—জবাই করব মা!

—না খোকা! অমনটি করিস না। কাকে জবাই করবি!

—কদমকে। ওই ব্যাটা স্যালো চুরি করেছে।

—তুই কি দেখেছিস!

—না। ও জিনিস দেখতে হয় না! চোরকে বোঝা যায়। শশাঙ্ক চুরি করিয়েছে।

বুলবন মণির কাছে এগিয়ে এসে হাত থেকে হেঁসো কেড়ে নিয়ে বলল—গরিবকে মারবার আগে ভেবে দেখতে হয় বোকা! মাথা ঠাণ্ডা রাখো! আমি আগে কদমকে জিজ্ঞাসা করি।

—চোর তোমাকে সত্য কথা বলবে? মণির একথার পৃষ্ঠে আয়েষা হঠাৎ বলে উঠলেন—তুই আমাকে একটা সত্য কথা বলবি মণি!

মায়ের শুধু এইটুকু উচ্চারণেই মণি বুঝতে পারল মা তার কাছে কোন্ সত্য জানতে চাইছেন। আবার সেই প্রশ্ন। সত্য বললেও এরা সত্য বিশ্বাস করেন না। কোরান হাতে চড়িয়ে দেন যাঁরা, মা-ও যেন তাঁদেরই দলে। অভিমানে, ক্রোধে, ঘৃণায় এবং আশ্চর্য অসহায়তায় মাথা নীচু করে মণি সেখান থেকে সরে চলে যায়।

রাত্রে জ্যোৎস্নায় অবিরল এক তৃষ্ণা জেগে ওঠে মণির। থোড়ের তৃষ্ণাব্যাপৃত ক্ষুধা তাকে ঝুপড়িতে ঘুমাতে দেয় না। হুকুম শুয়ে থাকে, কিন্তু সে নেমে আসে মাঠের মধ্যে। একটি থোড়কে স্পর্শ করে নেতিয়ে পড়া ধানগাছটির দিকে অপলক চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে তার জ্যোৎস্না কলকল করে নদীর বন্যার মত ডেকে ওঠে।

—সম্রাট নাদির শাহ্! তুমি কতবার এই স্বর্ণভূষিতা শস্য-শ্যামলা নদী-অলংকৃতা, বৃক্ষ-শোভিতা ভারত মাকে লুঠ করে নিয়ে যাবে, কতবার লাঞ্ছিতা করবে তাকে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে দিল্লির রাজপথে! আমরা কি মানুষ নই, দেশবাসী কি মানুষ নয়, মায়ের সন্তান কি মানুষ নয় সম্রাট! কে বলেছে তুমি সমাট! তুমি তো হীনমতি এক কুৎসিত

তস্কর ! অশ্বের পদঘাতে বালিঝড় উড়িয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করে বারবার তুমি হানা দাও এই সোনার দেশ, স্বর্নমন্দির, সবুজ শস্যক্ষেত, তোমার সৈন্যরা পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে গগনভেদী উল্লাসে, তোমার অসির ঝলকানিতে, অশ্বের হ্রেষায় আমরা অন্ধ আর বধির হয়ে যাই। না। না। না। তোমার পদাঘাত আর সইবে না ভারতবর্ষ ! না, না, না !

মণি শুধু না না না করে উঠে সশব্দে কেঁদে ওঠে একা। তার গাল গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। সে যাত্রার ঝলসিত আলো, তীব্র কনসার্ট, নর্তকীর নিক্কণ শুনতে পায়। শশাঙ্কর হাম্বার সাইকেলের রিমের তির্যক ধারালো আলো পথের উপর ঝলমল করছে, দৃশ্যটি কল্পনা করতে পারে। চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। তারপর সহ্য করতে না পেরে পাশের ভুঁই পেরিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করে নগেন বৈরাগীর ক্ষেতে রাসায়নিক সার পড়েছে, এগুলি ডাঙাল জমি, সার চলে। সারের দাম আছে। ক্ষেতে জলভর্তি। তরফদারের স্যালো থেকে জল টেনেছে পালি দিয়ে। বিড়ি বাঁধে বৈরাগী। তার মাত্র এই দুই বিঘা জমি। ঠিক তার পাশেই তরফদারের ন'বিঘার দাগ। সেখানে জলের থইথই করা দৃশ্য, গলা অবধি ধানের খাবার। আর সইতে পারে না মণি। না, না, না ! যাত্রার কণ্ঠে হেঁকে উঠে সে পায়ের ধাক্কায় পালির বাঁধ কেটে দেয় নগেনের জমির ! তরফদারের জল নগেনের মারফত নেমে আসে মণির তৃষ্ণার্ত থোড়ের গোড়ায়। জল এবং সারজল নেমে আসে। পাগলের মত মণি অট্টহাস করতে থাকে জমির উপর দাঁড়িয়ে এবং কদমের বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে হঠাৎ।

॥২৪॥

নাতাশা বলেছিল, তাদের ভূগোলের স্যার ডানহাতে ঘড়ি বাঁধেন। বাঁ হাতে কলম ধরেন। ব্ল্যাকবোর্ডে ম্যাপ আঁকার সময় ডান হাতে ডাস্টার, বাঁ হাতে চক-পেনসিল এবং ডাস্টার টেবিলে রেখে ডান হাতেই তুলে নেন কাঠের চাঁদোয়া। ঘড়ির ডায়াল চকচক করে।

মণি বাঁহাতী। তাই সে দাদার ঘড়িটা ডান হাতে বেঁধেছে। দাদার এই ঘড়ি তার শাশুড়ির উপহার। এই ঘড়িটি ছাড়া আর কোনও যৌতুক নেই। ফলে ঘড়িটার উপর দাদা-বউদির মায়া আছে। সেই বিয়ের যখন এতই হেনস্থা, তখন মায়া যে বিষম হবে, মণি নিজ বুদ্ধিতে বুঝতে পারে। দাদা তবু মণিকে সেই ঘড়ি ব্যবহার করতে দেন, বিশেষ এ রাত্রির মাঠে, সে-ও বড় তাজ্জব। দাদা জানে, মণি ডান হাতে ঘড়ি বাঁধতে পেলে খুশি হয়।

জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। ঘড়ির ভিতরে সবুজ আলো, জোনাকির আলোর রঙ। পাগল মণির হঠাৎ মনে হয়, ১২টা জোনাকি জ্বলছে, নিবছে না। ১২টি ঘণ্টার ঘর। এবং মিনিট আর ঘণ্টার কাঁটা যেন তাদেরই রঙিন ডানা ; ঘড়িটা মণিকে নিয়ে কোথায় যেন উড়ে চলেছে। অবশ্য এই সংসার ছেড়ে কোথাও উড়ে পালাতে পারলে ভাল হয়। কোথায় পালাবে মণি।

কদমের বাড়ির পেঁপেতলায় আবার এসেছে সে। আবার এক অদ্ভুত রাত্রির নীচে তার আসা। ঘড়িটা খুলে জামার পকেটে রাখে। কদমকে সে মারবে নির্ঘাৎ। মেরেই ফেলবে। নাতাশা তাকে বলেছে ঘটনাটি। বাপুকে থানার সামনে সেলে ভরে সেই

বকশিসের টাকায় কদম সদরঘাটে দুপুর রাতে রাহুলকে ভাত খেতে ডেকেছিল। 'আসো দাদা দু'মুঠা খাই !'

সেই কুপিটা জ্বলছে এখন। কালির গলগল করা শিখা নড়ছে। দেওয়ালে মানুষের ছায়া। তাহলে কি শশাঙ্কমোহন হাওয়ার কাছে আবার এসেছে ? ভালই হল, আসল লোকটিকেই আজ হাতের নাগালে পেয়েছে মণি। ছায়াটা প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত নারীর বুকের উপর খাড়া হয়েছে, হায়নার আদল। লম্বা হয়ে তলের ছায়াটিতে নামছে। সেই সুখানুভূতির কাতরতা ; দেহমিলনের তাপ। সেই মাদকতা, সেই আঠালো স্বর, হু হু করা দীর্ণ আবেগ, যেভাবে মাংস ভক্ষণ করে পশুর আর্দ্র জিহ্বা। কদম স্যালো মেশিনের পাইপ-পার্টস, 'গঙ্গা'র নাট-বল্টু, যন্ত্রাংশ চুরি করে বেচে সেই পয়সায় চাল-সওদা, নুনতেল কিনে এনে আয়েস করে খেয়ে এখন বউয়ের সঙ্গে কঠিন আমোদ করছে।

শশাঙ্কমোহন নয়। শীর্ণ ছায়া দেখে বোঝা যাচ্ছে চোর লোকটা মানুষের আদি আর আদ্য কাজে লিপ্ত। অন্যের সমূহ সর্বনাশ করেও এরা বউয়ের সঙ্গে এই রকম মাতে, কোনও দুঃখ হয় না, চিন্তা হয় না। চৌধুরী পরিবারের সারা বছরের অন্ন মেরে চারদিনের অন্ন জোগাড় করেছে কদম। তা যে কী আনন্দের, তা ওই আবেগঘন যৌন-প্রমত্ততায় হাওয়ার সুখের বোজাস্বরে উচ্চকিত। মণির মনে হল, সে এখন পশুরই মতন লোকটাকে আক্রমণ করে এই মুহূর্তে।

—ইমান আমাকে কব্বর থেকি ড্যাকে ইমানের বাপ ! রুহু কান্দে গো !

—চুপ যা মাগী, চুপ যা। সুখ লিতে দে হক্কের বউ। তোকে আমি ছিঁড়ে ফেলব !

—আহ্, মরণ !

মণির বুকের মধ্যে সহসা কেমন কষ্ট বাজতে থাকে। মানুষকে তার কেমন ভয়ংকর আর দুঃখী মনে হয়। রোঁয়া-ওঠা শকুনের মত কদমকে অভিশপ্ত মনে হয়। কেন হয়, সে বলতে পারবে না, বোঝাতে পারবে না। তার শরীর কেমন হিম হয়ে আসছে। ঘড়িটা সে পকেট থেকে বার করে ডান হাতে বাঁধে। ঘড়ির কাঁটার সবুজ ডানা দু'টি উড়ছে।

অন্যকে বিরান বা বিনাশ করে ভোগ করতে মানুষের আটকায় না ; চোর সে, অভাবী সে, তার কেন আটকাবে ; বকশিসের টাকায় ভাত খেতে ডাকা যদি আশ্চর্যের না হয়, জলের কল বেচে দিয়ে সহবাস করতে আটকাবে কেন ! কিন্তু শশাঙ্ক যে হাওয়াকে ভোগ করে যায়, সেই ভোগ কথাটা কানে শুনলে মাথাটা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে মণির। বুড়োরা মাচায় বসে অনেক সময় এই রকম ভোগের গল্প করে, কার বউকে কে, কোন মোড়ল ভোগ করে পালাতে না পেরে শীতলপাটির মধ্যে গা-মুখ ঢেকে জড়িয়ে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই কেচ্ছা শুনেছে মণি। সেই গল্প শুনে মানুষ হি হি করে।

এই রকম সংসারে থাকতে মণির একদম বাসনা হয় না। কিন্তু মানুষ তাকে বারবার এই সকল দৃশ্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কদমকে তথাপি সে আক্রমণ করতে পারল না। সে কদমেরই জন্য হেঁসো শাণিয়ে রেখেছিল। এই লোকটাই বাপুকে একদিন লঘুশালি ধানের বীজ এনে দিয়েছিল গড়াবাসা থেকে। ভাবতে ভাবতে মণি রাস্তায় নেমে আসে। মানুষ কী তাজ্জব-জীব। মণি ভাবে।

তার এখন একবারটি বউদির পবিত্র মুখটা দেখতে ইচ্ছে হয়। চারাতলায় মাচায় এসে বসে থাকে মণি। ঠিক তখনই ফুলভানুকে আগের রাত্রির মতন বদনা হাতে দেখতে পায়। তার কাছে এগিয়ে আসে হুকুমের ভাবী ওরফে বউ। ওর গায়ে জামা নেই, বসন

বুক থেকে সরে গিয়েছে। মণির গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়ায় ফুলভানু। হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে মণি মাচা ছেড়ে নেমে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসে।

পিছু পিছু আসে ফুলভানু। পারুল তেলের গন্ধ বাতাসে ভারী হয়ে ভাসছে।

—রাগ করলা ?

—না।

—রাগ করলে ভাগ পাবা না।

—ভাগ আমি চাই না ফুলভানু।

—ইস্ !

—হ্যাঁ।

—রাহুলের মুতন মোকে ডাকছে ! ব্যথা কিন্তু মাঠের পানী দেয় নাই ! কী করবা ? চামেলিবুবু কাম থিক্যা ছাড়ায়ে দিত্যে চাহিলে ভাই। কুথা যাব ?

—মরে যাও।

—ইস্ ! মুই যাব না। কুণ্ঠে যাব কহ !

মণি আর কোনও উত্তর দেয় না। বউদির ঘরে এসে দুয়ারে ধাক্কা দেয়। দরজা খোলে চন্দ্রিমা।

—এত রাতে তুমি ?

—তুমি জেগে আছো বউদি ?

—হ্যাঁ।

—তোমারও ঘুম হয় না বুঝি ?

—একখানা বই পড়ছি ভাই !

—আচ্ছা !

—ঘরে এসে বসবে ? এসো !

—না। একটু হ্যারিকেনটা দিবে আমাকে !

হ্যারিকেন হাতে করে গোয়ালঘরে আসে মণি। ডাক দেয়— ফুলভান্ ! এটি বাবুর ডাক।

ফুলভানু বদনা রেখে এগিয়ে যায়।

—পোয়াল নাড়া আনো। হাতপাখা আনো। আগুন দাও। মশা। গরুর ঘুম নাই !

—এত দরদ তুমার ভাই !

—কথা কম। কাজ বেশি। বিশদফা কর্মসূচি। আগুন, পানি। বন্দুক।

—পাগল !

—হেই ! মুখ ছিঁড়ে ফেলব হক্কের বউ। চুপ যা।

—ইস্ ! আমার লাভার রে !

সাঁজালে আগুন দিয়ে ধোঁয়া লাগায় মণি। পাখার হাওয়া দেয়। চন্দ্রিমা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। মণির কাণ্ড দেখে পরম অবাক হয়। মণির ঘুম নেই বুঝতে পারে।

—কাল মিস্ত্রি লাগছে মাঠে ?

—লাগবে।

—জল উঠবে ?

—উঠবে।

—যদি না ওঠে ?

বউদির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মণি। জবাব দিতে পারল না। হাতের ঘড়িটা খুলে দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল মাঠের দিকে। চন্দ্রিমা ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে এগারোটা।

মণি ঘড়িটা হাতে রাখতে পারল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, ঘড়ির কাঁটায় জোনাকির আলোর ডানা লাগানো রয়েছে। সে উড়ে চলে যাচ্ছে কোথাও। অথচ তার মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা দরকার।

ঝুপড়িতে ঢুকে হুকুমকে জাগিয়ে তুলল মণি।

—চাচা। ফুলভান্ ডাকছে তোমাকে। ঘরে যাও!

—ক্যানে ?

—যাও বলছি। আমি একা থাকব।

—আয়েষাবুবু বকবে।

—বকবে না। আমি বলছি, যাও তুমি।

অগত্যা হুকুম বাড়ি ফিরে গেল। মণির মনে হচ্ছিল, কদমের মত হুকুমেরও বউ আছে। যদি ফুলভানুর কাছে অন্য পুরুষ আসে! একদিন রাতে সে শরমের সঙ্গে বউটাকে কথা বলতে দেখেছে মাচার ওখানে চারাতলায়। এ রাত্রি ভয়ংকর, শকুনের ডানায় এই রাত্রির উড়ে চলা। বউদির সুন্দর মুখটা মনে করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল মণি।

সকাল দশটায় নাটার বাড়িতে মজলিস বসল। তিনশ সাতাশ টাকা জরিমানা হল মণির। সার আর জলের দাম যোগ করা হল জরিমানার সঙ্গে। মোট ৩২৭ টাকা।

হকিকৎ হেঁকে উঠল—লাইন ভেঙেছিস তুই ?

—হ্যাঁ।

—ক্যানে ?

—আমি চোর।

—আপন জুবানে কথা বলছিস মণি!

—হ্যাঁ। বলছি বইকি!

—নগেন বৈরেগীর জমিনে কেমিক্যাল পড়েছে। সারজল নামিয়ে নিলি হারামি। হারাম খেতে বাধে না চৌধুরীর ব্যাটা, তোর বাপটি না বাবুমশাই! তোর বাপ না ডাক্তার! তোর বাপ না মেলেটারি! মাস্টার!

আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছিল হকিকৎ। আয়েষার আঁচলে একশো তিরিশ টাকা ৬৫ পয়সা বাঁধা ছিল মাত্র। থাম ধরে তিনি নাটার বৈঠকী দরবারে দাঁড়িয়েছিলেন, মনে হয় তিনি আর পৃথিবীতে নেই। মুখটি কঠিন শুষ্কতায় বিপন্ন। বুলবনকে কাছে ডেকে আঁচল খুলে দিয়ে বললেন— আমার কাছে আর একপাই অতিরিক্ত নেই খোকা! এ দিয়ে তো হবে না!

বুলবন একশো তিরিশ টাকা হাতে নিয়ে বাঁ কব্জির ঘড়িটা খুলে হকিকতের দিকে এগিয়ে ধরে বলল— ভাইটাকে আমার মারধোর ক'রো না হকিকৎ। ঘড়িটা বিশেষ দামী। এইটা বিক্রি করে জরিমানার টাকা শোধ নিও, সঙ্গে একশো তিরিশ টাকা দিলাম, ঘড়িটা নিশ্চয় দু'শো টাকা হবে।

বলেই বুলবন মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চন্দ্রিমার চোখের দিকে চাইল।

নাটা বললেন— পানি তো আমি দিতেই চেয়েছিলাম বাপ। বৈরেগী গরিব লোক। আমার পানি টানতে গিয়ে তারও সারজল চলে গেল তোমার জমিতে। না হলে জরিমানা করতাম না। ঠিক আছে, দুই বিঘত নাকখৎ দে মণি, লোকে দেখবে।

মর্মান্তিক একটি দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে হবে এখন। জেলের ভিতরে বাপকে পীড়ন করছে রাষ্ট্রযন্ত্র, বাইরে সন্তানকে পীড়ন করছে দেশ-গাঁ, সমাজ, জোতদার, ধর্ম এবং অদ্ভুত নীতিবান মানুষ। জরিমানাই কি যথেষ্ট ছিল না! নাটার হুকুম শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিল বুলবন। আয়েষা মুখের মধ্যে আঁচল পুরে কান্না দমন করছিলেন। চন্দ্রিমা দেখল, মাটির উপর কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে দিলেন ললিতমোহন, শরম খ্যা খ্যা করে অমানুষিক স্বরে হেসে উঠল।

মাহেফরাসদের ন্যায্য দাবির মিটিঙে ললিত আসেন না, কিন্তু মণির বেলা সবার আগে এসে উপস্থিত হন। তিনিই দীর্ঘ একটা দাগ টানলেন, দু' বিঘত নয়, পঞ্চাশ বিঘত নাকখৎ দিতে হবে মণিকে।

মণি বলল— পারব না। আর মার খেতে পারব না।

শশাঙ্ক ভিড়ের ভিতর থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ছুটে এল। তারপর ঠাণ্ডাস্বরে বলল— তোকে কেউ মারেনি। নাকখৎ দে শালা! পরের পানিতে পোদ্দারি করবি! তোর বউদি পরের পানিতে পলিটিক্‌স করবে! একবার যাস গেটের কাছে! নে। নাকখৎ দিয়ে উঠে যা।

বলেই মণির পিঠে একটা সবল কিল মারল শশাঙ্ক। ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে মণিকে নোয়াতে চাইল। মণি দু'হাত মাটিতে রেখে ঝুঁকে নামল।

চন্দ্রিমা আর সহ্য করতে না পেরে বলল— তরফদার সাহেব। আপনার সঙ্গে বাবুর খুব বন্ধুত্ব শুনেছিলাম। আপনার ওষুধ দিয়ে বাবু চিকিৎসা করতেন। আমি রাজী। আমি আসব আপনার বৈঠকে। মণিকে ছেড়ে দিন।

বুলবন সহসা এবার আশ্চর্য উষ্ণস্বরে বলল— না। তুমি আসবে না। কিছুতেই আসবে না। মণি যদি চোখের সামনে মরে যায়, যাক। এই গ্রাম তুমি দ্যাখনি চন্দ্রিমা। কথা ব'ল না!

কান পেতে এই কথা শোনার পর মণি মাটিতে নাসিকা স্পর্শ করেছে মাত্র, এমন সময় দূরে পথের উপর আকাশভিন্ন করা তীব্র বেগবান চূড়ান্ত কম্পিত স্বর উদ্গীরণ ঘটায়— ইনকেলাব জিন্দাবাদ। সাদা চৌধুরী জিন্দাবাদ।

মণি কিন্তু নাকখৎ দিতে শুরু করে। নাকখৎ দিতে দিতে সে নগেন বৈরাগীর পায়ের তলা অবধি চলে গিয়ে নগেনের হাঁটু জড়িয়ে ধরে দুহাতে— আমাকে মাফ করে দাও বৈরাগী দাদা। আমি তোমার হক মেরেছি।

অত্যন্ত দীর্ঘ এক মিছিল দেখা যায়। এ গ্রাম কখনও এত সুদীর্ঘ উত্তাল মিছিল দেখেনি। প্রত্যেকে নিরস্ত্র বটে, কিন্তু তাদের আর্তনাদ ভয়াবহ। হঠাৎ দেখা যায় চিৎপুরের সভাস্থ লোকেরা ঊর্ধ্বে হাত তুলে সেই স্লোগানে সাড়া দিয়ে উঠল। ললিত অত্যন্ত বিমূঢ় হয়ে পড়ে। নাটা তরফদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন।

আমানির মৃত্যুর জবাব চাই। জবাব দাও। প্রদীপ ডাক্তারের বদলি চাই। ললিতের বন্দুক বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ইত্যাকার স্লোগানে আকাশ মথিত হতে থাকে। তারপর মিছিল ঘিরে ধরে সভাকে। গেটের চাবি ফেলে দাও। মাহেফরাস জিন্দাবাদ। ব্যথার ব্যথা বুঝবে কে? ললিতমোহন আবার কে? মুহুর্মুহু স্লোগান তাপিত বাতাস পাকিয়ে

পাকিয়ে উঠে নাটার পায়রার টঙ স্পর্শ করে ক্রমান্বয়ে। পায়রা ডানা ঝটপটিয়ে মণির হৃদয়ে আঘাত করতে থাকে। মণি বুঝতে পারে, এ তার অনুভব মাত্র যে, এই মিছিল রাহুল দাদার কাজ। খুবই বিস্ময়কর দেখায় একটি প্রায় গোপন ছবি। কী এক আনন্দে নগেন বৈরাগী এক হাত ঊর্ধ্বে তুলে স্বল্পস্ফুট স্বরে 'জিন্দাবাদ' বলে হাত নামিয়ে নিল ভয়ে। বোকার মত নাটার দাড়ির দিকে চেয়ে রইল।

ললিতমোহন পাগলের মতন করলেন। চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে হেঁকে উঠলেন— স্লোগান থামাও ! আমি কনভেনার বলছি। বন্ধ কর। এ অন্যায়। এই দেশ স্লোগানের নয়। মিছিলের নয়। মিটিঙের নয়। মিছিল, মিটিঙ, স্লোগান বে-আইনী। দাবি আছে, থাকবে। এখন এই সব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে থানা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য। চলে যাও। ফিরে যাও। পানি নিয়ে পলিটিকস চলবে না। আমি শান্তি বহাল রাখার পক্ষে। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। এমারজেন্সি মানে শান্তি। শন্তি, শান্তি, শান্তি !

বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে নামলেন ললিতমোহন। শরমকে ডাকলেন ইশারায়। মোটর বাইকের দিকে এগিয়ে গেলেন। উত্তাল জনতা কিছুতেই স্থান ত্যাগ করছে না দেখে বাইকে স্টার্ট দিলেন ললিত। থানার দিকে ছুটে চলল মোটরসাইকেল। ললিত যে ভয় পেয়েছেন তা তাঁর বক্তৃতার সুরেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চাবি কিছুতেই ছাড়লেন না ব্যথা তরফদার। থানা থেকে পুলিস আসছে শুনে মিছিল ফিরে গেল। পুলিস এসে দাঁড়িয়ে থেকে গেটের পাল্লা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে গেল।

ঠিক দু'দিন বাদে মগরিব নামাজের সময় সন্ধ্যাবর্তী সুন্দর আঁধারে চারজন লোক এসে ঢুকল তরফদারের বাড়িতে। কালো রেশমি রুমালে মুখ ঢাকা, চোখ দুটি খোলা, পরনে লুঙ্গি, মাথায় পাগড়ি, গায়ে চকরাবকরা শার্ট। নামাজে বসেছিলেন ব্যথা তরফদার। বাড়িতে কোনও পুরুষ ছিল না। নাটা গিয়েছিলেন মসজিদে নামাজ পড়তে। বউরা ভয় পেয়ে গেল। নামাজ থেকে ধমক দিয়ে ব্যথাকে খাড়া করে তুলল ওরা, হাতে ওদের ধারালো অস্ত্র। গায়ের চাদরের তলে গোপন করে এনেছিল তারা।

বাধ্য হয়ে ব্যথা চাবি এবং অন্যান্য গেটখোলার যন্ত্র এগিয়ে দিলেন, তাঁর কথা বলার সাহস ছিল না।

আরও দু'দিন বাদে গেটের পাল্লা নামিয়ে দেওয়ার জন্য মাহেফরাসদের একটি ছোট দল এল গভীর রাতে। ওরা যখন জলগেটে কাজ করছিল, বাঁধের উপর পাহারায় ছিল গোকুলদানা গ্রামের প্রহরী লক্ষণ দাস। তার উপর কড়া নির্দেশ ছিল, গেটের ওখানে লোক দেখা মাত্র শশাঙ্ককে যেন খবর দেওয়া হয়। লক্ষণ বাঁধের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ললিতের বাড়ির দিকে, পিছন থেকে আক্রান্ত হল সে। তাকে কুপিয়ে কেটে ফেলল সহিংস ভীত মাহেফরাস লোকগুলি। তার কোপানো দেহ বেগবান স্রোতের মধ্যে ফেলে দিল তারা। স্রোতের বিপুল গর্জনে লক্ষণের আর্তনাদ মিলিয়ে গেল।

এই ঘটনা ঘটল পাঁচ মিনিট আগে, হঠাৎ তারপর মোটর-বাইক গর্জে উঠল বাঁধ-পথে, শশাঙ্ক এসে দাঁড়াল বাইকের সিধা আলোর জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে। তার হাতে এই রাতে কোনও অস্ত্র ছিল না। একটা আসমান বিদীর্ণ হয়দরি হাঁকের মতন তীব্র জিঘাংসামাখা স্বর উত্থিত করল শশাঙ্ক, বিশ্বযুদ্ধের একটি কামান যেন তার কণ্ঠে ফেটে গেল। আলো আর আর্তনাদ সন্ত্রস্ত করল মাহেফরাসদের। তারা সম্পূর্ণ গেট বন্ধ করতে পারল না। একটা চাপা মিহি স্রোত উছলে পড়তে থাকল তখনও। ওরা ডোঙা ভাসিয়ে দিল জলে।

কবি বলল— এ তুমি কী করলে সুধাদাদা, কী করলে মার্জার ! লক্ষণকে মারলে কেন ? সমস্ত ভুল হয়ে গেল !

—চুপ ! কথা বলো না ! হরবোলার স্বর বিলের জলে সাদা জ্যোৎস্নায় সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মতন মিলিয়ে গেল নিরেট স্তব্ধতার মধ্যে। একটা বক ডেকে উঠল, শাদা জ্যোৎস্নার মাদক হিংসার সন্ত্রাসে।

লক্ষণের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ নদী বহন করে আনল সদরঘাটের ব্রিজের তলায়, যেখানে নদী তার কিনারা ধসিয়ে ফেলেছে স্রোতের ঘায়ে এবং অনেকটা স্থান জুড়ে একটা জলের ঘের রচনা করেছে। এটি হয়েছে জেলেদের নৌকা বাঁধবার ঘাট এবং স্নান করবার জায়গা। এখানে এসে লাগল লক্ষণের দেহ। দেহ আর নড়ে না।

এইরকম জলের ঘের নদীর বাঁকে বাঁকে অনেক আছে। তাছাড়া রয়েছে বিশাল জলঘূর্ণির গোত্তা। লাশ সেই সব পেরিয়ে এসেছে। ফলে মৃতদেহ সহজে আসেনি। প্রশ্ন হতে পারে, মৃতদেহ তাহলে কীভাবে আসে ! নদীর বুকে থাকে রহস্যের কাহিনী। গুমানির আছে গুমখুনের ইতিহাস। নদী মানেই শুধু পলিজল মাখানো উর্বর সবুজ অববাহিকার বৃত্তান্ত নয়, বন্যার বিধ্বংসী হাহাকার নয়। নদী মানে শুধু রুপালি শস্যের ঝিকিমিকি নয়। মধ্য বা আদি সভ্যতার হিংস্র জলরাশি রহস্যঘন হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী বহন করে যুগে যুগে। নদীর বিচার নাই, নদী বড়ই নির্বিচার থাকে। কাকে সে বহন করছে হিসাব করে না।

এই কি তবে উত্তর যে, নদী নির্বিচারে লক্ষণকে বয়ে নিয়ে এল ! ঘের এবং গোত্তা তাকে কি আটকায়নি ? যখন একটি মরদেহ আটকে পড়ে তখন কী হয় ? মানুষ লাশটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। পুরুষদেহ জলে উপুড় হয়ে থাকে। তার মুখ চেনা যায় না। নদী কখনও তাকে চিৎ করে দেবে না। রাখাল বাগাল লগি দিয়ে ধাক্কা দেবে ঘেরঘাটের কাছে, ধাক্কায় ধাক্কায় জলের মূল স্রোতে ঠেলে দেবে, এভাবে লক্ষণ দাস একটি ঘের এবং ঘূর্ণি ছেড়ে আর একটি ঘাটের দিকে এগিয়ে যাবে। যেতে যেতে লাশটি ফুলেফেঁপে বিকৃত হবে, তাকে আর চেনা যাবে না। সদরঘাটে লক্ষণ যখন পৌঁছাল, কেউ তাকে আর চিনতে পারল না। শুধু জলগেটের প্রহরী হঠাৎ উধাও হয়ে গেল।

শশাঙ্কমোহন হয়দরি চিৎকার করেছিল কেন নিজেও ঠিক মতন বুঝতে পারেনি। সে একটা 'ঝুপ্' শব্দ শোনে। জলোচ্ছ্বাসের শব্দে সেই 'ঝুপ্' শব্দটি মিশে যায়। গভীর এক সন্দেহে শশাঙ্ক আকাশভেদী আর্তনাদ করে ওঠে, বাঁধপথে লক্ষণ নেই দেখতে পায় চাঁদের আলোয়। মনে হতেই পারে অধিকাংশ মৃত্যুই পাখির পালকের মত হালকা, তার কোনওই ভার নেই। কেননা নদী তাকে বহন করেছে।

থানার পুলিস এসে জলঘেরটির চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। বাজারের লোকজন সেখানে জড়ো হয়েছিল। ললিতমোহনও সেখানে ছিলেন। ছিলেন তারক গাঙ্গুলি এবং প্রদীপ ডাক্তার। ছিলেন হিফাজত। নাটার ছেলেরা ছিল। চন্দ্রিমা এবং বুলবন উপস্থিত হয়েছিল পার্টি অফিসের ছাদের উপর থেকে নেমে এসে। শরৎ জন্মশতবর্ষের উৎসব পালন কমিটির সদস্যদের সভা বসেছিল ছাদে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ ছিলেন সেই সভায়। তাঁরা ছুটে এসেছিলেন ঘাটে। ঘাটে তিমিরবরণও এসেছিল। কেউ একবার অনুচ্চস্বরেও লক্ষণের নাম করল না। পুলিস লগির ধাক্কা দিয়ে মৃত লক্ষণ দাসকে স্রোতে ঠেলে দিয়ে ফিরে চলে গেল।

নদীর বুকে অজস্র 'ঝুপ্' শব্দ হয়, লক্ষণের মৃত্যু তেমনই একটি 'ঝুপ্' শব্দ মাত্র ছিল।

অতঃপর দুইজন সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন হয় জলগেটের বাঁধের উপর কদমতলায়। বিলের জল ধীরগতিতে নদীতে নামছে, একদিন এভাবেই জল শুকিয়ে কালো মাটি জেগে উঠবে। থানা সেই ভরসায় থাকে এবং মনে করে জল নামলে প্রণামপুরে তল্লাশি চালাবে। শশাঙ্কমোহনও পুলিস প্রহরা দেখে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু নাটার উদ্বেগ কমে না। ব্যথা স্বামীকে গেটের চাবি উদ্ধারের জন্য থানার উপর চাপ দিতে নির্দেশ করেন। ললিত কী করবেন বুঝতে পারেন না।

এক রাত্রে পুলিসের উপর হামলা করে মাহেফরাসের দল। বন্দুকই ছিনতাই করে না, দুজন প্রহরী পুলিসের একজনকে ডোঙায় করে বেঁধে নিয়ে চলে যায়। সেই পুলিসটার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। জল গেটে তারপর আর কোনও প্রহরী থাকে না। জল নামতে থাকে ধীরে ধীরে।

একদিন গভীর রাত্রে চৌধুরী বাড়ির সদর দরজায় চাপা কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। চন্দ্রিমা সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে। এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে। আজকাল তালা লাগানো হয় সদর দরজায়। চাবি নিয়ে যখনই সে এগোনোর চেষ্টা করে বুলবন জেগে ওঠে। দোতলা থেকে আয়েষা নেমে আসেন।

আয়েষা বলেন— সাবধানে বড়খোকা !

বুলবন বলে— দাঁড়াও আগে দেখি প্রশ্ন ক'রে। হুট করে খুলে দিও না।

—কে ?

—আমি রাহুল।

লহমামাত্র দেরি না করে চন্দ্রিমা তালা খোলে, রাহুল ঢুকে আসে। কড়া নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রিমার ঘুম ভেঙে যাওয়া এবং এক দণ্ড বিবেচনা না করেই চাবি হাতে সদর দোরে নিশ্চিন্তে ছুটে যাওয়া দেখে মানুষের মনে হতেই পারে, রাহুল আসবে সেকথা যেন চন্দ্রিমা জানত। তার মন ক'দিন থেকে বারবার বলছিল, আসবে নিশ্চয়। এত বিপদের মধ্যেও রাহুলকে দেখে চোখে চোখ পড়া মাত্র চাপা আনন্দে চন্দ্রিমার চোখ দুটি হেসে উঠল।

আয়েষা প্রথম কথাটিই বললেন— লক্ষণ খুন হয়েছে রাহুল ! সদরঘাটে নদীর পানিতে ওর লাশ ভাসছিল দেখেও মানুষ বুঝতে পারেনি, ওটাই লক্ষণ।

—ওর মৃত্যু কেউ চায়নি মা ! বলে রাহুল মাথা নীচু করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে দেখল সিঁড়ির রেলিংয়ে সারিবাঁধা মিহি মোম বসানো, তা দেখেই মনে হল, নাতাশা এসেছে। চোখ তুলেই দেখল, ঘুম জড়ানো চোখে বোনটি উপরের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে।

সকলেই দোতলায় উঠে আসে। রাহুল নিজের খাটের কাছে এসে নূপুরকে কাদা হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে এবং ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে ছোট বোনটির মাথার কাছে বসে পড়ে। বাঁ হাতের সাহায্যে কাঁধের ব্যাগটা নামায়। পায়ের কাছে মেঝেয় ফেলে দেয়।

বুলবন দুয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল— লক্ষণের মৃত্যুর জন্য আমরা কি তোকে দায়ী করতে পারি ?

—আমাকে !

—হ্যাঁ তোকে। তোর রাজনীতিকে !

—হ্যাঁ ! পার বইকি ! তবে একটা কথা বলি, সমস্ত মানুষ তার ইচ্ছেমতন সারভাইভ

করতে পারে না বুলবন। সমস্ত মৃত্যুর কৈফিয়ৎ চাওয়া যায় না। সময়ের এবং ঘটনার এই নিষ্ঠুরতা তোমাকে মেনে নিতে হবে। লক্ষণের মৃত্যুর জন্য আমাদেরও গভীর কষ্ট আছে বউদি।

চন্দ্রিমা বলল— ও কথা এখন থাক।

বুলবন বলল— গরিব মানুষ। ফসলের হাত-তোলায় ওর জীবন বাঁচত। ও ছিল তুচ্ছ আগলদার।

রাহুল বলল— শুধু গরীবী মানুষের কোনও সংজ্ঞা হতে পারে না। সে কার স্বার্থ আগলায় দেখতে হবে। প্রত্যক্ষত সে ছিল ললিত-নাটার প্রহরী। তথাপি এ মৃত্যু আমরা চাইনি। কিন্তু উপায় ছিল না।

বুলবন এবার ক্ষীণ হেসে বলল— আমানি আর লক্ষণের মৃত্যুর তফাতটা কিসের!

রাহুল নূপুরের চুলের ভিতর থেকে আঙুল টেনে নিয়ে বলল— তিমিরবরণ এই দুটি মৃত্যুকে এক চোখে দেখতে চায় বুলবন, লোকের মধ্যে দুটি মৃত্যুকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে সে। তার বসে যাওয়া পার্টিকে চাঙ্গা করার জন্য লক্ষণের মৃত্যুকে কাজে লাগাচ্ছে, আমরা খবর পেয়েছি। এই মধ্যপন্থা ওই দলটার বরাবরের চরিত্র। কিন্তু তুমি এই প্রশ্ন তুলছ দেখে অবাক হচ্ছি।

বুলবন বলল— না। এই দুটিই গরিবের মৃত্যু। তাবলে, দুটি মৃত্যু এক নয়। ঠিক কথা। কিন্তু তোমরা মানুষের সেন্টিমেন্টস বোঝো না, বোঝার চেষ্টাও করো না। লক্ষণকে কখনও কনভিন্স করেছ? সে কোন্ শ্রেণীর লোক, কার সে স্বার্থ রক্ষা করছে, মাহেফরাসদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেকথা বোঝানোর চেষ্টা না করেই মেরে ফেললে তাকে। লক্ষণ বুঝতেই পারল না, সে কেন মরে গেল। তিমির বলবে, এই ঘটনা মর্মান্তিক। এই সুযোগ সে নেবে। আর তোমরা যে বল, আক্রমণের বর্শামুখ, সেটা তারা কোনদিকে তাক করবে তোমার জানা নেই।

—কিন্তু সোভান আলির মৃত্যু মানুষ ভুলে যায়নি। সেটাও কম মর্মান্তিক ছিল না।

—ইতিহাসে এই মৃত্যুরও জমা খরচ থাকা উচিত রাহুল! এই সমস্ত মৃত্যুর।

—ইতিহাসের পথটাই এরকম রক্তাক্ত বুলবন। ঠিক আর ভুল মৃত্যুর পরম্পরা। এ সিরিজ অফ ডেথ— রং অ্যান্ড রাইট। আমি এই রকম বুঝেছি। হ্যাঁ, চীন এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে এমনও দেখা গেছে, সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য পার্টি-কমরেডকে পার্টি-নেতৃত্ব বাধ্য হয়ে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে, কারণ সেই ওয়ার্কার শোধনবাদী হয়ে গেছে, পার্টি-বিরোধী হয়ে পড়েছে, সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়িয়েও পার্টি-নেতৃত্বের নামেই স্লোগান দিচ্ছে। কারণ সে পার্টি-আদর্শকেই সত্য বলে জেনেছিল। কিন্তু তাকে বিনাশ করা ছাড়া পার্টির উপায় নেই। এ তো আরও মর্মান্তিক। কিন্তু তাই বলে এই ঘটনার জন্য মানুষের পথচলা তো থেমে যেতে পারে না!

—যায় বইকি। ইতিহাসের চাকা পিছনের দিকেও ঘুরে যেতে পারে। ওয়াটার গেটের জলকে তুমি ব্যবহার করতে চাইছ, জলও কিন্তু তোমায় ব্যবহার করতে পারে রাহুল। লক্ষণ যে-জল পাহারা দিত, সেই জলই তাকে মেরেছে। তাই না? এখন কী করবে! বলেই বুলবন দুয়ার ছেড়ে নীচে নেমে চলে যায়।

আয়েষা বললেন— এত কঠিন পথে তুই চলে গেলি মেজখোকা!

মায়ের এই কথায় চন্দ্রিমা মনে মনে বিচলিত হলেও বাইরে তার প্রকাশ থাকে না। রাহুল বিচলিত হয়।

—তুমি তো আমায় তাড়িয়ে দিয়েছ মা ! এত কষ্ট পাও কেন ?

—মায়ের মুখের কথায় সব সময় সত্য থাকে না বাবা !

—সত্য যে কঠিন মা ! তোমার জমা খরচের খাতায় আমাকে তুমি বাজে খরচ ধরে নাও।

—না খোকা, না। পারব না। কিছুতেই পারব না ! কিসের থেকে কী হয়ে গেল, এমন কেন হল ! স্বামী-সন্তান সব আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে কেন ! বন্দুক ছিনতাই করেছে বলে কোরান হাতে দিয়ে মণিকে কবুল করিয়েছে ব্যথা। হকিকৎ মেরেছে তাকে। আমারই মেশিন মাঠ থেকে চুরি হয়ে গেল, পালি কেটে নাটার ভুঁইয়ের পানি টানলে মণি ফসল বাঁচাতে গিয়ে, জলের টানে নাকি নগেন বৈরেগীর সার নেমে এল আমার জমিতে। সেই অপরাধে মণিকে সভার সামনে নাকখৎ করালো ললিত, পঞ্চাশ বিঘত। জরিমানা করল। তুই চলে যাবার পর এত কাণ্ড ঘটে গেল রাহুল ! লক্ষণ মারা গেল ! জীবন আমার কাছে আর কী দাবী করে খোকা !

রাহুল চুপ করে থাকে, বউদির দিকে অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে।

—কথা বল, আমি যে আর পারছি না ! আয়েষা যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। তারপর বলেন— রাত্রে শুয়ে ঘুমের মধ্যে কত যে বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখি খোকা ! তুই ফিরে যা রাহুল ! মেসে ফিরে যা। না যাস, আমার কাছে থাক। তোকে যে আমি আর কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আমি কী করব !

—ধৈর্য ধরো মা ? তুমিই বলেছ, তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

—তুই থাকবি তো ?

—না, মা। আমি ভোরেই চলে যাব ! কিছু বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, পরে একদিন এসে বাকিগুলো নিয়ে যাব।

—বুঝতে পারছি, তুই আর আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চাস না। এই জন্যেই কি তোকে আমি পেটে ধরেছিলাম রাহুল ! আজ ভাবি, আমিই বা কেমন মায়ের সন্তান ! এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা খোকা রে ! গর্ভে রাখলে যন্ত্রণা, বাইরে আনলে দ্বিগুণ যাতনা খোকা ! পুরুষ তো কখনও মা হতে পারে না, তাই সে বুঝবেও না আমার কথা। সে শুধু বুঝবে, আমি তাকে চলে যেতে বলেছি !

বলতে বলতে আয়েষা অশ্রু দমাতে শাড়ির আঁচল মুখের উপর চেপে ধরেন। তারপর ঘর ছেড়ে বাইরে আসেন। দোতলার বারান্দার একপ্রান্তে সরে চলে গিয়ে আনমনা জ্যোৎস্না-নিথর আকাশের চাঁদনির দিকে চেয়ে থাকেন। স্বামীর গাওয়া একটি গান তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায় :

'উদাসী পথিক শুনেছি তোমার ব্যাকুল বাঁশির কামনা।'

এই কামনা কথাটি কাউকে বোঝানো যায় না। ব্যাকুল... অ, বাঁশির...অ,— কামনা। গানের সুরটি অ-কার অন্ত, আর ওই অকারান্তে আবেগটি কেমন কামনা-নিবিড় বেদনাকে মদির আর অসহায় করে তোলে।

প্রত্যেক রোমান্টিক নারীর জীবনে যৌবনের দিনে একজন উদাসী পথিক সেই যে নিবিড় অবোধ্য একটা বেদনাময় বাঁশি বাজিয়ে দেয়, সে আর সারাজীবন থামে না। সেই বেদনা ফুরায় না। হৃদয়ের অন্তস্থলে সে থাকে একটি প্রস্রবণের মত উদ্গত বিস্ময়ে বিহ্বল, যতদিন থাকে, জীবনটাও তাজা হয়ে থাকে। সেই বেদনার থেকেই নারীর কোলে শিশু জন্ম নেয়। রাহুলও তো সেই বেদনা থেকে জন্মেছে, তাকে স্পর্শ করলে সেই

উদাসী পথিকটিকে পাওয়া যায়, মনের পথটি মিশেছে দিগন্তে, পথিকটি সুদূরে বৃক্ষচ্ছায়ে আকাশতলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, পাশে পড়ে আছে বাঁশিটি, কিন্তু বাতাসের গায়ে সেই সুরটি তখনও মিলিয়ে যায়নি। যৌবনের অবসান আছে, বাঁশির শেষ নেই।

রাহুল খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আয়েষার তখন স্পর্শের সাধ জাগে। তিনি মিহি মোম হাতে করে রাহুলের ঘরে আসেন। এই ক্ষীণ স্নিগ্ধ আলোয় কোন পীড়া নেই। রাহুলকে জড়িয়ে, গলা জড়িয়েছে কচি দু'টি হাতে, এখন ঘুমে সেই হাত আলগাও হয়েছে, শুয়ে আছে নূপুর সুন্দরী। দাদার গায়ে পা তুলে দিয়েছে পরম আয়েসে। আয়েষা দেখলেন, এরা কারা ! তাঁরই সন্তান বুঝি বা ! হাত বাড়ালেন তিনি রাহুলের মাথার চুলের দিকে। রাহুল নড়ে উঠল। রাহুলের ঘুম বরাবরই সতর্ক। এখন সেই ঘুম উদ্বেগে জড়ানো, সহজেই ভেঙে যায়।

—কে ? বলেই চোখ খোলে রাহুল।

আয়েষা চোরের মতন নূপুরের দিকে হাত বাড়ান, ছেলের দিক থেকে মেয়ের দিকে হাত সরে যায়। বলেন— নূপুরকে নিয়ে যাচ্ছি।

রাহুল বোনটিকে নিবিড় করে হালকা লেপের মধ্যে টেনে নেয়, কেননা নূপুরের দেহ লেপের বাইরে ঘুমের মধ্যে চলে যায় এবং লেপের উপর দিয়ে পা তুলে দেয় দাদার গায়ে। বাচ্চাদের কি গরম লাগে শীতেও ?

রাহুল চোখ বন্ধ করে বলে— থাক। আমার কাছে থাক।

আয়েষা কেন তবে চোরের মতন এসেছেন ঘরে ? কেন বা চোরেরই মতন বেরিয়ে চলে আসেন চুপি চুপি আশ্চর্য ব্যর্থতায় ! স্পর্শ তো হয় না। কেন হয় না ?

বুলেট মোটরবাইকের কর্কশ উৎকট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শব্দটা চলে যায় এত রাতে পথের উপর দিয়ে।

—শব্দ ? এত ভয়ংকর শব্দ খোদা ! অস্ফুট গলায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আয়েষা। তাঁর মনে হয়, তিনি যেমন তাঁর সন্তানদের এত রাতে জেগে থেকে পাহারা দিচ্ছেন, ওই শব্দটাও দিচ্ছে। ওই শব্দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর নৈঃশব্দ্য-বধির হৃদয় কেঁপে উঠছে কেবল। তিনি মেয়ের কাছে এসে দেখেন এই দোতলার ঘরটিতেও নাতাশার সঙ্গে বউমা শুয়েছে, স্বামীর কাছে যায়নি। বুলবন আর চন্দ্রিমার সেই বাঁশিটা কি থেমে পড়েছে কোথাও ? এত দুর্বোধ্য এই জীবন ! এতই নিরাকুল ! রাজনীতি এতই কঠিন, এতই শাণিত পদার্থ। কাউকে চেনা যায় না। আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে আয়েষার।

ভোরে আসে মোহর। নাতাশা থাকলে এই রকমই আসে সে। ওর সমস্ত হাতে মেহেদির আলপনা, পায়ে আলতা নয়, মেহেদিরই কামনা-মদিরতা।

নাতাশা বলে— তোর সর্বনাশ হয়েছে মোহর।

বেচারি মোহর কেঁদে ফেলে। চোখে নিঃশব্দ অশ্রু ঘনায় মেঘের ছায়ার মত।

—এসেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—যাব আমি ? এই হাত দু'টি দেখাব তাকে !

হাত দু'খানি টেবিলের উপর বাড়িয়ে দিয়ে মোহর ডুকরে উঠল— তুমি চলে যাও রাহুল ! থেকো না।

রাহুলের হাত মোহরের হাতের দিকে এগিয়ে এসে থেমে যায়, তার মায়ের হাতটিও রাত্রে এভাবে থেমে গিয়েছিল।

রাহুল শুধালো—কেন মোহর!

চাপা সুরে মোহর বলল— রাত্রে মামাবাড়ি থানার বড়বাবু এসে গোপন মিটিঙ করেছে। ললিত ছিল। তারক গাঙ্গুলিও ছিল। খুব খারাপ পরিস্থিতি রাহুল! বলতে বলতে আর বলতে পারে না মোহর। মেহেদি-লিপ্ত দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে।

॥ ২৫ ॥

মোহরের মেহেদি রাঙানো হাত দু'টির দিকে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছিল চন্দ্রিমা। কিছুতেই চোখ দুটি সরাতে পারছিল না। মৌমাছি যেমন গুনগুন করতে করতে, যেমন ভ্রমর বারবার ফুলের পাপড়ির উপরে ভিতরে ঘুরে ফিরে আসে, চন্দ্রিমার অক্ষি-ভ্রমর সেই রকম করছিল। হাতের উপর, হাতের রাঙা তালুতে, রেখায়, আঙুলে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে বসছিল।

সদ্যমাত্র ভোর অরুণাভায় প্রকাশিত হয়েছে, কুণ্ঠিত আলোয় উদ্ভিন্ন প্রকৃতি। সেই আলোয় হাত দুটি রঙিন, চোখ দুটি উদ্ভাসিত, কামিজের বক্ষচূড়ায় আলোর ফালি এসে পড়েছে। কামনারও একটি স্নিগ্ধ রূপ আছে। ভোরের আলোয় এমন রূপ কখনও দেখেনি চন্দ্রিমা ; তারও কি এমনই ছিল ! আজও কি সে এমনই সুন্দর ?

এই প্রশ্নটি জাগে কেন মনে ? স্পষ্টত সেকথা বুঝতে পারছে না চন্দ্রিমা। মোহরের একখানি হাত সে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নরম করে চেপে ধরে আছে। দোতলার ছাদের উপর মোহরকে টেনে এনেছে চন্দ্রিমা।

—এখানে আনলে কেন বউদি ?

—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—বল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল চন্দ্রিমা। মুটোয় ধরা মোহরের হাতখানি ছাড়ল না।

—আমাকে তুমি একবার ওষুধ কিনে দেবার প্রস্তাব করেছিলে।

—হ্যাঁ। নেবে তুমি ?

—নিতে পারি, যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকো। হাসানপুর থেকে মাঝে মাঝে সদরঘাটে শরৎপাঠাগারে আসতে পারবে ? তোমাকে সঙ্গে করে কাজ করব।

—আমাকে নেবে কেন, আমি যে শ্রেণীশত্রু তোমাদের। আচ্ছা। আমি গরিব ঘরে জন্মালে রাহুল বুঝি খুশি হত।

চন্দ্রিমা এবার হা হা করে হেসে ফেলে বলল—ঈশ্বরের কোন শ্রেণী-চেতনা নেই মোহর, তিনি শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাসী।

—এভাবে এড়িয়ে যেও না বউদি।

—এড়িয়ে কেন যাব। ঈশ্বর সব পারেন মোহর। যুদ্ধ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, আকাল। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস। কিন্তু আমার স্বামীর জন্য একটা ছোট চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেন না। আরও একটা জিনিস পারেন না। হিন্দু-মুসলমানের সত্যিকার মিলন ঘটানোর ক্ষমতা তাঁর দেই। এ ব্যাপারে তিনি ভারী কৃপণ। ঈশ্বরের একটু সদিচ্ছা থাকলেই তো হয়ে যায়।

—হয়ে যায় বুঝি। বলে ওঠে মোহর আর তখন তার গলায় আচম্বিত অশ্রুর ঈষৎ

স্পর্শ দুলে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান নয়, মোহর ভাবে মানুষ মানুষীর মিলনের কথা ; রাহুল এবং তার নিজের কথা।

চন্দ্রিমা এবার অবনত-চক্ষু মোহরের গ্রীবায় হাত রেখে বলে—আহা, তাই কি হয় নাকি।

—তাহলে। অত্যন্ত সরল কণ্ঠে বলে ওঠে মোহর।

আবার ক্ষীণ উচ্চ গলায় হেসে ফেলে চন্দ্রিমা। শুধু অশ্রুর মন্দ্রাভাসিত স্পর্শে যে সুরটি মোহরের কণ্ঠে উচ্চকিত হয়, তার মর্মার্থ বোঝা কি কঠিন। কামনার এই তীব্রতা নারীব্রতের মত সিধা, কম্প্র, বেগবান, কিন্তু তার কোনও স্পর্শযোগ্য ঈশ্বর নেই।

চন্দ্রিমা বলে—হয়ে কিছুই যায় না মোহর। সবই মানুষকে করতে হয়। ঈশ্বরই যদি বল, তাহলে বলব, জীবন-বাসনা প্রাণীমাত্রেরই থাকে, কিন্তু ভালবাসা জিনিসটা মানুষের সাধের জিনিস, কল্পনার সামগ্রী ; কামনা ঈশ্বরের দান, এ পর্যন্ত মানা যায়, কিন্তু প্রেম মানুষেরই একান্ত, অন্য প্রাণ বা অন্য প্রাণীতে ওই পদার্থটা নেই। আর সেটা অন্যদের নেই বলেই বোধহয় ভালবাসার জন্যে মানুষকে এত দাম দিতে হয়।

—আমার যে ভয় করছে বউদি। তুমি বলছ, প্রেম কল্পনার জিনিস।

—হ্যাঁ, কল্পনাই তো আসল জোরের জায়গা। যার যত কল্পনার জোর, তার তত ভালবাসার শক্তি। তোমার হাতের এই মেহেদির কীইবা দাম আছে। কিন্তু যদি এই রঙটা কল্পনা দিয়ে দ্যাখ তাহলে এর দাম যে কত, তা যে জানে সেই জানে। তাই না ?

চন্দ্রিমার এই কথায় মোহর এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। এভাবে কেঁদে ফেলতে তার একটুও ইচ্ছে ছিল না। সে লুকোতেই চেয়েছিল। অসহায় হয়ে সে কেঁদে ফেলেছে।

মোহর বলল—আমি যে তেমন করে ভাবতে পারি না বউদি। রাহুলের কথা ভাবলেই আমার চোখে কেমন পানি এসে পড়ে। বড় কোনও ভাব মাথায় আসে না, চোখে জল আসে। কেন যে এ বাড়িতে ছুটে ছুটে আসি বুঝতে পারি না।

চন্দ্রিমা এবার মোহরের থুতনি স্পর্শ করে বলল—তোমার কান্নাটা আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার কান্নাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আমারও আজকাল কাঁদতে ইচ্ছে করে, আমারও কান্না আছে বোন।

—সেকি বউদি।

—হ্যাঁ মোহর। একটা কথা বলি তোমাকে। নিটোল ভালবাসা গল্পে-সাহিত্যে হয়, বাস্তবে ও রকম গোল কিছু হয় না। শত কল্পনা দিয়েও বাস্তবে ঐ ধারা গোলগাল কিছু গড়া যায় না।

—এই যে তুমি কল্পনার কথা বললে।

—সেটা তো শক্তি, বানানো কিছু নয়। একটা কল্পনা বানায়, মিথ্যে করে সাজায়, অন্যটি হল উপলব্ধি। একটা হল ভঙ্গি, অন্যটি প্রাণ। যাই হোক। এসব হল ভালবাসার একটা সাদামাটা ব্যাখ্যা। তো, ব্যাখ্যা করলে কি ভালবাসা ছোট হয়ে যায়, কী জানি। তবে যে ভালবাসতে পারে, তার আর ব্যাখ্যার দরকার কী। আমি ব্যাখ্যা করে মরছি আর তুমি ভালবেসে মরছ।

—তুমি বুঝি ভালবেসে মরনি ?

—তুমি তো ভারি সেয়ানা মেয়ে।

—রাগ করলে বুঝি ?

—না।

হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল চন্দ্রিমা। সেই গাম্ভীর্যের সামনে দাঁড়িয়ে মোহরের মনে হল, বউদির জীবনটা কোনও সহজ কল্পনায় কিছুতেই ধরা যায় না। বউদিকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, চোখ দুটি দূরের গাছপালার দিকে সরু হয়ে সরে গেছে।

সুদূরে দৃষ্টি সঞ্চালিত থাকে, সহসা চন্দ্রিমা প্রশ্ন করে—রাহুল চলে গেল কেন। মোহরকে প্রশ্নটি সঠিক প্রশ্নের অভিঘাতে করা হয় না, কারণ রাহুল চলে যেতই। তবু মোহর প্রশ্নটির উত্তর দেয়—আমি স্পাইং করলাম বউদি। এখন তরফদার বাড়িতে ফিরে যেতে সাহস হচ্ছে না। মণির যেদিন জরিমানা হল, মাহেফরাসদের একটা বিশাল মিছিল এল। থানা বুঝতে পারছে না এত বড় মিছিল কীভাবে সম্ভব। রাহুল কি এই মিছিল সংগঠিত করেছে? বা, ধর তুমি। অথবা আর কেউ? তারক গাঙ্গুলির ভাগ্নে তিলক কি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, যার অন্য নাম কবি? তিমিরবরণ তোমার নাম করেছে। ইকবালের নাম বলেছে। শরম কিন্তু রাহুল আর কবিকে জড়াতে চায়। ওরা বুঝতে পারছে না, মাহেফরাসদের সংগঠন কতটা জঙ্গী।

বলতে বলতে মোহর থেমে গেল। দূর থেকে দৃষ্টিকে টেনে আনে চন্দ্রিমা, মোহরের মুখের উপর স্থাপন করে।

—লক্ষণের মৃত্যুর পর থানার টনক নড়েছে। ললিত আর ব্যথা চাইছেন, থানা রাহুল আর কবিকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাক। থানা কী করবে বোঝা যাচ্ছে না বউদি। সাদা চৌধুরীর নামে একটা মারাত্মক সংগঠন যে গড়ে উঠেছে পুলিস বুঝতে পারছে। অথচ জলগেটের কাছে কোনও পুলিস-প্রহরা দিতে বড়বাবু রাজী হচ্ছেন না। সমস্ত কথা আমি রাহুলকে বলেছি।

মোহরের কথা শুনতে শুনতে চন্দ্রিমা তার চোখ দুটিকে আবার দিগন্তে মেলে ধরল। তারপর বলল—তোমাকে ব্যথা তরফদার আর বিশ্বাস করবেন না মোহর। তুমি যে এখানে এসেছ, তা উনি বুঝতেই পারছেন।

—হ্যাঁ, বউদি।

—আজ থেকে তোমারও রাজনৈতিক জীবন শুরু হল তাহলে, সেকথা রাহুল জানতে পারল না। তোমার ভালবাসা আর কিন্তু নিটোল থাকল না ভাই। কষ্ট পাও। এ সংসারে ভালবাসাও নিরপেক্ষ নয়। হয় মাহেফরাসের পক্ষে, না হয় বিপক্ষে। জানি, এই কথায় তোমার মন এখনও আপত্তি করবে।

—একটা কথা বলব বউদি? বলে মোহর তার ব্যথিয়ে ওঠা চোখ দুটি মেহেদিরাঙা আঙুলের ফাঁকে আড়াল করতে চাইল একখানি হাত কপালে ঠেকিয়ে।

—বল।

—ভাববে না, আমি খুব সেয়ানা হয়েছি?

—তুমি খুব শক্ত মেয়ে মোহর।

—আমি পক্ষ বুঝি না। অবশ্য ছাই, রাহুলকেও বুঝি না হয়ত। শুধু ভয় করে, রাহুল চলে গেল আমারই কথায়, এক মিনিট দেরি করল না। জানো বউদি, আমার আর লেখাপড়াটি হবে না।

—কেন?

—ও আর হবে না। কিছুতেই মন বসাতে পারি না। কত কথা বললাম তোমাকে, তুমি কিছু মনে করছ না তো।

—না। ভাবছি, তবে তোমার সত্যিই সর্বনাশ হয়েছে।

—ও কথা নাতাশাও বলেছে আমাকে। আমি যাচ্ছি বউদি। বলে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলে গেল মোহর। পথে গিয়ে পড়ল। ছাদের উপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না চন্দ্রিমা।

বাইরের বারান্দায় ওষুধ বিলি করতে করতে চন্দ্রিমা তার কর্মসূচি ছকে ফেলল মনে মনে। চার-পাঁচজন মাহেফরাস-রুগী এসেছিল ওষুধ নিতে। তাদের একজনকে সে বলে দিল, সপ্তাহে দু'দিন সে তেরোঘরায় চিকিৎসার জন্য যাবে। তাদের কেউ একজন যেন কদমতলায় জলগেটের কাছে ডোঙা নিয়ে আসে।

চন্দ্রিমার মনে হল, রাহুলের রাজনীতির কোনও প্রচ্ছদপট নেই। মাহেফরাসের আগ্নেয় আন্দোলনটির মলাট চাই, সুগ্রন্থিত করা চাই এর প্রতিটি পৃষ্ঠা, প্রতিটি অক্ষরকে। প্রচ্ছদে সে একটি ডাক্তারি ব্যাগ এঁকে লিখে দিতে চায় কোলাজের সাঁটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছবি। যথা, ছবিটির একটি টুকরো এক প্রৌঢ়ের, তিনি সাদা চৌধুরী, হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ, একটি বাঁধ পথের উপর দিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর স্টেথোটি অন্য ছিন্ন কাগজে জড়িয়ে রয়েছে। ঠিক সেই নলটির কাছেই আধখানা ডোঙার মাথাটি এসে পড়েছে খাড়া হয়ে, ঠিক একটি উচ্ছ্রিত জলোচ্ছ্বাসের চূড়ায়। খুব সাবধানে শরৎচন্দ্রের মুখটিও ধরা থাকে একটি কোণে। মাহেফরাসের জালের ঘর প্রচ্ছদকে সার্বিক আলিঙ্গনে জড়িয়ে থাকে, দেখে মনে হয়, এ যেন প্রতিরোধের মত শক্ত সুতোয় বোনা। প্রচ্ছদে জলের উচ্ছ্বাস আবেগঘন তীব্রতায় বিদীর্ণ হয়েছে।

ঠিক এই সমূহ দৃশ্যের উপর দিয়ে দিগন্তাভিসারী একটি শুভ্র বলাকা উড়ে চলেছে, তার ডানায় রক্তিম লোহিত সূর্যালোক জ্বলজ্বল করছে। একটি টুকরোয় বন্দুকের একটি নল দেখা যায় অস্পষ্টভাবে। বন্দুকের রঙটি কালো আর হিমশীতল দেখায়। বাইরে শীতল হলেও ভিতরের কঠিন উষ্ণতার ছিদ্রটি উন্মুখ, দৃশ্য হয়।

একজন পুলিসকে টেনে নিয়েছে ওই জলোচ্ছ্বাস, ওই গ্রামগুলি, সে আর ফিরে আসতে পারেনি থানায়। শুধু লক্ষণ নয়, একটি পুলিসের অস্তিত্বও হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে বাঁধ-পথের উপর থেকে।

থমথমে এই আবহে দিন-দ্বিপ্রহরে চন্দ্রিমা ডোঙা ভাসিয়ে দেয় জলে।

জলের বিস্তার দেখে মনটা কেমন দমে যেতে চায়, অসম্ভব শূন্যতা তার হৃদয়ে ধাক্কা দিয়ে ওঠে। মণি বলে—ভয় কি বউদি। ডোঙা আঁকড়ে থাকো, দাঁড়া ঠিক রাখো, নড়বে না। বাঁধপথের উপর কদমতলায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটি কঠিন চোখে উপভোগ করছিল তিমির, সঙ্গে তার পাঁচ জন ক্ষেতমজুর ; তাদের চোখে হিংসা দগদগ করছে।

বিলের জলে ডোঙা ভেসে যায় চন্দ্রিমার, ঠিক তখন মোহর তার মামাবাড়ি থেকে রাহুলদের বাড়ি ফিরে আসে। তার চোখমুখ অত্যন্ত থমথমে। কথা বলতে পারছে না। নাতাশা ওকে দেখেই বুঝতে পারে তরফদার-বাড়ির সঙ্গে মোহরের চির-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

—তুমি কি একেবারেই বেরিয়ে এসেছ মোহর ? যাবে এখন ? শুধায় নাতাশা।

—একেবারেই এসেছি। বলে মাথা নীচু করে বসে রইল রাহুলের খাটের উপর মোহর।

নাতাশা বলল—বউদি মণিকে সঙ্গে করে প্রণামপুর চলে গেল।

মোহর বলল—আমি সঙ্গে যেতে পারতাম। অবশ্য বউদি আমায় সঙ্গে নিত কি না

বলতে পারি না। একটা কথা কিন্তু বউদিকে বলতে পারিনি তাশা।

—আমায় বলবে?

—হ্যাঁ, তোমাকেই বলি। কথাটা রাহুলের কানে পৌঁছনো দরকার। তিমিরবরণ কিন্তু মোটেও সুবিধার কাজ করছে না। লক্ষণের মৃত্যুকে ওই লোকটা ব্যবহার করছে। একদল গরিব মানুষকে সে ভাঙিয়ে ফেলেছে এবং তোমাদের ফ্যামিলির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইছে। অথচ আমানির মৃত্যুর সময় চুপ করে থেকেছে, ঠিক এই কথাটা নগেন বৈরাগী আমাকে বুঝিয়ে বলল একটু আগে।

—কখন?

—একটু আগে, পথের উপর দেখা হল। এই সব দেখে আমার মাথাটা ঘুরে যায় তাশা, কিছুই বুঝতে পারি না।

—তুমি কিন্তু মায়ের সামনে লক্ষণের কথা একদম তুলবে না, মা খুব কষ্ট পান।

—রাজনীতি জিনিসটা কি শুধুই চালাকি?

—রাহুলকে দেখে কি তোমার সেই প্রত্যয় হয়েছে মোহর।

—তিমিরবরণও তো বামপন্থী কি না।

—বউদি বুবনও বামপন্থী, তাই না? কিন্তু রাহুলের সঙ্গে দাদাবউদিরও পার্থক্য আছে।

—কিসের?

—ঠিক বলব তোমাকে? তীব্রতা এবং মাত্রার তফাত। একদল বলছে সময় হয়েছে, অন্য দল বলছে, সময় হয়নি, দেরী আছে। পথ এক, পন্থা ভিন্ন।

—আচ্ছা, আত্মত্যাগই কি শেষকথা নাতাশা?

—না। ওটা গোড়ার কথা।

একটা ভারী, ধীর এবং পুরুষ-কণ্ঠ কানে লাগে মোহরের। মোহর ঘাড় কাত করে দরজায় দেখে বুলবন এসে দাঁড়িয়েছে। পাজামা-পাঞ্জাবি এবং চটিপরা বুলবনকে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় এবং সুন্দর দেখাচ্ছিল। বুলবন বলে উঠেছে, ওটা গোড়ার কথা।

—আপনি এরকম বলছেন?

—হ্যাঁ, বলছি।

—আচ্ছা। আপনি কি সদরঘাট যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমি আপনার সঙ্গেই চলে যাই এখন। এখানে আমার আর ভাল লাগছে না। বাসে করে সুন্দরপুরের স্টপেজে নেমে ঘোড়াগাড়ি করে বাড়ি চলে যাব।

তারপর নাতাশাকে উদ্দেশ করে তুমি যাবে? ঠিক আছে, তাহলে পরেই এসো তুমি।

নাতাশাকে একথা বলেই মোহর খাট ছেড়ে নেমে পড়ল। এবং বুলবনকে বলল—চলুন তাহলে।

আয়েষা এগিয়ে আসেন পায়ে পায়ে। বুলবন এবং মোহর নীচে নেমে এসেছিল। নাতাশাও নেমেছে সঙ্গে সঙ্গে।

আয়েষা বললেন—মহেশের দোকান থেকে একখানা শাড়ি ধারে আনতে পারবে বড়খোকা? ফুলির কাপড় ছিঁড়ে গেছে। বাবুর নাম করে চাইবে। আর এই পাঁচটা টাকা তোমার কাছে রাখো।

—আমাকে কি ধার দিতে চাইবে মা?

—বাবুর নাম করে চাইবে।

—সবই তো বাবুর নামে চলছে মা। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না।

—একবার হিফাজতের সঙ্গে দেখা করতে পার না ?

—কী হবে দেখা করে ? ওই চাকরিটা আর হবে না।

—তোমার হাত খালি দেখে মনটা খারাপ হয় খুব।

—ও ! ঘড়িটার কথা বলছ ? দ্যাখ, এই বেশ হয়েছে, আর কোনও চিহ্নই রইল না। এখন যদি চন্দ্রিমা এই ফ্যামিলিতে থেকে যেতে পারে.....

—তুমি কি বলছ, দোলা এখানে টিকতে পারবে না ? কী, বলছ তুমি ?

বুলবন এবার মোহরের চোখে চকিতে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নাতাশাকে দেখে নেয়। তারপর পানসে করে হেসে ফেলে—দ্যাখ মা। বলে মায়ের চোখে চোখ রাখে।

—তোমার কথা কিন্তু ভাল লাগল না বুলবন। তোমরা কমরেড, তোমাদের মুখে এমন কথা শুনলে ভয় করে। ঘড়িটার জন্যে তোমার একটু দুঃখও হয় না ?

—না। কেন হবে ? মণির ইজ্জতের চেয়ে ঘড়ির দুঃখই বড় হবে ? চোখের সামনে ওকে ওইভাবে নাকখৎ দিতে হল। কেন হল মা ? বিয়ের ঘড়ি বলে আমার কোনও আলাদা সেন্টিমেন্ট নেই। ঠিক করেছি আমি আর কখনও ঘড়ি বাঁধব না হাতে।

—এমন কথা বউমার সামনে বলো না বাবা। তাতে ওর লাগবে।

—কেন, এতে লাগার কী আছে ?

—মেয়েদের মনটা তুমি বোঝো না বাছা।

—মেয়েরাও কি আমার মনটা বোঝে। দ্যাখো, সে কোথায় গেছে, আমায় বলে পর্যন্ত যায়নি। এভাবে চলে না মা। আমি না হয় মন বুঝি না, কিন্তু কাজটা তো বুঝি।

—আমি কিন্তু মনটাই বুঝি। কাজ তো বুঝব না। সংসার করতে হলে মন বোঝার দায়িত্বটা থাকে বাছা। বউমার সঙ্গে কোনও বিরোধ তুমি করতে পার না।

সহসা বুলবনের গলা খাদে নেমে যায়—তুমিই তো ঘড়ির কথা তুললে।

তারপর সহসাই তার গলা উচ্চে উঠে গেল—তোমার বউমা এখন অ্যাডভেঞ্চারে বার হয়ে পড়েছে। ওই রকম জল দেখে ওর কিন্তু ঘোর লেগেছে চোখে, জল তো কখনও দেখেনি এভাবে। ডোঙায় চড়া সখটা কিন্তু সহজ নয় মা। ও কী করছে, তা কিন্তু নিজেই জানে না। কোথায় হাত বাড়িয়ে কী ধরতে চাইছে বুঝতেই পারছে না। সি ইজ কমপ্লিটলি কনফিউজড। কমরেড জি.এস.-এর রাজনীতিটা ওর আর মাথায় নেই। ও রাজনীতি নয়, রাহুলকে ধরতে চায়। একে পলিটিকাল অ্যাকটিভিটি বলে না। যাই হোক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে মোহর ? এসো তবে।

হঠাৎ নাতাশা বুলবনের সমস্ত কথা শুনে বলে উঠল—দাঁড়াও ভাইয়া। আমি মোহরের সঙ্গে হাসানপুর চলে যাব। এক মিনিট, আমি আসছি। বলে সে দোতলায় এসে দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল। আয়েষা অবাক হয়ে রইলেন।

কোনওক্রমে বললেন—হঠাৎ তোর কী হল আবার। তুই কেন যাবি ?

কী একটা ভুলে যাওয়ায় দ্রুতই সিঁড়ি ভেঙে নাতাশা উপরে আসে এবং দ্রুততর পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় সিঁড়ির উপর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়। আয়েষা বলেন—তোর কি একদিন পরে গেলে চলত না ?

নাতাশা বলল—কেমন বিপজ্জনক মনে হচ্ছে সব কিছু। আমি ওদের সঙ্গেই চলে যায়। তুমি সাবধানে থেকো, মণিকে আগলে রেখো।

আয়েষা বললেন—বিপজ্জনক কেন মা !

নাতাশা বলল—সে ঠিক বোঝাতে পারব না তোমাকে।

আয়েষা বললেন—বিপদটা কি ঘরের, না বাইরের খুকি ?

নাতাশা চোখ মেলে এদিক-ওদিক নূপুরকে খুঁজছিল, কোথাও দেখতে না পেয়ে বলল—এই চকোলেটসগুলো নূপুরকে দিও। এ সংসারে ঘর আর বাহির তো আলাদা নয় মা। তুমি কখনও আর ঘড়ির কথা তুলবে না।

—কবে আসবি খুকি ?

—আসব আবার।

আয়েষা থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একা। ভাবলেন, তিনি যে একটু আগে 'মনটাই বুঝি' বলে অহংকার করলেন, সত্যিই কি তিনি সকলের মন বুঝতে পারছেন ? তাঁর মনে হল, খোদা মানুষ গড়েন, কিন্তু মানুষের মনটা মানুষ নিজেই গড়ে।

রাস্তায় চলতে চলতে মোহর বলল—ঘড়িটা ফেলে এলাম।

—নিয়ে আসবে গিয়ে, আমরা গৌর ঘোষের ভিটার ওখানে দাঁড়াচ্ছি। বলল নাতাশা।

—না, থাক। আমি আর মামীর সামনে যাব না। সম্বন্ধ শেষ করে এসেছি। বলেছে, যদি সতী মায়ের পয়দাস হও, আমার এখানে এসো না। এর পর আর যাওয়া যায় না নাতাশা।

বুলবন বলল—আমাদের জন্য তোমাকে আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটাতে হল মোহর।

—আমি কী করতে পারি। বউদির সঙ্গে কথা হয়েছে, মাঝে মাঝে সদরঘাটে শরৎপাঠাগারে এসে শরৎ সেন্টিনারি প্রোগ্রামে কাজ করব। ব্যাপারটা কিন্তু সহজ হবে না।

—বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে। বলল বুলবন।

—যথেষ্টই হবে।

—তবু আসবে কেন ?

—বউদির সঙ্গে কাজ করব, শরৎচন্দ্র আমার ফেভারিট অথর। সমগ্র সাহিত্য আমি পড়েছি। বহু দিন রাত্রে একলা পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলি। শ্রীকান্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় নায়ক।

নাতাশা বলল—মোহর একেবারে গল্প-উপন্যাসের পোকা। হাসানপুর পাঠাগারে যত বই সবই বোধহয় পড়ে ফেলেছে। অবশ্য ওখানে অনেক ভাল ভাল বই আছে।

মোহর বলল—সব বই কি কেউ পড়তে পারে। তা নয়। উপন্যাস পড়ি। ফের সব উপন্যাস পড়াও যায় না। আমি শেষ প্রশ্নের কমল আর গৃহদাহের অচলা, এই চরিত্র দুটি বুঝে উঠতে পারি না। আচ্ছা, কিরণময়ী পাগল হয়ে গেল কেন ?

—কমরেড জি.এস.এর শরৎ মূল্যায়ন পড়লে তুমি বুঝতে পারবে। এই তিনজন মেয়ের সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু প্রেম। কিন্তু তিনজনের সমস্যা আলাদা। কমলের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র 'ডায়ানেমিক লভ'-এর বিষয়টি দেখাতে চেয়েছেন। সমস্যাটি ভারতীয় সাহিত্যে অত্যন্ত নতুন। বলে উঠল বুলবন।

—ভালবাসা কি 'ডায়ানামিক' হয় ? সপ্রশ্ন সিধা কৌতূহল প্রকাশ করে মোহর।

—হয় বইকি। তবে তোমাদের এই বয়েসে ওই সব ব্যাপার না জানলেও চলবে। কখনও যদি তোমার জীবনে তেমন সমস্যা দেখা দেয় তখন 'কমল' সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে। একটা কথা বলি তোমাদের, অধিকাংশ মেয়েই কিন্তু অচলা। ভালবাসার

ক্ষেত্রেও কতকগুলি মূল্যবোধ কাজ করে, সচেতনভাবেই হোক আর অসচেতনভাবেই হোক। কোন্ কংক্রিট ভ্যালুজের উপর তাকে দাঁড়াতে হবে, তা সে বুঝতে পারে না। নাম অচলা হলেও অচলা এখানে চঞ্চলা। অস্থির। এই অস্থিরতার কারণগুলি বুঝতে পারলে অচলাকে বোঝা যায়।

—আচ্ছা, একই সঙ্গে একটি মেয়ে কি দু'জন পুরুষকে ভালবাসতে পারে? অচলাকে একদম বুঝতে পারি না।

নাতাশা সঙ্গে সঙ্গে বলল—তোর কি হয়েছে মোহর, তুই পেকে গেছিস খুব। চ, আর প্রশ্ন করতে হবে না। বলে নাতাশা সশব্দে হেসে উঠল।

বুলবন হাসতে হাসতে বলল—প্রশ্ন করা অন্যায় নয়। তবে নাতাশা ঠিকই বলেছে, তার একটা প্রসঙ্গিকতা থাকা চাই।

—শরৎচন্দ্রের কোন্ উপন্যাসে কী কী সমস্যার কথা রয়েছে, তা আগে থেকে বুঝব কী করে? আগে পড়ে দেখতে হবে, আর সেটাই করি আমরা। এবং উপন্যাস পড়ে মানুষ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়াই প্রশ্ন করে। তাই যদি বলেন, তাহলে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসখানা আমার পড়াই উচিত হয়নি। ওই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী আমার অচেনা, ওদের সমস্যাও আমার নয়। অনেকে তো উপন্যাসই পড়ে না, তাই বলে কি তাদের জীবনে প্রেম ইত্যাদি আসে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুসুম' ক'খানা উপন্যাস পড়ে শশী ডাক্তারকে ভাল বেসেছিল? উপন্যাস পড়লেই কেউ অচলা বা কমল হয়ে যাবে, তাই কি ঠিক?

নাতাশা বলল—তুই কিন্তু রেগে উঠেছিস মোহর। রাহুল ওই অচলাকে সহ্যই করতে পারে না। আর কমল সম্বন্ধে বলে, বেচারি কেবল প্রেম করেই গেল, মিডল ক্লাশের এই একটা হ্যাপা। কমল খেতে পর্যন্ত পায় না, এদিকে প্রেমটি তার অসামান্য।

বুলবন সহসা রেগে উঠে বলল—খুব কেমন কথাবার্তা হচ্ছে নাতাশা। আমি আবার বলছি, তোমরা ছেলেমানুষ, তবু তোমাদের যে বোঝার বয়েস না হয়েছে, এমন নয়। তবু একথা ঠিক যে, কমলকে রিয়ালাইজ করার ধৈর্য এবং মানসিকতা রাহুলের নেই। অথচ অবাক লাগে, রাহুল বিভূতিভূষণ পড়ে। যুগলপ্রসাদ আর রাঁজু পাঁড়ের ভক্ত। এদিকে বলে, নতুন যুগ, নতুন লেখক। আমি কিরণময়ীকে ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু চোখের সামনে দেখা অনেক মানুষেরই ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।

নাতাশা বলল—কিছু মনে করো না ভাইয়া। নতুন যুগ আর নতুন মানুষ, এদের ব্যাখ্যা তো শরৎ মূল্যায়নে নেই। অচলা এবং কমলকে যদি ডোঙায় চড়ে তেরোঘরায় যেতে হত তাহলে কি হত তাই ভাবি।

—তাহলে শিবনাথ আর ওই ডোঙায় চড়ার সাহস পেত না তাশা।

—তাহলে অজিতও তাকে ত্যাগ করত পথের উপর। বলল নাতাশা।

বুলবন এবার সোৎসাহে বলে উঠল—তোমার কথাটিই শরৎচন্দ্রের কথা। কমরেড জি.এস.-এর ব্যাখ্যায় ওই কথাটিই মুখ্য। কমলের 'সম্বন্ধ' পাত্র পরিবর্তন করেছে সামাজিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে, সেটি কোনও ব্যভিচার নয় মোহর। সমাজ-প্রগতির চলমানতার বেগ আর রুচিবোধ স্বামী শিবনাথকে পিছনে ফেলে, একদার প্রিয়পাত্র অজিতকে ফেলে রাজেনের দিকে ঠেলেছে কমলকে। কথাটি আরও ব্যাখ্যা করতে হবে।

নাতাশা বলল—বউদির কাছে এরকম শুনেছি একদিন। রাহুল তর্ক করেছে এই বলে যে, কমলের সামাজিক লক্ষ্যটা কী? দুস্থ দরিদ্র মানুষের মধ্যে রাজেনকে দেখা গিয়েছিল,

রাজেনের নিঃস্বার্থপরতা.....একটা উচ্চ মন......তার আকর্ষণ.....যাক গে, আমার নিজের সামাজিক লক্ষ্য বলে কিছুই নেই, রাজনীতিও বুঝি না। কমলের সোসাল ওয়ার্ক, রাজেন তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, ওই আর কি, সেই সব কনটেক্স্ট আমি বুঝব না। তবে মোহর প্রসঙ্গ ছাড়াই প্রশ্ন করতে ভালবাসে।

—আমাকে কিন্তু আবার তুমি রাগিয়ে তুলছ নাতাশা। আমি আর কথা বলতে চাই না। বয়েস হোক, তখন প্রশ্ন তুলব। বউদি ডেকেছেন, মাহেফরাসদের জন্য ওষুধ চেয়েছেন, মানুষের জন্য করবার একটা ইচ্ছে সবারই থাকতে পারে, সে না হয় বাদ দাও। সাহিত্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলাটা আপনা থেকেই হয়, ওটা আমার স্বভাব।

বুলবন এই সময় অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়ে। অন্যমনস্কভাবে অপরাহ্নের আকাশে চায়। চকের ওদিকে সাদা পায়রার ঝাঁক উড়তে দেখা যায়। বহমান নদীর দিকে চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে নাতাশা এবং মোহরের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে।

নাতাশা এগিয়ে গিয়ে রসস্থ গলায় মোহরকে বলে—এত মেহেদি কোথায় পেয়েছ মোহর।

মোহর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—ভালবাসার জন্য না খেয়েও থাকতে পারি নাতাশা। তুমি শুনে হাসবে জানি। কিন্তু রাহুল এত্তো মেহেদিপাতা দিয়েছিল একদিন। শরৎচন্দ্রের কমল বয়সিনী, বাংলাটা ঠিক বলেছি তো? দ্যাখ, শরৎচন্দ্রের কিন্তু অনেক নায়িকাই ছিল ষোড়শী-অষ্টাদশী।

নাতাশা বলল—আর তারাও কম যায় না, তারাও ছিল তোমারই মত পাকা।

মোহর অভিমান করে বলল—জানি, আমার ভালবাসার কোনও দাম নেই তোমার কাছে। আমি খুব তুচ্ছ। হ্যাংলাও বলতে পার। শরৎচন্দ্র পড়া আমার উচিত হয়নি।

নাতাশা বলল—আমি কিন্তু ভাই ওই 'ডাইনামিক লভ' বস্তুটা চাইব না। কী দরকার। কখনও যদি স্বামী পাই, তাকেই প্রাণভরে ভালবাসব। পলিটিকস বল, লভ বল, কোনও ঝক্কির মধ্যে আমি নেই। বাপু ফিরে এসে যদি আমার বিয়ের ব্যবস্থা দেখেন, আমি রাজি হয়ে যাব। আমার আর কিছু ভাল লাগে না, শুধু ভাবি বাপু কেন ফিরে আসছেন না। বলতে বলতে নাতাশার চোখ দুটি বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।

সদরঘাট পৌঁছে মহেশের দোকানের সামনের রাস্তায় দাঁড়াল ওরা তিনজন। দোকানটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুলবন একা এগিয়ে যেতে যেতে বলল—তোমরা এখানেই দাঁড়াও, আমি আসছি।

দোকানে যথেষ্ট ভিড় ছিল। বুলবন ঢুকে গিয়ে দোকানের মালিকের সামনে মেঝেয় বসল। কথা বলল। মালিক হাসতে হাসতে কী যেন বলল কিছুক্ষণ। বুলবন দোকান ছেড়ে বেরিয়ে চলে এল পথে। মোহর এবং নাতাশা বুঝতে পেরেছিল, দোকানদার ধারে জিনিস দিতে অস্বীকার করেছে। বুলবনের চোখেমুখে একটা কেমন চাপা অভিমান ছলছল করছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলবন বলল—নাঃ। হবে না। চ।

মোহর বলল—আমি আপনাকে টাকা দিতে পারি। যদি কিছু মনে না করেন।

বুলবন বলল—ঠিক আছে, অন্য কোনও দোকানে চেষ্টা করে দেখি। তোমরা বাস ধর। বাপুর দাম খুব কমে গিয়েছে তাশা। আমরা আর মানুষ নেই। এতক্ষণ শরৎ-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সব কেমন হাস্যকর ঠেকছে। যাও, চলে যাও তোমরা।

মোহর আর সাহস করে দ্বিতীয়বার টাকার কথা তুলতে পারল না।

নাতাশা বলল—আমার কাছে সাত টাকা মতন রয়েছে, তুমি নেবে, ভাইয়া?

—না। তোরা চলে যা। বলে অন্যমনস্কের মত বুলবন এগিয়ে গেল শ্লথ পায়ে। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তা দেখে মোহর তার দিকে অগ্রসর হয়ে এল।

বুলবন বলল—যত হাস্যকরই মনে হোক মোহর, হৃদয়বৃত্তিকে বিসর্জন দিতে পারব না। তুমি তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাবে। বলে আবার এগিয়ে গেল বুলবন।

বুলবনের এই অসহায় এবং দুর্মর অবস্থা দেখে মোহরের বুকের মধ্যে অপূর্ব অনুভূতি উদ্বেলিত হয়। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে নাতাশার কাছে ছুটে এসে হাত ধরে।

হিফাজত ডাক্তারের হোমিও হলে এসে ওঠে বুলবন। মোহর এবং নাতাশা বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাস ধরে।

হিফাজত বুলবনকে দেখেই বলে ওঠেন—চাকরি তোমাকে দিতে পারিনি বাবা। আমি আর ওই কমিটির মধ্যেও নেই। নতুন কমিটি হচ্ছে। ওই চাকরি করবে ললিতের জামাই। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। ওই চাকরির শর্তে ললিতের মেয়ের আসছে বৈশাখে বিয়েও স্থির হয়েছে। জানো কিছু?

—না।

—সেই ঘেন্নায় আমি সমস্ত ছেড়েছি।

—আপনার ভাগ্নের চাকরিটা...

—ওটি কোনওমতে হয়েছে বাবা। মিছে বলব না। আমাকে তুমি মাফ করে দিও বুলবন। ভাগ্নেটা খুবই দরিদ্র, একেবারেই গরিব। মানুষ তো এখন মানুষকে মেরেই বাঁচে। আমি তোমাকে মেরেছি।

—এইভাবে বলছেন কেন ডাক্তার সাহেব। ঠিক আছে, আপনারও দরকার ছিল। আচ্ছা, উঠি তাহলে।

বলে বুলবন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কেমন একটু ইতস্তত করে। তা দেখে হিফাজত বলেন—আর কিছু বলবে বাপ?

—হ্যাঁ, কিন্তু সংকোচও হচ্ছে খুব।

—বল, কী বলবে।

—না। থাক।

—আহা। লজ্জা কেন করছ? পারি না পারি, বলতে আপত্তি কেন বাপজি?

—আমাকে যদি কিছু অর্থ...

—হ্যাঁ, কত দেব বল?

—আমি কিন্তু চট করে শোধ দিতে পারব না, দেরি হবে।

—ঠিক আছে, যখন পারবে দেবে। কত চাই, বল।

—বেশি না। চল্লিশ পঞ্চাশ।

—এই নাও। ধর, এক দুই তিন চার পাঁচ। নাও, নিয়ে যাও। সব কেমন ঘোর হয়ে আসছে বুলবন। মানুষ বাঁচবে না। লক্ষণ আগলদার খুন হয়ে গেল। এখানকার ওই ঘাটে ওর লাশ ভেসে এসেছিল, দেখেছ? মানুষ চিনতেও পারেনি।

একদিন আবার দুটি বিক্ষত মৃতদেহ ভৈরবের জলে ভেসে এল সদরঘাটের জলঘেরের

আবর্তে। মোহর এবং বুলবন দেখল, দেহ দুটি কোপানো। মানুষ ঘিরে দাঁড়াল সেই জলঘেরের তীরভূমি।

॥ ২৬ ॥

কবি অনেকদিন পর মামার বাড়িতে ফিরে এসেছিল জোড়াখুনের রাত্রিতে। এবং তিন তিনটি রাত সেখানে কাটিয়ে দেয় বাড়ির মধ্যে নির্বিকার, প্রায় নিঃশব্দে। তাকে মামা এবং মামি কেউই তেমন কোনও ভালমন্দ প্রশ্নই করছিলেন না। তার অসম্ভব ঘুম পাচ্ছিল। দিনের বেলাতেও তার জেগে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। এত ঘুম কেন ? জীবনে কখনও তো এমন হয়নি।

শরীরের প্রতিটি কোষে যেন ঘুমের মাদক আলস্য আঠার মত জড়ানো। কিছুতেই জেগে উঠতে দিচ্ছে না। ঘরটা বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না। তার দেহের পক্ষে এই অন্ধকার ছিল শীতল আর আরামপ্রদ। মাথার কাছের জানলাটা খুলে দিলে পাণ্ডুর রোগীর মুখের মত ফ্যাকাসে আলো এসে পড়ে। জানলাটির কাছে নড়বড়ে একটা টেবিল আছে। ধুলোমাখা একটি পলিথিনের শিট, টেবিলের ঢাকনা। তার উপরে ধূপদানিতে নিবে যাওয়া অর্ধদগ্ধ ধূপবাতি। একখানি পুরনো ছেঁড়া হাফ পঞ্জিকা।

ঘরটা পুরনো কাগজপত্র বই-পুস্তিকায় ঠাসা, কাগজের বাসি ধূলামলিন গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে শ্বাস টানতে কষ্ট দেয়। শীর্ণ শ্যামলা ক্লাস নাইনের ছাত্রী মামাতো বোনটি তার মাথার কাছে দুই তিন বার চ্যাটালো পেতলের থালায় করে রুটি তরকারি এনে দিয়েছে এই ক'দিন। দিনে রাতে ক'বার এসেছে, কবি তা মনে করতে পারে না। তাকে কতবার ডেকেছে, ভাত খেতে, স্নান করতে ডেকেছে কিনা স্মৃতি তা এখন ধার্য করতে পারে না। সে বোধ হয় বারকতক চা খেতে চেয়েছিল বোনটির আছে। চা খেয়েছে, রুটিও মুখে দিয়েছে একটু আধটু আর দিনে রাতে বেশ ক'বার বাথরুমে ঢুকেছে।

তারপর শুধুই ঘুমের আচ্ছন্ন চেতনায় ডুবে যাওয়া। ছিপের হালকা ফাতনা যেমন প্রবল স্রোতের চাপে ভেসে থাকতে না পেরে স্রোতের তলে ডুবে থাকে, জলের উপর ভেসে ওঠে না, তার চৈতন্য সেইভাবে থেকে গেল তিনটি রাত্রি এবং দিনগুলি।

তারপর এক স্তব্ধশান্ত মিষ্ট দ্বিপ্রহরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল কবি। স্নান করল, খেল। মামাতো বোনটি বলল—তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে তিলকদা ! আমরা খুলে দেখিনি। টেবিলের উপর আছে। আর জানো, সদরঘাটের ব্রিজের কাছে জলঘেরায় দু'টি লাশ ভেসে এসেছে ! পুলিসে মানুষে ছয়লাপ, ডাঙায় লোক ধরছে না। বাবা তোমাকে ওখানে যেতে মানা করেছে, তুমি হস্টেলে চলে যাও।

শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে সামান্য কেঁপে উঠল কবি। সে জানে, পুলিস এই লাশ দু'টিকে শনাক্ত করতে না পারলেও অথবা শনাক্ত করতে চাইবে না হয়তো, কিন্তু সে জানে এই ডেডবডি কাদের, কখন তাদের কুপিয়ে কাটা হয়। মানুষ দুটির আর্তনাদও সে শুনেছে। তারপর সে আর ডোঙা নিয়ে প্রণামপুরে ফিরে যায়নি। সেই রাত্রে মামার এখানে এসে ওঠে।

টেবিল থেকে চিঠিটা হাতে তুলে নিয়েই তার লিখিত নামটির দিকে চেয়ে কবি চিনতে

পারে, এই হস্তাক্ষর বাবার। হঠাৎ তার মাকে মনে পড়ে যায়। মায়ের ক্যানসার, মা কি এখনও বেঁচে আছে ?

এখানকার কলেজে এসে ভর্তি হওয়ার পর একবারই সে মাকে দেখতে গিয়েছিল। গিয়েছিল অদ্ভুত এক ছদ্মবেশে। কারণ সে ছদ্মবেশ ছাড়া বাড়ি পৌঁছতে কেন যেন ভরসা করতে পারেনি। কবি কাগজ-কুড়ানির বেশে বাড়ির কাছে পৌঁছায়। পরনে ছেঁড়া পাজামা, খালি পা। পিঠ ফাটা, হাত ছেঁড়া জামা। গায়ে তার খড়ি উঠছিল এমনই চেহারা। উসকোখুসকো হতশ্রাদ্ধ, বিমলিন, নিঃস্ব করুণ চাহনি, যেন তার মায়ের নাম ভারতবর্ষ এবং তার সেই মা বোধ হয় আর বেঁচে নেই।

সে হাঁকল—পেপার গো !

ওই হাঁকটি সে এক কুড়ানির কাছে শুনে স্বর ও কথাটি উদ্ধার করেছে একদা। সে খুঁজছে ছেঁড়া কাগজ। অথচ হাঁকছে হকারের মত, অথবা পুরনো খবরের কাগজ খরিদ করতে এসেছে। আসলে সে এক পাগল কাগজ-কুড়ানি ছোকরা। মাথার স্ক্রু ঠিক নেই, কিন্তু ডাকটি বড়ই মিঠা, কলের পাখির মত ডাকে, গলায় শিস দিয়ে পাখি ডাকছে—পেপার গো !

কাঁধে ঝুলছে ছেঁড়া বস্তা। তলার ফুটোয় একটা ভাঙা নারকোলের কৌটো আধখানা ঝুলে আছে। সে ঘুরে মরছে বাড়ির চারপাশে, একটি বেড়াল ছানার মত। করুণাভূমি ভারতবর্ষ কখনও এমন ছায়াছবি দেখেনি। পাগল ছেলে দেখেনি। কাগজ কুড়াতে দেখেনি কাউকে, শোনেনি কলের পাখির গান। কবির সেদিন মনে হল, সে আর কেউ নয়, এই একটি আশ্চর্য সুর হয়ে মাকে ডাকছে, এত আনন্দ আর কিসে হত ! এই পাগলামির মধ্যে ভারতবর্ষকে সবচেয়ে ভালভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

সে ডাকল—পেপার গো ! কুড়িয়ে নেব নাকি দিদি ? এই দ্যাখ, কিছুই চুরি করিনি।

কবি বাড়ির কাজের মেয়েটিকে বাইরে বাসন হাতে কলতলায় দেখে দিদি বলে ডেকেছিল। লতিকা তাকে চিনতেই পারেনি অনেকক্ষণ। বলেছিল—কী নিচ্ছ, আগে দেখাও। তারপর চেয়ে থাকতে থাকতে ডুকরে উঠেছিল—দাদা, তিলকদাদা ! হায় ভগবান !

বলতে বলতে বাসনগুলো জল-কলের চাতালে নামিয়ে ফেলে খিড়কির খোলা দোর দিয়ে চিৎকার করতে করতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায় এবং সহসা তার স্বর বিস্ময়ে বেদনায় আপনা থেকে থেমে যায়। জল-কলের আরও কাছে সরে আসে কবি। দোরের দিকে উঁকি দেয়। সে আর ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা স্বস্তিকর মনে করে না।

মাথায় যে ওই ডাকটা অমন করে আসবে কবি প্রথমে কল্পনা করেনি। ছেঁড়া বস্তা কাঁধে ঝুলিয়ে নেবার পর সাহস করে পাড়ায় ঢুকে পড়েছিল। নিঃশব্দেই সে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে অনুভব করার চেষ্টা করেছিল, কেউ তাকে সন্দেহের চোখে নিরীক্ষণ করছে কিনা। কোনও বউ-ঝি তাকে দেখে কুড়ানি ছাড়া অন্য কিছু ঠাহর করে নাকি ! 'পেপার গো' ডাকটি এমনই অবিকল ছিল যে, ডাক কানে পেঁছনো মাত্র পাড়ার বউ-ঝিরা ভেবেই নিয়েছিল সেই ছেলেটা এসেছে, পুরনো কাগজ কেনার হাঁক দিলেও যে বস্তুত কুড়ানি। অমন ছেঁড়া বস্তা কাঁধে ঝুলিয়ে কেউ পুরনো খবরের কাগজ খরিদ করতে আসে না, কাগজ কুড়াতেই আসে। কবি অতএব হেঁকে উঠেছিল—পেপার গো !

ওইভাবে ডেকে না উঠলে লতিকা তার দিকে চেয়েও দেখত না। সে যে বাড়ির চারপাশে পড়ে থাকা কাগজের স্তূপের ভিতর থেকে সোনাদানা কুড়িয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না,

সেকথা বলতেই লতিকা চোখ মেলে তাকে দেখে। তারপরই লতিকা ভগবানকে ডেকে ডুকরে ওঠে।

আর একবার, মাত্র একবার মায়ের কাছে ওই রকম পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে কাগজ কুড়ানির ছদ্মবেশে পৌঁছতে বাসনা হয় কবির। চিঠিখানি হাতে ধরে সে আনমনা হয়ে যায়। সে ভাববার চেষ্টা করে, অমন সুরে ডাকে কেন ছেলেটা? পুরনো খবরের কাগজ খরিদ করার মূলধন নষ্ট হয়ে গেলে ছেলেটা কি কাগজ কুড়াতে শুরু করে? অথবা ওই ডাকটি কোনওভাবে তার জিহ্বায় জড়িয়ে থেকে যায়, আদৌ কখনও সে কাগজ খরিদ করত না, কেবল সে কুড়ানি মাত্র ছিল? কিংবা সে কখনও হকারি করত 'পোপার' বিক্রির?

এইসব চিন্তার কোনও মানেই হয় না। ডাকটিই আসল কথা। ডাকতে ডাকতে কবি মায়ের কাছে পৌঁছাতে চায়।

চিঠিটা পড়ে শেষ করে সে অবশ হয়। মায়ের অন্তিম দশার অত্যন্ত করুণ বিবরণ আছে চিঠির প্রতিটি অক্ষরে। আগেও বার কতক এই রকম চিঠি এসেছে, তবে এবারের চিঠি আরও করুণাঘন। মায়ের প্রতিটি শ্বাস এই চিঠির পরতে জড়ানো। বাবা লিখেছেন মায়ের কষ্টের অনুপুংখ অবস্থার কথা, মায়ের কথা বলার শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে। মা কেবলই একটা চেষ্টা করেন, শীতল স্থির দৃষ্টি মেলে তিলককে খুঁজে ফেরেন, তাঁর নাকি শুধুই মনে হয়, বাড়িরই কোথাও তাঁর ছেলে লুকিয়ে আছে, দুষ্টুমি করে সামনে আসছে না।

একবারটি মায়ের কাছে যেতে সাধ হয় কবির। চিঠিটা জামার পকেটে ঢুকিয়ে কবি মামার বাড়ির বাইরে চলে আসে। তারপর অন্যমনস্কভাবে মজুমদার বাবুদের বালাখানার পথ ধরে এগিয়ে যায়। জোড়াপুকুরের বুড়া পাকুড়তলায়। এখানে আছে গম্ভীর প্রাচীন নির্জনতা। পুকুর পাড়ের উপর দিয়ে পথ গিয়ে মিশেছে নশিপুরের প্রধান সড়কে। পাকুড়ের শিকড়ে বসে পড়ে কবি। হঠাৎ চোখে পড়ে সাইকেল চড়ে নশিপুরের সড়ক ধরে ফুটবল মাঠের চৌমাথার কাছে দ্রুত ছুটে এসে এদিকেই এগিয়ে আসছে মণি।

কবি হাত তুলে ডাকে—মণি!

মণি শুনতে পায় না।

আবার ডাক দেয়—এদিকে! মণি রে! ও মণি-ই-ই!

এবার শুনতে পেয়েছে ছেলেটা। সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে। গড়াতে গড়াতে ঠেলে আনছে সাইকেলখানি। দূর থেকেই দাঁত বিকশিত করেছে একটু। গাল বেয়ে ঘাম নেমেছে মাথার চুলের গোড়া থেকে, কাছে এসে হাঁফ ছাড়ে বেচারি।

—এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথা যাস ভাই?

—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, শোনেন বলি, তারপর সিদ্ধান্ত করবেন।

—কী ব্যাপার!

—লঘু দফাদারের বাড়ি পাম্পের চুরি করা লোহার পাইপ ধরা পড়েছে।

—সে কি রে! তাহলে!

মণি এবার সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বলতে থাকে। কদমকে শাণ দেওয়া হেঁসো দেখিয়ে তামাম ঘটনা গতিক বার করে ফেলেছে সে। পাইপগুলি কাদামাখা অবস্থায় লঘুর বাড়ির ঢেঁকি ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল কদম এবং শরম। বাকি যন্ত্রাংশ বস্তায় ভরে রাতারাতি শশাঙ্কমোহনের বাজারের লোহার দোকানে রেখে গেছে। শশাঙ্ক কখনও মন দিয়ে

দোকান করে না। এগারোটায় আসে সন্ধ্যার আগেই বেশির ভাগ দিন বাড়ি ফিরে যায়। সব দিন দোকান খোলেও না। টাট আছে, টাটে মন নাই। কেনা বেচার ধৈর্যও নাই, দোকানে বিক্রিবাটাও তেমনি, দু'চারটি খদ্দের লাগে, সব মাল পায় না। সেই দোকানেই বস্তাটি লুকানো আছে।

—আচমকা হানা দিলে বস্তা বার করা যায়! বলল মণি।

—যায়!

—কী করব?

—তাই করতে হবে।

—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কি না!

—সেই কথাই ভাবছি। তোর সঙ্গে কেউ নেই? পাইপগুলির কী হয়েছে?

—হাকিম চাচারা কদমকে মেরে ধরে থানায় নিয়ে যাবে বলে সঙ্গে করে খেদিয়ে আনছে, ওরই কাঁধে পাইপ চাপিয়ে দিয়েছে। হেঁটে আসছে দল বেঁধে। চাচারা পরামর্শ দিল আমাকে দোকান আগলাবার জন্যে, আমি তাই সাইকেলে সত্বর এসেছি। বৈরাগীর জমি থেকে পালি কেটে জল টেনেছিলাম বলে আমার জরিমানা হয়েছে তিলকদাদা! নাকখৎ করেছি। বড়দার ঘড়ি বাঁধা পড়েছে।

—দাঁড়া আগে ভেবে দেখি, আমার যাওয়া ঠিক হবে কিনা!

—একলাই আমি সব করব তিলকদাদা! রাহুলদাদা থাকলে আমি আপনাকে ডাকতাম না। আপনি ভয় করছেন কেন?

—আজই আমি মায়ের চিঠি পেলাম কিনা! বাবা লিখেছে। আমার হঠাৎ বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে রে! সদরঘাটে মাহেফরাসদের দুটো লাশই উঠেছে এসে। পুলিস আগলে বসে আছে। গেটের কপাট বসাতে এসেছিল ওরা। শশাঙ্কর নাইটগার্ডের টিম ওদের মেরে ফেলেছে। পুলিস তো ওয়াটার গেটের কাছে ঘেঁষে না।

—ও। বলে মণি সাইকেল গড়িয়ে পুকুরপাড়ের পথে উঠে যায়।

—মণি শোন্ ভাই!

—না। বলেই মণি সাইকেলের সিটে লাফিয়ে চড়ে সাইকেল চালিয়ে দেয় সড়কমুখো বাজারের দিকে। মণির স্বরে অভিমান চলকে উঠেছে, অতীব থমথমে সেই স্বর। সে যেন ভাবতেই পারেনি, কবি তার সঙ্গে যেতে চাইবে না। এই কি তবে যুক্তি হয় যে, মায়ের চিঠি কবির সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে? মা কথা বলতে পারেন না, মা কেবল চেয়ে থাকেন! মনের চোখে কবি তার মায়ের চেয়ে থাকা দেখতে পায়। হৃদয়ের মধ্যে কে যেন ডুকরে কলের পাখির মত ডেকে ওঠে—পেপার গো!

কবি পাকুড়ের বলশালী শিকড়ের গর্তে ঢুকে ভাবে, মণি যে একলা চলে গেল! সবই কি মণিকে একলা করতে হবে? সমস্ত যুদ্ধটাই কি ওই কিশোরটির কাঁধের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তারা? একটি দৃশ্যমান বন্দুক অদৃশ্যে মণিরই কাঁধে চেপে আছে। সেই বন্দুকটা আজ অবধি উদ্ধার করতে পারেনি কবি। কবি তাহলে কী পেরেছে?

মণির এখন ওই বস্তাটা উদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরি। মণির মানমর্যাদা যেন ওই বস্তার উদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। নাকখতের অপমান, জরিমানার দংশন, বুলবনের ঘড়ি বাঁধা পড়ার সম্ভ্রম খোয়া যাওয়ার সমস্ত উদ্ধার-পর্বটি আসন্ন মনে করে উত্তেজিত মণি ছুটে এসেছিল। অথচ মণিকে কবি একা করে দিল। কবি এখন চাইছে, বাসি ছেঁড়া পরিত্যক্ত কাগজ কুড়াতে কুড়াতে মায়ের কাছে পৌঁছতে।

না, এ হতে পারে না। মনে মনে একথা বলে কবি পাকুড়ের শিকড়ে বেষ্টিত গুহাসদৃশ আড়াল থেকে বার হয়ে আসে। বুক পকেটে তার মায়ের চিঠিটা থেকে যায়।

বারবারই কবির মনে হতে থাকে, রাহুলের সঙ্গে তার একবার দেখা হওয়া দরকার। মুমতাজ আলি এবং ডাক্তাদার সঙ্গে কথা বলা একান্ত আবশ্যক। সে যে এখনও বেঁচে রয়েছে ওরা কেউ তা জানে না। হরবোলার সঙ্গেও কথা বলার প্রয়োজন ছিল। ছিল ইকবালের সঙ্গেও। প্রকাশ্য দিনের আলোয় এখন আর ডোঙা করে প্রণামপুর যাওয়া যাবে না। ত্যানাচুরার বাস স্টপ থেকে বাস ধরে বহরমপুর রওনা দেওয়া যায়। সদর ঘাটের স্ট্যান্ডে গিয়ে যদি বাস ধরার চেষ্টা করে তাহলে ঝক্কি থেকে যায়।

যায় না কি ! একথা নিজেকেই বলে কবি। রাহুল কোথায় রয়েছে কবি জানে না। দু'জন মাহেফরাসের মৃত্যুর পর রাহুল প্রণামপুরের এলাকাতেই রয়ে গেছে, নাকি বহরমপুরের দিকে গেছে কবি বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ এভাবে ঘুম তাকে জড়িয়েছে, সহসা ঘুম। এমন কেন হল ? ঘুমই যেন তাকে ঘটনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তার উচিত ছিল ডোঙা নিয়ে সেই রাতেই প্রণামপুর চলে যাওয়া, তা সে করেনি। ডোঙার অন্য আরোহীকে বলেছিল, তোমরা ফিরে যাও। কাল দেখা হবে !

শশাঙ্কমোহনের লোক বাঁধপথের উপর পাহারারত দু'জন কমরেডের উপর আচমকা কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দুজনকে কোপ মারে। জলগেটের কপাট নামিয়ে দিতে পারে না অন্যরা। ভাসমান ডোঙার উপর থেকে কবি ঘটনা সবই দেখেছে, তারই নেতৃত্বে কপাট নামিয়ে দেওয়ার গোপন কাজটি পরিচালিত হয়। এই মৃত্যুর পর প্রণামপুরের অবস্থা কেমন কবি বুঝতে পারছে না।

হরবোলা বলেছিল—জল রোকো। এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব রাহুলের। রাহুল স্থির করুক কে কে কবির সঙ্গে যাবে, তার নির্দেশেই সবাই প্রস্তুত হবে। কবি কেবল ডোঙা নিয়ে জলের উপর থাকবে, ঘটনার সময় টিমের নেতৃত্ব তার। একটা স্কোয়াড তৈরি হোক আগে।

রাহুল বলেছিল—জল রোকো আন্দোলনের একটা প্রকাশ্য দিক থাকবে। সেই আন্দোলনেরও একটা ক্রম পরিণতি দরকার। একটা বৃহৎ মিছিল নাটার বাড়ি পর্যন্ত গেছে, তারও একটা প্রতিক্রিয়া সম্ভব। এরপর আমরা প্রশাসনের কাছে যাব।

—না। জোর গলায় আপত্তি করে ওঠে হরবোলা। তারপর বলে—এমন চমৎকার সুযোগ আমরা আর না-ও পেতে পারি রাহুল। গেটের ওখান থেকে পুলিস হঠে গেছে। কোন 'ওয়াচ' নেই লক্ষণের মৃত্যুর পর। এখন যদি আমরা কোনও কনভেনশনাল মুভমেন্ট করতে যাই, মারাত্মক ভুল করব। চাবি আমাদের হাতে এসে গেছে। তুমি চাবি ছিনতাইয়ের প্রোগ্রামেও বাধা দিতে চেয়েছিলে। কেন বুঝতে চাইছ না, প্রশাসনের কাছে ধর্না অথবা হত্যে দেওয়া বা ওই রকম যে কোন ছক, দ্যাট টাইপ অফ মুভমেন্ট ইজ রাবিশ। এখন যদি এই সব কথা তোমাকেই বোঝাতে হয় তাহলে কাজ কীভাবে এগোবে ?

রাহুল বলল—স্বতঃস্ফূর্ততা যে কোনও আন্দোলনের গোড়ার কথা হলেও, আমি বলব, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কখনও সামগ্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের আধার হতে পারে না। তাছাড়া মাহেফরাসের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তও নয়, এদের উপযুক্ত রাজনীতি না দিয়েই.....তাছাড়া এইযে চাবি ছিনতাই হল, এটা বাইরের কমরেডরা এসে করে দিয়ে গেছে,

মাহেফরাসরা মনে করতেই পারে বিপ্লবটাও শহরের স্কোয়াড এসে করে দিয়ে যাবে। এভাবে হয় না। সেই কারণে আমি চাবির ব্যাপারে আপত্তি করেছি।

—তাহলে তুমি থিওরি কপচে এদের রাজনীতি দিতে চাও ?

—আপনি খতিব, অত্যন্ত জিদ করছেন !

—জিদ তো দরকার রাহুল ! বাইরের কমরেডরা এসে ছিনতাই করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, কাজটি কঠিন নয়। তাছাড়া, কারা ব্যথার চাবি ছিনিয়ে নিল, সেটি যদি ব্যথা বুঝে যায়, তা কি একটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির পক্ষে সঠিক হত ? হত না। তুমি কি চাও আমি ধরা পড়ে যাই ! চাও কি যে, জল নেমে চলে যাক আর পুলিসভ্যান ছুটে আসুক ?

—না।

—দ্যাখো রাহুল, গেটের ওখান থেকে আমরা একজন পুলিসকে তুলে আনতে পেরেছি। তাকে আমরা কাজে লাগাব।

—ঠিক আছে। আপনিই ভাল বুঝবেন। তবে লক্ষণের মৃত্য অবধারিত ছিল কিনা, আমরা ভেবে দেখিনি। তাকে আমরা কখনও পলিটিক্যালি কনভিন্স করার চেষ্টাও করিনি।

—তা করতে গেলে আমাদের ডুবতে হত রাহুল ! লক্ষণের ব্যক্তিস্বার্থ, তার জীবন মাহেফরাসের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। ও নাটা-ললিতের কোটাল।

—কিন্তু সে সর্বহারা শ্রেণীরই লোক ছিল।

—তোমার কাতরতা বুঝি, কিন্তু উপায় নেই কমরেড। ওকে মরতেই হত। তোমার হৃদয়টি হৃদয় আর আমাদের সব লোহার খাঁচা মনে করো না।

হরবোলার কথায় এবার রাহুলের চোখ দুটি ব্যথায় ভারী হয়ে উঠল। সে অতঃপর কাঁপা কাঁপা স্বরে জলগেটের কপাট রুদ্ধ করে জল রোকো আন্দোলনের প্রকৃত কাজে কে কে যাবে সেই নামগুলি উচ্চারণ করতে থাকে। স্বরটি ঈষৎ সিক্ত হয়ে যায়। নাম ঘোষণা শেষ হয়ে গেলে রাহুল নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিয়ে তীব্রস্বরে হঠাৎ স্লোগান দিয়ে ওঠে—ইনকেলাব জিন্দাবাদ। জল রোকো আন্দোলন জিন্দাবাদ। সাদা চৌধুরী জিন্দাবাদ। কমরেড সি. এম. জিন্দাবাদ।

রাহুলের চোখ মুখ এক লহমায় কঠিন হয়ে ওঠে, চোখের দৃষ্টি শাণিত আবেগে ছলছল করতে থাকে।

বুকপকেটের জামার উপর বাঁ হাতটি চেপে কবি ত্যানাচুরার বাস স্টপেজের দিকে পা বাড়িয়ে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে তাকে কেবলই নানান ভাবনা পেয়ে বসে। রাহুল এবং হরবোলার কথা মনে পড়ে বারবার। রাহুল কিছুতেই মাহেফরাসী আন্দোলনের সঙ্গে তার বাবার নামটিকে জড়াতে চাইছিল না। গোড়া থেকে বারবারই সে তর্ক করে চলেছিল, বাবার নামটি যেন কোনওক্রমেই স্লোগান না হয়ে ওঠে : শেষ অবধি কী আশ্চর্য ধাক্কায় তারই মুখে সাদা চৌধুরী পর্যবসিত হল অতর্কিত স্লোগানে, মনেই হল না ওই নামটি আন্দোলনের মৃত্তিকায় এবং জলে কখনও অসংলগ্ন ছিল, নামটিই যেন আন্দোলনের বীজ-কণিকা।

রাহুল মেনে নিতে পারে না, তবু সে মেনে নেয় কেন ? যা সে বোঝাতে চায়, তা সে বোঝাতেই বা পারে না কেন ? রাহুল মেনে নিতে পারে না হরবোলা এবং রুকসানার রহস্যময় সম্বন্ধের স্তরটিকে। হরবোলা যে দেবপ্রতিম, তা কে জানে ! একজন কলেজ-অধ্যাপকের সঙ্গে রুকসানার সম্বন্ধ কিছুতেই বাঞ্চিত হতে পারে না।

রুকসানা অসুস্থ দেবপ্রতিমকে সুস্থ করে তুলেছে, রুকু মনে করে সে খতিবের শুশ্রূষা করেছে, তা বড়ই পুণ্যের কাজ। কিন্তু সেবার ছলে হতভাগী দেবপ্রতিমের প্রেমে আসক্ত হয়েছে দিনেরাতে, এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখেছে রাহুল। রাহুল কেঁপে উঠেছে।

কেঁপে উঠেছে এবং বিচলিত হয়েছে। হৃদয়ের অকথ্য চাঞ্চল্য লক্ষ করেছে কবি। কবির পাশে রাত্রে রাহুল ঘুমাতে পারেনি। এও এক বোবা কষ্ট রাহুলের।

অসুস্থ দেবপ্রতিমের জ্বরে আচ্ছন্ন চেতনা, তিনি রুকসানার কোলে মাথা রেখে চিত হয়ে পড়ে আছেন, বারবার তাঁর জিভ শুকিয়ে উঠছে, তিনি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছেন, মাঝে মাঝে জ্বরের নিঃশব্দ বিকারে। রুকু তার প্রেমিক খতিবের অঙ্গে সস্নেহে হাত বুলিয়ে চলেছে।

কবি বলল—এই ঘনিষ্ঠতার পরিণাম কী হবে রাহুল ! ইকবাল সমস্ত জানে, অথচ বোনকে বাধা দিতেও পারে না। বা ইকবাল হয়ত এই সম্বন্ধের মধ্যে কোনও অন্যায় বা অস্বাভাবিকতা দেখে না। ইকবাল খুব উদাসীন কেন ?

রাহুল কবির কথা শুনে চুপ করে রইল।

কবি বলল—ইকবাল যেন বলতে চায়, ও কিছু নয়। কেন ?

রাহুল ঈষৎ ধরা গলায় বলল—আমি ঠিক জানি না কবি ! আমায় প্রশ্ন ক'রো না।

কবি বলল—ইকবাল কী-ই বা করতে পারে, রুকসানা ভাইকে তেরোঘরায় চলে যাওয়ার জন্য বলে, একদিন চলে যাব ঠিক, দেখে নিও, ক্রমাগত বলে যায়—এই দেখেছি। খতিবের পূজা করে রুকু, পূজা আর প্রেম, ও ঠিক জানে না, কী সে করছে !

রাহুল ধমক দিয়ে উঠল কবিকে—তুমি চুপ করবে ! আমি জানি না। কিছুই জানি না। কেন বারবার প্রশ্ন কর, বুঝি না। আবার বলছি, আমি ঠিক বুঝতে পারি না এখন। দেবপ্রতিমের বউ আছে শহরে, সন্তান আছে। একটা কথা খুব কানে বাজে কবি, খতিব ডাক্তারদাকে বলে, আমি আর পারছি না, এই ছদ্মবেশ ভাল লাগে না, আমাকে বেরিয়ে আসতে দাও। সেই তীব্র আকুলতা দেখে মুমতাজের ভয় করে।

কবি বলে—রুকসানা একটি ছদ্মবেশকে ভালবেসেছে, কিন্তু একথা সে জানে না রাহুল !

রাহুল বলল—খতিব কোনও ছদ্মবেশ নয় কবি। ছদ্মবেশ নয়—ইকবাল হয়ত ঠিক তাই-ই মনে করে। আমি ঠিক জানি না।

—কেন এমন হচ্ছে তোমার ? তুমি জান না কেন ?

—ঠিক এই রকমই হয়েছিল একদিন। যখন কদম আলি রাত দেড়টায় সদরঘাটের হোটেলে বাপুকে থানার লকআপে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুস নেয় ও. সি-র কাছে এবং সেই টাকায় ভাত কিনে খায় এবং আমাকে ডাকে, 'আসো রাহুল দাদা, দু'মুটা খাই।' কী অবলীলায় খেতে ডাকে নিরাপরাধীর গলায় ; ভেবেছি, কদমের ওই মনটা তবে কী ? অমন করে ডাকতে পারে মানুষ ! বিস্মিত হয়েছি, কিন্তু ঘৃণা করতেও পারিনি। আমি রুকসানাকে ঘৃণা করি না, ইকবালের মনটা যে কী তাও জানি না, তবে তার ওই উদাসীনতার ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে। আর দেবপ্রতিম ? কিংবা খতিব ? জানি না ভাই। জানি না।

রাহুল চাপা আর্তস্বরে কেমন যেন করে উঠেছিল। কবির কানে সেই আর্তসুর বাতাসে ভেসে এসে ফিসফিস করতে থাকে, কবি হেঁটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ সে তার গন্তব্যের দিশা ঘুরিয়ে দেয় অন্য পথের দিকে। তার একবার মৃতদেহ দুটি দেখতে ইচ্ছে করে। সে ভাবে, ভিড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে নেবে এক পলক, তারপর

কেটে পড়বে।

সদরঘাটের জলঘেরের দিকে এগিয়ে যায়। খাঁকি পোশাকের পুলিসদের দেখতে পায়। পুলিস দেখে সহসা তার মনটা কেঁপে ওঠে কেন সে বুঝতে পারে না। তাকে কি তারা ঠিক চেনে ? ওদের পক্ষে যে-কোনও মুহূর্তে চিনে ওঠা বিচিত্র নয়।

কবি আবার বুক পকেটে হাত রাখে। একটি চারা পাকুড়ের তলে চায়ের দোকানে বেঞ্চের উপর বসে। গাছটির ডালে একটি টুনটুনি পাখিকে দেখতে পায়। এই সময় টুনটুনি পাখি বড় একটা দেখা যায় না। ওটা কীভাবে কোথা থেকে শীর্ণ ডালটির পাতার আড়ালে বসেছে এসে। কবির মনে পড়ে বেড়াল আর টুনটুনির কাহিনী। মনে পড়ে একটি প্রচ্ছদ, তার আড়ালে ছিল একটি রাজনৈতিক ইশতেহার, সেটি ডাকযোগে তারক গাঙ্গুলির পোস্ট অফিসে আসে। চিৎপুরের ঠিকানায় মুমতাজ আলির নামে সেটি যাচ্ছিল, C/O ছিল সাদা চৌধুরীর নামে। তারক গাঙ্গুলির শিশুপাঠ্য গল্পে কৌতুহল সীমাহীন, তিনি বেড়াল আর টুনটুনির গল্পটিকে মোড়ক খুলে পাঠ করতে চাইলেন। অতঃপর সেই ইশতেহার আর চিৎপুর পৌঁছলো না। সাদা চৌধুরীকে কালোগাড়ি বাড়ির খুলান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। টুনটুনির দিকে আবার চেয়ে দেখে কবি। জামার বুক পকেটে চিঠির ওপর হাত রাখে।

পুলিসেরা এই দিকেই এগিয়ে আসছে, এক দঙ্গল মানুষ তাদের ঘিরে সামনে পিছনে চলেছে। বাজারমুখো চলেছে ওরা। হাকিম চাচা, বুলবন এবং একটি সুন্দর কিশোরীকে দেখতে পায় কবি, অর্থাৎ মোহরকে দেখে, হঠাৎ মনে হয়, বাজারের ওদিকে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে তাহলে। মণি কি অতঃপর কোনও ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পেরেছে ? নাকি, অন্য কোনও কারণে পুলিস ওই দিকে চলেছে ? তাহলে বুনবন এবং হাকিম চাচা পুলিসের সঙ্গে কেন ?

নানান বিচিত্র ভাবনা কবির মনে তরঙ্গ তুলছিল, হঠাৎ কে একজন পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত রাখে। পিছন ফিরে চাইতেই তিমিরবরণ মিচকি হেসে ফেলে।

—কমরেড !

—আমি কোনও কমরেড নই তিমিরবাবু।

—ডোঙায় চড়তে যাও না আর, দেখি না যে বড়। রাহুল কোথায় হে ? চল, মণি একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে, দেখে আসি।

—না।

—আহা চলই না !

—মণিকে আমি চিনি না। কে মণি ?

—রাহুলের ছোটভাই মণি পাগলা।

—না।

—না, কী ? যাবে না ? তুমি শহরে, মানে কলকাতায় আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছিলে ? অ্যাকসন করেছ ? রুটিতে কেরোসিন মাখিয়ে ছুঁড়তে পার ? বোমা বাঁধতে পার ?

—এই সব কথার মানে কী ?

—ইকবালের সঙ্গে দেখা হয় ?

—না।

—দু'জন মাহেফরাস মার্ডার হয়েছে, দেখলে ?

—না।

—ঠিক আছে, চল। পুলিস শশাঙ্ককে অ্যারেস্ট করবে মনে হচ্ছে। চল দেখি! আমরাও শ্রেণী-সংগ্রাম কম বুঝি না। আচ্ছা—

—বলুন।

—তোমরা চীনপন্থী, আমরা রাশিয়ানপন্থী, গোড়ায় আমরা একই অখণ্ড পার্টিতে ছিলাম। তোমরা হলে আলট্রা, উগ্র। এত উগ্র যে লক্ষণের মত গরিবকেও মেরে ফেলে দিলে। এটা অন্যায় হয়েছে। শহরের ছেলে এসে গাঁয়ে গরিবে গরিবে হাঙ্গামা বাধাবে এ আমরা সহ্য করতে পারব না। তুমি ফিরে যাও। তোমাকে চুপ করে বলছি।

ক্রোধে এবার কবির নাসিকা নিঃশ্বাসে স্ফীত হয়ে ওঠে।

—আমি এখানে পড়াশুনা করতে এসেছি তিমিরবাবু।

—না, তুমি তা আসনি। তুমি প্রণামপুরকে ভিয়েতনাম বানাতে এসেছ, থানায় রিপোর্ট এসেছে।

—আপনি কী করে জানলেন?

—খবর পাই। আমাদের গাঁয়ে কেন আলট্রার অত্যাচার হবে? তুমি কিন্তু খুব সন্দেহজনক কবি। কবি তোমার নাম নয়। মামাটি এবার আর তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি ফিরে যাও।

—ঠিক আছে, আমি ফিরেই যাব। তাই যাচ্ছি। বলে কবি উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে—আপনি কিন্তু ভুল করছেন তিমিরবাবু! আমি আলট্রা নই, ভিয়েতনামী নই। তবে তোমার মত জোতদার-ভূস্বামী আর সর্বহারা গরিবের মাঝখানে আপোসকামী দালাল-শক্তিও নই। বিশ্বাস করি না সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে এদেশে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হবে। এটা ডাহা চাতুরি।

—চোপ!

—চোখ রাঙাবে না।

কবি পা বাড়ায় বাজারের দিকে। সাইকেল গড়াতে গড়াতে পিছু পিছু এগিয়ে আসে তিমিরবরণ।

তারপর গলার স্বর বদলে শান্ত এবং মিষ্ট গলায় তিমির বলে—শোন ভাই তিলক। তারক মাষ্টারের ভাগ্নে তুমি, খারাপ কথা শোভা পায় না। তুমি আলট্রা নও, চেয়ারম্যানের চেলা নও, তুমি মহাদেব বা সত্যনারায়ণের জিগিরেও বিশ্বাস কর না, ফের কিন্তু লিন পিয়াওয়ের বন্দুকবাজী ভালবাস।

—না।

—পুলিস রাহুলদের বাড়ি বন্দুক খুঁজতে এসেছিল কিন্তু!

—আমি তার কী করতে পারি?

—বাড়ি ফিরে যেতে পার, তোমার গ্রুপটার নাম কী কবি।

—আমার কোনও গ্রুপ নেই। আমি ছাত্র।

—কার ছাত্র শুনি।

—বিজ্ঞানের।

কবি বুঝতে পারছিল, তিমিরের কণ্ঠস্বরটি পুলিসেরই কণ্ঠস্বর। নাটা ললিত এবং থানার মধ্যবর্তী একটা দোলায়মান অবস্থানে দাঁড়িয়ে লোকটা এক অদ্ভুত শেয়াল-বৃত্তির পোষকতা করছে, রাজনীতি নেই, কাজ নেই, এখন প্রশাসনের গুপ্তচরের মতন সি. এম. এর রাজনীতির ধ্বংস সাধনে লিপ্ত। সর্বাগ্রে একেই হত্যা করতে পারলে জুৎ কাজ হয়।

—একই অখণ্ড পার্টিতে ছিলাম তিমিরবাবু, তাই না !

—হ্যাঁ।

—তবু এত বিদ্বেষ কিসের দাদা ?

—বিদ্বেষ কেন হবে !

—ইতিহাসে এই বিদ্বেষেরও একটা এক্সপ্লানেশন আছে। লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে মার্কসবাদকে দোহন করে রাজাউজির হওয়ার চেষ্টা যারা করে, তারা শোধনবাদের পাণ্ডা। এরাই প্রতিবিপ্লব ঘটায়, এরা মার্কসবাদের প্রাণসত্তাকে মারে। তার আগে আমাদের মারতে চায়। আমি ফিরে যাব না তিমিরবাবু !

—কী বলছ ভাই তিলক ! তুমি তাহলে এখনও চেয়ারম্যানের রাজনীতি কর ?

—না। করতাম।

—বাড়ি ফিরে যাও। মা তোমাকে ডাকছেন।

—যাই।

বলেই কবি বাজারের দিকে দৌড়তে শুরু করে। দেখে একটি কালো পুলিসভ্যান রানীনগর থানার দিক থেকে হাসপাতালের রাস্তা দিয়ে বাজারেই ঢুকে আসছে।

শশাঙ্কর দোকানের সামনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে কবি। ওকে দেখেই মণি চমকে ওঠে। চাপাস্বরে বলে—বস্তায় মাল আছে।

—কদমের কোমরে দড়ি ?

—হ্যাঁ।

—শশাঙ্ক ?

—উনি চোরের সাধ্। সাধু। মিচকে, খুনী। শালা ! ওই দেখুন। লেকচার দিচ্ছে।

প্রচুর ভিড়ের মধ্যে তারক গাঙ্গুলিও থানার ও. সি-র সঙ্গে, অন্যান্য বাবুদের সঙ্গে কথা বলছেন ক্রমাগত। হঠাৎ কবির দিকে তাঁর চোখ পড়ে। তিনি খুব দ্রুত কবির কাছে চলে আসেন রাস্তাটার কাছে।

চাপাস্বরে বলেন—তুমি কেন ? বাড়িতে থাকতে পারলে না ? চলে যাও।

—যাই।

—কলকাতা চলে যাও।

—যাই।

—পুলিসের মাথা খারাপ হয়েছে। যাও। দেরি করো না।

—মায়ের চিঠি, মানে বাবার চিঠি পেয়েছি মামা।

—হ্যাঁ, চলে যা তিলক, থাকিস না !

কবি মণির গায়ে হাত রেখে বলে—আমি চললাম মণি। তোর কাছে জিনিসটা রইল।

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে কেন যেন হঠাৎ দৌড়তে থাকল নশিপুরের ফুটবল ফিল্ডের দিকে, তারপর কী মনে করে সেদিক থেকে হঠাৎ ফিরে আসে এবং হাসপাতালের দিকে ছুটে যায়। বোঝা যাচ্ছিল হাসপাতালের স্টপে এসে শেখপাড়া বা লোচনপুরের বহরমপুরগামী বাস ধরবে। হঠাৎই তার এই ছুটে যাওয়া দেখতে পান দারোগা। অম্বরীশলালও থানার টিমের সঙ্গে ছিলেন, তিনি লাশ দেখতে এসেছিলেন।

ললিত সহসা বললেন—ওটাকে আপনি অ্যারেস্ট করতে পারতেন এস. পি সাহেব !

—কে ?

—কবি, টেকনেম।

—ও, ইয়েস। মুভ অন। চরম তৎপর শোনায় অম্বরীশের গলা।

কবি দেখে, বাসটি এসে দাঁড়িয়েছে। বাসটি ছেড়ে দেওয়ার আগেই লাফিয়ে ওঠে পাদানিতে। বাস ছেড়ে দেয়। সদরঘাটে এসে বাসটি দাঁড়ানো মাত্র, ডোমকল লাইনের একটি বাস ছাড়ছে দেখে লাফিয়ে নেমে কবি ছুটে গিয়ে সেটির পাদানিতে ওঠে। সাইকেল তাড়িয়ে ছুটে এসেছে তিমির। কবির হাত ধরে সজোরে টেনে নামিয়ে ফেলে।—যাও কোথা! সোল্লাসে বলে ওঠে তিমিরবরণ। কোমরে দড়ি বাঁধা কদমের পাশে কালোভ্যানে বসতে পায় কবি, ভ্যানটি থানার হাজতে কবিকে নিয়ে যায় তারপর। তার বুক পকেটে থেকে যায় বাবার চিঠিখানি, সে শুনতে পায় একটি কলের পাখির গান—পেপার গো!

॥২৭॥

নাটা তরফদার খুব ভোরবেলা চৌধুরী বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। একাই এসেছেন তিনি। মাথায় তাঁর নামাজী টুপি, কপালে সিজদার ধূলা। দাড়িতে মক্কার আরবী আতর এই প্রত্যুষে বাতাসকে প্রসন্ন করে তুলেছে। দাড়ি রেখেছেন কিছুদিন আগে, পূর্বে মুখ কামাতেন।

তরফদারকে চা খেতে দিয়েছেন আয়েষা। নাটা বসে রয়েছেন একটি কাঠের চেয়ারে, কাছেই টেবিল, টেবিলে রাখা কাপে চা, প্লেটের উপর। হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে খাচ্ছেন সুড়ুৎ করে সশব্দে। সামনে চৌকির প্রান্তে বসে রয়েছে চন্দ্রিমা। ভোরে মাঠে চলে গিয়েছে বুলবন। আয়েষা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর আঁচল ধরে রয়েছে নূপুর।

—আপনি কিছু বলবেন বুঝি! কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর প্রশ্ন করল চন্দ্রিমা।

—আমি একটা খুব বদ খুয়াব দেখেছি বউমা। কাজে কাজেই আসা। ফজরের নামাজ শেষ করার পর মনটা বড়ই চঞ্চল হল।

বলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকেন নাটা। চন্দ্রিমা এবং আয়েষা চুপ করে অপেক্ষায় থাকেন, তরফদার কখন প্রকাশ করেন কোনও বিপজ্জনক উক্তি।

—না, বউ, আমি যার পর নাস্তি চঞ্চল হয়েছি, খুদা কসম মা! বুলবনের এই শখের ঘড়িটা......বলতে বলতে তরফদার জামার পাশের পকেটে হাত ঢোকালেন। চেন ধরে টেনে বার করলেন ঘড়ি।

সামনে মেলে ধরে বললেন—এটা তুমি ফেরত নাও মা। হাকিমের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমরা একটা ফয়সালা করতে পারি। থানার হাতে আমি দেশ শাসনের বরাত কেন দেব, আমরা মিটিয়ে নিতে পারি না? তুমি ঠাণ্ডা বুদ্ধির মেয়ে, তোমাকে সব অবস্থা বিচার করতে হবে। আমি দু'নোকতা কথা বলব খালি।

—বলুন।

—ঘড়িটা তোমার মায়ের দান। এটা রাখো। উপহারের জিনিস। সাচ্চা জুবানে বলছি বউমা, শশাঙ্ক কাজটা ভাল করেনি। শেষে চুরি করালো, এটা অন্যায়।

চন্দ্রিমা সহসাই উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়িটা গ্রহণ করে বলে—ঠিক আছে। তাহলে ফয়সালা

হয়ে গেল।

—না বউ মা, আর একটু আছে।

—বলুন।

—বাবুকে খুয়াবে দেখেছি, তিনিই ঘড়ি ফেরত দিতে বলেছেন। আর বলেছেন, আমার ফ্যামিলিকে ধ্বংস করে দিও না তরফদার। তোমারও বিবেক আছে বউমা, তুমি ভেবে দ্যাখ!

—আর কী?

—তুমি আমার বৈঠকে ওষুধ বিলি করবা। আগেও বলেছি তোমাকে।

—ঠিক আছে, তাই করব।

—তিমির যে তারকের ভাগ্নেকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিলে, এটাও জবরদস্ত অন্যায় হয়েছে বউ চন্দ্রিমা। কলকাতার ছেলে, স্টুডেন্ট, ও বেচারি ডোঙায় চড়ে গাঁ দেখে বেড়াত, মাহেফরাসের আন্দোলনের কী বুঝবে! তাছাড়া রাহুলের বন্ধু।

—রাহুলের বন্ধু কিনা জানি না, তবে একই কলেজের ছাত্র ওরা।

—তাই হবে।

বলে উঠে দাঁড়ালেন নাটা তরফদার। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

তারপর বললেন—ওই কথাই রইল তাহলে দোলা! তুমি যাবে।

—যাব।

—আমরা দুজনেই চাই যে, এ গাঁয়ে পুলিস আসা বন্ধ হোক।

—হ্যাঁ।

—খুন বন্ধ হোক। গুমানি শান্ত হোক মা।

—তাই হবে। চেষ্টা করব আমি চাচাজি।

—আমার বন্দুক আর ব্যথার চাবি তুমি ফেরত দিবে চন্দ্রিমা। আমি ঘড়ি ফেরত দিয়ে গেলাম।

—আমি তাহলে যাচ্ছি না তরফদার সাহেব। পারব না।

তরফদার বাইরে বেরিয়ে এসে মুখমণ্ডল মুহূর্তে কঠিন এবং মুহূর্তেই কোমল করে বললেন—সত্যিই তাহলে আর যাওয়ার দরকার নেই দোলাবিবি!

চন্দ্রিমা বলল—প্রথম থেকেই আপনি ওষুধ বিলি করার কথা বলছেন। ফের আমার কাছে বন্দুক আর চাবি ফেরত চাইছেন।

—চাইব না? আমার যে নিঁদ হয় না বউ।

—আগেও বলেছেন আপনি।

—তুমি আর যেও না। আর বলব না। পুরনো সম্বন্ধ ছিল বাবুতে আমাতে। সেটা তুমি রাখতে চাও না। এই গাঁয়ে থাকতে হলে পলিটিক্স ছাড়তে হবে। তোমাকে খুব সহজ কথাটা বলে গেলাম।

—কথাটা খুবই কঠিন চাচাজি। মাহেফরাসরা আমাকে চাবি দেবে কেন?

—তুমি চাইলে দিবে না? তুমিই ওদের খেপাচ্ছ, তোমার দেওর রাহুল এই ঘটনায় আছে বলে তুমি তো স্বীকার কর না। অতবড় মিছিলটা এল কোথা থেকে?

—আরও আসবে চাচা। মানুষ তার অস্তিত্বের কারণে আসবে। আপনি এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে চৌধুরী ফ্যামিলিকে কস্মিনকালেও জড়াবেন না। আপনার বন্দুক এবং চাবির

জন্য এই পরিবার দায়ী নয়।

—তুমি দায়ী। তুমি গাঁয়ে আসার পর এই সমস্ত ঘটছে।

—আমি না এলেও এ জিনিস ঘটত।

—না ঘটত না। যদি ঘটতই তাহলে কে ঘটাতো সেটা ? রাহুল ?

—না রাহুল কেন ঘটাতে যাবে। আপনাকে স্পষ্ট বলছি, রাহুল এই ঘটনার মধ্যে নেই। আমার শ্বশুর সাদা চৌধুরীও এই ঘটনার মধ্যে ছিলেন না।

—তাহলে সাদাবাবুর নামে পোস্টার হয় কেন ? স্লোগান হয় কিসের তাড়নায় ? কে করে ?

—মাহেফরাস করে।

—কে করায় মা ?

—আমি।

আয়েষা এতক্ষণে ডুকরে উঠলেন—তুমি চুপ কর বউমা, আর কথা ব'লো না। উনাকে চলে যেতে বল। আমি উনার খুয়াব বিশ্বাস করি না। তুমিও বিশ্বাস ক'রো না। কী কষ্ট খোদা গো ! বলে আয়েষা মুখে আঁচল চেপে ধরেন।

সামান্য ভয়ে স্বল্পস্ফুট স্বরে নূপুর বার কতক 'মা' 'মা' করে ডেকে ওঠে, মায়ের কষ্ট দেখে এতটুকুনি মেয়ের কান্না পেয়ে গিয়েছিল। বউদিকে বুলবন ভাইয়া পর্যন্ত কখনও কড়া কথা বললে নূপুর সইতে পারে না। নাটার উষ্ণ কথায় নূপুরের মনে জোর আঘাত এসে পড়ছিল বারংবার। নূপুর যখন সইতে পারে না, তখন সে শান্ত চোখে কেঁদে গণ্ডদেশ ভাসিয়ে দেয়, একটু একটু ফোঁপায়। এখন সে একটু একটু কাঁপছিল অদম্য অস্ফুট দমিত কান্নার বেগে, তার অন্তর কী উদ্বেল হয়েছে !

নূপুর দেখল তরফদার চাচা তার মায়ের দিকে কটমট করে চেয়ে হাতের রূপার গিল্টি বাঁধানো তেলপাকানো লাঠিটা মাটি থেকে শূন্যে বারবার উঁচিয়ে উঁচিয়ে তুলছেন আর বারান্দার মেঝেয় ঠুকছেন। বউদিকে চাচা বুঝি মারতেও চায় !

—ধর্ম যদি সত্য হয় আয়েষাবিবি, তবে আমার খুয়াবও সত্য। তুমি আমাকে অপমান করলা। বাঁচতে যদি চাও দুটি শর্ত পালন করতে হবে। এক নম্বর শর্ত ঘরের বউকে নামাজ রোজা করিয়ে ধার্মিক বউ করবা। দুই নম্বর হল, পলিটিক্স বন্ধ করতে হবে, ঘরের বউ ঘরে থাকবে। আমি মজলিস ডাকছি। আমি ছাড়ব না।

বলতে বলতে এগিয়ে যান নাটা তরফদার। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন—আমি মনে করি বুলবন আর চন্দ্রিমার সম্বন্ধ অবৈধ। কারণ এদের নিকাহে কোনও দোয়াকালাম হয়নি। 'মিরাজ' ঠিকই লিখেছে। বউকে পলিটিক্সে নামানোর আগে এই দুটি শর্ত পালন করা উচিত ছিল। তা তুমি করনি আয়েষা ! সেই ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। বাবু ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব ভেবেছিলাম, এখন দেখছি...

—তাই হোক। বাবু ফিরে এলে ওই কথা তুলবে তরফদার, এখন তুমি যাও। অসহিষ্ণুর মত সকাতরে বলে উঠলেন আয়েষা।

—বাবু কি ফিরতে পারবেন ! সবই খোদার ইচ্ছা। চলি, তবে তার আগে, বউকে নিজেই তুমি একটু আধটু দোয়াকালাম করিয়ে নিতে পার, না হলে পাপ হয় আয়েষা খাতুন। সেই পাপে বাবু আর না ফিরতেও পারেন। বলতে বলতে রাস্তায় নেমে চলে যান নাটা তরফদার।

রৌদ্রতাপে বুলবনের মুখমণ্ডল টকটক করছে এই দ্বিপ্রহরে, কাঁধে তার শুকনো

কাদা-মাখা কোদাল। পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা গেঞ্জি। লুঙ্গির ঝুলন্ত প্রান্তভাগ পায়ের কাছে থেকে তুলে কোমরে গুঁজেছে, তাকে দেখায় যথার্থ মুনিষেরই মত। ঘর্মক্লান্ত দেহ, সেদ্দ হয়ে যাওয়া বেচারিকে অত্যধিক অবসন্ন দেখাচ্ছিল। সে তার শোবার ঘরটির উঠোনে লাগোয়া বারান্দার একটি থামের কাছে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে।

জোহরের নামাজের পর আয়েষা দোতলার বারান্দায় জায়নামাজে বসে কাঠের রেহেলের উপর কোরান রেখে গুঞ্জিত স্বরে পাঠ করে চলেছেন আয়াতমালা। কানে আসছে বুলবনের।

—স্নান করবে না ?

—করি। চন্দ্রিমার কথার জবাব দেয় আনমনা।

—এইভাবে তুমি পারবে না বুবন। কখনও তো অভ্যাস করনি। কাঁধে কিসের দাগ ?

বুলবন নিজেরই কাঁধ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করে এবং হাত বুলিয়ে নেয়, দৃষ্টি ঠিক পৌঁছায় না, সরাসরি। যেটুকু সে দেখে, তাইতেই বুঝতে পারে, ছড়ে গেছে, রক্ত জমেছে, ব্যথাও অসম্ভব।

—একটু ডেটল লাগিয়ে দেব ?

—না।

—যদি কিছু হয়ে যায় !

—কী হবে ? কিছুই হবে না। চাষের কাজ করে যারা, তাদের জীবন অনেকটাই প্রিমিটিভ, লাগে-টাগে, পরোয়া করে না। শরীরের নাম মহাশয়, শুনেছ কখনও ?

—শুনেছি।

—মহাশয় বলে কেন ? একে যা সওয়াবে তাই সইবে। জেল-হাজতে, থানায় যেসব অত্যাচার চলছে, মানুষ সইছে না ? কবির উপর কী নিদারুণ নিগ্রহ হবে কেউ বলতে পারে না। প্রণামপুরে গিয়ে তুমি কী বুঝলে ?

—কিছুই বোঝা যায় না। তিনদিন মাত্র গেছি, ওষুধ বিলি করেছি। ইতিমধ্যে দু'জন মাহেফরাসের প্রাণ চলে গেল। ওরা যা করে হোক গেটটা বন্ধ করতে চাইছে। কে যে ওদের নেতা, বুঝতে পারিনি। ইকবাল আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি। রাহুল ওখানে নেই বা থাকলেও আত্মগোপন করে আছে।

—পুলিস খুব সজাগ, তোমাকে বলে দিচ্ছি। নাটা এবং ললিতের লোক ওখানে আছে, তারা বা কোনও একজন থানায় খবর দিচ্ছে, রাহুলের দল বুঝতে পারছে না। আবার এমন হতে পারে মারধর করে কথা আদায় করবার জন্য কবিকে থানা অ্যারেস্ট করেছে।

—আমি কী করব তাহলে ?

স্ত্রীর এই প্রশ্নে বুলবন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল—তুমি পলিটিক্যালি ওদের হোল্ অরগানাইজেসনকে কনভার্ট করতে পারবে না।

—কেন ?

—তোমার কথা ওরা শুনবে না।

—নাটা তরফদার খুব ভোরে, তুমি মাঠে বেরিয়ে যাওয়ার পর এসেছিলেন। আমার কাছে বন্ধুক এবং চাবি চাইলেন। আমি কোথায় পাব ? পাগলের মত করছিলেন।

—লোকটা ভয় পেয়েছে।

—কিন্তু আমাদের ভয় দেখালেন।

—গন্ধ শুঁকছে লোকটা, বাবার বন্ধু। তুমি কতটা ইনভলভড় জানতে চাইছে।

তোমাকে এখন যদি থানা অ্যারেস্ট করে বিস্মিত হব না।

—আমি বলেছি, মিছিল আমারই উদ্যোগে হয়েছে। রাহুল এই ঘটনার মধ্যে নেই।

—আলটিমেটলি তুমি তাহলে রাহুলের রাজনীতিই করছ। কখন যে তুমি চীনের বিপ্লব কপি করার কাজে নেমে পড়েছ, আমি বুঝতেই পারিনি।

—দ্যাখো বুলবন এভাবে কথা বলবে না। তুমি আমার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেই পার, আমি নতুন মানুষ, এই জলও কখনও দেখিনি,গ্রাম-জীবনও ততটা বুঝি না, আমার সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু তাই বলে আমার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে এত অবজ্ঞা কেন? কমরেড সিনহা নির্দেশ করেছিলেন বলেই আমি প্রণামপুর গেছি। পার্টির নির্দেশেই গেছি।

—তুমি রাহুলের জন্য গেছ।

—যাব না?

—না।

বুলবনের এই 'না' বলার মধ্যে কী যেন ছিল, চন্দ্রিমার চক্ষুদু'টি আহত হয় দৃষ্টিসীমায় এবং দৃষ্টি সরু হয়ে ওঠে।

—রাহুলের তবে কী হবে!

—এই ভাবাবেগ অত্যন্ত মারাত্মক চন্দ্রিমা। এই পরিবারটার কী হবে তা কখনও ভেবে দেখেছ? নাটা রাহুলকে ভয় পায়; তুমি নাটাকে ভয় পাও না!

—রাহুল এই পরিবারের বাইরে নয় বুবন। আমার দেওর সে। তার কিছু হয়ে গেলে......তার রাজনীতি আমার কাছে বড় নয়, কিন্তু তার জীবনের দাম আছে। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

—পার্টিকে বোঝাতে পারবে?

—তা-ও হয়ত পারব না।

—তুমি বোঝাতে পারবে, তুমি যা করনি, কেন সেই মিছিলের ক্রেডিট তুমি নেবে? তুমি কোনও পোস্টার লেখনি, তবু কেন লিখেছ বলে ব্যথাকে ধোঁকা দাও! এই আবরণটা কিসের!

—আমি বাধ্য হয়েছি বুলবন।

—তুমি আমার সঙ্গে আলোচনা করনি। তুমি একটা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে ডোঙা চালিয়ে চলে গেছ।

—রাহুলকে রক্ষা করা আমি কর্তব্য মনে করেছি।

—তুমি আমাকে আর কর্তব্য শেখাবে না দোলন। রাহুলের রাজনীতি আজ তোমাকে এতটাই বশীভূত করে ফেলেছে? তুমি যে ডিফারেন্ট, তা তো কই মাহেফরাসরা বুঝতে পারল না!

—সেটা তো তিন দিনে বোঝানো যায় না। সেই অবকাশই করে উঠতে পারিনি। আগে প্রবেশ করতে দাও!

—তোমাকে আর প্রবেশ করতে হবে না চন্দ্রিমা। পারবে না।

—নিশ্চয় পারব। আমি কোনও ভুল করিনি।

—জিদ করো না। তুমি কতটুকু সাঁতার জানো? কতটুকু? বল, চুপ করে থেকো না। সহসা উন্মত্তের মত উত্তেজিত হয়ে ওঠে বুলবন। তার চোখ দুটি অদ্ভুত উত্তাপে দীপ্র হয়ে ওঠে। স্বামীর এমন উত্তেজনা কখনও দেখেনি চন্দ্রিমা।

চন্দ্রিমা খাদের গলায় বলে ওঠে—সামান্য। খুব সামান্যই জানি।

তারপর বলল—জানি না সাঁতার।

এবং একটু পর চন্দ্রিমা স্বর ঈষৎ শক্ত করে বলল—কবি এক ফোঁটাও সাঁতার জানে না। একটুও না। এই কয়দিন আমি কেবল এই একটা কথা ভেবেছি, কবি সাঁতার না জেনেও ডোঙা চালিয়ে ফিরেছে। কী করে পারল? থানাকে যদি বলা যায়, কবি সাঁতার জানে না, তাহলে কবিকে থানা ছেড়ে দেবে না?

—তুমি বলবে?

—কেউ যদি গিয়ে বলতে পারে?

—কেউ পারে না।

—পারে না?

—না।

—মণি বলছিল, কবি ওর মায়ের চিঠি পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল, তিমির ওকে ধরিয়ে দেয়।

—তুমি থানায় যাবে? ও. সি-কে বলবে কবি সাঁতার জানে না! আমি মনে করি, তুমি পাগল হয়ে গেছ চন্দ্রিমা। তোমাকে কিছুতেই সুস্থ বলা যায় না। কাল তুমি আমার সঙ্গে বহরমপুর পার্টি অফিসে যাবে। আজ বিকেলে সদরঘাট যাবে। শরৎ সেন্টিনারি প্রোগ্রামের কালেকশন হবে। মোহর, আমি এবং তুমি, আরও দু'জন নতুন কমরেড মিলে তহবিল সংগ্রহ করব, প্রপাগাণ্ডাও হবে একই সঙ্গে। একটা হ্যান্ডবিল ছাপতে দিয়েছি ডোমকল প্রেসে, সেটি আজ প্রেস ডেলিভারি দেবে বলেছে। তুমি আর প্রণামপুর যেও না।

—আমাকে যেতেই হবে।

—আগে পার্টির সঙ্গে কথা বল, অযথা আমাদের বিপন্ন ক'রো না। রাহুলকে ভুলে যাও চন্দ্রিমা!

—এই কথা তুমি বলতে পারলে? আমি প্রণামপুর যাব না! আমি ভুলে যাব! না, এ হতে পারে না? একটু বাদে আমি মণিকে সঙ্গে করে প্রণামপুর যেতে চাই। রাত্রে না-ও ফিরতে পারি।

—প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার ভুল হচ্ছে চন্দ্রিমা।

—মাহেফেরাসদের বলেছি, সমস্ত অবস্থায় আমি তাদের সঙ্গে থাকব। ওদের গভীর আস্থা অর্জন করতে হলে আমার আর পিছিয়ে আসা চলে না।

—আস্থা অর্জনের সময় তুমি পাবে। আবার বর্ষা আসবে, খাল বিল নদী নালা জলে ভরে যাবে, চন্দ্রিমা। এবারের মত জল বার হয়ে যেতে দাও।

—মাহেফেরাস সেই কথায় রাজী হবে না বুলবন। তেমন সংগঠন ওদের নয়।

—এই সংগঠনের পিছনে আমাদের রাজনীতি নেই। এই সংগঠনের শক্তি তোমার নয়। এই জল চলে যেতে দাও।

—নাটা এবং ললিত এই জলের অন্তর্ধান চান। এই প্রস্তাব আমার হতে পারে না।

—তুমি কেন ভুল কথা বলছ, আমি ললিত নই চন্দ্রিমা!

—কবির কষ্ট যদি তোমার বুকে না বাজে, তবে বুঝব কমরেড জি এস-এর রাজনীতি তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমার পদক্ষেপে কোথাও ভুল নেই।

—শুধুমাত্র কোনও গভীর আত্মবিশ্বাস সত্য প্রমাণ করে-না।

—সৎ এবং গভীর আত্মবিশ্বাসীর আত্মত্যাগের দাম খুব খাটো নয় বুলবন। ইতিহাস তাকে মনে রাখে। কিন্তু সত্য জেনেও যে আত্মবিশ্বাস পায় না, সত্য যতই সত্য হোক, সেই সত্য তাকে ছেড়ে যায়। এইভাবে বুঝি।

—নিজের উপর এই অতিরিক্ত বিশ্বাস ভাল নয় কমরেড। কমরেড জি.এস-ও বোধকরি ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তোমার রাজনীতি আর তুমি আজ আলাদা হয়ে গিয়েছে। রাহুলের মোহ আজ তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়েছে।

—মোহ !

—থাক, আর কথা নয়। তোমাকে যা বলেছি তা না বোঝার মত সরল বুদ্ধি তোমার নয়। শুধু এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, তোমার ভুল পদক্ষেপ যেন এই পরিবারকে বিপদে না ফেলে। আমি বেকার, মণি আমাদের অন্নদাতা। নাটা-ললিতের আক্রমণ প্রতিহত করার মত সংগঠন একদিনে গড়ে ওঠে না। আগে এই এলাকায় আমাদের একটা স্ট্রং ইনটেলেকচুয়াল সাপোর্ট দরকার ছিল। শরৎ সেন্টিনারি প্রোগ্রাম তাই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

—ছিল এবং আছেও। তুমি এবং মোহর সেই কাজ করছ না কি ? কমরেড সিনহা আমাকে প্রণামপুরে খামাকা যেতে বলেননি। তুমি কেন সে দিন তাঁকে আমার মোহগ্রস্ততার কথা বোঝাওনি ?

—একেই যান্ত্রিকতা বলে চন্দ্রিমা। আজ পরিস্থিতি অন্য। তিন তিনটে খুন হয়ে গেছে। এই ঘটনার পর পার্টি নেতৃত্বের কাছে তোমার নির্দেশ চাওয়া উচিত ছিল। কবি অ্যারেস্টেড। 'মোহ' শব্দটি আমি অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রয়োগ করেছি।

—আমি প্রাণদাকে চিঠি লিখেছি সমস্ত পরিস্থিতির কথা জানিয়ে।

—তাই নাকি ? কই আমায় তো বলনি !

—বলেছি, তোমার মনে নেই।

—কখন বলেছ ?

—গত পরশু রাতে।

—অ। কখন ?

—জানি না, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কিনা।

বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রিমা বারান্দা ছেড়ে দোতলায় উঠে চলে যায়। চুপচাপ থম মেরে বসে থাকে বুলবন, তার আর নড়তে ইচ্ছে হয় না। অনেকক্ষণ ধরে মনে করার চেষ্টা করে কখন চন্দ্রিমা প্রাণদাকে চিঠি লেখার কথা বলেছিল। কিছুতেই মনে করতে পারে না। অথচ চন্দ্রিমা যে মিথ্যে বলার পাত্রী নয়, সেকথা মনে মনে কবুল করতেই হয়।

তাহলে সে কেন ভুলে যায় এভাবে ? এমন বিস্মৃতি কি কোনও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ? সে কি চন্দ্রিমার কাজের কোনওই গুরুত্ব দিতে চায় না। সে কি তবে চন্দ্রিমার প্রণামপুর যাওয়া পছন্দ করে না ? তার কাঁধে কিসের দাগ। এই সহানুভূতি চন্দ্রিমার মুখে বেমানান ছিল না, তবু কেন সেই কথায় বুলবল গ্রাহ্য করল না বউকে ? রাহুলের প্রতি চন্দ্রিমার আগ্রহ কি শুধুই ব্যক্তিগত, এই আগ্রহের ভিতর কোনও রাজনৈতিক বাসনা কি নেই ? যদি না-ই থাকে, তবু ব্যক্তিগত এই আগ্রহের নাম কি মোহ ? ঠিক এই মোহ বলতে কী বোঝায় ? মোহ শব্দটির সত্যিই কি সতর্ক প্রয়োগ সে করেছে ?

বুলবন নিজেকে বলল, আমি ঠিক করেছি বুলবন। রাহুলের মোহ এক বিপজ্জনক

প্রবণতা। যেমন বিলের জল মোহময়। জলের দিগন্তরেখায় রেখাচিত্রের মত গ্রাম, উড়ন্ত বলাকা, সবুজাভ বৃক্ষরাজি, মাইলের পর মাইল শান্তিকল্যাণ, ছায়ামেদুর মাহেফরাসের ডিঙি এবং ডোঙা, বিন্দুবৎ মানুষ কী বিস্ময় জাগায়!

শোন বুলবন! তুমিই বলতে পার, রাহুলের আত্মত্যাগের প্রখর রাজনীতি রাহুলকে যে ব্যক্তিত্ব দিয়েছে, তাই কি অন্তরে কোনও অসূয়ার জন্ম দেয়? ওই দূরবর্তী গ্রামগুলিতে আমার কখনও পদচিহ্ন পড়েনি। এই অক্ষমতার কারণ কী? রাহুলকে আমি কন্‌ভিন্স করতে পারিনি, এই ব্যর্থতা কিসের? আমার রাজনীতি কি এত তুচ্ছ! আমি কি এত অক্ষম যে চন্দ্রিমার ডোঙায় চড়ার দুঃসাহস আমাকে অসহিষ্ণু করে? এ কী ধরনের জটিলতা আমার? আমি কি কবির কাছেও হেরে গেছি? একজন সাঁতার না জানা শহুরে ছেলের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি?

সাঁতার জানে না যে, সে কী করে ডোঙায় ভেসেছিল? তিমিরাবৃত হিম ইগলুর উপমহাদেশে তার অন্তর কী উপায়ে অগ্নি উৎপন্ন করে? তেভাগার আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নৌ-বিদ্রোহ, নুরুল ইসলাম আনন্দ হাইতের খাদ্য আন্দোলন কবির বিপ্লবী হৃদয়কে তাপিত করেছে, জিইয়ে রেখেছে তাকে—এই উৎপন্ন অগ্নি কী বিষম উদ্বেলতা! তার রাজনীতি যদি কখনও তার সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে বসে তবু এই অগ্নিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। আগুন জ্বালানোর মানুষের অভাব কখনও হয়নি, একজন তিতু মীরই কি যথেষ্ট ছিল না? ফের, আগুন নেবানোর মানুষও কম নেই সংসারে। কিন্তু বিশ্ব অবলুপ্ত হওয়ার পর একটি অগ্নি-কণিকা থেকে যায়, তাই আবার উৎপন্ন করে আর এক নবীন পৃথিবী। গোড়া থেকে।

হঠাৎ এখন বুলবন এমন করে ভাবতে বসে কেন? সত্যিই তার কী হয়েছে এই দুপুরের অবসন্ন বেলায়, এমন কেন হচ্ছে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

অন্যমনস্কভাবে সে স্নান করে আনমনা থাকে খাবার সময় গ্রাস তুলতে তুলতে, যেন অন্ন ব্যঞ্জনেও তার আসক্তি শেষ হয়ে গেছে। চন্দ্রিমা সবই লক্ষ করে।

খাওয়া শেষে একটু বিশ্রাম আবশ্যক মনে হয়। একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে বুলবন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রিমার একটি হাত আচমকা কাঁধের উপর গিয়ে বসতে চায়। ঠিক ঘা লাগা কিঞ্চিৎ ছড়ে যাওয়া স্থানে, রক্তঘন কালচে জায়গাটা স্পর্শ করে চন্দ্রিমা। তন্দ্রা ঠেলে সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য আর্তনাদ করে ওঠে বুলবন। একটা কেমন অস্বাভাবিক চিৎকার করে ওঠে। চন্দ্রিমা অপ্রস্তুত হয়ে ভয়ে এবং লজ্জায় হাত টেনে নেয়।

সেই চিৎকারে মা এবং মণি ছুটে আসে। ফুলভানু অবাক হয়ে দুয়ারের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার চোখে বিস্ময় ঠিকরে পড়ে।

—কী হয়েছে বউ মা? প্রশ্ন করেন শঙ্কাতুরা আয়েষা।

—কিছু নয় মা! আমি ওকে ঘড়িটার কথা বলছি। বলে ওঠে চাপাসুরে চন্দ্রিমা।

—ঘড়ি? বিস্ময়-বিদ্ধ কণ্ঠস্বর বুলবনের।

—চুপ কর! বলে ওঠে গোপন গলায় চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়। তারপর বলে—আপনি চলে যান মা। ও কিছু নয়।

—তাই যেন হয়। তাই যেন সত্য হয় বউ। এই দুর্দিনে তুমি একটু পূজাপাঠ করবে মা! তোমার শ্বশুরের সংগ্রহে একখানা পকেট-গীতা আছে, উনি একটু দেখবেন বলে কিনেছিলেন। দেব তোমাকে? আমি তোমাকে নামাজের কথা বলি কোন মুখে দোলা?

আনব তোমার জন্যে ?

—না মা ! বলতে গিয়ে চন্দ্রিমার তাবৎ দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখে জল এসে গেল।

আয়েষা এবার অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস মথিত গলায় বলে উঠলেন—তোমরা অমন ক'রো না বউ মা ! আমি রাহুলকে আর এই বাড়িতে ঢুকতে দিব না। নির্ভয়ে থাক। বলেই আয়েষা দোতলায় উঠে চলে গেলেন। একটু পর ভুলভানু সরে যায়। অথবা চন্দ্রিমা।

মণি বলল—মোসলেম চাচা খবর এনেছে থানা থেকে, কবি দাদাকে মেরে ফেলছে থানা। এখনও মরেনি। রোজ, সর্বক্ষণ মারে। দাদার মুখে গ্যাঁজলা উঠে, অচৈতন্য হয়। কেউ দ্যাখে না বউদি ! মোসলেম কদমকে দেখতে গিয়ে ওই একটা 'সিন' দেখে এসেছে। কথা কইতে গিয়ে মোসলেমের গলা বুজে যায় বউদি।

চন্দ্রিমা হাতের উল্টো পৃষ্ঠে চোখ মুছে বলে—তুমি আর কথা ব'লো না মণি। চলে যাও। মণি চলে যায়।

আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে চন্দ্রিমা ঘড়িটা বুলবনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—তোমার হাতে বেঁধে দেব ?

—না।

—দিই। আমাদের বিয়ের চিহ্ন বুলবন। নাটা ফেরত দিয়েছেন। নেবে না ?

—ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও দোলন।

—কেন ?

—না, ওটা আর পরব না।

—বেশ।

—হৃদয়ই তো আসল চন্দ্রিমা !

—আমি তোমাকে পরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম বুবন। তোমার কাছে আমার আর কোনও যোগ্যতা নেই।

—তুমি ভুল বুঝো না, প্লিজ ! আমি পারব না।

—কেন ?

—ওটার অনেক ঘাট চন্দ্রিমা। ঠিক বোঝানো যায় না। ওটা হাতে পরলে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হবে। তুমি ভুল বুঝলে না তো !

—না।

না বলতে গিয়ে চন্দ্রিমার গলা জলে পড়ে যাওয়া পয়সার মত তলিয়ে যায়। চৌকিতে বুলবনের পাশে নিথর হয়ে নির্বাক বসে থাকে সে। এই মুহূর্তে তার শরীরের সমস্ত শক্তি কী এক অনৈসর্গিক উপায়ে কে যেন অদৃশ্য আড়াল থেকে কোন চঞ্চুর সাহায্যে টেনে শুষে নিয়েছে, কোন বল নেই, সাহস নেই, কোন আশা নেই তার। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও চলে গিয়েছে।

এই সময়ে প্রাণকিশোরের সরল মুখটি ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছিল না। জীবনকে তার অতীব দুর্বোধ্য জটিল অঙ্কের মত ঠেকছিল। জোর করে নিজেকে খাড়া করে তোলে। মেঝেয় পা ফেলে হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে, পা পড়ছে ঘূর্ণ্যমান মৃত্তিকার পরে, ঝড়ের গতিতে চলেছে পৃথিবী।

মণি জামা প্যান্ট পরে তৈরি হয়েছিল।

বলল—যাবে না বউদি ?

চন্দ্রিমা কোনও জবাব দিতে পারে না। দোতলায় উঠে এসেছিল, নির্বাক ভঙ্গিতে আবার নীচে নেমে চলে আসে। মণি পিছু পিছু নামে। বুলবন সদরঘাট যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আজ সে ফুলপ্যান্ট এবং হাফশার্ট পরেছে। ঘড়িহীন খালি হাত চোখে পড়ে। বারবার চোখে পড়ে চন্দ্রিমার, বুলবনের শূন্য হাতের মত এক গভীর নিঃসঙ্গতা তাকে কোথায় যেন নিক্ষেপ করে দেয়।

মণি আবার প্রশ্ন করল—প্রণামপুর যাবে না বউদি !

চন্দ্রিমা এবার মণির মুখের দিকে নিরর্থক দিশায় চেয়ে থাকল আনমনা। কথা বলল না। চন্দ্রিমাও ইস্ত্রি করা শাড়ি পরেছে, ব্লাউজটা স্বল্প ব্যবহৃত, মণির চোখে নতুন। পায়ে চটিও গলিয়ে নিয়েছে। কিন্তু হাঁটাচলায় কোথাও যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, বউদি কী যেন ক্রমাগত চিন্তা করে চলেছে।

—যাবে না ? হঠাৎ শুধাল বুলবন।

—না। বলে কেমন এক ভেঙে পড়া ভঙ্গিতে চৌকির উপর থপ্ করে বসে পড়ল চন্দ্রিমা। বলল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বুলবন !

—সেকি !

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গেই যাব। মণি, তুমি একবার মোসলেম চাচাকে ডেকে আনতে পারবে ?

বুলবন অবাক হয়ে চন্দ্রিমার দিকে চেয়ে রইল দু'দণ্ড,অনুভব করতে পারল, চন্দ্রিমার মাথা থেকে কবির অ্যারেস্ট হওয়ার ঘটনা কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

—না। থাক। দরকার নেই। বলে উঠল হঠাৎ করে চন্দ্রিমা।

বুলবন আরও অবাক হয়ে গেল। চাপা অভিমানে, ক্ষোভে এবং পরাস্ত অশ্রুর গোপন বিষাদে চন্দ্রিমা টলটল করছে, যেন কোনও আসন্ন জয়ের রথের চাকা সহসা কোনও অভিশাপে মাটিতে পুঁতে গেছে।

মণি বলল—মোসলেম চাচা ভিক্ষেয় গেছে। পাব না হয়ত। তবু দেখছি।

—না। যেতে হবে না তোমাকে ! বলে উঠল চন্দ্রিমা। তারপর বলল—চল বুলবন !

বুলবন চুপচাপ কোনও কথা না বলে রাস্তায় নেমে এল। পায়ে পায়ে হেঁটে মোসলেমের ভিটার দিকে এগিয়ে চলেছে দেখে চন্দ্রিমা বলল—আর কী হবে। কেন যাচ্ছ ওদিকে ?

—তুমি যে মোসলেমের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলে ?

—না। আচ্ছা, তিমির কেন কবিকে ওইভাবে ধরিয়ে দিল ?

—এ হল ঈর্ষা। রাজনৈতিক অসূয়া। তিমির ভাবছে, কবিরা তার গ্রাম দখল করে নিয়েছে এবং বাস্তবিকই হয়ত কবির দল বিপ্লব করতে পারে এবং তা যদি ঘটে যায়, তাহলে তিমিরের রাজনীতির কী হবে ! একটা অনিশ্চয়তাও 'ফিল' করে তিমির। তার শ্রেণী চেতনা এবং রাজনীতি কিছুতেই সংসদীয় গণতন্ত্রের বাইরে কিছুই চিন্তা করার সাহস পায় না। বড়'জোর দু'এক কাঠা জমি আর ফসল দখল করার চেষ্টা করে। এরপর সেই বরাতটুকুও জে.এল আর ও-র উপর ছেড়ে দিয়ে তার রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করতে চায়। এক্ষেত্রে কোনও ধরনের বিঘ্ন সে সইবে না.....

বলতে বলতে চুপ করে যায় বুলবন। তারপর বলে—তুমি আমার কথা শুনছ না দোলন ?

চন্দ্রিমা বলল—রাজনৈতিক অসূয়া কথাটি কখনও শুনিনি। তবে আজ অনুভব করতে

পারি।

—তিমিরকে দেখে ?

—তোমাকে দেখেও।

রাস্তার উপর এবার দাঁড়িয়ে পড়ল বুলবন। তার চোখমুখে দ্রুত এক কঠিন ভাবান্তর ঘটে যায়।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ চন্দ্রিমা।

—না।

—আলবাত বুঝেছ। জলে ভাসতে পারাটা সংগ্রাম নিঃসন্দেহে, তবে ভেসে যাওয়াটা কোনও বড় দৃষ্টান্ত নয়। ডোঙায় চড়তে পেরেছ, তাই খুব। তবে কবির মত ভেসে যেও না। বলে উঠল বুলবন।

চন্দ্রিমা এবার পানসে করে হেসে ফেলল। তার চোখেমুখে সূর্যের দীপ্ত আলো. বিন্দু আগ্রহে তাকে উদ্ভাসিত করতে থাকে।

—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না বুলবন। এখন শুধুমাত্র পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গেই কথা হতে পারে। তাড়াতাড়ি চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বলেই চন্দ্রিমা দ্রুত পদক্ষেপে বুলবনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনেই মোসলেমকে দেখতে পায়।

—তুমি কবিকে দেখেছ চাচা !

—হ্যাঁ মা।

—কেমন আছে কবি ?

—মরে যাবে মা গো ! তাবৎ গায়ে ছ্যাঁকা মেরেছে। কালো হয়ে গেছে। মার, মার, মার !

—সাঁতার জানে না কবি।

—কে শুনে সেই কথা !

—তুমি বলতে পার না ?

—না।

—কেন পার না ? কবি কেন বলছে না, সে সাঁতার জানে না, সে কোনও আন্দোলন করেনি। সে ডোঙায় চড়া শিখত। ও নদী দেখে অবাক হত। ও কিচ্ছু জানে না।

—তুমি এট্টা চিরকুটে লিখ্যা দেও কথা কয়ডা। আমি দিব। নুকিয়ে ছাপিয়ে দিব তেনার হাতে। একবারও তিনি কহেন নাই, তেনার সাঁতার জানা নাই। দারোগারে বলা চাই কথাডা। বুদ্ধিহারা হয়েছে ছেলেডা। তারকবাবু ভাগ্নেকে দেখতেও যায়নি মা। বে-রহম, বে-দিল ইনসান। আমি মিসকিন ভিকিরি মা, থানা শুনে না। ভাবে, আমি পাগল।

শুনতে শুনতে চন্দ্রিমা স্তব্ধ হয়ে দূরে কোথাও চেয়ে থাকে। তারপর অন্যমনস্কের মুদ্রায় কাঁধের ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম বার করে ছোট করে ছিঁড়ে নেয়। কবি, তুমি সাঁতার জানো না। মনে আসে না সেকথা ? লিখে ফেলে চন্দ্রিমা। তারপর চাপা স্বরে বলে—এটি দিতে পারবে কবিকে ? চাচা ? পারবে তো ?

মোসলেমের পক্ষে কাজটি খানিক সহজ বোধ হয়। থানায় যায় সে কদমকে দেখতে। কথা বলা যায় না। তবে এক ফাঁকে এই চিরকুট চালান করা কঠিন হবে না। সে চিরকুট নেয়। বুলবন এগিয়ে যায় সামনে। কিছুক্ষণ হেঁটে চলে নিঃশব্দে। তারপর

চন্দ্রিমাকে বলে—এ তোমার পাগলামী দোলন। কিন্তু বিপজ্জনক।

॥ ২৮ ॥

মোসলেমের কাছে অচেনা মানুষ সহজে ঘেঁষতে চায় না কেন, মোসলেম জানে। তার ঘা ; ঘেয়ো, রক্তাক্ত, কাপড় জড়ানো হায়নাদংশিত অর্ধপঙ্গু পায়ের ছিরি বীভৎস দেখায়। মানুষ আচমকা পায়ের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠে ঘৃণায় সরে যায়। বাচ্চারা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

অসুন্দরকে যে মানুষ অন্তর থেকে ঘৃণা করে মোসলেম তা অন্তর দিয়েই অনুভব করেছে। হায়না তাকে চিবিয়ে রেখে চলে গেল, শেষ করে গেল না। আশ্চর্য এই যে, ওই দাঁতালো ভয়ংকর কুৎসিত জীবটা কখনওই পুরোটা শেষ করে না মানুষের।

মানুষ ঘৃণায় আধ-খাওয়া তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু চেনা মানুষরা ভাবে, এখনও মোসলেম বেঁচে আছে, মরে গেলেই তো পারে ! তার মৃত্যুকামনাই যেন তার প্রতি সবচেয়ে বড় সহানুভূতি। অবশ্য মোসলেম সেই সহানুভূতির তোয়াক্কা করে না বলেই আজও মরেনি।

সে অবশ্যই, হঠাৎ-ই, একদিন পথের উপর এন্তেকাল করবে, কেউ জানবে না। মৃত্যুই তার সবচেয়ে বড় অভিমান। ওই অভিমানের জোরেই সে তার জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে ফিরছে।

কবি তার দিকে চেয়ে আছে। চোখে একফোঁটা ঘৃণা নেই। কথাও বলছে না। ছেলেটি আর বোধ হয় কথা বলতেও চায় না। তার সমস্ত গা আজ মোসলেমের পায়ের মত অসুন্দর, ভয়ংকর এবং ঘৃণ্যও বলা যেতে পারে। তাকে দেখে আধ-খাওয়া, জীব-দংশিত ভিখিরিটা আঁতকে ওঠে ঘন ঘন। মোসলেমের এই মনোভাব বুঝতে পারে কবি। কিন্তু এই একজন মানুষকে দেখল ভিখিরিটা, যে-কখনও তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। সমস্ত ঘৃণার ঊর্ধ্বে ওই ছেলেটা উঠে গেছে, অত নরম প্রসন্ন ভালবাসা কোথায় পেয়েছে সে ! কোথা থেকে এসেছিল ছেলেটি ?

—বাবা ! বলে চাপা গলায় ডাকে মোসলেম।

কবির ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। পাশের সেলে ভাইপো কদম বন্দী। দেওয়াল নয়, শক্ত গ্রিলের পার্টিশন। কদমকে কবি এবং কবিকে কদম আলি দেখতে পায়। প্রতিটি প্রহার কদম দেখেছে। কদমকে দু'চারটি রুলের আঘাত করেছে পুলিস। ব্যস।

মোসলেমকে দেখেই পুলিস সর সর করে। ঘৃণায়। এবং আশ্চর্য তাদের হৃদয়, একজন সুন্দর যুবাকে তারা তারই মতন অসুন্দর আর ঘৃণ্য করে তোলে। শবদেহের মত ঝলসে পোড়া একটি জীবিতদেহ, মানুষের রঙ আর নেই। ত্বকের সমস্ত সুষমা অন্তর্হিত। এই ছেলেকে তার মা বেচারিও চিনতে পারবে না। একে কেউ আর চিনতে পারবে না।

মোসলেম ডাকল—বাবাজীবন !

বাবা আর জীবনের এই জোড় মোসলেমকেই কেমন কাঁপিয়ে তুলল। গলাটা তার বুজে আসছিল।

বড় বড় ফোস্কা গলিত হয়ে ঘা হয়েছে, চামড়া যেন বসন্তের কালো দাগের মত ছোলানো। এই অবস্থায় মানুষ হেসে উঠলে মনে হয় মৃতদেহ হাসছে এবং সেটাও ওই মানুষটির জীবনের প্রতি এক অদ্ভুত সাধ। সে যেন বলছে, দ্যাখো এখনও বেঁচে আছি। এখনও আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায়নি।

এই হাজত থেকে একবার কেবল বার হয়ে পড়তে চায় কবি। পুলিস-থানা কি তাকে ছেড়ে দেবে না ?

—বাবাজীবন !

এই একটা মানুষ রোজই একবার এখানে আসে। কদমকে দেখতে। আসলে ওই পঙ্গু মানুষটা তাকেও দেখে। বাবা বলে ডাকে। তার কষ্টের কথা গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেয়। পুলিস ওকে ঘৃণা করে, অতি নগণ্য জীব ছাড়া কিছুই ভাবে না এবং খবর রটাতে পারে বলে প্রশ্রয়ও দেয়। গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস জাগিয়ে তুলতে হলে কবির কষ্টের কথা, অতি নিকৃষ্ট ধরনের মারের সকাতর বর্ণনা, প্রচারের জন্য যন্ত্র হিসেবে মোসলেমের নিত্য উপস্থিতি এই থানায় দরকার। থানা ওকে চায়। কবি সমস্ত ব্যাপারটি মার খেতে খেতে বুঝতে পেরেছে এবং একথাও এখন খুব পরিষ্কার যে, মামা বা অন্য কেউ তার জন্য থানায় আসবে না।

কোনও একজন, কেউ একজন কি আসতে পারে না ? মন বড় বালাই, সে তবু স্বপ্ন দেখে। দুই রকমভাবে কবি পরিস্থিতিটাকে চিন্তা করে। থানা তার কাছে থেকে কোনও কথা আদায় করতে পারেনি, শত প্রহারেও সে মুখ খোলেনি। যদি সে মুখ খুলত, বেঁচে যেত। থানা তাকে জেলে পাঠিয়ে দিত। পরিস্থিতি এই একভাবে বদলে যেতে পারত। দ্বিতীয়ত, কেউ একজন আসতে পারত।

—রাহুলকে দেখেছেন মোসলেম চাচা ! আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল কবি। কিন্তু রাহুলের নাম মনে মনে আউড়ে নিতে নিতে সে ভয়ে চুপ করে গেল। ওই নামটি এখন মনের অন্তরালে ভাসিত হওয়াও গোনাহ্‌। তৌবা কমরেড সি. এম.—তৌবা ! কিছুতেই ওই নামটি মুখে যেন না আসে হে কাণ্ডারি ! আপনি জানেন ওহে প্রিয়তম কমরেড, আমি কিছুতেই আর ভুল করতে পারি না। রাহুলকে আমি চিনি না। চিনি না।

—মুমতাজ আলি কে হে !

—জানি না বড়বাবু।

—ঠিক করে বল্‌ শুয়োরের বাচ্চা !

—না।

—বলবি না, মুখে তোর ইয়ে করি !

—না। না। না। আর পারছি না। ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দেব, আগে নেতার নাম বল্‌। বিশ্বরঞ্জন কে ?

—জানি না।

—দেবপ্রতিম কোথায় আছে ?

—জানি না।

—তোদের সব ফুটুনি আমরা জানি। বিপ্লব ভোজসভা নয়, মনে আছে ? কবিতা লেখা নয়, লেকচার মারা নয়, কী রে ! মনে নাই ? অ্যাই শালা ! বল্‌, কথা বল্‌।

—বাবা !

আবার ডেকে উঠল মোসলেম !

মার খেতে খেতে কবি যখন চেতনা হারায় তখন সে শিশুর মত ঢলে পড়ে। যখন জাগে ত্রস্ত, ভীত, বোবা পশুর মত চোখ মেলে, ত্রাসিত তার জিহ্বা ঠোঁট চাটে তৃষ্ণায়।

সে ডাকে—মা!

গরাদের ফাঁকে একটা চিরকুট এগিয়ে ধরেছে সতর্কচক্ষু মোসলেম। অত্যন্ত ক্ষীণ বিস্ময়রেখা কবির চোখে বিদ্যুৎরেখায় খেলে উঠে মিলিয়ে যায়। কবি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজের টুকরোটি আঙুলে পাকিয়ে সেলের কোণের দিকে ফেলে দেয়। তুমি সাঁতার জানো না। সেকথা মনে আসে না?

—কে লিখেছে?

—বউমা।

—অ। যাও, চলে যাও চাচা।

—যাই। বলে মোসলেম থানার মেঝের চৌকাঠের একপাশে সরে এসে বসে পড়ে।

ওই চিরকুট বলে দেয় কবির কাছে কেউ আর আসবে না। সে সাঁতার জানে না, একথা তার মনেও আসেনি। কিন্তু ওই যুক্তিটা কি তাকে বাঁচাতে পারে? কেনই বা পারে না! সে তো সত্যিই সাঁতার জানে না। জানে না বলেই জলকে জলাতঙ্ক রোগীর মত ভয় পেত নাকি! মামা এসে যদি বলত, আমার ভাগ্নেটা সাঁতারই জানে না, সে কী করে প্রণামপুর যাবে! কেউ যদি একবার এসে বলত থানাকে! তাহলে কবি একবার তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারত।

একটি সঙ্গোপন চিরকুট সত্য লেখে, কিন্তু তা থানাকে দেখানো যায় না। একথা প্রমাণ করে, কবির কাছে কেউ আর আসবে না। এইটুকু বার্তা শুধু অবশিষ্ট ছিল, কবি সাঁতার জানত না।

কবি কল্পনা করে থানায় ললিতমোহন এসেছেন।

—সাঁতারই জানে না ছেলেটা, ওকে কেন ধরে রেখেছেন, ছেড়ে দিন!

—আমরা কী করে বুঝব ললিতবাবু! ও নিজেও তো বলতে পারত কথাটা!

বড়বাবুর গলার স্বর আশ্চর্য কোমল হয়ে যায়। এই একটা কল্পনা কবি করতে পারে।

তারপর কল্পনায় সে মনের মধ্যে যিশু-মূর্তি দেখতে পায়। খুবই আশ্চর্য লাগে, যিশুর মূর্তিটা কেন এভাবে খাড়া হয়ে উঠছে মনের ভিতর? কখনও সে তো ওই মহামানবের কথা ভাবেনি। তার কোনওই গূঢ় ধর্মবোধ নেই, ধর্মের কোনও আচার-বিচার সে মানে না।

মনে মনে কবির অদ্ভুত সংকোচ হচ্ছিল। কেউ তার মনের কথা জানে না। কেউ জানবেও না, থানা-হাজতে মার খেতে খেতে, অকথ্য অত্যাচার সইতে সইতে তার হঠাৎ কার ছবি মনের মধ্যে আসে।

কোনও যুক্তিই ঠিক মাথায় আসে না, কেন যিশুর ছবিটা এভাবে ভাসছে! দু'দিন ধরে ভাবতে ভাবতে কবির আজ হঠাৎ-ই মনে পড়ে, যিশু কেন আসছেন মনের মধ্যে। রাহুল ডোঙায় করে ভাসতে ভাসতে তার সঙ্গে কথা বলছিল, সেদিন কবি তাকে জেনি মার্কসের কথা, তাঁর শিশুর মৃত্যুর কথা, রাতারাতি মার্কসের সমস্ত চুল-দাড়ি সাদা হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। কারণ রাহুল বলেছিল, বাবার মাথার চুল সমস্তই পেকে সাদা হয়ে গেছে জেলের মধ্যে, গায়ে ঘা, সর্বাঙ্গে সাদা উকুন, তাঁকে দেখায় লেংটি-পরা যিশুর মত।

আজ কবির দেহ আগুনের ছ্যাঁকায় ঘেয়ো, মনে গেঁথে থাকা ছবিটা তাই এসে পড়ে মনেরই অজান্তে। সাদা চৌধুরীর সমস্ত প্রহার আজ কবি সর্বাঙ্গে ধারণ করতে পেরেছে।

সাদা চৌধুরীর কাছে কেউ যেমন যায় না, যেতে পারে না, তার কাছেও আসে না।

কিন্তু মোসলেম আসে। একটি বার্তা সে পৌঁছে দেয়। সাঁতার জানে না কবি। চন্দ্রিমা বউদির প্রাণটিই যেন ওই চিরকুটে লেগে আছে। সে আসতে পারেনি, কিন্তু তার প্রাণটি ছুটে এসেছে।

—বউদি! তুমি কি ভেবেছ, সাঁতার জানি না বললেই থানা আমাকে ছেড়ে দেবে? তুমি হঠাৎ এইভাবে ভাবতে পারলে কেন? থানার কি কোনও হৃদয় আছে বউদি! থানা কি স্কুলের মাস্টারমশাই যে, জ্বর হয়েছিল বললে আর পড়া ধরবে না?

—স্যর!

—কে?

—আমি। একটা কথা বলতে চাই মেজবাবু!

—বল।

—আমাকে ছেড়ে দিন।

—সেকি হে, হঠাৎ?

—হ্যাঁ, স্যর! আমাকে যেতে দিন। আমি সাঁতার জানি না। না। আই কান্ট সুইম ইন দ্য রিভার গুমানি।

দমকা বেগে সহসা অট্টহাস্য করে উঠলেন মেজবাবু—হো হো হো!

হাসতে হাসতে যেন তাঁর আরও হাসি পেয়ে যায়। দ্বিগুণ উৎসাহে স্বর উপরে চড়িয়ে অতি অধিক হাস্য করেন তিনি। তখন তাঁর স্বাভাবিক গলা নাটুকে হয়ে যায়।

—বলছিস! হাসি থামিয়ে খর চোখে কবিকে দেখেন সমীর পুরকাইত। হাতের রুলটা বার কতক নাচিয়ে নিলেন। মাথার ক্যাপটা টেবিল থেকে মাথায় তুলে জুৎ করে বসিয়ে ক্যাপের সামনের ছাউনির প্রান্ত ধরে গরাদের কাছে আসেন একটা তুখোড় ভঙ্গিমায়।

—বলছিস? দ্বিতীয়বারে গলা নরম করে শুধালেন। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে চাইছেন তিনি।

—আজ্ঞে! বলে চুপ করে থাকে কবি। সে কি কিছু ভুল বলেছে, অত হাসছে কেন দারোগা!

—শোন ছোকরা! সাঁতার যদি নাই জানবে, তাহলে জলে নামতে গেলে কেন? বল্! বল্ শালা, বল্!

—আমি জানি না। আমি নদী দেখতে...

—তুই জানিস না! ভোজবাজি? নদী দেখতে গিয়েছিলি? পাঁঠা!

—আই কান্ট সুইম।

—ম্যাজিক। বিপ্লব কোনও জাদুগিরি না রে তিলককুমার! ভোজসভা না।

—ওই কথাটা সবাই আপনারা বলেন। কতবার বলেন!

—আমাদের এক সহকর্মীকে তোরা গাপ করেছিস। কোথায় তিনি?

—জানি না। আমি সাঁতার জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

—কেন এসেছিলি শহর থেকে? কেন?

—জানি না।

—সব ভুলে গেলি ইতিমধ্যে? আমি তোকে মেরে ফেলে দিতে পারি, আমার কিচ্ছুটি হবে না।

—জানি। প্রমোশন হবে।

—চোপ শা—লা ! ও রে চাবি নিয়ে আয়। খোল্ দেখি। আমি ওকে প্রমোশন দেখাচ্ছি ! বলেই গরাদ ধরে ক্ষিপ্তের মত নাড়িয়ে তোলেন সমীর পুরকাইত। যেন তিনি গায়ের জোরে ভেঙে ফেলতে চান। গরাদ সামান্য কাঁপে।

মোসলেম বুঝতে পারে, এবার কবির উপর অত্যাচার হবে। তালা খোলা হবে। মারবার আগে দারোগা গরম হচ্ছে। চিৎকার করে, খিস্তি দিয়ে নিজেকে ঝাঁঝাবে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মোসলেম চোখের উপর এই দৃশ্য সইতে পারবে না। সে চৌকাঠের কাছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে পড়েছিল, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বার হয়ে আসতে চায়। দেখবে না, কিছুতেই সে দেখবে না অত্যাচারের ছবি।

—দাঁড়াও। যাবে না। দেখে যাও !

—না বাবু। অসহায় সুরে মোসলেম কথা বলে চৌকাঠ ডিঙোয়।

—আহা ! ওকে আবার ধরে রাখছেন কেন ? যেতে দিন। বলে উঠলেন ছোটবাবু ঘরের কোণের চেয়ার থেকে, লম্বা টেবিলের প্রান্তভাগে তিনি। চুপ করে ছিলেন।

—আহা কিসের মিহিরবাবু ! আহা কিসের !

—আহা করব না ?

—না। সহ্য করতে না পারেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান। মিনিটে মিনিটে আপনি আহা, উহু করেন। এই ম্যানারিজম এই লাইনে চলে না।

—ছেলেটা ঠিক বলেছে।

—কী বললেন ?

সমীর পুরকাইত এবার কটমট করে চাইলেন মিহিরবাবুর দিকে। সেই খরচক্ষুর দিকে ক্ষুদে পুলিস-অফিসারটি চেয়ে থাকতে না পেরে চোখ নামিয়ে ঘাড় নীচু করলেন।

—আর একবার বলুন কথাটা। অত্যন্ত শান্ত আর কঠিন-কণ্ঠে বলে উঠলেন মেজবাবু।

—না।

—আর একবার বলুন, শুনি ! সাহস হচ্ছে না ? বলে গরাদের কাছে থেকে সরে এসে মিহিরবাবুর মুখের কাছে ঝুঁকে আসেন সমীর পুরকাইত, টেবিলে দু'হাতের ভর রেখে ঝুঁকেছেন।

—বলুন ! রিপিট করুন। আপনার মুড নষ্ট হয়ে গেছে, তাই না ? আর পারবেন না ? আপনি আসানসোলে থাকতে গ্রুপ-থিয়েটারে নাটক করতেন। হিউম্যানিস্ট আপনি। দারোগা। শালা, কাঁঠালের আমস্বত্ব ! ছিঃ ! অত্যন্ত লজ্জার কথা।

বলেই সমীর পুরকাইত খাড়া হয়ে গরাদের দিকে ঝটিতি সরে যাবেন, এমন সময় ভীরুচোখে মিহির বললেন—আমি বলছি !

এক ঝটকায় আবার ছোটবাবুর দিকে সরে এসে সমীর বলেন—হ্যাঁ, বলুন ! পারবেন মনে হচ্ছে। বলুন !

বলতে বলতে ঈষৎ জেগে ওঠা মিহিরবাবুর মাথার টাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সমীর পুরকাইত। ছোটবাবু ফর্সা, অত্যন্ত ভদ্র তাঁর চেহারা, মুখের ভাঁজে কিছুতেই তিনি কোনও কাঠিন্য জাগিয়ে তুলতে পারেন না। তাঁর গা থেকে পোশাক খুলে নিলে, তাঁকে দেখাতে পারে একজন পরিচ্ছন্ন গৃহী, কারও সাধারণ স্বামী, কারও সাধারণ দাদা বা ভাই অথবা ছেলে, কারও বাবা। তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশের কোথাও তাঁর বয়েস বা চল্লিশের

কাছাকাছি হবেন বুঝি বা।

তাঁর আর সত্যিই সাহস হল না সমীরের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করার। তিনি কথাটি প্রকাশ করলেন অদ্ভুত নিশানায়।

বললেন—আমি বলছি, ছেলেটা ঠিকই বলেছে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সাঁতার জানে না। ওর ইংরেজি শুনলেন, ঠিক ছাত্রদের মত।

—অহ্!

—হ্যাঁ।

—হাঃ! হাঃ! হাঃ! তাই বলুন।

—ছেড়ে দিন।

—আমি পারি না। মেরে না ফেলে আমি পারি না। বলেই আবার সমীর পুরকাইত লাফিয়ে ছুটে আসেন গরাদের কাছে।

—ছেড়ে দিলে দাদাদের গিয়ে অত্যাচারের গল্প বলবে। অসম্ভব।

—ওদের জীবন গল্প নয় সমীরবাবু!

—রিয়েলি? গল্প নয় তাহলে? অ্যাই, এদিকে এগিয়ে আয়। গরাদে রুল ঢুকিয়ে ইশারা করেন মেজবাবু। বলেন—তোদের দলের আর কে আছে প্রণামপুরে? বলে দে, আমি ছেড়ে দেব। বন্দুকটা কোথায়? তরফদারী দোনলা?

গভীর রাতে প্রকৃত অত্যাচারের তীব্র দৃশ্য থানা-হাজতটিকে নারকীয় করে তোলে। দিনের বেলা লোক-দেখানো অত্যাচার চালায় থানা। একটি গ্রাম্য থানা তার অবস্থান বানিয়ে নেয় মধ্যযুগের অন্ধকারে। এই রকম একটি ঘটনা হাতে পেয়ে থানার ঘুম চলে গিয়েছে।

নাটা তরফদারের বন্দুক ছিনতাই হয়ে যাবে, একজন পুলিস হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে, তিন তিনটি খুন হয়ে যাবে, মাহেফরাসরা হঠাৎ এত তাজবাহাদুর হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়বে থানা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। সাধারণ দু'চারটে চোর-ডাকাত পেটানো, দুমদাম খিস্তি করা বা চোরা মাল পাকড়ানো থানার একটা আয়েসী অভ্যাস।

শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ঘন ঘন নির্দেশ আসছে উপর থেকে। সমীর পুরকাইত এই রকম কড়া নির্দেশের অর্থ বুঝতে পারেন। তাঁর মনের মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত ভয় ইদানীং মাথা চাড়া দেয়। মাহেফরাসদের জিদ দেখে তাঁর রোখ উগ্র হয়। মানুষ মারার একটা বদ নেশা তাঁর আছে। চোর-ডাকাত পিটিয়ে হাত জুৎ করে রেখেছেন তিনি।

ভিতরের জিঘাংসা একবার জেগে উঠলে সহজে তাকে দমানো যায় না। গরাদের কাছে থেকে হঠাৎ কী মনে করে মেজবাবু সরে আসেন মিহিরবাবুর সন্নিকটে। গলা অদ্ভুত নরম করে বলেন—অম্বরীশলালের ঘটনাটা জানেন তো ছোটবাবু!

—না।

—বউটা অ্যাবনরমাল।

—কেন?

—এই যে আপনি আমাকে বাধা দিচ্ছেন, বউ অম্বরকে বাধা দিত। সোনার ছেলেদের মারছে বলে কান্নাকাটি করত। সোনার ছেলে! খুনে, শয়তান! তারা হল ক্রিম অফ দি সোসাইটি। প্যাঁদানি দিলে সোসাইটি শালা কুঁইকুঁই করে, তা এরকম সোসাইটির ছাল

ছাড়িয়ে নুন মাখালেও রা করে না, আমাদের চেয়ে সোসাইটি কোনও শালা চেনে না। তো লিন পিয়াওয়ের ব্যাটাদের উনি সল্টিং করছেন তখন। সল্টিং বুঝলেন তো!

—বউটার কী হল, তাই বলুন।

—পেটে বাচ্চা ছিল বউটার! কী আর হবে! অ্যাকশনে বার হচ্ছেন বাবু, দেখলেই বউটির কী যেন হত, যেও না, মেরো না, ওরাও তো মানুষ, তোমার বুকে মায়া নেই, এইসব বলত আর কঁকাত।

—বুঝেছি।

—না, বোঝেননি ছোটবাবু। ওই রকম গোঁ ধরা ঠিক না।

—বউয়ের পেটে লাথি মারলেন অম্বর, বউ পড়ে গেল সিঁড়ির উপর।

—সিনেমায় যেমন হয় আর কি! একটা কথা কি জানেন, সিনেমায় যা হয় না, আমাদের লাইনে তা-ও ঘটে। এই ছোঁড়াটাকে আমি মেরে ফেলব, দেখে নেবেন। লাথি মেরে আমি ওকে একেবারে রোস্ট করে ফেলে দেব। কোমর ধসিয়ে দেব। শালা!

বলে আবার তেড়ে ছুটে যান সমীর পুরকাইত। তারপর ফের আপনা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে মিহিরবাবুর কাছে আসেন।

শান্তভঙ্গিতে বলেন—দুঃখ কী জানেন! বউটার পরে বাচ্চা হয়, দু'দুবার নষ্ট হয়ে যায়। কনসিভ করে, কিন্তু রাখতে পারে না। সেই থেকে অম্বরীশের মাথাটা বিগড়ে যায়, একটু একটু করে একটা কেমন পাগলামি, বুঝলেন! অবশ্য পরে নানান কিছু করে, ডাক্তারবদ্যি তো বটেই, থানে গিয়ে হত্যে দিত বউটা, কী প্যাথেটিক সিন, সিনেমার মত আর কি। আমাদের লাইনে যা হয়, সিনেমা তা ভাবতেও পারে না। আপনি হিন্দি সিনেমা দেখেন ছোটবাবু?

—দেখি। ওই তো 'দিল দিয়া দরদ লিয়া' দেখলাম। 'ও কৌন থী' দেখলাম। 'আঁধেরি রাত' দেখলাম। শেখ মুক্তার বলে অভিনেতাটি গুড অ্যাক্টর—বেশ রোল করে। সি. আই. ডি-র রোল করছিল, প্রথমে বুঝতেই পারিনি। আরে, ওই যে ফিরোজ খাঁ জানেই না, শেখ মুক্তার তারই 'বস্'। ওপর-অলা।

—ঠিক। কিন্তু সিনেমা এখন থাক ছোটবাবু। অম্বর যে ওপর-অলার ওপর-অলা, ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন উনি স্বাভাবিক নন। খুব ভয়ংকর, আপনার আমার মাথা চিবিয়ে দিতে পারেন। আসুন, আমরা ছেলেটাকে মেরে ফেলি! কাম অন।

ভয়ে শিউরে উঠলেন মিহির। তাঁর স্বল্প টাক ঘামে সিক্ত হয়ে উঠল। চোখমুখ এক লহমায় কেমন সন্ত্রস্ত দেখাল।

মিহির ভাবতে পারেন না, কী অবলীলায় সমীরবাবু হত্যার কথা উচ্চারণ করেন। অম্বরীশ যদি অস্বাভাবিক হন, তাহলে সম্মুখের পুলিস-ইউনিফর্ম পরা মানুষটাই বা কী? এভাবে বলতে তাঁর একটুও আটকালো না? তাঁকে ডাকছেন কেন উনি! যা করবেন, একাই করুন। যদি আরও বাহুবল দরকার হয়, অনেক পেয়াদা আছে, তাদের ডাকতে পারেন।

থানা-হাজতে হত্যার ঘটনা নতুন নয়। কথা আদায় করতে গিয়ে মারতে মারতে মেরে ফেলা কতই তো ঘটে! ঠিক সেই রকম কোনও অতর্কিত সহিংস উত্তেজনা, বেসামাল তীব্র অমানবিকতা বউয়ের গর্ভস্থ সন্তানের মুখে লাথি কষিয়ে দেয়। আমি 'আহা' বলি, কেন বলি? কিছুই বুঝতে পারি না। 'আহা' বললে ওই ইউনিফর্ম আমাকে ঠাট্টা করে। কেন? তা-ও জানি না। আমিই কি তবে পাগল!

কবির দিকে নিঃশব্দে চোখ তুলে চাইলেন মিহির ভট্ট। বিড়বিড় করে বললেন—আমায় কেন পাগল করে দিচ্ছিস খোকা ! আমার বুকে কি কোনও মায়া আছে রে ! নেই। ওসব নরম ব্যাপার আমার মধ্যে নেই। থাকে না।

—কই আসুন ?

—না।

—না, কী ?

—যদি পারেন, খোকাকে ছেড়ে দিন। না পারেন, বড়বাবুকে বলে সদরে চালান করে দিন। মেরে ফেললে বিপদে পড়বেন।

—ভয় দেখাচ্ছেন ? খোকা মানে কী ? এটা খোকা ? দুদু খায় ? আপনাকে দেখে মিহিরবাবু, লোকনাথপুরের মাস্টারমশাই মনে হচ্ছে।

—কী ?

—ঝুনু মাস্টার। লোকে বলত ঝুনো মাস্টার। নাকের চুলে নস্য লেপ্টানো, হাঁপানি, লবঙ্গ চুষত। বিড়ি খেত লম্বা লম্বা।

—ধুর ! বলেই চেয়ার ছেড়ে কিসের এক ঘৃণ্য ধাক্কায় উঠে পড়েন মিহির। বাইরে বেরিয়ে চলে আসেন। তাই দেখে সমীর পুরকাইত হো হো করেন সশব্দে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দেবদারু গাছের ফাঁকে সূর্যাস্ত দেখেন। সূর্যাস্তের আলোয় ছাতারে একদল পাখি পোকা খুঁটে খাচ্ছে। আকাশ থেকে লম্বা হয়ে নেমে এসেছে রোদ, যেন একটা পথ বা সুদীর্ঘ সড়ক নেমেছে।

—হায় ভগবান এমন করে আলো নামে কেন ! দেখে বড় কষ্ট হয়। গত জন্মের কথা মনে পড়ে। আমি ছাতারে পাখির দলে পাখি হয়ে অনেক নেচেছি বোধ হয়। আমি কি পাগল ? আমার কেন এমন হয় ? হায় রাম !

আপন মনে বিড়বিড় করেন মিহির ভট্ট। তাঁর এই মনের অদ্ভুত অনুভূতির কথা কেউ বুঝবে না। গত জন্মের কথা তাঁর মনে আসে কেন ? নিজেকে ছাতারে পাখির মধ্যে দেখতে পান কেন ! অজস্র পতঙ্গ উড়ছে রোদের তরঙ্গে, ওই সব পতঙ্গ কি আশ্চর্য উদ্বেল। মরছে তবু থামছে না। ওরা কি বুঝতে পারছে না, পাখিগুলি ওদের খেয়ে ফেলছে।

পাখা ঝাপটে ঝাপটে খরখর করে পাখিগুলি চিরুনি তল্লাসির মত চলে যাচ্ছে নাচতে নাচতে। জীর্ণ পাতা, ঝরা পাতার ভিতর দিয়ে নেচে নেচে চলেছে। পাখার ঝাপটায় পতঙ্গ লাফিয়ে লাফিয়ে রোদের মধ্যে আকুলি বিকুলি করছে। হা ঈশ্বর ! এমন কেন হয় ? ওই রোদের ভিতর দিয়ে তারা রোদের পথ বেয়ে ঈশ্বরের কাছে চলে যেতে পারে না ?

অজস্র, অজস্র পতঙ্গ—তারা কিসের মোহে জেগে ওঠে পাতার আড়াল থেকে, স্যাঁতসেঁতে মাটির উষ্ণতা থেকে, রোদ দেখে তাদের কী যেন হয়ে যায় ! পাখির পাখার ঝাপটায় তাদের আর চুপ করে থাকে না পাখার ধুনন। তারা খুদে খুদে ডানা কাঁপাতে কাঁপাতে ওঠে। পাখির ঠোঁটের ফাঁকে চলে যায় তাদের স্পন্দিত ক্ষুদ্র প্রাণ, তাদের যূথবদ্ধ জীবন ফুরিয়ে যেতে থাকে। তারা কি বোঝে না ?

পুরকাইত শিগগিরই ও. সি-র পোস্ট পাবে। গতজন্মে সে-ও ছিল খরখরে ছাতারে পাখি, নাচতে নাচতে সে এ জন্মে চলে এসেছে, ওই রোদ দেখে কখনও সে আকাশে চেয়ে দেখবে না, আকাশ সূর্যাস্তের আভায় কী শোভনীয় হয়ে কত দূর ভেসে রয়েছে

এখন, সমস্ত রাত খোকাকে ঠোকরাবে, হঠাৎ সেলের মধ্যে ঢুকে ঘুমন্ত ছেলেটাকে মেরে টেনে তুলবে। বিপ্লবী জীবনে কোনও ঘুম নেই, প্রাণ কখনও আরাম পায় না— একটা ভুল আত্মদানও কত কষ্টের ! খোকা ! তুমি ভুল করেছ বাপা ! হায় ঠাকুর !

পাখিদিগের দিক থেকে চোখ টেনে এনে বাইরের বারান্দায় টানা বেঞ্চের প্রান্তে হতবাক বসে থাকা মোসলেমের দিকে চাইলেন মিহির। মনে মনে বললেন, কেন আসে লোকটা ? এত অথর্ব মানুষ এখানে এসে কী করবে ?

মোসলেমের কাছে এগিয়ে এসে বললেন—চলে যাও মোসলেম, সন্ধ্যা হল !

—যাই বাবু !

—কেন আসো ?

—আমার কদমকে ছাইড়ে দ্যান ছোটবাবু !

—চোর !

—হ্যাঁ, বাবু !

—ছাড়বেন না পুরকাইত। কদম আমাদের লোক, ওকে রাখা হয়েছে কাজের জন্য। ভেবো না। কাউকে বলে দিও না। আপনা থেকে বাড়ি ফিরে যাবে।

—জি ! বলে যেন শিউরে উঠল মোসলেম।

হঠাৎ উচ্চকিত প্রবল আর্তনাদ হল হাজতের মধ্যে। আহ্ বেচারি ! অস্ফুট কঁকিয়ে উঠলেন ভট্ট। তারপর দ্রুত ঘরে ঢুকে এসে দেখলেন সেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন পুরকাইত। কবির মাথার চুল শক্ত মুঠিতে ধরে পেটে ঘুষি ছুঁড়ছেন মুহুর্মুহ পাগলের মত।

—দ্যাখ্ কদম, দেখে রাখ ! ছাল ছাড়াব, নুন মাখাব। তুই প্রণামপুর যাবি। তোর ডিউটি ! বুঝলি ? বলে দৃষ্টি বাঁকা করে কদমকে দেখেন পুরকাইত।

—নাহ্।

—বল্ শালা। শুয়োরের বাচ্চা !

—আই কান্ট সুইম।

—বাংলা বল্ হারামজাদা।

—সাঁতার জানি না মেজবাবু ! ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দিন। বলে সেলের মধ্যে ঢুকে এসে মিহির এক প্রকার জোর করে পুরকাইতকে বাইরে টেনে আনেন।

—এ কী করছেন আপনি ! এ আপনার এক্তিয়ার নয় মেজবাবু। মরে গেলে সত্যিই বিপদে পড়ে যাবেন। কেউ আসছে না দেখে আপনি ভাবছেন ওর কেউ নেই, তাই না ?

—আমাকে আপনি এক্তিয়ার শেখাবেন না ভট্ট।

—পাগল হয়ে গেছেন আপনি।

—ওর কে আছে বললেন ?

—আছে, আছে।

—কে ? কই বলছে না কেন ! আমি তো নামটাই শুনতে চাই। ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে ? আপনি এই লাইনটা ছেড়ে দিন দয়া করে। সহ্য করতে না পারেন ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যান। ক'দিন ছেলেবউয়ের মুখ দেখে আসুন। ওর কে আছে সেটা বলতেই হবে ওকে।

—আছে। কিন্তু মরে গেলেও বলবে না। ও তো মরবার জন্যই তৈরি হয়ে গেছে,

দেখতে পাচ্ছেন না ?

—ওকে আপনি উৎসাহ দিচ্ছেন মরতে ! হাউ স্ট্রেঞ্জ !

—দিচ্ছি ! কারণ, জীবনটা এখন আর ওর হাতে নেই।

—আপনি কে মশাই ! দারোগা ?

—নিশ্চয় দারোগা। দারোগারও উচিত দু'একটা সত্য কথা বলা।

—তাহলে তো আপনি যুধিষ্ঠির দেখছি। যুধিষ্ঠিরেরও দারোগার চাকরি হয় তাহলে ? আপনার সমস্ত রিপোর্ট অম্বরদা জানবেন। আমি বলব।

—বলবেন। সেলের দরজা বন্ধ করুন।

—কেন ?

—অবশ্য ও আর পালাতে পারবে না, সেই শক্তিই নেই।

—হ্যাঁ, ভট্ট। নেই। নেই কেন জানেন ? ও স্বীকার করেছে দেবপ্রতিম প্রণামপুরেই আছে। একটাই কথা বার করতে পেরেছি।

—এবার ওকে, অতএব মেরে ফেলুন মেজবাবু ! আর রাখবেন না। বলে প্রায় লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে চলে আসেন মিহির ভট্ট।

বড়ই আশ্চর্য হয়ে যান পুরকাইত। ভট্টের কথাটি তাঁকে অভিভূত করে ফেলে।

—তোকে তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি তিলক !

—নাহ্ ! বলে অদ্ভুত কান্নায় ডুকরে কেঁদে ফেলল কবি, এই প্রথম। বলল—আমায় আর ছেড়ে দেবেন না দারোগাবাবু ! দয়া করুন, প্লিজ !

॥২৯॥

কদম আলি মধ্যযুগের লোক। বিশেষত অপরাধীর শাস্তির বিধান বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পুরনো। চোর হিসেবে তার নামডাক আছে, সেই সুবাদে থানা তাকে ইদানীং পালন-পোষণ করছে, মাঝে মাঝে পাকড়ে আনে, আবার ছেড়ে দেয়, মারধর যে না করে এমন নয়, তবে সেই মার খেয়ে গা আরও সুড়সুড় করে।

আরব দেশে এককালে চোরের হাতপা কেটে দিত রাজারা। সেই সব কঠিন শাস্তির ভয় থাকা সত্ত্বেও চোরের উপদ্রব কমত না। ভারতে দেখা যাচ্ছে অন্য রকম। চোর হল থানার স্পাই। তা-ও ফের সাধু লোকদের হাজতে ভরবার জন্য চোরকে কাজে লাগানো হয়। সাদা চৌধুরীকে ধরে এনে কদমকে বকশিস দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল—ঘটনাটা আজও কদম আলি বুঝতে পারেনি। কারণ চোর ছাড়া পেয়ে গেল, সাধুর হল জেল। বা চোরকে বকশিস দিয়ে দিলে থানা—কিছুই আজকাল আর বোঝা যায় না। বাস্তবিক অদ্ভুত ধন্দ।

এবারে পাম্প মেসিনের পার্টস আর স্যালো-পাইপ চুরি করে কদম প্রথমে ঘাড়বে গিয়েছিল, শশাঙ্ক না চাইলে কদমের ইচ্ছে ছিল না বাবুর জিনিসে হাত বাড়ায়।

চুরি করলেও যে হাজত, বিপ্লব করলেও সেই হাজত। তাহলে বিপ্লব না করে চুরি করলে অসুবিধা কোথায়! বরং এই দেশে চোরের মায়ের বড় গলা আর বিপ্লবীর মা কথা বলতে পারে না। অবশ্য কদম বিপ্লব মানে এক ধরনের হুজ্জোত ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

কবির মার খাওয়া দেখতে দেখতে মাঝে মাঝেই চরম উত্তেজিত হয়ে উঠছিল কদম আলি। এত মারধর করলে ঘুমের বড্ড বিঘ্ন হয়। ক'রাত্রি ভাল করে ঘুমোতে পারেনি সে। কদম আলি মুখ বুঁজে মার খেতে পারে, সেই একটা বিদ্যা তার জানা আছে। কিন্তু এত মার খেতে কোনও মানুষকে সে দেখেনি। কদমের কোমরে ঘুনসির সঙ্গে জড়ানো সূতাবাঁধা কবচ আছে, মার সইবার ব্যবস্থা। ওই ছেলেটার তো সেসব কিছুই নেই। তাহলে ও বেচারি সহ্য করছে কী করে?

কদমের ইচ্ছে হল, নিজের কোমর থেকে খুলে সে কবচখানা, জড়িবুটির গাছড়া বিছেটো কবিকে দিয়ে দেয়।

বলল—লিবা ভাইজান?

কবি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে পড়তেও ক্ষীণ একটু হাসল নিঃশব্দে। তা দেখে বড়ই আশ্চর্য হল কদম। বুঝতে পারল, কবি ওই কবচে বিশ্বাস করে না, কিন্তু প্রস্তাবে খুশি হয়েছে।

বলল—তোমার কাছেই রাখো কদম। আমি আর বাঁচব না। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমাকে বাঁচতে দিও না।

হঠাৎ এই কথায় কদমের বধির হৃদয়টাও কেন যেন সামান্য কেঁপে উঠল। ও বুঝতে পারছিল না, বুকের ভিতরটা সিরসির করছে কেন।

—এই কবচের অনেক ধক আছে দাদা!

—জানি।

—লেও।

—না, কদম। আমাকে মরতে দাও।

—ঘিন্না কর নাকি গো! কবচ কিন্তুক শুদ্ধ জিনিস দাদা! পাপ নাই।

—রাখো। ও আমার কাজে লাগবে না কদম।

বলে কবি চোখ বন্ধ করে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে যন্ত্রণা দমন করে। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মেঝেয় পড়ে যায়।

লম্বা টেবিলটার উপর পা ঝুলিয়ে ফ্রক পরে আলোর মত জ্বলজ্বল করছিল নয় দশ বছরের মেয়েটি, বড় দারোগার কনিষ্ঠা মেয়ে, পায়ে লাল 'নটি' জুতা, সাদা মোজা, ফ্রকের তলে নরম জাঙ্গিয়া। রঙ ফর্সা, চুলে ফিতা বাঁধা, গোল মুখটা তত গোল নয়, থুতনিতে তিল, ভারি মিষ্টি। পা দোলাচ্ছিল মেয়েটি। সুপ্ত চৈতন্যের যন্ত্রণা শরীরে ছড়ানো, তবু বালিকার মুখটা কবি ভুলতে পারছে না।

—এত আলো!

—আমার ফ্রকের রঙ তিলে দাদা! তুমি আমার বর। এসো বরবউ খেলি।

—এত ফুল!

—আমি পরী। ফুল নই। আমার নাম জুঁই বটে। আমার পাখনা আছে। হ্যাঁ, গো!

জুঁই নামে ছোট্ট একটি মেয়ে যে-নিজেকে পরী ভাবত, তার সঙ্গে ছেলেবেলায় বরবউ খেলেছে কবি, ওসি-র মেয়েকে দেখে বারবার মনে হচ্ছিল, টেবিলে বসা ওই সেই জুঁইরানী। অবিকল সে। কবির দিকে এক মনে তাকিয়ে পলক ফেলছিল না। ফ্রকের একটি প্রান্ত তুলে দাঁতের ফাঁকে ধরে অদ্ভুতভাবে কবিকে দেখছিল। দৃষ্টি ঈষৎ বাঁকা, ঘাড় কাত করা।

একটু ঢুলুনি মত আসে কদম আলির। ঘুমের মধ্যেও 'কোন স্বস্তি নেই। যে-কোন

সময় ছেলেটার উপর আক্রমণ নেমে আসবে। ছেলেটা তখন গোঙাবে। সেই কাতরানি আর ভাল লাগে না। এই ক'দিন কেবলই এই দৃশ্য দেখে দেখে কদমের চোখ পচে গেছে। এখন সে আর সহ্য করতে পারছে না। যদিও মুখে কখনও সেকথা বলা যাবে না। তার বিচারে ছেলেটাকে মেরে ফেলা ভাল। একখানা হাত কেটে, পা দুমড়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ভাল, যাতে আর আন্দোলন না করতে পারে।

—অ্যাই খুকা! কমরেড! উঠো, উঠো। নিঁদ আসে দাদা?

আর বেচারি চোখ তুলতেও পারছে না। আহা! মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে গো! কষের লালা আর রক্ত গড়িয়ে যায়। মুখের কাছে একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে কেন ঘুরছে? হায় আল্লা!

মালেক-উল-মৌৎ কি অদৃশ্যে দাঁড়ায় এসে গরাদের কাছে? আমার ছেলেটা, আমার আমানি কি এই রকমই মার খেতে খেতে মরেছিল! সোনার বর্ণ এই জীবন, তার কী হেনস্থা হয় সংসারে। আমানি গরুর পায়ে ফাল লাগায় আর কুকথা কইলে দিনমান, কে সইবে, দোষ হয় বড়। কিন্তু কবি তো কোনও কুবাক্য বলে নাই।

—খুকা! উঠেন জাগেন! চোখ তুলো ভাই! 'আক্রম' হয় তুমার উপরি, তবো তুমি খারাপ কথা কহেন নাই। ইডা কেমন হয় বাছা!

এত ডাকাডাকিতেও চোখ মেলে না কবি। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকায় কদম আলি। গা ঠান্ডা, অসম্ভব স্তব্ধ। নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে কেমন চমকে ওঠে।

—নাই। আর নাই।

বিড়বিড় করতে থাকে কদম। তারপর চিৎকার করে ওঠে।—বাবু! ও মেজবাবু!

লকআপের মধ্যে কবির নিস্তব্ধ কুঁকড়ে পড়ে থাকা দেহটির দিকে চেয়ে দেখে এই মধ্যরাতে পুরকাইত কেমন চমকে ওঠেন। ভাবতে পারেননি সত্যিই ছেলেটা এভাবে মরে যেতে পারে। তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গায়ে হাত দিয়ে টের পান, শেষ হয়ে গিয়েছে, নাকে নিঃশ্বাস বইছে না।

—একে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। বলে উঠলেন সমীর পুরকাইত। গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছোটবাবুকে জাগিয়ে তুলে বললেন—কবি মারা গিয়েছে, উঠুন!

চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মিহির ভট্ট। জেগে উঠে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে রইলেন। চোখ মেলে গরাদের দিকে চাইতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না।

জড়িতস্বরে ভট্ট বললেন—কোথায় ফেলে আসব মেজবাবু?

—ভাবুন সেটা, আমি বড়বাবুর কোয়ার্টারে রিপোর্ট করে আসি। ড্রাইভারকে বলে গাড়ি ঠিক করে রাখুন। আমি আসছি। এক কাজ করা যায়, ওকে সদরঘাটের জলঘেরে ফেলে দিলে কেমন হয় ?

—না। ওই সর্বনাশটি করবেন না। মেরে ফেলেছেন, এলাকার জনসাধারণকে আর উত্তেজিত করবেন না।

—তাহলে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসুন। অথবা যেখানে খুশি..... আমার ঠিক মাথায় আসছে না। এখানে আর রাখা যায় না। কদমকে সঙ্গে নেবেন। ওকে ছেড়ে দিতে হবে। ওর সঙ্গে কথা বলেছি।

কদমের দিকে চেয়ে দেখে সমীর পুরকাইত বললেন—কদম! তোমার ছুটি। ইচ্ছে আর সুবিধা মত জিপ থেকে নেমে চলে যেও। তুমি প্রণামপুর গিয়ে যা বলেছি, তাই করবে। এখন সোজাসুজি গাঁয়ে ফিরে যেও না। কাল মোসলেম এলে যা বলার আমিই বলব। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আসছি। কদমকে তালা খুলে বার করুন ছোটবাবু। দেরি

করবেন না। মড়া আগলে বসে থাকা ঠিক নয়।

বড়বাবু জিপ নয়, নীল ছোট ভ্যানে করে মৃতদেহ নিয়ে যেতে বলেছেন। মানুষ যাতে ভাবতে পারে, চোরডাকাত যাচ্ছে। সদরঘাটে লোক জেগে থাকে, হোটেল খোলা থাকে। জিপে করে যাওয়া রিস্কি। গাড়ি ছাড়ল।

মেজবাবু সঙ্গে দুজন পেয়াদা দিতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে নিতে চাননি মিহির ভট্ট। বলেছিলেন, কদম সঙ্গে আছে, পাইক-পেয়াদার দরকার নেই। শুধু রসুলকে দিন সঙ্গে।

আসলে কেন বলেছিলেন মিহির ? কবির মৃত মুখের দিকে তির্যক চেয়ে দেখে তাঁর কেন যেন মনে হয়েছিল, মানুষের প্রাণ বড়ই কঠিন, সহজে ছেড়ে যায় না। একথা তিনি ভেবেছিলেন, মুখে কিছুই বলেননি। কবির মুখের দিকে কেউ ফিরেই চাইছিল না। কেনই বা চেয়ে দেখবে তাকে ! সে তো মরে গিয়েছে। মরে গেল, সত্যিই মরেছে কিনা কেউ সেকথা ভাল করে ভাবতেও চাইল না। তাকে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে পারলেই যেন থানা নিশ্চিন্ত হয়। থানার ঘৃণা বড়ই তীব্র। তার ভাষা অকথ্য, তার ঘৃণার পরিমাপ নেই, অত্যাচার কোনও মাত্রা মানে না—মনেই হয় না মানুষ মানুষকে মারছে। একথা মিহির ভাবতে গিয়ে কেমন অবশ হয়ে যান মনে মনে। কবির মাথাটা কোলের উপর টেনে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ ডেডবডি গাড়ির মেঝেতে পিছনে পড়ে আছে। একখানা কাপড় ফেলে দেওয়া হয়েছে মৃতের শরীরে। কাপড় তুলে কবির মুখটা একবার দেখতে সাধ হয় ছোটবাবুর। কিন্তু তিনি চুপ করে বসে থাকেন।

একটি অলৌকিক রক্তমাখা চাঁদ উঠেছে পুবাকাশে। চাঁদের আকৃতি থালার মত নয়, ফুটবলের মত। মনে হচ্ছে ভূ-গোলকের পানা মেটে রঙের রক্তাক্ত চাঁদটি কাটা মুণ্ডুর মত আকাশে ঝুলছে, দিগন্তের গাছপালার এক বিঘত উপরে। ওদিকে চেয়ে থাকতে পারেন না মিহির। অথচ চোখের সামনে আকাশটাও যেন অনেক সরে এসেছে আজ। এ চাঁদ জ্যোৎস্না দেয় ঘোলা রক্তের মত। ক্রমশ সেই জ্যোৎস্না চাল ধোওয়া জলের মত লাগে, পানসে। চাঁদের দুই পাশ দিয়ে হাওয়া ছুটে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

—স্যার ! চাপা স্বরে পিছন থেকে কে যেন ডাকছে। লোহার জালের ওপাশে ডেডবডি, রসুল এবং কদম আলি আছে। ড্রাইভারের পাশে সম্মুখে বসে আছেন মিহিরবাবু। ড্রাইভার একখানা বড় রুমালে মাথা মুখ ঢেকে নিয়েছে। এই লোকটি অত্যন্ত কম কথা বলে। গাড়ি ছাড়ল, কোন্‌দিকে যেতে হবে জিজ্ঞাসাও করল না। গাড়ি বহরমপুরের দিকে ছুটছে।

—স্যার !

—কে ?

—আমি স্যার ! রসুল।

—কী হল ?

—ডেডবডি নড়াচড়া করছে স্যার !

—তাই নাকি ! ওহে কৃষ্ণ, দাঁড়াতো ভাই, একটু নেমে দেখি। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। ছেলেটা হয়ত এখনও বেঁচে আছে।

ড্রাইভার কৃষ্ণগোপাল গাড়ির গতি থামাতে থামাতে বলল—থানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব ?

—পাগল হলে নাকি ! একটু আধটু নড়াচড়া করলেই কি কেউ বাঁচে ? তাছাড়া

ডেডবডি গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলতে পারে, অনেক সময় ওইরকম হয়।

বলতে বলতে মিহিরবাবু ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে আসার সময় জলের ফ্লাস্কটা সঙ্গে নিলেন।

—রসুল! খোকার মুখে একটু জল দাও ভাই। হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ছেলেটা হয়তো বেঁচে যেত। কিন্তু সেই উপায় তো নেই। ডাক্তারের কোনও প্রাইভেট চেম্বারেও নিয়ে যেতে পারব না। দাও, জলটুকু দাও। বলে ফ্লাস্ক এগিয়ে দেন মিহির। টর্চের ঝাপসা আলো নিক্ষেপ করেন গাড়ির ভিতরে। রসুল জল দেয় কবির মুখে।

—জল খায়?

—খায়।

—গিলছে?

—আজ্ঞে স্যার!

—দাও। আরও দাও। মরবার আগে জল দেওয়া পুণ্যের কাজ। একটা পাখিকেও জল দিতে হয়।

—দিয়েছি স্যার।

—আরও দাও। যতক্ষণ পারছে দাও।

—আর নিচ্ছে না স্যার!

—ঠিক আছে। বাঁচবে না, বুঝলে?

—আজ্ঞে সেই রকমই মনে হচ্ছে।

—মনে কী হচ্ছে তোমার! অনেক দেখেছি রসুল, বাঁচে না। এইরকম কত কৃত্য করেছি ভাই, পুলিসের চাকরি। মরে যাচ্ছে দেখেও চুপ করে থাকতে হয়। চল।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মিহির ভট্ট ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলেন—বুঝলে কৃষ্ণগোপাল! মরবার আগে প্রত্যেকের প্রবল তেষ্টা পায়। আমি অজস্র ভালমন্দ কেস স্টাডি করে দেখেছি, সবারই জলকষ্ট হয়। আর কিছু না। শুধু জল।

ড্রাইভার কথা বলে না। মিহিরবাবুও ফের চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ।

হঠাৎ ছোটবাবু বলে ওঠেন—আচ্ছা! খোকা কী ভাবছে বলতে পার। পার না। কিন্তু আমি পারি। সে কেন এখনও মরে যেতে পারল না। ব্যস!

এইটুকু বলার পর অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে যান ছোটবাবু। সহসাই তাঁর মনে হয়, পুরকাইত কী করতেন এতক্ষণ! গাড়ি থেকে কবিকে নামিয়ে দিয়ে রাস্তার উপর গুলি করে দিতেন। জলের বদলে গুলি। সবাই এরা বুঝতে পারছে, ভট্ট লোকটি পুলিসের কাজ করছেন না। জল দিচ্ছেন খেতে, এটা অত্যন্ত হাস্যকর দৃশ্য।

ফের গাড়ি থামাতে বলেন ভট্ট। কৃষ্ণগোপাল অবাক হয়। ছোটবাবুর আর আদিখ্যেতার শেষ নেই, যেন বা পাগল। আবার জল খাওয়ানোর দৃশ্য। প্রায় একই ধরনের সংলাপ।

—আর কিন্তু নিচ্ছে না স্যার!

—ছেড়ে দাও। আর কী নেবে, ওর হয়ে এসেছে রসুল!

—আজ্ঞে দুবার হেঁচকি তুলেছে। কাঁপছে।

—পাখিকেও জল খাওয়াতে হয়। পথের ভিখিরিকেও হয়। চল।

আবার গাড়ি ছাড়ে। বিশ মিনিট চলার পর আবার গাড়ি থামাতে বলেন ভট্ট।

কৃষ্ণগোপাল এবার বিরক্ত হয়ে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে।

—আপনার আর পাগলামির অন্ত হয় না দেখি, কী করেন! পুরকাইত সাহেব এতক্ষণ গুলি করে দিতেন। বলে গজগজ করতে থাকে কৃষ্ণ।

এই সময় কদম আলি 'হায় আল্লা' বলে ডুকরে ওঠে। কেন ওঠে সে নিজেও জানে না। কৃষ্ণগোপাল কদমের মায়াকান্না দেখে রেগে যায়।

—শালা, তুমি আল্লার নাম করছ এত রাতে! চোখের সামনে অত মারধর হল, কই খোদার নাম ত করনি? যা হট! বাঁচবার জন্যে এত ভনিতে করতে তোর বাধে না কদম! শালা পাপী! ছোটবাবু! এখানেই ফেলে দিন ছেলেটাকে। ওই পার্কের ঝোপের মধ্যে গুঁজে দিন।

কৃষ্ণের কথায় কদম কাঠ হয়ে যায়। রসুল আর কদম কবিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলে। একজন ধরে মাথার দিক, অন্য জন পায়ের দিক। ঝোপের কাছে এনে নামাতে গিয়ে হঠাৎ কদমের মনে হল কবি যেন তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। শিশু যেমন বাপ-মাকে ধরে। আমানি কি এইভাবেই কখনও বাঁচতে চেয়েছিল? খুব তিয়াস লাগে বুঝি! জীবন তো এক তিয়াসনামা কবি, পানি ছাড়া বাঁচে না। বোকা লোক আমি, তবু তিয়াসের কথা জানি, সোনার জীবন, সোনার জীবন যে কী, তাও জানি তিলেভাই।

আমার কান্নাও যে মানুষ বিশ্বাস করে না, আম চোর। আমি পুলিসের চর। থুক। থুক। থুক দিই এই জীবনকে।

আপনমনে কথা বলতে বলতে ঘাড় থেকে একটু জোর করেই কবির হাতটা নামিয়ে ঝোপের ভিতর সামান্য ঠেলে দেয় কবির দেহ। তারপর সিধে হয়ে উঠে দাঁড়ায়। রসুল আর সে গাড়ির কাছে ফিরে আসে।

ভট্ট বলল—আর নড়াচড়া করছিল?

কদম বলল—না। বুঝতে ঠিক পারা যায় না বাবু।

ভট্ট বললেন—ঠিক আছে। চল।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

এই ভাবে কবিকে ফেলে দিয়ে থানার ক্ষুদ্র বাবুটি এতই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন যে, সমস্ত পথ একটিও কথা বলেননি। কিছু দূর আসার পর শুধু কদমকে নামিয়ে দিলেন তিনি। কদম কী একটা কথা বলতে গিয়ে সাহস পেল না। গাড়িও আর দাঁড়াল না।

বাকি অর্ধরাত্রি চাঁদ ক্রমশ সাদা হয়ে উঠল। অবিশ্রান্ত মৃদু হাওয়া কবির দেহে মাতৃস্পর্শে বয়ে যেতে থাকল। কবি দেখল নিরুদ্ধ চোখের স্মৃতিপথে, জুঁইরানী তাকে ডাকছে, এসো তিলেদা—খেলবে না?

চাঁদের আলো আরও স্বচ্ছ হয়, সেই জ্যোৎস্নায় জোনাকি ওড়ে এবং ঝিঁঝিঁ ডাকে। কবির মাথার চুলে শিশির ঝরে। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পায় স্পষ্টত। খুব স্পষ্টত সে বোঝে সে আর থানা-হাজতে নেই। যদিও সংবিৎ জেগেছিল অনেক আগে এবং কোনও মুহূর্তেও সম্পূর্ণ চেতনা তার লুপ্ত হয়নি। কদম আলি যখন 'নাই নাই' করে উঠল গারদের মধ্যে, সেই হায় হায় সে শুনেছে—শুনেছে কদম তার মৃত্যুর ঘটনা ঘোষণা করছে কেমন ভয়ার্ত বিস্ময়ে। তখন কবি কোনও প্রতিবাদ করল না, তার স্বর ফুটল না।

সে কি তবে মৃত্যুর অভিনয় করেছে তখন! সে কি পারত না জেগে উঠতে? কোনও ক্ষমতাই কি তার ছিল না! কদমের ঘোষণা সত্য ছিল না, কদম সহসা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কবির দেহ মেনে নিতে চাইছিল মৃত্যুর খবর, মিথ্যা রটনা। মন বলছিল সেই

মিথ্যার প্রতিবাদ সে করে। কিন্তু পারল না কেন কবি ? কদম তাকে কবচ দিতে চাইল, তাই-ই কি তাকে জীবনের জন্য প্রলুব্ধ করে ?

কবিকে মৃত্যুই যেন লুব্ধ করেছে ; মৃত্যু আর জীবনের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে সে মৃত্যু আর জীবনকে পৃথক করতে পারেনি। একটা সূক্ষ্ম লোভ আলোড়িত হয়ে ওঠে, জুঁইরানী তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করে দেয়। ও. সি-র মেয়েটি যদি অমন করে চোখের সামনে না আসে, অত আলো, অত ফুল না আসে, তা হলে সে কখনওই কদমের ঘোষণাকে মেনে নেয় না।

এই কৈফিয়ত জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হলেও, বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাবার চিঠি কি তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল ! একটি কলের পাখির গান, সেই কাগজ-কুড়ানি ছোকরা কি তাকে বিবশ করে ফেলে ?

কবি আত্মত্যাগ করতে পারল না, অথচ পার্টির কর্ম-প্রচেষ্টাকে সে প্রতারণা করল। দেবপ্রতিম যে প্রণামপুরে রয়েছেন পুলিসের কাছে একথা কেন সে কবুল করল ?

দুজন মাহেফরাসের মৃত্যুর পর কেন সে ডোঙা বেঁধে মামার ওখানে চলে আসে ? অথচ তার প্রণামপুর যাওয়া উচিত ছিল। তা সে গেল না। হঠাৎ এভাবে চলে আসার পর সেই যে ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুম তাকে কাহিল করে দিল। ঘুমই তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এত ঘুম কিসের ! এত মাদকতা জীবদেহের কোথায় থাকে ! বাবার চিঠি পেয়ে সে মায়ের কাছে পৌঁছতে চায় এবং সে মণির আহ্বানে উৎসাহ বোধ করে না। কেবলই মনে হতে থাকে সে ধরা পড়ে যাবে। তিমিরবরণ তাকে ধরিয়ে দেয়। সমস্ত ঘটনা এখন সে কাকে বলবে ? কে শুনবে তার কথা ! বাবার চিঠিটাও হারিয়ে ফেলেছে কবি। কোথায় ফিরে যাবে সে ? অবশেষে মৃত্যুই তাকে ছলনা করে গেল ! জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল তার। ব্যর্থই শুধু না, অশেষ গ্লানি তাকে কুরে কুরে খেতে থাকল।

খিদে পেয়েছে আর তীব্র তেষ্টা গলা শুকিয়ে তুলেছে। একটু জল না হলে আর তো বাঁচা যায় না ! বুকের ভেতরটা কারবালার মরুপ্রান্তরের মত ধু ধু করছে। মনে পড়ে যায় ফুলচাচার জারিগান :

> ডাইনে সাপা বাঁয়ে শৃগাল
> ধীরে চালাও পা
> জয়নাল যেন রণে যায় না !

দক্ষিণ আর বাম বিচ্যুতির ইঙ্গিত আছে গানে। এক বিশ্বাসঘাতক সর্প তাকে দংশন করে গেল। তিমিরবরণ আর তার মধ্যে পার্থক্য কোথায় থাকল ? আজ যদি হরবোলা ধরা পড়েন সমস্তই বিফল হবে। ক্ষমা নেই। কোনও ক্ষমা নেই। নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

বুক দিয়ে ঠেলে হিঁচড়ে দেহটাকে ঝোপের বাইরে টেনে আনে কবি। আর সে পারে না, এত গ্লানি, এত পরাজয়, এত প্রতারণা, তবু সে বেঁচে আছে ! নিজেরই শরীরের প্রতি তার অশেষ ঘৃণা হচ্ছিল।

কবি ক্রমশ টের পাচ্ছিল সে চুনাখালির পার্কের মধ্যে ঝোপের আড়ালে পড়ে আছে। এখানেই তাকে ফেলে রেখে গেছেন ছোটবাবু। ইচ্ছে করলে তাকে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারতেন, তা হলে এই ঘৃণা আর গ্লানির হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে যেত। সাঁতার সে জানে না। বউদির চিরকুটের কথা মনে পড়ে যায়।

ঘাসের উপর উঠে বসল কবি। সমস্ত শরীরে এত ব্যথা যে হাত-পা নাড়তে ভীষণ কষ্ট

হয়। এখনও ভোর হয়নি। পুব আকাশে এখনও রঙ ধরেনি, সেখানে এখনও জমাট বাঁধা অন্ধকার। বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সে। প্রথমে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে, আকাশের দিকে মুখ তুলে শ্বাস টানে, যেন সে দম পাচ্ছে না। তেষ্টায় গলা আরও কাঠ হয়ে আসে।

আবার চেষ্টা করে কবি। বুঝতে পারে, পার্কের কোণের জলকলের কাছে তাকে যেতেই হবে। গলায় জল না দিলে সে আর কিছুতেই বাঁচবে না। অতএব জোর করে নিজেকে খাড়া করে। চার ধাপ আসার পর আবার পড়ে যায়। বসে থাকে, শ্বাস টানে। মুখ দিয়ে কি রক্ত উঠে আসবে ? বমি বমি ভাব হয়। বমি হয় না। ভয় করে, হয়ত রক্তই উঠবে। অনেকক্ষণের চেষ্টায় সে অতঃপর কলের কাছে পৌঁছতে পারে। নলকূপের হাতলে হাত দেওয়া মাত্র সেটি নেমে যায়। জল পড়ে না। বুঝতে পারে কলে জল নেই, বিকল।

তা হলে এখানে কি সূর্য ওঠার আগেই তার মৃত্যু হবে ? সে কি সত্যিই বাঁচবে না ?

পার্কের বাইরে পাকা সড়কের উপর এসে পড়ে কবি। হাঁটতে হাঁটতে আবার পড়ে যায়। পাকা সড়কের নীচে টানা বিল লাগবাগ পর্যন্ত গেছে। বিলে পানার তলে প্রচুর জল। কিন্তু এত উচ্চ খাড়ি যে নামতে সাহস হয় না। কবি বুঝতে পারে, নামার চেষ্টা মানেই মৃত্যু। কারণ সে গড়িয়ে পড়ে যাবে, কারণ সে সাঁতার জানে না। বউদি লিখেছিল, কবি তুমি সাঁতার জান না। সে কথা কি মনে আসে না ?

বউদি ! সবই তো এখন আমার মনে আসে। তোমার হৃদয়কে আমি আজ স্পষ্ট বুঝতে পারি। তোমার রাজনীতি আলাদা, তোমরা যেভাবে বিপ্লবের কথা ভাব, আমরা তা ভাবি না। এমনকি তোমরা আদৌ কোনও বিপ্লবী শক্তি কিনা বুঝে পাই না। কখনও মনে হয় তোমরাই হয়ত ঠিক। কখনও মনে হয়, তোমরা আর পাঁচটা সোসাল ডেমোক্রাট দলের মতই পেটি-বুর্জোয়া দল। অথচ তোমার দল সংসদীয় রাজনীতির সেবাও যে করে, তা-ও কিন্তু মনে হয় না। তোমার দলে রাজাউজির দেখি না। সৎ ছেলেমেয়েদের দেখি।

এখন তুমি বলে দাও বউদি, আমি কি মরে যাব ? সাঁতার জানি না, আমি কি বিলের জলে গড়িয়ে পড়ে যাব ? আত্মহত্যা করব ? কেউ বুঝতেও পারবে না আমার কী হয়েছিল। ভাববে, পুলিস আমাকে মেরে ফেলে এই জলে ছুঁড়ে দিয়েছে। আত্মহত্যাও তো জীবনের অপমান। কিন্তু মানুষ বুঝতেও পারবে না, আমি কীভাবে শেষ হয়ে গেছি। সেই অপমানকে আমি লুকিয়ে নিয়ে চলে যাব এই আসন্ন উষার আঁধারে, শুধু কিছু পাখির কলরব ছাড়া আর কোনও শব্দ হবে না। যেভাবে লক্ষ্মণ মরেছে, যেভাবে আমার দুজন মাহেফেরাস কমরেড গেছে, ঠিক সেইভাবে আমিও যেতে পারি।

অন্যথা আমায় বাঁচতে হবে। আমার কি কোথাও ঠাঁই আছে আর ? আমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বউদি ! ডাক্তারদা, মুমতাজ, রাহুল, হরবোলা কি জানতে পেরেছেন দলের আমি কতবড় ক্ষতি করে ফেলেছি ? কেন আমি স্বীকার করলাম দেবপ্রতিম প্রণামপুরেই আছেন !

বউদির কণ্ঠস্বরই যেন বা অদৃশ্য বাতাসে ভেসে এল—তুমি যা থানায় বলেছ, সবই তোমার দলের কাছে প্রকাশ করা উচিত। নইলে হরবোলা ধরা পড়ে যাবেন। ব্যথা তরফদারকে জলগেটের চাবি ফেরত দিয়ে গুমানির জলে হাত ধুয়ে ঘরে ফিরতে হবে

সকলকে। সমস্ত এলাকায় প্রবেশ করে যাবে পুলিস। জলের কপাট এখনও রুদ্ধ হয়নি, ধীরে ধীরে তামাম জল বেরিয়ে চলে যাবে।

—কিন্তু আমি বেঁচে আছি টের পেলে থানা আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি কি জানো না বউদি, বিপ্লবী কখনও দুবার মরে না! এ কথা প্রায় মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে ফেলে কবি।

—এত বড় পৃথিবীতে কোথাও তুমি আত্মগোপন করতে পারবে না?

—কী হবে সেই জীবনে, আত্মগোপন তো আত্মপ্রকাশেরই জন্য। আমাকে যদি অস্ত্রহীন, অপরাধীর মত লুকিয়ে থেকে জীবন কাটাতে হয়, তাহলে আত্মহত্যাও মহৎ। পুলিস আমাকে খুঁজবে, দল আমাকে কখনও বিশ্বাস করবে না। সেই একটা চোরের জীবন নিয়ে আমি কী করব? পুলিস কেন আমায় ছেড়ে দিল? আমায় মেরে ফেলল না!

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হবে তার পাঁচ মিনিট আগের দৃশ্যটি কল্পনা কর।

—করি। আমি কল্পনা করতে পারি। চার মিনিট আগের দৃশ্য। ওঁর হাতে লেনিনের বই। এমনকি তিন মিনিট আগেও তিনি সেই বই নিবিষ্ট মনে পাঠ করে চলেছেন। এমন কি এক মিনিট আগেও।

—তাঁর ডাক পড়ল ফাঁসির মঞ্চে ওঠার জন্য।

—তিনি বললেন, দাঁড়াও হে, আমায় বিরক্ত করো না, এখন একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হচ্ছে।

—তোমার ফাঁসির সময় হয়েছে, এবার ওঠো।

—ও, তাই নাকি! এই বইখানা শেষ করতে তোমরা আমাকে আর সময় দেবে না! আমার যে জানা হল না। তেমন একটি নিবিড়, রঙিন দৃপ্ত মৃত্যুই তো কামনা করেছি বউদি!

—আত্মহত্যা করো না। সাঁতার জানো না বলেই এই হীন মৃত্যুর কথা ভাবছ। তুমি রাহুলের কাছে ফিরে যাও। চুনাখালির মোড়ে রিকশা লেগেছে, ওখানে সুলতান আছে। চায়ের দোকান খুলল বলে। পুব আকাশে রঙের মৃদু আভা, পাখি ডাকছে।

কবি হঠাৎ দেবদারু গাছের তলে একটি আবছা-আধাঁরি নারীমূর্তি দেখে। একটুখানি এগিয়ে এসে বুঝতে পারে, মেয়েটির হাতে জলের বদনা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। সড়কের পাশে ঝোপের মধ্যে নামবেই না হয়তো, পথে বসেই ভোরের কাজ সারবে। কবিকে দেখে বসতে পারছে না প্রাতঃকৃত্যে।

—শোন! স্বল্পফুট স্বরে ডেকে ওঠে কবি।

ডাক শুনেই মেয়েটি গাছের আড়ালে সরে যায়।

—শোন বোন। আমায় ভয় পেও না। স্বর একটু উপরে তোলার চেষ্টা করে কবি।

কিছুক্ষণ আড়ালে থাকার পর মেয়েটি আড়াল ছেড়ে বার হয়ে আসে।

—আমাকে একটু জল দাও খেতে।

মাথায় ঘোমটা টেনে একটু একটু করে এগিয়ে আসে মেয়েটি। লক্ষ করে লোকটি ভিখিরি নয়। পাগলও নয়। পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে জামা নেই, সমস্ত গা পোড়া পোড়া। কোনও রোগ হয়েছে। আধি ব্যাধির কি আর শেষ আছে! কুষ্ঠ নয় বোধ হয়।

—কে গো তুমি?

—প্রণামপুরের লোক।

—আমি কি ছাই চিনি সেই গাঁ?

—দাও ! অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়ে পড়ে কবি।

—এই জল খাবে ?

—কেন খাব না ?

—আমরা মুসলমান। বদনার পানি, বাহ্যের বদনা।

—আমিও তোমারই জাত বা হিন্দুই হলাম বা'। রাস্তার পাশের একটি ছোট কুটিরে ঢুকে যায় মেয়েটা। এদিকে বসতি খুব কম। ওই কুটিরের বাইরে সাইকেল সারাইয়ের দোকান, ঝাঁপ এখনও বন্ধ।

পায়ে পায়ে অতি কষ্টে সড়ক ধরে চুনাখালির পার্কের মোড়ে আসে কবি। খান তিনেক রিকশা লেগে আছে দেখতে পায়। রিকশার সিটকে সামনে ঠেলে দিয়ে জায়গা কিছুটা প্রশস্ত করে নিয়ে তাইতে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে রিকশঅলা। ঘুমিয়ে রয়েছে, কিন্তু ডাকলেই জেগে উঠবে।

তিনজনের এরা কেউ সুলতান নয়। কবি চায়ের বন্ধ ঝাঁপের সামনে পড়ে থাকা বাঁশবাতার বেঞ্চিতে বসে পড়ে। অপেক্ষা করতে থাকে সুলতানের জন্য। কিছুক্ষণ বাদেই মনে হয় সুলতান আসবে না। হতে পারে সে নিমতলায় রিকশা লাগিয়েছে। তা হলে এখান থেকে হাতিনগর কীভাবে পৌঁছনো যায় ভেবে পায় না কবি। জলঙ্গীর বাস ছেড়ে আসবে পাঁচটায় বহরমপুর থেকে। কলকাতা ফেরত যাত্রীরা লালগোলা প্যাসেঞ্জার থেকে নেমে পাঁচটার গাড়ি ধরে।

পোড়া পোড়া এই দেহ। বিশ্রী বিধ্বস্ত এই চেহারা, খালি গা, চোরের মত দশা—কবি ভাবল এই অবস্থায় ভর্তি লোকের বাসে ওঠা যায় না। মানুষকে মুখ দেখাতেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। একটু আগেই সে আত্মহত্যার কথা ভেবেছে। এবং সে নিশ্চিত পুলিস তাকে আবার অ্যারেস্ট করতে পারে। তার মৃত্যু হয়নি এটা পুলিসের কাছে বিপজ্জনক সংবাদ। তাই যদি হয়, পাঁচটার বাস ধরাটা বুদ্ধির কাজ হবে না।

সুলতান এল না। ভাগ্য এই রকমই, কেউ তাকে গ্রহণ করার জন্য বসে নেই। কেউ আজ আর তার জীবনটাকে ভালবাসবে না। জুঁইরানী তাকে আর কিছুতেই ডেকে উঠবে না, এসো তিলেদা খেলি !

এই সব ভাবতে ভাবতে বহরমপুরের দিকে প্রবাহিত পথে বহরমপুর থেকে ছুটে আসা দুটি নীচু হেডলাইট চোখে পড়ে। এত নীচু আলো, পুলিসের জিপ নয় তো !

প্রায় নিঃশব্দে ছুটে আসছে এদিকে। গাড়িটা মোড়ের কাছাকাছি এসে গতি শ্লথ করে। ভয়ে চমকে ওঠে কবি, হেডলাইটের তামাম বিকিরণ বেঞ্চিতে কবির গায়ে এসে লেগেছে, ভোর হয়ে আসছে বলে আলোর তেজ খানিক কমে এসেছে।

এটি একটি জিপ। সভয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে কবি। সামলাতে পারে না। বেঞ্চির তলায় পড়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে—না-আ-আ। আমি যাব না আ-আ...সেই চিৎকারে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মোহরের চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রিমা ক্রমশ কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। চোখের পাতা ভারী হয়ে এল শুকনো বাতাসে বৃষ্টির গন্ধের মত। মেয়েটি কীভাবে কথা বলবে বুঝে পাচ্ছে না। কথা বলার আগেই চোখে জল এসে পড়া সহজ নয়। বুক ফেটে পড়তে চাইলে তবেই চোখ ভিজে আসে, পাতা ভার হয়, দৃষ্টি নুয়ে যায় এবং একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

—তুমি প্রাণদার চিঠি পেয়েছ? প্রশ্ন পেশ করে চন্দ্রিমা।

— হ্যাঁ। মাথা সামান্য কাত করে মোহর।

বাহুল্য এ-প্রশ্ন এবং তার জবাব। কেননা তারা দুজনই প্রাণকিশোরের চিঠির তাগিদে সদরঘাটের পাঠাগারে এই দুপুরে এসেছে। অন্য আর কেউ নয়, মাত্র তারা দু'জন। বুলবন আসবে সন্ধ্যায়, বুলবনের চিঠিতে প্রাণকিশোর সেই প্রকার নির্দেশ করেছেন।

কিন্তু মোহরের চোখদুটি ভিজে আসতে চাইছে কেন?

—তুমি কিছু বলবে মোহর আমাকে?

—বাড়ি থেকে অনেক বাধা বউদি!

—জানি।

—আমি মাকে বলেছি, আমি কোনও পার্টি করছি না। শরৎচন্দ্রের প্রোগ্রাম, সবাই করছে। কিন্তু....

—বল।

—তুমি অবাক হবে। ব্যথামামি মাকে চিঠি লিখে বলেছে, আমি যদি চৌধুরী-বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখি তা হলে যেন তরফদার বাড়ি না যাই। সোনাই গিয়েছিল, সোনাইকে মামি অপমান করেছে। চিঠির ভাষা এত নোংরা যে পড়া যায় না। লিখেছে, আমরা যেন জমি জিরেতের প্রাপ্য অংশ বুঝে নিয়ে সত্বর সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলি। রাহুলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাকি খুবই কুৎসিত, সেকথা মামি এমন করে লিখেছে যে...

—আহা! সেইজন্য তোমাকে কাঁদতে হবে মোহর!

মোহর এবার সত্যিই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। মেঝের উপর একটি শতরঞ্জি পেতে বসে কথা বলছিল ওরা। দেওয়ালে হেলান দিয়েছে মোহর। চোখ মুছল আঙুল দিয়ে, গাল মুছে নিল উড়নির প্রান্ত দিয়ে। মুহূর্তে শক্ত হওয়ার চেষ্টা করল। ভাবল বোধ হয়, এমন করে কাঁদব কেন!

—ওই চিঠি পড়ে বাবার খুব লেগেছে। আমরা কখনওই মামার কাছে সম্পত্তির অংশ চাইনি। সম্পত্তি আমাদের আছে। বাবা এই অপমান হজম করতে পারছেন না। তা ছাড়া বারবার বলছেন চৌধুরী ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যাবে—ওই পরিবারটা সুখশান্তির জায়গা নয়, ওখানে...আমি আর বলতে পারব না বউদি। বলতে বলতে মোহরের গলা বুজে যায়।

—বুঝতে পারছি, বাবার সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটি হয়েছে।

—হ্যাঁ। আব্বা আমার পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। সমির মামাকে বাড়িতে ডেকে বলে দিয়েছেন, আমার মেয়ে যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কৌটো না বাজায়। আমি একশ দেড়শ দুশো টাকার কালেকশন চাও দেব, মেয়ে যেন পথে না নামে। আমার মেয়ে ভিখিরি নয়। আমি সহ্য করতে না পেরে বলেছি, তহবিল সংগ্রহ ভিক্ষে কেন হবে! তা

হলে নেতাজি গান্ধীজিও তো সেই ভিক্ষে করেছেন। টাকা-পয়সাঅলা লোকেরা কখনও তর্ক সহ্য করতে পারে না বউদি!

আবার গলা ধরে আসে মোহরের।

—হ্যাঁ, বল।

—আর কী বলব তোমাকে! ভেবেছিলাম বহরমপুরে গিয়ে পাবলিককে ব্যাজ পরিয়ে কালেকশন করছি, এই দৃশ্য বাবা দেখবে না। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের ব্যাপার। আমি বলেছি, আই লাভ মাই অথর। শরৎচন্দ্র আমার প্রিয়। ভালই লাগে ভাবতে যে, শরৎবাবুর জন্যে বাপের হাতে মার খেয়েছি। আনন্দ হয় যে, একজন বড় লেখককে ভালবাসাও কত কঠিন। সমির মামার সামনেই বাবা আমার চুলের মুঠি ধরে—মারলেন না বটে, কিন্তু অপমান করলেন। তুমি ভাবছ আমি কাঁদছি! মোটেও না।

মোহরের আত্মগত বিদ্রোহের ভাবটি চন্দ্রিমাকে মুগ্ধ করে দেয়, তারও মনে পড়ে, তাকেও তো নজরুল সমিতির মধ্য দিয়ে একইভাবে পার্টিতে এবং বুলবনের প্রেমে পৌঁছাতে হয়েছে। তবে সে মার খায়নি কখনও। কেউ তার কেশ আকর্ষণ করেনি।

—একটু কষ্ট হয়। আব্বা কোনওদিন আমার ওপর হাত তোলেন না। পরে দেখলাম বাবা কাঁদছেন। তখন আমি আর সংবরণ করতে পারি না। তো, তাই বা কম কথা কিসের! শরৎবাবু সকলের চোখের জল টেনে বার করতে পারেন, একজন জোতদারই বা বাদ যায় কেন!

চন্দ্রিমা দেখল, মোহরের চোখেমুখে রক্তের অদ্ভুত তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে আলোছায়ার মত। কখনও অধিক উজ্জ্বল হয়, কখনও ম্লান হয়ে আসে। তার কষ্ট যত তীব্র, আনন্দও তত গভীর। মোহরের উপলব্ধির স্তরটি যে সাধারণ নয়, সাহিত্যের এমন পাঠক যে সামান্যও নয়, তার পার্টিই মোহরকে সেই স্তরটিতে চালিত করে দিয়েছে এবং এত অল্প সময়ে মেয়েটি যেভাবে পৌঁছতে পেরেছে, তা তারই নিজস্ব বোধের কারণে। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রসগ্রাহী মনটিই তাকে এই প্রোগ্রামে টেনে এনেছে। নইলে তার এখানে আসার কথাই নয়।

কিন্তু শুনতে শুনতে চন্দ্রিমার বুকের ভেতরটা কেমন সিরসির করছিল। চন্দ্রিমা বলল—শরচন্দ্রের 'পথের দাবী' বুকে বেঁধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অতীতের বিপ্লবীরা একদিন জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের বুকের একপাশে ধর্মগ্রন্থ 'গীতা', অন্যপাশে 'পথের দাবী'। শত অত্যাচার সইবার ক্ষমতা কোথা থেকে পেয়েছিলেন তাঁরা! শৌর্যের কথা বল, আত্মত্যাগের জোর বল, সাহিত্য জুগিয়েছে সেই সব। কমরেড সিন্হা প্রায়ই বলেন, সাহিত্যের আর এক নাম উজ্জীবন। সাহিত্য আমরা শুধু এন্টারটেইন করি না, তা আমাদের বাঁচায় এবং রক্ষা করে। এ আমাদের শুধু কথার কথা নয়, তা আমাদের বিশ্বাসের কথা। লোকে ভাবে, আমরা সাহিত্য নিয়েও পলিটিক্স করছি। মানুষ ভাবে ঠিক নয়, তাকে ভাবানো হয়। এবং সাহিত্য শুধু প্রমোদ-সামগ্রী যে নয়, চোখের জলেও সাহিত্য যে শেষ হয় না, সে কথা ভোলবার ব্যবস্থাও কিন্তু আছে। তোমাকে দেখে আমার এত সব কথা মনে পড়ছে মোহর! তুমি আর একটু সরে এসো, তোমাকে ছুঁই!

বউদির কথায় এবং আহ্বানে মোহর ঈষৎ কেঁপে উঠল।

—অথচ এই শরৎচন্দ্রকেই অনেক ক্রিটিক পাকশালার সাহিত্যিক বলেছেন। অনেকেই আমরা বলি, সাহিত্যটা কম বুঝি না, শরৎচন্দ্রের বোঝার কী আছে, চোখের জলের

সাহিত্য ! বলে বউদি কেমন ম্লান করে হেসে মোহরের দিকে হাত বাড়ায়, কাছে টেনে নেয়।

—আমি কিন্তু সদরঘাটে ব্যাজ-কালেকশনে থাকব না, চেনা কেউ দেখে ফেললে... বহরমপুরে কালেকশন করেছি অথচ কী ভাগ্য দ্যাখো, ওই দিনই বাবা বহরমপুর গেছেন বেঙ্গল বুক ডিপোতে সোনাইয়ের বই কিনতে। কাদাইয়ের মোড়ে আমাকে দেখেছেন। বলতে বলতে চুপ করল মোহর।

চন্দ্রিমা বলল—বাড়ি বাড়ি যে কালেকশন হবে, তাতে তুমি থেকো। রোডস কালেকশনে থেকো না। অবশ্য প্রাণদার কাছে জেনে নিও, কী করবে।

মোহর বলল—একটা কথা বলব তোমাকে, কিছু মনে করবে না ? বলে সে একটু থামে। তারপর বলে—'পথে এবার নামো সাথি, পথেই হবে পথ চেনা', এই গানটা রাহুল খুব গাইত। আর একটা গাইত, পুরনো গান। 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায় ! খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।' সেদিন যখন কালেকশন করছি, রাহুলের গান কোথা থেকে ভেসে আসছিল।

চন্দ্রিমা বলল—সেটা তো খুব ভাল।

মোহর বলল—ভাল না ছাই। মন খারাপ করে। পথ আর পথিক এই নিয়ে কত গান যে আছে ! খুব হিট গান। আমি জুলুম করলে, তবে রাহুল গাইত। আজ জানি, সে আর ওই গান গাইবে না।

—কেন ?

—আমাকে বলেছে। সেদিন বুঝিনি।

—পথ তো ফুরোচ্ছে না মোহর ! নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভেবো না।

—না বউদি। ভয় করে। রাহুলের নামটি মামি চিঠিতে এত কদর্য করে লিখেছে, বাবা বলেছেন মেয়েকে আমি কেটে ফেলে দেব গুমানির জলে, কোনও দুঃখ হবে না।

—ও কথা এখন থাক মোহর। গুমানির জলে আরও অনেক লাশ ভাসবে। কবিকে থানা মেরে ফেলেছে।

—না।

—কী বললে ?

—কবি এখনও মরেনি। বেঁচে আছে।

—তুমি কী করে জানলে ?

—গত রাতে মামাবাড়ি থেকে হঠাৎ নাতাশা আমার কাছে আসে। ওকে কেমন খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বলল, ওর সঙ্গে এখুনি একবার যেতে হবে, বড় দরকার। আমি কোনও প্রশ্ন না করে বেরিয়ে গেলাম। রাত তখন নটা। পুকুরপাড়ে পৌঁছে পথের উপর দাঁড়িয়ে নাতাশা বলল, সমির মামা গোরাবাজার থেকে জিপে করে ফিরছিলেন খুব ভোরে। চুনাখালির পার্কের কাছে আধমরা অবস্থায় কবিকে পড়ে থাকতে দেখতে পান। তখনও অন্ধকার ছিল। ভোর হয়ে আসছিল। একটা অস্বাভাবিক চিৎকার শুনে মামা ড্রাইভারকে জিপ থামাতে বলেন। হেডলাইটের আলোয় দেখতে পান একজন লোক চিৎকার করে রাস্তার স্টলের মাচার কাছে পড়ে গেছে।

বলতে বলতে থেমে গেল মোহর।

—তারপর ?

—জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল কবি। ভয়ে। ভেবেছিল পুলিসের জিপ। তা ছাড়া দেহে

কোনও জোরও ছিল না। মামা সমস্ত পথ ফ্লাস্ক থেকে জল খাওয়াতে-খাওয়াতে বাড়ি পর্যন্ত এনেছেন, বাঁচে এমন ভরসা ছিল না। ভাবতে পার না বউদি, থানার পুলিস ওকে কিভাবে মেরেছে ! মৃত ভেবেই পার্কের ওখানে ফেলে দিয়েছে।

—তুমি মামার ওখানে গিয়ে দেখলে কবিকে ?

—না বউদি ! নাতাশা আমাকে নিয়ে গেল না। পুকুরপাড়ে এসে দুম করে মত বদলে ফেলল। বলল, তোমাকে এই রাতে সঙ্গে করে ফিরলে মামা কিভাবে নেবে বুঝতে পারছি না। কবি নাকি নাতাশার একটি হাত জড়িয়ে ধরে বলেছে, আমি বেঁচে আছি, তুমি ছাড়া কেউ জানে না। মামা আমাকে চেনেন না। একটু সুস্থ হলেই আমি চলে যাব। 'আমি আছি', কেউ যেন না জানতে পারে।

—মামা কবিকে প্রশ্ন করেননি কোনও ?

—না। কেবল নাকি নাতাশাকে বলেছেন। ছেলেটাকে বাঁচা। মামা তো বেশি কথা বলেন না।

—তোমার সঙ্গে নাতাশার আর দেখা হয়নি ?

—না।

চন্দ্রিমা মোহরকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে কাছে আরও একটু নিবিড় করে নেয়। তারপর একটি গাঢ় শ্বাস ফেলে। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষই কথা বলতে পারে না।

—কে ? আধফোঁটা স্বরে কেমন চমকে উঠে দরজার দিকে দৃষ্টি চালনা করে চন্দ্রিমা। মনে হচ্ছে ওখানে কারও ছায়া নড়ে উঠে সরে গেল। আবার ভুল হতেও পারে। চুপ করে রইল ওরা দুজন। মোহর পলক না ফেলে খোলা দুয়ারের ফাঁকের শূন্যতায় চেয়ে থাকে।

—উঠে গিয়ে দেখে আসব ? বলল মোহর।

চন্দ্রিমা কোনকিছুই নির্দেশ না করে চুপ করে থাকে। কেউ হলে নিশ্চয়ই কথা বলত। তবে কি কেউ নয় ! শুধু ছায়া ?

—শোন ! বলে ফের চন্দ্রিমা নীরব হয়। মোহরের চোখ দুয়ার থেকে চন্দ্রিমার মুখে ফেরে আবার চলে যায়।

আবার একটা ছায়ার আভাস বাতাসে এবং শূন্যতায় রঙের মত নড়ে, মানুষের আভা একটি যেন। মোহর এবার দাঁড়িয়ে ওঠে। ওর হঠাৎই মনে হল, কেউ একজন সত্যিই এসেছে।

—আমরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছি, মনে হচ্ছে ! বলল চন্দ্রিমা।

—দাঁড়াও, দেখে আসি। বলে মোহর চৌকাঠ ডিঙিয়ে এসে বাইরের সংকীর্ণ রেলিঙের কাছে দাঁড়ায়। লম্বা তত নয়, কিন্তু সরু পথের মতন, এই রেলিঙে দাঁড়ালে ছাদের একাংশ দেখা যায়। কিন্তু সর্বত্র চোখ যায় না। অন্য ঘরটির আড়ালে ছাদের বাকি অংশ পড়ে। দেখা দরকার, সেখানে ছায়াটা সরে গেছে কিনা। মোহর পায়ে পায়ে খোলা ছাদের উপর আসে। কাউকে দেখতে পায় না।

মোহর পাশের ঘরটির দুয়ার ঠেলে মুখ বাড়ায়। অন্ধকার ঘর, সব জানালা বন্ধ, গুমোট এবং স্যাঁতানো গন্ধ। দুয়ার টেনে বন্ধ করে চলে আসে। কিছুক্ষণ বাদেই আবার ছায়াটা—ঠিক কেউ এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল মনে হয়।

—কে তুমি ? কথা বলছ না কেন ? হেঁকে ওঠে চন্দ্রিমা। কোনও সাড়া পায় না। হঠাৎ কানে আসে ছাদের উপর ছুটে গেল কেউ, তারই মৃদু গুমগুম আওয়াজ। মোহর

আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে, কেউ নেই ছাদে, সিঁড়িতে নেমে গেছে। সিঁড়ির কাছে এসে দেখতে পায়, নীচে কোনও লোক দাঁড়িয়ে নেই।

একটু বাদে আবার ছায়া। চন্দ্রিমা এবার আর থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়ায়। তখনই মণি ভিতরে ঢুকে এসে হা হা করে হাসতে থাকে।

—তুমি করছিলে ?

—কী বউদি।

—নাও, চালাকি করো না। তুমি একটু আগে এসেছিলে ! অমন করলে কেন ?

চন্দ্রিমার এমন গম্ভীর স্বর মণি ভাবতে পারেনি।

—তোমরা কথা বলছিলে ! মোহর আপা ছুটে বার হল, দেখে আমার আনন্দ হল। তুমি রাগছ কেন !

—আমার খুব খারাপ লেগেছে।

—আহা বউদি ! তুমি সত্যিই রেগে গেছ। বলে উঠল মোহর। চন্দ্রিমার মুখটা কেন যেন রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছিল। ক্রমশ শান্ত হয়ে আসে। মোহরও মণিরই মতন অবাক হয়েছে। চন্দ্রিমার এমন উত্তেজনা খুবই বিরল ঘটনা। তা ছাড়া মণির এও যে এক ধরনের পাগলামি, সে কথা চন্দ্রিমাকে বোঝাতে চাওয়া খুবই বাহুল্য, কেননা বউদি মণিকে সবচেয়ে ভাল বোঝে। অথচ বউদি রেগে উঠল !

—তুমি কোথায় এসেছ ?

—গঙ্গার তেল নিতে। ডিপোতে।

বউদির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মণির চোখ ছলছল করে ওঠে।

—গঙ্গা ! অবাক স্বর চন্দ্রিমার।

—স্যালো-মেশিন। মণির ছোট জবাব। আসলে মেশিনের নাম 'গঙ্গা' সেই কথা মণি জানিয়ে দেয়।

—ও ! চন্দ্রিমার মনে পড়ে।

—বউদি ভুলে যায় মোহর আপা। গঙ্গা নামটাও ভুলে যায়। পার্টস চুরি হয়ে গেল, তবু ! বাবুর ওই নামটা খুব পছন্দ। আমি মেশিনের জন্যে নাকখৎ করেছি, বড় ভাইয়ার ঘড়ি বাঁধা পড়েছিল। ভাইয়া আর ঘড়ি পরে না। বউদি বললেও পরে না।

—তেল পেয়েছ ? মোহর প্রশ্ন করে।

—না। এখনও পাইনি। দেখি যাই। লাইনে টিন রেখে এসেছি। চাষা খাটে আশায়, কী বলেন ! আপনারা বসেন। গল্প করেন। দুখানা শরবতী শাঁখ আলু এনেছি বউদি। নিবা ?

বলেই কাঁধে ঝোলানো গামছার মুড়ো খুলে দুটি বড় ডেলার আলু রেখে দেয় টেবিলের উপর। তারপর ঘাড় নীচু করে বেরিয়ে চলে যায়। এত সরল আর বউদি বলতে অজ্ঞান ছেলেকে অকারণ আঘাত করল কেন চন্দ্রিমা, বুঝে উঠতে পারে না। মনে ক'রে মাঠ থেকে শাঁখ আলু এই পাঠাগার পর্যন্ত এনেছে বেচারি।

—তুমি অমন করে না বললেই পারতে বউদি। মণি চলে যাওয়ার পর মন্তব্য করল মোহর।

—ওকে দেখে খুব মায়া হয় মোহর !

—তবু তুমি খুব খারাপ করে বলকে ওকে। ভীষণ লজ্জা পেয়েছে !

—চোরের মতন শুনবে কেন ? ও কি পুলিস ? ও রাতে মোসলেমের সঙ্গে থানা পর্যন্ত

কোন সাহসে যায় ! এসে সেদিন বললে থানায় কবি নেই। ও কাউকে বলেও যায় না কোথাও। থানার সড়কের পাশে চায়ের দোকানে এই কদিন বসে থাকত গোপনে। আমি জানি, রাহুলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। কিন্তু কিছুতেই বলবে না সে কথা। আমরা কী কথা বলছি, ও জেনে গেল, বুঝলে !

—কী বলছ বউদি !

—ঠিকই বলছি ভাই !

—ও শুনে গেল বলে কি খারাপ হবে ! তোমার সঙ্গেই তো সে প্রণামপুর গেছে।

—গেছে বলেই বুঝতে পেরেছি, মণি অনেক কথা জানে, যা সে বলে না। ওর মত রহস্যময় কবিও ছিল না। আসলে কী জানো, ও রাহুল ছাড়া সত্যিই কিছু বোঝে না। আগে রাহুল, তারপর আমরা। রাহুল বাঁচলে ও বাঁচবে। রাহুল মরলে ও মরবে !

—ওই ওর মন !

—তাহলে ? বল তুমি ? আমি কেন ওকে প্রণামপুর নিয়ে যাব। ও কোনও রাজনীতিই কখনও বুঝবে না। কোনও অপমানের হাত থেকে ওকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি।

—এইভাবে বলছ তুমি বউদি !

—বলব না ? জানো, আমার মন বলে, বন্দুক কি সত্যিই ওর কাছে আছে ! ওটার ব্যবহার কি ও করবে ? ভাবতে সত্যিই ভয় করে। ও আমায় মিথ্যে বলেছে ! আমি বোঝাতে পারি না। কাউকে আমি বোঝাতে পারি না মোহর !

—চুপ কর বউদি, আর বলো না !

—ঘড়িটা পর্যন্ত হাতে পরবে না বুলবন, কেন বলতে পার ? হুকুম ফুলভানুর পায়ের দিকে চেয়ে কথা বলে, মুখে চায় না কেন ? এসব কথা তোমাকে বলবার নয়। তুমি ভাই, ভয় পেও না।

মোহরের সামনে এই সব খেদোক্তি ঠিক নয়, মানায় না, এমনকি পার্টি পদ্ধতি এ নয়, বুঝে থেমে পড়ে চন্দ্রিমা।

শুনতে শুনতে বিষম অবাক হয়ে পড়ে মোহর। ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বউদির কথাবার্তা। নাতাশার মুখে সে শুনেছিল ফুলভানুর চোখে চোখ রেখে হুকুম আলি কখনও কথা বলে না। লক্ষ্মণ যেভাবে সীতার পায়ের দিকে চেয়ে থেকে কথা বলতেন, তাই করে হুকুম। সহসা এই প্রসঙ্গ কেন বউদির মুখে।

—তুমি ফুলভানুর কথা বলছ বউদি !

—ও কিছু নয় মোহর ! রাহুল ডাকে ভুলভানু !

—আমি জানি, তোমার সব কথা শোনা উচিত নয়। উপর নেতৃত্বই তোমার কথা জানবে। তুমি কি গ্রামে এসে কষ্ট পাও ?

—না। থাক মোহর। আমার কষ্ট আছে কিন্তু আমার হাল ভেঙে যায়নি। যারা কখনও রাজনীতি করেনি, তারা ভাবে পথে দাঁড়িয়ে কৌটো বাজালেই রাজনীতি হয়ে যায়। আর আছে অন্য এক রাজনীতি, পুলিস আর গুণ্ডাবাহিনী পুষে ভোটে পাশ করে জমিদারি চালায়, মানুষের গালে চপার মারে, সেই রাজনীতি দেখে মানুষ বুঝেছে, সমাজে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধান্দাটির নাম পলিটিক্স। সেই রাজনীতি থেকে শত হস্তে দূরে আছি, সেটা কম আনন্দ নাকি ! তুমি খালি কষ্টের কথা শুধোচ্ছ !

বলে চন্দ্রিমা গা ঝাড়া দিয়ে হেসে ওঠে। মোহর বোঝে, বউদি তার কষ্টকে কোথায়

যেন আড়াল করে দিল। মোহর আর কথা না বলে চুপ করে রইল।

একটু বাদে পাঠাগারের দোতলায় উঠে এলেন সমির চৌধুরী সেই ছবি বিশ্বাসের মতন যাঁর দেহাকৃতি, উচ্চতা এবং আদল। রঙে ঢঙে অভিনেতার একটা ভাব, হাঁটা চলায় এবং কথা বলায় ছবি বিশ্বাসের একটা নকল চোখে পড়ে।

—আপনি!

—এসে পড়তে হল দোলা! মোহরের দিকে চেয়ে দেখেন তারপর এবং বলেন—ও তুইও আছিস দেখছি।! খবর পেয়েছি প্রাণদা আসবেন। আবার ঘুরে তাকালেন চন্দ্রিমার দিকে। অতঃপর বেঞ্চের উপর বসে পড়লেন সমির চৌধুরী। সাদা চ্যাপটা কৌটোর ভিতর থেকে খিলি পান বার করে মুখে পুরলেন। বাতাসে জবাকুসুম তেলের গন্ধে ঘর ভরে গেছে।

আরও খানিক বাদে প্রাণকিশোর এবং আদিত্য সিংহ এসে পৌছালে চন্দ্রিমার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

প্রাণকিশোর সমির চৌধুরীকে দেখে খুশি হন। মোহরকে দেখে বলেন—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। একে একে সবার সঙ্গে কথা বলব। প্রথমে সমির সাহেবের সঙ্গে আলাদা করে আদিত্য কথা বলে নিক, ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে। এক কাজ কর, চন্দ্রিমা আর মোহর, তোমরা দুটিতে পাশের ঘরে যাও, নাকি আদিত্য?

আদিত্য বলল—গেলেও হয়, না গেলেও হয়। থাকতে পারে ওরা। থাক না! বলে মিষ্ট করে ঠোঁট টিপে হাসে আদিত্য সিংহ। চন্দ্রিমা দেখে রাহুলও ওই রকমই হাসতে পারে।

চন্দ্রিমা আর মোহর মেঝেয় পাতা শতরঞ্জির উপর বসে পড়ে। ছোট শতরঞ্জি। সারা ঘর ভরে যাওয়ার মত নয়। দেওয়াল ঘেঁষে দু'খানা বেঞ্চ রয়েছে। দক্ষিণের জানালার কাছে টেবিল চেয়ার। তা ছাড়া অতিরিক্ত একখানা চেয়ারও ভর্তি বইয়ের খাড়া আলমারির কাছে রয়েছে, টেবিলেরই কাছে। কাঠের আলমারি, পাল্লা কাচের। আলমারির মাথায় দেওয়ালে ঝুলছে শরৎচন্দ্রের ফোটো। অন্য দেওয়ালে নজরুলের ফোটো টাঙানো। দুটি চেয়ারে দুই নেতা এবং বেঞ্চের উপর সমির চৌধুরী বসলেন। চৌধুরী বেঞ্চের প্রান্তে টেবিলের কাছে সরে এসেছেন।

আদিত্য বলল—সমস্ত স্টোরিটা সাদা চৌধুরীর অ্যারেস্ট হওয়া থেকে শুরু হয়েছে সমির মামা। আপনি জানেন! সত্যি বলতে কি, আমরা এই ধরনের গল্প ভাবতে পারি না। অথচ ভারতবর্ষে এই ঘটনা বস্তুত কোন সিনেমার গল্প নয়। যত দিন যাবে, গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো এভাবে পদ দলিত হবে। গণতন্ত্রের ঠাটবাট থাকবে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। এখন যদি আপনাকেও পুলিস অ্যারেস্ট করে...

—করবে। নতুন কোনও ঘটনা তো হবে না। তাই বলে একটা আধমরা জোয়ান ছেলেকে আমি ফেলে দেব, তাড়িয়ে দেব! যদি তাই বলেন, তা হলে তো দয়ামায়া বলে কিছু থাকে না।

—আপনি কদ্দিন কবিকে লুকিয়ে রাখবেন? কিভাবেই বা রাখবেন! কোনও প্রকারে জানাজানি হয়ে গেলে...

প্রাণকিশোর বললেন—পুলিস ওকে সহজে ছাড়বে না। ওদের সংগঠনের খবর জানবার জন্যে ফের গ্রেফতার করতে পারে।

আদিত্য বলল—অপর পক্ষে কবির দল কবির সঙ্গে কি ধরনের 'বিহেভ' করবে জানা

নেই।

সমির চৌধুরী বললেন—কবি যে ভয় করছে, তা জানি। আমি যে কবিকে চিনতে পেরেছি তা ছেলেটা জানে না। যখনই বলল, ও রাহুলের বন্ধু, তখনই চিনলাম। যাই হোক। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে বলতে পারি না। নাতাশার মামি কবিকে ওভাবে রাখবার একেবারেই পক্ষপাতী নয়। রাতদিন আমাকে যাচ্ছেতাই করে বলছে। যদি মোহরের বাড়ি জানে যে, আমি ওইভাবে একজনকে আশ্রয় দিয়েছি, তা হলে থানায় খবর হয়ে যাবে বলে সন্দেহ হয়। এত বড় ঝক্কি কেন নিচ্ছি বলতে পারি না।

আদিত্যর চোখ দুটি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন দেখালো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। চোখের পুরু কাচের চশমাটি চোখ থেকে নামিয়ে ফেলল টেবিলের উপর। চশমা খুলে ফেললে চোখদুটি বুজে আসতে চায়। কেমন যেন আলো সহ্য হয় না বলে মনে হয়।

—আমি কি ভুল করছি আদিত্যবাবু? সমির চৌধুরী ঈষৎ প্রশ্ন করেন। তারপর বলেন—নাতাশার মামি বলছে, এই করে চিৎপুরের চৌধুরী ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে গেল।

প্রাণকিশোর বললেন—মোহর তুমি সমস্তই শুনলে।

আদিত্য চোখে চশমা তুলে নেয়। মোহরের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন চিন্তা করতে থাকে। তারপর জোর দিয়ে বলে—ধ্বংস কিছু হয়নি। সব ঠিক আছে। একটা যুদ্ধ চলেছে, তার কিছু ক্ষয়ক্ষতি থাকবে না?

প্রাণকিশোর বললেন—এখন কবির কি হবে তাই বলে দাও।

আদিত্য বলল—সেই কথাই বলছি। কবিকে আমরা রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু যুদ্ধও থামবে না। একদিকে পুলিস, অন্যদিকে ওর দল, কোনও পক্ষই আমাদের কথা শুনবে না। তবু চেষ্টা করতে হবে। সুস্থ হলে কবি কী করবে কবিই তা জানে। যদ্দিন সুস্থ হয়ে না ওঠে ততদিন ওকে রাখুন। এমন ভাবে রাখবেন, ঘুণাক্ষরেও যেন থানা টের না পায়। মোহরকে বলছি, দুটি কাজ ওকে করতে হবে। মাম্মার বাড়ি মোহর বেশি যাতায়াত করবে না। যদি রাহুল কখনও আসে, আমার ধারণা হচ্ছে, মোহরের কাছে আসতেও পারে...

ঠিক এই কথায় মোহর লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে নেয়। তা দেখে আদিত্য সিংহ অদ্ভুত মিষ্ট করে এক সেকেন্ড হাসে। তারপর বলে—রাহুলকে মোহর আমার কাছে আনবে বা প্রাণদার কাছে, আমরা কথা বলতে চাই। যদি রাহুল বাড়ি ফেরে, চন্দ্রিমা নিশ্চয়ই রাহুলকে আমাদেরই কাছে টেনে আনবেন আশা করি। আর একটা কথা নাতাশার সঙ্গেও দেখা করতে পারে রাহুল। নাতাশা যেন ভুল না করে, দেখবেন চৌধুরী মামা।

সহসা চন্দ্রিমা বলে উঠল—কিন্তু মণি?

প্রাণকিশোর বললেন—মণি হতে সাবধান চন্দ্রিমা। ও যেন কিছুই না জানতে পারে।

চন্দ্রিমা এবং মোহর পরস্পর শঙ্কিত দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিনিময় করে, খুব নীরবে। একটা ভয়াবহ ভার চাপে চন্দ্রিমার মাথায়, চোখের পাতা ভারী হয়।

—কিছু বলবে তুমি? প্রাণকিশোর বলেন চন্দ্রিমাকে।

—না। বলে চুপ করে চন্দ্রিমা।

মোহর বলে—কোনওভাবে যদি মণি জেনে যায়....

আদিত্য বলে—কেন জানবে! যাতে জানতে না পারে, সেটাই দেখতে হবে। যদি কবি বাড়ি ফিরতে চায়, গোপনে সেই ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। আমরা কবির বাড়িতে

একটা খবর নিতে বলব, ওখানকার সংগঠন মারফত। তবে যদি না ফিরতে চায়, জোর করব না।

আদিত্য এবার কবির প্রসঙ্গ ছেড়ে শরৎ জন্মশতবর্ষ প্রোগ্রামে ঢুকে যেতে চায়। তার আগে বলে—চৌধুরী মামা। আপনার সঙ্গে সব কথা শেষ করিনি কিন্তু। আজ আপনি যান। আগামী কাল বহরমপুর পার্টি অফিসে সন্ধ্যার পর একবার আসবেন। আপনার কোর্ট তো খোলা আছে ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে সন্ধ্যার পরই আসবেন একবারটি।

—ঠিক আছে। আমি উঠছি। মোহরের অনেক সমস্যা আদিত্যবাবু ! আমারই চোখের উপর ওর বাবা...

—থাক মামা ! বলে উঠল মোহর।

প্রাণকিশোর বললেন—মোহর নিজে মুখেই বলুক তা হলে। আমরা শুনেছি সমিরের কাছে। ভয় পেয়েছ ?

—না। বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোহরের চোখ চিকচিক করে উঠল। সমির চৌধুরী হা হা করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

প্রাণকিশোর মোহরের চিকচিক করা চোখের দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে বললেন—ভয় পেও না। মেয়েরা খাবে পরবে, সংসারধর্ম করবে এই আমাদের জে-জে-জেনারেল আউটলুক। আদিত্য ভাল বলতে পারে। কিন্তু তুমি একসেপশন।

আদিত্য বলল—পার্টিতেও মোহর ব্যতিক্রম প্রাণকিশোরদা। অত ভাল করে কেউ শরৎসাহিত্য পড়েনি। সাহিত্যের জন্য ও সব পারে, শরৎচন্দ্রের জন্য। আমি বুলবনের মুখে শুনেছি, জলঙ্গী থেকে ফেরার পথে সেদিন এখানে নেমেছিলাম, তো বুলবন বলছিলেন, মোহর অত্যন্ত জেদি। মনে মনে কত কি জেনে গিয়েছে। প্রশ্ন করে সাংঘাতিক। বাবা মেরেছেন তো কী হয়েছে। বাবাটি কি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন না। মেয়েদের গায়ে পুরুষের হাত কত অবলীলায় উঠে যায় ! যাই হোক, মন আরও শক্ত করতে হবে। আরও অনেক কঠিন সংগ্রাম আছে তোমার সামনে।

মোহর একটু কেঁপে ওঠে। তবু সে ভাববার চেষ্টা করে, রাহুল কি সত্যিই তবে তার কাছে আসবে ! কখন আসবে ? কীভাবে আসবে ? আসলে আদিত্যদা বলছেন, যদি আসে, আমি যেন কবির কথা তার কাছে না বলি। কী সাংঘাতিক পরিস্থিতি হল ! আদিত্যদা কবিকে বাঁচাতে চাইছেন, রাহুলদের এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? কবিকে কি রাহুলরা মেরে ফেলবে ? তবে শুনে রাখো রাহুল, তোমার জন্য আমার অন্তরে আর কোনও প্রতীক্ষা নেই। আমি সইতে পারব না। এ কোন্ পথে গিয়েছ তুমি ?

দেখতে দেখতে আকাশের সূর্য পশ্চিমে নেমে যায়। মোহর আগামী দিনের কর্মসূচি বুঝে নিয়ে পাঠাগার থেকে একা পথে নেমে আসে। ওর এখন হঠাৎ একবার মনে হয়, রাহুলের সঙ্গে তার আর দেখা না হলেই বুঝি ভাল হয়।

পথের উপর থেকে আবার সে পাঠাগারে এসে চন্দ্রিমাকে ডাকে। সিঁড়ির মুখে এগিয়ে আসে চন্দ্রিমা। বলে—কী হল !

—না। কিছু না। আমার ঝোলাতে শাঁক আলু রয়েছে, বউদি, মণি এনেছিল ! নাও তুমি।

—না।

—কেন ?

—তুমিই খেয়ে নিও। যাও, চলে যাও !

—মণির কথা বলবে না আদিত্যদাকে ?

—বলাই তো উচিত। তুমি আর ভেবো না। চলে যাও এখন।

—মণি কি সত্যিই শুনে ফেলেছে ?

—কী করে জানব বল ? তবে খুবই সন্দেহ হচ্ছে।

—তুমি পার না বউদি ?

—কী ?

—মণিকে সামলাতে ? আমাদের পার্টিতে ওকে টানতে পার না ? ও আসবে না ?

—তুমিই কি আসতে পেরেছ মোহর ?

—পারিনি বুঝি ?

—অনেক কিছুই ছেড়ে আসতে হয় কিনা !

—জানি।

—ঠিক জানো, কতটা ছেড়ে আসতে হবে।

—জানি, তাই বা বলি কি করে, তুমিও কি জানো বউদি সবখানি ? চলি। বলে মোহর চন্দ্রিমার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে দেখে সামনে পা বাড়ায়। রাস্তার দিকে।

সন্ধ্যায় পৌছনোর কথা বুলবনের। রাত আটটা বাজতে চলল বুলবন এল না। প্রাণকিশোর অবাক হলেন। চন্দ্রিমা মনে মনে অসোয়াস্তি বোধ করতে থাকে, চঞ্চল হয়। ভাবে, সে একা মোহড়াঘাট ফিরে যাবে কী করে ? না আসার কারণই বা কী হতে পারে ?

আদিত্য সিংহ জরুরি কাজে বহরমপুর পার্টি অফিস ফিরে গেছে। প্রাণকিশোর চন্দ্রিমাকে একা ফেলে চলে যেতে পারেননি। ভাবছেন, হয়ত তাঁকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে বহরমপুর, চন্দ্রিমার রাত্রে আর ফেরা হবে না বাড়ি। এমন সময় দেখা যায় সিঁড়ির কাছে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে মণি উঠে এল ছাদে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে দড়ি দিয়ে বাঁধা তেলের টিন।

এসে বলল—বউদি তুমি বাড়ি যাবে না ? বুলবন দাদা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে ! তখন বলতে ভুলে গেছি, দাদা আসবে না। আমাকে বললে তুই তেল আন গে যা, আমি পাড়ায় গিয়ে মুনিষ দেখে রাখছি। সাঁঝ তক দেখবি, যদি না যাই বুঝবি, আমি আর গেলাম না। বউদিকে বলিস। তা ছাড়া আমার জ্বর জ্বর করছে।

চন্দ্রিমা একদণ্ড চুপ করে থেকে বলল—তুমি নিতাইয়ের চায়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়াও, আমি আসছি।

মণি চলে যায়। এবার প্রাণকিশোরের সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না চন্দ্রিমা। ফুঁপিয়ে ওঠে। আমার ওপর রাগ করে ও প্রোগ্রামে এল না প্রাণদা ! ও বলছে, আমার সঙ্গে ওর কোনও বোঝাপড়া নেই, আমি নিজের মত কাজ করি। আমার ইগো। প্রোগ্রামে যখন বার হয়ে আসছি, বললে, তোমার সঙ্গে কাজও করতে পারি না বলেই প্রাণদা আমাকে পরে ডেকেছেন।

—ওহো ! এই কথা ! কী আশ্চর্য দ্যাখো তো ! বলে ওঠেন অভিভূত স্বরে নেতা, যেন তিনি শিশুরই মতন অবাক হয়েছেন। বললেন—অত কেন ভাবছ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিছুই আর ঠিক হবে না। ও আমার মায়ের দেওয়া ঘড়িটা পর্যন্ত ছোঁবে না। আমার কোনও কাজ ওর পছন্দ নয়। আমি কি প্রণামপুর যাব না ?

—যাবে। নিশ্চয় যাবে। সমস্ত রকমের সংযোগ গড়ে তুলতে হবে তোমাকে।

—কিন্তু কী করে পারব আমি ! ও নানান ভাবে বিঘ্ন ঘটাতে চাইছে। রেগে যাচ্ছে।

—কেন ?

—এই ঘড়িটারও নাকি দোষ হয়েছে বাঁধা পড়েছিল বলে। ও নেবে না। কিছুতেই নেবে না।

—ঠিক আছে। ঘড়িটা আমাকে দাও। আমিই ওকে দেব। সময়েরও কিছু দোষ আছে, বুঝলে ! বাবা জেল খাটছেন। রাহুল চলে গেছে। চাকরিটা হল না। বাড়ির বড়ছেলে সে। সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলমান বিয়ে তত কঠিন না। পার্টি কর তো, তাই এই বিয়েরই জটিলতা ভিন্ন রকমের, মনে রাখতে হবে। আমাদের সো-সো-সোসাইটিটা কী, দেখতে হবে তো ! ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে। একান্তই যদি নাই-ই হয়, জানবে এও তোমার পরীক্ষা।

—আমি কী করব বলে দিন। চন্দ্রিমার স্বর বেদনায় মথিত হয়ে ওঠে।

—ঘড়িটা আমিই দেব। ঘড়ি গছিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ভালবাসা গছানো যায় না। ওটা দরদামের জিনিস না। উপদেশ দিচ্ছি মনে করো না। বিয়ের দিন কলকাতার পার্টি-অফিসে কমরেড জি. এস. তোমাদের কী বলেছিলেন মনে আছে ! সেই কথা তুমিই আমাকে কোট করেছ একদিন। 'ভালবাসা নিয়ে যেদিন হিসেব নিকেশ করতে বসবে, বুঝবে আসল বস্তুটাই গেছে। সেদিন যেন সব ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পার।'

—সে কি খুব সহজ প্রাণদা ?

—কে বলেছে সহজ ! জটিল নকশার সৌন্দর্য গভীর, কমরেড সিন্‌হার কথা। ফের নকশা জটিল হলেই সুন্দর হয় না। একটা সি-সি-সিম্পল জীবন নিয়ে তুমি আমি কী করব ! আমার থিওরি আসে না। তবু আজ অনেক কথা বললাম। ভাবো, কবির জীবনটা, কত জটিল হয়ে গেছে। দাও, ঘড়িটা দাও।

ঘড়িটা ব্যাগ থেকে বার করে প্রাণকিশোরের হাতে দিয়ে চন্দ্রিমা কান্নায় ভেঙে পড়ে। অন্ধকার ছাদ, হাওয়া আছে। হাওয়ায় অন্ধকারে মনটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, ভবানীপুরের ছাদে এরকম অন্ধকারে একা বসে চন্দ্রিমা একদিন শুধু বুলবনের মুখটা মনে করে রাত্রি গভীর করে তুলত। আর আজ ?

রাস্তায় নেমে চন্দ্রিমা মণিকে কথা বার করার জন্য কায়দা করে শুধালো—জানো, কবি বেঁচে আছে কিনা ! থানায় নেই। তাই না ? কী হল কবির ?

মণি বলল—কদম আলি সব জানে বউদি। স্পাই। দেখলাম ডোঙা করে প্রণামপুর যাচ্ছে।

চন্দ্রিমা চমকে উঠল।

॥ ৩১ ॥

মণিকে কদম আলি অত্যন্ত ভয় পায়। মণিকে হাওয়া বিবি অধিক ভয় পায়। হাওয়ার ভ্রষ্টাচার মণি দেখে ফেলেছে। কদম সে কথা জানে না। মণি কদমকে সে কথা বলতেও যাচ্ছে না। মণি যা জানার ছিল জেনে ফেলেছে। কী জেনেছে মণি ? বউদি চাপ দিলেই কি সব কথা বলে দিতে হবে ! অবশ্য খুব অবাক করে দিয়ে হঠাৎ গভীর রাতে কদম আসে

মায়ের কাছে। এসে কেঁদে ফেলে। মুখে নূর রেখেছে লোকটা। আশ্চর্য এক নামাজি নামাজি ভাব।

কবি দাদা বলে গিয়েছে, জিনিসটা রইল মণি! কোথায় রইল কবি দাদা জানত না। কেবল খুঁজে মরত। অনেক ভেবেচিন্তে বুঝেছে, মণি জানে কোথায় সেই বন্দুক। 'জানি বইকি। কিন্তু সে কথা তো আমি নিজেকেই বলি না।' মণি গরুর জাবনা তোয়ের করছিল। তালগাছের মোজ কেটে নামিয়েছে, মা তো অবাক। কেটে ফেলে দিলি? রস হবে না এ বছর?

—না। বাপু নাই তার কিসের কি!

—তুই না করলে আলতার বর করত। তাকেও দিলি না! সব মোজ গরুকে খাইয়ে দিলি?

মণি আর কথা বলল না। তালগাছটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর দুটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল চিৎপুর মোহড়া গাঁয়ে আর প্রণামপুরে। এক রাত্রে বদনা হাতে ফুলভানু লেবুবনের কাছে প্রস্রাব করছিল একা। মাঝরাত তখন। হঠাৎ চিৎকার করে। মাঠ থেকে লণ্ঠনে তেল ভরবার জন্য লণ্ঠন হাতে বাড়ি ফিরছিল মণি। দেখল, চারাগাছতলায় মাচার উপর তিনজন তাগড়া জোয়ান ফুলিকে নগ্ন করে শুইয়ে ফেলেছে। লণ্ঠনে আলো ছিল না। ওরা বুঝতে পারেনি। মণির হাতের লাঠি গিয়ে মাথায় আছড়ে পড়ে। শরমের মাথা ফেটে যায়। শরমের মাথায় ব্যাণ্ডেজ পড়ে।

ওই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় গাঁয়ের লোকেরা লঘু দফাদারের বাড়ি শরমকে দেখে আসে, দলবেঁধে মেয়েরা যায়। কোনও কোনও মেয়ে মুখে আঁচল চেপে শরমকে দেখে। শরম ওই দৃশ্য দেখে ফোঁস ফোঁস করে। ললিত এসে দফাদার বাড়িতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শরমকে পায়ের জুতো খুলে মারেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে তেরোঘরায়। সমস্ত বস্তি রাতারাতি পুড়ে যায়। খোপরা আর খড়-তালপাতার চাল, কঞ্চির বেড়ায় মাটি লেপা। মধ্যরাতে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়। দুজন কিশোরীকে নৌকায় তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে একদল লোক। তারপর ধর্ষিতাদের জলে ফেলে দেয়। তারা আর সাঁতার কেটে পাড়ে ফিরতে পারে না। আনিসুল করীমের পত্রিকায় দুটি সংবাদই সোচ্চারে প্রকাশিত হয়।

মণি 'আজান' পত্রিকা হাতে করে বাড়ি ফেরে এক দুপুরে। চন্দ্রিমার হাতে পত্রিকাখানি তুলে দিয়ে বলে— দেখবে, থানা কিচ্ছু করবে না।

দেখা যায় চারজন কনস্টেবল আর একজন পুলিস জলগেটের কাছে চৌকি দিচ্ছে। চন্দ্রিমার খুব আশ্চর্য লাগে, পুলিস প্রণামপুর তেরোঘরায় না গিয়ে চৌকি ফেলল জলগেটের কাছে কদমতলায়।

চন্দ্রিমা মণিকে সঙ্গে করে তেরোঘরায় আসে। দেখতে পায় বাতাসে পোড়া ছাই উড়ছে, বস্তির লোক সামনের বাগানে হাঁড়িকুড়ি থালাবাসন এবং বিড়ি বাঁধা কুলো নিয়ে উঠে এসেছে। দুমকার সাঁওতালদের মতন বাগান হয়েছে ওদের আশ্রয়। বাগানে মাছধরা ছোট জাল, পলুই ইত্যানি পড়ে আছে। ঘটনা সবচেয়ে বিস্ময়কর ঠেকে, যখন নাটা, ললিত, শশাঙ্ককে তেরোঘরায় দেখা যায়। ওঁরা ত্রাণ করতে এসেছেন।

নাটা বলেন—বাঁশখুঁটি যা লাগে দিব। এখানকার বাঁশঝাড়ে গিয়ে কেটে নে তোরা। দড়িদড়া যা লাগবে, আমার কাছে যাস, সাহায্য করব।

এইসব কথা যখন উনি গলগল করে বলছেন, তখন লাঠিতে ভর করে সামনে এগিয়ে

এল ইকবাল ভুঁইয়া।

বলল—মাঝরাতের ঘটনা তরফদার সাহেব। কিন্তু তিনদিন হয়ে গেল, করীমের কাগজে সংবাদ হওয়ার পর আপনারা এসেছেন। মনে হচ্ছে, আপনারা কিছুই জানতেন না। আমরা জানি কী করে কী ঘটল। শশাঙ্কর দল এসে এই কাজ করে গেছে। ঘটনা ঘটাবার আগে দুই সন্ধ্যা এক ব্যাণ্ডেজ-অলা এই বস্তিতে যাতায়াত করেছে। জুতোখোর একটা, চেনেন তাকে ?

—কী বলছিস ইকবাল ! বিস্ময় প্রকাশ করেন ললিতমোহন।

—ন্যাকামো করবেন না কনভেনার। এই দেখুন ! বলে একটা রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ ললিতের চোখের সামনে তুলে ধরে ইকবাল ভুঁইয়া।

—আপনি যাকে জুতো মেরে সিধে করার লোক-দেখানো ভড়ং করেন, আপনার ভাই ডাক্তার ডেকে এনে তার মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। নাটা আসেন দৌলত বিলোতে। আপনাদের খুনে-শশাঙ্ক কিসে সিধে হয় জানি, আমার অক্ষম পায়ে সে জুতা তুলে পিষেছে, মনে আছে ! যান চলে যান। বেশি নবাবী করলে তার পরিণাম ভাল হবে না। দুটি কচি মেয়ের উপর অত্যাচারই শুধু হল না, শেষ হয়ে গেল প্রাণ দুইটা। আর কী চান ?

—ব্যাণ্ডেজ কোথায় পেয়েছিস ? ললিত জানতে চান।

—জুতাখোরকেই শুধোবেন কোথায় পেয়েছি। অ্যাই, কে আছ, তরফদারের বাঁশবাগানে কে কে যাবা ? শোন ভাইসকল ! ডিহির বাগান সাফ করে দাও। দা নিয়ে বেরিয়ে পড়। ওরা দেখে যাক বাঁশবাগান খাসের জিনিস। পুলিস এসে অবস্থা দেখে যাবে ভেবেছিলাম। অপেক্ষা করেছি, এবার কাজে নাম। এদের কাছে বন্দুক থাকলে কেড়ে নিয়ে রাখ, পরে ফেরত দিয়ে আসব।

—কী করছ তুমি ইকবাল ! আমি তো দিতেই চেয়েছি। ঈষৎ কাতর গলায় বলে উঠলেন নাটা তরফদার।

—হ্যাঁ, উড়ো খই তো মানুষ গোবিন্দকেই দেয় ! তোমরা শশাঙ্ককে ওই কাঁঠালগাছে দড়ি দিয়ে বাঁধো, পালাতে দিও না। নাকখৎ হবে। ধর ওকে। মনে রাখবে, নেতা বলেছেন, পুলিস কখনও ডোঙায় চড়ে না। তারা কখনও তেরোঘোরা দেখেনি। ওদের মুরোদ জলগেট পর্যন্ত।

চারজন তাগড়া জোয়ান কুঁয়োর রসি হাতে শশাঙ্কর দিকে এগিয়ে আসে। অনেকের হাতে দা, রামদা, কাটারি, গুপ্তি উঠে পড়েছে। সহসা যেন রণক্ষেত্রের প্রস্তুতির মত দেখায়।

—মারবে তোমরা ? নাকখৎ কেন ভাই ! কাতর-বিমর্ষ স্বরে বলেন ললিত।

—দাঁড়াও ইকবাল ! অমন করো না ! সবিনয়ে গাঢ়স্বারে বলে উঠল চন্দ্রিমা।

—না বউদি, তুমি কথা বলো না ! এদের ছেড়ে দিলে আর সুযোগ পাব না আমরা !

—কী করতে চাও তুমি ? উত্তেজিত হয়ে ওঠে চন্দ্রিমা।

চন্দ্রিমার কথার কোনও জবাব না দিয়ে ইকবাল চোখের ইশারা করে কয়েকজনকে এদিক ওদিক। আকুল হয়ে ইকবালের লাঠিটা দু হাতে জড়িয়ে ধরে চন্দ্রিমা। এমন সময় কোথায় নিকটে আকাশ ভিন্ন করে দেয় হঠাৎ গর্জে ওঠা এক সুতীব্র বন্দুক। ললিত, নাটা এবং শশাঙ্কর নাড়ী ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সেই বেগবান শব্দে।

বন্দুকের আওয়াজ হওয়ার পর কয়েক দণ্ডেই পিলপিল করে সশস্ত্র মানুষ তেরোঘরাকে

ঘিরে ফেলে। প্রত্যেকের হাতে দা, কাটারি, হেঁসো। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। মানুষ আসছে তো আসছেই, সেই প্রবাহ আর শেষ হতে চাইছে না।

—শশাঙ্কবাবু দেখে রাখ, কারও গলায় কিন্তু লাল রুমাল বাঁধা নেই। তোমার হাতে আজ বন্দুকও নেই। এরা প্রত্যেকেই আজ সোভান আলি। তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছে। বলে উঠল ইকবাল ভুঁইয়া।

—আমাদের যেতে দে ইক্‌বাল। গরিবের ছেলে তামাশা করিস না! বলে ওঠেন ললিত।

—তামাশা! ও! এই সব তামাশা হয়ে গেল আপনার কাছে! ঠিক আছে, ঈশ্বরের নাম করুন তা হলে। অ্যাট ফার্স্ট আপনাকেই জবাই করা যাক। গুলি নয়। হেঁসোর কোপ মারবে। কই, কে আছো।

ভিড়ের মধ্য থেকে তীব্র খর গলা টানা সুরে ভেসে উঠল— আছি-ই-ই-ই! কেউ তার মুখ দেখতে পেল না।

ইকবাল বলল— এরা প্রত্যেকে ছোটডিহির মসজিদে নামাজ পড়ে দু-এক ওয়ক্ত, বুঝলেন ললিতবাবু। এরা হরবোলা খতিবের হাতে হাত রেখে কসম খেয়েছে তাড়ি খাবে না। বউ ছেড়ে পালাবে না। এই উন্নতি একদিনে হয়নি। তাড়ির গেলাস ফেলে অস্ত্র ধরা সহজ কাজ নয়। এরা প্রত্যেকে এই একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করেছে। আপনার মুণ্ডুটা কাটা পড়লে ওই কাঁধে আর মুণ্ডু গজাবে না।

চন্দ্রিমা বলল—ইকবাল! আমার কথা শোন ভাই!

ইকবাল শুনতে চাইল না। ললিতকে উদ্দেশ করে বলল—বাবুকে জেলে পাঠালেন কেন? কবিকে মেরে ফেললেন কেন!

—কবি মরেনি ইকবাল! বলে ফেলে চন্দ্রিমা চমকে উঠল। কী ভুল করল সে!

—মরেনি? কী করে জানলেন আপনি! আপনি কে! দালাল? এখানে কেন আসেন আপনি? আপনার মুরোদ আছে চৌধুরী-ফ্যামিলিকে রক্ষা করার? আপনার চোখের উপর মণির নাকখৎ হয়, আপনি কিছুই করতে পারেন না। আপনি কবিকে দেখেছেন?

—না।

—তবে কথা বলছেন কেন?

চন্দ্রিমা বলল—আবার বলছি, এদের ছেড়ে দাও তুমি। কবি ফিরে আসবে।

—কথা দিচ্ছেন? আপনি আর ললিত তো একই দলের লোক। আপনার দল হল, ললিতের দলের 'বি' টিম। তিমিরের দল ইলেকশন লেকচারে সেই কথা বলে। তা হলে কি সেই কথা সত্য? এত মার খেয়েও আপনি দালালি করতে আসেন এখানে?

—না। আসিনি। কবিকে ধরিয়ে দিয়েছে তিমিরবরণ। 'কংসাল' বলে একটা উগ্র দলের কথা তিমিররাই প্রচার করেছে। ললিতের দলে আশ্রয় নিয়েছে তোমারই দলের কর্মীরা, চাকরি পর্যন্ত নিয়েছে, যাকে তাকে 'দালাল' বলার চেষ্টা কর না ইকবাল। অনেক করেছ, চোধুরী-ফ্যামিলিকে বাঁচতে দাও।

—এইভাবে আপনি কম্প্রোমাইজ করবেন বউদি!

—ছেড়ে দাও!

—আপনি ছেড়ে দিলেন বউদি। এর ফল-পরিণাম আপনার উপর বর্তাবে। খেসারত আপনিই দেবেন। শ্রেণী-ঘৃণা বস্তুটা আপনি বোঝেন না।

—ঠিক আছে, ওদের তবে হত্যা কর!

—না, থাক। আর নয়। আমি ধর্মের মানুষ। জিহাদ করলে রক্ত ঝরে। হায় খুদা ! পরওয়ারদিগার তুমিই জান আজ কী হয়ে গেল ! বলতে বলতে দু হাত আসমানের দিকে খাড়া করে তুলল হরবোলা খতিব। দেবপ্রতিমের বুকের ভেতরটা কিসের নখরে যেন আঁচড়ে চলেছিল। আজকের এই 'অ্যাকসান' হয়ে গেলে তিনি এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারতেন। 'জলগেট' বন্ধ হয়ে যেত। জল আর নামত না। বর্ষা এসে যেত। খুব ভুল হয়ে গেল আজ। তাঁকে সবার সামনে ধার্মিক পুরুষ হরবোলা খতিব হয়েই থেকে যেতে হল। ছদ্মবেশ উন্মোচিত করতে পারলেন না তিনি। তাঁদের তরফে সবচেয়ে সহানুভূতিশীল রাজনৈতিক দলটিই আজ বাধা হয়ে দাঁড়াল। চন্দ্রিমার দলই তাঁদের ছেলেদের 'ক্রিম অফ দি সোসাইটি' বলে আখ্যাত করেছে। কোনও দল তাঁদের ইতিহাসের এমন মূল্যায়ন করেনি। শহিদ মিনারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিমিরের দলের নেতারা যখন পুলিসকে হুমকি দিয়ে বক্তৃতা করে—পুলিসের পিস্তলে বেয়নেটে কি লুপ পরানো আছে যে ম্যরতে পারে না। মারো মারো। তখনই চন্দ্রিমার দল বলে, এরা ক্রিম।

চোখেরই উপর দিয়ে ছুটে পালায় শশাঙ্ক। তেরোঘরায় দগ্ধ ধ্বস্ত গৃহ-কাঠামো পেরিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে। সে এক ত্রাসিত অভূতপূর্ব চলচ্চিত্র। লোকটা এখন আর বাবু নয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা এক দ্বিপদ প্রাণীমাত্র সে, তার প্রাণ আছে, সংসারধর্ম আছে। লোকটির জোতজমি, হাল-বলদ, দোকানপাট আছে, ওর বলদের পায়ে হাল লেগেছিল। আমানি নামের এক কিশোরকে পিটিয়ে মেরেছে পশুপ্রেমিক এই মানুষটা। বলদের রক্ত জমিতে পড়েছে বলে তার কষ্ট হয়েছিল। কদমের বউকে প্রসন্নভাবে ধর্ষণ করেছে এই লোক।

উন্মত্ত জনতা ওর পিছু ধাওয়া করে। আকাশ দীর্ণ করে যায় সেই বিশাল বাহিনী ; ঊর্ধ্ব চিৎকারে দৌলতডিহার দিকে পালায় শশাঙ্ক। জনতাকে অনেকটাই পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছিল সে। এখানে একটি বড় ধরনের বাঁক আছে, বাঁকের মোড়ে উচ্চভূমিতে অতি পুরনো এক মসজিদ। ঢুকে পড়ে। মসজিদে নামাজি মানুষের সংখ্যা এতই অল্প হয় যে, তা উল্লেখ করা লজ্জাজনক। আজ শুক্রবার, জুম্মা।

মসজিদটা অচল হয়ে যায় পাছে, তাই প্রতি জুম্মায় এখানকার লতিফ মিঞা নামে একজন, সাদা চৌধুরীর স্কুল-কলিগ শিশাডিহার চয়ন মৌলবিকে খুদবা পড়ানোর জন্য, নামাজ পড়ানোর জন্য ডেকে মসজিদকে জিন্দা রাখার ব্যবস্থা করেছেন সম্প্রতি।

জুম্মা হবে সাড়ে বারোটায়। বারোটা এখনও বাজেনি। কিন্তু চয়ন এসে পৌঁছে গেছেন ধর্মরক্ষার জন্য, তাছাড়া জলপথে ডোঙায় আসতে হয় বলে তাগিদ থাকে। তিনি সঙ্গে আনেন এক কলিদার পাজামা, কিস্তি টুপি পরা কিশোরকে। ছেলেটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনিচ্ছুক, অর্ধ-ইচ্ছুক নামাজিকে ডেকে আনে জামাতের জন্য। এই কারণেও কিছু আগাম পৌঁছাতে হয়। ছেলেটা গরিব মেহনতী মানুষকে ডাকতে গেছে। মসজিদে চয়ন একা, লতিফ মিঞাও এসে জুটতে পারেননি।

মসজিদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কদম। তাকে বারবার ভিতরে ডাকছেন চয়ন খতিব। বলছেন—চুরিদারি যাই কর কদম, অন্তত জুম্মার দিনে চারটি সিজদা দাও। এসো।

কদম চয়নকে এড়াতে পারছিল না। ভাবছিল, পাপী মানুষ, কী করবে সে !

চয়নের চাপে জলভর্তি বদনা হাতে ওজু করবে কিনা ইতস্তত করছিল। বদনা ঠেলে ফেলে সে পালাতে পারছিল না, অথচ সে তেরোঘরার আওয়াজ শুনেছে। হঠাৎ শশাঙ্ক

তার কাছে পাগলের মত ছুটে আসে। কদম তাকে ইশারা করতেই মসজিদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

—বাঁচাও খতিব! বলে চয়নের পায়ে পড়ে যায়। চয়ন ভাবে, জান বাঁচানো ফরজ। বড় শেতলপাটি জড়িয়ে মসজিদের এক কোণে শশাঙ্ককে খাড়া করে রাখে খতিবটি। কদম মসজিদের বাইরের চাতালে একটা ঘাস বিজড়িত কাঠের উপর বসে জল-প্রক্ষালন করতে থাকে, নামাজি ভাষায় যাকে বলে ওজু।

মানুষ সগর্জনে শুধায়—কোথায় শালা!

কুল্লি করে এবং মুখে জল ঝাপটা মেরে খোদার মুহব্বতে উদ্ভাসিত কদম বলে—ইদিকে! বোধহয় ইদিক পানে। আঙুলের ইশারা করে দেয় অনির্দেশ্য ভঙ্গিমায়। জনবাহিনী বাঁক পেরিয়ে ছুটে যেতে থাকে। এভাবে ছদ্মবেশী ধর্ম রাজনৈতিক শ্রেণীঘৃণাকে আড়াল করে, ধার্মিক কোনও এক মহাপাপকে শেতলপাটিরূপী জায়নামাজে জড়িয়ে রাখে, ধর্মের আশ্রয় মানুষ এভাবেও রচনা করতে পারে। এ ভাবনাটি ভাবতে পারে কদম আলি। নামাজ পড়তে পড়তে তার খুবই কান্না পায়। সে অবাক হয় নিজে, এত কান্না কিসের খোদা! এই লোকটাই তো আমার ছেলেকে মেরেছে। তবে তাকেই খোদার ঘরে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলে বাঁচাতে গেলাম কেন? হু হু করে কেঁদে ফেলে কদম।

নামাজের সুন্নত বাকি ছিল, নফল বাকি ছিল অর্থাৎ গৌণ প্রার্থণাগুলি যা জামাতে নয়, একা করতে হয়, কদম করে না। উঠে পড়ে।

গায়ে জ্বর চাপে এই চড়া দ্বিপ্রহরে। গলা শুকিয়ে আসে ঘন ঘন। মাথায় কিসের গোলমাল দেখা দেয়। হায় পীর পয়গম্বর! জীবনটা কিসের হদিশে চলে খোদা! কী পাপ করলাম বাপ ইমান আলি। কী পাপ করলাম হাওয়া খাতুন! কী পাপ করলাম ফুলভানু।

কদম চুপচাপ পথে নেমে বুঝতে পারে, সে পাগল হয়ে গেছে।

—আমি পাগল হয়ে গেলাম মেজবাবু! আর পারব না।

—পারতেই হবে তোকে।

—জি!

—দেবপ্রতিমকে খুঁজে বার কর!

—আমাকে ক্ষ্যামা দেন বাবু!

—না।

—পারব না। চিনি না তেনাকে। কুথা থাকেন সেই মানুষ, জানা নাই। হায় চয়নজি, এ কী পাপে জড়ালেন খতিবসাব! এই শশাঙ্ক আমার বিবির কাছে যায়, রেতে। কী ঘিন্না এই পরানে বুঝবা না দারোগাবাবু, বুঝবা না খতিব।

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে হাঁউমাউ করে ওঠে কদম আলি, একাকী। পায়ে পায়ে সে তেরোঘরায় চলে আসে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে একটি বউ। আলুথালু হয়ে যাচ্ছে তার ছেঁড়া শাড়ি, ময়লাধরা বসন। ওর মেয়ে বলাৎকারে জলে শেষ হয়ে গেছে। ওর মুঠোয় ধরা ছাই, গায়ে কপালে মাখছে ভস্মীভূত গৃহের শেষ অর্থহীন অবশেষ।

—আমি কি ততটাই পাগল খোদা! আমি কি মানুষ দেববাবু! তুমি কোথায়! কলেজের মাস্টার তুমি। আমি যে আল্লার কালাম নাশ করেছি। আমাকে ক্ষ্যামা করেন।

বিড়বিড় করে কদম। ডুকরোনো কান্না দেখে বউটির। ছাইভস্ম দেখে, উড়ে যাওয়া

সেই ছাই ঘূর্ণিবাতাসে পাক খেয়ে ওঠে, মনে হয় ওই ঘূর্ণির আবর্তভস্মে শয়তান লেগেছে। 'ফিনা রে জাহান্নামা খলেদিনা ফিহা।' খোদা গো! অত্যাচারী শয়তানকে জাহান্নামের আগুনে ফেঁকে দাও।

আমাকে চূর্ণ কর। বাবু সাদা চৌধুরী, কুথা আছেন গো আপনি! সব বিরান হচ্ছে বাবু। আপনার বীজ-বিছন সব শেষ হয়ে যায়। আসেন, আসেন। দ্যাখেন, চোর কদম পাগল সেজেছে। লঘুশাল ধানের বিছনের কথা তুমার মনে আছে চৌধুরীবাবু! গড়াবাসার ধান। সেই যে সিবারে আনে দিই, স্মরণ করেন!

ইকবাল কদমকে দেখতে পায়। লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে আসে। তার দুটি চোখ সেকেন্ডমাত্র ধক্ করে জ্বলে ওঠে। খপ করে মাথার চুল মুঠিতে খামচে ধরে।

—এখানে কেন, তুই! থানা ছেড়ে দিয়েছে তোকে! কবি কই? বল্।

পাগল কদম ইকবালের লাঠি ধরে মাটিতে পড়ে যায়।

—ভাই, তুমাকে সব বুলব। আমাকে বিশ্বাস করেন তুমি। আমি পাগল।

—হ্যাঁ, পাগল সেজেছ! আয় হারামজাদা? দাঁতে দাঁতে চেপে ইকবাল কদমকে চুল ধরে খাড়া করে। বাড়িতে টেনে আনে।

ধাক্কা দিয়ে বিমর্ষ বসে থাকা হরবোলার পায়ের কাছে ফেলে দেয়। কদম হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

—থানা তোমাকে কী বুলেছে বাপজি! কিসের জন্যি এসেছ ইখানে! সত্য কথা বুলো। ওর কপালে কিসের দাগ! বলে ওঠে হরবোলা।

—ধুলা খতিব। মা-খাকির ছাপ। মহজিতে জুম্মা পড়েছি জুনাব। অখনও রজু (ওজু) ভাঙেনি। মিছা কইব না। গড়গড় করে বলে যায় কদম আলি। দেবপ্রতিমের কেনম যেন মায়া হয়। মায়া হয়, ঘৃণাও হয়।

—থানা আমাকে ছেড়ে দিলে চুনাখালির কাছে। বুললে, চলে যা। আমার সন্দ, ফিরা আমাকে পাকড়াবে থানা।

—কেন এসেছিস তবে?

—তেঘোরায় বাস করব, ঠাঁই দেন খতিবসাহেব। খুদা কসম।

—তোর কসম খোদাও বিশ্বেস করে না কদম আলি। কপালে সিজদার ধুলা মেখে চোর কি সাধু হতে পারে রে!

এবার কদম সজোরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। নির্বোধ হলেও সে বোঝে, কপালের প্রার্থনা ধূলি কি মিথ্যা, কী প্রচণ্ড ধাপ্পা, কী করুণ ছদ্মবেশ!

হঠাৎ ইকবাল অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে বলল—একে পানিতে ফেলে দিতে হবে খতিব। একে আর রাখা যাবে না।

কদমের কান্না সহসা রুদ্ধ হয়ে যায়। মনে পড়ে, থানা তাকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছে। এত টাকা যে, এরপর সে চুরি ছেড়ে নামাজি হয়ে সুখে কাল কাটাতে পারে। খোদাঅলা, পরহেজগার হতে পারে। শশাঙ্কর কাছে পেতে পারে অনেক বখসিস।

চন্দ্রিমা রুকসানাদের বাড়ির বাইরের চটি বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওর পায়ের কাছে চুপচাপ বসে আছে মণি। উঠোনে অনুচ্চ মোড়ার উপর বসে রয়েছে হরবোলা, কুলগাছের তলে। ইকবালের প্রস্তাবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে চলেছে। চন্দ্রিমা চমকে উঠেছে। মৃত্যুই যেন কোথা থেকে কদমকে ডেকে এনেছে।

চন্দ্রিমা বলল—তোমাকে থানার পুলিস চুনাখালির পার্কের কাছে নামিয়ে দেয়, তুমি

তখন কী করলে ?

কদম উঠোনে দু'হাত পেতে কুঁকড়ে পড়ে আছে। চন্দ্রিমার কথায় নড়ে উঠল।

—কবি দাদাকে নামাই আমরা। আমি আর রসুল। ফেলে আসি ঝোপের ভিত্রি, গুঁজড়ে দিই। দাদা তখনও মরে নাই।

—তারপর। নির্ভয়ে কথা বুলো। সত্য বুলো। জুম্মা পড়েছ তুমি। কপালে সিজদার দাগ আছে। সত্য বুললে খোদার কাছে আমি দোয়া করব তোমার জন্যে। আগে বুলো, থানায় মার খেতে খেতে দারোগার কাছে কী কথা কবুল করেছে কবি ! মোলায়েম সুরে জানতে চায় হরবোলা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে কদম। তারপর বলে—নেতার নাম কবুল করলে। তারপর পাগল হয়ে গেল।

—কেন ? ইকবাল শুধায়।

—তাপর বুললে, দারোগাবাবু আমাকে মারেন, শ্যাষ কর্যা দ্যান বাবু গো ! আমি আর বাঁচতে চাই না।

হরবোলা এবার মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর হাত-পা থর থর করে কাঁপছে। কথা বলতে পারছে না।

—নেতার কী নাম বুলেছে কদম আলি ! অত্যন্ত ভারি আর সিক্ত শোনায় হরবোলার কণ্ঠস্বর।

মণি হঠাৎ কথা বলে উঠল—মায়ের কাছে গিয়ে রাতে খুব কান্নাকাটি করেছে কদম আলি। একা। মা আমাকে বলেছে খতিব সাহেব। এই ঘটনার পর মা কদমের হাতে তছবীহ তুলে দিয়ে বলে, কসম খা কদম আমার ফ্যামিলির ক্ষতি তুই করবি না। এত ঘটনার পরও মা কদমকে বিশ্বাস করে, বুঝলেন !

মণির কথা শুনে চন্দ্রিমা আশ্চর্য হয়। মণি এই ঘটনার কোনও উল্লেখ করেনি তার সামনে।

মণি বলে—আমি জানি কবিদাদা বেঁচে আছে।

—কী করে জানলে ? প্রশ্ন করল ইকবাল।

—কদম আমাকে আগেই সব বলেছে। ওকে আমি প্রণামপুর আসতে মানা করেছিলাম। বলেছি, ইকবাল ভাইরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না, তুমি যেও না। ইদানীং ওকে কেমন পাগল ঠাহর হয়।

—এই পাগলামিটা ওর অভিনয়। বলল ইকবাল।

—আমি কবিদাদাকে আমার জান-কবচ দিতে চাইনু খতিব বাবা ! নিলে না। দড় মানুষ, তবো পারলে না। কবুল করলে। নেতার নাম দারোগা আমাকে বুলেছে বাপজি ! মুনে নাই। আমি তেনাকে সাবধান করতে আসেছি বাপ !

কদমের এই সব কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আবার মোড়ার উপর বসে পড়ে হরবোলা। তারপর বলে—কলেজের মাস্টারডাকে সাবধান করে দাও ইকবাল। বরং তেনাকে চলে যেত বল। ওর আর কী কাজ আছে ! খুদা আর এই আন্দোলন চান না ভাই ইকবাল।

—কী বলছেন হরবোল ! প্রায় ডুকরে উঠল ইকবাল ভুঁইয়া।

রুকসানা বলে উঠল—বউদি, তুমি আর ডেঁড়িয়ে থেকো নি, চইলে যাও। অনেক করেছ, ইবার কদমকে লিয়ে পালাও।

—নাহ্। বলে তীব্র হিংসায় লাফিয়ে উঠল হরবোলা। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হিসহিস করে চাপাস্বরে বলল—ইকবাল ! এই চোরডাকে নিকেষ করে দাও। রেখো না। অ্যাই, পালানোর চেষ্টা করো না ! তুমি যাকে সাবধান করতে আসেছিলা, আমি তারে গিয়ে সাবধান করি।

বলে দ্রুত পায়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় হরবোলা। একটু বাদেই চারজন যুবক এসে দড়ি দিয়ে কুলগাছের সঙ্গে কদমকে বেঁধে ফেলে।

মণি নিরাশ কণ্ঠে বলল—চলো বউদি আমরা যাই।

চন্দ্রিমা কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। নাটা, ললিত, শশাঙ্ক নয়, বর্শামুখ অন্যদিকে ঘুরে গেল। চন্দ্রিমার মনে হল, সমস্তই তারই জন্য।

কিছুতেই চন্দ্রিমার ঘুম আসে না। স্বামী পাশে শুয়ে আছে। নিঃশ্বাসের শব্দে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে। এত কষ্ট বুকরে মধ্যে যে শ্বাস টানতেও বুকটা ব্যথা করে। বুলবন যদি তাকে একবারটি কাছে টেনে নেয়, মনে হয় তার কষ্ট প্রশমিত হবে।

ভয়ে, দ্বিধায় এবং যন্ত্রণায় ডেকে ওঠে—বুলবন ! অত্যন্ত ক্ষীণ স্বর।

স্বামীর গায়ে হাত দেয়। সমস্ত ঘটনা পাশের মানুষটিকে বলে ফেলতে ইচ্ছে করে। সে কি ভুল করেছে, কতখানি ভুল করেছে ? বারবার হরবোলার কঠিন মুখ ভেসে ভেসে উঠছে। হঠাৎ মনে হয়, ইনিই আসল নেতা, কিন্তু কলেজের মাস্টার কি অমন হয় ? অমন ভাষায় কি একজন কলেজ-শিক্ষক কথা বলতে পারেন ? উনিই ফের বললেন, মাস্টারকে তিনি চলে যেতে বলবেন, তাঁর আর কাজ নাই ! তাহলে তো প্রকৃত বড় নেতাটি গ্রামেরই অন্য কোথাও আত্মগোপন করে আছে। রাহুল কোথায় ?

কেন সে ইকবালকে বাধা দিতে গেল ! নিশ্চয়ই চন্দ্রিমা ভয়ে অমন করে বাধা দিয়েছে। নাটারা তিনজন খুন হয়ে গেলে বাস্তবিক তারপর কী হত ! এই ফ্যামিলি আর একদণ্ডও টিকতে পারত ! থানা-পুলিস, কূট-প্রশাসন কি চুপ করে থাকত ! আবার মনে হচ্ছে, গ্রাম স্তব্ধ হয়ে যেত, সব অত্যাচার থেমে যেত। সে বাধা দিতেই, হরবোলা ধার্মিক-স্বরে পরিস্থিতিকে সামাল দেয়, যেন সে-ই নাটাদের রক্ষা করল।

এই সব ঘটনা বুকে চেপে রাখতে পারছিল না চন্দ্রিমা। সবচেয়ে ভয়ংকর নির্বোধ কদমের ছবিটি। এতক্ষণ হয়ত তার হতচ্ছন্ন লাশ জলে ভাসছে। ও কি সত্যিই পাগল ! মণি তাকে পাগল বলেছে। পাগলকে মেরে ফেলবে কেন ওরা ? কদম তো আর পুলিসের লোক নেই। অন্তত এ কথা ইকবালদের বলা উচিত ছিল। চন্দ্রিমা বলতে পারেনি। কষ্টে বুকটা ভেঙে পড়ছে, স্বামীকে ডাকলেও স্বামী সাড়া দিচ্ছে না।

—বুবন !

—অ্যাঁ !

—আমার ঘুম আসছে না।

—ঘুমোও।

—না।

—কী করতে হবে আমাকে !

—শোন !

—না, পারব না ! জ্বালাতন ক'রো না।

—আমরা কেন তবে একসঙ্গে আছি !

—তোমরা আর ন্যাকামির শেষ নেই দেখছি।

—আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে বুবন। প্লিজ !

—আজ প্রচণ্ড খাটাখাটনি গেছে, মুনিষের সঙ্গে। এ তো ডোঙায় চড়া নয় চন্দ্রিমা ! আমার ঘুম পাচ্ছে !

—কখনও এভাবে চাইব না বুবন ! কোনওদিন এমন করিনি।

বুবন এবার বিছানায় উঠে বসে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে। চন্দ্রিমা স্বামীর একখানি হাত জড়িয়ে নেয় দু'হাতে, তারপর বুকের দিকে টানে।

মহাক্রোধে বুলবন চন্দ্রিমাকে দংশন করে বুকে মুখ নামিয়ে, যেন গা থেকে গরল নেমে যাচ্ছে।

—ওহ্ ! ছাড়ো, প্লিজ ! অমন কেন করছ ! ছেড়ে দাও ! আর কোনও দিন তোমায় বলব না। আমি ভুল করেছি।

—নাহ্। নাহ্। একটা দুর্বোধ্য স্বর বার হয় বুলবনের গলায়। এক ধরনের ধর্ষণ হয় তারপর। চন্দ্রিমার দেহের প্রতিটি কোষ ঝিমঝিম করে, জ্বলে যায়। স্বামীর মুখটিকে অদ্ভুত অচেনা লাগে।

চন্দ্রিমা কেঁদে ফেলে। ভোর রাতের দিকে ঘুম আসে চন্দ্রিমার। বুকের ভিতরে এবং বাইরে ব্যথা শুরু হয়। বুলবন আর ঘুমাতে পারে না। এক সর্বগ্রাসী অপরাধবোধ তাকে জালের মত জড়ায়। একটু একটু শীত লাগছে এখন। দিগন্তে আঁধারে কোথায় সুদীর্ঘ হাওয়া বয়ে চলেছে। চন্দ্রিমার সঙ্গে সে পশুর মতন আচরণ করেছে। টেবিলের বাতিটা একটু উসকে দিয়ে চন্দ্রিমাকে দেখতে থাকে। আলোটা ঘুমন্ত মুখের কাছে টেনে আনে। বুলবনের চোখ দু'টি ছলছল করে ওঠে।

পায়ের কাপড় উঠে গিয়েছিল চন্দ্রিমার। সন্তর্পণে নামিয়ে দেয় বুলবন। মনে হয় চন্দ্রিমার কোমল পা দু'খানি বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেয়। ক্ষমা কি করবে না এই মেয়ে ! কী ঘটেছে প্রণামপুরে। কিছুই তো সে জানতে চায়নি।

শুধু তারই ভরসা করে কলকাতা থেকে একা এত দূরে অজ পল্লীতে এসেছে মেয়েটি। রাজনৈতিক কারণে কতভাবে রাতদিন অপমানিত হচ্ছে। শত নিগ্রহ সে তুচ্ছ করতে পারে, যদি হৃদয়ে ভালবাসা থাকে, 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' কোথাও কি সেই হৃদয় খালি হয়ে গেছে ?

চন্দ্রিমার মাথায় আলতো করে হাত রাখে বুলবন। টেবিলে সরিয়ে দেয় স্নিগ্ধ বাতিটি। তেকোনা পতঙ্গের মত আলোর বোঁটা। সেদিকে দেখে একবার।

চন্দ্রিমার পায়ের দিকে হাত বাড়ায় বুলবন। আলোর মৃদু উজ্জ্বলতায় তেকোনা পতঙ্গ পুড়ে যায়। মনে হয় ওই শিখাটি একটি ছবি, এক অনন্ত হৃদয়ের উৎস, আলো আর প্রেম একই বর্ণশোভায় মথিত এবং উদ্গত। নিশ্চয়ই চন্দ্রিমা তাকে ক্ষমা করে দেবে।

চন্দ্রিমা ঘুমের মধ্যে কথা বলতে চাইছে। মুখে সংকুচিত আবেগ। একটু আধো ভাব, ক্ষীণ ধ্বনি ওঠে।

'রাহুল !'

বিশ্বাস করতে পারে না বুলবন। কান পাতে।

—'রাহুল !'

তৃতীয় বার ডেকে উঠেছিল চন্দ্রিমা, অত্যন্ত যন্ত্রণা-গভীর কাতরতা ছিল। বুলবন আর চন্দ্রিমার কোমল পা স্পর্শ করতে পারল না। হাত শূন্যে থেমে গেল। কোথাও আশ্রয় ছিল না এই বাড়ানো হাতখানির।

তখনও আঁধার ছিল গৃহকোণে, বাতাসে অন্ধকার ছিল হালকা ভাসমান। চন্দ্রিমা মাঠে এসে ঝুপড়িতে দেখল, মণি নেই। হুকুম বলল, মণি রাতে শুতে আসেনি। বাড়িতে নাই ?...চন্দ্রিমা পূব আকাশে চেয়ে রইল। চুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তীব্র হাওয়া। এই চুল ধরে হেঁচকা টেনে জাগিয়ে তুলেছে বুলবন। ব্যথা করছে।

॥ ৩২ ॥

রুকসানা ফুঁ দিয়ে কুপিটা নিবিয়ে দেয় সিঁথানের কাছে। তারপর চটি-বারান্দার মাটির মেঝেতে শেতলপাটির উপর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। চিৎ হয়ে শুয়েছে, একটু কাত হয়। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, সূর্মার ছায়ায় ঘেরা আছে আকাশের চাঁদ। এমন চাঁদের ছবি প্রতি নিশিকালে থাকে না। বাতাসে শীত নেই, তবে শীতলতা আছে, সেই বাতাসে জ্যোৎস্না লেগেছে বুনো ফুলের মাদক-সুবাসে। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানলে বুকটা কেমন হাহাকার করে।

বারান্দায় উঠে বসে রুকসানা। খতিবের কাছে যেতে হবে। রাত হল। বেচারি পাগল হয়ে গেছে। দু'জন অল্পবয়েসী মেয়ের ইজ্জত গেল, প্রাণ চলে গেল। খতিব কিছুই করতে পারল না। রুকসানা আশ্চর্য হয়, খতিব ইকবালের দলের লোক। ইকবাল খতিবকে মান্যি করে। তেনারই হুকুমে কদম আলি আটক হয়ে গেল। সব রাগ গিয়ে পড়ল বেচারা চোরের উপর।

কুলগাছের তলে লোকটা কুকুরের মতন বাঁধা, রশি দিয়ে আটকানো। ওকে খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। পানি চেয়েছে, বাটিতে করে খাইয়ে দিয়েছে রুকু। তখন কদমকে মানুষ মনে হচ্ছিল না।

—খাও।

—বাঁচব না বহিন।

—তুমি পুলিসের লোক।

—ছিনু বুবু। এখন আমি পাগল। ছাড়ে দাও দিদি!

—না। ছাড়ে দিলি ক্ষেতি করবা তুমি। পুলিসে খপর করবা। তুমি শশাঙ্কর লোক।

—হায় আল্লা। আমি কী করলাম গো!

ডুকরে ডুকরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কাঁদে কদম। পুরুষ মানুষের এমন সখের কান্না সহ্য করতে পারে না রুকসানা। অবশ্যি অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে শুনলে মনে হয়, এটা ঠিক আর সখের কান্না নয়। মন বলছে, সত্যিই লোকটা কাঁদছে। পশুপাখি যেমন কাঁদে।

রুকসানা বারান্দা ছেড়ে নামে। কুলগাছের কাছে চলে আসে। বাঁধন কেটে ঘুমন্ত কদমকে ডেকে দিয়ে বলে—পালাও কদম আলি। কখনও আর এই বাগু হবে না। কসম খাও।

—আল্লা কসম বহিন। আমি খতিবের লোক। জান যাবে, খবর করব না, আমি তেনারে চিনেছি। চিনি নাই ?

—কাকে চিনেছ তুমি ?

—তেনারে। খতিব তুমারে ভালবাসে বুবু।

—খতিবকে চেনবার কী আছে ! মোকে ভালবাসে কী করে জানলে ?

— চোকের বয়ানে, দিষ্টিতে...

—কী ?

—ভাল মানুষ দিদি।

—যাও, যাও ! খতিব যদি দেখে, বাঁচবা না। পালাও।

কদম যা বলতে চাইল, পারল না। রুকসানা টেরও পেল না, কদম কী বলতে চেয়েছিল। রুকসানা এতদিনেও চিনতে পারেনি খতিবকে। ভালবেসেও পারেনি। মানুষটা যদি শুধু খতিবই হয়, তাহলে ইকবালরা ওর কথা এত মান্য করে কেন ! খতিবই যেন আন্দোলনের নেতা। খতিব তাকে প্রতিরাতে বুকে নেয়, কিন্তু কখনও তার বেশি কিছু করে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুকে করে শুয়ে থাকে, চুমু খায়, খুব ভাল করে বুকে রেখে দেয়, কিন্তু ওই অবধিই। কেন ? এত সবুর মানুষটার, এত ভালবাসা মানুষটার ! ভাবলে চোখে জল ভরে আসে।

কদমকে ছেড়ে দেওয়ার পর রুকসানার ভয় করতে লাগল। কী করে একথা খতিবকে বলবে সে ? এমনিতেই খতিবের মাথার ঠিক নেই। রুকু কি তবে সত্যি খুবই অন্যায় করে ফেলল ! কদম কি অনেক বড় ক্ষতি করবে তাদের ? ওকে কি ইকবাল ভাইয়া মেরে ফেলতে চেয়েছিল ?

ভয়ে ভয়ে ছোটডিহির দিকে এগিয়ে যায় রুকসানা। ছোট মসজিদের গা-লাগা মাচায় শুয়ে থাকে খতিব। মাচাটা ত্রিপল দিয়ে ঘেরা। রাত্রে রোজই সেখানে আসে রুকু। পথে লোকজন থাকে না, রাত নিশুত হয়। খতিব তাকে আলিঙ্গন করে।

দেবপ্রতিম হাহাকার করে ওঠে, প্রতিটি আলিঙ্গনে তীব্র যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে।

—হায় খুদা ! আমি কি পাপ করছি। অন্যায় করছি কোনও ! আমি কি ভালবাসি রুকুকে ? প্রতিরাতে আমি কি তাকে ঠকাই না ? বিড়বিড় করতে থাকেন দেবপ্রতিম।

আমি কি ভালও বাসি না ! দেবপ্রতিম নিজেকে প্রশ্ন করেন। আমি কি খতিব বলে ভালবাসি, দেবপ্রতিম হলে বাসতাম না ! কমরেড সি. এম. আমাকে এই অবস্থায় দেখে কী ভাবতেন ! ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন আমি কি ঠিক করছি ? কী করছি এখানে ? মানুষের যৌন-চেতনারও কি শ্রেণীরূপ আছে ! শুধু একটি সময় আমাকে এনেছে এই পল্লীর নিভৃতে, জলের আড়ালে, গরিবের মন আমাকে মান দিয়েছে, আমি কি ওদেরই হতে পেরেছি ! সময় আমাকে এনেছে, আমি তো আসিনি ! ছদ্মবেশে আমি কেন কষ্ট পাই ? সবিতা ! আমি তোমার কাছে ফিরে যাব। হিরণ্ময় আমার ছেলে, আমি তার কাছে ফিরে যাব ! কিন্তু ফিরে গেলে পুলিস আমাকে ছাড়বে না রুকসানা। তুমি আমাকে রাখো, রেখে দাও চিরটা কাল ! এই জল, এই মৃত্তিকা বিপ্লবের জন্য, রুকুকে বাদ দিলে আমি জলেরও নই মৃত্তিকারও নই।

—আপনি আমার কাছে থাকবেন তো খতিব সাহেব ? চলে যাবেন না ?

—কেন যাব ?

—খোদা জানে সেকথা ! আমার ভয় করে।

—আমি তোমার দেহটাকে দেহ দিয়ে শোষণ করি রোজ ! কেন করি তা শুনলে তুমি চমকে উঠবে !

—শুনতে চাই না আমি। পাগলামি কেন করছেন ! আপনার ধর্ম নেই ! দোহায়, আপনি এমন করে কইবেন না জি !

—আবার বল !

—কী কইব ?

—জি। ওইটে আবার কও।

—কেনে ? 'জি' কখনও শুনেন নাই ?

—খুব মিঠা লাগে রুকু। প্রেম কি সম্মানের জিনিস তোমাকে না দেখলে জানা হত না। ওই একটা 'জি', ব্যাস !

—জি ! অবাক হয় রুকসানা। খুব বিস্ময় বোধ করে। মানুষটা বলে কি !

রুকু গলায় মৃদু ঝংকার দেয়—আপনের সহবত বুজতে পারি না, বুজি এই বুকের মদ্যি আমি আছি।

দেবপ্রতিমের বুকটা তোলপাড় করে ওঠে, তিনি ভাবেন তাঁর প্রজ্ঞা কি তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে, বুকের এই তৃষ্ণা কি প্রতারণা ! সমগ্র জীবন ওই 'জি' শব্দটা আমাকে ভাবিত করবে, মুক্তি দেবে না। দেবপ্রতিম ভাবেন।

আজ এই রাতে রুকসানা খতিবের বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে ঝরঝর করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

—কী হয়েছে !

—আমি কদমকে ছাড়ে দিয়েছি খতিব সাহেব !

একথা শোনামাত্র দেবপ্রতিম রুকসানাকে বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। অত্যন্ত হতাশসুরে বললেন—আর পারলাম না রুকু। একটু আগে খবর পেয়েছি, দৌলতডিহার মসজিদে শশাঙ্ক লুকিয়ে ছিল। চয়ন ওকে আশ্রয় দিয়েছিল। কদম ওই ঘটনায় জড়িত। তুমি এ কী করে করলে ! আমাদের সমস্ত গোপন জিনিস চোরটা জেনে চলে গেল। বলো, কোনদিকে গেছে, লোকটা !

—ছাড়ে দিয়েছি আমি। মায়া হল !

—আর মানুষ বিশ্বাস করবে না আমাদের। সংগঠন ভেঙে যাবে। যাও, আমার কাছে আর এসো না। ধাক্কা দিয়ে দেবপ্রতিম রুকসানাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, ফের কাছে টেনে নিয়ে বুকে দলিত করতে থাকেন পাগলের মতন। রুকসানা সশব্দে কেঁদে ওঠে।

দেবপ্রতিম আবার রুকুকে ঠেলে দেন বুক থেকে। অদ্ভুত যন্ত্রণায় তিনি কুঁকড়ে গিয়েছেন। টলতে টলতে মসজিদে ঢুকে আসেন। একটা কাপড়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। বেশি কিছু নেই তাতে। সামান্য জামাকাপড়, চাদর, টুপি, চশমা, একখানা অদ্ভুত মুখোস এবং একটা ছোট টর্চ। বেরিয়ে পড়লেন পথে। রুকসানা ছুটে এল পিছু পিছু। কিন্তু তাঁকে বাধা দিতে পারল না। দু'বার কাতরস্বরে ডেকে উঠল, তারপর আর স্বর ফুটতে চাইল না।

দেবপ্রতিম হনহন করে ছুটে চললেন বিলের একটি নির্দিষ্ট ডোঙার দিকে। ব্যাগে টর্চ ছাড়া আরও একটি বস্তু রয়েছে। ভর্তি রিভলবার। হাত ঢুকিয়ে দেখে নিলেন মুহূর্তেই, এটা কতখানি সক্রিয় হতে পারে। ডোঙায় একপ্রকার লাফিয়ে চড়লেন তিনি। ভাসিয়ে দিলেন লগির ধাক্কায়। হঠাৎ চমকে উঠলেন, ডোঙায় একটা লোক আঁধারের অবয়ব নিয়ে নড়ে উঠল।

টর্চের আলো পড়ল কদমের মুখে।

দেবপ্রতিম বললেন আশ্বস্ত গলায়—ও, আচ্ছা ! তুমি তাহলে এখানে ! চলো, যাওয়া যাক।

কোন কথা না বলে কদম আলি দেবপ্রতিমের হাত থেকে নিয়ে লগি দিয়ে ডোঙা ঠেলতে লাগল।

আকাশে চাইলেন দেবপ্রতিম। একখণ্ড কালো মেঘ কোথা থেকে উড়ে এসে একটু আগে চাঁদের মুখ ঢেকে দিল। তিনি মনে মনে বললেন, এ বেশ ভালই হল। চোরটার চোখের দিকে চেয়ে দেখে গুলি ছুঁড়ে দিতে হঠাৎ হাত কেঁপে উঠতে পারে, অন্ধকারে সেই অসুবিধা নেই। এই অন্ধকার সদৃশ ছায়ায় কদমকে নড়তে দেখে মনে হয়েছিল, মরবার জন্যই যেন লোকটা বসে আছে, এই রাতে তার আর কোনও কাজ ছিল না।

মেঘের ছায়ায় বিপুল বিস্তীর্ণ জলরাশিকে মনে হচ্ছিল ঘন ভয়াল এক সমুদ্র, ছপছপ শব্দে দেবপ্রতিমের হঠাৎ কেন যেন বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। স্ত্রী সবিতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সামনের লোকটা এখন কী ভাবছে কে জানে! তার কি স্ত্রীর কথা স্মরণে আসে না? শশাঙ্কর হাতে তার সন্তান মরেছে, একথা কি তাকে কখনও বিচলিত করেনি? মনে করা যাক, লোকটা মানুষ নয়। এর উপর শ্রেণী-হিংসার প্রয়োগ একটুও নিষ্ঠুরতা নয়। এর মধ্যে কোনওই মনুষ্যত্ব নেই।

দেবপ্রতিম ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে রিভলবার স্পর্শ করলেন। অত্যন্ত সন্তর্পণে বস্তুটাকে বাইরে বার করলেন। অন্য হাত দিয়ে নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে দেখলেন। অন্ধকারেই তাক করলেন লোকটার দিকে।

—সাদাবাবু কি ছাড় পাবে না খতিব সাহেব?

—কী করে বলব তোকে!

—আপনি কলেজের মাস্টার নাকি বাবু!

—ও! তুমি এতই ধূর্ত কদম! খুব আশ্চর্য তো!

—জি। আন্দাজ করি।

—আমাকেও আন্দাজে কাজ সারতে হবে! কলেজে খতিবের চাকরি নাই কদম।

—তাহলি আপনে অন্য লোক?

—আমার হাতে একটা পিস্তল আছে কদম আলি।

—জি!

—অবাক হচ্ছিস!

দূরে হঠাৎ ইঞ্জিনের আশ্চর্য শব্দ শোনা গেল। মনে হচ্ছে খুব দ্রুত শব্দটা এদিকে এগিয়ে আসছে।

—মাইরো না খতিব! মাস্টার আমাকে মাইরো না গো! আমি আমানির বাপ।

শ্রেণী-ভালবাসার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাইছে কদম আলি। অথচ এর উপর শ্রেণী-হিংসা প্রয়োগ করতে হবে। তার ছেলের মৃত্যু দেবপ্রতিমের কাছে বড় ঘটনা। আমানির নামে ছড়াগান দেবপ্রতিমের প্রিয় প্রসঙ্গ। আজও তিনি মাঝে মাঝে সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর তরজা আপন মনে গেয়ে ওঠেন।

আওয়াজটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সামনে নয় পিছনের দিকে, অর্থাৎ কোদালকাটির কদমতলার দিকে চেয়ে দেখলেন দেবপ্রতিম। একটা আলো চোখে পড়ছিল। মনে হচ্ছে, আলোটা এই দিকেই এগিয়ে আসছে। শব্দটাও ধাবমান।

—খতিব সাহেব আমাকে খামোকা মারবেন! আমি পুলিসের লোক লই গো! আমি হ্যাবা বিবির সোয়ামী। একবার জানডা বাঁচান বাবু, আমি জানের দাম দিব।

দেবপ্রতিম এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আলোটার দিকে চেয়ে

থাকতে থাকতে বুঝলেন, জলে ছুটে আসছে মোটরলঞ্চ। অবাক। তাহলে পুলিসরা যন্ত্রনৌকা নামালো জলে!

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর হাতের রিভলবার ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিয়ে দেবপ্রতিম বললেন—ডোঙা ফেরা কদম। পুলিস আসছে!

আলোটা বেশ স্পষ্ট এখনও হয়নি, তবে আলো এবং শব্দ দু'টিই যে গতিসম্পন্ন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কদম আলোটা দেখছিল।

—কিসের আওয়াজ খতিব?

—মোটরলঞ্চ! ইঞ্জিনের নৌকা, চ্যাতালো পাটাতন, খুব জোরে চলে। ললিত শেষ পর্যন্ত...

কথা শেষ করে না হরবোলা। কদম ডোঙাটিকে প্রণামপুরের দিকে চালিয়ে দেয়।

লঞ্চটা এখন অনেকটাই স্পষ্ট দেখাচ্ছে। আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। সমস্ত আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, চাঁদটা আড়ালে চলে গেছে। একটু একটু বিদ্যুৎ চমকে উঠছে।

জলডোবা, গলা জাগানো শিমুল গাছটার কাছে এসে হরবোলা বলল—এখানে ডোঙা লাগা কদম, লগি মার।

ঠিক এই সময় লঞ্চের আলো ওদের গায়ে এসে পড়ে। হরবোলা ব্যাগ থেকে বার করে মুখোসটা মুখে সেঁটে নিয়েছে। আলোয় সেটা অতি ভয়ঙ্কর দেখায়। লঞ্চের উপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—অ্যাটাক। চালিয়ে দাও।

মুহূর্তে দেবপ্রতিমের রক্তকণিকা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁদের শেষ করে দিতে চাইছে ওরা, ডোঙাটাকে পিষে দিতে চাইছে। ডোঙার পাশ দিয়ে লঞ্চটা ছুটে গিয়ে গোল বৃত্তের মত ঘুরতে থাকে চারপাশে। প্রবল তরঙ্গের মধ্যে ফেলে ডুবিয়ে দিতে চায় বা তরঙ্গায়িত অবস্থায় ধাক্কা দিয়ে উলটে দেবে।

মৃত্যুর এমন খেলা মোটেও পছন্দ করতে পারেন না দেবপ্রতিম। তাঁর রিভলবারটি আবার হাতে উঠে আসে। ডোঙাটি কেঁপে উঠে কাত হয়ে যেতে চাইছে। গুলি ছুঁড়ে দিলেন দেবপ্রতিম। লঞ্চের আলোটা নিবে গেল। দেরি না করে আবার তিনি গর্জে উঠলেন তাঁর হাতের আয়ুধে। লঞ্চের থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল।

লঞ্চ থেমে গিয়েছে। মেশিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অতর্কিত এই আক্রমণের কথা পুলিসের লোক ভাবতে পারেনি। দেবপ্রতিমের মনে হল, এই অন্ধকারে আন্দাজে ছুঁড়লেও কেউ একজন বিদ্ধ হয়েছে।

—চোপ্। চুপ করে থাকো! কারও গলা ধমক দিয়ে উঠল। অন্ধকারে অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে লঞ্চ। একটা আলো ক্ষীণভাবে জ্বলে উঠল ওখানে।

—কদম! ভয় পাও? চাপাস্বরে বলে উঠল হরবোলা।

কদম চুপ করে রইল।

ওদিক থেকে কথা ভেসে এল—কদম আলি, ডোঙা নিয়ে চল কদমতলায়! নেতাকে বল, গুলি ছোঁড়া বন্ধ করতে, আমরা নিরস্ত্র নই।

কদম আলি বলল—উদিক পানে লিয়ে গেলে আমাকে মারে দিবে লিডারে, আমার আর বাঁচন নাই দারোগাবাবু!

মিনিট অর্ধ চুপ করে রইল যন্ত্রনৌকা। তারপর ভেসে এল—ঠিক আছে, নেতাকে প্রণামপুর নিয়ে চলে যাও। নামটা বল, উনি কে?

—নাম বুললে কি আমি বাঁচব দারোগাবাবু ! আমাকে বাঁচান।

—হরবোলা লোকটা কে ?

—খতিব।

—সন্দেহ হয়।

—সন্দ করলে সন্দ। ভাল মানুষ বেচারা। গরিব মানুষ। খুৎবা পড়িয়ে খায়। যাকে তাকে সন্দ করেন তুমরা।

—ঠিক আছে, চলো হে ! নইলে আর বাঁচানো যাবে না।

একটি কাতরানি ফুটে উঠতে লাগল।

একটু একটু করে অনেকটা দূরে ডোঙা নিয়ে সরে চলে এসেছিল কদম। হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব ভেসে এল ওদিক থেকে—দু'টোকেই খতম করে দিন স্যর !

কে একজন বলে উঠল—আর যাই হোক, একজন হিন্দু কখনও খতিব হতে পারে না ললিতবাবু।

অন্য আর একজন বলল—চেয়ারম্যানের বাচ্চারা, আর ওই যে বৈঠা বাইবে যে লোকটা, হাল ধরেছেন চেয়ারম্যান, বৈঠা বাইছে একজন, ওইটের বাচ্চারা...

—ওইটে তো আর নাই... বলুন, বলুন !

—সব শুয়োরের বাচ্চা, বাঘের বাচ্চা। এরা সব পারে। আমি মনে করি না একজন খতিবের মধ্যে একজন দেবপ্রতিম লুকিয়ে থাকতে পারে না। পারে। কিন্তু এটা অতি কল্পনাও হতে পারে । না-ও পারে।

—ধরুন, ডোঙার ওই লোকটাই যদি দেবপ্রতিম হয় !

—ওই মুখোস ? ফায়ার। গুলি কর ! দেখার দরকার নেই কে। আগে শেষ করে দাও !

—আমাকে বাঁচাও দারোগা, আমি অধীনের লোক। কদম।

যন্ত্রনৌকা আবার গর্জে উঠল। আকাশ থেকে গম্ভীর দু'টি একটি ফোঁটা পড়তে থাকল কৃষ্ণকায় বিলের জলে। তখন গ্রাম জেগে উঠল।

যন্ত্রনৌকা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল বিলের জলের দিকে চেয়ে, জলের উপর ভেসে পড়েছে কতকগুলি অগ্নিবিন্দু। মুর্শিদাবাদের ব্যারা-ভাসানের হুবহু একটা ছবি জলে নেমেছে।

দেবপ্রতিম পরম বিস্মিত হলেন। কদম বিহ্বল হয়ে পড়ল। চারিদিক থেকে অগ্নিবিন্দুগুলি জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে আসছে। এই দৃশ্যের মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে যাবে, আজ আর তার কোনওই দুঃখ রইল না, মধ্যবিত্তের কোন গ্লানিই আর রইল না। অধঃপতিত কদমের উত্থানের রাত এটি, মৃত্যুরও রাত। মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাওয়ার রাত।

এক আশ্চর্য রোমান্টিক মৃত্যু, সরোজদা দ্যাখো, এই জীবনটা এই রাতে তোমারই কবিতার মত সুন্দর। মনে পড়ে তোমাকে, তোমার মৃত্যুর দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। জেল থেকে বার করে আনা হল, পুলিস ভ্যানে করে কলকাতার পার্কে। তখনও সূর্যের আলো ফুটে ওঠেনি।

গাড়ির পাল্লা খুলে তোমাকে ছেড়ে দিলে পুলিস, বলল—যাও, চলে যাও, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হল !

তুমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলে না। এই পার্ক থেকে তুমি তাহলে বাড়ি ফিরে

যেতে পারবে। বাড়ি তো নয়, ভেবেছিলে সেই গোপন আস্তানায় ফিরে গিয়ে আবার তুমি কবিতা লিখবে, কড়া সম্পাদকীয় লিখবে একটা, তোমার কলম এই রিভলবারের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী ছিল—এই দৃশ্য দেখলে তুমি অবাক হতে! তোমার মাথায় নির্ঘাৎ কবিতা এসে যেত।

তুমি ভ্যান থেকে নেমে অনেকটা দ্বিধার সঙ্গে পার্কের ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে গেলে। পিছন থেকে গুলি করে দিল পুলিস। অতর্কিতে। তুমি মুখ থুবড়ে ঘাসের উপর পড়ে গেলে। একজন অভিনেতা তোমার এই মৃত্যুর দৃশ্য দেখেছিলেন, তিনি খুব সম্ভব মর্নিং ওয়াকে বার হয়েছিলেন সেই প্রত্যুষে।

যন্ত্রনৌকা বন্দুক তাক করে আমার দিকে ছুটে আসছে।

—কদম! তুমি কি তৈরি!

—হ্যাঁ, বাবু!

—তুমি এখন কার অধীন?

—আমি পাগল। ওই আলো, এই পানি, আকাশের ম্যাঘ, হাওয়া, দু'ফোঁটা বিষ্টি—ই'র মদ্যি অধীন কিসের হব খতিব সাহেব! তুমিও যা, আমিও তাই। স্বাধীন। লয় বাবু!

—কিন্তু বউটা তোমার বাঁধা থেকে গেল শশাঙ্কর কাছে!

—জি!

এই 'জি' শব্দে রুকসানার মুখটা মনে পড়ে গেল হরবোলার। আলোকবিন্দুগুলি এখন তারকা থেকে উল্কার মত হয়েছে। ওগুলি মশাল। যন্ত্রনৌকাটি আর এগিয়ে আসে না। পুলিস ভয় পেয়ে যায়। প্রচুর ডোঙা অগ্নিময় এবং সশস্ত্র। চরম উৎসাহে নাটা, ললিত, শশাঙ্ক যন্ত্রনৌকায় উঠেছিল, যন্ত্র চালিয়ে আনছিল যে, সে কিন্তু মাহেফরাস একজন। তার এক হাতে গুলি বিঁধেছে।

যন্ত্রনৌকা কদমতলার দিকে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল আলোকবিন্দুগুলি ঝপ ঝপ করে নিবে যাচ্ছে। সব কেমন অন্ধকার হয়ে গেল।

আকাশের মেঘ সরে যেতে লাগল উধাও দিগন্তের দিকে। চাঁদ বেরিয়ে পড়ল সুর্মারঙের, তার থেকে একটু দূরে একখণ্ড মেঘ এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিঃশব্দে দেবপ্রতিমের চোখদুটি অশ্রুপ্লাবিত হয়ে এল। গাল বেয়ে নামতে লাগল সেই জল। মুখোস খুলে ফেলল খতিব।

কাছে সরে এসেছিল কদম। খুবই অবাক হল সে।

—খতিব!

—বল।

—কী হল আপনের!

—আনন্দ হল, দুঃখও হল কদম আলি। তুমি বুঝবে না। বলে আকাশের দিকেই চেয়ে রইল হরবোলা।

একটু বাদে একটি ডিঙি এগিয়ে এল কাছে। কথা শোনা গেল।

—হরবোলা, তুমি প্রণামপুরে ফিরে যাও। কাল দেখা হবে। রাতে।

—কে! ঈষৎ চমকে উঠলেন দেবপ্রতিম।

—আমি রাহুল!

—তুমি!

—আর এখন কথা বলব না। কদমকে ছেড়ে দাও, ও আমার সঙ্গে যাক। আমরা

গোকুলদানা, দুবরাজপুর হয়ে যাব। এসো কদম, বৈঠা মারো। কদমতলায় বউদিরা আছে। ডিঙিটা বেশ চলে কিন্তু!

—তুমি খবর পেলে কীভাবে?

—এখন কিছুই বলব না।

—তোমার সঙ্গে কদমের গিয়ে কি ভাল হবে!

—দেখা যাক। ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। কোদালকাটি কদমতলার ওখানে তাবৎ তল্লাটের সাধারণ মানুষ জড়ো হয়েছে বাঁধের উপর। ঘাটে লঞ্চ নামতে দেখে বউদি ঘরে ঘরে গিয়ে বলেছে, মাহেফরাসদের ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিস নামছে জলে। ফলে...

—তোমার বউদি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে রাহুল! যে-কাজের গতকালই নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারত, তা উনি হতে দিলেন না। মণি সবই দেখেছে। আমি শুধু জানতে চাইছি, কতকাল এভাবে থাকব!

—এ প্রশ্ন আমাকে কেন হরবোলা!

—মানুষ যা চায় এবং পারে, মানুষকে সেই পর্যন্ত যেতে দিতে চায় না তোমার বউদি। নাটা, ললিত এবং শশাঙ্ককে আমরা একই সঙ্গে তেরোঘরায় পেয়েছিলাম। সমস্ত সংগঠন প্রস্তুত ছিল।

—শুনেছি।

—কী জোয়ার, তুমি ভাবতে পার না! এত দিনের সব পরিশ্রম জলে গেল। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যে ভীত ললিত লঞ্চ নামিয়েছে, শেষে মনে হল আমি একা, আমার সঙ্গে কেউ নেই, একখানা রিভলবার ছাড়া সত্যিই তো কিছুই ছিল না।

—তাই কি মাস্টারমশাই! কিছুই ছিল না? জলের উপর এতগুলি মশাল ভাসল কীভাবে! শুধু রুকসানার প্রবল আর্তনাদে এত মানুষ জেগে উঠেছিল, এত ডোঙা মুহূর্তে জলে নেমে গেল! এ সব কি বৃথা?

—আমার মৃত্যু হতে পারত!

—আমি আর কথা বলতে চাই না হরবোলা। কদমকে দাও।

—না। আমি ভরসা করি না। বিশ্বাস করি না ওকে। তুমি ওকে নিয়ে যেও না। তুমি ওকে কিসের জন্য চাইছ?

—এই অবস্থায় কী করে বলব!

—ঠিক আছে। কিন্তু... বেশ। যাও কদম।

ডিঙি ভেসে চলল গোকুলদানা গ্রামের দিকে। অনেকক্ষণ কদম আর রাহুল কোনও কথা বলছিল না। মণি হাতিনগর গিয়ে রাহুলকে খুঁজে বার করে তেরোঘরার সব ঘটনা বলেছে এবং কদমকে মেরে ফেলা হচ্ছে বলে জানিয়েছিল।

মুমতাজ আলি বলেছিল—কদমকে খতম করা ঠিক হবে না হয়তো। মণি যা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে, লোকটা ব্যবহৃত হচ্ছে। ও জানে শশাঙ্ক তার শত্রু। যত বোকাই হোক, খানিকটা বুদ্ধি অন্তত আছে যে, থানার তাঁবেদারি করে শেষ পর্যন্ত সে বাঁচবে না।

রাহুল বলেছিল—কিন্তু শুনলে তো তুমি, ওকে বেঁধে রেখেছে হরবোলা।

মুমতাজ বলল—তুমি আর দেরি না করে রওনা দাও।

রাহুল বলল—আমরা যদি এভাবে মেরে ফেলি, তাহলে পুরো যুদ্ধটাই গোলমাল হয়ে যায় তাজ। লক্ষ্মণের মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করেছে তিমির। কদম মরলে সমস্ত পাবলিক

সেন্টিমেন্টস আমাদের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। তাছাড়া...

ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন বললেন—ওখানকার পরিস্থিতি আমরা জানি না। আন্দাজে আমরা এত দূরে থেকে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। হরবোলা যা বোঝে, আমরা তা বুঝি না। ব্যাস! লক্ষণের মৃত্যু যদি আমাদের চোখে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে থাকে, কদমের মৃত্যুও তাই হবে।

—নাহ্! বলে উত্তেজিত রাহুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে—কদমের তো নয়ই, লক্ষণের ওই মৃত্যুতেও আমার কোনওই সমর্থন ছিল না। একথা আমাকে বলতে দিতে হবে।

বিশ্বরঞ্জন অত্যন্ত বিরস গলায় বললেন—তোমায় কেউ আটকাচ্ছে না।

—তার মানে ?

—তুমি গিয়ে কদমকে বাঁচাও, একটা কথা তুমি বারবার বলে আসছ, ওই চোর গড়াবাসা থেকে লঘুশাল ধানের বীজ এনে দিয়েছিল তোমার বাপকে। এই গল্পটা তুমি অনেক করেছ। এটা সাহিত্যের গল্পের মত। তাই দিয়ে একটা লুম্পেন পার পেতে পারে না।

রাহুল বলল—ওকে আমি চোর বলতে চাই না ডাক্তারদা। ওর নির্বুদ্ধিতা অদ্ভুত।

—এই ভাবাবেগ খুবই ক্ষতিকারক রাহুল!

—আমি ওকে মরতে দেব না। আমি বলছি, হরবোলা ভুল করছে।

—হরবোলা ভুল করতে পারে, দেবপ্রতিম ভুল করবেন না। তুমি যাও। তুমি মোহরের সঙ্গে দেখা করে জেনে নাও কবি কোথায়। কদমের ভালমন্দ দেবপ্রতিম বুঝবেন, তুমি খোদকারি করতে যেও না। আসল কাজ কর। কবিকে চাই আমাদের। হাসানপুর যাও, প্রণামপুর নয়।

রাহুল বলল—এই নির্দেশ মানব কিনা ভেবে দেখতে হবে, কারণ প্রণামপুরে যা ঘটেছে, খুব সহজ ঘটনা হয়নি। মুমতাজ সঙ্গে আসতে পারে, হরবোলার সঙ্গে সেই-ই কথা বলবে।

ডাক্তার বললেন—মুমতাজ তোমার সঙ্গে যাবে না। ওকে শহরের দিকে থাকতে হবে। ওকে প্রয়োজন হলে হরবোলা লিখত। কুরিয়ার কোনওই সংবাদ নিয়ে আসেনি।

—মণি এনেছে।

—হ্যাঁ, এনেছে। কিন্তু হরবোলা তাকে পাঠায়নি। ওকে পাঠিয়েছে বউদি।

মণি বলল—কেউ আমাকে পাঠায়নি ডাক্তারদা। আমি নিজেই এসেছি। কদম মার কাছে কেঁদেছে এসে। ওকে মারলে ফল ভাল হবে না দাদা! আমানির বাপকে মেরে ফেললে আমি আর ঘটনায় থাকব না। মণি পাল ডেকেছে আমাকে, আমার কাজ আছে।

ডাক্তার বললেন সুর নরম করে—তুমি এইভাবে রেগে যাচ্ছ ভাই!

মণি বলল—রাগটাগ না। আমার আসল হল পালা-নাটক। তাই বলছি। আমি মোসলেম চাচাকে বলেছি, কদম বাড়ি ফিরে আসবে। হাওয়া কাঁদছিল, বলেছি, ভেবো না।

—তুমি তো ওস্তাদ ছেলে মণি! একেবারে কথা দিয়ে ফেলেছ! যাক গে, রাহুল তুমি হরবোলার সঙ্গে দেখা করে কাজ ক'রো, দেবপ্রতিমের কাজ দেবপ্রতিমকেই করতে দিও। উনি তিন তিনবার জেল খেটেছেন, ওঁকে যেন 'সেন্স' দিতে যেও না। যাও!

সামান্য তপ্ত গলায় 'যাও' বলে বিশ্বরঞ্জন রাহুলের চোখে অদ্ভুত করে চাইলেন। রাহুল আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে হল, নেতা সর্বত্র এক, অহংকার ছাড়া নেতা হওয়া যায় না।

অধোমুখে বাইরে বেরিয়ে আসে রাহুল মণিকে সঙ্গে নিয়ে, ওর শরীর কাঁপছিল।

বোলতলায় এসে দাঁড়াল ওরা। হঠাৎ মুমতাজ রাহুলের একটা হাত ঘনিষ্ঠ করে চেপে ধরে বলল—তুমি বোধহয় ডাক্তারদাকে ভুল বুঝলে! প্রফেসর সম্বন্ধে একটা বাড়তি ইমোশন ডাক্তারদার আছে।

—তিনবার জেলে খেটেছেন ?

—না। শুধু সেকথা নয় রাহুল!

—কদমও অনেকবার জেলে গেছে!

—ইস! তুমি খুবই উত্তেজিত। এই অবস্থায় তুমি বুঝতে চাইবে না।

—আমার অনেক প্রশ্ন আছে খতিব সম্পর্কে!

—জানি।

—রুকসানা এবং খতিবের সম্বন্ধ!

—জানি, জানি!

—তুমি ঠিক জানো না তাজ! কবি জানত! আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।

—এ নিয়ে কথা হবে তোমার সঙ্গে!

—ও আর প্রয়োজন হবে না মুমতাজ আলি। আমি যা বোঝার বুঝেছি! এই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে বিপ্লব করা যায় না। প্রশ্ন অনেক।

—তুমি যা দেখেছ, তা মেনে নিতে বলছি না, বুঝে নিতে বলছি রাহুল!

—ও! তাই ?

—প্রশ্ন আমিই করব তোমাকে। উত্তর চাইব। আগে দেবপ্রতিমের সমস্যার কথা তোমাকে শুনতে হবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায়।

—ওঁর সুন্দরী বউ আছে বাড়িতে।

—থাক রাহুল! আজ থাক। যথেষ্ট হয়েছে। এবার তুমি যাও। পরে হবে। তুমি কিন্তু মোহরকে দেখা করতে ভুলো না। মনে আছে, মেহেদিপাতা!

বলেই মুমতাজ হো হো করে হাসতে থাকল। সেই হাসি আকাশপথে এই বিলের জলে এসে ডিঙির গায়ে মৃদু তরঙ্গ হয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। ছলছল করছে চাপা স্বরে, চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে সেই জলকণিকার হাসি। ডিঙি চলেছে।

॥৩৩॥

কদম আলিকে গোকুলদানা গ্রামে রেখে ওই রাতেই সাহস করে বাড়িতে এসে রাহুল বাইরের দুয়ারে কড়া নেড়ে উঠল। ঠান্ডা স্বরে ডেকে উঠল— মা!

চন্দ্রিমা চাবি হাতে করে তালা খুলতে এগিয়ে যায়। বাড়ির সবাই জেগে রয়েছে। বুলবনের ঘরে একা চন্দ্রিমা শুয়েছিল, তারও ঘুম নেই, ঘুমের প্রশ্নই ওঠে না। বুলবন দোতলায় রাহুলের ঘরে খাটের উপর বসে রয়েছে চুপচাপ, মা রয়েছেন খাটের একদিকে পা ঝুলিয়ে বসে, তাঁর বুকে নূপুর শুয়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত

শিশুকে বুক থেকে নামিয়ে খাটে শুইয়ে দিতেও ভুলে গেছেন তিনি। কড়া নাড়ার শব্দে তিনি চমকে উঠলেন।

বুলবন সামান্য ইতস্তত করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে। আয়েষা নূপুরকে বুক থেকে খাটে নামিয়ে ফেলেন। বালিশ টেনে নূপুরের মাথার তলে দেন এবং একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক ঠেলে ওঠে। সবাই ফিরে এসেছে কোদালকাটির জলগেটের বাঁধের ওখান থেকে, মণি ফিরে আসেনি। হুকুম মাঠ পাহারায় গেছে একা। একাই যেতে নির্দেশ করেছেন আয়েষা, কেননা এই রকম গোলমালের সময়ই স্যালোকলের পার্টস চুরি হয়েছিল সে'বারে। সেইবারেও খুব উত্তেজনা ছিল কদমতলায়। অবশ্য আজ রাতের ঘটনা অধিক ভয়ংকর, পুলিস সম্পর্কে একটা অভূতপূর্ব বিভীষিকা মোহড়াগাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ ভাবতেই পারেনি, এভাবে বিলের জলে যন্ত্রনৌকা নামবে।

লঞ্চটি প্রণামপুর যেতে চেয়েছিল, পারেনি। যন্ত্রনৌকার চালক আহত হয়েছে, লোকটা মাহেফরাস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৌকার গতি ও গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করছিল। এই মানুষটা এককালে সদরঘাটের ব্রিজ হওয়ার আগে নদীতে লঞ্চ চালাত, ভটভটি নৌকা। এ ঘটনা নিশ্চিত সত্য যে, এই চালকটি প্রণামপুরে ফিরলে লোকে তাকে মেরে ফেলে দেবে।

আবারও একটি মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে আসেন আয়েষা। এসে দেখেন বুলবন নিঃশব্দে রাহুলকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বার করে দিতে চাইছে ওর ঘরের দুয়ারের চৌকাঠের কাছে। হাতে হারিকেন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বউ চন্দ্রিমা।

—বউদি! তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না! বুলবনকে থামাও, ও কেন এমন করে ঠেলে ফেলছে! বুলবন, তোমার কি মাথা খারাপ হল! মা, মা! তোমার বড় ছেলেকে ধরো, ও কি পাগল হয়ে গেছে!

রাহুল খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে কথাগুলি বলে চলে। এবং তার বিস্ময়বোধ চরম হয় ক্রমশ, বউদি অথবা মা কেউই বুলবনকে মুখের কথা দিয়েও বাধা দিচ্ছেন না, পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—গোয়ার্তুমি ক'রো না বুলবন। এটা আমারও বাড়ি! ধাক্কা খেতে খেতে রাহুল একথা বলে অল্প দৃঢ় হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তার গায়ে কিছুতেই জোর আসতে চাইছিল না। আসলে মনের জোর না থাকলে গায়ের জোর পাবে কোথায় মানুষ, সেকথা চন্দ্রিমার একবার মনে হয়। কিন্তু চন্দ্রিমা স্থির করেছিল সে রাহুলের সঙ্গে কথা বলবে না। সে যে বুলবনের উপর অভিমান করে রাহুলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না, চন্দ্রিমার মন সেকথা জানে, বিশ্বের অন্য কোনও প্রাণী সেকথা বুঝবে না। এখনও তার চুলের গোড়ায় ব্যথা আছে, স্বামীর মুখেই সে শুনেছে, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে সে রাহুলের নাম ধরে ডেকেছে, একথা চুল খামচে ধরে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বলেছে বুলবন। বুলবনের হিসহিস করা ঘৃণ্য তীব্র স্বর এখনও কানে বাজছে।

বুলবন বলল— এটা তোমার বাড়ি কিনা, সাদাবাবু ফিরে এলে সেই বোঝাপড়া ক'রো! আজ যাও।

— কিন্তু বউদির সঙ্গে আমার কথা আছে!

— তোমার আছে। কিন্তু বউদির নেই। চলে যাও।

— বউদির নেই, তুমি কী করে জানলে! ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি, একবার খালি নূপুরকে দেখব।

— তুমি এক্ষুনি অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পার রাহুল। পুলিস এখনও গাঁ থেকে যায়নি। আমি তোমাকে বন্ধুর মত বলছি, তুমি চলে যাও।... যাও! বলে আবার ধাক্কা দেয় বুলবন।

রাহুল এবার দেহ শক্ত করে দাঁড়িয়ে বলল— বন্ধু কখনও এভাবে ধাক্কা দিতে পারে না বুবন! আমার গায়ের জোর তোমার চেয়ে কম নেই। বউদি! তুমি কথা বলবে না?

একটু কড়াস্বরে বউদিকে সম্বোধন করল রাহুল।

বুলবন সঙ্গে সঙ্গে বলল— ওর সে সাহসই আর নেই।

— সাহস! আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস! অবাক হয় রাহুল।

— হ্যাঁ, বলে ওঠে বুলবন।

চন্দ্রিমার আপাদমস্তক একটা অদৃশ্য হিম স্রোত বয়ে যায়, বিস্ময়ের বেদনার চূড়ায় সে দেখে একটি বিষণ্ণ তারকা, যা তার পার্টির পতাকায় চিহ্নিত, এখন তা আকাশে নিঃসঙ্গ দূরত্বে চলে যাচ্ছে।

— তাহলে এই শেষ কথা, কেউ তোমরা কথা বলবে না আমার সঙ্গে? বউদি, সত্যিই তুমি বলবে না!

বউদি এবার হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় নীচু করা অবস্থায় মাথা নাড়ে। ধীরে, একটু একটু। না, সে বলবে না। কিছুতেই বলবে না। সাহস, বুলবন সাহসের কথা তুলেছে। এই সাহস কথাটি তার রাজনৈতিক চরিত্রের নিন্দা যে নয়, রাহুল বুঝতে পারে কিনা চন্দ্রিমা জানে না। এ কি তার নারী-চরিত্রের অপবাদ নাকি জীবন-অস্তিত্বের ভীরুতার প্রশ্ন! ভাবতেও ভয় করে এখন, বুলবন তাকে অসতী ঠাউরেছে বা রাহুলকে স্বপ্নে দেখা অবৈধ সাব্যস্ত করেছে।

চন্দ্রিমা মনে মনে বলল, আমি কি এতই সাধারণ বুলবন যে, আমি কেন রাহুলকে স্বপ্নে দেখি বুঝতে পারলে না! শরৎ-সাহিত্যের ছাত্র হয়েও তোমার হৃদয়ের এই শুষ্কতা ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমা করবও না কখনও। আমার অভিমান কঠিন, তা শুধু ঠোঁট ফোলায় না, আমার আত্মমর্যাদা সেই অভিমানের বর্মে ঢেকেছি আমি।

তুমি কি জানো না, আমার পার্টির সর্বোচ্চ নেতা কমরেড জি. এস. স্বপ্ন দেখলেই শিশুদের দেখতে পেতেন! শিশুদের সঙ্গে তিনি স্বপ্নে খেলা করতে ভালবাসতেন। তাঁর স্বপ্নের ধ্বনিরা ছিল শিশু-কাকলিতে পূর্ণ। সূর্যোদয়ের পথে তিনি শিশুদের দেখতে পেতেন। রাজনৈতিক মানুষ, একজন বিপ্লবী কখনও খারাপ স্বপ্ন দেখে না, স্বপ্নের মধ্যে তাঁর কোনও কুঅভ্যাস থাকে না। রাহুলকে স্বপ্নে দেখে আমি কোনও অন্যায় করিনি। তুমি বুঝবে না, তোমাকে বোঝাতেও চাই না আর।

— বউদি! তুমি এত ভীরু! চোখ তুলেও দেখবে না আমাকে একবার! কাতর গলায় বলে উঠল রাহুল।

হ্যারিকেনের আলো অতি অল্পই চন্দ্রিমার মুখে এসে লাগছিল। ছায়ামাখা সেই আলোয় চন্দ্রিমা চোখ তুলল রাহুলের দিকে। তার চোখমুখে অদ্ভুত বিষণ্ণতা লক্ষ করল রাহুল, কিন্তু আলো স্বচ্ছ ছিল না বলে প্রকৃত অবস্থা টের পেল না।

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাহুল বলল— ঠিক আছে। বলে খানিকটা দূরে মায়ের দিকে চাইল সে। তারপর আবার বউদির দিকে চেয়ে দেখল। বুলবন এতক্ষণে চুপ করে গেছে সহসাই, রাহুলকে ছেড়ে দিয়েছে।

— বউদি! একটা কথা শুধু বলে দাও, কবি কোথায়!

— তোমার দলের খবর ও কী করে বলবে রাহুল ! বলে উঠল বুলবন।

— ও ! ঠিক আছে। চলি তাহলে। মা ! তুমিও কোনও কথা বললে না ! বলেই ক্ষিপ্রভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাহুল চারাগাছতলার মাচার দিকে চাইল। তারপর দ্রুত সেদিকে ছুটে গেল।

এতক্ষণে আয়েষা আর সংবরণ করে থাকতে না পেরে বললেন— বউমা, তুমি এত কঠিন !

চন্দ্রিমা বলল— হ্যাঁ, মা। আপনারই মত।

বুলবন বলল— তোমাকে মা, কতবার বলেছি, রাহুল এলে চলে যেতে বলবে। ওর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শেষ হয়েছে মা ! ও এখানে থাকলে অ্যারেস্ট হতই। তুমি কথা না বলে ভাল করেছ। ও বুঝে গেল যে, এ বাড়িতে ওর আর কোনও স্থান নেই। আমরা সাহস হারিয়ে ফেলেছি। কদমতলায় দাঁড়িয়ে থানার ও.সি. নানার রকম জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন ওর সম্পর্কে। ওখান থেকে ফিরে এসে প্রথমেই সেকথা বলেছি তোমাকে।

আয়েষা এবার অল্প সুরে কেঁদে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলেন। বললেন— আমরা তাহলে ঠিক করেছি বলছ বড়খোকা ?

— হ্যাঁ, নিশ্চয়।

— কিন্তু তুমি বাবা ঠিক করলে না। বউমাকে তো নয়ই, আমাকেও কথা বলতে না দিয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে !

— ওর ভালর জন্যই করেছি। শোন তবে বলি, থানার ছোটবাবু চুপ করে আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আজ আমরা মোহড়ায় থাকব, রাহুল এলে বাড়িতে শেলটার না দেওয়াই ভাল। আপনার ভাই, তাই বলে দিলাম। অম্বরীশলাল যাকে খুশি অ্যারেস্ট করতে পারেন। একটা ইনফরমেশন দিই মিস্টার চৌধুরী, কদম একজন ইনফরমার, ও যদি আপনার ভাইয়ের নাম করে দেয়, তাহলে অ্যারেস্ট ইজ মাস্ট। যান, চুপ করে বাড়ি চলে যান। বাবুদের সঙ্গে বেশি কথা বলবেন না।

কথা শেষ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বুলবন, তারপর উপরে উঠে চলে গেল। আয়েষাও কিছুক্ষণ বাদে উপরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এসে থেমে পড়েন। চন্দ্রিমাকে উদ্দেশ করে বলেন— ভাল করে হুড়কো এঁটে তালা দেবে বউমা।

— আপনি ভয় পাচ্ছেন মা !

— রাহুল আবার আসবে না তো বউ ! মণি ফিরল না যে ! তুমি উপরে যাবে ?

— না। আবার তালা খুলতে হতে পারে !

— কেন ?

— ঠিক বলতে পারি না। বলে চন্দ্রিমা চুপ করে যায় মৌখিকভাবে, কিন্তু অন্তরে তার কথা চলতে থাকে। এভাবে দরজা খোলা রাখাই তো ভাল, যখন মন বলবে, আমি চলে যেতে পারব। এই রাতেই কি চলে যাওয়া যায় না ! আর কি, সবই তো শেষ হয়ে গেছে ! নিজেকে শোনালো সে।

বুকটা কিসের চাপে ভেঙে পড়তে চাইল চন্দ্রিমার। অসম্ভব অব্যক্ত কষ্টে তোলপাড় করতে থাকল। এত তীব্র কষ্ট কখনও হয়নি। মনে হচ্ছিল চারিদিক থেকে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। যাকে স্বপ্নে দেখে ডেকেছিলাম, সে যখন সামনে এল, দুয়ার খুলে দাঁড়ালাম, কিন্তু ভিতরে টেনে নিতে পারলাম না— যদি কখনও বিপ্লব এভাবে এসে কড়া নাড়ে ! আমি জানি, সেই শব্দের রূপটা ঠিক এরকম অতর্কিতেই হানা দেবে শিকলে,

কড়ায়, করাঘাতে— ঠিক যেভাবে রাহুল ডেকে উঠল, মা ! বউদি ! দরজা খোলো !

মনে হচ্ছে, রাহুল এখনও বাড়িরই আশেপাশে কোথাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন যেন চন্দ্রিমার মন তাই বলছে। দরজা ঠেলে বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল চন্দ্রিমা। চৌকাঠের কাছে হ্যারিকেন রেখে দাঁড়িয়ে রইল বাইরের অন্ধকারে চেয়ে। তারপর হ্যারিকেনের দম কমিয়ে একটি নীল বিন্দুতে পরিণত করল শিখাটিকে, দরজা খোলা রইল।

চারাতলায় দ্রুত ছুটে এসে ডাকল— রাহুল ! শোন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কমরেড সিনহা বলেছেন ... বিশ্বাস কর আমার অনেক সাহস রাহুল পারভেজ, অনেক।

বলে বুলবনের সঙ্গে সে একটি সাহসিক সবল বিচ্ছেদের কল্পনা করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল, গলায় দলা পাকিয়ে তুলল অব্যক্ত কান্না।

সেই ধরা গলায় আবার ডাকল। অন্ধকারে সেই স্বর রাহুলকে পাগলের মত খুঁজতে থাকল। রাত্রি নির্জন ছিল, নিশুত ছিল, ডাকটি সকাতরে অন্ধের ব্যাকুলতা ছড়াচ্ছিল পথের উপর। দোতলা থেকে সেই আহ্বান কানে লাগে বুলবনের। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার সমস্ত বুদ্ধি।

— দেখলে মা, তোমার বউমা কতখানি অবুঝ ! ওভাবে ডেকে বেড়াচ্ছে পথের উপর, শত্রুপক্ষ সজাগ, ও কি বোঝে না ! ওই মেয়ে কবিকে চিঠি লিখেছিল থানায়, ভাবতে পার ?

— ওকে ডাকতে দে খোকা !

— কবি যে সাঁতার জানে না, সেকথা কবিকে লিখে পাঠানো কি পাগলামি নয় মা ! ওর পাগলামির জন্যে, ওরই জন্য রাহুল ধরা পড়ে যাবে। ছিঃ !

— আর যাই কর, ছিঃ ক'রো না বড়খোকা !

— ছিঃ তো করেইছি মা।

— ছিঃ করেছ ?

— হ্যাঁ, করেছি। অনেক ঘৃণা বুকে জমা করেছি।

— তুমি বউমাকে ঘৃণা কর !

— করি।

— তার অপরাধ ?

— ও পাপী, ও আমাকে ঠকিয়েছে।

— পাপ কথাটা তোমাকে মানায় না বুবন। আমি প্রাণকিশোরবাবুকে চিঠি লিখে জানাব। ওইভাবে রাস্তায় বেচারি রাহুলকে ডেকে বেড়াচ্ছে এ তোমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না।

— মা !

— তুই রাহুলকে হিংসে করিস ! এত ছোট তুই ! পাপ করেছ তুমি, চন্দ্রিমা নয়। যাও, বউকে ধরে আনো।

— না। বলে এমন একটা তীব্র ভঙ্গি করল বুলবন যে, আয়েষা অবাক হয়ে গেলেন।

অসভ্যের মত 'না' করে আর্তনাদ করেই বুলবন বুঝতে পারল সে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। সে কেন ছিঃ করতে গেল, এই ছিৎকার অত্যন্ত মিথ্যা। এবং সে ভাবল, সে নিশ্চয়ই তবে রাহুলকে হিংসা করে, নইলে মা কখনও বলতেন না ওকথা। রাহুলকে হিংসা করাই মায়ের চোখে পাপ। এত ক্ষুদ্র হৃদয় নিয়ে সে কেন তবে পার্টিতে রয়েছে !

কিন্তু রাহুল যে সত্যিই ধরা পড়ে যেতে পারে, একথা এরা কেন বিশ্বাস করছে না !

দ্রুত নীচে নেমে চলে আসে বুলবন।

— দাঁড়াও, আমিই যাচ্ছি ! বললেন আয়েষা।

বুলবন শুনল না। এসে দেখে চারাতলায় মাচার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে বউ। মাচার উপর বসে রয়েছে মণি। ওরা কেউ কোনও কথা বলছে না।

— আমার কথা বিশ্বাস হল না তোমার ! বলে উঠল বুলবন। চন্দ্রিমা সেকথার উত্তর না দিয়ে মণির হাত ধরে টেনে বলল— এসো !

মণিকে সঙ্গে করে সামনে সামনে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল চন্দ্রিমা, পিছনে বুলবন।

— আমার কথা বিশ্বাস হল না ! আবার বলে উঠল বুলবন।

সেকথারও কোনও জবাব না দিয়ে মণিকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল চন্দ্রিমা। আলোর শিখা যথেষ্ট উসকে তুলে মণির চোখে স্থিরভাবে চেয়ে রইল সে।

— বল !

— ও কী বলবে !

— বুবন তুমি চুপ কর !

— আমার কথা...

— তোমার কথা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই না ? শুনব পরে।

— মানে, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ ! মিহির ভট্ট আমাকে যা বলেছেন, ওই ছোটবাবু...

— তুমি চুপ না করলে আমি তো কথা বলতে পারি না বুবন ! তুমি কোথায় ছিলে মণি ?

— পুলিস দেখছিলাম। ওরা কদমতলার চৌকি তুলে দিচ্ছে। খালি দু'জন কনস্টেবল থাকবে, বাকি সব চলে যাবে।

আয়েষা বললেন—রাহুলের সঙ্গে তোর দেখা হল মণি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় গেল রাহুল ?

মণি চুপ করে থাকে।

—বল ! চাপ দেয় চন্দ্রিমা।

মণি বলল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ—যুদ্ধ আরও হবে, এ কথা বলল রাহুলদাদা। আমি বললাম, পুলিস আছে গাঁয়ে। চৌকির ওদিকে যেও না।

—তারপর ? শুধালো চন্দ্রিমা।

—আমাকে এই লজেন্সগুলো হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, তুই আর নূপুর খাস !

—তুমি বলে দিলে কবি কোথায় আছে ?

—না। তুমি তো বলনি বউদি !

—তুমি তাহলে বলে দিয়েছ ? চুপ করে না থেকে সত্যি কথা বলবে।

—আমি জানি না।

—কী জানো না ?

—পাঠাগারে তোমরা বলাবলি করছিলে, তোমরা জানো। আমি কী করে জানব !

—চোরের মত শুনেছ। শোননি ?

—কানে এলে আমি কী করব ? কিন্তু...

—বল !

—তুমি মানা করেছ, সে কথা বানিয়ে বললাম রাহুলদাদাকে। মোহর আপার কাছে যাও। আমি কী করব! বলতে বলতে অভিমানে গলা ধরে আসে মণির।

—যাও, শুয়ে পড়! বলে চন্দ্রিমা মণির হাত ছেড়ে দেয়। এবং স্বামীর সঙ্গে কোনও কথা না বলে নীচে নেমে চলে আসে। শুয়ে পড়ে। শেষ রাতে ঘুম আসে চন্দ্রিমার।

চন্দ্রিমা ইদানীং একা নীচের ঘরে শুয়ে থাকে বলে সিঁড়ির কাছের দোর ঠেলে দেয়, খিল তোলে না। সকালে আয়েষা নীচে নামেন। দুয়ার সামান্য ঠেলতেই নিঃশব্দে খুলে যায়। ভোরের আলোয় আশ্চর্য দৃশ্য দেখেন তিনি। বউমা শুয়ে রয়েছে কাৎ হয়ে পা কিছুটা গুটিয়ে রেখে, ওর পায়ের তলায় কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছে বুলবন। যেন বড়খোকা এক ভীরু ক্ষমাপ্রার্থী। দোর টেনে বন্ধ করে বাইরে এসে আয়েষা দেখেন তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন। চৌকিতে বুলবন নয়, যেন সাদাবাবুই কুঁকড়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে তুচ্ছ আঘাত করে কষ্ট পেলেও বাবু ওই বুলবনের মতন করতেন। ভোরের নামাজে বসে ঈশ্বরের কাছে উনি প্রার্থনা করেন, খোদা! তুমি এদের বিচ্ছিন্ন করো না। তাঁর ঘুম ছেড়ে উঠতে দেরি হওয়ায় ফজরের নামাজ দেরিতে কায়েম করেন তিনি, তখন উঠোনে সূর্যালোক ছড়িয়ে গেছে সোনার রঙে।

চন্দ্রিমা ঘুম থেকে জেগে স্বামীকে ওই অবস্থায় কুঁকড়ে থাকতে দেখে হাত দিয়ে ঠেলে জাগাতে যায় ভুল বশে, হঠাৎ মনে পড়ে চুলের গোঁড়ায় এখনও ব্যথা। ব্যথা হয়ত নয়, কিন্তু সেই আঘাতের স্মৃতিই তখন বাস্তব লাগে।—আমার স্বপ্নকেও যে প্রহরীর মত আগলায়, তাকে জাগিয়ে তোলা বৃথা। ওকে আমি স্পর্শ করতে চাই না। ভাবতে ভাবতে এই ভোরেই চন্দ্রিমার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। স্বামীকে ডাকে না, ছোঁয় না সে। বিছানা ছেড়ে ছাদের উপর উঠে চলে আসে।

ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে বুলবনের প্রথম যে কথাটি মনে ভেসে উঠল, সেটি মায়ের বলা, রাতের কণ্ঠস্বর—ওকে ডাকতে দে খোকা! আর যাই করো, ছিঃ করো না বড়খোকা।

ক্রমাগত এই কণ্ঠস্বর ঢেউয়ের ঝাপটায় মনের মধ্যে তটরেখার জলক্রীড়ার মত ছুঁয়ে যেতে থাকে। 'এত ছোট তুই!' মনের মধ্যে গুমরে উঠলেন মা। মা নয়, বুলবন নিজে।

—আচ্ছা! রাহুল কি ধরা পড়ে গেছে! ভেবেই বুলবন অসম্ভব ছটফট করে উঠল মনে মনে।

—কেন ওকে এ ভাবে ঠেলে বার করে দিলাম!

বারবার এ কথা মনের নিভৃতে উদ্গত হতে থাকে।

—আমাকে কেন একই সঙ্গে সংসারী এবং বিপ্লবী হওয়ার চেষ্টা করে যেতে হয়! একই সঙ্গে পাপ এবং পুণ্যের দ্বিধা বহন করতে হয়! আমি বুঝি রাহুলকে ভালবাসি না!

চোখদুটি ছলছল করে উঠল বুলবনের। দোতলায় এসে নিজে হাতে চা করল বুলবন। তারপর এক কাপ চা ছাদের উপর প্লেটে চড়িয়ে টলমল করতে করতে নিয়ে গেল চন্দ্রিমার জন্য। চন্দ্রিমা গম্ভীরভাবে কাপ আর প্লেট হাতে ধরে নেয়। চুমুক দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলে—কবি বাঁচবে না।

কবি নিজেও ভেবেছিল সে আর বাঁচবে না। যত সে সুস্থ হয়ে উঠছিল ততই জীবন সম্পর্কে মায়া বাড়ছিল। যত মায়া বেড়ে যায় কষ্টও বেড়ে যায়। নাতাশার সেবাপরায়ণ

সুশ্রী মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবে, এই মেয়েটিই বা তার জন্য এত করল কেন ! নাতাশার চোখেমুখেই রয়েছে শীতল সেবাধর্মের মায়াময় আগ্রহ। কতভাবে তার রাজনীতি চিৎপুরের চৌধুরী পরিবারটিকে বারবার আঁকড়ে ধরেছে এবং আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেও ফেলেছে। ওরা জানতেও পারে না কিভাবে তারা জড়িয়ে পড়ে। কবি কি জানত, সে এভাবে নাতাশার কাছে পৌঁছবে !

নাতাশা বলল—আপনি ভাবছেন মামা আপনাকে চিনতে পারেননি, আসলে সবই বুঝেছেন উনি। রাহুলের বন্ধু বলাতেই ওঁর সন্দেহ হয়েছে। মোহরের মারফত বউদির পার্টির কাছে আপনার রিপোর্ট চলে গেছে। মামাও নিশ্চয় বলেছেন পার্টিকে। আদিত্যদা জানিয়েছেন, যা করে হোক উনি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। আর একটু সুস্থ হলেই আপনি চলে যেতে পারবেন !

—মোহর রাহুলকে যদি বলে দেয়, আমি এখানে আছি। রাহুল যদি হঠাৎ এখানে আসে ? তোমার কাছে যদি জানতে চায় কোথায় আমি ? আমি জানি না, আমার সঙ্গীরা কী ব্যবহার করবে ! যতটুকু জানি, ওরা আমাকে বিশ্বাস না করতেও পারে। তবু আমি ডাক্তারদা নয়, মুমতাজও নয়, কেবল রাহুলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওর কাছে বুঝতে পারব আমার ভবিষ্যৎ কী !

বলে বিছানায় শায়িত কবি শান্ত হয়ে চোখ বুজল। নাতাশার খুবই মায়া হচ্ছিল কবির কথা শুনতে শুনতে ; বিপ্লবপ্রয়াসী মানুষের যুদ্ধ কি এতই জটিল ! থানা পেলে আবার তাকে অ্যারেস্ট করবে, সঙ্গীরা ওকে বিশ্বাস না করতেও পারে। কতবারই তো কবি একথা বলেছে। তার আর যেন কিছুই বলবার ছিল না।

নাতাশা মামাকে বলে কবিকে সমির চৌধুরীর চৌদ্দ বিঘার বাগানে এনে ফেলে গরুর গাড়ি করে এক ভোররাত্রিতে। ওকে লুকিয়ে ফেলে। এই সংবাদ মোহরের কাছেও ছিল না। চৌদ্দ বিঘায় মামার একটি কোঠাবাড়ি আছে।

এই রকমই অবস্থায় রাহুল এসে মোহরের কাছে উপস্থিত হয়। তখন সবে ভোর হয়েছে। সারারাত দীর্ঘপথ হেঁটে পাড়ি দিয়েছে রাহুল। এত লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার ঘটনা তার জীবনে বিশেষ ঘটেনি। বাড়িতে সে স্থান পেল না। বউদি, মা কথা বলতে চাইল না। মণির কাছে আসল সংবাদ কিছুই পাওয়া গেল না। মণি কেবল ওইটুকুই বলেছে যে, মোহরআপা এবং বউদি শরৎপাঠাগারে বসে কবির কথা বলাবলি করছিল, তাছাড়া বউদি ইকবালের সামনে কবুল করেছে কবি বেঁচে আছে। রাহুলের অসম্ভব ক্রোধ হচ্ছিল, এরা কেন কবিকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। তাহলে কি কবি থানায় এমন গোপন তথ্য ফাঁস করে ফেলেছে, যাতে করে সে আর দেখা করতে চাইছে না তাদের সঙ্গে ! কদমের কাছেও খবর নেই। চুনাখালির পার্কে কবিকে নামিয়ে দেওয়ার পর, পরবর্তী ঘটনা কদমের অজ্ঞাত। এখন কী করে কবিকে পাওয়া যায় রাহুল ভেবে পাচ্ছিল না।

মণি তাহলে মোহরের সঙ্গে দেখা করতে বলল কেন ? হরবোলার সুসংগঠিত সশস্ত্রশক্তির তৎপরতা বিলের জলে যে অপূর্ব দৃশ্য রচনা করেছিল, তা ভোলবার নয়, রাহুলের একটি ডাকে সবই তৈরি হয়ে গেল। রুকসানার আর্তনাদ সকলকে জড়ো করে ফেলল। কদমতলায় লঞ্চ নেমেছে, এ খবর মণি রাহুলকে দেয় চারাতলায় পৌঁছনো মাত্র। দৌড়ে গিয়ে জলগেটের পরিস্থিতি দেখে আসে। রাহুল তখন জলগেটের ওখানে না গিয়ে অন্য পথে জলে নামে, ওখানে সৌভাগ্যবশত মাহেফরাসদেরই ওই ডিঙিটা পেয়ে যায়, ওই ঘাটটা জলগেট ছেড়ে অনেক তফাতে অব্যবহৃত ঘাট, নগড়াজলির ঘাট, মানুষেরা

গরুমোষের নাড়াঘষা করে, ওদিকে সাপের উপদ্রব বলে লোক নামে না রাতে।

রাহুল জানত, ওই ঘাটে অনেক সময় ডিঙি বাঁধা থাকে, লোক থাকে না। এই গোপন খবর ইকবাল তাকে বলে রেখেছিল। এভাবে সে প্রণামপুর পৌঁছে যায়। সশস্ত্র ডোঙা আর ডিঙি বিলের জলে এক বহ্নি-উৎসব রচনা করে, মশালের আলোয় জাগ্রত গ্রাম বুঝিয়ে দেয় একটি সামান্য সশস্ত্র যন্ত্রনৌকা তাদের কাছে কী তুচ্ছ।

এই ঘটনার গভীর প্রভাব পড়েছে মোহড়াগাঁয়ে, অন্যত্র আশেপাশের দিগরে। সবই হরবোলার বুদ্ধি এবং সংগঠনশক্তির পরিচয়। নাটা, ললিত এবং শশাঙ্কর মৃত্যু ঘটাতে পারলে, যা মোটেও অসম্ভব ছিল না, সেই খতমের ঘটনা হত সংগঠনশক্তির এক উচ্চ সাফল্য, তারপর দীর্ঘকাল এ অঞ্চলে জোতদারের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যেত। চৌধুরী পরিবার হত সংগ্রামের প্রতীক। এভাবে একটি একটি বিন্দু ভেঙে অজস্র বিন্দু গড়া যেত। হল না।

মনে পড়ে কবিই তাকে এই রাজনীতির গভীর সংস্পর্শে এনেছে, ডোঙায় ভাসতে ভাসতে মার্কস এবং জেনি মার্কসের কাহিনী বলেছে, তার আগ্রহকে উসকে দিয়েছে বারংবার। কবি বলেছে তার রাজনীতি ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আত্মত্যাগের রাজনীতি। হরবোলার নেতৃত্বে সে জলগেটের কপাট বন্ধ করতে চেষ্টা করে, রাহুলই তখন সেই স্কোয়াডটি গঠনের প্রস্তাবে নামের তালিকা হাজির করেছিল। কিন্তু তারপর কবির কী হল বোঝা যায় না, সে অ্যারেস্ট হয়ে যায়। সেই সময় রাহুল ডাক্তারদার কথায় প্রণামপুর ছেড়ে আসে। কিছুদিন কপাট রুদ্ধ করার কাজ কবিরই কারণে স্থগিত থেকে যায়।

কবির রাজনীতি যখন ঘনিয়ে উঠেছিল তখনই সে থানার লকআপে চলে গেল। কবি বোধ হয়, মাহেফরাসদের উপর্যুপরি মৃত্যুর ঘটনা সহ্য করতে পারেনি।

ডাক্তারদা চাইছেন কবির সঙ্গে কথা বলতে। কবির অবস্থান জানতে না পারলে এবং থানায় কী বলেছে কবি না শুনে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কদম বলেছে, এক কলেজ মাস্টার যে প্রণামপুরে রয়েছেন একথা স্বীকার করেছে কবি। থানার দারোগা কদমকে পাঠিয়েছিল দেবপ্রতিমকে শনাক্ত করে আসার কাজে। কদম তার ধূর্ত চোখ দিয়ে হরবোলাকে সন্দেহ করেছে, যদি সে থানায় গিয়ে হরবোলার নাম ঘোষণা করে দেয়, দেবপ্রতিম তাহলে টিকতে পারবেন না। থানা এবং উচ্চ প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য দেবপ্রতিম।

—হরবোলা যে নেতা, উনিই কলেজ মাস্টার কী করে বুঝলে কদম?

—মুনে মুনে গাওনা হয়ে গেল রাহুলদাদা! তাছাড়া খতিব য্যাখন গুলি ছুঁড়ল ডুঙা থেকি, তখন বুজলাম উনি একডা বাবুলোক। তেনার জুবানে ত্যাখন খতিবী বচন থাকল না, ভদ্দরনোকের জুবান খোলাসা হল দাদা!

—এই যে চিনে ফেলেছ তুমি, এই জ্ঞান তোমার মৃত্যুর কারণ হবে কদম! তোমাকে মরতে হবে।

—আমাকে বাঁচাও দাদা!

—কী করে বাঁচাব কদম আলি! থানা তোমার কাছে থেকে কথা আদায় না করে ছাড়বে না। লঞ্চে কে গুলি ছুঁড়েছিল তুমি জেনে ফেলেছ।

—জি!

গোকুলদানা গ্রামে এক বলিষ্ঠ কমরেডের ওখানে রাহুল কদমকে রেখে চলে এসেছে। কদমকে দেখে বারবারই মনে হচ্ছিল, লোকটা আগের সেই চোর মানুষটি নেই। শশাঙ্ককে

সে চোখের ইশারা করে মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল, সে কথা অবধি গোপন করল না। বারবার বলতে বলতে ডুকরাতে থাকল।

গোকুলদানার কমরেড কুতুব খাঁ বিড়ি বাঁধা কারিগর, খুবই বলিষ্ঠ জোয়ান, তারই আওতায় রেখে এসে অনেকটাই নিশ্চিন্ত রাহুল, কিন্তু ভাবনা অন্যখানে। এখন মনে হচ্ছে খতিবের কব্জা থেকে কদমকে টেনে এনে ঠিক করেনি সে। যদি হরবোলার কাছে আস্ত চোরটিকে ফেরত না দিতে পারে রাহুল, তাহলে কী ঘটতে পারে ভাবতে পারছে না, মনে হচ্ছে কদমের উপর কোনও অধিকার তার নয়। এর অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রক সে নয়। ওর খোদাও ওকে নিয়ন্ত্রণ করছেন না। তার বাঁচা মরা একটা অজ্ঞাত নিয়তি বিশেষ, তাছাড়া কি, রাহুল জানে না। কী করলে কদমের ভাল হয় রাহুল জানে না। কদমকে মেরে ফেলতেও পারবে না রাহুল।

ইতিহাসের একটি সময় কদমের জীবন-স্বত্বকে অপরিজ্ঞাত দ্বৈরথে বেঁধেছে, সে চোর, সে চোর নয়, সে দালাল, সে দালাল নয়, সে নামাজি, তা-ও কিনা বলা যায় না, তবে কি বিপ্লবী, তাই বা কে বলবে! সে থানার লোক, বলা যায় না, সে হরবোলার লোক, বলা যায় না। তার দ্বন্দ্ব কি সে জানে না। এবং রাহুল জানে না কদমকে নিয়ে কী করবে! কোথায় রাখবে তাকে!

রাহুলের মনে হল, নিজেরই তার আজ আশ্রয় নেই, ঘর নেই। প্রেম? তা-ও কি আছে?

একদিকে কদম, অন্যদিকে কবি, দুজনের সঙ্গেই তার সংযোগ জরুরি মনে হচ্ছে, কিন্তু কেন এই সংযোগ সে আর বুঝতে পারছে না। তার কী ভূমিকা সে স্থির করতে পারছে না।

অথবা মোহর? তার কাছে এসেছে সে অত্যন্ত কাজে, সেই কাজের সঙ্গে প্রেমের কী সম্বন্ধ? প্রেম অতি মহৎ বস্তু এ কথা মোহরকে বলে তাকে ভোলানো? তারপর কাজ হাসিল করা?

চৌধুরী হাসানপুরে রাহুল এই দ্বিতীয়বার এল। মোহরদের পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল। ভোর হয়ে আসছে। রাতজাগা চোখ দুটি পুকুরের জলে ধুয়ে নেয় জল-পৈঠায় নেমে। আহ্, কী আরাম! এত হেঁটেছে, দাঁড়া কনকন করছে, জলে নেমে যেতে ইচ্ছে করছে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মোহর পুকুরপাড়ে চলে আসে। ওদের পাঁচসাতটা পোষা রাজহাঁস গলা তুলে দৌড়তে দৌড়তে জলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কী আনন্দ হাঁসগুলির, পাখা তো নয়, শক্ত ডানা মেলে জলে খাড়া হচ্ছে, যেন জল থেকে উড়ে চলে যাবে আকাশে। জল ছিটিয়ে দিচ্ছে প্রবল ডানার তাড়নায়।

ওই হাঁসেদের একটির নাম মোহর। সে তিরতির করে জল কেটে তার দিকে ছুটে এসে জল কাঁপিয়ে একটু ঢেউ তুলে ঘুরে চলে গেল। আবার ঘুরে এল। মনে মনে ডাকল রাহুল, মোহর! অ্যাই, শোনো!

কী দারুণ সাদা! গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা টগর কেউ যেন জলে ফেলে চলে গেছে, ওরা আপন মনে ভেসে চলেছে। হঠাৎ রাহুলের মনে হল, সাদা টগরফুল যদি গুচ্ছবেঁধে কখনও অস্থির হয়ে উঠত, তাহলে তাদের রাজহাঁসের মত দেখাত।

পিছন থেকে পিঠের উপর এসে দাঁড়াল কুতুব খাঁ। জলে ভাসমান সাদা পুষ্পময়ীর ডানায় হাতে তুলে জল ছেঁটাতে গিয়ে থেমে গেল রাহুল। চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল, কোথায় কুতুব! কেউ নেই। গোকুলদানার কুতুব কেন এখানে আসবে!

আসলে সেই দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না রাহুল। ঘন ঘন নামাজ পড়তে চাইছে কদম। সময় অসময় কিছু তার খেয়াল নেই, কিসের প্রার্থনা তা-ও সে জানে না। তন্ময় বধির আচ্ছন্নতায় যেন তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া কিছু বোঝে না। কুতুব ওকে বিশ্বাস করে না। নামাজরত কদমের পিঠের কাছে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে বিশ্বাসী কমরেডটি। কুতুবের ধারণা, নামাজ পড়তে পড়তে কদম উঠে পালাবে। রাহুলের একবারও মনে হয়নি কদম পালানোর চেষ্টা করবে ওইভাবে। কিন্তু কুতুবকে সে বাধা দিতেও পারেনি। এই দৃশ্যটা এখনও তাড়া করছে রাহুলকে।

রাহুল আবার ডাকল—মোহর ! এসো, এসো ! এদিকে। এই যে আমি !

॥৩৪॥

মোহর বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু তার আদিত্য সিংহের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। আদিত্যদা পোড়খাওয়া নেতা, তাঁর জীবন কতকগুলি রাজনৈতিক গভীর জটিল সংগ্রামের সমষ্টি, ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন বলতে তাঁর তেমন কিছুই নেই। রাহুলদের রাজনীতির অন্তর্ঘাত তাঁর চেনা, তাদের দলের কর্মীদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে তাঁরও সীমাহীন শ্রদ্ধা, কিন্তু কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে এক আশ্চর্য অবিশ্বাস তিনি দেখেছেন।

মোহর বিশ্বাস করতে পারছিল না পুকুরের ঘাটে জলপৈঠার উপর নেমে সত্যি রাহুল জল ছিটিয়ে হাঁসেদের খেলা দেখছে এই প্রত্যূষে। পুব আকাশে একটু করে কেবলই রঙ ধরেছে, জলে প্রসারিত আলো সদ্য এসে পড়েছে, ডানার ঝাপটা লেগে ঝিলমিল করছে এবং সেই আলো এসে লাগছে রাহুলের গায়ে।

একদিন এমনই ভোরে মেহেদিপাতা এনেছিল রাহুল। সেদিনও কেমন অবিশ্বাস্য ছিল তার আবির্ভাব। কিন্তু আজ রাহুল তার জন্য কিছুই আনবে না, সেকথা জানে মোহর। আদিত্যদা বলে দিয়েছেন, মোহরের কাছে রাহুল আসবে। যখন আসবে, মোহরের কর্তব্য কী, তা-ও বলে দিয়েছেন তিনি। রাহুলকে সঙ্গে করে পৌঁছাতে হবে বহরমপুর পার্টি অফিস।

আদিত্যদা যখন বলছিলেন, কাজটি তখন খুব কঠিন বলে মনে হয়নি। অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, রাহুলকে সেকথা উচ্চারণ করে বলা-ই কত শক্ত কাজ। তারপর তাকে রাজি করানো।

নতুনই টঙ হয়েছে মোহরদের বাড়ি। সোনাই পায়রা পুষছে। টঙে উঠে একটা পট করে বাজি খেল দু'টি পায়রা একসঙ্গে, একটির রঙ দুধলি, অন্যটি মেঘালি। সেই শব্দে পিছন ফিরে চাইল রাহুল। চোখ আটকে গেল মোহরের সদ্যোজাগা ঘুম জড়ানো চোখে। সেই সাদা উড়নি চোখে পড়ল, গলা বেড়ে পিছনে ঝুলছে, সালোয়ার কামিজ তেমনই সাদা-ঘেঁষা ফুলপাতায় আঁকা, মোহরের বক্ষচূড়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। খুব নরম আলো।

রাহুলের চোখেমুখে উদভ্রান্তি, রাতজাগা ক্লান্তির ছাপ, প্যান্টে ধুলা লেগে আছে, ফুলহাত হাওয়াই শার্টে পরিচ্ছন্নতা তেমন নেই। চুল উসকোখুসকো, চিরুনি পড়েনি। মুখে দাড়িটাই কেবল কামানো, তা-ও রাহুল নতুনই দাড়ি কামাচ্ছে, বোঝা যায় রাহুল যুবক

হয়ে গেছে।

—আবার দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। সেই যে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললে, চলে গেলাম আর বাড়িতে ঢুকতে পারলাম না।

—আমি পুকুরপাড়ে আসব তুমি জানতে ?

—হ্যাঁ।

—এত ভোরে কী করে এলে ?

—হেঁটে।

—কোথা থেকে ?

—চিৎপুর থেকে।

—বাস ?

—ছিল না। তখন রাত অনেক।

—কেন এলে ?

—খুব দরকার মোহর !

—জানি।

—ওই হাঁসটাকে আমি মোহর মোহর বলে ডাকছিলাম, ও কিন্তু সাড়া দিচ্ছিল।

—বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে মনেই রাখো না।

—আচ্ছা ! ডেকে দেখাচ্ছি তাহলে !

—থাক। কী দরকার বল। এখানে তোমার সঙ্গে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না।

—কেন ?

—বাবা মা চান না ব'লে।

—কই, আগে তো বলনি ?

—আমার জীবনটা কি সব সময় এক রকম থাকবে ! কই তুমিও তো সেই আগের মত গান গেয়ে শোনাও না কাউকে। কলেজ বন্ধ করে দিয়েছ।

—তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না ?

—বলব না তো, দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন ? শোন, তুমি আয়না মামার বাড়ির সামনে ষষ্ঠীতলায় চলে যাও। পাকুড়তলায় নাণ্টুর দোকানে বাঁশবাতার বেঞ্চি আছে, ওখানে বসে থাকো, আমি আসছি। একটু কিন্তু দেরি হবে, চলে যেও না। অবশ্য তুমি যাবে না জানি।

—আমার যে খুবই প্রয়োজন মোহর ! এমন এক আকুল স্বরে রাহুল বলে ওঠে যে, পিছন ফিরে চলে যেতে উদ্যত মোহর চমকে ঘাড় ফেরায় রাহুলের মুখের দিকে। একটি পা তার উপরের সিঁড়িতে উঠেছিল, সেটি থেমে গেছে। অন্য পা নীচের সিঁড়িতে থেমে পড়েছে, রাহুল আরও নীচের জলছোঁয়া সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

—সেই কথাই তো বলছি ! বলে হেসে উঠতে গিয়ে মোহরের মুখ মৃদু ব্যথায় ম্লান হয়ে যায়। ফের সে হেসে ওঠার চেষ্টা করে নিঃশব্দে, পারে না। হাসি আসতে গিয়ে ছায়ার মত সরে যায়।

নাণ্টুর দোকানে বাঁশের বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করে রাহুল। হঠাৎ একবার নাতাশার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে, বাড়তি হাঙ্গামার দরকার নেই, ওকে দেখলে নাতাশা বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করবে। তখন কী কথা বলবে ভেবে পায় না

রাহুল। তাছাড়া মামা মামির প্রশ্নের জবাব করতে হবে। সে কোথায় আছে, কী করছে এবং মাহেফরাসদের রাজনীতির সঙ্গে তার যোগ কতখানি শুধাবেন। এমনকি মামার সঙ্গে রাজনৈতিক কূট প্রশ্নও উঠে যেতে পারে। কোনও ধরনের তর্কে যেতে রাহুলের আর আগ্রহ ছিল না।

তাছাড়া কবির কী হয়েছে, মামা প্রশ্ন করতে পারেন। কবির প্রসঙ্গে কিছু না কিছু জবাব করতে হবে। মামা যাবতীয় ঘটনার জন্য রাহুলকেই দায়ী করে বসবেন। এই অপ্রীতিকর জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় না সে। শুধু সে কবিকে খুঁজে বার করতে চায়। যেভাবেই হোক বউদির দলের কাছে কবির আত্মগোপনের সংবাদ রয়েছে। মণির সঙ্গে কথা বলে এইটুকুই বুঝেছে রাহুল।

মোহরের সঙ্গে বউদি কবি-প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন, মণি শুনেছে। কী কথা হচ্ছিল মণি বুঝতে পারেনি, কিন্তু মণির মনে হয়েছে, মোহর আপা জানে কবি কোথায়। কেননা মোহর কবি সম্পর্কে একটি বিবরণ পেশ করছিল বউদির কাছে, অস্পষ্টভাবে কানে আসছিল মণির। মোহর কবিকে কীভাবে দেখল, নাকি দেখেনি, অন্য কোনও ভাবে শুনেছে! শোনা কথাকেই প্রত্যক্ষদর্শীর মত বিবৃত করছিল? আচ্ছা, মামাও কি জানেন কবি কোথায়? পার্টির কাছে যে-খবর রয়েছে, তা মামার পক্ষে জেনে ফেলা বিচিত্র না হতেও পারে! ফের, পার্টি মামার মত সিমপ্যাথাইজারকে বা মোহরের মত নতুন ওয়ার্কারকে কবির আত্মগোপনের খবর বলতে যাবে কেন? তাহলে কি এমন হতে পারে, এই গাঁয়েই কোথাও কবি আত্মগোপন করে আছে! ডাক্তারদা সেই জাতীয় একটা সন্দেহ প্রকাশ করতে চান।

রাহুল ভাবল, মণির তথ্যে ভুল থাকতেও পারে। কবি হয়তো আর বেঁচে নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাহুল চুপ করে বসে থাকতে থাকতে মনে মনে কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। মোহর অসম্ভব দেরি করছিল। নাণ্টুর দোকান মনোহারি। সাদা টিনের ঘের। ছোট চৌকির উপর চার প্রস্থ টিনের বেড়া। কাঠের বর্ডার দিয়ে টিনগুলি মজবুত ভাবে বাঁধা। নাণ্টু বিড়ি বাঁধে আর সওদা বেচে। কোলের উপর কুলো। নাণ্টু একমনে একটা সুর ভাঁজছে, কী গান বোঝা যায় না।

রাহুলের খিদে পেয়েছে তীব্র। নাণ্টুর কাছে খাস্তা বিস্কুট চাইল সে।

নাণ্টু শুধালো—বিড়ি খাও?

—না।

—সিগারেট?

—না। নেশা নেই।

—এখানে কী?

—একজন আসবে।

—মেয়ে না মরদ?

—মেয়ে।

—কার ঘরের? লেটার দিয়েছ?

—লেটার?

—হ্যাঁ, চিঠি দাওনি? আমাকে দিয়ে যেও, আমি পৌঁছে দেব। এখানে বাবুপাড়ার অনেক হিরোইন আসে, আমি কালেক্ট করি, ডেলিভারি করি। নো রিস্ক।

—ও। বলে রাহুল ফিক করে হেসে ফেলে। তারপর বলে— চলি তাহলে!

—এসে গেছে ?

—হ্যাঁ।

নান্টু একটু ঝুঁকে মোহরকে দেখে বলে— সর্বনাশ ! বলে মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলে— এ তো বড় সাহেবের মেয়ে ! আরে বাস্ ! তুমি তো বাঘের খাঁচায় হাত দিয়েছ ভাই !

রাহুল আর কোনও কথা না বলে পথের উপর নেমে আসে।

—লোকটা কেমন ?

—কে ?

—ওই নান্টু !

—ভাল। মেয়েরা ওর কাছে মাথার ফিতে, কাঁটা, বলকাঁটা, নেলপলিস, লিপস্টিক এই সব কেনে। কেন বল তো ?

—না। কিছু না। মনে হল, ও কার সঙ্গে কার ভাব সব জানে।

—তোমাকে খারাপ কথা বলল বুঝি !

—না। বলল, আমি বাঘের খাঁচায় হাত দিয়েছি। প্রশংসা করল।

—তুমি তাই মনে কর ?

—কী ?

—এই যে বললে বাঘের খাঁচা...

—তুমি অনেক দেরি করলে !

—খাঁচা থেকে বার হতে হল ! তুমি জানো না !

—স্নান করেছ ? খেয়েছ ?

—না।

—সেজেছ খুব।

—যাঃ !

—এই প্রথম শাড়ি পরলে মনে হচ্ছে।

—আগেও পরেছি।

—কই দেখিনি তো ! তোমাকে মানিয়েছে দারুণ ! তুমি খুব সুন্দরী মোহর !

মোহর খুব গম্ভীর হয়ে বলল— চল !

রাহুল কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে আর পাশের মোহরকে মাঝে মাঝে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে। তারপর বিস্মিত গলায় বলে— কোথায় যাচ্ছি আমরা, কিছুই তো বলছ না !

—তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ?

—তা কিছুটা হচ্ছে বইকি, অনেক হেঁটেছি কিনা ! খিদেও পেয়েছে খুব।

—তোমার জন্যে পিঠে এনেছি। খাবে ?

—কেন খাব না ! আজকাল যা পাই, খেয়ে নিই। পিঠে তো ভাল খাবার।

—কোথায় থাকো ? প্রশ্ন করেই মোহর কাঁধের ঝুলন্ত কাপড়ের ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া প্যাকেট খুলে পিঠে বার করে রাহুলকে দেয়। রাহুল ছোট ছোট মিষ্টি পিঠেতে কামড় দিয়ে বলে— তুমি খাবে না ?

—খেয়েছি।

—বললে যে খাওনি।

—খেয়েছি বইকি। পিঠেই খেয়েছি। পিঠে আমার ভাল লাগে না।

—মনে হচ্ছে, তুমি বেরিয়ে এসেছ।

—হ্যাঁ।

—কখন ফিরে আসবে ?

—তুমি যখন চলে যাবে। যখন প্রয়োজনের কাজ শেষ করে পালাবে, ফিরেও চাইবে না।

—কে বলেছে !

—তোমাকে আমি জানি না !

—ভুল জানো।

—তাই নাকি !

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমারও মন আছে মোহর। আমি ভাবি।

—কী ভাবো ? আমার কথা !

—ভবিষ্যৎ !

—তোমাদের দলের ছেলেরা, ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না শুনেছি।

—তোমাদের দলের ছেলেরাও কি ঘামায় ? অবশ্য তোমাদের পার্টিতে কিছু নিশ্চিন্দি আছে।

—যথা ?

—ঘরের খেয়েও প্রোগ্রাম করা যায় ! তাহলে তুমি পলিটিক্স করছ মোহর ?

—নিশ্চিন্ত মনে করছি বটে। করছি না বললে বিশ্বাস করবে কেন !

—এখন, এই মুহূর্তে কী প্রোগ্রাম তোমার ?

রাহুলের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মোহর রাস্তার দু'পাশের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের দিকে চাইল। সবুজ মাঠ আদিগন্ত ভোরের বাতাসে দুলছে, কোথাও ফসল কিঞ্চিৎ হলুদ হয়েছে। নানা রকমের পাখি উড়ছে, সাদা বক ফসলের উপর দিয়ে ডানা মেলে চলেছে।

মোহর সেদিক থেকে চোখ টেনে পাশের রাহুলকে দেখল একবার।

—এমন করে দুজনে হেঁটে যাব ভাবিনি। ভাবিনি কখনও রাজনীতি নিয়ে কথা বলব।

—আমিও ভাবিনি। তোমার কাছে সেই বাপ-ছেলের চীনা ফোটোটা আছে ? কাঁধে বন্দুক, বাপ বসেছে একটা পাটাতনে, তার পায়ের ফাঁকে মাটিতে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে তার ছেলে। আড়বাঁশি।

—হ্যাঁ।

—ভেবেছিলাম তুমি...

—বল !

—না থাক। পথ আমাদের আলাদা হয়ে গেছে মোহর। তুমি আজ সিরিয়াসলি অন্য দলের ক্যাডার। ওই ফটোটার একটা বক্তব্য ছিল, তুমি বোঝোনি।

—বুঝে আমি কী করতাম ! আজ যদি আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই, তুমি নেবে সঙ্গে ? তোমার দল কোথায় ?

—ও, এই কথা ! কোনও অস্তিত্বই টের পাও না বুঝি ! দল তো কাজের জন্য, সেই কাজ তো হচ্ছে !

—কবিকে বাঁচাতে পারবে ?

—তোমার প্রোগ্রামটা সত্যি ঠিক কী ধরনের এখন, বলবে আমাকে !

—তোমাকে তোমার দরকারটা বুঝিয়ে দেওয়া।

—বল তাহলে!

—আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।

—কোথায়? একটা কথা শোন, ভালবাসারও কিছু দাম আছে মোহর!

—হঠাৎ একথা!

—হঠাৎ নয়। আমাকে আর কোথাও টেনে না গিয়ে এখানেই বলে দাও, আমি আর পারছি না হাঁটতে। তুমি আমাকে ভালবাস না! কেন এভাবে টেনে নিয়ে চলেছ?

এভাবে রাহুলকে টেনে নিয়ে যেতে সত্যিই ভাল লাগছিল না মোহরের। খুবই মায়া লাগছিল। মোহরের ইচ্ছে করছিল রাহুলের ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিতে। খুবই বাসনা হচ্ছিল রাহুলের মাথাটা ওই বটবৃক্ষের তলে বসে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে এবং রাতজাগা চোখের পাতায় চুমু দেয়। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

—আর আছে মোহর?

—কী?

—পিঠে!

—আর তো নেই! বলে সলজ্জ মোহরের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। কখনও মোহর রাহুলকে আলিঙ্গন করেনি, শুধু হাতদুটি স্পর্শ করেছে দু'একবার। অথচ এখন অদ্ভুত সব বাসনা হচ্ছিল তার।

বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে মোহর। গাছটির দিকে এক নিমেষে চেয়ে দেখে, তারপর বলে— তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে না গেলে তুমি কবির খোঁজ পাবে না রাহুল। মণি তোমাকে কী বলেছে?

—তুমি সব জানো।

—কোথায় রয়েছে বলে দেয়নি?

—না। মণি জানে না। বউদি জানে, বউদি আমাকে বলতে চায়নি। বলা দূরে থাক, বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি বুলবন। আমার আর কোনও জায়গা নেই মোহর। মা পর্যন্ত কথা বলেনি। ভেবেছিলাম, বাড়িতে ঢুকতে পারলে পেট ভরে খাব।

—তোমাকে খাওয়াতে পারি, তুমি আমার সঙ্গে আর একটু কষ্ট করে চল!

—ভালবাসা আর ভাত এই জন্যেই বুঝি এতসব! খাওয়াব বললেই আমার কদমের কথা মনে পড়ে। ঠিক আছে, আগে প্রাণটা বাঁচুক। নাওয়া খাওয়ার আর তো কোনও নিশ্চয়তা নেই মোহর।

ক্ষীণ অশ্রুভাসা চোখে চোখ তুলে আর একবার চেয়ে দেখে মোহর, রাহুলকে। কথা বলে না।

রাহুল বলে— শরৎচন্দ্রের নায়িকারা বেশির ভাগ মানুষকে খাওয়াতে পারলে আর কিছু চাইত না।

মোহর বলল— আমাকে বলছ বুঝি! তবে মানুষ কথাটি গড়পড়তা হয়ে গেল। মনের মানুষ বলতে পারতে!

বলে ফেলে সশব্দে হেসে ওঠে মোহর। রাহুল কী একটা কথা বলতে গিয়ে চেপে যায়। দেহ আর কিছুতেই বইতে চাইছিল না। মাঠ পেরিয়ে আরও একটি দীর্ঘ মাঠের পথে পড়ে ওরা। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এটি সংকীর্ণ স্রোতধারা, খুব ছোট ধরনের

কোনও নদী। নদীতে জল বেশি নেই, মরে আসছে।

সেইদিকে চেয়ে রাহুল বলল— খুব তেষ্টা পেয়েছে গো!

—ওই জল খাবে বুঝি!

—উপায় কি!

—লক্ষ্মীছেলে আর একটু কষ্ট করে চল! সামনেই একটা টিউবওয়েল আছে, বরজের কাছে।

—ছাতি ফেটে যাচ্ছে মোহর, একটুখানি মুখে দিই। বলেই জলের দিকে নেমে যায় রাহুল। অঞ্জলিতে জল ধরে মুখের কাছে এনে সেই জল ফেলে দেয় স্রোতে, হাত দিয়ে জল সরিয়ে আবার অঞ্জলি বাঁধে, আবার মুখে তোলে। এত নোংরা, কাদামাখা জল কী করে খাবে রাহুল!

—খেও না রাহুল! খেও না। অসুখ করবে।

রাহুল শুনল না। প্রায় চোখ বন্ধ করে গিলে নিল। তারপর পাড় ধরে টলতে টলতে উঠে এল।

—তুমি পারও বাবা! আর তোমার তর সইল না! ওই তো দ্যাখ, টিউবওয়েল!

—বলছ বটে, তেষ্টা কী জিনিস...

—কারও যেন পায় না তোমার মত!

একথার আর কোনও জবাব না করে রাহুল টিউবওয়েলের কাছে ছুটে গেল এবার।

মোহর হ্যাণ্ডেল চেপে জল নিংড়ে দিতে থাকল। মুখে চোখে জল দেয় রাহুল।

খানিকটা শীতল হয় দেহমন; কিন্তু পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে, অবশ্যি পিঠে পেটে পড়ায় নাড়িতে সামান্য বল এসেছে।

রাহুল বলল— খিদে সহ্য করার শক্তি কিছুটা মুমতাজের কাছে শিখেছি। যাক গে। তুমি আমাকে খাওয়াবে বলেছ! বলেই রাহুল হা হা করে হেসে উঠল।

মোহর কিন্তু হেসে উঠতে পারল না। মনে মনে ভাবছিল, কী গভীর বিশ্বাসে রাহুল তার সঙ্গে হেঁটে চলেছে। ভাবছে, খেতে পাবে এবং কবির সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। খুব নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে রাহুলকে।

রাহুল আরও নিশ্চিন্ত হল উল্লাসপুর গ্রামে এসে। এই গ্রামে কখনও সে আসেনি। মাঠের শেষ যেখানে, ঠিক যেখানে গ্রামের শুরু, তার প্রথম বাড়িটি পাকা দালানের। খুব বড় বাড়ি নয়। সেই বাড়িতে রাহুলকে সঙ্গে করে ঢুকে পড়ে মোহর।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকে—ফুপু মা!

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল— কে গো!

—আমি মোহর।

—ও, মোহর এসেছিস! আয় মা। কে আছে সাথে?

—সাদাবাবুর ছেলে। রাহুল।

—মোহড়ার সাদা চৌধুরীর ছেলে?

—হ্যাঁ।

—ও মা! তাই নাকি! ও ঘরে নিয়ে যাও। আমি শুয়ে আছি, উঠতে যে পারি না! ফুপাও নেই।

—তুমি শুয়ে থাক। উঠতে হবে না। আমিই রাহুলকে রান্না করে খাওয়াব। শুধু বলে দাও কোথায় কী আছে।

—সব আছে। রান্নাঘরে সব পাবে। একটু বাদে কাজের মেয়েটা আসবে। আমি তো কিছুই পারি না। তুমি দেখে বুঝে নাও। বসতে দাও। গোসলের পানি দাও। গামছা সাবান তেল দাও। গোসলখানা ওদিকে। তুমি তো সবই জানো। খাটা পায়খানা আছে।

রাহুল ফুপুর মুখ দেখতে পেল না। শুধু কণ্ঠস্বর শুনল। প্রাতঃকৃত্য, স্নান, খাওয়া এবং ঘুম। কোথাও কোনও বিঘ্ন হল না। খেতে বসে বারবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। সামনে বসে তালপাখার হাওয়া দিতে দিতে গভীর মনোযোগে মোহর তাকে পরিবেশিত খাদ্যের দিকে আকর্ষণ করছে, কিছুই তো খাচ্ছ না, রান্না বুঝি ভাল হয়নি ইত্যাদি বলে এবং এটা নাও, ওটা তো নিলেই না, জিয়োনো মাছ ছিল ঘরে, তাজা ছিল কিন্তু বলে, হাওয়া দিয়ে, অতি প্রসন্ন মমতা দিয়ে রাহুলকে খাওয়াতে থাকে মোহর। তখন রাহুল বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

—ফুপু রুগ্‌ণ শুয়ে থাকে।

—বুঝতে পেরেছি।

—বাঁজা।

—ও!

—কেমন লাগছে তোমার?

—ফুপুর কথা খুব মিঠে। চারদিকে নজর আছে।

—এখানে থাকবে দু'দিন?

—কেন?

—এমনি! কোনও ঝামেলা নেই। ফুপা বাংলাদেশে গেছে। তুমি গাইবে, আমি শুনব। আর তো কখনও হবে না।

—কী হবে না?

—এই রকম।

—এই রকম কী?

আর কোনও কথা না বলে মোহর ঘাড় নীচু করে। পাখাটা পাশে রাখে মেঝের উপর। রাহুল দেখে, এ ঠিক শরৎচন্দ্রেরই নায়িকা বিশেষ। এর আকর্ষণ মারাত্মক। এবার পালাতে হবে।

অপূর্ব সৌন্দর্যে টলটল করছে মোহর। রাহুল ভাবে, সে যদি কবি হত, তাহলে এই ছবিটার একটা বিস্ময়কর বর্ণনা দিত। সে তা পারে না বলে, একটা সহজ পদ্ধতি বার করে। ক্যামেরা যেমন ছবিটা হুবহু তুলে নেয়, তেমনি রাহুল মোহরের এই বিশেষ ভঙ্গিটাকে মুখস্থ করে ফেলে, ফলে সেটাও একটা ছবি হয়ে যায়। তখন সে ছবিটাকে বুক পকেটে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মুখ হাত ধোয়। আঁচায়। বিছানায় এসে শুয়ে যায়। আর সে বসেও থাকতে পারছে না। ঘুম এসে পড়তে চাইছে।

—এই রকম কী, বললে না তো! চোখ দুটি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, চোখের সামনে ঝুঁকে এসেছে মোহর, তখন ফের প্রশ্নটি করে রাহুল।

—হাঁ কর। বলছি। বলে মুখশুদ্ধি ধরা হাতটি মোহর রাহুলের মুখের কাছে ঠেলে দেয়। মুখশুদ্ধি নেয় রাহুল। চোখ বন্ধ করে। ঘুমে তলিয়ে যায় মুহূর্তে। সাড় চলে যায় চৈতন্যের সীমানা পেরিয়ে অথৈ সমুদ্রের মত সুপ্ত আলোড়নে, তখন শুধু ঘুম।

মোহর গা নাড়িয়ে ডাকে রাহুলকে। সুপ্তির তলদেশ থেকে রাহুল সাড়া দেয়। ঠিক জানে না কী জবাব দিচ্ছে তার মস্তিষ্ক।

—এই রকম খিদে কখনও পাবে না তোমার!

—না।

—এমন তেষ্টাও পাবে না।

—না।

—যদি পায়, দেখা হবে না।

—না।

—যদি কখনও দেখা হয়, এই তেষ্টা, এই খিদে না-ও লাগতে পারে। বল, তুমি যে শুনতে চাইলে রাহুল!

রাহুল আর সাড়া দিতে পারল না। ঘুমন্ত রাহুলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মোহর ফুঁপিয়ে উঠল মৃদুশব্দে। সে কিছুতেই চোখের জল সংবরণ করতে পারছিল না। একা একা কাঁদল মোহর, কেউ শুনতে পেল না। কেউ প্রশ্ন করল না, কেন তুমি কাঁদছ।

মোহর তখন নিজেকে দুটি চূড়ান্ত বিপরীত ভাগে বিভক্ত করে ফেলল। তার প্রথম ভাগের নাম প্রথম মোহর। দ্বিতীয় ভাগের নাম দ্বিতীয় মোহর। প্রথম মোহর দ্বিতীয় মোহরকে প্রশ্ন করে। বা দ্বিতীয় মোহর প্রথম মোহরকে শুধায়।

প্রশ্ন : তুমি এখন কী করবে?

উত্তর : বুঝতে পারছি না।

দ্বিতীয় মোহর : আদিত্যদার কাছে নিয়ে চল রাহুলকে।

প্রথম মোহর : কী বলে নিয়ে যাব?

দ্বিতীয় মোহর : বল যে, কবি কোথায় আদিত্যদাই জানেন। তুমি জান না।

প্রথম মোহর : সত্যিই আমি জানি না ভাই। নাতাশার কাছে কবি ছিল। এখন কোথায় সে, নাতাশাও জানে না। অন্তত নাতাশা আমাকে বলেনি। শুধু বলেছে, কবি চলে গেছে।

দ্বিতীয় মোহর : একথা রাহুল বিশ্বাস করবে না, ওকে নিয়ে চল।

প্রথম মোহর : আদিত্যদার সামনে কি যেতে চাইবে রাহুল?

দ্বিতীয় মোহর বলল : যেতে চাইবে। কেননা যেভাবেই হোক, কবির খোঁজ তাকে পেতেই হবে। তুমি বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে যাবে না। শুধু বলবে, আদিত্যদার কাছে গেলে রাহুল সব জানতে পারবে।

প্রথম মোহর : ও যদি ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলে, তুমি কেন বলছ না! যদি বলে, সব জানো তুমি, বলতেই হবে তোমাকে! আমি কী জবাব দেব বলে দাও!

দ্বিতীয় মোহর : বলবে, তুমি জানো না, ব্যস! হয়ে গেল!

—হল না, হল না। কিছুতেই এভাবে হয় না। অত সহজে হয় না মোহর!

—তাহলে তুমি মর!

—আদিত্যদা ভাববেন, আমি নিয়ে যেতে পারলাম না। রাহুল ভাববে, আমি মিথ্যা বলছি। আদিত্যদা ভাবছেন এইভাবে রাহুলকে আটকাবেন। রাহুল ভাবছে, আমার কাছে থেকেই কবিকে সে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবে। এদিকে কবি কোথায় নাতাশা বলেনি। কেন নাতাশা বলল না! সত্যিই কি সে জানে না? কিংবা গোপন করছে!

—এসব কথা তুমি রাহুলকে প্রকাশ ক'রো না মোহর! বিপদ আরও ঘনাবে।

—কী করব ?

—নিয়ে চল। ব্যস!

—ঠিক আছে।

—মন শক্ত কর। তোমার সামান্য ভুলে অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। রাজনীতির তুমি কিচ্ছু বোঝো না।

—ভালবাসা ? বল, তা-ও কি বুঝি ? আমি যে চালাক নই মোহর !

বিকেলে ঘুম ভাঙে রাহুলের। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নামে। চোখেমুখে জল দেয়। জামাপ্যান্ট কেচে রোদে শুকিয়ে কয়লার উনানে ইস্ত্রি বসিয়ে সব ইস্ত্রি করেছে মোহর। গেঞ্জিটা ধবধব করছে।

চটপট পরে ফেলে রাহুল। হঠাৎ রাহুলকে অন্য এক রাহুল বলে মনে হয়।

—এবার যেতে হবে।

—কোথায় ? ভয়ে বিস্ময়ে প্রশ্ন করে মোহর।

—কাছে এসো ! রাহুল মোহরকে চোখের ইশারা করে এবং ডেকে ওঠে।

অবোধ ভঙিতে সরল বিশ্বাসে মোহর এগিয়ে যায়। দু'হাত দিয়ে রাহুল তাকে কাছে টেনে প্রায় বুকের কাছে এনে ফেলে। মোহরের মুখটা ঘনিষ্ঠভাবে নিজের মুখের দিকে থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে তোলে। বলে— এ রকম আমি সিনেমায় দেখেছি। এত কাছে এই প্রথম, তাই না ? ঠিক জানি না, কীভাবে সোহাগ করতে হয়।

পাখির বুকের মতন হালকা হয়ে যায় মোহরের দেহ। আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সে, রাহুলের বুকে ঢলে পড়ে। দু'হাত দিয়ে রাহুলকে জড়িয়ে ধরে, যেভাবে একটি বৃক্ষকে ধরে মানুষ। রাহুলের বুকে মুখ ঘষড়াতে ঘষড়াতে কেঁদে ফেলে মোহর। শরীর অসম্ভব কাঁপতে থাকে।

—আমাকে ফেলে দিও না রাহুল ! জড়ানো এবং কাঁপা স্বরে বলে ওঠে মোহর।

—না !

—কেন ?

—শোন !

—না !

—রুকসানা নামে একটি মেয়ের কথা তোমাকে বলছি, আমাকে ছাড়ো এবার। বলেই হঠাৎ রাহুল কেমন শক্ত হয়ে যায়। নিজের দেহ থেকে মোহরকে টেনে তোলে।

—খতিব সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া শেষ হয়নি !

বিড়বিড় করে বলে ওঠে রাহুল। কিছুই বুঝতে পারে না মোহর। মোহরকে জানালার কাছে টেনে আনে, পাল্লাটা সরিয়ে খুলে দেয় প্রকাশ্য অপরাহ্নের আলোয়, আলো লাগে মোহরের মুখে, চেয়ে দেখে রাহুল। চোখে তার তখনও অশ্রু। চোখে তার তখনও মুগ্ধতা। শরীরে তখনও আসঙ্গলিপ্সার বিচ্ছিন্ন বেদনা, তখনও নিরাকুল আবেগ স্পন্দিত হৃদয়ে, চোখের পাতায় মদির অপরাহ্নের আলো রহস্যস্নিগ্ধ, বুকের কাপড় সরে গিয়ে বোতাম খসে গেছে ঘাট ছেড়ে, প্রস্ফুটিত রাঙা কুসুমের মত বুকের অর্ধেক ঠেলে এসেছে আগ্রহে, স্তনসন্ধির কিছুটা চোখে পড়ে যায়, উপত্যকায় একটি তিল অশেষ ভালবাসায় ঘুমিয়ে রয়েছে। তখনও মোহর কাঁপছে।

রাহুল মোহরের চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে অস্বাভাবিক কঠিন গলায় বলল— কবি কোথায় মোহর ! বল, আর দেরি ক'রো না। বল, কথা বল !

মোহরের চোখের দৃষ্টি সহসা কঠিন হয়। মুখের ডৌলে কে যেন খানিক কালি ঢেলে দেয়, ঠোঁট দুটি শুকনো, ছাই হয়ে যায়। রাহুল ক্ষিপ্তস্বরে বলে— বলবে না ?

॥৩৫॥

মোহর বলল—কবি কোথায় আমি সঠিক জানি না রাহুল। তোমাকে মিথ্যা বলব না। রাস্তায় চল সব বলছি।

রাহুল মোহরকে বিশ্বাস করতে পারল না। তার চোখে মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল। দু'হাতে সে মোহরের বাহুর গোড়া খামচে চেপে ধরেছিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়িয়ে আচমকা বলেছিল—বলবে না ?

বস্তুত মোহরের একটু একটু করে কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। রাহুল তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল— ঠিক আছে, চল।

ফুপুকে বলে বিদায় নিয়ে মোহর রাস্তায় নেমে এল রাহুলকে সঙ্গে করে। চুপচাপ হেঁটে চলল কিছুক্ষণ।

রাহুল বলল—আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ ? কবির কাছে ?

—না। কবি কোথায় জানি না বলেই আদিত্যদার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বহরমপুর। বলে মোহর সামান্য সভয়ে পাশের চলমান রাহুলের দিকে চায়।

—তোমার নেতারাই সব বলবেন, জানবেন। তোমরা কি সব পুতুল ? আসলে তুমি সিদ্ধান্ত করতে পারছ না, কবি কোথায় বলে দিলে, পার্টির নির্দেশ কতটা অমান্য করা হয়।

—না।

—আমার বউদি, বুলবন এই পার্টির লোক এবং মোহর তুমিও। আমি জানি, তোমাদের রাজনীতি......

—ও কথা থাক রাহুল ! রাজনীতি নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না।

—আমি ঠিক বুঝছি না, কবিকে তোমরা লুকিয়ে রেখেছ কেন ?

—তাহলে কি আমরা পুলিসের হাতে তুলে দেব ? এ প্রত্যাশা তুমি তিমিরের দলের কাছে করতে পার, আমরা ওই কাজটা পারি না।

—তুমি যে দেখছি পার্টির লোকের মতই কথা বলতে শিখে গেছ। বউদির কাছে শিক্ষে পাচ্ছ বুঝি ! তোমার ভাবটা অনেকখানি বউদির মত হয়েছে, ভাষাও।

—তা কি খুব খারাপ হয়েছে !

—এই দ্যাখো, এটাও বউদির ঢঙ। কিছু মনে ক'রো না !

—একই পরিবেশে থাকি, একই রাজনীতির পরিবেশ বলে হয়ত.....কিন্তু আমি রাজনীতি করি না রাহুল !

—তাহলে তুমি আদিত্যদার কাছে নিয়ে যেতে চাইছ কেন ? তুমি তো আমার রাজনীতিকেও সাহায্য করতে পার ! আমার আদর্শকে না হোক, অন্তত আমাকে !

—আমি কি কখনও করিনি তেমন ?

—করেছ বলেই তো আবার এসেছি তোমার কাছে।

রাহুলের এই কথায় মোহর চুপ করে থাকে, বড় অকারণ তার চোখে জল এসে পড়তে চাইছে। সে সামান্য বালিকা, জীবনের এই সংকটকে কিভাবে বুক দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাবে,

বুঝে পাচ্ছে না।

—চুপ করে থাকলে কেন ? রাহুল প্রশ্ন করল কিছুক্ষণ বাদে, মোহর কথা বলছে না দেখে।

—আবার বলছি, আদিত্যদার কাছে চল, সব তুমি জানতে পারবে।

—ওই নামটা কি এতবার করে উচ্চারণ করতে হবে মোহর ! খোদার একশো একটা নামের মত করে আউড়ে চলেছ।

—উনি যে নেতা !

—নেতা কিন্তু খোদা তো নন ! তাছাড়া তুমি বলছ, রাজনীতি তুমি কর না !

—কিন্তু তুমি যে কর রাহুল ! তোমাকে আমার ভয় করছে। বলে এবার বাস্তবিক মোহরের দুই চোখ গভীরভাবে ছলছল করে উঠল। সেই চোখের দিকে চেয়ে প্রথমে থতিয়ে যায় রাহুল, তারপর ওই অশ্রুর কাছেই, যেন সে আবেদন করে ফেলে, বলে ওঠে—সত্যি যদি আমাকে ভালবাসতে......

রাহুল কথা শেষ করতে পারে না, তার আগেই মোহর ওর বুকে ভেঙে পড়ে বুকেই মুখ গুঁজড়ে নির্জন রাস্তার উপর ফুঁপিয়ে ওঠে। একটি ছোট পাখি যেন রাহুলের হৃদয়ের সন্নিধে ধুকপুক করে ওঠে। অত্যন্ত কোমল একটি প্রাণ। মুহূর্তে রাহুল নিজেও কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারে না।

—আমি বুঝি ভালবাসি নি। বলে উঠতে গিয়ে আরও স্বর গাঢ় হয়ে যায় মোহরের, ভিজে ভেঙে যায় গলার উচ্চারণ, আরও সে কেঁপে ওঠে।

কেউ দেখে ফেলতে পারে ভেবে হঠাৎ-ই সচেতন হয়ে মোহর রাহুলের বুক থেকে মাথাটা তুলে নেয় এবং আঙুলের ডগা দিয়ে সন্তর্পণে চোখের জল মুছে ফেলে। এই মধুর ভঙ্গিটি লক্ষ করে রাহুল। চিন্তা করতে থাকে, এই নরম মনের মেয়েটির কাছে থেকে কিভাবে কথা আদায় করবে। আদিত্য সিংহের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে মোটেও উৎসাহ ছিল না রাহুলের। মনে পড়ে গেল, বুলবন তার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করেছে তা যদি ওদের পার্টির মনোভাব হয়, তাহলে আদিত্য সিংহের কাছে গিয়ে হতাশই হতে হবে।

চোখের জল মুছে একটু নিজেকে সামলে নেয় মোহর। তারপর পা বাড়িয়ে ছোট করে বলে—চল !

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রাহুল কথা খুঁজে পায় না দীর্ঘক্ষণ। ওর সহসা মনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বলে—আমার অনেক কাজ মোহর।

—কী করব !

—আমাকে আর ভোগান্তির মধ্যে ফেলো না। আদিত্যদার কাছে গিয়ে সত্যিই জানতে পারব বলছ ? কিন্তু একটা কথা তোমারও বোঝা উচিত, কবিকে আমরা অনেক বেশি ভালবাসি, তোমাদের দলের পলিটিক্স সে হয়ত ঘৃণা করে না, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণও ভাবে না। তাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাতে চাইছ কেন তোমরা ?

—আমি জানি না, আমি বলতে পারব না।

—তোমার নিজস্ব মন নেই ?

—আমরা কবিকে লুকিয়ে রাখিনি, সে নিজেই লুকিয়ে আছে। খুবই অসুস্থ !

—তুমি তাকে দেখেছ ? অত্যন্ত সাগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয় রাহুল।

মোহর বলে—না। শুনেছি।

—কার কাছে !

—আচ্ছা, এই সব প্রশ্ন না করলেই কি নয় ?

—তুমি কেন আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছ ? মামার কাছে তুমি শুনেছ ? কদম বলেছে, কবিকে থানা চুনাখালির পার্কে মুমূর্ষু অবস্থায় নামিয়ে দেয় গাড়ি থেকে। তারপর কী হল ?

মোহর চুপ করে আছে দেখে ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে রাহুল—বলবে না ! বুঝতে পারছি, বলবে না। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে বহরমপুর যাব না মোহর ! আমি গোকুলদানা ফিরে যাব। ওখানে কদমকে রেখে এসেছি।

—যাবে না ! বলে বিস্ময়ে এবং হতাশায় দাঁড়িয়ে পড়ে মোহর।

—না।

—আমাকে বিশ্বাস করছ না। ভাল তো বাসিনি, কেন করবে !

—আমিও তাই মনে করি।

—তুমি এত নিষ্ঠুর !

—রাজনীতির কাজটা তো মোলায়েম নয়। তুমি নিজেও টের পাচ্ছ। তোমার ইচ্ছে করছে বলে দিতে, পারছ না। এ ব্যাপারে তুমি তোমার নিজের মনের কথা বলবে একটু ?

—ব্যক্তিগত কথা ? মনের কথা ? বেশ !

—পার্টির কথা নয়।

—আবার বলছি, কতবার বলছি, আমি শরৎ-সেন্টিনারি প্রোগ্রামে বউদির দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, আমি পলিটিকাল ক্যাডার নই। কিন্তু......

—কিন্তু ?

—কবি বাড়ি ফিরতে চায় রাহুল !

—ফিরবে। আমি শুধু ওর সঙ্গে দু'চারটি কথা বলব।

—ওকে মেরে ফেলবে না ?

—মেরে ফেলব ? আদিত্যদা এইসব বলেছেন !

—কেউ বলেন নি। বা বলেও যদি থাকেন.....বা এটাই আমার.....

—ঠিক আছে। যদি দেখি, মেরে ফেলার প্রয়োজন হচ্ছে, তাহলে আমরা কী করব !

—ও, তাহলে মারবে !

—সে কথা তো বলছি না। কবির প্রাণের দাম তোমাদের কাছে আছে, আমাদের কাছে নেই ? বারবার মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন ? লক্ষণকে মেরে ফেলেছি বলে !

—আমার ভয় করছে রাহুল !

—তোমার ভয় করছে শুনে ভালই লাগে। কিন্তু তোমার পার্টি ভয় করছে একথা বিশ্বাস করি না। এভাবে নাক গলানো ঠিক হচ্ছে না। শোন, আমি আর যাব না।

একথা বলে বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল। এখানে এক মিনিট বাস দাঁড়ায়। কিন্তু পুরনো স্টপেজ।

—তুমি রাগ করলে খুব। আমার ব্যক্তিগত কথাটি বলি তাহলে। কবি হাসানপুরে মামার ওখানে ছিল। নাতাশা কবির শুশ্রূষা করেছে। দু'দিন হল কবি আর সেখানেও নেই।

—কোথায় গেছে !

—তারপরের ঘটনা আমার জানা নেই। মামা কবিকে পার্ক থেকে তুলে এনেছিলেন, ওঁর জিপে ক'রে। পরে মামার বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছে কবি, নাতাশা আমাকে

বলতে পারেনি। কবি আশ্রয় খুঁজছে, এ তোমাকে আমি বলতে পারি। আমার মনে হচ্ছে, আদিত্যদার কাছে গেলে তুমি সব জানতে পারতে। বিশ্বাস কর, তোমার সামনে আমি মিথ্যা বলতে পারি না। মুখে আসে না রাহুল!

—জানি।

—তাহলে তখন অমন করে বললে কেন?

—তুমিই তো বললে তুমি আমাকে ভালবাসনি!

—তাই বলেছি বুঝি! গলা ফের ধরে আসে মোহরের।

—ব্যক্তিগত কথাটা তাহলে বল, আমি চলে যাই। রাহুল বলে।

—আশ্রয় কবি পাবে, ললিতের দলে অথবা তিমিরের দলে। পাবে না?

—পাবে।

—তাই কি ভাল হবে রাহুল! চাইলে সে একটা চাকরি......

—হ্যাঁ, গ্রিন রেভ্যলুসনের মারফত চাকরির অনেক সুরাহা হয়েছে, হবেও, বিশদফার ঘোষণাও খুব জোরদার। রেডিওতে ইন্দিরা গান্ধীর রোজ ভাষণ শুনতে পাও না?

—চাকরির লোভে অনেকে তোমার দল থেকে ললিতের দলে গেছে। প্রাণ বাঁচাতেও গেছে। অনেক নেতাও চূড়ান্ত আপোস করেছে। আদিত্যদা আশ্রয় দিতে চাইলেই বুঝি নাক গলানো হয়! অন্তত তাঁর কাছে থাকলে কবি আর যাই হোক, বিপ্লবকে ঘৃণা করতে শিখবে না।

—বাঃ! এই তো বুলি, লাইক এ গুড ক্যাডার। কে বলে, মোহর রাজনীতি জানে না!

—সত্য বলার অনেক দোষ রাহুল, কখনও বা শোনাবে বউদির মত, কখনও মনে হবে আমি আর আমি নেই, জ্ঞান হয়েছে খুব। মেয়েরা বেশি জ্ঞানী হলে পুরুষরা তাকে আর ভালবাসতে পারে না, বউদি একদিন বলছিল। মেয়েদের নাকি একটু বোকা সেজে থাকতে হয়, তবেই ছেলেরা পছন্দ করে। বোকা আর কাঁচা। বউদি ওই কথা বলে কী হাসিই যে হাসল সেদিন!

—ছেলেদেরও খুব ইনটেলেকচুয়াল হওয়া চলে না মোহর, তাতে সুন্দরী বোকা মেয়েরা ভেগে পালায়। প্রেম করতে হলে বুদ্ধিকে লুকিয়ে রেখে চলতে হয়, তাতে রোমান্টিকতা বাড়ে, প্যাশন বাড়ে, একথা বলেছে মুমতাজ আলি। ওর ধারণা, বেশির ভাগ প্রেমই হচ্ছে কাঁচা পদার্থ বাজে ব্যাপার, ওটা থাকলে অনেক বিড়ম্বনা, ওটাকে নাকচ কর, ব্যস! জীবনটা তখন হল গিয়ে লায়লামজনু।

—ইস্! তুমি একেবারে যা তা। হাসাও বড়।

—কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত কথা!

এবার গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে গেল মোহর। ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল বটগাছের তলে।

রাহুল হঠাৎ বলল—আমি জলঙ্গীর বাস ধরব। তুমি বহরমপুর যাও। আজ দু'জনার দু'টি পথ ওগো দু'টি দিকে গেছে বেঁকে, ওই গানটা তোমার মনে আছে মোহর।

—বউদি বলেছিল, তুমি ঠিক আসবে আমার কাছে, এই তোমার আসা! কে তোমার কাছে গান শুনতে চাইছে।

—তুমি একটু বললেই কিন্তু আমি গাইতে পারি মোহর! মাথায় অনেক চাপ, তবু। কিন্তু ব্যক্তিগত কী যেন তুমি বলতে চাইলে। কবির ব্যাপারে বুঝি?

—হ্যাঁ। আদিত্যদার কাছে না গেলে তুমি ভুল করবে। উনি তোমাকে খুব পছন্দ করেন। কবি যদি না বাঁচে আমি তোমাকে দায়ী করব রাহুল ! আমাদের দু'টি পথ চিরকাল আলাদাই থেকে যাবে। এই আমার মনের কথা।

—সত্যিই তুমি খুব কাঁচা মোহর। প্রেমে নয়, রাজনীতিতে। কবির বাঁচা মরা নিয়ে তুমি কেন ভাববে ! তুমি তো ওর সঙ্গে প্রেম করনি ! তোমার অত চিন্তা কিসের !

—বাঃ ! চমৎকার !

—রাগছ কেন !

—কবির বুঝি কেউ তেমন থাকতে পারে না ?

—আমাদের এত অবিশ্বাস করছ কেন বুঝছি না, সত্যিই বুঝতে পারছি না। আমরা ছাড়া আছে কে ওর ? মা তো মর মর.........

—ওর আছে। ওর কিছু হলে চোখের পানি ফেলবার মতন কেউ আছে বইকি, তোমাদের দল কোনও দিন সেকথা জানতে পারবে না। ওকে পুলিস মরে গেছে ভেবে ফেলে দেয়, তা বলে তাকে বাঁচিয়ে তোলার মানুষ কি থাকতে পারে না ? বউদি থানায় চিরকুটে কবিকে গোপনে লিখে পাঠিয়েছেন, ইউ কান্ট সুইম। কেন ওকথা লেখে বউদি, কেন কবিকে বাঁচাতে চায়, এর উত্তর তো কেউ বলতে পারে না। একে বুঝি নাক গলানো বলে ?

—কবির কোনও প্রেমট্রেমও নেই, ও ওসব বোঝে না। হি ওনলি নোজ কমরেড সি এম।

—তাহলে তাকে এত সন্দেহ কেন ?

—ও কী বলেছে থানায়, আমরা জানব না ? কবির নিজেরই দায়িত্ব ছিল.......

—ওর দায়িত্ব কী ছিল বললে ? আমি মনে করি, ওর মরে যাওয়াই একমাত্র কাজ ছিল রাহুল। নাতাশাকে বারবার সেকথা বলেছে কবি। সেই সুরটা যদি শুনতে ......বলতে বলতে নাতাশার মত মেয়ে চোখের জল সামলাতে পারল না।

—বেশ। তাহলে আমিও তোমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদি। তাহলেই একমাত্র বুঝবে, আমি কবিকে ভালবাসি। ওর জীবনের দায় তোমার দলের নয় মোহর। কোথায় আছে বল, এখুনি আমার দেখা হওয়া দরকার। তোমার আর আমার পথ কোনও দিনই এক নয়, তোমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লব করতে চাও, আমার দল চায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব। ভালবাসার গান গেয়ে সেই পথ এক করা যায় না। আমি চললাম।

—দাঁড়াও, যেও না। প্লিজ যেও না তুমি ! মোহরের গলা হাহাকার করে উঠল। সেই আর্তনাদ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল রাহুল, বাসটা ধরল না আর, ছেড়ে চলে যেতে দিল। ওর উদ্বিগ্ন চোখের দিকে চেয়ে মোহর ভাবল, তোমার জীবনের কাছে ভালবাসা নামের কাঁচা পদার্থটির কোনও দাম নেই। তুমি কি সত্যি জানো কবিকে নিয়ে কী করবে, কোথায় রাখবে তাকে !

রাহুল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর চিন্তার মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল তার চোখ দু'টি।

হঠাৎ রাহুল আপন মনে বলে উঠল—এভাবে আর ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না।

—আমার বুঝি খুব দোষ হল ! মোহর স্বল্পস্ফুট গলায় বলে উঠল। একথা শুনে

চিন্তাব্যাপৃত চোখ দু'টি অন্যমনস্কভাবে মোহরের দিকে অপলক মেলে ধরে রাহুল।

—কবিকে নিয়ে যে এমন হবে ভাবিনি। রাহুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই কথার কী জবাব দেওয়া যায়, মোহরের আর মাথায় আসে না। রাহুলের চোখ দু'টি ক্রমশ মোহরের দিক থেকে সরে গিয়ে সুদূর দিগন্তের দিকে প্রসারিত হয়। আরও কী সব ভাবতে থাকে রাহুল।

বহরমপুরগামী একটি বাস এসে দাঁড়ায় ওখানে। রাহুল আশ্চর্যভাবে বাসের পাদানিতে চড়ে মোহরকে ডাকে—এসো।

বাস ফাঁকা ছিল তখন। বসবার জায়গা পায় রাহুল। মোহর মেয়েদের আসনে বসে কিছুটা অপরাধীর মত রাহুলের চোখে চায়। তখন রাহুল চোখ টেনে নিয়ে বাইরে দূর গাছপালার দিকে দৃষ্টি চালনা করে দেয়। সারাপথ একবারও সে আর মোহরকে দেখে না। মোহর কিন্তু দুই চোখ ভরে বিমুখ রাহুলকে দেখতে থাকে।

বাস থেকে নেমে রিকশায় চড়ে খাগড়ার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ রাহুল বলল—তোমার কাছে টাকা পয়সা কেমন আছে!

—আছে অল্পই। তোমার দরকার?

—না থাক।

—ঠিক আছে, দিচ্ছি তোমাকে।

মনিব্যাগ থেকে ছেচ্চলিশ টাকা মতন নানান ধরনের কাগজি মুদ্রা মোহর মুঠোয় করে এগিয়ে ধরে রাহুলের চোখের উপর। একটু দ্বিধার সঙ্গে টাকাগুলি নেয় রাহুল। তারপর বলে—এ আর শোধ হবে না কখনও। বলে মিষ্ট করে হাসে সে। এবং তার চোখদু'টি একটি ডাক্তারের চেম্বারের দিকে গিয়ে পড়ে।

—ডাক্তার মজুমদারের ভিজিট এখন কত জানো? মাত্র চার টাকা। এই লোকটা তিরিশ টাকা ভিজিটিং ফি নিত। আমরা ওটা ধমক দিয়ে নামিয়ে মাত্র চার টাকা করেছি। কিছু ডাক্তারকে প্রায় লাঠি মেরে জনসেবা শেখাতে হয়। দেশে সত্যিকার আন্দোলন না থাকলে মানুষ জীব হিসেবে খুব ছোট হয়ে যায়। আন্দোলনের চাপে রেখে কতক মানুষকে সিধে রাখতে না পারলে, মানুষ যে মহৎ প্রাণী প্রমাণ করা খুবই কঠিন হয়। কী বল, তুমি! ধর.......

মোহর বলল—তুমি রাত্রে কোথায় থাকবে?

রাহুল বলল—আমার কথা তুমি শুনলে না।

মোহর হেসে ফেলে বলল—ডাক্তার মজুমদার তো শুনেছেন!

রাতুল নিঃশব্দে হাসল।

ওরা দু'জনে পার্টি অফিসে এসে দেখে, অফিসের ছোট ঘরটি ভরে আছে। বউদি এবং বুলবনও রয়েছে সেখানে, সমির চৌধুরীও আছেন। প্রাণকিশোর, আদিত্য এবং অন্য আরও সব কারা, অনেককেই নেতৃস্থানীয় বলে মনে হয়। টেবিলের উপর শরৎচন্দ্রের আবক্ষ ছবির ছাপ আঁকা ধাতুর সুন্দর ব্যাজ কতকগুলি পড়ে রয়েছে।

রাহুল এবং মোহরকে দেখে ঘরের প্রত্যেকেই কেমন একটু নড়ে উঠল। আদিত্য সিংহ সপ্রশংস চোখে মোহরকে একবার দেখে নিয়েই বলল—তোমরা এদিকে এসো!

আদিত্য এবং প্রাণকিশোরের কাছাকাছি বেঞ্চের দিকে মোহর রাহুলকে নিয়ে যায়। এক মিনিট পর এই ঘরের মধ্যেই নাতাশা কবিকে সঙ্গে করে ঢুকে আসে। কবি যখন নাতাশার হাতে ভর করে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে এল, এক হাতে সে নাতাশাকে অবলম্বন

করেছে, অন্য হাতে একটা লাঠিই নির্ভর, তা দেখে রাহুল স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই অভাবিত দৃশ্যে চমকেই শুধু ওঠে না রাহুল, মুহূর্তে তার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। ওর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, বাস্তবিক কবির বাঁচার কথা ছিল না।

কবি এবং নাতাশা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কবির মুখ ম্লান হয়ে গেছে। নাতাশা রাহুলের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে পারছে না। রাহুল কিন্তু মনে মনে নাতাশাকে বলল, তুই বোন ভালই করেছিস, কিন্তু শেষে তোকেও আসতে হল। তুই মনেপ্রাণে রাজনীতি জিনিসটা ঠিক বোধহয় সহ্য করতে পারিস না। কিন্তু সময় তোকেও ছাড়ল না। দেশে আন্দোলন থাকলে ঘর আর বাহির আলাদা থাকে না।

প্রকাশ্য আন্দোলন নিষিদ্ধ হয়েছে, জরুরি অবস্থার দাপটে রাজনীতির প্রাণ চি চি করছে, ঘরের মানুষ ঘরে আছে, বামপন্থী আন্দোলনের শৈত্যপ্রবাহ চলেছে, ঘরের কপাট রুদ্ধ, বড়জোর মানুষ শরৎ-সাহিত্য থেকে উদ্দীপনা লাভ করতে পারে, ঘর ঘরে আছে, বাহির বাইরে পড়ে রয়েছে, এই অবস্থায় নাতাশাকে দেখে রাহুলের হঠাৎ মনে হল, ঘর আর বার এক হয়ে গেছে একমাত্র তারই জীবনে। যদিও আজ নিজের তার ঘর নেই। বড়ই অসময় এখন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে মেঘ ছেয়ে রয়েছে, গুমোট, বৃষ্টি হয় না দিনে, শুধু হঠাৎ গভীর শীত নেমে এসে রাত্রে একটা তীব্র হাওয়া বইয়ে দেয়।

আন্দোলন কোথাও নেই, কিন্তু প্রশাসন ঘুমাতে পারছে না। দেশমাতৃকার দেহ নিস্পন্দ কিন্তু গর্ভে যেন দাপিয়ে উঠছে একটি ভ্রূণ, যাকে গর্ভেই হত্যা করার জন্য তৎপরতার শেষ নেই। মাঝে মাঝে সেই গর্ভস্থ প্রাণপিণ্ড অসম্ভব মৃতবৎ লাগে, যেন নেই, ফের আচমকা নড়ে ওঠে।

কবিকে দেখে মায়া লাগছিল রাহুলের, বড়ই মায়া। অকারণ হৃদয়ে কী একটা শান্ত স্নেহময় অনুভূতি হচ্ছিল, কবির বেঁচে থাকার কথা ছিল না, মৃত্যু ছাড়া আর কোনও কথা ছিল না ওর জীবনে, ভাবলে, অন্তরে একটি হিম পদার্থ যেন চুঁইয়ে নামছে মনে হয়, শরীর অবধি সিরসির করে। ওর হাতের লাঠি, নাতাশাকে অবলম্বন করে হাঁটাচলা, দৈহিক এই অক্ষমতা রাহুলকে গোপনে মৌনে বিচলিত করতে থাকে। তার একবার ইচ্ছে হয়, কবিকে সে একটুখানি স্পর্শ করে দেখে। রাহুলের চোখমুখ কেমন কোমল হয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে।

মানুষ বিস্ময়কর জীব, সেই বিস্ময় তার অন্তরের অনুভূতির ক্ষমতায়। আদিত্য সিংহ রাহুলের দিকে পরম আগ্রহে চেয়ে ছিল, সে অনুভব করতে চাইছিল রাহুলের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থার পরিচয়। সে কবিকে দেখছিল, বুঝে নিতে চাইছিল জীবনের মহৎ এক কুণ্ঠা কী করে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরেছে। দেখছিল নাতাশাকে আর অনুভব করছিল এই মমতাময়ী ক্ষুদ্র বালিকার অন্যের জীবনের প্রতি আগ্রহের রূপটাই বা কী সবল রূপে মুখের আদলে একটি স্নেহ উৎপন্ন করে চলেছে। ভারতবর্ষ অনেক কাল প্রকৃত বিপ্লববঞ্চিত ভূমি, কিন্তু বিপ্লব প্রয়াসে তার কখনও সোনার ছেলেমেয়ের অভাব হয়নি। আদিত্য ভাবছিল, প্রভূত রাজনৈতিক ব্যর্থতার মধ্যেও দেখতে চাইলে চক্ষু সার্থক করার মত ঘটনা দেখা যায় বইকি!

আদিত্যর চোখ গিয়ে বুলবনের উপর পড়তেই বুলবন এক অদ্ভুত সংকোচে, যেন অপরাধীর মত দৃষ্টি নামিয়ে নিল। আদিত্য এখন তাকেও অনুভব করতে পারে। প্রায় একই রকমভাবে চন্দ্রিমাও দৃষ্টি নুইয়ে নেয়, রাহুলের দিকে চোখ তুলতে পারছে না দোলন— আদিত্য বোঝে। কোথায় যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল হৃদয়ের বাধা তৈরি

হয়েছে ! ভেবে একটা ছোট শ্বাস দীর্ঘশ্বাসের কায়দায় ত্যাগ করে আদিত্য সিংহ।

আদিত্য ভাবতে পারেনি, এভাবে রাহুল উপস্থিত হবে। বাস্তবিক তাকে ধরে আনতে পারবে মোহর। এবং একই দিনে কবি আর রাহুল এভাবে মুখোমুখি হবে। সমির মামা নির্দেশমত কাজ করেছেন। প্রাণকিশোর তাঁকে জেলা অফিসে কবিকে উপস্থিত করার জন্য বলেন, কারণ কবির সঙ্গে কথা বলা দরকার। অপর পক্ষে মোহরও রাহুলকে এনে কর্তব্যই করেছে। কিন্তু এ সমাবেশ যথার্থ হয়েছে কিনা আদিত্য বুঝতে পারছে না। কবি এবং রাহুল পৃথকভাবে পৃথক সময়ে উপস্থিত হলে কথা বলার সুবিধা ছিল। এদের দেখা হয়ে যাওয়া হয়ত ঠিক হল না।

প্রাণকিশোর রাহুলকে দেখছিলেন এক মনে, তারপর কবির দিকেও অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। ধুতির কোঁচা হাতের মুঠোয় ধরে, উঠে দাঁড়িয়ে সেটি পাঞ্জাবির পাশের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন— আজ এখানে আমরা কালচারাল প্রোগ্রামের ব্যাপারে মিটিং ডেকেছি, কতক ইমপর্টেন্ট কমরেড এসেছে, পরে হয়ত আরও দু'চারজন আসবে। তার আগে, মূল মিটিং শুরু হওয়ার আগে কমরেড আদিত্যর অন্য একটু কাজ আছে। এসো আদিত্য আমরা বরং ওদিকের ঘরে গিয়ে বসি, কমরেডরা ততক্ষণ এখানেই থাকবে, মৃণাল ওদের সঙ্গে ডি-ডি-ডিসকাস করুক, আমরা বেশি টাইম নেব না। আচ্ছা, ঠিক আছে, নাতাশা কবিকে সঙ্গে করে ও ঘরে আসুক, কী বল আদিত্য ?

আদিত্য নিজেও এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। সমির চৌধুরীর দিকে চেয়ে দেখে বলে— মামাও আমাদের সঙ্গে আসুন তাহলে ! বলে একটু ঝুঁকে রাহুলের গায়ে হাত দিয়ে আলতো স্পর্শ করে আদিত্য। তার চমৎকার মিষ্ট হাসিটি হাসে আদিত্য, সে হাসি যেমন পবিত্র দেখায় তেমনি বুদ্ধির আলোও যেন খেলে ওঠে।

আদিত্য হাতের একটু চাপ দেয় রাহুলের কাঁধে। বলে ওঠে—এক্ষুনি আমি আসব, তোমার সঙ্গে কথা হবে। তুমি বসো, বিরক্ত হবে না কিন্তু।

রাহুল এক মুহূর্ত দেরি না করে বলে— কবির সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দিন আদিত্যদা, আমি চলে যাব।

আদিত্য বলল— আচ্ছা, আচ্ছা ! আগে আমরা একটু কবির সঙ্গে কথা বলে নিই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমরা কবির কোনও অনিষ্ট করব না। ও চাইলে নিশ্চয় তুমি কথা বলবে !

—দেখুন আদিত্যদা, কবি না চাইলেও আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, ওকে বলুন সেকথা !

—নিশ্চয় বলব। বলেই অত্যন্ত দ্রুত আদিত্য স্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে আসে। নাতাশা কবিকে সঙ্গে করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—তাশা, তুই আমাকে চিনতে পারছিস, আমি রাহুল ! রাহুলের এই উচ্চারণে নাতাশার উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি একটু কেঁপে আরও সিধে হয়ে যায়, ওর চোখে কিসের একটা বিস্ময়ব্যথা জড়ানো চাপা ভয় চমকে ওঠে। রাহুলকে সে দৃষ্টি ঈষৎ বাঁকা করে চেয়ে দেখে।

—তোর সঙ্গে আমার কথা আছে ! বলে উঠল রাহুল।

নাতাশা এক ধাপ এগিয়েছিল কবিকে সঙ্গে করে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে জবাব করে ওঠার আগেই কবি কাঁপাস্বরে বলল— তোমার সঙ্গে কথা আমার শেষ হয়নি রাহুল ! তুমি যেও না।

নাতাশা কবিকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

নাতাশা এবং কবি বেরিয়ে চলে গেলে রাহুল ঘরের বিভিন্ন মুখের দিকে চেয়ে দেখে এবং তার নিজেকে বোকা মনে হতে থাকে। নিজেকে অসম্ভব একাও মনে হতে থাকে। বউদির চোখে চোখ পড়ে, চন্দ্রিমা চোখ টেনে নিয়ে নত করে দৃষ্টি। বুলবন কিছুতেই চোখ তুলছে না তার দিকে, বুলবন এক কোণে মেঝেয় পাতা মাদুরের উপর বসে আছে, অন্য এক কোণের দিকে দু'জন মেয়ের সঙ্গে বসে রয়েছে চন্দ্রিমা।

রাহুল বউদির মস্তিষ্ক লক্ষ্য করে বলল— তোমরা কেউ আমায় চিনতে পারছ না দেখছি! ভাবতেই পারছি না, তুমি আমার হিস্ট্রির নোট লিখে দিতে, আর বুলবন ছিল আমার বন্ধু। আদর্শ আলাদা হলে বন্ধুত্ব টেঁকে না বলে শুনেছি। লক্ষ্য এক, পথ আলাদা। তাইতেই আমরা এত পর হয়ে গেলাম! বলতে বলতে মোহরের দিকে চোখ ফেরায় রাহুল। মোহরও মাথা নীচু করে নেয়। রাহুল এবার নিজেকে অদ্ভুত কাহিল অবস্থায় নিঃশব্দে একটু বাঁকা করে হাসিয়ে তোলে। সেই হাসি দেখে চন্দ্রিমার বুকটা মোচড়াতে থাকে, এমনই পর হয়ে যাওয়ার কথা বুলবনও একদা বলেছিল। আজ কেউ তারা আর আপন নেই। কবিও কি রাহুলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! হঠাৎ চন্দ্রিমার মনে হল, কবিকে রাহুলের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত! আদিত্য সিংহ কী করবে বোঝা যাচ্ছে না।

রাহুল কেমন শঙ্কিত চোখে সকলকে দেখছিল, কাউকেই যেন সে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। প্রাণকিশোর এবং আদিত্য চলে যাওয়ার পর প্রধান চেয়ারটিতে এসে বসেছে একজন। কথা বলবার জন্যই বসেছে। ওর চোখমুখ দেখে রাহুল অনুভব করল, এই ঘরের সকলেই তার মুখ থেকে প্রোগ্রামের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, অবশ্য আদিত্যই প্রকৃতপক্ষে এই মিটিং পরিচালনা করবে।

রাহুল বলল—মৃণাল আপনি শুরু করুন, আমি বাইরে ছাদে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আপনি কথা না বলতে পেরে মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছেন এতক্ষণে। শুরু করুন।

এই কথায় ঘরের প্রায় সকলেই সশব্দে হেসে উঠল। কে একজন হাসতে হাসতেই 'আরে না না, আপনি বসুন ভাই' বলে উঠল এবং হাসতে লাগল। মৃণালও না হেসে পারল না। তবু রাহুল কিছুক্ষণ বসার পর একা ছাদে চলে আসে।

সন্ধ্যা হয়ে এল ধীরে ধীরে। একা ছাদের উপর ছটফট করতে থাকল রাহুল। ভেবেছিল, কবিকে সঙ্গে করে এখনই সে ডাক্তার বিশ্বরঞ্জনের কাছে গিয়ে উঠবে। একটা কাজ করে দেখাতে পারবে। কদম নয় কবি— কবিকে টুঁড়ে বার করাটাই তার কর্তব্য নির্দেশ করেছেন ডাক্তারদা।

অন্ধকার নামছে ঘোর হয়ে। সিঁড়ির দিকে চাইল রাহুল। হঠাৎ চোখে পড়ল ওরা নেমে চলে যাচ্ছে, কবি, নাতাশা, মামা এবং প্রাণকিশোর। সিঁড়ির মুখের কাছে এসে থেমে পড়ল আদিত্য সিংহ। মনে হচ্ছে, সবই গোলমাল হয়ে গেল। হালকা ওই আঁধারে রাহুলকে দেখতে পেয়েছে আদিত্য, সিঁড়ির মুখ ছেড়ে রাহুলের কাছে আসে।

বলল— আরও দুটো দিন তোমার কাছে সময় চাইছি আমরা। কবি তার সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি। এখনও অসুস্থ। ফলে...

—ফলাফল স্থির হল না বলছেন আদিত্যদা! আপনি কিন্তু আমার দলের ক্ষতি করছেন জেনে রাখুন। কবিকে ছেড়ে দিন। ওর বাঁচা মরার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। এ বোধহয় ঠিক হবে না যে, আমরা দলবেঁধে এসে জোর করে ওকে তুলে নিয়ে যাই!

—না। ঠিক হবে না। বিকজ, আমরা ওকে আটকে রাখিনি।

—রেখেছেন!

—রেখেই যদি থাকি, শেকল পরিয়ে রাখিনি রাহুল।

—ভয় দেখিয়েছেন! প্রাণের ভয় দেখিয়ে কোনও কাউকে বিপ্লবের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, আর যাই হোক, আপনার দলের কাছে আশা করিনি। কবি ইজ মাই কমরেড।

—কবি আজ সেকথা বলছে না।

—আপনি তাকে বলতে দিচ্ছেন না! ওর কাছে আমাদের গোপন তথ্য এবং টাকাপয়সা আছে, অস্ত্র আছে এমনকি শুনে রাখুন, জলগেটের চাবি আছে ওর কাছে। কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না। অলরাইট, আপনি একবার মোহরকে ডেকে দিন। ওই যে বললাম, চাবি, ওটা কবি সংগ্রহ করেনি আর ওটা শুধু চাবিও নয়। আপনি রাজনীতি জিনিসটা বোঝেন। আপনি মোহরকে ডেকে দেবেন না? ঠিক আছে, এই টাকাগুলো ওর হাতে দিয়ে দেবেন। বলবেন আমি চলে গেছি। ব্যস!

—ব্যস! এইভাবেই কি সব শেষ হয়ে যায় রাহুল! দাঁড়াও মোহরকে ডেকে দিচ্ছি। যা দেবার ওর হাতেই দেবে। বলে আদিত্য অফিসের ছোট ঘরটির দিকে এগিয়ে যায়। মোহর আসে ছাদে। রাহুল নেই। কী একটা পায়ে ঠেকে মোহরের। ঝুঁকে নামে সে। হাত বাড়িয়ে তোলে টাকাগুলি বেঁধে দেওয়া তারই রুমালখানি, যা সে রাহুলকে যত্ন করে হাতে গুঁজে দিয়েছিল। শুধু টাকাই নয়, রুমালটাও। রাহুল ছুঁড়ে ফেলে চলে গেছে।

সব রাগ এসে আমার ওপর পড়ল তোমার! অন্ধকারে একথা ভেবে মোহরের চোখ ভিজে উঠল।

॥৩৬॥

নাতাশা ঠিক যা ভেবেছিল, ঘটনা সেই রকমই ঘটে গেল। এক ভোরবেলা রাহুল এসে উপস্থিত হল তার কাছে। বলল— কবি কোথায় তাশা! যথেষ্ট হয়রানি হয়েছে, এবার ছেড়ে দে।

নাতাশা বলল— আমি তোকে দেব কী করে রাহুল, ওকে কি তুই আমার কাছে রেখে গেছিস! আমি কবিকে কুড়িয়ে পেয়েছি, মামা এনেছিলেন। আদিত্যদা না চাইলে দিতে পারি না। ওকে কোথায় নিয়ে যাবি এখন?

রাহুল বলল— কবি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, কথা আমাদের শেষ হয়নি তাশা।

নাতাশা বলল— কবি বাড়ি ফিরতে চাইছে, ও আর রাজনীতি করবে না। যদি করে বউদির পার্টি করবে। আদিত্যদার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

রাহুল বলল— ওই কথাগুলো আমি কবির মুখেই শুনতে চাই। আমি শুধু জানতে চাইব প্রকাশ্যবাদীদের দলে কেন কবি আশ্রয় নিতে চাইছে। বুকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আগলে রেখে রাজনীতি করার শখ কি মিটে গেল! বন্দুকটা কোথায়? ওটা ওর উদ্ধার করার কথা!

নাতাশা চুপ করে আছে দেখে অত্যন্ত বিপন্ন গলায় রাহুল বলল— কবি বলে দিক,

জলগেটের চাবি কোথায় রেখেছে ? আমি আর কিছুই বলব না, চলে যাব ! প্লিজ নাতাশা ! আমার দিকটাও ভেবে দেখতে হবে তোকে।

দুপুর হয়েছে। বাইরে চড়া রোদ। গলগল করে ঘামছিল রাহুল। ভাইয়ের মুখে চেয়ে দেখে নাতাশার বুকটা দরদে টনটন করছিল। কী এক আশ্চর্য সংকটে পড়েছে রাহুল, রাজনীতি তাকে কি রকম বিজড়িত করেছে পাকে পাকে, অদ্ভুত বিপন্ন করেছে।

অপর পক্ষে কবির বিপন্নতা সীমা হারিয়েছে, জীবন এবং রাজনীতি সম্পর্কে সে কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারছে না। একটা কথা শুধু বোঝা যায়, কবি বাঁচতে চাইছে। কালই তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। আদিত্যদা নাতাশাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, কবিকে সঙ্গে করে কাল অতি প্রত্যূষের বাস ধরে বহরমপুর পার্টি অফিসে পৌঁছাতে হবে। কবি এখন রাহুলের দলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক চায় না। এখন থেকে কমরেড
সি.এম নয় কমরেড জি.এস-এর রাজনীতিই কবির রাজনীতি। বাড়ি ফিরে গিয়ে কবি কাজ শুরু করবে। আদিত্যদা এত কথা লিখে জানিয়েছে এই জন্যে যে, পাছে রাহুল এসে কবিকে না ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ! নাতাশা আদিত্যদার চিঠির সেই রকমই একটা অর্থ করতে পারে।

নাতাশা বলল— কবির কাছে কোনও চাবি নেই রাহুল।

রাহুল বলল— কাছে না থাকলে থানায় জমা দিয়েছে কিনা জানা দরকার। তা যদি করে, মাহেফরাসদের সব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে নাতাশা !

—ঠিক আছে, কাল একবার আয়। আমি বলব তোকে !

—কী বলবি তাশা !

—কবির কোনও ক্ষতি করবি না তো !

—এই একটা কথা মোহরও বলে। কেন বলে বুঝতে পারি না !

—ও যদি সত্যিই থানায় চাবি জমা দিয়ে থাকে !

—এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নেই নাতাশা !

—মেরে ফেলবি !

—জানি না। কবিকে ছেড়ে দে তুই ! এ রকম করলে সমস্ত জীবনের মত তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে।

—তোর আজকাল আর কারুকেই অপমান করতে আটকায় না। মোহরের দেওয়া টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাল করিসনি। তুই একা এভাবে বাঁচতে পারবি রাহুল ! বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে পারিস না।

—ব্যক্তিগত উদ্যোগের রাজনীতি নাতাশা ; কমরেড সি.এম.-এর বুকের সাহস আমার ভরসা। তুই বোন হয়েও আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিস, জানি, এই রকমই হবে। তা বলে আমি থামব না।

—সাদা চৌধুরীর কী হবে রাহুল ?

এবারে হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল রাহুল। নাতাশা বলল— মানুষ না চাইলে তুই পারবি না, কিছুতেই পারবি না।

রাহুল বলল— ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং যেদিন চেষ্টা করেছিলেন, মানুষ সেদিন চাইছে, কি চাইছে না তাঁরা ভাবেননি। ঠিক আছে, তাহলে তুই দিবি না ? বলেই রাহুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং বলল— মানুষ চাইছে কি না প্রণামপুরে সেই প্রমাণ আছে নাতাশা। চলি তাহলে। এভাবে কবির সঙ্গে কথা বলতে না দিয়ে মোটেও ভাল কাজ

করলিনে, উপকার দূরে থাক, অনেক ক্ষতি করছিস আমাদের ! অন্তত তোর কাছে থেকে এই ব্যবহার ভাবতে পারি না।

—দাঁড়া রাহুল !

সদর দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল রাহুল, মামি কী একটা খাবার থালায় সাজিয়ে নিয়ে ঢাকনা ঢেকে রান্নাঘর থেকে এদিকে আসছিলেন, তিনি থতিয়ে গেলেন। নাতাশা রাহুলকে সঙ্গে করে কোথায় চলে যাচ্ছে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মামি। মামা বাড়ি নেই। ছেলেরা বাইরে। মামার সব ছেলে। মেয়ে নেই। চাকর-কিষেনরা কাজে গেছে। বাড়ি অত্যন্ত নির্জন ছিল। দু'জন কাজের মেয়ে বড় কুলোয় করে খন্দশস্য ঝাড়ছিল, তারা ঘোমটা টেনে কাজ করছে, ধুলায় মাখামাখি অবস্থা, রাহুল চলে যাচ্ছে বলে ওদের হাত থেমে পড়েছে। ঘোমটার আড়াল থেকে চোরাচোখে এদিকে দেখছে ওরা।

মামি অত্যন্ত কম কথা বলা মেয়ে, হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে যান, কথাই আসে না মুখে। উনি দাঁড়িয়েই রইলেন। রাহুল আর নাতাশা বাইরে বেরিয়ে এল। কিছু দূর হেঁটে আসার পর নাতাশা বলল— তোকে আমি একটা গোপন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি রাহুল ! কথা দে, এই জায়গাটার কথা তোর দল কখনও জানবে না। যদি দরকার হয়, এখানে তুই একদিন আত্মগোপন করতে পারবি। বলে ভাইয়ের মুখের দিকে চাইল নাতাশা।

রাহুল শুধালো— কোথায় যাচ্ছি আমরা !

নাতাশা বলল— গেলেই বুঝতে পারবি ! লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

—কী করে খুঁজে পেয়েছিস ?

—ভেবে ভেবে। কবি যে বেঁচে উঠবে ভাবতেই পারিনি। একটা অত্যন্ত মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা অসম্ভব কাজ। ও প্রায়ই বলত, আমি বাঁচব তো নাতাশা ! সুস্থ হওয়ার পর একদিন বলল, আমাকে বাঁচালে কেন নাতাশা ! ওর কী কষ্ট রাহুল, তুই বুঝবি না !

রাহুল কী বলবে বুঝে পেল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। আরও কিছু দূর আসার পর মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল ভাইবোন।,

নাতাশা সহসা বলল— মণিকে তুই বাঁচিয়েছিলি রাহুল, মনে আছে ? কাউকে বাঁচাতে পারলে আনন্দ হয় না তোর। যদি কেউ বাঁচার চেষ্টায় তোর হাত জড়িয়ে ধরে তুই কী করবি ?

রাহুল বলল— তোর মনের অবস্থা বুঝি নাতাশা ! মোহর বলেছে, কবির জন্যও চোখের জল ফেলবার লোক আছে।

নাতাশা বলল— ওর মা হয়তো আর বেঁচে নেই। আমি রাজনীতি বুঝি না, মানুষ বুঝি ! বাবাও একজন মানুষ, কবি কেবলই সাদা চৌধুরীর কথা বলে। ওর সেবা করতে করতে অনেক পড়াশুনোর কামাই করেছি। মনে হত, আব্বাও তো এমনই কষ্টে আছেন।

—বাপু ঠিক ফিরে আসবে নাতাশা !

—কবিকেও ফিরে যেতে দে।

—তাই হবে।

—তুই পারবি তো !

—কেউ ফিরতে চাইলে তাকে আটকানো যায় নাতাশা !

—বাবু কেন ফেরেন না ? কবি চাইলেই কি ফিরতে পারে ? শোন্ ! শুধু কথা বলেই কিন্তু তোকে চলে যেতে হবে। দলকে গিয়ে কী বলবি তুই ?

—সে আমি বুঝব।

—মনে হচ্ছে, তুই ভেবেও দেখিসনি। আমার কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় হয়ে এল রাহুল। তোর লেখাপড়ার কী হবে ?

—জানি না। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাহুল। তারপর বলে— ভাবছি, একদিন হস্টেলে যাব। কলেজটাও ঘুরে আসব। ডাক্তারদা হঠাৎ আমাকে কলেজে যোগাযোগ রাখতে বলেছেন। কেন বললেন, বুঝলাম না।

—আচ্ছা ! এমারজেন্সি কতদিন চলবে আর ?

—জানি না রে। পা চালিয়ে নাতাশা !

—হ্যাঁ। বলে দ্রুত হাঁটতে থাকল রাহুলকে সঙ্গে করে নাতাশা। হাঁটতে হাঁটতে বারবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল রাহুল। মণিকে বাঁচানোর প্রসঙ্গ তোলাতেই মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গেছে, কবিকে বাঁচাতে পেরে নাতাশার মনের আনন্দ যে কত খাঁটি, বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার এই লক্ষ্মী বোনটি ভারি স্নেহময়ী, ওর আনন্দ যেন সত্য হয়। কবিকে বাঁচাতে হবে সঠিক আত্মত্যাগের জন্যই। নাতাশাকে আর আত্মত্যাগের কথা বলা যায় না। অন্যের আত্মত্যাগকেও মানুষ ভয় পায়, প্রাণকে মানুষ এতই ভালবাসে, শুধু নিজের প্রাণই নয়, অন্যের প্রাণটিও তার ভালবাসার সামগ্রী। আচ্ছা, এই বোনটি কবিকে ভালবেসে ফেলেনি তো !

নিজের ভাবনার মধ্যেই রাহুল চমকে উঠল।

নাতাশা বলল— কাল ভোরে আদিত্যদার পার্টি-অফিসে যাবি। ওখানে কবিকে নিয়ে যাব। কবি কার জানি না রাহুল ! আদিত্যদা আর তুই বোঝাপড়া করবি। তার আগে তোকে একটা চান্স করে দিচ্ছি, মামা জানতে পারলে খেয়ে ফেলবে। মণি কেমন আছে রে ! ওর সঙ্গে তো তোর যোগাযোগ আছে !

—একটু আধটু।

—কদম আলির কী হয়েছে ? বলবি না ? সেদিন বহরমপুর পার্টি অফিসে ওর কথা উঠেছিল।

—ও একটা লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট। ওর কথা কী শুনবি ! এখন ও ভয়ঙ্কর নামাজী।

—বাপুকে ওই-ই ধরিয়ে দিয়েছিল ! থানা ওকে পোষে ? সত্যিই পোষে ?

—জানি না ঠিক।

—তুই যেন কথা বলতেই চাইছিস না !

—আচ্ছা, মোহর কি খুবই রাগ করেছে নাতাশা ?

—খুব।

—কাঁদছিল ?

—যদি বলি হ্যাঁ, কী করবি তাহলে ! চোখের পানি মুছিয়ে দিবি ? সময় আছে তোর ! তুই যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বউদিও বলে। বউদির জ্যাঠার ছেলে মন্মথ নাকি ঠিক তোর মত ছিল।

চৌদ্দবিঘায় এল ওরা। চারিদিকে দিগন্তছোঁয়া শস্যভূমি, এত তার বিস্তার যে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শস্যগন্ধে নেশা লেগে যায়। ফাঁকা এই মাঠে

অত্যন্ত নির্জন এই মাটির বাড়িটার চারধার আম, জাম, কাঁঠাল, নিম, জিয়ালা, বাবলা গাছঘেরা ; দূর থেকে গাছপালা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। রাখালবাগালরা রাত্রে এখানে থেকে শস্য পাহারা দেয় কখনও কখনও। মাটির দালান, চাল ছাওয়া।

ভিতরে এমন একটা কুঠুরি আছে যে সহজে জায়গাটা চোখে পড়ে না, মনে হয় ওটা একটা মাটির দেওয়াল মাত্র। মাটিরই অত্যন্ত ছোট জানলার খোপের মত ঢোকার পথ, দেওয়ালে এমন করে লেগে রয়েছে যে, পথ তা বোঝার একফোঁটা উপায় নেই। একটা কাঠের লম্বা চাবি লাগিয়ে ছিদ্রে ঢুকিয়ে টেনে ছোটপথের মাটির পাল্লা আলগা করে সরিয়ে একপাশে রাখলে পথ পাওয়া যায়। তাই করল নাতাশা।

ভিতরে ঢুকে অদ্ভুত লাগল। দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট ঘুলঘুলি। তাই দিয়ে বাতাস এবং আলো ঢুকে আসছে। মেঝেটি আসলে একটি মজবুত বাঁশের মাচা, চারদিকের দেওয়ালে মাঁচার বাঁশগুলি ঢোকানো, মাচাটি শূন্যে ঝুলে আছে। এই মাচার অস্তিত্ব এতই গোপন ! একবার একজন কিষেনকে, যে কিনা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ফেরার হয়ে গিয়েছিল, তাকে বাঁচাবার জন্য সমির চৌধুরী এই ঘরটা বানিয়েছিলেন, সে এখানে থাকত। চৌধুরীমামার অদ্ভুত সব পরিকল্পনা মাথায় আসে।

পরে সেই ফেরারি একদিন এই ঘরে বসে এনড্রিন খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। রাখাল-কিষেনরা অনেক দেরিতে জানতে পারে, মৃতদেহের গন্ধে গাছের ডালে এসে শকুন বসেছিল, শেয়াল এসে রাত্রে হাউহাউ করত। এখানে আশ্রয় পেয়েছে কবি।

কিন্তু নাতাশার মুখে এই গোপনতম কক্ষটির ইতিহাস শুনে রাহুলের বুকের ভেতরটা কেমন ধক করে উঠল। মৃত্যু এবং ভয়াবহ মৃত্যু অধ্যুষিত এই কক্ষে কী করে কবি রাত কাটায় ! মানুষ কি তার প্রাণটিকে এতই ভালবাসে ! এতই যদি বাসে, তাহলে সেই প্রাণটিকে বিপ্লবের জন্য ত্যাগই বা করে কেন ?

ঘরের মধ্যে কবিকে দেখতে পেল না নাতাশা। অবাক লাগে, একটি চাবি কবির কাছে রয়েছে, বন্ধ দেখে নাতাশা ভাবে, বাইরে কোথাও নিশ্চয়ই বেরিয়েছে, নাতাশা অন্য চাবিটি দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু অবাক লাগল, কবির জামাকাপড় বলতে নতুন তোয়ের করা পাজামা-পঞ্জাবি নেই, তোয়ালে এবং লুঙ্গি নেই। সাবানের বাক্স, টুথ ব্রাশ, টিউব-পেস্ট, কিছুই চোখে পড়ছে না।

কবি চলে গেছে। দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে একটা সাদা কাগজে লিখে, সেটা সেঁটে রেখে গেছে বাবলা আঠায়, চললাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না। বড় বাবলার কোটরে চাবি রেখে গেলাম। তোমাকে ভুলব না নাতাশা, আদিত্যদাকেও আর বিড়ম্বিত করতে চাই না। জীবন আমার, তার ব্যবহারও আমিই করব। মনে থাকবে তোমাকে।

রাহুল দেওয়ালে সাঁটা অক্ষরগুলি পড়তে পড়তে মনের মধ্যে কেমন একটা তোলপাড় করা অনুভূতি অনুভব করে। নাতাশা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে।

—তুই কাঁদছিস কেন তাশা !

—জীবনটা শুধু ওর কে বলেছে ওকে ! তুই বল্ রাহুল, তোরা কি এইভাবে শেষ হয়ে যাবি !

বোনের এই অশ্রু-ব্যথিত প্রশ্নের কোনও জবাব না করে দ্রুত বাইরে বার হয়ে চলে এল। তারপর প্রবল বেগে একা ঊর্ধ্বনিঃশ্বাসে ছুটে চলল পাগলের মত ; রাহুল আর পিছনে ফিরেও দেখল না।

জীবনটা শুধু ওর, কে বলেছে ওকে ! এই একটি আর্ত প্রশ্ন ক্রমশ এক সুতীব্র ব্যথায়

বুকটিকে বেঁধাতে থাকে, দিশেহারা লাগে রাহুলের। এই প্রশ্নটি আপনা থেকে বুকের নিঃশ্বাস ঠেলে বার হয়ে এসেছে নাতাশার, গভীর এক মমতা জড়িয়ে ধরেছে তার জিজ্ঞাসার অতল অন্তরকে। মমতা শুধু নয়, কোনও নির্মল ভালবাসাও উচ্চকিত হয়েছে নাতাশার গলায়। কবির মতন ধারালো অথচ কোমল এবং অনিশ্চিত এক অস্তিত্বকেও ভালবাসার কেউ যে থেকে যায়, তাই বড় আশ্চর্যের ঘটনা।

নাতাশা তার আবেগকে রোধ করতে পারেনি। যে মেয়ে সহজে কাঁদতে চায় না, তারও চোখে জল এসে পড়ে। কবি আদিত্যদার আকর্ষণকেও গ্রাহ্য করল না, নাতাশার অস্ফুট প্রেমও তাকে বাঁধতে পারেনি। বা এইসব বাঁধনের চেয়েও কোনও বড় আকর্ষণ কি কোথাও তার রয়েছে ? বা সে জানেই না, কী করবে এখন, কিন্তু জীবনের একটা নিজস্ব ব্যবহার সে করবে, কিন্তু কিভাবে ? রাহুল এখন কোথায় খুঁজবে তাকে ?

রাহুলের মনে প্রশ্ন জাগছে, অতএব কী ? কবির কাছে রয়েছে জলগেটের চাবি, সে এমন করল কেন ? থানা যখন তাকে মৃত ভেবে বা মরে যাবে ভেবে চুনাখানির পার্কে ঝোপের আড়ালে গুঁজড়ে ফেলে চলে গেল, তারপর চেতনা ফিরলেই কি কবি বদলে যায় কোনওভাবে ! সে কি আন্দোলন-বিমুখ হয়ে পড়ে ? নাতাশার শুশ্রূষা কি কবিকে গেরস্ত বানিয়ে তুলেছে ! তার কাছে কি তার রাজনৈতিক আদর্শ তুচ্ছ হয়ে গেছে ? বহরমপুর পার্টি অফিসে শুধু সে বলেছে, এখনও রাহুলের সঙ্গে তার কথা শেষ হয়নি। কবির শেষ কথাটা কী ?

রাহুল গোকুলদানা গ্রামে পৌঁছলো রাত্রি ন'টার পর। আরও একটি আকস্মিক জীবন-ঝটিকা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। অত কঠিন পাহারা সত্ত্বেও তাহাজুদ নামাজ পড়তে পড়তে আচম্বিত তৎপরতায় কদম আলি কুতুব খাঁকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, পরিশ্রান্ত কুতুবের চোখ এক ফাঁকে ঘুম জুড়ে এসেছিল বোধ হয়।

রাহুল ঘটনার এই নাগালহারা আকস্মিকতায় আপন মনেই হেসে ফেলল। কদম এবং কবি কাউকেই বোধ হয় সে রক্ষা করতে পারল না। হেসে ফেলল এবং হতাশ হয়ে বসে পড়ল কুতুবের মাটির দাওয়ায়। থানা শেষ মারটি দিল বড়ই অদ্ভুত !

রাহুল ভাবল, সে আর প্রণামপুর যাবে না। সমস্ত ঘটনা ডাক্তারদা এবং মুমতাজকে জানানো দরকার। মণিকে পেলে খুব ভাল হত ! গোকুলদানা থেকে তিনদিন পর বুদ্ধি স্থির করে টানা হেঁটে রাতারাতি মোহড়ায় সে পৌঁছায় বারোবিঘার জমিতে, যেখানে মণি মাঠ পাহারা দেয়।

রাত তখন বারোটা। মণিকে চুপিচুপি ডাকল রাহুল। এক ডাকেই সাড়া দিল মণি। মণি জেগেই ছিল। রাহুলের কণ্ঠস্বর সে চিনতে পেরেছে। রাহুল মনে মনে ভাবছিল, আর কত ছুটে বেড়াব এভাবে ?

রাহুল বলল— প্রণামপুরে গিয়ে হরবোলাকে একটা খবর দিতে পারবি ?

মণি বলল— খোদা করলে পারব। কিন্তু মন আমার ভাল নাই মেজভাই !

—কেন রে ?

—বউদি চলে গেছে !

—সেকি !

—হ্যাঁ। একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে তোমার জন্যে। পকেটে নিয়ে ঘুরচি।

—তুই পড়েছিস ?

—না।

রাহুল ভাবল, আর কত আকস্মিকতার বেগ তাকে সামলাতে হবে! কী যে ঘটে চলেছে, সে যেন আর বুঝতেই পারছে না।

মণি হঠাৎ বলল— কবি দাদাকে দেখেছি রাহুলভাই।

—কোথায়?

—তারক গাঙ্গুলির বাড়ি। লুকিয়ে আছে।

—কে বলল তোকে?

—খবর রাখি। মোসলেম ওই বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়ে দেখেছে। পোস্ট মাস্টারের বাড়িতে নাটা-ললিত আনাগোনা করছে হামেশা। কবিদাদা বিকিয়ে গিয়েছে রাহুলদাদা!

—নাহ্! এ হতে পারে না!

—তাই হবে বা! মোসলেম ফকির বলেছে, আন্দাজে!

—ঠিক আছে, বউদির চিঠিটা দে আমাকে!

—বাড়ি যাবা না? মা কাঁদছে, রাহুলভাই! নূপুর কাঁদে গো! বলে চাঁদের আলোয় নিঃশব্দ অশ্রু হাতের উল্টো পিঠে মুছে নেয় মণি। তারপর জামার পকেট থেকে বউদির লেখা দীর্ঘ একখানা চিঠি বার করে রাহুলের হাতে তুলে দেয়।

রাহুল চিঠি হাতে নেয়, চাঁদের আলোয় পড়া যাবে না, তাছাড়া তেলের অভাবে মণির লণ্ঠন নিবে গেছে, অতএব বুক-পকেটে চিঠিটা রাখে। একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে বলে— হরবোলাকে বলবি, ডাক্তারদা ডেকেছে। ব্যস! ভোররাতে ডোঙা করে চলে যাবি। আমি চললাম!

—মায়ের সাথে কথা কইবা না?

—না মণি! যাব না রে! বলে রাস্তায় নেমে যায় রাহুল।

বউদি শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না। এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কী ঘটনা হল বুলবন আর চন্দ্রিমার মধ্যে, ভেবে উঠতে পারছিল না রাহুল। চাঁদের আলোয় সে হাঁটছিল, পকেটে বউদির চিঠি। সদরঘাটে না পৌঁছালে সে পাঠযোগ্য আলো পাবে না। বুকটা কেমন খালি হয়ে গিয়েছে। কবি বিকিয়ে গিয়েছে, বউদি গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, কদম উধাও, এতগুলি ঘটনার প্রচণ্ড চাপ রাহুলকে ছিন্নভিন্ন করে তুলছিল।

এই সময় তার কেবলই মোহরকে মনে পড়ছিল। এতভাবে ক্ষতবিক্ষত হওয়া এবং নিরন্তর এক গভীর বিপন্নতা তাকে ত্রস্ত ভারবাহী পশুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় এই সমস্ত ঘটনার কিনারা, সে জানে না। মোহরকে সে অহেতুক আঘাত করেছে, অথচ তারই কাছে যেতে ইচ্ছে করছে, কেন মনটা তাকেই চাইছে, বুঝে ওঠা কঠিন। ওর কমনীয়, অত্যন্ত সজীব, মুখটা এবং মেহেদি রাঙানো হাতদুটি চোখের উপর ভেসে ভেসে উঠছে!

কে যেন পায়ের শব্দ করে পিছন থেকে হেঁটে আসছে। দ্রুতই ছুটে আসছে তার পিছুপিছু। স্পষ্ট পদধ্বনি বেজে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে হেঁকে উঠল রাহুল— কদম আলি!

না। কেউ নয়। কোথাও কদম আলির চিহ্ন নেই। শুধু জ্যোৎস্নাবিধুর পথ, শুধু অতিক্রান্ত পথের মোহনা পিছনে দেখা যায়। আকাশে দুধপথে পুঞ্জ পুঞ্জ তারকার জমাট শুভ্রতা ছাড়া আর কোনও নিঃসঙ্গতা এত মায়াবী হয় না। আকাশের বুকে একটি হাওয়া খাড়া হয়ে উঠে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত প্রলম্বিত হয়ে ভেঙে পড়ছে দূরান্তের প্রান্তরে, সরণিতে। সেই পথ ধরে বিকিয়ে যাওয়া কবি কি দিগন্তের পানে হেঁটে চলে যাচ্ছে, সে-ই

তাকে মার্কস্ এবং জেনির কাহিনী শুনিয়েছিল। একটি আন্দোলনকে হত্যা করল কবি।

আবার যেন পিছন থেকে কে আসছে বলে মনে হয়। কে আসে ? কবি! তোমার কথা কি শেষ হয়ে গেছে ?

—বউদি তুমি চলে গেলে কেন ? বুলবন তোমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে দিল না। মা আমাকে ডাকেনি অবধি। বিপ্লবেরও কি কোনও অদৃশ্য নিয়তি থাকে, যে আমাকে এভাবে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে! এত কষ্ট হচ্ছে কেন ? এত কেন একা মনে হচ্ছে নিজেকে ? পিছন ফিরে আবার চেয়ে দেখে রাহুল।

—বাপ ইমান, কুতায় নুকালি বাপা! সহসা কোথা থেকে হাওয়া বিবির গলার ডাক ভেসে আসে। ফাল লেগেছিল শশাঙ্কর গরুর পায়ে, কিশোর ইমান ওরফে আমানির প্রাণটি নিকেশ হয়ে গেল! হাওয়া বিবি গরুগাড়ি করে অর্ধমৃত আমানিকে হাসপাতাল নিয়ে চলেছে ভোরবেলা। ফুটে উঠে প্রাণ ছেড়ে কাঁদতেও পারে না, শশাঙ্কবাবুর মান রক্ষা পাবে না বলে। রাহুল কতবার বলে— কাঁদো হাওয়াবিবি, গলা তুলে সুর করে কাঁদো, লোকে শুনবে। গাঁ-মনিষ্যি শুনবে, বনের পশুপাখি শুনবে, বাতাসের ফেরেস্তা শুনবে, আকাশের নবী-পয়গম্বর শুনবে। গলার স্বরটুকুও ফুটে উঠল না ন্যালার মায়ের।

এই সব ঘটনার কথা বারংবার মনে পড়ে যাচ্ছে। ন্যালার মৃত্যুর তরজা মনে পড়ে যাচ্ছে, হাওয়ার আর্তনাদ, সন্তানের গোরের কাছে ঘুরে ঘুরে কেঁদে ওঠা 'কুতায় নুকালি বাপা' কিছুতেই রাহুলের মন থেকে সরতে চাইছে না।

জ্যোৎস্নার ভিতর ছায়া-শরীরে সবাই ওরা ভিড় করে আসছে। আমানির মৃত্যু কেন রাহুলকে অপরাধী করে! নিরন্তর এই প্রশ্ন কেন জাগ্রত হয় হৃদয়ে ? এই প্রশ্নকেই হৃদয়ে আরও ঘনীভূত করেছিল কবি। তারই কথার তরঙ্গে জেনি মার্ক্স আর হাওয়া বিবির জীবন এই সেদিন একাকার হয়ে বেজে উঠেছিল। কালো মাটির দেশে, কবি এসেছিল, রহস্যময় মানুষের মত। কেন্দ্রচ্যুত কবি একটি বিন্দু খুঁজে পায়, একটি বন্দুক খুঁজে ফেরে— এভাবে কবি রাহুলকে ঘরছাড়া করেছে।

ভাবতে ভাবতে রাহুল সদরঘাট পৌঁছে যায়। রাত্রিজাগা হোটেলগুলি এখন শান্ত হয়ে আসছে, খদ্দের আর নেই। ভোরের আলো ফুটতে এখনও দেরি আছে। আলো ফুটে গেলে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে। রেজগি গুনছে কেউ একজন হোটেলঅলা, তার গলার শতকিয়া শোনা যাচ্ছে। চারপাঁচটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে এদিক-ওদিক প্রেতাত্মার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে।

ভোর পাঁচটার বাস ধরবে বলে কিছু লোক বাক্স -প্যাঁটরা সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারা বটতলায়। কারও কারও হাতে বস্তা বাণ্ডিল করা, এরা বিড়ির পাতা, মশলা আনতে যাচ্ছে বহরমপুর। মুদিখানা চালায় কেউ কেউ। ভদ্র পোশাক-পরা বাবুরাও আছেন, চকের বাবুদের দু'একজন। হয়ত ওঁরা ট্রেন ধরবেন, কলকাতা চলেছেন। কেউ রেশমবস্ত্রের কারবারি, মালদা যাচ্ছেন রেশম আনতে। কুকুরগুলো এত মেতে উঠেছে কেন বোঝা যাচ্ছে না। যাত্রীরা কেউ কেন খেয়ালই করছেন না কুকুরদের ব্যাপার! মদনপুরের দু'জন লোক বিড়ি টানছে, গঙ্গাপ্রসাদের দু'জন ব্যাপারি বাসের ছাদে ছাগল তুলে নিয়ে, ভ্যা ভ্যা করতে করতে যাবে।

রাহুল লক্ষ করল কুকুরগুলো ব্রিজের টোলগেটের দিকে দলবেঁধে দৌড় দিয়ে ছুটে গিয়ে, হেউ হেউ করতে করতে ছুটে আসছে ফের। হঠাৎ-ই ব্রিজ-চৌকির হেঁড়ে একটা গলা হাহাকার করে উঠল, বোঝা গেল না, কেন অমন করে হেঁকে উঠল লোকটা। দূরে

বাসের শব্দ কান পাতলে শোনা যায়।

রাহুল এখান থেকে, অর্থাৎ চারাবটতলার অদূরে পড়ে থাকা একটি ভাঙা বেঞ্চে বসে সবই প্রত্যক্ষ করছিল। একজোড়া নতুন বরবউ এল ঘোড়াগাড়ি করে বালুমাটির ওদিক থেকে, হতে পারে অন্য কোনও জায়গা থেকে আসছে ; বালুমাটির পথ ধরে টাঙা তাড়িয়ে এসেছে।

রাহুল বউটিকে চিনতে পারল। নিতাইকে দেখতে পায় রাহুল। তার সহপাঠী বন্ধু। চায়ের দোকানটা বোধ হয় ভালই চলছে নিতাইয়ের। বুলবনরা ওর দোকানে চা খায় শরৎপাঠাগারে এসে। বউদি চলে গেছে, নিশ্চয়ই নিতাই জানে না।

কাছে এসে নিতাই বলল— ললিতের জামাই আর মেয়ে। বেগমপুরের জুনিয়র হাইতে ঢুকিয়ে দিয়েছে ললিত। দ্যাখ কেমন ঝলমল করছে।

রাহুল বলল— হ্যাঁ ! বুলবনকে বঞ্চিত করে ওই চাকরি নিতাই।

নিতাই বলল— লোকে সবই জানে রাহুল ! এত ভোরে কোতি যাবা ?

রাহুল কনের গলার চন্দ্রহার দেখছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল— কোথায় আর যাব নিতাই ! ভাল আছো তুমি ?

নিতাই বলল— আছি ! বলে হতাশা প্রকাশ করল।

তারপর বলল— আঁচ দিয়েছি। চা খাবা ? করি তাহলে ! চল আমার দোক্যানে ! বলে, পুরনো বন্ধু নিতাই রাহুলের হাত ধরে টানল।

ঝাঁপ তুলেছে নিতাই। কয়লার আঁচের ধোঁয়া কুণ্ডলি বেঁধে উঠে ব্রিজের দিকে মেঘের মত ভেসে যাচ্ছে। সেদিকেই চেয়ে রইল রাহুল। বাসের দূরবর্তী আওয়াজ ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকল। আঁধার হালকা হয়ে আসছে। আবার চৌকির কর্কশ আর্তনাদ।

—ওদিকে কী হচ্ছে বল তো ?

—কোন্‌দিকে ?

—ওই যে কুকুরগুলো ছুটে যাচ্ছে বারবার ! টোলের ওদিকে...

—তাই তো ! খুনটুন হয়ে গেল না তো ! আজকাল যা অবস্থা, বিশ্বাস নাই। পথের উপর মার্ডারি হয়ে যাচ্ছে ! যাবা নাকি দেখতে, কী হল !

—চল তো দেখি, পরে এসে চা খাব ! বলে উঠে দাঁড়াল রাহুল। দুই বন্ধু ওরা ব্রিজের দিকে এগিয়ে যায়।

জলঙ্গীর বাস এসে লাগে। বাসের যাত্রীরা বাসে উঠে পড়ে। বাস ছেড়ে ব্রিজের দিকে আসে। টোলে চেক হয় গাড়ি, টিকিট হয়, তখনই যাত্রীদের অনেকে নেমে পড়ে।

রাস্তা নীচু হয়ে গড়িয়ে নেমেছে এপারে। নদীর চর ধুধু করছে। সড়কের দু'ধারে নালা। এখন শুকনো। কুকুরগুলো মানুষজন দেখে সাহস পেয়ে লক্ষ্যস্থলে দৌড়ে যায়। নিতাই আর রাহুল পথের পাশের একটি শিমুলগাছের কাছে ছুটে আসে। উপুড় হয়ে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

নিতাই অস্ফুট ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল— দেখলে ! বলতে না বলতে...

—কিন্তু কে হতে পারে মানুষটা ? এভাবে পড়ে আছে... বিড়বিড় করে ওঠে রাহুল।

যাত্রীরা চাপা গুঞ্জন করতে করতে এদিকে ধাবিত হয়ে আসে। মৃতদেহকে ঘিরে ফেলে ওরা। সেই বৃত্তের মাঝখানে রাহুল আর নিতাই।

নিতাই বলল— তখনই বুঝেছি !

রাহুল বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল— কী বুঝেছ ?

নিতাই এর-ওর-তার মুখের দিকে দেখে নিয়ে বলল— ভোররাতে একবার পেচ্ছাব পায়, উঠে দেখি থানার একটা নীলরঙের ভ্যান। টোলের ওদিকে চলে গেল। চারটে কুকুর বারবার তেড়ে গেল ভ্যানটার পেছনে।

রাহুল আর দেরি না করে মৃতদেহের কাছে ঝুঁকে নেমে হাত দিয়ে ঠেলে চিৎ করে দেয়। তারপর আঁতকে উঠে সরে আসে। এক ঝলক রক্ত ঝাঁঝরা বুক ঠেলে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে।

—গায়ে অমন করে হাত দিও না রাহুল! কিসে কী আছে, বলা যায় না! বলে ওঠে নিতাই। তারপরই সে সচকিত গলায় বলে ওঠে— মরবার আগে লোকটা মুখে সুন্নৎ রেখেছিল গো! মাথায় টুপি। কপালে সেজদা না কি য্যানে বলে রাহুল!

—হ্যাঁ, সিজদার দাগ! ধুলো।

—কদম! চোর কদম আলি!

যাত্রীদের কে একজন আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল। এমন সময় বাসের হর্ন বেজে ওঠে, বাস ছেড়ে যেতে চাইছে। যাত্রীর বৃত্তভিড় আলগা হয়ে ছড়িয়ে যায়। নানান রকম মন্তব্য করতে করতে যাত্রীরা বাস ধরতে ছুটে যায়। দু'একজন থেকে যায় ডেডবডির কাছে। কুকুরগুলি আর কোনও আওয়াজ করছে না। মাটি শুঁকছে ঘনঘন।

নিতাই রাহুলের হাত ধরে টানছিল। রাহুলের কেন যেন চোখের কোণটি ঈষৎ ভিজে উঠেছিল। কিসে কী আছে, সত্যিই তো মানুষ জানে না।

—দাঁড়াও, আর একটু দেখি। বলে রাহুল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝুঁকে আসে কদমের দেহের দিকে। মৃতদেহের মুখের উপর একটি মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। কেমন একটা পাপবোধের ধর্মীয় বিকার কদমকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

—কদম! কদম আলি! ভাই! বলে ডেকে উঠতে গিয়ে রাহুলের গলা কেঁপে যায় এখন।

মৃতদেহ বলে ওঠে— আসো রাহুলদাদা! দু'মুঠা খাই!

জীবনের এই এক ব্যবহার, মৃত্যুর পরও যার কণ্ঠস্বর ফুরায় না। রাহুল আর সহ্য করতে পারে না।

দোকানে এসে নিতাই বলে— চা খাবে না রাহুল!

রাহুল বলল— না। শেখপাড়ার বাসটা এসে গেছে নিতাই। চলি।

॥ ৩৭ ॥

কবিকে দেখে তারক গাঙ্গুলি ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন, মামি ভয়ে কাছে এল না। মামাতো বোনটি কেবল দাদার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃদুসুরে ফুঁপিয়ে উঠল একটুখানি, দু হাতে মুখ ঢেকে, ফের দু হাত মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে বিস্ময়-ব্যথিত চোখে চেয়ে রইল। শীর্ণ বোনটি কেঁদে ভাসাতে পারে না, বাবা পছন্দ করবেন না। মা যেন চিনতেই পারছে না তিলককে।

—তুই বেঁচে আছিস! বলে মামা অবাক যত না হয়েছেন, ভয় পেয়েছেন অধিক। মনে হল, কবির বেঁচে থাকার মধ্যে কোথাও নিশ্চিত অপরাধ বা অন্যায় রয়েছে, কবির যেন বেঁচে থাকা মানায় না।

—ভেবেছিলাম মরে গেছিস, তাই আর থানায় গিয়ে খোঁজখবর করিনি। তোকে কিন্তু আমি বাড়ি চলে যেতে বলেছিলাম তিলক। এখন কী করবি! আমার তো হাত-পা বাঁধা, চাকরি করি। সেন্ট্রালের সারভেন্ট। তোর দায়িত্ব আমি আর নিতে পারব না। তুই অবিশ্যি ললিতের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারিস! থানায় একটা মুচলেকা দিয়ে হস্টেলে ফিরে যা। ললিতকে বলে আমি একটা ব্যবস্থা করি তাহলে!

—না, মামা! আমি কিন্তু বেঁচে নেই, আই অ্যাম ডেড। তোমাকে আর চেষ্টা করতে হবে না।

—অভিমান করিস না তিলক। আমি ছাপোষা মানুষ। সংসারধর্ম আছে আমার।

—জানি।

—গত সপ্তায় দিদি মারা গেছে তিলক, তোর মা....

কবি এবারে অদ্ভুত একটা নাড়া খেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ! তারপর দোরের দিকে চোখ যায়। ওখানে মোসলেম এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে চোখ পড়ে।

মুখ একটু হাঁ করে মোসলেম, বিড়বিড় করে, কথা বোঝা যায় না।

—কিছু বলবে চাচা! অত্যন্ত ধরা গলায়, চিকচিক করা চোখ মেলে কবি শুধায়।

—দিদি মরে গেল, চিঠিতে খবর এল তিলক। দেখতেও পেলাম না। চিতা হয়ে গেছে। আমার দায়িত্ব শেষ। ব্যস! ছেলে এখন বিপ্লব করুক আর পড়াশুনাই করুক, আমি দেখতে যাব না। মামা মোসলেমের দিকে চেয়ে একথা বলে উঠলেন।

দায়িত্বপালনের এমন দৃষ্টান্ত কবিকে বিচলিত করে না, সে ফের মোসলেমকে বলে—মণি কেমন আছে চাচা, তোমার পায়ে এখন জোর পাও?

—বাপ! শুধু এইটুকু উচ্চারণ করে ঢোঁক গেলে মোসলেম। ওর ফোলা পায়ে ঝাঁক ঝাঁক মাছি ভনভনিয়ে উঠছে। একটা কুকুর অযথা ওর সামনে গিয়ে লেজ নাচিয়ে দুবার ঘেউ ঘেউ করল, যার অর্থ হল, চলে যা, চলে যা!

—মা! তুমার কুকুরডা বজ্জাত মাগো! খালি খ্যাঁকায়, তারে ডাকো মা! খবর আছে! বলে উঠল মোসলেম। তারপর গাঙ্গুলি-পত্নীর দিক থেকে চোখ টেনে কবির দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে বলল— বাবাজীবন! বেঁচে আছ সুনা!

সেই মিষ্ট ডাকটি, বাবাজীবন, কত মায়া, অজস্র মায়ায় জড়িয়ে ধরতে চায় কবিকে। সোনার ছেলেকে মানুষ যেমন ডাকে, তাই ডাকছে মোসলেম।

কবি বলল—মা মরবার আগেই আমি মরে গেছি চাচা, তাই আজ আমার আর কোনও কষ্ট নেই।

—উ কথা বুলে না বাপসোনা, তুমি মর নাই। খুদা তুমাকে রাখেচেন, খুদা তুমাকে রাখবেন, তেনার ইচ্ছা! যাও, চলে যাও। ললিতনাটার আনাগোনা আছে, পুলিস আছে। এ বাড়ি তুমার না বাপজি! নেতাজি পার্কে মটর-বায়েক লিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তেনারা! বলেই মোসলেম ভিক্ষে না নিয়েই দোর ছেড়ে রাস্তায় নেমে চলে যায়। সারাটা দিন এই এলাকা ছেড়ে নড়ে না। দেখতে পায় ললিতনাটা তারক গাঙ্গুলির বাড়িতে যাওয়া আসা করছেন, কবি তখনও বার হয়ে চলে যায়নি। কী হল ছেলেটার, বুদ্ধিতে আসে না তার। কবি কি তা হলে নাটাললিতের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, মুচলেকা লিখে দিচ্ছে! রাত দশটা পর্যন্ত বাড়িটার উপর নজরদারি করে মোসলেম। দূর থেকে। পার্ক থেকে। রাস্তা থেকে। তার চোখে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। এই সন্দেহের কথা সে মণিকে বলে

দেয়। পুলিসের গাড়ি অবধি আসে ওই বাড়ির সামনে।

তারক তাঁর ভাগ্নেকে বলেন—চলে যা তিলক !

কবি বলে—চলে যাব মামা ! আমি একটা জিনিস খুঁজছি এখানে, পেলেই চলে যাব।

—আমি আর পারব না বাঁচাতে ! পুলিস তোকে আবার তুলে নিয়ে যাবে।

—আমি চলে যাচ্ছি মামা ! বলেই হাতের পৌনে দু'হাতী বাঁশের চিকন লাঠিটা মেঝেয় ঠুকে থরথর করে কেঁপে ওঠা দেহটাকে সামলাতে সামলাতে পাশের গুমোট দিনেও অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে টেনে আনে নিজেকে কবি। এখানেই একদিন তার ভয়ঙ্কর ঘুম পেয়েছিল। সেই ঘুম তার কাল হল। এখানেই সে রেখে গিয়েছিল জলগেটের চাবি, কিন্তু ঠিক কোথায়, ঘরের ঠিক কোন্ কোণে, কিসের ভিতর সেটি রয়েছে, কিছুতেই কবি মনে করতে পারছে না। তাকে চলে যেতে হবে। এদের বিপন্ন করা ঠিক নয়। এরা তাকে সহ্যও করতে পারছে না। মা নেই, আর কেউ নেই তার। তার যেন আর কোনও গন্তব্যও নেই। তবু পথে নেমে যেতে হবে তাকে। নইলে এরা ঠেলে ফেলে দেবে।

এ বাড়ি তুমার না বাপজি ! মোসলেম বলে গেছে তাকে। কিন্তু মোসলেম বলে যায়নি, পৃথিবীতে কোথাও তার বাড়ি নেই। মোসলেম বলে গেছে, 'তুমি মর নাই।'

তাই যদি সত্য হয় তা হলে ডাক্তারদার ওখানেই ফিরে যেতে হয়। অন্তত চাবিটা পৌঁছে দিতে হয়। এই একটা কাজ তার বাকি থেকে গেছে। একটা কাজ তার বাকি থেকে গেছে। চাবিটা হেথাহোথা যত্রতত্র পাগলের মতো খুঁজতে থাকে কবি। জীবনটাকেই হারিয়ে ফেলে মানুষ যেমন করে খোঁজে।

—আমি পাগল হয়ে যাব। যদি না পাই, পাগল হয়ে যাব। অস্ফুট গলায় আপন মনে কথা বলে কবি।

বোন শ্যামলী প্রশ্ন করে—কী খুঁজছ দাদা !

প্রথমে অনেকক্ষণ বলতে চায় না, ভাবে, একথা প্রকাশ করার বিপদ থাকতে পারে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্রমশ হতাশ হতে থাকে। অবশেষে বোনকে বলে ফেলে চাবির কথা। তারপর ভাবে, এই চাবির জন্য কত কাণ্ড হয়েছে, ব্যথাবিবির রোখ ভোলা যায় না। এই চাবির জন্য প্রাণ গিয়েছে মানুষের। চাবিই হল ললিতের জেদ, ললিতের স্বার্থের, শক্তির মুঠি। নাটার জোতদারি দম্ভের চিহ্ন, আধিপত্যের মুখ।

এই চাবি মাহেফরাসের আন্দোলনের প্রতীক। আজ যদি সেই চাবি কবি হারিয়ে ফেলে, কেউ তাকে ক্ষমা করবে না। ভাবতে ভাবতে প্রাণটা শুকিয়ে যেতে থাকে কবির। চেহারার মধ্যে উদ্বিগ্ন এক ত্রাস জমতে থাকে। ঘাম ফুটে বার হয় কপালে।

শ্যামলী খুঁজতে থাকে। যদিও সে চাবির আকৃতি জানে না, দাদার কাছে বিবরণ শোনে আর খুঁজে চলে। খুঁজতে খুঁজতে বলে—নিশ্চয় পাব, তুমি ভেবো না।

তারপর শ্যামলী হঠাৎ নীচে নেমে কী যেন দেখে এসে বলে—দাদা তুই চলে যা, আমি খুঁজে রাখব। থানার বড়বাবু এসেছে। পিছনের খিড়কি দিয়ে বাগান পেরিয়ে চলে যা। আর কোনও রিস্কের মধ্যে থাকিস না। ওরা তোর কাছে ফের কথা আদায় করতে চাইবে। বাবাকে বিশ্বাস করিস না।

—কিন্তু চাবি না পেলে, আমি কী করে যাব !

—আমি খুঁজে রাখব বলছি তো তোকে।

—চাবিটাই সব, বুঝলি শ্যামলী ! ওই চাবি দিয়ে আমি আমার প্রাণটা রক্ষা করতে পারি। যদি নাটাকে দিই, লোকটা আমাকে বাঁচাবে। যদি ডাক্তারদার হাতে তুলে দিতে

পারি, ওরা আমাকে হয়ত....তাছাড়া এ চাবি কারও ব্যক্তিগত নয় রে !

হঠাৎ এই সময় পরম আহ্লাদে সামান্য চেঁচিয়ে ওঠে শ্যামলী—পেয়েছি রে দাদা ! সঙ্গে সঙ্গে সারামুখ তার হাসিতে ভরে গেছে, সেদিকে চেয়ে কবির চোখেমুখে গভীর চাপা আনন্দ ফুটে ওঠে, পাগল একজন মানুষ যেন সুস্থতায় ফিরে আসতে থাকে। গায়ে জোর আসে।

—দারোগা কী করছে শ্যামলী ?

—পোস্ট আপিসের গা-লাগা ছোট ঘরটায় এসে কথা বলছে বাবার সঙ্গে। সঙ্গে একজন পুলিস। কিন্তু পুলিসটার গায়ে ইউনিফর্ম নেই, লুঙ্গি পরে আছে। ললিত ওকে সঙ্গে করে এনেছে গাঁয়ের ওদিক থেকে। ললিত আছে।

শুনতে শুনতে চমকে উঠল কবি। বলল—ও, বুঝেছি !

কবি অনুমান করে নেয়, এই পুলিসটাকেই তারা 'গাপ' করেছিল, উধাও করে নিয়েছিল কোদালকাটির কদমতলা থেকে, এর নাম নিত্যপদ গিরি। মানুষটা ভাল, প্রণামপুরের একটা স্কোয়াড ওর কাছে বন্দুক চালনা শিখেছে। কিন্তু গিরি কী করে পালিয়ে এসেছে বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য কবি জানবেই বা কেমন করে !

জল স্থির নয়। এই আন্দোলনও স্থির হতে পারেনি কখনও ! একটা গভীর উপলব্ধি কবিকে নাড়াতে থাকে। তার চোখের উপর ভাসতে থাকে একটি কম্পমান ডোঙা, একখানি রেডবুক এবং আটটা দলিল আর সি. এম-এর পিঠে বাঁধা সিলিন্ডার, তাঁর মাঝে মাঝেই শ্বাসচালনার জন্য অক্সিজেন লাগত।

—কিছু বলছিস দাদা ! তুমি আর থেকো না দাদা ! বলল শ্যামলী।

কবি বলল—হ্যাঁ শ্যামলী ! এবার আমি যাব। আমার সময় হয়েছে।

—সময় ?

—হ্যাঁ, আমার আর সময় নেই। রাহুল বলেছিল, যুদ্ধ পরিচালনা করতে চলেছেন নেতাজী, ঠিক শেষ মুহূর্তেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মাথার ক্যাপ আর চুল সযত্নে কী বলে, আঁচড়ে টুপিটা জুত করে নিচ্ছেন, একটু বাদে তাঁর মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। সাধ ছিল শ্যামলী, পাহাড়ের মতো ভারী একটা মৃত্যু হবে আমার !

—ও কথা আর বলিস না দাদা !

—মোসলেম বলেছে, আমি মরিনি।

—তুমি অন্তত বেঁচে থেকো তিলকদা !

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কবি চিরুনি চালিয়ে নিজেকে দেখল, বলল, নিজেকে এভাবে চেয়ে দেখলে মায়া বাড়ে, নাতাশা বলে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ছে এখন ; তোর কথা আর ওর কথায় যেন ভারি মিল পাচ্ছি কী একটা, ঠিক বলা যায় না। তুই হয়ত বলবি, বিপ্লবের মধ্যে কি দয়ামায়া বলে কিছু থাকে নাকি ! তাই যদি না থাকবে, তা হলে আর এত ভাল লাগছে কেন আমার ! চাবিটা যথাস্থানে দিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত ! দে। চাবিটা দে। বিদায় শ্যামলী ! ওহে, কবি ! বলে আয়নার ছায়াকে সে বলল—গুড বাই ! চলি। সাদা চৌধুরী জিন্দাবাদ। মাহেফরাস জিন্দাবাদ। বাই !

দ্রুত খিড়কি পথে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় পোস্ট অফিসের কোণের ঘরটিতে চোখ গেল, ওরা আছে। গিরিও আছে বাস্তবিক। কবির মুকুরভাসিত ছায়া কবিকে অনুসরণ করতে থাকল—পালাও, আর দেরি ক'রো না।

কবি বলল—আমি অত আত্মকামী নই হে ! খুব ভাল ভাষায় কথা বলছি।

ছায়া বলল—আমি তোমাকে ভালবাসি।

কবি বলল—এখন ভালবাসার কথা থাক। আমার মা নেই জানো!

ছায়া বলল—পেপার গো, ডাকটা মনে আছে তোমার!

কবি বলল—আই কান্ট সুইম। বেঁচে থাকলে সাঁতার শিখব। জীবন একবার, কিন্তু বিপ্লব বহুবার। মানুষ জানে।

—তুমি আর কী জানো কবি?

—জল অস্থির। ভারতবর্ষ আবার উত্তাল হবে।

—কিন্তু এখন?

—চাবিটা আমাকে পৌঁছে দিতে হবে।

—পুলিস তোমাকে অনুসরণ করছে। ত্বরান্বিত কর নিজেকে, পা চালিয়ে।

বাস ধরবার জন্য দাঁড়ায় কবি। এই বিকেলে আকাশ প্রসন্ন ছিল, কিন্তু ঝড়ের একটা নিঃশ্বাস লেগেছিল মেঘালি দিগন্তে। মেঘের রূপালি রঙ কালো হয়ে উঠছে। বাতাসে ঝলমল করছিল যে রোদ, তা এখন সন্দেহগভীর ছায়ায় ধূসর। একঝাঁক পাখি উড়ে যায় চক কালীতলার দত্তদের বাড়ির দিকে। চকের ওদিকে গরদের মতো একফালি রোদ দেখা যায়। একদিন গত বছর রামধনু উঠেছিল মুর্শিদাবাদী সিল্কের মতো, জীবনের সেই স্মৃতি মনে থাকবে নাতাশা।

কবি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শুনে ফেলে, কদম মারা গেছে। থানা তাকে শেষ করে দিয়েছে।

—তুমি কিন্তু মর নাই কবি! এখানে তিমির নেই। তিমির তোমাকে আবার বাসের পাদানি থেকে নামিয়ে ফেলতে পারে! এরাই একদিন দেশ শাসন করবে। মন্ত্রীযন্ত্রী হবে। খাস জমি বাঁটবে, পাট্টা দেবে। পৃথিবীময় এদের সুনাম হবে।

—জয় হোক। বলে কবি বাসের পাদানিতে লাফিয়ে উঠল। বাসটিকে অনুসরণ করতে থাকল একটি পুলিসের গাড়ি।

হাতিনগরের বাসস্টপে নেমেই চায়ের দোকানে চোখ যায়। ফুলচাচার ওখানে সন্ধ্যাবাতি পড়েছে, নতুন হ্যারিকেন হয়েছে চাচার।

—ডাইনে সাপা, বাঁয়ে শৃগাল। মনে মনে একথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় কবি। বাসটা চলে গেছে, কিন্তু পুলিসের জিপটা গেল না, দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ছেড়ে গেল। 'ওয়াচ' করে গেল বুঝতে পারল কবি।

সবই লক্ষ করলেন ফর্সা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, প্যান্ট-শার্ট পরা একজন নতুন ভদ্রলোক। ফুলচাচার দোকানে বসে আছেন। সাদা শার্ট পরা মানুষটির চোখেমুখে বুদ্ধি ঝলমল করছে।

নতুন এই মানুষটিকে কখনও দেখেনি কবি। চাচার দোকানে আসামাত্র লোকটি কবির একখানা হাত খপ করে চেপে ধরে বললেন—পুলিস সঙ্গে করে আনলে! তোমাকে রাখব কোথায় এখন? চলো! তুহিন আর খোদাকে এখনই ঠিক জায়গায় চলে যেতে বলবে ফুলচাচা! এখনই আসবে ওরা। আমরা চললাম।

লোকটি কবিকে একটি রিকশায় এনে তুললেন, নিজেও উঠলেন। রিকশা চলতে শুরু করলে বললেন—আমাকে তুমি চিনতে পারছ না!

—না! আপনি কে?

—ভেবে দ্যাখো তো, আমার সঙ্গে কখনও কোনও পরিচয় ছিল কিনা!

—পুলিসরা এভাবে কথা বলে !

লোকটি এবারে হো হো করে হেসে উঠলেন। এই হাসিটা কবি কোথায় যেন শুনেছে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না। রিকশা দ্রুত ছুটে চলেছিল।

—পুলিসকে তোমার খুব ভয়, তাই না ? ভয়ে তুমি তাদের কাছে সমস্তই প্রকাশ করে দাও !

সন্ধ্যা ক্রমশ ঘনায়মান, আকাশে ফুলকি দিচ্ছে তারকা, পথের দু পাশের গাছপালায় জোনাকি উড়ছে, পথ নির্জন। রিকশার দুপাশে হঠাৎ দুখানা সাইকেল এসে লাগে, দুজন আরোহী। তারাও চলেছে রিকশার সঙ্গে সঙ্গে।

—খোদা !

—হ্যাঁ।

—তুহিন !

—হ্যাঁ।

—এদের চিনতে পার কবি ?

—ও !

—তোমার নিজেকে খুব বোকা লাগছে ! লাগছে না ?

—আমি বলিনি দাদা !

—বলেছ, তুমি দেবপ্রতিমের নাম বাতলেছ থানাকে ! এই পথের উপর তুমি সত্য কথা বলবে। কারণ, পথ ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। আমি পুলিস নই। আমাকে তুমি চেনো। একটা কথা শুনে রাখো, তোমার কতকগুলো ভুলের জন্য এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হরবোলাকে তার সংগঠন ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে !

—বিশ্বাসঘাতকতা !

—পুলিসকে তুমি সব কথা ফাঁস করে দিয়ে ওয়াটার গেটের চাবি সঙ্গে করে উধাও হয়ে গেলে ! পুলিস যখন একজন বিপ্লবীকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করে নেয়, তখন সে আর বিপ্লবী থাকে না। সে তখন শত্রু শিবিরের লোক হয়ে যায়। তুমি সেকথা জানতে। যাই হোক। চল !

তবে কি মৃত্যুরই সরণি বেয়ে রিকশা গড়িয়ে চলেছে ! কবি মনে মনে কনভিন্সড হয়ে যায়, সে বিশ্বাসঘাতক। মৃত্যু তাকে মহিমান্বিত করেনি, জীবন তাকে অপদস্থ করেছে ; গ্লানিতে জর্জরিত হৃদয়। শুধু ছিঃ ! শুধু ছিঃ !

ডাক্তারদার বাড়িতে এসে রিকশা থামে। কবির মগজে আর কোনও কথা ঢুকতে চায় না, মৃত্যু তার মস্তিষ্কে নেশার মতো প্রবেশ করে যায়।

রাহুলকে দেখেই প্রায় পাগলের মতো কবি বলে ওঠে—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল রাহুল !

এবার তুহিন আর খোদা বক্স হা হা করে উৎকট হেসে উঠল। সেই হাসি মস্তিষ্কের মৃত্যুকে যেন খোঁচায়, একটা কাছিমকে যেভাবে খোঁচানো হয় শিকের ফলা দিয়ে। কবি ফ্যালফ্যাল করে ডাক্তারদা, মুমতাজ এবং সকলকে দেখতে থাকে।

—বউদির দলে নাম লিখিয়েছ ? ডাক্তারদা প্রশ্ন করেন। ছোট টেবিলটায় একটা কাচের প্রদীপ এবং একটা পিস্তল পড়ে আছে। সেদিকে কাতর চোখে দেখতে থাকে কবি।

—তুমি মামাবাড়ি কী করছিলে ?

—বিপ্লব মামাবাড়ির আদর ! চাবি কোথায় ?

তুহিন আর খোদা বক্‌স পর পর বলে উঠল। ভয়ে কবির চোখের তারা কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল, সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, অথচ চোখ মেলে আছে।

সেই নতুন মানুষটি বললেন—কবি তুমি কমরেড স্তালিনের ছেলের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল জানতে। ছেলে যখন শত্রু শিবিরে বন্দী, প্রতিদিন খবর আসে ছেলের উপর অত্যাচার হচ্ছে—পিতা শুধু আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে ভাবতেন ছেলে যেন শত্রুর কাছে দলের কোনও তথ্য প্রকাশ না করে ফেলে। মার খেতে খেতে মার খেতে খেতে....

রাহুল এবার গম্ভীরস্বরে বলে উঠল—থামুন ! দেবপ্রতিমবাবু ! ওই মৃত্যুর ডেসক্রিপসন শুনিয়ে কী হবে ! আপনি সংগঠন ছেড়ে চলে এসেছেন, বেশ করেছেন। কবিকেও চলে যেতে দিন।

তুহিন বলল—বিপ্লব কি চাকরি যে ইস্তফা দেবে ! ও কেন মামার বাড়ি গেল সেকথা শুনব না ?

—না। শুনব না।

—কী বলছ রাহুল ! বলে উঠলেন ডাক্তারদা।

—হ্যাঁ, আমরা কবির বিচার করতে বসিনি। না, বসিনি।

এই কথায় বউদির চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে কাজের মেয়েটা বাইরে কোথাও গেছে।

দেবপ্রতিম বললেন—প্রাণ যে স্বেচ্ছায় দান করে না, তার কাছে আমরা ভিখিরির মত হাত পাতি না রাহুল ! আমার খালি ভয়, পুলিস কবিকে ধরবে, ছাড়বে না।

রাহুল এবারে মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। কবি দেবপ্রতিমকে দেখল একবার। চিনতে পারল না। ইনিই কি হরবোলা ? উনি কি আমার কাছে সত্যিই প্রাণটা চাইছেন ? নাকি, আমাকে বাঁচাতে চাইছেন ? কবি আর বুঝতে পারে না।

দেবপ্রতিম ফের বললেন—কমরেড স্তালিন তাঁর এক নিকট কমরেডকে, নেতৃস্থানীয় কমরেডকে বারবার বলে চলেছেন, প্রায় প্রতিদিন, ছেলেটা কি বলে দেবে গোপন কোনও তথ্য ? মারের ধাক্কা সামলাতে না পেরে, প্রাণের ভয়ে... সেই কমরেডটি স্তালিনকে আশ্বাস দিয়ে সেদিন বলছেন, প্রাণ যাবে তবু প্রত্যাশা করি আপনার আশঙ্কা যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আপনার পুত্র। শুনে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে স্তালিন হঠাৎ বললেন, বলে কি দেবে কমরেড, গত কাল ওর মৃত্যু হয়েছে শত্রুর হাতে, সেলের মধ্যে ! ওর সঠিক মৃত্যুই হয়েছে, খোকা কোনও ভুল করেনি।

কবি অদ্ভুত আর্তস্বরে বলে উঠল—আমি ভুল করেছি, আমি পারিনি।

ডাক্তারদা বললেন—মামার ওখানে গেলে কেন ? তোমাকে আমরা যদি সন্দেহ করি, তা কি খুব অন্যায় হবে ?

তুহিন এবারে কটমট করে কবির চোখের দিকে চাইল। অত্যন্ত কাছে এগিয়ে এসে কবির গলায় হাত দিতেই কবি কেমন শিউরে উঠল। তুহিন খুবই তাচ্ছিল্যের সুরে বলল—শালা !

কবিরই হাতে ধাক্কা লেগে ওর হাতের লাঠিটা মেঝেয় সড়কে হড়কে পড়ে যায়।

রাহুল দ্রুত দাঁড়িয়ে উঠে তুহিনের হাত চেপে ধরে বলল—এত ঘৃণা কিসের তুহিন ! ও পারেনি, ব্যস ! চাবিটা কোথায় কবি, দিয়ে দাও ! নেই তোমার কাছে ?

কবি কথা বলল না, ওর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল নিঃশব্দে। তা দেখে রাহুল

বলল—ওকে নিয়ে আমি চলে যেতে চাই !

—চলে যাবে ? সীমাহীন বিস্ময় প্রকাশ করেন বিশ্বরঞ্জন ।

—হ্যাঁ, যাব । ওঠো কবি । তোমার কথা এরা কেউ ধৈর্য ধরে শুনতেই চাইছে না ।

—না, যাবে না । মামার সঙ্গে কী কথা হয়েছে, কেন ওখানে গেল, সবই বলতে হবে ওকে । আদিত্য সিংহের কাছে গিয়েছিল কেন, সবই বলতে হবে । তুমি ওকে নিয়ে যেতে পার না । ঈষৎ তপ্তস্বরে বলে উঠলেন বিশ্বরঞ্জন ।

হঠাৎ রাহুল বলল—আপনাদের এত অহংকার কিসের বুঝতে পারছি না । ভুল আপনারা করেননি ? সাদা চৌধুরী আজ জেলে গেছেন কেন ? এর জন্য যদি ডাক্তারদা আপনাকে আমি দায়ী করি ! আপনি কেন ওভাবে বাবার C/O করে টুনটুনির ছাপমোড়া ইস্তেহার পাঠিয়েছিলেন, চিৎপুরের ঠিকানায় ? সেটা ভুল ছিল না ?

—আবার তুমি বাবার কথা তুলছ রাহুল, এই অবসেসন কিছুতেই গেল না !

—না । যাবে না । বাবার কথা বারবার তুলব । আমি মনে করি হরবোলার সঙ্গে রুকসানার সম্বন্ধ ভুল । একশবার ভুল ।

—ওটা কোনও সম্বন্ধই নয় রাহুল, তুমি উত্তেজিত হবে না । আমি ডাক্তার হিসেবে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ওটা কিছু নয় । ইকবাল ভুঁইয়া জানে, দেবপ্রতিম ডিজেবল, ওঁর যৌনক্ষমতা নেই । জেলের অত্যাচার ওঁর সব শেষ করে দিয়েছে, ওঁর দাম্পত্য-জীবন বানচাল হয়ে গেছে । যাকে ফিরে চলে এসেছ বলে মনে করছ, সে কিন্তু কোথাও ফিরতে পারে না । উনি ফিরতে পারেন না কমরেড ! প্রণামপুর থেকে ওঁকে তুলে নেওয়া হল, কিন্তু তাঁর কাজ শেষ হল না । ডাক্তারদা ব'লে উঠলেন ।

এই কথায় সমস্ত ঘরটার পরিবেশ কেমন নিস্তব্ধ হয়ে যায় । রাহুল ধীরে ধীরে কবিকে ছেড়ে খাটের এক কোণে সরে এসে বসে পড়ে । 'বানচাল হয়ে গেছে' কথাটা ঘরময় নৈঃশব্দ্যে মুখর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল । তুহিন এবং খোদা বক্সের চোখেমুখে একটা সবল গর্ব ফুটে উঠল, কবিকে ছেড়ে তুহিনও সরে যায় ।

হঠাৎ-ই রাহুল তাদেরই নিজেদের মধ্যে দু'টি ভাগ প্রত্যক্ষ করে, একটা চিড় খেয়ে ফাট ধরেছে বলে মনে হল তার । এতক্ষণ অবধি একটিও কথা বলেনি মুমতাজ আলি, মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে সব শুনছে ।

তাজ সহসা বলে উঠল— প্রণামপুর ছেড়ে চলে এসেছেন খতিব । কিন্তু ওই সংগঠন এখন কীভাবে চলবে ! জল নেমে যাচ্ছে, কালো মাটির পথ পড়ে যাবে । পুলিস হানা দেবে । তামাম গাঁ জেলে ঢুকে যাবে ।

—কিন্তু চাবিটা কোথায় ছিল তাজ ! তুমি বোকার মত কথা বলে যাচ্ছ যে! দায়িত্ব নেবে তুমি ! তুমি যে বন্দুক চৌধুরী-বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছ, তা তোমাকেই উদ্ধার করে আনতে হবে । ওটার প্রয়োগ কে করবে ?

—আর প্রয়োগের কথা বলবেন না ডাক্তারদা, প্রদর্শনী আমরাও করি, ওই রিভলভারটা স্যর (দেবপ্রতিম) প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু এখানে সেটা আপনি প্রদর্শনীর জন্য রেখেছেন ! এটার কোনও প্রয়োজন ছিল না ।

—এটা তোমার হাতের বন্দুক নয় তাজ ! এটা প্রদর্শনী নয়, এটা বিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে । একা মানুষটা লড়ে ফিরেছেন, বউদি বাগড়া না দিলে তিন তিনটে জোতদার খতম হয়ে যেত । এই ঘটনা কাউকে হতাশ করলে, তাকে দোষ দেওয়ার আগে, নিজের দিকটা ভেবে দেখতে হয় । কী করেছ ?

—ওটার উত্তাপই শেষ কথা নয়। আমি বলছি প্রণামপুরের সংগঠন ধসে যাবে। বলে মুমতাজ থেমে পড়ে।

—সেজন্য দায়ী করবে কাকে ? বল ? বল না ! আমরা তো এখানে ভোজসভায় আমন্ত্রিত হইনি ! কে দায়ী ! কার দোষ ? বলতে বলতে ডাক্তারদার চোখদু'টি হয়তো অসচেতনভাবেই কবির উপর এসে পড়ে। তিনি হয়তো এভাবে দৃষ্টি ফেলতে চাননি।

আকস্মিক সব দৃশ্য নড়ে ওঠে। মেঝেয় পড়ে যাওয়া লাঠিটা কবি চেয়ার ছেড়ে নীচু হয়ে হাতে তুলে নেয়। কাঁপতে কাঁপতে লাঠি ধরে দাঁড়ায়, তারপর চরম ক্ষিপ্রতায় টেবিলে রাখা রিভলবার আঁকড়ে ধরে। এবং অদ্ভুত বদলে যায় মানুষটা।

প্রায় হুংকার দিয়ে ওঠে কবি—আমার মা নেই খোদা ! আমার কেউ নেই। এই চাবিটা আমি তাজকে দিলাম। না, তাজ নয়, এটি রাহুলকেই দেব। নাও, ধরো রাহুল। তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়েছে। তোমাকেই দেব বলে এত দূরে ছুটে এসেছি। আমি এই অস্ত্রটা প্রয়োগ করতে চাই, অনেকক্ষণ ধরে এটার প্রদর্শনী হল। কেউ এক পা নড়বে না।

সকলেই চমকে উঠে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে কবির দিকে চেয়ে থাকে। ভয় পায়। ওরা কেউ ভাবতেই পারেনি, কবি এভাবে উঠে দাঁড়াবে। বাইরে একটা কালপেঁচা কর্কশ গলায় ভৌতিক সুরে ডেকে ওঠে। চাবিটা ছটকে পড়ে রাহুলের কোলে।

—তুমি এ কী করছ কবি ! কাকে মারবে ! বলে ওঠেন শান্ত দেবপ্রতিম।

কবি বলে—সেই দৃশ্যটা মনে করুন। কমরেড সি এম মড়ার খাটে শুয়ে রয়েছেন, অক্সিজেন নিচ্ছেন, নইলে শ্বাস বয় না তাঁর। কিন্তু ওই অবস্থাতেই চার ছ'জন কমরেড খাটটা সাদা থানে ঢেকে নিয়ে হরির লুঠ দিতে দিতে কাঁধে করে চলেছে, যেন মৃতদেহ চলেছে শ্মশানে।

এইটুকু বলে দোরের দিকে খানিকটা সরে যায় কবি ত্বরিতে এবং উদ্যত অস্ত্রটি হাতের উপর নাচিয়ে নেয়।

—ওটা লোডেড রিভলবার কবি, খেলা ক'রো না। ভাই, তুমি একটি বার আমার কথা শোন ! আকুল স্বরে ব'লে উঠলেন দেবপ্রতিম।

কবি তন্ময়সুরে বলল—পুলিস দেখছে শহরের পথে একটি মৃতদেহ শ্মশানে চলেছে। জনগণ দেখছে বাতাসা ছড়িয়ে পড়ছে পথের উপর। কিন্তু কমরেড সি এম চলেছেন শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গোপন বৈঠকে অ্যাটেন্ড করতে, তাঁকে ধরবার জন্য পথে গলিতে পুলিস মোতায়েন রয়েছে। যে যায়, যে প্রয়োগ করে, এভাবেই করে হরবোলা। এভাবেই যায়। চলি। বলে বাড়ির উঠোনে অন্ধকারে লাফ দেয় কবি।

সবাই এত হত-চকিত বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে, কী করবে ভেবে উঠতে পারে না। বাইরে অন্ধকার নিবিড়। তখনও চাঁদ ওঠেনি। অজস্র জোনাকি মহোৎসবের মাদকতায় আঁধার-ব্যাপ্ত করে উড়ে মরছে। উড়ছে, কেবলই উড়ছে, পৃথিবীর সমস্ত জোনাকি যেন বাতাসে এসে হেথায় মিশেছে, আঁধার, নাকি জোনাকির আলো, তরঙ্গের মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, বোঝা যায় না। মনে হয় হৃদয়, ফুসফুস শ্বাসে আঁধারে আলোয় পাকিয়ে পাকিয়ে প্রসারিত এবং সংকুচিত হচ্ছে।

এ দৃশ্য অর্থহীন ছিল না, এ দৃশ্য অহেতুক ছিল না। হৃদয় এবং আঁধার আর আলো একাকার ছিল। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস একাকার ছিল। ঝির ঝির করে কোদালকাটির

গেটে জল বেরিয়ে চলে যাওয়ার শব্দ ছিল, সেখানেও জোনাকি উড়ছিল। নাতাশা এবং মোহর আর বউদির চোখে জোনাকি মেতে উঠেছিল। আয়েষা দেখছিলেন জোনাকি। বুলবন ভাবছিল 'অদ্ভুত আঁধার এক।' ফুলভানু ফুঁপিয়ে কাঁদছিল অকারণ। মণি আর্তনাদ করল মাঠের মধ্যে—হেই হো...কে জাগে ? ওস্তাদ, অধিকারী জাগে। নটনটী জাগে। আমি জেগে আছি বাবু ! মেলেটারির ছেলে, জাগছে গো ! মাস্টারের ছেলে গো !

একটু একটু করে সবাই উঠে দাঁড়াল।

ডাক্তারদার স্ত্রী বলে উঠল—ওকে তোমরা ধর ! ও যে চলে গেল ! কোথায় যাবে, কী করবে, তোমরা একটুও ভাবলে না !

বাইরে উঠোনে নেমে এল সবাই ওরা।

—ও যখন থানায় ছিল, কেউ তোমরা দেখা করতে পারনি। ওর বুঝি অভিমান হতে পারে না ! বলতে বলতে বউদি অন্ধকারে গলা তুলে ডাকেন—কবি ! যেও না !

অন্ধকার থেকে, জোনাকির আলো থেকে কোনও জবাব ভেসে এল না। কবি কি পোলের সাঁকোর দিকে গেছে !

রাহুল অন্ধকারে বোকার মত ছুটে যায়। অনেকখানি ছুটে এসে ভাবে, কোথায় এভাবে ছুটে যাবে !

—কবি ! অস্ফুট কাতরানির মত ডাকে রাহুল।

মুমতাজ এসে রাহুলের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কে ! বলে চমকে ওঠে রাহুল।

—আমি রাহুল, ভয় পেও না !

—এত জোনাকি অসহ্য তাজ ! এত এত এত কেন !

—ও কি গুলি ছুঁড়ত বলে মনে হয় ! শুধায় মুমতাজ।

—না। ও বাঁচতে চায় তাজ !

—ডাকবে ? জোরে ?

—না।

কেউ কিছু করতে পারে না। অন্ধকারে চেয়ে থাকে। হঠাৎ একটা গগনবিদীর্ণ করা গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। এক দণ্ড সমস্তই স্তব্ধ। ওদিকে গাছের পাখিরা ডানা ঝটপটিয়ে আকাশে উড়ে যায়। কিন্তু কোন্ দিকে ?

তাজ আর রাহুল সামনের দিকে ছুটে গিয়ে থেমে পড়ে। শোনা যায় চাপা গোঁগানি, চাপা, তীব্র, দীর্ণ এবং অশ্রুময়।

—মা ! বলে ওঠে কবির জীবন। শুধু মা। একটা কাজ শেষ করার ক্লান্তি ঝরে পড়ে গুমরে ওঠা স্বরে।

ডাক্তারদার হাতে মিহি টর্চ। উনি দূর দিয়ে ওদিকে হেঁটে যাচ্ছেন। বকুল গাছটার দিকে। সেখানে কবি নেই। মাঠের মধ্যে স্বরটা কোথায় শনাক্ত করা যায় না।

রাহুল ধীরে ধীরে দীর্ণ গুমরানো স্বরটা ক্ষীণ হয়ে আসছে বুঝতে পারে। আর পারছে না কবি।

রাহুল পৌঁছে যায় কবির কাছে।

—তাজ ! এক সুতীব্র হাহাকার মথিত করে রাহুলের গলা উচ্চকিত হয়ে আকাশে ভেসে চলে যায়, ভেসে যায় এবং ফিরে এসে স্থিত হয় নিজেরই বুকে। এ মৃত্যু তাকে অপরাধী করে দেয়।

—এই কি জীবনের ব্যবহার কবি ! বলে রক্তাক্ত দেহ কোলে তুলে নেয় রাহুল।

তাজ কবির অত্যন্ত কাছে ঝুঁকে নামে। জোনাকির আলোয়, নীল আলোয় পূর্ণ হয় একটি মৃতদেহ। ঠাণ্ডা, হিম, শীতল, করুণা জ্বলতে থাকে। নেবে না।

পুলিসের একটি জিপের হর্ণ তীক্ষ্ণসুরে খুব কাছে বা দূরে কোথাও ডেকে ওঠে এবং আর কিছু শোনা যায় না তখন।

॥৩৮॥

রাহুল এবং মুমতাজ কবির মৃতদেহ কাঁধে তুলে নেয়, সেই এক জোনাকি ওড়া রাতে। তখনই বেজে উঠেছে পুলিসের বাঁশি। ওরা আর দেরি করে না। হাঁটতে শুরু করে। হনহনিয়ে ছুটে চলে রাত্রি আর ধাবমান জোনাকি। কবির মৃত শরীরে জোনাকি মুখ দেখে। কবির চোখের পাতায় বসে দু'টি নীল আলো, জ্বলে আর নেবে।

মাঠ ছেড়ে ওরা রাস্তার মোড়ের দিকে উঠে আসে। আবার মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে। একটা বাবলা গাছের তলে লাশ নামায় এবং পশ্চাতে কারা আসছে বোঝার চেষ্টা করে। কোনও মানব অস্তিত্ব টের পায় না। এভাবে মৃতদেহ বহন করা কঠিন। কাঁধে রাখা যায় না। হড়কে পড়ে যেতে চায়। দু'জন একযোগে বয়ে যাওয়া যায় না। একা একা বইতে হয়। একবার রাহুল, একবার মুমতাজ বহন করে নিয়ে যায়।

মুমতাজ বলল—এক কাজ করলে হয় না !

রাহুল শুধায়—কী ?

মুমতাজ বলে—ডাইনে একটা আলো জ্বলছে দেখতে পাও ?

রাহুল চেয়ে দেখে বলে—হ্যাঁ।

তাজ বলল—ওটা মনে হচ্ছে, সুলতানের ঘর। মাঠের মধ্যে একটেরে ঘর বানিয়ে নতুনই শাদি বসিয়েছে, সেকেন্ড ম্যারেজ। প্রথমাটি গোয়াসের ওদিকে লোকপুরে পুরনো গেরস্তালি সামলাচ্ছে। ওকে বলে একটা খাটিয়া জোগাড় করা যায়।

রাহুল বলল—চল !

সুলতান ওদের দেখে শুনে প্রথমে কেমন হতবাক হয়ে গেল।

—এইভাবে মরে গেল কবিদাদা ! তুমরা রাখতে পারলা না ?

—এখন কী হবে বল ? মৃদুস্বরে বলে মুমতাজ। এবং বলে—চারপাশে পুলিস ডিউটিতে আছে, কবিকে সন্ধ্যায় হাতিনগরের মোড়ে নামতে দেখেছে। ফুলচাচার ওখানে।

—ইদিকডায় দশ রশি ফারগে একখান গোরস্তান আছে, শ্মশান মশান নাই, কী করবা, শেয়ালকুকুরের মুখে তো দিতে পার না ? এক মিনিট বস, আমি আলাম বুলে ! বলে একখানা দা হতে করে বেরিয়ে চলে গেল সুলতান। সুলতান চলে যাওয়ার পর তুহিন আর খোদা বক্স এসে ঢুকল সেখানে। উঠোনে একটা কালিপড়া লণ্ঠন জ্বলছিল ঝাপসা হলুদ আলোয়, ঘোড়ার প্রস্রাবের মত বর্ণ।

খোদা বক্স এবং তুহিন মাটির নীচু দাওয়ার একদিকে এসে খুঁটির কাছে বসে পড়ল। তারপর চেয়ে রইল উঠোনে পড়ে থাকা লাশের দিকে। ওদের চোখ যেন ঠিকরে বার হয়ে যেতে চাইছিল।

সুলতান কোথা থেকে বাঁশ কেটে এনে আধঘন্টার মধ্যে হাতিয়ার দিয়ে চেঁছে ছুলে খাটিয়া বানালো ; ওই সব হাতিয়ার সে মাছধরা, ঝুপড়ি গড়ার কাজে ব্যবহার করে, ছুতার মিস্ত্রির কিছু হাতিয়ারও ওর কাছে দু'একখানি রয়েছে। মোটামুটি কাঁধে তোলার মত একখানা বস্তু তৈরি হয়।

এই সময় বিশ্বরঞ্জন এবং দেবপ্রতিম এসে পড়েন উঠোনে। দু'জনই কোনও কথা বলেন না।

সুলতান শুধাল—গোর দিবেন ! তাহলি লোকে বুজবে না ঘটনার কথা। বলে সে ডাক্তারদার মুখের দিকে চাইল।

তুহিন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে বক্তার মুখের দিকে। খোদা বক্সের মাথায় যেন কোনও শব্দই ঢুকতে চাইছে না। দেবপ্রতিম চুপ করে আছেন। বারবার যে সুলতান গোরের কথা বলছে, ওর দোষ নেই। ও শুধু ভাবছে, লাশটাকে লুকিয়ে ফেলা দরকার। সবাই সেই কথাই চিন্তা করছে।

মৃতদেহ শোয়ানো হয় খাটিয়ায়, এমন সময় ডাক্তারদা তাঁর পরনের সাদা ধুতি খুলে কবির শায়িত দেহে থানের মতন মেলে দেন। তাই দেখে রাহুল বলল—থাক ডাক্তারদা, আপনি আর উলঙ্গ হবেন না।

ওই একটা কথাই যথেষ্ট ছিল, কেমন বোকা হয়ে যান বিশ্বরঞ্জন। কেমন দুর্বল ভেজা গলায় ডাক্তারদা বলেন—এটা দিয়ে ঢেকে দিতে দাও রাহুল, কোরা, খুব নতুন।

—বউ ! তোমার কাপড় আছে ! সাদা মেঝে ! বলে তাজ।

—লোতুন একখান আনেছে প্যাডলার। দিব ? কুটিরের ভিতর থেকে সুলতানের স্ত্রীর গলা ভেসে আসে। বউ বলে—পিঁদিনি অখুনও !

রাহুল বলল—তাই দাও !

হরবোলা বললেন—গরিবের জিনিসটা থাক রাহুল ! বিশ্বরঞ্জন যখন বলছে !...

রাহুল বলল—গরিবের জিনিস দিয়েই তো কবিকে জড়ানো উচিত স্যর ! আমি মনে করি, সেই সম্মান কবির প্রাপ্য !

বিশ্বরঞ্জন বোকারই মতন ধুতি হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইললেন। কথা বলতে পারলেন না। ওর চোখেমুখে অদ্ভুত হতাশা এবং সকরুণ সংকোচ মাখামাখি।

মৃতদেহ কাঁধে তোলে রাহুল এবং মুমতাজ। তার আগে ঘোমটা টানা ছোটোখাটো বউটি ওর নতুন কেনা সাদা মেঝের শাড়িটা হাতে করে বাইরে আনে। শাড়ির পাড়টি হালকা কচি কলাপাত বর্ণের, রাত্রির জোনাকি আর লণ্ঠনের গোমুত্র রঙের আলোয় সবই সাদা গোত্র হয়। বউ ঢেকে দেয় কবিকে। মরদেহ কাঁধে তোলা হলে বউ হঠাৎ বলে—শাড়িখান ফিরত আনবা তাজ ভাই, আমি পিঁদব। মানুষ তো মরে না, শরীলডাই মরে। আমি ধুয়ে লিব। কমরেডের গায়ের জিনিস, আমার খারাপ লাগবে না।

—তুমি লোভ করছ বউ ! দানের বস্ত্র আবার ঘরে আনব ? বলল তাজ।

—গরিবের লোভ থাকে জানো না ! বলল বউটি।

রাহুল স্তম্ভিত বিস্ময়ে জোনাকি ছড়ানো অজস্র আলোককণিকার দিকে চেয়ে ভাববার চেষ্টা করে, গরিব রিকশাচালকের বউটির ভাষা এক অভিজ্ঞতা বিশেষ, মনটা কেমন করতে থাকে। কেমন কষ্ট হয়। কে জানত, কবির মৃত্যুতে একথা শোনা যাবে একদিন।

—আমারটা নিলে না তোমরা। বলে ডাক্তারদা মৃদু গলায় হাহাকার করেন একটি বার।

হরবোলা বলেন—তুমি কেন আবার বলছ ডাক্তার ! তাজ ! আমরা কি তোমাদের সঙ্গে যাব ? বলি কি, হরিধ্বনি দিও একটু আধটু ।

—কেন ? চড়াসুরে প্রশ্ন করে ফেলে মুমতাজ ।

—লোক দেখলে দেবে ! শ্মশানে যাচ্ছ তো, অনেক পথ । পুলিস আছে কিনা ! আমি খবিত ছিলাম তাজ ! ধর্মের ভয় করি না

দেবপ্রতিমের কথায় রাহুল বলল—সেটাও এখন বুঝি বলবার মতো কথা ? যাই হোক ! আপনাদের আর আসার দরকার নেই ।

দেবপ্রতিম বললেন—কবি একটা শব বহনের কথা বলে গেছে রাহুল ! সি.এম যেভাবে যেতেন ! হরিধ্বনি হত ! আমার কথা কি খারাপ লাগছে তোমার !

রাহুল বলল—আমরা কোনও মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি না খতিব সাহেব ! দাহ করতে যাচ্ছি, দাহ নয় ; জলে ভাসিয়ে দেব কবিকে । একটা ব্যর্থ জীবন ; কবির কথা বাদ দিন আপনি । তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ !

মুমতাজ বলল—আপনি অনেক গল্প করেছেন, কিন্তু এই শবদেহ কোনও গল্প নয় স্যার ! স্তালিনের ছেলের মৃত্যুর গল্পটা না করলেই পারতেন ! কবিও কিন্তু অনেক গল্প জানত ! চলো রাহুল !

—আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমরা, আমি বুঝতে পারিনি ! কাতর গলায় বলে ওঠেন দেবপ্রতিম ।

রাহুল এবং তাজ আর কোনও কথা না বলে রাস্তায় নেমে আসে । কাঁধে ওদের মৃতদেহ । রাত্রি হনহনিয়ে গঙ্গাতীরে ছুটে চলেছে, জোনাকির অর্বুদ বিস্ময়-আলোকে হরিধ্বনি ওঠে । বল হরি, হরি বোল ।

পিছনে সেই ধ্বনি অন্য কণ্ঠে সহসা জাগে । তুহিন আর খোদার গলা । এবং সুলতানও শবানুগামী ।

বিশ্বরঞ্জন এবং দেবপ্রতিম সাহস করে এদের আর অনুসরণ করতে পারেননি ।

দ্রুত ওরা এগিয়ে চলেছিল । এক সময় মুমতাজ বলল—বউকে শাড়িখানা ফেরত দিতে হবে ।

রাহুল বলল—সে আর হবে না তাজ !

—কেন ?

—রক্তে ভিজে যাবে ।

—অমন করে চাইলে বউটা !

চুপ করে যায় আবার দু'জন । নৈঃশব্দ্য ভরে ওঠে জোনাকিপুঞ্জে । হরিধ্বনি না দিলে পিছনে হরিধ্বনি হয় না ।

—হরিবোল ।

—বলহরি ।

এভাবে অগ্রসর হয় কবির দেহ । সরু খাটিয়া, এক জনরেই দুই কাঁধে নেওয়া । সামনে তাজ । পিছনে রাহুল । যেতে যেতে সেই মৃত্যু পাহাড়ের মত ভারী হয়ে তাজ এবং রাহুলের কাঁধে চেপে বসে । যদিও এই মৃত্যুকে তারা গোপন করতে চায়, গঙ্গার স্রোতধারে লুকিয়ে ফেলতে চায়, এই গোপন জোনাকি মাখা রাত্রির রহস্যে তারা ধাবমান, তবু মনে হয় তুচ্ছ এ মৃত্যু পাহাড়েরই মত ভারী ।

রাহুল আর হাঁটতে পারছিল না, তার অলক্ষ্য অশ্রুময় দেহ কিছুতেই অগ্রসর হতে

চাইছিল না, তার জিভ প্রবল তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল তার এই দেহ অশ্রু দিয়ে বানানো, কিন্তু কোনও আকাশ-দেবতাও সেকথা বুঝতে পারছে না।

—আর কতদূর তাজ !

—তুমি কি আর পারছ না ?

—আর পারছি না।

—নামাও তাহলে।

খোদাও, তুহিন এবং সুলতান কাছাকাছি আসে। সুলতান এগিয়ে এসে বলে—খুদাকে তুহিনকে কাঁধে লিতে দেও রাহুল !

—নাহ্ ! হয় না। ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে রাহুল বলে।

সুলতান রোগা লোক। লাশ বইবার ক্ষমতা তার অতি সামান্য, তাছাড়া মদ খেয়ে রয়েছে, চোলাই, পা টলছে। খাটিয়া বানাতে গিয়ে একটা আঙুল কিঞ্চিৎ কেটে ফেলেছিল। ওর কাঁধে দিতে ভরসাও করছিল না রাহুল।

রাহুল বলল—বরং দু'রশি তুমিই কাঁধে করে চল, আমি আবার নেব। সাবধান, ফেলে দিও না।

কাঁধে নিয়েই সুলতান বলল—ভারী আছে গো, লম্বা মানুষ, গতর ছিল।

টলতে টলতে চলেছে কবি, ওর দেহের রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে সুলতানের উঠোনে। সেই রক্ত রাহুলের জামায়, তাজের পোশাকে। সেই রক্ত বউয়ের কাপড়ে।

হঠাৎ রাহুল বলল—ও যখন থানার লকআপে মার খাচ্ছে, আমরা ওর সঙ্গে দেখা করতেও পারিনি।

—ও কথা কেন এখন মনে করছ, রাহুল। বলল তাজ।

—ওর ঠিক কী হয়েছিল, বলতে পার ? রাহুল প্রশ্ন করল।

—নির্দ্বিধায় কিছুই বলা যায় না। মন্তব্য করল মুমতাজ আলি।

রাহুল আপন মনে ভাবতে থাকে। কবির মধ্যে এক ধরনের নাগরিক একাকিত্ব ছিল, বউদির মত। বউদির চিঠিটা এখনও জামার পকেটে গচ্ছিত আছে, ওটা আর একবার পড়ে দেখতে হবে। বউদি যেমন গ্রামকে ভালবেসেও গ্রামের হতে পারেনি, কবিও নাগরিকই থেকে গিয়েছিল। সেই একাকিত্ব তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল শেষের দিকে।

ওর মা তাঁর মৃত্যুর আগে ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন, চোখের দেখা, কারণ মায়ের কথা বলার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। নির্বাক মা চোখ দিয়ে দেখতেন ছেলেকে। সেই চোখের অনুভূতিটা কী, কল্পনা করতে চায় রাহুল। মনের মধ্যে সেই দৃষ্টি দেখতে পায়। সেই সতৃষ্ণ আকুল দৃষ্টি, অপলক। কিন্তু সেই চোখ নিবে গিয়েছে বোধহয় অথবা এখনও চেয়ে রয়েছে।

রাহুল ছোট্ট করে ডেকে উঠল—মা !

—কী হল রাহুল ! তাজের কণ্ঠস্বর।

—না, কিছু না !

হঠাৎ পিছনে জিপের আওয়াজ এবং আলো। খোদা বক্স চেঁচিয়ে উঠল—হরিবোল।

—বলহরি।

জিপটা শবযাত্রীদের পেরিয়ে সামনে চলে গিয়ে দু'সেকেন্ড দাঁড়ায়, হরিধ্বনি শোনে,

তারপর ছেড়ে চলে যায়।

—গোর দিলে ভাল হত!

—হত না।

—কেন?

—কাঁচা কবর দেখে নানান প্রশ্ন উঠত।

—প্রশ্ন কাকে করত? কারা?

—গ্রাম।

—গঙ্গার জল প্রশ্ন করবে না তাজ। বলল রাহুল।

—হরবোলা কিন্তু হরিধ্বনির সাপোর্টার মনে হল! একটু আধটু দিও, বলল না তখন?

—ওটা গল্পের জন্য। ওর হিন্দু-মন বলেনি। সি. এম যেভাবে মিটিঙে যেতেন, সেইভাবে, কিন্তু সি. এম. যে...থাক। বলল রাহুল।

—তাহলে কি আমি মুসলমান বলেই তখন একটা কেমন গন্ধ পেয়েছিলাম! সবিস্ময় জিজ্ঞাসা তাজের, যেন নিজেকেই বলল—হরবোলা কিন্তু শেষে কেমন হাঁপিয়ে উঠেছিল, ভয় করছিল, অবশেষে সে কি মুসলমান হয়ে যাবে! সিরিয়াসলি বলত কিন্তু।

—কী জানি!

—হ্যাঁ রে ভাই!

—মৃতদেহের কিন্তু ইচ্ছেটিচ্ছে থাকে না তাজ—না গোর, না শ্মশান!

—তা কি আর জানেন না দেবপ্রতিম? যাক যে!

—এত খারাপ করে কাউকে ভাবতে ইচ্ছে হয় না তাজ। ওঁর ব্যবহার করা রক্তমাখা রিভলবারটা আমারই পকেটে রয়েছে, সেটার কী হবে! কবির রক্ত লেগে রয়েছে!

একটু পিছিয়ে পড়েছে খোদা আর তুহিন। রাহুল আর মুমতাজের কথা হয়ত শুনতে পাচ্ছে না।

সুলতান বলল—তুমরা কি ভেন্ন হয়ে গেলা, কথার মাহাত্ম্য বুঝা যায় না যে!

—না হে, আমরা আছি। বলল মুমতাজ আলি।

—ধর ভাই! বলে উঠল সুলতান।

রাহুল খাটিয়া কাঁধে নিয়ে বলল—তুমি কুরিয়ার, এই সব কথা পেটে রাখবে। ডাক্তারদা বা প্রফেসর যেন না শোনে।

—মড়া লিয়েও জাতধর্ম উঠছে কিনা! কবির নসিব। বলল সুলতান।

—তুমিও ওকে গোর চিতে চাইলে! চাওনি?

—জি।

—কেন চাইলে?

—বিপদ বুলে, সিধা হবে তাই!

—এই পথে কোনও কিছু সিধা নয় সুলতান। বলল মুমতাজ।

—জি? বলে লজ্জা প্রকাশ করে সুলতান। এবং বলে—আল্লার জীব, সব সুমান। আমার কথা ধরবেন না।

—বল হরি। বলে হঠাৎ উচ্চনাদ করে ওঠে রাহুল।

—হরিবোল। বলে সমস্বরে জেগে ওঠে। জাতধর্মের তর্ক স্থগিত থাকে। সেই জিপটা সামনে আসে সম্মুখ পথ থেকে। একটু দাঁড়ায় এবং একটা রাউন্ড দিয়ে সামনের দিকেই ফিরে যায়। মনে হল, কিছু একটা ভাবছে পুলিস। এই শবযাত্রা তাদের চোখে

হয়ত সন্দেহজনক।

অনেক দেরিতে চাঁদ উঠল আকাশে। তখনও জোনাকি উড়ছিল, কিন্তু চাঁদের আলো যত স্বচ্ছ এবং বিকীর্ণ হতে থাকে, জোনাকিরা ততই যে কোথায় হারিয়ে যেতে থাকে।

দু' একটি জোনাকি চাঁদের আলোয় মিটমিট করতে থাকে বাতাসে, নদী ছলছল করছে, চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে। শবদেহ নামে জলে। স্রোতে পা পড়বা মাত্র রাহুলের শরীর কেমন কেঁপে ওঠে। ও খাটিয়া থেকে কবির মাথা ধরে নামায়, পা এবং গা দু'হাতে তুলে নিয়েছে মুমতাজ। সুলতান মৃহদেহের খুব কাছে নেই, একটু দূরে। খোদা এবং তুহিন সড়কের উচ্চতা থেকে নেমে ঘাসজমির ঢালে এসে বসেছে। ওদের দেহে জ্যোৎস্নার তুমুল কিরণ পড়েছে এখন। ওদের দেখায় খোদাই করা মূর্তির মত।

খোদা বক্সের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধা, সে দেখে মধ্যযাম পার হয়ে গেছে রাত্রি। অন্য কারও কাছে ঘড়ি নেই। কিভাবে সময় চলে গেল বোঝা গেল না। এই তো কিছুক্ষণ আগেও কবি বেঁচেছিল, যেন ঠিক পাঁচ মিনিট আগে। কথা বলছিল কবি দশ মিনিট আগে। রুখে উঠেছিল কবি সাত মিনিট আগে। কিন্তু এখন সে নেই, তার দেহ আছে। সেই দেহও আর থাকবে না।

জলে নেমে গেছে কবি। মাথার দিকটা ধরে আছে রাহুল। স্রোতের ধাক্কায় সে ঘুরে গেল। পা দু'খানি টেনে ধরে আছে মুমতাজ। স্রোত টানছে কবিকে। বুকের কাছে মাথাটা, রাহুল যেন ঘিরেছে তাকে।

তাজ বলল—সরে যাও, আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

রাহুল সরতে পারছে না।

—কী হল! সরো! আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। দেখো, কবি বুঝতেও পারছে না, আমরা ওকে নিয়ে কী করছি! ছাড়ো!

—কেউ যখন প্রশ্ন করবে, কী হয়েছিল, কী বলব!

—কে প্রশ্ন করবে রাহুল! ছেড়ে দাও! স্রোত কিন্তু তাড়া দিচ্ছে, টের পাও না!

—হ্যাঁ।

—কেন তবে এমন করছ?

রাহুল ছেড়ে দিল এবং সহসা চিৎকার উঠল—কবি চলে গেল, রইল না।

এই কথায় দুর্বোধ্য শব্দে প্রতিধ্বনিত গঙ্গার কোলে অতি এক পাগলের মত তুহিন আর্ত চাপা দলিত কণ্ঠে কেঁদে উঠল।

খোদা বক্স বলল—শেষ পর্যন্ত ছুঁতে দিলে না রাহুল! একটু ছুঁতে দিলে না!

তুহিন বলল—আমি খারাপ, খুব খারাপ খোদা? কী যে করলাম বুঝতেও পারলাম না।

মুমতাজ বলল—কবি কোথাও যায়নি রাহুল! তুমি জানো কবির কোনও পরপার নেই, ও শুধু এই জগৎটার কথা ভেবেছিল!

—কিন্তু আমি দেখলাম তাজ! ও আমার হাতের মধ্য থেকে বার হয়ে সটকে পড়ল, ঠিক একটা চালাক ছেলে! বলেই ধরা গলাটাকে ভেজা হাতে চেপে ধরে নিজেরই; বলা কথাকেই যেন রুদ্ধ করে দিতে চায় রাহুল।

মুমতাজ কাছে এগিয়ে এসে রাহুলকে হাত ধরে টেনে বলে—চলো! তোমার কাছে রিভলবারটা আছে?

—হ্যাঁ?

—দাও আমাকে ?

—তোমাকে দেব !

—হ্যাঁ, আমার কাছেই থাক।

রাহুল আর কোনও কথা না বলে অস্ত্রটা তাজের হাতে তুলে দেয়। তারপর জল থেকে উঠে আসে।

সামনে সামনে ঢালের দিকে এগিয়ে যায় মুমতাজ, পিছনে পরিশ্রান্ত রাহুল। পা চলতে চাইছে না।

বসে থাকা তুহিন এবং খোদা বক্সের সামনে দাঁড়ায় মুমতাজ। শাড়িখানা বুকে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলতান।

রিভলবারটা সুলতানের দিকে এগিয়ে ধরেছিল তাজ। হঠাৎ সেটি বসে থাকা তুহিনের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

—নাও, ধর !

চমকে উঠে মুখ তুলল তুহিন। চাঁদের আলো আকাশ থেকে সিধে ওর চোখে এসে লাগছে, চোখে জল শিশিরের মতন চমকায়।

—কী করব ? অর্ধস্ফুট গলায় তুহিন জানতে চায়।

—প্রফেসরকে দিয়ে বলবে, আমাদের অস্ত্র আছে।

—বলব ?

—হ্যাঁ, বলবে ! আমরা আমাদেরই অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারি !

—পার না ! বলে উঠল খোদা বক্স। বলল—বন্দুকটা ফেলে এসেছ, মনে থাকে না তোমার ?

—আছে, সব আছে। এটা আমাদের কাজে লাগবে না ! বলেই কোলের উপর রিভলবারটা ফেলে দিল মুমতাজ। তারপর রাহুলের হাত ধরে টেনে ঢাল বেয়ে উপরে উঠে চলে এল।

রাহুল বলল—এটা কি ঠিক হল তাজ !

—ঠিক হয়েছে ! ওটা অন্তত আমি আর ব্যবহার করতে পারব না, ওটার গায়ে কবির রক্ত লেগে আছে ! তুমি পারতে ? শুধালো মুমতাজ।

রাহুল কথা বলতে পারল না। চুপচাপ ওরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। অনেকক্ষণ ওরা হেঁটে আসে নিঃশব্দে।

—কোথায় যাব এখন ? প্রশ্ন করল রাহুল এক সময়।

—আমি ডাকবাংলোর ওখানকার মেসে গিয়ে থাকব, ওখানে একজনের ব্যবস্থা হতে পারে। দুজন এক জায়গায় থাকব না।

—ঠিক আছে, আমাকে ছেড়ে দাও !

—একটা ব্যবস্থা তোমার...

—ঠিক আছে।

—না, ঠিক নেই। দাঁড়াও ভেবে দেখি। প্রফেসর সিনহার ওখানে, বা লাহিড়ী ! ইকনমিক্স বা হিস্ট্রি, কিন্তু সবই দেবপ্রতিমের শেলটার।

—আমার ঠিক আছে তাজ ! চৌধুরী মেসে বা...তুমি ভেবো না, যাও বাংলোয় চলে যাও। ইস্ ! তুমি দেখছি চিন্তায় পড়ে গেলে।

—অনেক রাত।

—তা হোক ! রাহুল বলল। এবং বলল—'অবনী বাড়ি আছো' বলে ঢুকে যেতে পারব !

—সেটার কী মানে ?

—ওটা বুঝবে না, ওটা কবিতার লাইন ! শত কষ্টেও আমার মুখে ফের কবিতার লাইন এসে যায়। কবি তাই নিয়ে কখনও কখনও ঠাট্টাও করত। বলত, নাম কবি, অথচ আমি এসব মোটেও পারি না !

—কবিতা ধরে ডাকলে কেউ সাড়া দেয় ?

—রাশিয়ায় দিয়েছিল !

—এখানে ?

—তেমন কেউ থাকলে নিশ্চয় দেবে !

—তোমার এই কবিতাটায় কী ছিল ? সাড়া দিয়েছিল ? কী হল ? দিয়েছিল ?

—জানি না। বলে রাহুল মুমতাজকে ছেড়ে গোরাবাজারের দিকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

তারপর আপন মনে রাহুল কথা বলে উঠল কবিতারই লাইনে—ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার ! কেউ আছো ? দেখো, কবি নেই, কিন্তু কবিতাই সম্বল আমার এই রাতে।

—ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার ? 'অবনী বাড়ি আছো !' আপন মনে কথা বলতে বলতে রাহুল ছুটে যেতে থাকে। মনে হচ্ছিল কবি তার পিছনে পিছনে আসছে। ঠিক কাঁধের পাশে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। এখনই কথা বলে উঠবে। কিন্তু এ বিভ্রম মাত্র। বস্তুত কবিকে নদীস্রোতে, গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হল। রাহুলের জামায় এখনও কবির বুকের রক্ত লেগে আছে, কী অসম্ভব এই কাজটা, নিজেরই বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি চালানো, নিজেকে হত্যা করা ! এ কি সত্যিই কোনও আত্মহত্যার ঘটনা !

কখনও মানুষকে ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না, বাস্তবিক কবির কী হয়েছিল ! নাতাশা, মোহর, বউদি, আদিত্য সিংহ কেউ বুঝতে চাইবে না। ওদের উত্থিত প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে পারবে না রাহুল। এই মৃত্যুকে সে নিজেও কি মেনে নিতে পারছে !

ভাবতে ভাবতে রাহুল চৌধুরী মামার বাড়ির কাছাকাছি চলে আসে। তারপর অবাক হয়ে ভাবে, অন্যমনস্কভাবে এ কোথায় এসেছে !

সমির মামার বাড়িতে কে বা কারা থাকে, রাহুল জানে না। চৌধুরী মেসে যাবে ভেবেও যেতে পারল না। ওখানে গেলে নানা রকম প্রশ্ন উঠবে, বানিয়ে বলা কঠিন। অবিশ্যি মামার এখানেও প্রশ্ন করবার লোক থাকতে পারে। জামায় রক্ত লেগে আছে, একমাত্র মায়ের কাছে ফিরতে পারলে ভাল হত বুঝি ! তাজের জামায় একটু আধটু লেগেছে হয়ত, ও হয়ত গোপন করতে পারে। রাত্রে জলের কলে সাবান দিয়ে কেচে ফেলতে পারলে রক্তের দাগ অনেকটা চলে যেতে পারে।

ভাবতে ভাবতে মামার বাড়ির বাইরে দোরে কড়া নেড়ে ওঠে। কোনও সাড়া শব্দ পায় না। রাত অনেক। কত কে জানে ! রাহুলের হাতে ঘড়ি নেই। এখন মনে হচ্ছে, ঘড়ি থাকলে ভাল হত !

আরও একটু জোরে দ্রুত কড়া নেড়ে ওঠে, রাস্তায় একটা কুকুর চেঁচায়। পাশের বাড়ির পাণ্ডেদের বাড়ির ঘুম ভেঙে যেতে পারে !

—মামা ! ছোটমামা ! বলে ডেকেও উঠল রাহুল। ভিতরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠল, লোক জেগেছে।

দু'মিনিট বাদে বহির্ভাগের একটা জানলা খুলে গেল। কে ? একটি মেয়েলি গলা প্রশ্ন করল।

—আমি রাহুল। সমির চৌধুরীর ভাগ্নে আমি, দরজাটা একটু খুলবেন দয়া করে !

মেয়েটি আর কোনও কথা না বলে জানালাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল। রাহুল ভাবল, দরজা খুলবে না। হতাশ হয়ে সে ফিরে আসছিল পথের দিকে। পরিশ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত রাহুলের দেহ আর বইতে চাইছিল না। মনে হচ্ছিল সে পথের উপর পড়ে যাবে।

দরজা খোলার শব্দে সে পিছন ফেরে।

—এসো !

অবাক হয়ে গেল রাহুল। দরজার কাছে আসতেই চন্দ্রিমা বলল—এত রাতে তুমি কোথা থেকে ! প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, ভাবলাম ঠিক শুনছি তো !

—আর কোনও উপায় না দেখে এখানে এসেছি বউদি ! রাতটুকু থাকব, ভোরেই চলে যাব ! বলে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল রাহুল। ভিতরে ঢোকার সাহস হচ্ছিল না।

—এসো ! বলে চন্দ্রিমা ভিতরে সরে যায় পথ দেখিয়ে। ভিতরে ঢুকেই রাহুল প্রথমে দ্রুত হাতে দোরের হুড়কো তুলে এঁটে দেয়। এই ক্ষিপ্রতা লক্ষ করে চন্দ্রিমা।

ঘরের বারান্দায় উঠে বারান্দার বিদ্যুৎ বাতি জ্বেলে দেয় চন্দ্রিমা। সেই আলোয় রাহুলকে দেখে চমকে ওঠে দোলন। একেবারে বিধ্বস্ত একটা মূর্তি, চোখেমুখে উদভ্রান্ত ভাব, ফর্সা রঙটা যেন কালো হয়ে গেছে। রাহুলের যেন বয়সও বেড়ে গেছে। বউদিকে দেখেও রাহুল একটু সচকিত হয়, কেনম শীর্ণ আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে, অনেকটা করুণও বটে।

—তোমার সঙ্গে কে আছে এখানে ?

—কেউ নেই। আমি একা।

—একা !

—একজন কাজের মেয়ে আছে। খুব বুড়ি। মাঝে মাঝে দু'একজন মহিলা কমরেড এসে থাকে। এখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে রাহুল ! তোমাদের বাড়ি থেকে চলে এসে ভেবেছিলাম, কলকাতা ফিরে যাব ! মায়ের কাছে গিয়ে থাকব। কিন্তু লজ্জা করল খুব।

—কেন ?

—মুসলমানের বউ, ও বাড়িতে আমার ঠাঁই কোথায় !

—ও ! তোমার চিঠিটা আমি পড়েছি। শোন ? আমি জামাকাপড় কেচে ফেলব, পরবার জন্য একটা কিছু দাও আমাকে। তোমার একটা শাড়িই দাও, ভাঁজ করে পরব। গামছা আর সাবান দিও। বাথরুমটা ওদিকে, তাই না ? মুলমানের বউ কথাটিকে দ্রুত আড়াল করবার জন্য ত্বরিত স্বরে প্রসঙ্গ বদলায় রাহুল।

—তুমি খাবে না ? খাবার কিন্তু নেই। মুড়ি আছে। আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে ! কোথা থেকে আসছ, কিছুই তো বলছ না। দাঁড়াও ! বলে চন্দ্রিমা ঘরে ঢুকে এক মিনিট বাদে একখানা লুঙ্গি এনে সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল—মামার একখানা লুঙ্গি এখানে রয়েছে। নাও। জামাপ্যান্ট ছেড়ে দাও আমাকে। কিন্তু প্যান্টটা ভেজা কেন ?

—জলে নামতে হয়েছিল।

—কোথায় ?

—গঙ্গায়। পরে বলছি সব। জামাপ্যান্ট আমি কাচব। এত রাতে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। বলে রাহুল লুঙ্গিটা ধরে নেয়।

—দাঁড়াও তো! জামায় কী সব লেগে আছে তোমার? দাও আমিই কেচে দিচ্ছি! খোলো, খোলো! মাথা দিয়ে গলিয়ে নাও আগে। আহ্ তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—না বউদি। তুমি অনেক অনুগ্রহ করেছ, ভেবেছিলাম তুমি হয়ত দোরই খুলবে না। কথাই বলবে না। এই সব কাচাকুচি আমার অভ্যাস আছে!

—ভাই, তুমিই এবার একটু অনুগ্রহ কর আমাকে। তোমার শীত করছে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, কেমন একটু হচ্ছে যেন।

—তুমি খুব স্বাভাবিক নেই, শুধু হাতমুখ ধুয়ে এসে চুপ করে বস, জল ঘাঁটতে হবে না। দাও।

—না। আমি পারব। নিশ্চয় পারব। কেন পারব না!

—তুমি একটা কিছু করে এসেছ মনে হচ্ছে। কী করেছ?

চুপ করে থাকে রাহুল। রাহুলের মুখের দিকে অদ্ভুত স্নেহময় কিন্তু সন্দেহজনক অথচ সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চন্দ্রিমা। ওই দৃষ্টির সামনে রাহুল ধীরে ধীরে মূক এবং কোমল হয়ে আসে। অন্যমনস্ক চোখ তুলে ঘরের সিলিঙের দিকে চেয়ে লুঙ্গি গলিয়ে প্যান্ট ছেড়ে ফেলে রাহুল। আকাশের চাঁদটা কেমন টলটল করে তারই দিকে চেয়ে আছে, সেদিকে চোখ চলে যায় রাহুলের। জামা খুলে হাতের মুঠোয় জড়ো করে চেপে ধরে।

—বউদি! বলেই কেমন কেঁপে ওঠে একবার। তারপর বলে—তুমি রক্ত ধোবে বউদি! এই দেখো, কবির গায়ের রক্ত এখনও লেগে আছে। দেখো, দেখো, দেখো!

জামার শুকনো রক্তের জায়গাটা দেখায় রাহুল। চন্দ্রিমা কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে হাত বাড়ায় সে। প্যান্ট এবং জামা নিয়ে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হতে হতে চন্দ্রিমা বলে ওঠে—আমি জানতাম। ছোটনরা কখনও ফিরতে পারে না। ওরা ফাঁকি দেয়!

রাহুল বলল—কবি আত্মহত্যা করেছে। আমরা মারিনি, ও নিজেই নিজেকে শেষ করে দিল। বিশ্বাস কর! চমকে উঠে পিছনে চাইল চন্দ্রিমা, তার চাউনি কঠিন হয়ে ম্লান হয়ে গেল। সারামুখ শাদা হয়ে গেল। বাথরুমে জলের শব্দ, কবির শরীরের ঘ্রাণ, রক্তের সফেন ধারা—চন্দ্রিমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

বাইরে এসে বলল—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছ? ওটা রেখো না।

॥৩৯॥

প্রিয় রাহুল,

কখনও ভাবিনি এভাবে তোমাকে চিঠি লিখব। মণির কাছে এই চিঠি রইল, তোমাকে দেবে। তুমি অবাক হয়ে ভাবছ, এভাবে লিখছি কেন! নিতান্তই সখ করে চিঠি লেখার ধৈর্য আমার কোনওদিনই ছিল না।

ভালবাসার বিয়ে আমাদের। শুধু সেটুকুই বলার মত কথা, তা আমি মনে করি না। হিন্দু-মুসলমানে ভালবাসার বিয়েও নতুন ঘটনা নয়। মুঘল যুগে এই ধরনের বিয়ের খুব

চল ছিল, তার পিছনে রাষ্ট্রশক্তির উৎসাহ ছিল, বিশেষত বাদশা আকবরের দাক্ষিণ্য-প্রেরণা ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এই সব কথা অপ্রাসঙ্গিক নয় মনে করেই লিখছি। তখনকার দিনে মুসলিম রাজ-দুহিতা হিন্দু বিয়ে করেছে, হিন্দুর প্রেমে পড়েছে, এমন ঘটনার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে আয়েষার কথা শুধু সাহিত্য-কল্পনা নয়, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-কল্পনায় ইতিহাসেরও জোর আছে। তুমি হয়তো ভাবছ, চিঠি না লিখে আমি বুঝি ইতিহাসের নোট লিখছি। তোমার জন্যে নোট লেখার চেষ্টা আজ কবেই থেমে গেছে রাহুল! তুমিই থামিয়ে দিয়েছ।

পার্টির উৎসাহ না থাকলে বুলবনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বিয়ের পরিণাম লাভ করত কিনা বলতে পারি না। হয়তো করত, হয়তো করত না। যদি করত, ঘটনা বোধহয় এত জটিল না হতেও পারত। আশেপাশে এই জেলাতেও সাধারণের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে, গরিব মানুষের মধ্যেও আছে, হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে নিয়ে মানুষকে এত হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি। দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব হয়েছে অথবা হয়নি, সমাজ মানেনি, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সুখে আছে। আমাদের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়ার কি জো ছিল না! ঘটনা যাই ঘটুক, আমরা কি সুখী হতে পারতাম না! আজ আমি কাকে দোষ দেব, ভাগ্যকে?

ভাগ্য যে মানি না রাহুল! বলতে পার, আমরা নিজেরা নিজেদেরই উদ্যোগে বিয়ে করি, পার্টি সহায়তা করেছে মাত্র, যেভাবে স্বাভাবিক বিয়েতে সমাজ সাহায্য করে। মনে করি, একটি সত্যিকার সৎ এবং সেকুলার রাজনৈতিক দল সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ। শুধু তাই-ই নয়, যদি সেটি বিপ্লব-প্রয়াসী দল হয়, তাহলে তার মধ্যে আগামী সমাজের একটা ক্ষুদ্র রূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যদি তা না ঘটে, জানবে এ কোনও দল নয়। বরং সেই সব দল তাহলে সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক শক্তি।

আমার রাজনীতি বুলবন এবং আমাকে একই পরিণয়-সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। ভালবাসার টানে আমি তোমাদের সংসারে এসেছিলাম। বাপ মাকে, কলকাতার জীবনকে ছেড়েই আসিনি, ছিন্ন হয়ে এসেছিলাম। ছিন্ন যে, তাকে কেন বিচ্ছিন্ন হতে হল!

বড় ভাবের কথা লিখতে আজ ভয় করে। 'বিপজ্জনক শক্তি', 'সমাজের ক্ষুদ্ররূপ' এসব কথা বড্ড পলিটিকাল। জানি, এসব তুমি পছন্দ কর না। কিন্তু মনটার গড়নই এমন যে, আদর্শ শুধু কতকগুলো ভাব নয় বলেই, কথার মধ্যে ওই উচ্চ ভাবটিই বারবার বেজে উঠতে চায়। যে পারে না, সে তো শুধু ভাবটাকেই বুকে আঁকড়ে ভাবময় মানুষে পরিণত হয়। লোকে ভাবে, খালি বুকনি দিয়ে জীবনটাকে খাসাল করতে চাইছি। যত শক্তি এবং সাহস দিয়ে, প্রখর যুক্তি এবং ভালবাসা দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে হত, আমি তা পারিনি। সংগঠন শক্তির অত জোর ছিল না। এত জোর কখনওই ছিল না, যাতে কিনা তিনজন জোতদার খতম করেও সংগঠনের হাল ঠিক রাখা যায়। যতদিন জল আছে, ততদিন হরবোলা আছেন। জল নেই, হরবোলা নেই— আমি স্পষ্ট জানি, এইভাবে লক্ষ্যবিন্দু স্থির করলে, প্রণামপুর একদিন মিইয়ে পড়বে, ললিতরাই লাভবান হবে। আমি তাই তোমাদের অ্যাকসনে বাধা দিয়েছি। হয়তো ঠিক করিনি।

একটা বোঝাপড়া তোমার সঙ্গে ছিল, তা আর হল না। তার আগেই আমি আপন মনে বিদায় নিয়ে এলাম। আইনগত বিচ্ছেদ, বুলবন এবং আমাতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু বিয়ের সার্টিফিকেটটাও আর নেই। বুলবন ওই বস্তুটি ছিঁড়ে ফেলে বোধ হয় ভালই করেছে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল রাহুল! সন্দেহ, অবিশ্বাস জেগে উঠেছিল। তোমার বন্ধু বুলবন, মনে হচ্ছে বন্ধুত্বের এই উদার-দৃষ্টি আমাদের দাম্পত্যের

পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। বরং তুমি আমার দেবর, ও তোমার দাদা, এই সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভাল হত! কথাটি দুর্বোধ্য ঠেকছে, বুঝতে পারছি। একটা কথা কেবল লিখব, তুমি আমাকে দোষ দিও না। বন্ধুত্বের মধ্যে অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অতর্কিত জন্ম হয়, সেটা না বুঝেও হয়। বুলবন ঠিক মতন সংগঠন গড়ে তুলতে না পেরে, তোমার সাহসকে, যা ছিল মন্মথর ভিতর, তাকেই ভয় করে এবং অসহায় হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ওর বেকারত্ব নিয়ে জ্বালা, সে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করতে পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ললিত-নাটার আক্রমণে দিশে হারায়। কিন্তু সমস্ত ক্ষোভ এসে পড়ে আমার উপর। ক্ষোভ ঠিক ছিল, কিন্তু ও ভেবেছে আমি ওর নেতৃত্ব মানি না, পার্টি আমাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এভাবে আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি হয়।

কখনও যদি বুলবনের সঙ্গে তোমার কথা হয়, এই অবস্থার কথা জানা থাকলে তোমার হয়তো সুবিধা হতে পারে। আজ বুলবন পার্টির কাছে তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা আলোচনা করতে আগ্রহ বোধ করে না। বিয়ের কিছু পরে, মা ওকে একটি হাত-ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। মা বিয়ে মেনে নেননি, কিন্তু ঘড়ি কেন উপহার দিয়েছিলেন বোঝা যায় না। মানুষের কিছু অদ্ভুত আচরণ থাকে। বুলবন ওই ঘড়িটা অত্যন্ত পছন্দ করেছিল। ওটাকে ঘিরে ওর চমৎকার ইমোশন আমি দেখেছি। কিন্তু সেটাকেও আজ সে আর হাতে বাঁধার যোগ্য ভাবে না। প্রাণকিশোরদার হাত দিয়ে ঘড়িটা ওর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। এই রকম একজন মানুষের সঙ্গে আমি কী করে থাকব!

ওর আর আমার বিয়েতে, এমনকি ভালবাসায়, মুসলিম রাজ-দুহিতার মত আমারই ভূমিকা ছিল প্রধান। ইতিহাসের পালা বদল হয়েছে অনেক। হিন্দু-মুসলিম বাঙালি-জীবনে আজ কালচারের দিক থেকে হিন্দুরই আধিপত্য, সে নিশ্চয়ই কিছু এগিয়ে রয়েছে, আমি মধ্যবিত্ত হিন্দুর কথা লিখছি। ফলে ভীতু বুলবনকে আমিই বেশি ভালবাসি, ওর সাহস ছিল না। তুমি ওর বন্ধু, ওকেই জিগ্যেস করে দেখতে পার। ওকে ছেড়ে থাকব, এ কল্পনা করলেই ভয়ে অন্তর শুকিয়ে যেত। আজ থেকে সেই কল্পনার ভয় আর রইল না।

হঠাৎ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে মনে হল, আজ আমি চলে যাব। কিন্তু এই চিঠিটা লিখে তবেই যাব। দিনের সমস্ত দিন খরচ হয়ে গেল। এক ছত্র লিখতে পারিনি। রাত্রি হয়েছে। তোমার ঘরে বসে এই চিঠি লিখে চলেছি। নীচে বুলবন শুয়ে আছে।

এখনও চুলের গোড়ায় ব্যথা। বুলবন আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলেছে চুলের মুঠি ধরে, একে প্রহার বলে কিনা জানি না। আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে। মন্মথ আর তুমি তো আলাদা নও! চারিদিকে আতঙ্ক। নিত্য নাটা-ললিতের অত্যাচার। তুমি থাকলে এই বাড়ির সাহস থাকে। হয়তো কোনও একটা অবলম্বন হিসেবে, হয়তো তোমার কথা না ভেবে পারি না বলে, কী জানি কেন, স্বপ্নে এসেছিলে তুমি। মনে হচ্ছিল, তুমি এসে দুয়ার খুলতে বলবে। ঠিক সেই রকম কোনও ঘটনা ঘটে স্বপ্নে, আমি তোমার নাম ধরে বারবার ডেকে উঠি। এই স্বপ্নটি কি দোষের রাহুল! বুলবন ওভাবে আমাকে কেন টেনে চুল খামচে ধরে ; স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়— চুলের গোড়ায় ব্যথা, চিরুনি চালাতে গিয়ে বুঝতে পারি, আমার ভয়ানক কান্না পেয়ে যাচ্ছে। চোখের জল থামতে চাইছে না। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

দুপুরে যখন ওইভাবে একা কেঁদে চলেছি, দেখি ফুলভানু অবাক হয়ে আমার মুখের

দিকে চেয়ে আছে। লজ্জা করল খুব, কিন্তু চোখের জল লুকাতে পারলাম না। তুমি ওকে কথার ছলে 'ভুলভানু' বলে ডাক। ওর জীবনের বড় খেদ, স্বামী ওর মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না। পায়ের দিকে মাথা নীচু করে চেয়ে থাকে।

ওর আদলটাই যেন আমার মুখে এসে সেঁটে বসেছে। তাই যদি না হবে, তাহলে কেন বুলবন আমার চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না! পায়ের পাতার দিকে দৃষ্টি নুইয়ে কথা বলে! কোথায় বাধা আজ আর বুঝতে পারি না।

এভাবে তোমাকে লিখতে লিখতে সত্যিই বড় কষ্ট হয়। কলম সরতে চায় না। অথচ চিঠিটা ছোট করে যে লিখব, অত সংযমও আমার নেই। অনেক কথা তোমাকে লিখে জানাতে ইচ্ছে করছে। আজ অন্য কাউকে লিখে জানাব তেমন মানুষ নেই। পার্টিকে আমি সমস্তই বলেছি, নেতৃত্ব কী ভাবছে জানি না। শুধু বাড়ি ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তে প্রাণদা চুপ করে থেকে শেষে বলেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে পার্টি হস্তক্ষেপ করতে চায় না, তবে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবনের পক্ষে পার্টি। ভালবাসার দরদাম যারা করে তারা তো ব্যাপারি। আমি ওই একটি ব্যাপারে কখনও হিসেব করতে চাইনি, বুলবন তা-ও আজ ভুলে গেছে। অপমান করেছে কতভাবে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। লেখাও অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, আমি যেন জোর করে তোমাদের সংসারে পড়ে আছি।

আমি এমন এক বউ, বধূবরণের অনুষ্ঠান যার ভাগ্যে জোটে না, শ্বশুরগৃহে ঢোকার আগেই শ্বশুরকে জেলে যেতে হয় বিনা অপরাধে। জেলেই পড়ে রইলেন তিনি, আমি ঘর ছেড়ে চলে এলাম। কখনও যদি তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন, বুঝতেও পারবেন না, চন্দ্রিমা নামে একটি মেয়ে তাঁর পরিবারে বউ হয়ে এসেছিল, বাপমাকে ছেড়ে, পিতৃগৃহের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে একা তাঁর আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে চেয়েছিল— সবই একটা কাহিনীর মত শোনাবে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে। তিনি হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবেন না। যখন একথা ভাবি, বিশ্বাস কর, চোখে জল এসে পড়ে। কিছুতেই সংবরণ করতে পারি না।

মণিকে ছেড়ে আসতে কী কষ্ট যে বুকের মধ্যে বেজেছে, লিখে বোঝানোর সাধ্য নেই। ও আমার খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিয়েছিল, এমন করে বলত, যেন সেই কিশোর, মনে হত বাপের গলায় কথা বলতে চাইছে, সে আমার বাবা, আমার বুড়া বাপ। যাত্রাপালার অধিকারী কল্পনা করে নিজেকে, ব্যাঞ্জো বাজায়, ও চাষী, ওর কাঁধে ভর দিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল, ওর কাঁধ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে এবং বুলবনের স্কন্ধ বলে কিছু নেই, অস্তিত্বের সেই একটা শূন্যতা অনুভব করেও জীবনের সামনে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছি, শুধু স্নেহ পাব ভেবে। হল না রাহুল, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও!

মণিকে যে অমন করে নাকখৎ দিতে হল, সে যেন আমারই ভুল। ও মার খায় আমারই নির্বুদ্ধিতায়। বুলবনের উপর আমার অধিকার নেই, কিন্তু আমার উপর মণির অধিকার থেকে গেছে, এটা আমার অদ্ভুত অনুভূতি, যা কেবল তোমাকেই লিখে জানাতে মন চায়। আমার উপর এসে পড়া কোনও ধরনের সামাজিক অপমান মণি একদম সহ্য করতে পারেনি। তুমি যেভাবে ওকে রক্ষা করেছিলে, সে যেন আমাকে সেইভাবে রক্ষা করতে চাইত। ওর কাঁধের দাগগুলি স্পর্শ করে বিদায় নেব ভেবেছিলাম, হয়তো পারব না। মনে পড়ে, বুলবনের কাঁধে একদিন কিসের একটা রক্তাক্ত দাগ দেখে স্পর্শের হাত বাড়াতেই সে চমকে উঠল, আমার ছোঁয়াও ওর সহ্য হয় না, আর কী লিখব তোমাকে! এভাবে চলে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তুমি বুঝবে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তো তুমি বুঝবে ! আমি মনে করি, বুলবনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের মৃত্যু ঘটেছে। চলে না এসে উপায় ছিল না।

ইতি তোমার বউদি চন্দ্রিমা।

ভোর হয়েছে নিবিড় মেঘ সন্নিবেশে। এ রকম ভোর ; সূর্যহীন, কালো— জীবনে দু'চারটি হয়, মনে থাকে। জানলাটা খুলে দিতেই হু হু করে বাতাস তেড়ে আসে অন্তহারা কালো কটাশে মেঘের পাকাতে থাকা দিগন্ত থেকে, পাকিয়ে পাকিয়ে চলেছে আকাশ অবধি, একটা কিসের আয়োজন হচ্ছে গম্ভীরভাবে, কোনও ভয়ংকর কিছু, খুব গুরুতর। মেঘ দেখে এই ধরনের উপলব্ধি হয়। মেঘেরা বোবা, বিদ্যুৎ চমকায় না। রাত্রিতে কী গভীর জ্যোৎস্না ছিল, ভোরেই এই মেঘের মহলা ! চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, মনটাই এক প্রান্তরভূমি, খুব দূরে পড়ে রয়েছে, ক্ষীরনদীর তীরে, শৈশবে— ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে। এবং সেই মাঠে একটি লাশ উপুড় হয়ে পড়ে ভিজে চলেছে।

এই কল্পনাটা কিসের রাহুল ভেবে পেল না। কিন্তু মনটা ভার হয়ে গেল, কোথায় চলে গেল। এবং অসম্ভব কঁকিয়ে বেড়াতে লাগল একটা নিঃসঙ্গ সাদা বকের মত। বউদির চিঠিটা জামা কাচতে দেওয়ার আগে লুকিয়ে মুঠোয় ধরে নিয়েছিল। সেটি এখন বালিশের তলে রয়েছে।

চোখের পাতায় এখনও দুর্বহ ক্লান্তি। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেছে। তলে তলে বেলাও কি হয়েছে ! হঠাৎ মেঘের ফাঁকে খানিকটা ঘষা সাদা আলো চোখে পড়ল, ওটা কি সূর্য ? দোকানপাট কি খুলেছে ?

ঘরের দেওয়ালে বাঁধানো ফ্রেমে ক্ষুদিরামের ছবি। সেদিকে লক্ষ করতে গিয়ে খোলা দোরের দিকে চোখ যায়। এক হাতে প্লেটভর্তি স্লাইস পাউরুটি, একটা সেদ্ধ ডিম, কলা ইত্যাদি, অন্য প্লেটে চায়ের কাপ বসানো। বউদি ঢুকে আসে।

রাহুল বলল— এখনও মুখ ধুইনি। দাও, আগে চা খেয়ে ...

—না। খালি পেটে চা খাবে না। বাথরুমে যাও। মুখে জল দিয়ে এসো, ওখানে দাঁত মাজার পাউডার আছে। এগুলি খেয়ে চা খাও। যাও, ওঠো, ওঠো !

—চা জুড়িয়ে যাবে !

—ঢেকে রাখছি, চট করে জল দিয়ে এসো, দেরি করো না।

—তুমি তো জানো, মুখ না ধুয়েই চা খেতাম। রোজ। বাড়িতে। এই জন্যেই লোকে বাবাকে বাবু বলে ডাকে।

—সব জানি। রাত্তিরে কিছুই খেতে দিতে পারিনি। আজ মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে তবে চা খাবে। এটা কি বাড়ি ?

—মামাবাড়ি। বলে একটু হাসার চেষ্টা করে রাহুল বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। একটি তক্তাপোশের উপর তোশক পেতে বিছানা করা, মশারি টাঙানো। মশারির একদিকের দড়ি ফেলে দিয়ে জানলার কাছে বসে মেঘ দেখছিল রাহুল। বউদি টেবিলের উপর কাপ প্লেট রেখে এবং ঢেকে মশারি ভাঁজ করতে শুরু করে। রাহুল বাথরুমে যায়।

ফিরে এসে খাবার মুখে দিয়েছে, এমন সময় বাইরের দোরে কড়া নড়ে উঠল। বউদি ঝাড়ন দিয়ে বিছানার চাদরটি বুলিয়ে নিচ্ছিল, ওর হাত থেমে গেল রাহুলের বসে থাকা ভঙ্গিমার পিছনে। চৌকির লাগোয়া টেবিলে চা-খাবার, চৌকিতে বসে রাহুল খাবার মুখে তুলেছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে রাহুল চন্দ্রিমার মুখের উপর। বউদির

কপালের ত্বক ঈষৎ সংকুচিত এবং চোখ দুটি একটুখানি চমকে উঠেছে।

দাঁত দিয়ে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল। চন্দ্রিমা রাহুলের এই ধারা চকিতে দাঁড়িয়ে পড়া দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লেও মুখে বলল— অমন করে উঠে দাঁড়ালে কেন ? খাও, আমি দেখছি !

রাহুল কোনও কথা না বলে যন্ত্র-মানুষের মত ধপ করে চৌকির উপর বসে যায় এবং একদণ্ড স্থির থাকে, তারপর দ্রুত খেতে শুরু করে। ওর কেন যেন মনে হল, সে আর খাওয়ার সময় করে উঠতে পারবে না। তার খেতে খেতে আচমকা উঠে দাঁড়ানো, বউদির কথায় প্রায় অবোধ ভঙ্গিতে বসে পড়া এবং খেতে শুরু করা, সবই তার নিজেরই কাছে অদ্ভুত ঠেকে। সে ঠিক বুঝতেও পারছে না, একটা আশ্চর্য ভয় মুহূর্তের জন্য স্রোতবৎ তার ভিতরে বয়ে গেল কেন !

দোর খোলার শব্দ হয়, কথা বলার শব্দ হয়। কতকগুলো চেনা কণ্ঠস্বর একে একে বেজে ওঠে। টুকরো টুকরো হয়ে তাঁদের কথা বেজে উঠল। মায়ের গলা কেন শুনছে রাহুল ! সমির মামার গলা। আরও সব কারও আরও টুকরো ভাষা এবং সকলেই হয়তো কথা বলছে না, অনেক লোক ঢুকে এল। একটা বাহিনী।

চায়ে চুমুক দিল রাহুল। মেঘলা ভোর, মেঘলা সকালবেলা। কত ভোরেই না ওঁরা বাড়ি থেকে বার হয়ে এসেছেন ! খেতে খেতে বাইরে একটা জিপগাড়ির শব্দও শুনতে পেয়েছে রাহুল। জিপের শব্দ চেনে সে, ওই শব্দটায় ইদানীং ভয় করে, কবির মৃত্যু ওই শব্দকে আরও ভয়াবহ করেছে।

ওঁরা রাহুলের দোরে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমে মা ঢুকে আসেন। কোনও কথা না বলে আয়েষা চুপচাপ ঢুকে এসে মেজ ছেলের পাশে বসেন। নাতাশা ঢুকে আসে। চৌকির একপ্রান্তে বসে যায়। কথা বলে না। মণি এসে জানলার কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারও মুখে কথা নেই।

অতঃপর বুলবন দুয়ারে এসে দাঁড়ায়, ও ইতস্তত করে, চোখেমুখে থমথমে সংকোচ। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে মোহরকে দেখতে পায় রাহুল। চোখে চোখ পড়তেই মোহর দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। এই দু'জনই দ্বিধাগ্রস্ত, সংকুচিত এবং ভীরু। রাহুল সকলকেই চোখ তুলে দেখে নিয়েছে।

চায়ে দ্বিতীয়বার চুমুক দেয় রাহুল। ওর পরনে মামার লুঙ্গি, খালি গা। সহসা সন্তানের পিঠের উপর হাত রাখেন আয়েষা। স্বল্পস্ফুট গলায় 'মেজখোকা' বলে আর্দ্রসুরে ডেকে ওঠেন।

সমস্ত দেহ সিরসির করে ওঠে রাহুলের। কতকাল মা তাকে এভাবে স্পর্শ করেননি ! অকস্মাৎ আয়েষা হু হু করে কেঁদে ওঠেন—হায় খোদা, এই ছিল নসিবে। আর কত !

রাহুল আর চুপ করে থাকতে পারে না। দাঁড়িয়ে ওঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ভঙ্গিতে এবং মায়ের দিকে দেহটা মোচড়ায়, ঘুরে যায় সামান্য। মায়ের কথা কান্নার বেগে সম্পূর্ণ হয়নি।

—কী হয়েছে মা ! রাহুল বলে উঠে।

আয়েষার কান্না থেমে যায়। তিনি ডিটারজেন্ট খার-ধোয়া, স্পল্প ইস্ত্রি ছোঁয়ানো একটি শাড়ি পরেছেন, জামাটি নীল রঙের, শাড়িতে হালকা ফুলপাতার ছাপ। পায়ের চটি কালো ফিতের, চড়া নেই। পা থেকে খুলে না রেখে সোজা ঢুকে এসেছেন।

মা বললেন আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ দু'টি মুছে নিতে নিতে, শান্ত গলায়—ভাল খবর বাবা !

মায়ের এই কথায় চৌধুরী মামার মুখের দিকে চাইল রাহুল। মামা এ-ঘরের কাঁধতোলা বেঞ্চের একটা হাতলে বাঁ হাত ফেলে বসেছেন, ধুতি সামলে। রাহুলের দুর্বোধ্য বিস্ময়-পীড়িত এবং শঙ্কাঘন চাউনি দেখে বললেন—খবর ভালই। এসো বুলবন এদিকে।

ডানহাতখানি একটুখানি শূন্যে তুলে ছোটমামা বুলবনকে আহ্বান করেন। বুলবন বেড়ালের পায়ের মত নিঃশব্দে বেঞ্চের দিকে এগোয়।

রাহুল মাকে বলে ওঠে—খবর ভাল তো কাঁদছ কেন ! নিতান্ত উপায় না দেখে মামার বাড়িতে রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছি, এখনই চলে যাব। ভেবেছিলাম, বউদি হয়তো ঢুকতেই দেবে না। যাক গে। ভাল খবরটা বল তাহলে, শুনে যাই।

বলেই রাহুল আর একবার চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা শব্দ করে টেবিলে রেখে ঘর ছেড়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। এবং বলে—বউদি কোথায় ! আমার জামা প্যান্ট কি শুকিয়েছে !

—খোকা ! মেজখোকা ! ধরা গলায় মা ডাকলেন। ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মায়ের চাপা বেদনা টের পায় রাহুল।

—বাবুকে দেখবি না ! আমরা যে দেখতে এলাম !

অসম্ভব বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল।

মামা বললেন—জেল থেকে হাসপাতালে চালান করে দিয়েছে। চল।

মায়ের দিক থেকে মামা এবং মামা ছেড়ে নাতাশার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় রাহুল। তারপর মোহরকে দেখে। মোহর দোর ছেড়ে মাথা নীচু করে নাতাশার কাছে চলে যায়। নাতাশার গা স্পর্শ করে বসে পড়ে।

রাহুলের দৃষ্টি অন্যমনস্ক হয়ে জানলায় দাঁড়ানো মণির উপর এসে পড়ে। মণির চোখদু'টি মুগ্ধ-ব্যথিত চাউনিতে রাহুলকে দেখছে, একটু তীব্রও সেই চোখ। এবং মায়াময় অবশ্য।

সেই চোখে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না রাহুল। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। গভীর এক চাঞ্চল্যে উদ্বেল হয়ে উঠল হৃদয়। বানানো অপরাধীকে জেল থেকে হাসপাতালে চালান করে দিলেই সেটি সুখবর হয় না। অধিকাংশই খারাপ খবর হয়, মাকে সেকথা বলা হয়নি। জেলে না মেরে ফেলে, হাসপাতালে এনে চিকিৎসার ছলে মেরে দেওয়া প্রশাসন-পুলিশের পক্ষে সুবিধা ; জেলে মরেছে কথাটি জেলকর্তৃপক্ষকে লাগে, অত্যন্ত ক্ষীণ একটা লজ্জা হয় প্রশাসনের, কালো আইনের ঈষৎ ব্যথা জাগে নাকি ! শোনা কথা, হয় কিনা ভারতাত্মার গভীর অন্তর্নিহিত ধর্ম সেকথা বলতে পারে। একথা ভেবে রাহুল চুপ করে দেখতে থাকে অর্ধসিক্ত প্যান্টটার উপর তপ্ত ইস্ত্রি চালিয়ে যাচ্ছে বউদি।

—বাবুর খবর শুনেছ ?

—হ্যাঁ।

—মোহড়ায় খবর গেল কী করে ?

—আদিত্যদা মোটর বাইকে করে রায়হানদার সঙ্গে গিয়েছিলেন। মামাকে কোর্টে এসে এক কমরেড বলে যায় গতকাল সন্ধ্যায়।

—ও। তুমি কিছুই জানতে না ?

—আমি লালবাগ গিয়েছিলাম প্রোগ্রামে। রাত আটটায় ফিরেছি। পার্টি অফিসে আর

যাইনি।

—নসিব শব্দটা শুনলে আগে খুব রাগ হত বউদি! আজকাল আর রাগি না।

—কেন?

—মা-ও-সে-তুঙ একবার ওই কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। তোমার কী ভাগ্য বউদি! হাসপাতালে শ্বশুরমশাইকে কী অবস্থায় দেখবে! আচ্ছা চল। দাও, যা হয়েছে, হয়েছে, ছেড়ে দাও। পরে ফেলি।

রাহুল ফের বলল—বুলবন আর তুমি কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছ, বাপু সেকথা জানতেও পারবেন না। ভাববেন, বউ ছেলে তাঁকে দেখতে এসেছে, সাদা চৌধুরীর ভাগ্যের কথাটা ভাবো একবারটি। কী হল! দাও!

প্যান্টটা চন্দ্রিমা রাহুলের বুকের দিকে একপ্রকার ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এসব কথা এখন থাক রাহুল! তোমাকে এখানে দেখে বুলবন খুব প্রসন্ন হয়নি। তোমার খুব ভোরে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল!

—খুব আশ্চর্য মেঘ করল আকাশে। হল না!

—কী হল না?

—যাওয়া হল না বউদি। গঙ্গায় বিসর্জন দিলাম কবিকে। ও নেই আর মেঘ করল ভীষণ!

—ভাগ্য বলে মেনে নাও।

—না। নাহ্, কিছুতেই নয়। আমি মানি না। বাপুকে সাজা দিয়েছে ললিত, মানি না বউদি। কবি মরে গেল, কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। কদম আলি শেষ হয়ে গেছে, জানো! থানা ওকে মেরে ফেলে রেখেছিল পথের উপর। এই সব মৃত্যুর কি কোনওই মানে নেই! মা অত্যন্ত সরল বিশ্বাসে বাপুর সঙ্গে দেখা হবে মনে করে এসেছে! কী দেখবে মা! চল, চল, আর দেরি করতে পারি না।

বলতে বলতে রাহুল ঘরের কোণের দিকে সরে গিয়ে কাঠের আলমারির আড়ালে দাঁড়িয়ে প্যান্ট পরে নেয়। জামা গলিয়ে নিয়ে বলে—দ্যাখো তো, কোথাও রক্তের দাগ চোখে পড়ে?

চন্দ্রিমা জামার বিভিন্ন স্থান আঙুল দিয়ে দেখে, স্বল্প স্বল্প মাথা নাড়ে। না, নেই। মুখে সেকথা বলে না। মাথা নাড়ার অর্থ, হ্যাঁ হতে পারে। নাও হতে পারে।

রাহুল কিছুক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলে—বাবার সমস্ত মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে বউদি! তুমিই সেকথা বলেছিলে। একথা কবিকে আমি বলেছিলাম। কবি আমাকে মার্কসের রাতারাতি মাথার চুল সাদা হয়ে যাওয়ার গল্প বলেছিল। বাবার নামে স্লোগান দিতে কবি ভালবাসত। কোথাকার ছেলে কোথায় এসেছিল!

—তুমি কি একটুও চুপ করবে না রাহুল! বলে উঠল সকাতর চন্দ্রিমা।

রাহুল তারপর অসম্ভব নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওরা সবাই নেমে আসে পথের উপর। জিপ থেকে যায় বাড়ির বাইরের গাড়িঘরে। রাহুল হঠাৎ মণির একখানা হাত চেপে ধরে বলে—চ'। বলেই হাঁটতে শুরু করে নতুন হাসপাতালের দিকে।

মোহন সিনেমার মোড়ে এসে রিকশা ডেকে নেয় বুলবন। মামা এবং সে একখানা রিকশায় চড়ে বসে। মা এবং বউদি একটিতে ওঠে। নাতাশা এবং মোহর একটিতে উঠে বসে। দেখা যায় মণি এবং রাহুল হেঁটে চলেছে ঝড়ের বেগে। ওরা রিকশায় চড়ার কথা ভাবেনি।

রাহুল বলল—দ্যাখ্‌ ! মন খুব শক্ত করে থাকবি। বাপুর সামনে একদম কাঁদবি না। আচ্ছা, বাপুকে যে হাসপাতালে চালান করে দিয়েছে, গাঁয়ের অন্য লোক জানে !

মণি বলল—তরফদার ফ্যামিলি জানতে পারে। ললিত কনভেনার সব জানে।

—কী করে বুঝলি ?

—লোকমুখে শুনি। কবে নাকি বলেছে ললিত মাস্টার, বাপুকে ছেড়ে দিবে। বাপুর নাকি হাল ভাল নাই। খবিশের বাচ্চা শশাঙ্ক চাটকি দেয়।

—হাসপাতালে গিয়ে খারাপ কথা বলবে না।

—না।

—উত্তেজিত হবে না।

—না মেজভাই। হব না।

—কবিদাদা বেঁচে নেই মণি !

মণি এবার পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। রাহুল সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালের গোলাপি রঙের বিশাল দালানটির দিকে চেয়ে রইল দু'দণ্ড, তারপর দাঁড়িয়ে থাকা মণিকে বলল—সহ্য করতে হবে। কাঁদবে না, হাত কামড়াবে না। চলো।

মণির চোখ ছলছল করে উঠেছিল। বাঁ হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছল মণি। দু'বার শ্বাস টানল বুকের মধ্যে। একটা দুর্বোধ্য স্বর করল গলার মধ্যে। একটা পাশবিক কষ্টে যেন সে কেঁপে উঠল।

—চল্‌ মণি ! হাত ধরে টেনে রাহুল মণিকে নিয়ে এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

—কী করে মরল কবিদাদা ! কষ্টোত্থিত স্বরে প্রশ্ন করল মণি।

—গুলি করল নিজেকে।

—হায় আল্লা !

—হ্যাঁ মণি, তাই করল কবি ! সব কেমন হয়ে গেল, না রে ! তুই কিন্তু কাঁদবি না একদম।

—না।

—যদি চেনা কাউকে হাসপাতালে দেখতে পাও, শত্রু অথবা মিত্র ; চুপ করে থাকবে।

—থাকব।

—নাটা অথবা ললিত !

—থাকব।

—তিমিরবরণ বা সমীর পুরকাইত !

—থাকব রাহুলদাদা। বলেই মণি রাস্তার উপর ডুকরে কেঁদে বসে পড়ল। পথে লোক চলাচল কম। রাহুল এদিক ওদিক চেয়ে দেখে বোকার মত। মণির হঠাৎ ডুকরে ওঠা এবং পথের উপর দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়া রাহুলকে বিহ্বল করে তোলে। ওর ভয় হয়, মণি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ! মণি কি তার নিজের হাত কামড়াতে কামড়াতে চৈতন্য হারাবে !

—ওঠ্‌ মণি। লোকে দেখলে কী ভাববে ! তোর তো অনেক বুদ্ধি, তবু তুই অমন করিস কেন ?

—কবিদাদা মরল তুমি বুঝি কাঁদনি ?

—না।

—মিথ্যা ! তুমি কেঁদেছ। সব জানি, তুমি লুকিয়ে কাঁদো।

—ঠিক আছে, তুইও তাই কাঁদবি, লুকিয়ে, একা একা। এখন চ'। ওই দ্যাখ, মা, মামা, বউদি সব রিকশা করে আসছে। ওঠ্ ভাই!

মণি এবার চোখ থেকে হাত সরালো। পথের উপর দৃষ্টি মেলে রিকশার ছুটে আসা দেখল। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সড়কের পাশে পড়ে থাকা একখানা ইটের, মুঠোয় ধরা যায় এমন টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় টেলিফোনের ধাতব খাম্বার গায়ে। খাম্বাটি টিং করে বেজে ওঠে, তারে বসে থাকা একটি ফিঙে চেঁ চেঁ করে ওঠে বীভৎস স্বরে এবং উড়ে যায় হাসপাতালের দিকে। রাহুল চমকে উঠে সেদিকে চেয়ে দেখতে থাকে আকাশে এখনও কটাশে মেঘ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, সিসের মত এবং সাদা চর্বি ফেটে বেরিয়ে আসছে কালো মেঘের উদর ভিন্ন করে।

রেল স্টেশনের দিকে পথটা চলে গেছে সিধে। রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট। মুদি, মনোহারি, বইয়ের দোকান এবং চায়ের স্টলগুলি। পিচের পথ ঢুকে গেছে হাসপাতালের অভ্যন্তর অবধি। হাসপাতালের চতুঃসীমা ক্ষুদ্র নয়। রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়ার গাছ আছে হেথাহোথা। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রাণকিশোর এবং আদিত্য সিংহ। সঙ্গে আরও দু'একজন। গেটের দু'পাশে একটি পান বিড়ি সিগারেটের দোকান, অন্যটি চায়ের। চায়ের দোকানে মিঠে গোল পাউরুটি খায় রোগী দেখতে আসা লোকেরা। সেই অর্ধভুক্ত রুটির চাঁদফালিতে ডুমো মাছি বসে। দেবদারু গাছে অজস্র কিচকিচে পাখি রাতদিন ঝামেলা করে।

বউদিরা দু'মিনিট আগে পৌঁছে গেছে গেটের মুখে। রাহুলের জন্যই অপেক্ষা করছিল সকলে। প্রাণকিশোর অপেক্ষা করছিলেন। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি তাঁর চিরকালের পোশাক। পায়ে কালো জুতো, সর্বক্ষণ পালিশ করা। শত সংকটেও স্থিতধী। হাসতে হাসতে সহসা গম্ভীর হয়ে সংকটের তলদেশে দৃষ্টি চালনা করে দেন। উচ্চতা ছ'ফুট। দোহরা গড়ন। পকেটে গোঁজা ধুতির কোঁচ। গায়ের রঙ ফর্সা। চোখে প্লাস-মাইনাস চশমা। প্রৌঢ়ত্বের ছায়া পড়েছে।

পাশেই প্যান্ট-শার্ট-পরা আদিত্য নগ্ন তরবারি ধারালো বিভায় দৃপ্ত, কিন্তু তার চশমার কাচ অধিক পুরু। চেহারা তথাপি নায়কোচিত। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে একদল রাজনৈতিক কর্মী দলবেঁধে গেটের মুখে জড়ো হয়ে যায়। কিছু মহিলা কমরেডও এসেছে। আদিত্য তাদের সকলকেই আসার জন্য বলেছিল।

একটি দুধসাদা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে গেল।

আদিত্য রাহুলের একটি হাত পাকড়ে প্রাণদার মুখের দিকে চেয়ে বলল—জেলের মধ্যে মারপিট হয়েছে, গুলি লাঠি চালিয়েছে, শুনছি দু'জন মারা পড়েছে। ডি. এম. গুণ্ডা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নিজে দু'হাতে দু'খানা পিস্তল উঁচিয়ে কয়েদীদের শাসাচ্ছে, ওর পুরনো প্র্যাকটিস। কিছু কয়েদী নাকি এসকেপ করার চেষ্টা করে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা দুই নয়। অনেক।

নাতাশা বলে উঠল—বাপু! বাপুর কী হয়েছে আদিত্যদা?

একখানি পুলিস জিপ এবং একখানি ডি.এম.-এর গাড়ি ঢুকে গেল। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে আদিত্য রাহুলের হাত ধরে টানে এবং হাসপাতালের ভিতরে ছুটে চলে যায়।

রাহুল যা ভেবেছিল সবই সত্য। শত্রু মিত্র সবই আছে। কেউ বাদ নেই এখানে। ললিতের চোখে চোখ পড়া মাত্র ঘৃণায় রাহুলের মুখমণ্ডল কুঁচকে যায়। তিমিরকে দেখে রি রি করে রক্তের কণিকাসকল। নাটার বায়ু-আন্দোলিত সাদা, ঘিয়ে, মেহেদি দাড়ি কাঁধে

ঝাঁপিয়ে যায় ন্যাতার মতন, তাই দেখে রাহুলের চোখ দু'টি বিষণ্ণ হয়ে গেল।

আদিত্য বলল—যা জেলের ভিতরে ঘটেছে, হাসপাতাল কম্পাউন্ডে যদি তাই-ই ঘটে, রক্তপাত, অবাক হব না। তুমি তৈরি থেক রাহুল। বলেই আদিত্য পিছনে চেয়ে কোনও এক রামপূজন নামের কমরেডকে উদ্দেশ করে বলল—কিছু বুঝতে পারছেন ?

স্বাস্থ্যবান, বেঁটে এবং মাথায় মস্ত টাকঅলা সরল মুখের এক কমরেড, মাঝবয়েসী, রুমালে টাকের ঘাম মুছতে থাকে। মাঝে মাঝে টাকের ঘাম মোছা ওর কাঁধ মোছার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ওর মাথায় ঘাম হয়। লোহার মতন দেহের কাঠামো, চোখের দৃষ্টিতে ইস্পাতের ছুরিকা। হঠাৎ রাহুলের চোখ চলে যায় কলেজ-শিক্ষক, প্রফেসর বি. সি. লাহিড়ীর দিকে। উনি কেন এখানে ! পাশেই প্রফেসর বোলার, ক্ষ্যাপা, আত্মভোলা মানুষ। স্কোয়্যার ফিল্ডের ওখানে, কোর্টের কাছে, গাছের ছায়াতলে পাখি-বিক্রেতারা আসে। বোলার সেই পাখি প্রত্যহ কেনেন এবং উড়িয়ে দেন খাঁচা খুলে। পাখির বন্দিত্ব একফোঁটা সহ্য করতে পারেন না, কেঁদে ফেলেন। দুই প্রফেসরের ঠিক পাশেই তুহিন আর খোদা বক্স।

মুমতাজকে দেখতে পায় রাহুল। স্ট্রেচার নামছে অ্যাম্বুলেন্স থেকে, জখম মানুষ কাতরাচ্ছে। এদের বয়ে আনা হচ্ছে জেল-হাসপাতাল থেকে সাধারণ হাসপাতালে।

অম্বরীশলালকে দেখে ফেলে রাহুল। জিপ থেকে খাঁকি পোশাকমোড়া তাঁর দলবল নিয়ে নামলেন এবং হাসপাতালের প্রবেশ-পথে সিঁড়ির উপর, উপরের ঝুলন্ত ছাদের তলে গিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডি. এম. গিয়ে দাঁড়ালেন ওঁর পাশটিতে। আধমরা দেহ নামছে, লোহার কড়া গেট দিয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছে তীব্র গোঙানির শব্দে। তিমির এবং ললিতের লোকজন পুলিসকে ঘিরে রয়েছে, ওখানে শরমকে দেখে বুঝতে পারে রাহুল।

মণিকে দেখা যায়, ও শরমের কাছে, পুলিসের কাছে, অম্বরীশের কাছে, ডি. এম-এর কাছে, এর মুখে, তার মুখে চাইছে আর ঘুরছে। খালি ঘুরছে, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। রাহুল ভাবল, জেলখানা পাখির খাঁচা নয় বোলার স্যর ! আপনি কেন এখানে এসেছেন !

আদিত্য বলল—ডাইরেকট ডি.এম-কেই অ্যাপ্রোচ করব রাহুল। বলব, ভিতরে যেতে দাও। চল।

ওরা এগিয়ে গেল।

॥ ৪০ ॥

আদিত্য সিংহ পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে অম্বরীশলাল এবং ডি. এম.-এর কাছে। পিছনে রাহুল। প্রফেসর বোলার এবং লাহিড়ীও এগিয়ে এসেছিলেন।

আদিত্য বলল—আমরা ভেতরে ঢুকতে চাই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। সাদা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।

ডি. এম. বললেন—একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। জেল উত্তাল হয়েছে। জেলে পাগলি ঘন্টি বেজেছে। আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম হয়েছে, বুঝলেন ! খে, খে !

আদিত্য বলল—আপনার কথা আজকাল আমরা আর বুঝতে পারি না। ছোট্ট

রিকোয়েস্ট, ভিতরে যাওয়ার অনুমতি করুন।

—না। যারা আহত হয়েছে সব স্রেফ জেল-বার্ড, এদের সঙ্গে দেখা করা যায় না।

—সাদা চৌধুরী জেল-বার্ড!

—না। উনি এসকেপ করার চেষ্টা করেন! উনি আলট্রাদের চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান অফ বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল। ওঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে না।

—ওঁর ছেলে দেখা করতে চায়। ওঁর স্ত্রী এবং মেয়ে। আপনি গেট খুলে দিন।

—না।

—দেবেন না?

—না।

—তাহলে কি আমরা জোর করে ঢুকব? কে আলট্রা, কে চেয়ারম্যান, এসব কথা আমাকে বলছেন কেন? ওসব আমি বুঝব না। আমিই চৌধুরী ফ্যামিলির স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ—সকলকে ডেকে এনেছি। জেলে যা ঘটেছে এবং ঘটানো হয়েছে, সেসব আলোচনা করা বা শোনার আমার আগ্রহ নেই। আমি জানি, সাদা চৌধুরী ইজ এ পারসন অফ গান্ধীইজম। ওঁকে আলট্রা বা চেয়ারম্যান বানানোর চেষ্টা করবেন না। উনি চাষী মানুষ, একজন শিক্ষক। ওঁকে আর বিপাকে ফেলবেন না। আপনি অত্যন্ত থিওরি কপচাতে ভালবাসেন।

—ওটা ঠাট্টা!

—কী বললেন?

—ঠাট্টা করি। রসিকতা। মানুষ শাসন করার জন্য আমারও তো কিছু এনার্জি লাগে। আমি একজন ডি. এম.। সো, সি. এম.-এর উপর আমারও অগাধ শ্রদ্ধা। 'স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল' চমৎকার, চমৎকার! ভাবি, কী দুষ্টু হয়েছে ছেলেগুলো, এদের পেঁদাতে যায় পেয়াদা। আমি বলি, না না, তা হয় না। মূর্খ পেয়াদা, বর্বর মিলিটারি কেন সোনার ছেলেদের গায়ে হাত দেবে। ওরা মার্কসবাদ বোঝে? বোঝে না। ওরা লিন পিয়াও কে, একদম জানেই না। সো, আমরাই পেঁদাতে পারি, অম্বর এস. পি. পেঁদাতে পারেন। কিন্তু জেলের মধ্যে কতকগুলো গুণ্ডা ঢুকে গিয়ে দুটো জেল-বার্ড মারল, পাঁচটা চেয়ারম্যানকে জখম করে দিল। তাই বা হবে কেন? হাসপাতালে এনে তাদের সব চিকিৎসা হচ্ছে। এটা কিন্তু ঠাট্টা নয় স্যার! যান চলে যান। গো ব্যাক টু পার্টি-অফিস। গো ব্যাক টু মাসেস অ্যান্ড অর্গানাইজ দেম। বলুন যে, আমি ঢুকতে দিচ্ছি না।

—মাস ইজ অলরেডি অরগানাইজড়। আমিও ঠাট্টা করছি না। নাউ, অফ কোর্স, আপনাকে গেট ছেড়ে দিতে হবে স্যার! রামপূজন, গেট রেডি। বলে চিৎকার করে উঠল আদিত্য সিংহ।

অম্বরীশলাল সিঁড়ির একধাপ নেমে এসে বললেন—হাসপাতালের গেটের সামনে গেট রেডি বলবেন না আদিত্যবাবু! আপনি ট্রেড-ইউনিয়ন মুভমেন্টে লিডারি করে জেল খেটেছেন। আপনি নেতা, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করুন। যারা জেলের ভিতর গুণ্ডামি করেছে, তারা কিন্তু এখানেও আছে।

—আছে। তাদের নেতারাও রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। বাট উই আর নট অ্যাফ্রেড অফ দেম।

—জেদ ধরবেন না আদিত্য। পরিণাম খারাপ হবে।

—কোনও জেদ নয়, আপনি আমাদের ঢুকতে দিন। এসো, রাহুল। বলে রাহুলের

হাত ধরে হেঁচকা টান দেয় সামনে এগোতে উদ্যত আদিত্য সিংহ। এবং পিছন ফিরে চেয়ে দেখে সমগ্র হাসপাতালের চত্বর এবং সড়ক লোকে ভর্তি হয়ে গেছে। তার কর্মীদের এক বিপুল বাহিনী ঢুকে এসেছে। ঢুকে পড়েছে রাহুলের দলের ছেলেরা। মর্নিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দেখা যাচ্ছে। আদিত্যর দলের রিকশা ইউনিয়নের লোকজন এবং চালকরা ভিড় করে এসেছে। আদিত্য সকলকে সাবধান করে বলে রেখেছে, পুলিস-প্রশাসন যতক্ষণ আঘাত না করে, কর্মীরা যেন আগে থেকে ঝাঁপিয়ে না পড়ে। তার শঙ্কা, রাহুলের দল না অঘটন ঘটিয়ে ফেলে।

আদিত্য উচ্চে গলা তুলে বলে উঠল—কমরেডস!

সেই আর্তনাদ অতি রুদ্র ভয়ংকর দীপ্র, অগ্নিক্ষরিত, অতীব তেজালো। জনমন মুহূর্তে মথিত হয়ে উঠল।

আদিত্য প্রায় বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে উঠল—আপনারা জানেন যে, এই জিলার জিলা-শাসক একজন ওয়েল-ইনফরমড়, পণ্ডিত মানুষ, কথায় কথায় তিনি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মা-ও-সে-তুং থেকে কোটেশন দিতে পারেন এবং শুধু তাই নয়, তিনি ওইভাবে মানুষকে জেলে ভরতে, ফাঁসি চড়াতে, রাস্তার উপর মেরে ফেলে রাখতে ইনস্পিরেশন পান, এনার্জি স্টক করেন ইন দ্যাট ওয়ে। হি ইজ এ ভেরি কালারফুল, এ ম্যান অফ পার্সোন্যালিটি। তাঁকে আমরা নমস্কার জানাতে এসেছি।

এবার চারিদিক থেকে অজস্র পায়রার ডানার ঝাপটের মত করতালি হয়। করতালি যখন স্তিমিত হয়ে আসে আদিত্য বলে উঠল—প্রার্থনা করি তিনি গেটের তালা খুলে দেবেন, আমরা সাদা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে পারব। আমরা তাঁকে অনুরোধ করি, আহত চৌধুরী সাহেবকে চিকিৎসা শেষে এখান থেকেই তিনি বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেবেন, তাঁর রিলিজের ব্যবস্থা করবেন। প্রশাসককে আমরা ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

—আমার কাউকে রিলিজ করার এক্তিয়ার নেই। না, নেই। আমি এখানে আহতদের চিকিৎসার জন্য এসেছি, কোটেশন দিতে আসিনি। এবং আমি কাউকে শৃঙ্খল পরিয়েও রাখিনি। যদিও আপনাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছু নেই। সো, শুয়োরের বাচ্চার মত করবেন না।

—হোয়াট! বলে আর্তনাদ করে উঠলেন প্রফেসর বোলার। তাঁর সাধু প্রকৃতির শ্মশ্রু-আচ্ছন্ন মুখটি রক্তাক্ত হয়ে গেল। পায়ে জুতো পরেন না। পরনে অত্যন্ত সস্তা মোটা ধুতি, পায়ের পাতা অবধি নামে না, গায়ে খদ্দরের স্থূল সূতার সাদা পাঞ্জাবি, কোথাও ইস্ত্রির ছোঁয়া লাগে না। তেমন পরিচ্ছন্নও নয়। চোখে সর্বক্ষণ মহত্তের ছায়া, নিবিড় কোমলতা এবং চাউনি পাগলের প্রায়। তিনি আর সহ্য না করতে পেরে মুখ খুললেন—তুমি ছেড়ে দাও, চাকরি ছেড়ে দাও।

শুনেছি, দিল্লিতে তোমার ভাল প্রমোশন অপেক্ষা করছে। আমি তোমার ক্লাশমেট, বন্ধু। আমি বলছি, তুমিই জেলে গুণ্ডা ঢুকিয়েছ, আমার ছাত্রদের মেরেছ। প্লিজ ওপেন দ্য ডোর। ভেতরে যাব। আমি রাজনীতি বুঝি না। ওহে মহামান্য, খোলো!

—বোলার তুমি কথা ব'লো না। তুমি কেন এখানে এসেছ! চলে যাও। বলে উঠলেন ডি. এম.। ওকে সরিয়ে দাও, এখান থেকে—বলে চিৎকার করলেন।

ডি. এম যেন বোলারকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। একসঙ্গে পড়াশুনা করেছেন বলেই হয়তো। কৈশোরের বিবিধ মধুর-অম্ল স্মৃতিকে ভয় করছিলেন হয়তো বা।

তিনজন পেয়াদা নেমে চলে আসে বোলারের কাছে। লাঠি উঁচিয়ে তোলে। কেমন একটা চাপা, জটিল এবং ধারালো গুঞ্জন হয়।

মুমতাজের গলা এবার ফেটে পড়ে—তোমার স্যারের গায়ে পুলিস হাত তুলেছে রাহুল ! আমরা সহ্য করব না। না, নেভার ! বলে ভিড় ঠেলে ছুটে এসে পেয়াদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চারপাঁচজন তাগড়া জোয়ান তাজকে ঘিরে ধরে, টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে একজন ওর বুকের ডানপাশে ছুরি চালিয়ে দেয়। ওই পাঁচজনকে আরও দশজন গুণ্ডা ঘিরে রইল, মুমতাজ খুন হয়ে গেল। জনগণ বুঝতেই পারে না, কী অতর্কিতে ঘটনাটি ঘটে, কী ক্ষিপ্রতায় ! মাটির উপর কাত হয়ে পড়ে যায় তাজ। বোলার মুমতাজের উপর ঝুঁকে পড়েন।

শুধু কোনক্রমে বোলার স্যার বলে ওঠেন—তুমি কি আমার ছাত্র বাবা ! এ কী হল !

হাসপাতালের দরজা খুলল। খুলল, কিন্তু রাহুল ছাড়া কেউ তৎক্ষণাৎ ঢোকার অনুমতি পেল না। এবং ঢুকে গেল ছুরিকাবিদ্ধ তাজের দেহ। বাইরে তখন তীব্র শব্দে হাতবোমা ফাটার শব্দ হয়। মারামারি বাধে। কে কাকে মারছে বোঝা যায় না। কাঁদানে গ্যাসে আকাশ ছেয়ে যায়। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পরিবেশ, কৃষ্ণচূড়ার ডালে ধুঁয়োর মেঘ।

একটু বাদে আদিত্য ছুটে এল প্রাণকিশোরের কাছে। বলল—পরিস্থিতি জটিল। মনে হচ্ছে, তিমির ছুরি চালিয়েছে, শরম আলি ছিল। অবশ্য বোঝাও যাচ্ছে না, সত্যিই কে ছুরি মারল ! আপনি, মামা আর বুলবন মেয়েদের সঙ্গে করে পার্টিঅফিস ফিরে যান। রামপূজন একজন পেয়াদাকে আছড়ে ফেলে দিল, বুঝতে পারছি না, জল কতদূর গড়াবে।

—তুমি তাহলে দ্যাখো !

—হ্যাঁ।

বলেই আদিত্য ভিড়ের জটলার দিকে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে আসে। অম্বরীশলাল ওর কাছে এগিয়ে এসে বলেন—ঠিক আছে, আপনি হাসপাতালে ঢুকে যান। আপনি থাকলে হাঙ্গামা আরও বাড়বে।

—না। বাড়বে না। আমিই এদের থামাতে পারি। আপনার চোখের সামনে এভাবে খুন হয়ে গেল একজন, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন ! বলেই আদিত্য একে ওকে তাকে ধরে ধরে নিরস্ত হতে বলে। অম্বরীশের কথা শোনে না ক্ষুব্ধ জনতা। হঠাৎ আদিত্যর মনে হয়, মণি কোথায় ?

একটি নীলরঙের পুলিসভ্যান ঢুকে এল এক সময়। বেশ কিছু লোককে পুলিস অ্যারেস্ট করে গাড়িতে ওঠালো। জখম হয়েছে অনেক লোক। রামপূজনের মাথা গড়িয়ে কাঁধে রক্ত ঝরছে। দ্রুত ছুটে এসে তাকে ধরে আদিত্য। ক্রমশ বুঝতে পারে, বিস্তর মারামারি হয়েছে।

হাসপাতালের গেট এখন হাট হয়ে খুলে গিয়েছে। আধমরা মানুষকে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে। কিন্তু মণিকে কোথাও দেখা যায় না। আদিত্য পূজনকে সঙ্গে করে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে আসে। তাজের খুন হওয়ার পর দেখতে দেখতে চল্লিশ মিনিট কেটে গিয়েছে। তারই চোখের সামনে অতঃপর সহসা হাসপাতালের গেট বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে ধীরে ধীরে জন-সমাবেশ হালকা হয়।

হাসপাতালের মেঝেয় আহত মানুষ পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে—ডাক্তার নেই, নার্স নেই। ললিত, নাটা, তিমির কাউকে এখানে দেখা যায় না। খুব সম্ভব নাটা-ললিত এবং তিমিরের

দলের কিছু লোককে অ্যারেস্ট করেছে পুলিস। নীল ভ্যানটা ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। পূজনকে দেওয়ালে পিঠ ঠেসে মেঝেয় বসে যেতে বলে আদিত্য সিংহ।

একের পর এক আহতদের দেখতে দেখতে আদিত্য বেডগুলিও দেখে নেয়। দলের কিছু কমরেডকে দেখতে পায়। অন্যদের দেখে বোঝে, ওরা রাহুলের দলের কর্মী। সামান্য সামান্য আঘাত পেয়েছে তারা। প্রত্যেককে হাত তুলে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় আদিত্য। অধিকাংশ মেঝেয় পড়ে আছে।

তারপর সে একটি অদ্ভুত দৃশ্যের সামনে দাঁড়ায়। মেঝেতেই পড়ে রয়েছেন সাদা চৌধুরী। নাকে নল লাগানো, একই সঙ্গে পাশাপাশি অক্সিজেন-সিলিন্ডার এবং স্যালাইন-বোতল দেখা যাচ্ছে। বুকের ভেতরটা কেমন সিরসির করে ওঠে। মাথার কাছে বসে নিশ্চুপ মণি। রাহুল দাঁড়িয়ে।

ঘোরের মধ্যে, মৃত্যু এবং চেতনা, পরস্পর নিবদ্ধ-সীমায় সাদা চৌধুরী বেঁচে। ঠিক তার খানিক তফাতে তাজের শরীরেও নল-বাহিত। শ্বাস ঢুকছে। ওকেই চেয়ে চেয়ে দেখছে রাহুল। তাজকে ও.টি.তে তোলা হয়েছিল।

আদিত্য রাহুলের গায়ে হাত দিতেই রাহুল কেঁপে উঠে বলল—তাজ যদি অমন না করত! দরজা খুলত না! তাজ বাঁচবে তো আদিত্যদা!

আদিত্য এত সত্ত্বেও আশ্বস্ত হয় একথা ভেবে যে, তাজের চিকিৎসা হয়েছে। বুকের ডানপাশের ছুরি বেঁধানোই ছিল, সেটি ডাক্তার সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে সেলাই করে দিয়েছেন। তাকে অচৈতন্য করে অপারেশন করেছেন ডাক্তার নার্স। এখনও তাজের জ্ঞান ফেরেনি।

হঠাৎ-ই একজন ডাক্তার দ্রুত হেঁটে যান সম্মুখ দিয়ে। পিছনে একজন নার্স ছুটে যাচ্ছে। আদিত্য সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ তুলে ডাক্তার যেতে যেতেই বললেন—সব ঠিক আছে। কেউ মরবে না।

রামপূজনের মাথায় ব্যান্ডেজ হয়।

—আপনি বলছেন, কেউ মরেনি?

—মরেছে। সে দায়িত্ব আমার নয়। কতকগুলোকে মেরেই এনেছে। আমি কী করতে পারি! ওই ঘরে গিয়ে দেখুন। আন্দোলন করবেন আপনারা, আর যত হ্যাপা আমাদের সামলাতে হবে। জেলের ভিতর থেকে বাইরে আন্দোলন ছড়ানো যায় না। এসকেপ করতে গেলেই মরতে হবে। আসুন আদিত্যবাবু! একটা কথা বলি।

বলে কম বয়েসী ডাক্তারটি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন—যা করছি, স্বেচ্ছায় করছি মশাই। ডি. এম.-এর নির্দেশ অন্য রকম ছিল, সেসব আপনাকে বলব না।

—জানি।

—আপনারা কিছুই জানেন না। আপনাকে এখনই চলে যেতে হবে। আমার কাছে একটা লিস্ট দিয়ে গেছে ওরা।

—কারা?

—ডি. এম. তারপর এস. পি.। সেই লিস্ট অনুযায়ী কিছু পেশেন্ট এখানে থাকবে। বাকিদের বার করে দেব। এভাবে গাদাগাদি করে রাখা যাবে না। সিট নেই, জায়গা নেই।

—সাদা চৌধুরী?

—ওঁর মুক্তি নেই।

—তাজ ?

—জানি না, এস. পি. এসে কী বলবে ! হয়তো বলবে, সে খুন করার চেষ্টা করেছিল। সো, যেমন বলে ওরা, সো হি ইজ আন্ডার অ্যারেস্ট। বেঁচে ওঠার আগেই ওকে হাতকড়া পরাবে কর্তারা। আছেন কোথায় ? ভারতবর্ষ দেশটাকে চেনেন আপনি ? আসুন, একটু নরক-দর্শন করে যান। অদ্ভুত নিরাসক্ত, অথচ কোমল শোনায় ডাক্তারের গলা।

আর সাহস হচ্ছিল না রাহুলের। একবার সে বাপু এবং তাজের দিকে দূর থেকে চেয়ে দেখে। মণি হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে রয়েছে নির্বিকার, যেন একটি মূর্তি। আদিত্য সিংহ ডাক্তারের পিছু পিছু চলে যাচ্ছে। দ্রুত পায়ে সেদিকে চালিত হয় রাহুল।

দরজাটা খুলে দিলেন ডাক্তার। তারপর বললেন—দেখুন !

ভয়ে চমকে উঠল আদিত্য। কতক মরে গেছে। কিছু এখনও বেঁচে। মুখ দিয়ে শব্দ করার ক্ষমতাও আর নেই। মানুষ নয়, মাংসপিণ্ডের জড়াজড়ি মাত্র। কেউ কারও সন্তান নয়, স্বামী বা ভাই নয়, থ্যাঁৎলানো, রক্তাক্ত লাশ। কারও মাথাটি পড়ে রয়েছে কারও বুকের কাছে, যেন সে আশ্রয় চাইছে মৃত্যুর পরেও।

—এদের কি বাঁচাব বলুন তো ! ভারী এবং প্রায় রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন ডাক্তার।

—ওটা নড়ছে এখনও, ওকে দেখুন ! বলে আদিত্য অর্ধ অস্ফুট শব্দ করে গলায়।

—বাঁচবে না। বললেন ছোকরা ডাক্তারটি। অবয়বে ছোটখাটো মানুষ। কিন্তু ব্যক্তিত্ববান।

তখন মৃত্যু-শোণিতময় কড়া গন্ধে নিরেট ঘরটিতে ক্ষীণস্বর ওঠে—জল !

কে অমন করে কাতরে উঠল—কোন্ মৃতদেহ, কোন্ জীবন-পিপাসা ? এখনও কি প্রাণ আছে দেহে ? এরা অধিকাংশ রাহুলেরই আদর্শের মানুষ। বিকৃত হয়ে গেলেও রাহুল দু'একজনকে চিনতে পারছে। ওই তো চন্দন চন্দ, ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র ছিল গত সন। ওখানে পড়ে আছে শিশির বাগ, বানজেটিয়ার ওদিকে কলোনিতে থাকত বিধবা দিদির কাছে। কারবালার মধু আর বেঁচে নেই।,

জল ! আবার ক্ষীণ কাতরানি ; মাথা তোলার চেষ্টা করছে। ঠিক তার পাশেই চন্দন অতি কষ্টে শেষবারের মত মাথা তুলে 'জল' ডেকে ওঠা কিশোরটিকে স্পষ্ট চোখ মেলে দেখল। মানুষের শেষ উত্থান এরকম বুঝি হয় !

—ভাই ! বলে চন্দন ডাকল কিশোরটিকে। চন্দনের মাথা দিয়ে এক ঝলকে ঝরে পড়ল রক্ত। নিজেরই রক্ত সে আঁজলা পেতে ধরল। ওর কী বোধ মস্তিষ্কে কাজ করে তখন ! চন্দন কি মনে করে হাতে ধরা শোণিত আসলে অশ্রুজল, সেই অশ্রু কি শীতল পানীয় ? রক্ত, অশ্রু, জল—তার মৃত্যু-আচ্ছন্ন অনুভূতিতে কিভাবে একাকার হয়ে যায় ! আঁজলা ধরা রক্ত সে কিশোরটির মুখের দিকে ঠেলে দেয়। সেই রক্ত কিশোরের মুখে ঝরে পড়ে। এই ভাবে কি বাঁচে মানুষ ?

দু'চোখে হাত ঢাকে রাহুল, আর চেয়ে দেখতে পারে না। বিদীর্ণ হয়ে ওঠে দুর্বোধ্যস্বরে। কিশোরটি জল চেয়েছিল, চন্দনের কাছে জল তো ছিল না, রক্তই ছিল।

ডাক্তার দুয়ার টেনে বন্ধ করে দিলেন। বললেন—আসুন !

—বাঁচত না ?

—না।

—চেষ্টা কেন করলেন না ডাক্তারবাবু ?

—আমি একা কী করব ?

—আর কেউ ?

—কে কোথায়, আমি জানি না। ব্যস ! ছুটি। বলতে বলতে ডাক্তারটি জুতোর ঠক ঠক শব্দে অন্যদিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। নার্সটি চলে যায় পিছু পিছু।

এস. পি. ঢুকে আসেন, অম্বরীশলাল।

—দেখা হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—চলুন তাহলে !

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—রাহুলও কি ...

—হ্যাঁ।

—মণি ! মণি অন্তত থাক। ছোট ছেলে।

অম্বরীশলাল হাতের রুল উঁচিয়ে বললেন—বাইরে সব শান্ত। এবার আসুন দয়া ক'রে। দেখা তো হয়েছে। একটা অনুরোধ করি, বাইরে গিয়ে পাবলিককে এজিটেট করবেন না। কথা দিচ্ছি, সাদা চৌধুরীকে ছেড়ে দেব।

—কবে ?

—তা ঠিক বলতে পারি না। একটু আগে খাগড়ার গলিতে, ভাল করে শুনুন, তিমিরকে কেউ স্ট্যাব করেছে। ওল্ড হসপিটালে ওকে রেখে এলাম। ছেলেটার দোষ কোথায় বুঝলাম না। ও কিন্তু ছুরি চালায়নি এখানে। অন্যে মেরেছে। ভেরি স্যাড।

আদিত্য রামপূজনকে ডেকে নেয়। বাইরে চলে আসে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রাহুলের জন্য অপেক্ষা করে। রাহুল কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অম্বরীশের কথা শুনল। ছোট অবয়বের সাদা হাফশার্ট এবং সাদা প্যান্টপরা অত্যন্ত ফর্সা সেই হিতকারী ডাক্তারটিকে বাঁকের মুখে দেখতে পায় সে। তিনি হাতের ইশারায় রাহুলকে ডাকছেন।

অম্বরীশ মণির কাছে গিয়ে রুলের গুঁতো দিয়ে বললেন—ওঠো খোকা ! যাও এবারটি। অ্যাই মণি, বন্দুকটা কোথায় রে !

—নাই। বলেই মণি সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোনও কিছু না বলে দ্রুত ছুটে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে। তারপর ছুটতে থাকে একা। আদিত্য ডেকে উঠলেও সে শোনে না।

ডাক্তারটি রাহুলকে একটি সাদা ঝাপসা কাঁচমোড়া ঘরে টেনে আনেন। ঘরে একটি পায়রার শুকনো পায়খানা চিত্রিত টেবিল এবং দু'টি হাতলভাঙা এবং একটি করে পায়া ধসে যাওয়া চেয়ার ছাড়া কিছু নেই।

—এখানে কী ডাক্তারবাবু ?

—এই চাবিটা নাও। তোমার সঙ্গীর কাছে ছিল। যাও, চলে যাও। শোন ! পকেটে ঢোকাও।

—মুমতাজের কী হবে ! আকুল হয়ে জানতে চাইল রাহুল।

—চাবিটা কিসের ? প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

—বাপু বাঁচবে তো ! সম আকুলতা ধ্বনিত হল রাহুলের গলায়।

—মণি, ওই ছেলেটা ? কে ? ভাই ? আবার প্রশ্ন করলেন ডাক্তারবাবুটি।

—আদিত্যদা কোথায়। মনে পড়ে রাহুলের, হঠাৎ। অসহায় বিস্ময়ে ব'লে ওঠে।

—চলে গেছেন। ডাক্তারবাবু রাহুলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

—মা দেখতে পেল না। বউদিকে ঢুকতে দেওয়া হল না ! আচ্ছা, ঠিক আছে। বলে

চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাহুল বলল—আমার বোন নাতাশা এসেছিল ডাক্তারবাবু !

—ও ।

—বুলবন, আমার দাদা ! সে-ও এসেছিল । মোহর এসেছিল ।

—আচ্ছা !

—ওই ঘরটা আর একবার দেখব ডাক্তারবাবু । চন্দনকে ।

—না, না ! চলে যাও । ওদের মরে যেতে দাও । অর্থহীন চেষ্টা, ওরা বাঁচবে না, আর সময় নেই । অনেক আগে চেষ্টা করতে হত ! চাবিটা কিসের, বললে না তো !

রাহুল জবাব দিল না । বেরিয়ে এল । আদিত্য ওর হাত ধরল । এমন সময় হাসপাতালের অভ্যন্তর সড়কের উপর প্রফেসর বোলারকে ছুটে আসতে দেখা গেল । উনি এসে রাহুলের কাঁধে হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটতে থাকলেন, ফিরে চললেন হাসপাতাল ছেড়ে । বোলার আর হাসপাতালের গেট অবধি যেতে চাইলেন না । ওঁর ঠোঁট দু'টি ফুলে রয়েছে ঘুষির আঘাতে । বারবার মুখে রুমাল চাপছেন । কথা বলছেন না ।

রাস্তায় একটিও রিকশা অথবা গাড়িঘোড়া চলাচল করছে না । অসম্ভব নির্জন সড়ক । দু'একটি দোকান খোলা আছে, অধিকাংশ ঝাঁপ বন্ধ করেছে ।

আদিত্য বলল—ভেবেছিলাম যেভাবে জন-সমাবেশ হয়েছে, চাপের মুখে ডি. এম. বাধ্য হবে ।

—ওটা আপনার ভুল, মস্ত ভুল প্রত্যাশা আদিত্যবাবু ! আমিও কিন্তু আশা করেছিলাম, আমাকে দেখে অন্তত গেট খুলে দেবে, আমার ছাত্রদের মারছে ওরা, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জেলে ঢোকাচ্ছে, রাত্রে বাপমাকে ঘুমাতে দেয় না । ওই ডি. এম. নিজে গিয়ে হানা দেয় । অশেষ ইতরতা, অসভ্য ! ওকে আপনারা তাড়াতে পারেন না এখান থেকে ! ওর প্রমোশন দরকার, সেটা দিতে পারেন না ! একখানা পিস্তলই তো যথেষ্ট ।

বলতে বলতে বিদ্যাসাগর মূর্তির চৌমাথায় এসে বোলার দাঁড়িয়ে পড়েন । থর থর করে কাঁপছেন তিনি, নিজেরই বলা উত্তেজক কথায় নিজেই কেঁপে ওঠেন সর্বাপেক্ষা, ছাত্রবৎসল এই মানুষটি ছাত্রের সামান্য ক্ষতিই সহ্য করতে পারেন না, ইদানীং সেই ছাত্রের প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, এ তাঁর চরম উত্তেজনা এবং সীমাহীন কষ্টের কারণ । তিনি কিছুই করতে পারেন না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারেও পথের উপর ছুটে বেড়ান । এমনিতে লোকে তাঁকে পাগল ভাবে, পুলিসেরাও পাগলকে সহজে গুলি করে না । ফলে ওঁর সাহস বেড়ে গেছে ।

কথা না বলে পথ হেঁটে গেলে মানুষটি পাগল । কথা বলে উঠলেই মানুষটি বিদ্বান । ভাষা তীব্র এবং যথার্থ ।

—রাহুল ! তুমি কাল কলেজ যাবে ! বললেন বোলার হঠাৎ-ই ।

—আমি কলেজ যাই না স্যার !

—যাবে । কথা আছে । শোন । মুমতাজ আলিকে কেমন দেখলে ?

—ভাল না ।

—খবরের কাগজের টুঁটি টিপে ধরে আছে । অল কাইন্ডস অব নিউজ সেন্সার হয়ে যায়, যদি সামান্য রক্তের গন্ধ থাকে । কে রক্ত ঝরাচ্ছে, ভবিষ্যতে নিউজ পেপার পড়ে মানুষ তার এক অক্ষর বুঝতে পারবে না । দেশকে হেড টু টেল, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, টপ টু বটম অন্ধকারে রেখে দেওয়া হল, প্রতিটি অ্যালফাবেট মসীলিপ্ত বাই মিসা, আলো নেই আদিত্যবাবু ! বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বোলার ।

আদিত্য বলল—এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, দিস সিসটেম কখনও একটা নাগরিক অধিকার একবার কেড়ে নিলে, সেটি আর ফেরত দেয় না। আপাতভাবে ভোল দেখায়, ফেরত দিয়েছে। এমারজেন্সি, ডিক্লিয়ার্ড এমারজেন্সি ! বাট ইন ফিউচার, দেয়ার উইল বি অ্যান আন-ডিক্লিয়ার্ড এমারজেন্সি। নিউজ সেন্সার হবে, আমরা বুঝতে পারব না। অত্যাচার হবে, মানুষ আজকের মতই মুখ বুজে থাকবে। লোকাল কাগজেও আজকের এই ঘটনা ছাপতে পারবে না !

—ইন্দিরার ভবিষ্যৎ খুব ভাল নয় আদিত্যবাবু। তিনি তাঁর কবর নিজেই খুঁড়ে রাখছেন।

—সেকথা তো ললিত-কনভেনারকে বোঝানো যায় না স্যার ! তাকে তো রাষ্ট্রপতির সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সে কানে ফোন তুলে বলে, কনভেনার স্পিকিং। হা, হা, হা ! এত কষ্ট, তবু সেকথা ভাবলে হাসি পায়। ও তার কিথ অ্যান কিন্ সকলকে চাকরি দিয়েছে।

—পার্টি-বাজি !

—সেটারই চূড়ান্ত হল এমারজেন্সি। সেটা ঘোষণা করে হোক বা না করেই হোক।

—অন্ধকার, আলো নেই কোথাও !

—আসবে।

—কী বললেন ?

—আলো আসবে স্যার !

—আর কত প্রাণ বিনষ্ট হলে আলো আসবে বলতে পারেন ! দেখলেন তো, তাজকে কিভাবে মেরে দিল ! উহ্ ! অসম্ভব। ভীষণ অসম্ভব রাহুল !

রাহুল সহসা ব'লে উঠল—চন্দন মরে গেল স্যার !

—কে চন্দন ?

—ম্যাথস অনার্স। বানজেটিয়ার ওদিকে থাকত। পাজামা আর ফুলশার্ট পরত। খালি পা, আপনার মত।

—ও, চন্দ ! আমার সাবজেক্ট, ম্যাথসের ছাত্র। চন্দন ! চন্দন মরে গেল ! কোথায় ?

—হাসপাতালে। ওকে দিন পনর আগে থানা অ্যারেস্ট করে। এখন দেখলাম, জেলে ঢুকিয়েছিল, স্যার ! ওকে ডাক্তার বাঁচানোর চেষ্টাও করল না। ধুঁকে ধুঁকে মরল ! চোখের সামনে। ও মাথা তুলল, রক্ত ঝরছে, আঁজলায় ধরেছে নিজেরই রক্ত, পাশেই একজন ছেলে, জল জল করছে ! নাহ্ ! আর বলতে পারি না। আর পারি না। আমার বুকটা কেমন করছে, দম বইতে চাইছে না। আমাকে গোরাবাজারে নিয়ে চলুন আদিত্যদা ! মামার ওখানে !

বোলার বললেন—এ-ও আহত !

আদিত্য বলল—রামপূজন এর নাম। আমার কমরেড।

বোলার বললেন—ওরও কষ্ট হচ্ছে হয়তো। ওকে নিয়ে আপনি চলে যান আদিত্যবাবু। আমি রাহুলকে নিয়ে যাচ্ছি ! রিকশা নেই একটা ! কিচ্ছু নেই !

বলতে বলতে রাহুলের একটা হাত চেপে ধরলেন বোলার, শক্ত ক'রে। তারপর বাঁ দিকের রাস্তায় নেমে পড়লেন।

—আমি হাসপাতালের দু'জন সুইপারকে বলেছি ! একজনের বউ আমার বাড়ির রান্না করে দেয়। ওর স্বামী, করুণার স্বামী খোঁজ রাখবে, কী হয়, না হয় !

—মধুও বেঁচে নেই স্যার ! কারবালার মধু। খুব ডানপিটে ছিল। ক্যারমে ডিস্ট্রিক্ট কমপিটিশনে মেডেল পেয়েছিল গত বছর। কিশোকুমারের গলা নকল করে গান করত।

—শোন ! আমি রাত্রে যাব।

—কোথায় স্যার ?

—হাসপাতালে।

—কী হবে !

—আমি ওয়াচ করব। আমি পাগল তো, আমি ওয়াচ করব, কেউ বুঝতে পারবে না। চল। সাবধানে। দম পাচ্ছ এখন ?

—আপনাকে মানুষ চেনে স্যার।

—না, না। কেউ চেনে না। ম্যাজিস্ট্রেট চিনতে পারল ! পাওয়ারে বসলে মানুষ মানুষকে চিনতে পারে না, আর তাছাড়া ওর আরও ক্ষমতা দরকার, ও কেন চিনবে ! ওর ডাকনাম ছিল গাঁটলু, পড়াশুনোয় যে খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল, তা বলব না, শেষের দিকে ভাল রেজাল্ট করেছিল।

—অম্বরীশ আমাকে ঠিক চিনেছে, কিন্তু একটি বারও চোখের দিকে চাইল না। ওকে আমি প্রশ্ন করতে পারতাম, বাবাকে আপনি ধানের 'মলন' থেকে তুলে এনেছিলেন। বলেছিলেন সাক্ষী হবেন সাদাবাবু, সেদিন গাঁয়ে কালপ্রিট খুঁজতে বার হয়েছিলেন। কদমকে ভ্যানে তুলে নিয়ে মোহড়া গাঁয়ে পৌঁছালেন, সেই প্রথম একটা পুলিসের কালোগাড়ি ঢুকল চিৎপুরে। আচ্ছা স্যার ! তিমির স্ট্যাবড্ হয়েছে, খতম তালিকায় অম্বরীশ ...

—ও কথা এখন থাক রাহুল !

—তিমির কবিকে ধরিয়ে দিয়েছিল, খাগড়ায় ওদের একখানা পুরনো বাড়ি আছে। শহরে এসেও থানার হয়ে স্পাইং করে। ও যদি চিকিৎসায় সেরে ওঠে ...

—ও কথাও পরে ভাববে। এখন চল।

—আমার বারবার মনে হচ্ছে, ললিতের লোক নয়, তিমিরের দলের কেউ তাজকে ...

—হতে পারে দুই দলে মিলে ... অনেক তো ছিল ... সব মস্তান ... পোষা লোক।

—টোয়েন্টি-পয়েন্ট প্রোগ্রাম তিমিরের দল সাপোর্ট করে স্যার ! ইন্দিরার এভরি অ্যাকটিভিটিজ ওরা নাক ঘুরিয়ে দেখায় মোর প্রগ্রেসিভ ... আমাদের হ্যাটা করার জন্যে ওদের নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, নেতারা জেল থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাডারদের আমাদের পিছনে লেলিয়ে দেয়। অ্যাকচুয়ালি এই এমারজেন্সির পিরিয়ডে ওদের কোনও পলিটিকাল প্রোগ্রাম নেই। ইন রুরাল এরিয়া দে আর অলমোস্ট ইন অ্যাকটিভ। গর্তে ঢুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে হিসহিস করছে।

—কিন্তু জনগণ তো ওদেরকেই বামপন্থী মনে করে। ওরাই ভোট পাবে।

—এখন করে না।

—ভবিষ্যতে করবে। আবার তো ভোট হবে। ওটা একটা ইলেকশন-পার্টি। ভোট ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। অবশ্য জনগণও ভোটটাই বোঝে। চল। এমন তো হতে পারে, ইট মে বি যে, তাজকে যে মারল, সেই একই লোক তিমিরকে স্ট্যাব করল। এবং এই লোকটা প্রফেশনাল কিলার। হয় না ?

—স্যার !

—আমি এক সেকেন্ড লোকটাকে দেখেছি, যদি চোখের ভুল না হয়ে থাকে, সেই

লোকটা ... ষণ্ডা ধরনের এবং ও বহরমপুরের কুখ্যাত দুই দাদা, চিতে আর অধীর বাগের কোনও একজনের চেলা।

—স্যার !

—অবশ্য ওকে পার্টি ব্যবহার করতে পারে। অম্বরলাল বা গাঁটলু ব্যবহার করতে পারে। তোমার দলের মধ্যেও ওরা ঢুকছে রাহুল !

—না, স্যার !

—তুমি জানো না রাহুল ! ঢুকছে। চাঁদা তুলে মদ খাচ্ছে। আমি প্রফেসর চক্রবর্তীকে বলেছি, দেখুন ! এই সব হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। আত্মত্যাগের রাজনীতি আপনাদের, সেটার মাহাত্ম্য জনগণ বুঝে ওঠার আগেই, চিতে আর অধীর বুঝে গেল ! হাউ স্ট্রেঞ্জ !

—স্যার !

—হ্যাঁ, রাহুল ! পাগল মানুষ, তবু বলছি, আত্মত্যাগ আর খতম, এই দু'টো মিলছে না, পরস্পর পরিপূরক হয়নি। দু'টি জিনিসকে তোমরা নিজেদের হাতে রাখতে পারনি। আত্মত্যাগ তোমাদের নিজের কাছে, কিন্তু খতমটা অধীর-চিতের হাতে চলে যাচ্ছে। গেছে !

—না, হতে পারে না ! কিছুতেই হতে পারে না !

—হয়েছে। তাজকে কোনও ক্যাডার মারেনি। কিন্তু তিমিরকে কে মেরেছে বলতে পারব না। দাঁড়িয়ে পড়লে কেন ? চল !

বোলার কথা বলতে বলতে পিছনে ফিরে চাইলেন একবার। দেখেন একটি অধিক লম্বা লোক দ্রুত পা ফেলে ঝড়ের মত ছুটে আসছে। একটি গঙ্গা ফড়িঙের মত পদ-বিক্ষেপ। দেখে গা কেমন সিরসির করে ওঠে। লোকটা ক'দণ্ডেই কাছে চলে এল। কর্কশ কিন্তু ভাঙা স্বর।

বলল—রাহুলকে ছেড়ে দিন স্যার ! ফেউ নেমেছে। বাড়ি চলে যান। রাহুল, তুমি চলে যাও। আমি গুঞ্জ ! করুণার দাদা। আমাকে স্যার চিনবেন না। গঙ্গার ওপারে আমার ব্যবসা আছে। খারাপ ব্যবসা। বুঝতেই পারছেন, ভাঁটি চালাই। ওখানে ঘোড়ার মুখের খবর যায় স্যার। চলেন। দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

বোলার রাহুলের হাতখানি ছেড়ে দিলেন এবং হঠাৎ কী মনে করে ফের সবেগে আঁকড়ে ধরলেন। গম্ভীর কণ্ঠে গুঞ্জকে বললেন—তুমি যাও।

॥ ৪১ ॥

গুঞ্জ চলে যাওয়ার পর গোরাবাজারের এই গলি-পথের উপর বোলার রাহুলের একখানি হাত হাতের মুঠোয় চেপে ধরে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমশ মনে পড়তে লাগল, গুঞ্জকে আগে দু'একবার তিনি দেখেছেন। করুণার কাছে এসে বাড়ির খবর নিয়ে যেত। গুঞ্জ গঙ্গার ওপারে কলোনিতে থাকে, ওদিকেই কোথায় ওর চোলাই মদের কারখানা আছে।

রাহুল বলল—আপনার কথাই হয়তো ঠিক স্যার !

বোলার বললেন—হতে পারে গুঞ্জ সবই জানে। শোন ! আমি করুণার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইনফরমেশন নেব, বুঝলে ! কাল কলেজে আসবে। তুমি আদিত্য

সিংহের সঙ্গে এই ঘটনাটা জানিয়ে একটু কথা বলে রেখো, তিমির কিভাবে স্ট্যাবড হয়েছে খোঁজ নেওয়া দরকার। তুমি এখন বরং মেসে চলে যাও। তোমাকে আমি কিছু টাকা দিচ্ছি, কাছে রাখো।

—না, স্যর!

—শোন, যা বলছি শোনো। দ্বিরুক্তি করবে না। সব সময় দু'চারটি টাকা কাছে না রাখলে... ধরো, বেশি না, কাছে যা আছে দিচ্ছি। বলে বোলার পাঞ্জাবির ঝুলন্ত পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি কালো রঙের পেটমোটা পার্স বার করে দু'শো টাকা মতন রাহুলের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন— মেসেই যাও। আমি অন্য দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে দেখছি, তারপর তুমি কোথায় থাকবে না থাকবে ঠিক হবে। একা রাস্তায় চলাফেরা করবে না।

—আমি তো গাঁয়েও ফিরে যেতে পারি স্যর!

—না। তুমি কলেজ করবে। ডাইনের গলিটা দিয়ে সিধে গিয়ে নিমতলায় চলে যাও। ইয়েস, মুভ অন মাই বয়। মুভ অন। বলেই বোলার ঘাড় নীচু করে পথের উপর নিবিষ্ট দৃষ্টি ফেলে অত্যন্ত দ্রুত চলে যেতে থাকেন। মুখের উপর রুমাল চেপে ধরে তিনি ছুটে চলে গেলেন, পিছনে ফিরে চাইলেন না।

মেসে পৌঁছে দোতলায় বাবুলের কাছে ঘরের চাবি চাইতে ওঠে রাহুল। বাবুল তার অতিরিক্ত ফর্সা মুখমণ্ডল, সোনালি ঝাঁকড়া চুল এবং কয়রা চোখ মেলে জানলা দিয়ে রাহুলকে দেখে, 'হ্যাল্লো' বলে ওঠে, আজ সহসা বাবুলকে প্রসন্ন দেখায়। কেন, কী হয় কে জানে! আভিজাত্যের গাম্ভীর্য থাকে না। দরজা খুলে দোতলার রেলিঙে বেরিয়ে আসে।

—এসে পড়লাম।

—সে তো দেখেই বুঝেছি! থাকবে, না আবার চলে যাবে? শোন ভাই, তুমি আর নীচে থেকো না। উপরে ওই কোণের ছোট ঘরটা, আমার বৈঠকখানা, ওটায় থাকবে।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি। আই লাভ ইউ।

—ওহ্! তোমার মর্জি! নীচের ঘরটা খারাপ কী ছিল?

—ছিল। আলো-হাওয়া ঢোকে না। ওটায় একজন উকিল থাকছে, তোমার জিনিসপত্তর উপরে তুলে এনেছি।

—এখানে ভাড়া বেশি লাগবে?

—না। তোমাদের ইকনমিকসের প্রফেসর, ওই যে চক্রবর্তী স্যর, আমাকে ডেকে বলেছেন, তোমাকে উপরে এনে ঘর দিতে। তাছাড়া দেবপ্রতিমবাবু বলেছেন!

—দেবপ্রতিম!

—চমকে উঠলে কেন? মনে হচ্ছে চেনই না! তোমাদের দলে অনেকেই অনেককে চেনে না বলে শুনেছি। আমি কিন্তু তোমাদের সাপোর্ট করি।

—হ্যাঁ, চিনি না।

—কলেজে কখনও দ্যাখনি কিনা! গত সপ্তাহ থেকে উনি কলেজে ক্লাস নিচ্ছেন!

—ও!

—কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে!

—না। আমাকে ঘরটা দেখিয়ে দাও। উপরে তো ভাড়া রাখ না!

—রাখি না। তোমাকে দিচ্ছি। এসো।

রাহুল বাবুলের এই ধারা ব্যবহারে বিষম বিস্মিত হচ্ছিল। ঘরখানি ছোট হলেও অত্যন্ত আলো-বাতাস-যুক্ত। বড় বড় জানলা। একখানা আবলুসি রঙের খাট, সুন্দর দামি চাদর ঢাকা, তোশকের পুরু বিছানা, জানলার কাছে। ড্রেসিং টেবিল এবং চেয়ার টেবিল রয়েছে। ছোট সেলফে সাহিত্যের বই খান কতক, টেবিলের কাছে, মাথার উপর। রাহুল দেখল, ওই সেলফে বিষাদসিন্ধু আর সঞ্চিতা আছে।

—দেবপ্রতিমবাবুর সঙ্গে তোমার কবে দেখা হয়েছে?

—পরশু।

বিকেলে যখন রাহুল নিজের সুটকেস থেকে বার করা পাটভাঙা জামা-প্যান্ট পরে নীচে নামছিল, বাবুল কোথা থেকে তখনই ফিরল। ওকে বার হতে দেখে বলল—কোথায় হে?

—খাগড়া যাব। রিকশা চলছে?

—হ্যাঁ। খাগড়ায় কেন?

—আদিত্য সিংহের সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে।

—ঠিক আছে, আমি ওদিকেই যাব। মোটর বাইকে করে নিয়ে যাব তোমাকে।

—মোটর বাইক, সেটি কবে হল!

—হয়েছে। নতুন না। সেকেন্ড হ্যান্ড, তবে নতুনেরই মত, চালু। মামার সঙ্গে কনস্ট্রাকশনের কম্পানি খুলে এখন সরকারি কাজ পেয়েছি। রোডস কন্ট্রাকটরি করছি গত মাস থেকে। আমার তো লেখাপড়া হল না। পি. ইউ. পাশ করে কলেজে ছ মাস পড়েছি, বাপু মারা গেল। ইচ্ছে কি ছিল জানো, মুভি ক্যামেরার কাজ শিখব বাংলাদেশে গিয়ে, ওখানে আমার এক চাচা ক্যামেরাম্যান। ফেমাস। পাঁচখানা টকি করেছে।

—চল।

—হ্যাঁ, চল।

মোটর বাইকের ব্যাকে বসল রাহুল। ঝড়ের বেগে বাইক ছুটল। দু মিনিট চালিয়ে এসে বাবুল কথা বলল—তিমির খাগড়ার গলিতে ছুরি খেয়েছে, ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্লেয়ার, তোমার গাঁয়েরই লোক। তোমার দলই করেছে, তাই না? খাগড়ায় তিমিরদের কাঁসার দোকান আছে। বাড়ি আছে।

—দেবপ্রতিম ক্লাস নিচ্ছেন একথা কি সঠিক?

—শুনেছি সেইরকম। ভাল প্রফেসর কিনা! শুনলাম, উনি এসেছেন। পরে দেখাও হল। অবশ্য ওঁকে কিছু শুধোইনি। শোন, তুমি সিনহার সঙ্গে কথা বলে, পার্টি অফিসেই থাকবে। আমি ডেকে নেব।

—কেন, আমি কি একা ফিরতে পারব না?

—আমি যা বলছি শোন। শহরের হাওয়া খুবই খারাপ। চিতে গুণ্ডা দলবল নিয়ে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে অধীর বাগও তৈরি। হাসপাতালের ভিতরে মারপিট হয়েছে শুনলাম। জেলে পাগলি হয়েছে। হসপিটালে লাশের গন্ধে টেঁকা যাচ্ছে না। এখনকার ডি. এম. হল হারামি দি গ্রেট। জেলর নাকি রেজিগনেশন দিয়েছে। ডি. এম. যা করেছে, তারই প্রতিবাদ।

—তুমি এইসব কী করে জানলে? রাহুল প্রশ্ন করল।

—আমার সোর্স আছে। জবাব করল দীর্ঘাঙ্গি সাহেবী বর্ণের বাবুল। কয়রা চোখে ঈষৎ বেগুনি রশ্মি খেলা করছে।

—তোমার সোর্স কী ?

—পুলিশ, গুণ্ডা, ক্যাডার, নার্স, ডাক্তার, ঝাড়ুদার সব আমার সোর্স। তবে আমি ভাল ছেলে, বিজনেসম্যান। তোমার রিলেটিভ। সাদা চাচা কেমন আছে রাহুল !

—আছেন। অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। চোখ মেলেননি।

—হসপিটালে ঢুকেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—আমি রাত্রে যাব। দেখি, যদি দেখা করতে পারি !

রাহুল আর কথা না বলে চুপ করে রইল। খাগড়ার পার্টি-অফিসের কাছে, প্রায় দোরগোড়ায় এনে রাহুলকে নামিয়ে দিয়ে সোনাপট্টির রাস্তা ধরে কাশিমবাজারের দিকে গাঁ-গাঁ করে চলে গেল বাবুল। বলে গেল—ঘণ্টা খানেক বাদে আসছি।

রাহুল সংকীর্ণ গলিতে ঢুকে পড়ল মুহূর্তে। পার্টি-অফিসের ছাদে বিকেলের আলো পড়েছে, আকাশ মেঘশূন্য। নীল। ফ্যাকাসে নীল। একটি সাদা বক একা উড়ে চলে যাচ্ছে গঙ্গার দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বকটাকে দেখে রাহুল, যতক্ষণ না গাছপালার আড়ালে চলে যায়। ছাদের উপর মোহর, বউদি এবং নাতাশাকে দেখতে পায়।

নাতাশা দ্রুত সিঁড়ির মুখে ছুটে আসে। শুধায়—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ! বোলার স্যারের বাড়ি ?

—না। বলে ছাদে উঠে এসে রাহুল প্রশ্ন করল—মা কোথায় ?

নাতাশা বলল—প্রাণকিশোরদার বাড়ি শুয়ে আছেন। অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন।

বউদি বলল—মুমতাজকে কেমন দেখলে !

রাহুল জবাব করল—খারাপ। আদিত্যদা বলেননি ?

চন্দ্রিমা বলল—হ্যাঁ, বলেছেন। তবে খুঁটিয়ে কিছু শুনিনি। ওঁরা সব ভেতরের ঘরে রয়েছেন। মিটিং হচ্ছে। তুমি এখানে একটু বসো মাদুরের ওপর। আমি ওঁদের খবর দিচ্ছি।

চন্দ্রিমা চলে যায় এবং এক মিনিট পরে রাহুলকে ভেতরের বড় ঘরটির মধ্যে ডেকে নেয়। ছাদে থেকে যায় নাতাশা আর মোহর।

প্রাণকিশোর রাহুল এবং চন্দ্রিমা, দু'জনকেই বসতে নির্দেশ করেন। মৃণাল, তপন এবং সরিৎ নামের তিনজন নেতৃস্থানীয় কমরেডও রয়েছে এই ঘরে। আদিত্যর মুখ সদা হাস্যোচ্ছল থাকে, আজ এই মুহূর্তে তাকে অনেকখানিই বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

প্রাণকিশোর বললেন—আমার সব শুনে মনে হচ্ছে, রাহুলের পার্টির যে-কোনও কমরেডই আজ খুন হয়ে যেতে পারত। স্বদেশ খোঁজ-তল্লাশি করেছে, চিতে গুণ্ডার লোক স্ট্যাব করেছে বলে অধীরের এক চেলা জানিয়েছে। শুনে বড় আশ্চর্য লাগল যে, অধীর বাগ রাহুলের পার্টির নামে রুটিমহলের ওদিকে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে।

রাহুল একথা শুনে মাথা নীচু করল।

আদিত্য বলল—স্বদেশকে বলেছে গুঞ্জ। এই চোলাই-কারবারী গুঞ্জকেও কিন্তু আমার ডাউট হয় প্রাণকিশোরদা। এ কার লোক ? চিতে না অধীরের ? গুঞ্জ বলেছে, পরে সে ডিটেলস খবর দেবে। একটাই শুধু সন্দেহ ওর যে, চাকু মেরেছে লোকটা, কিন্তু চাকুটা

স্ট্যাব করার পর বিঁধিয়েই রেখে দিয়েছে, তুলে নেয়নি। তাজ এবং তিমির, দু'জনের ক্ষেত্রেই একই ঘটনা। মালতি বলে গেল একটু আগে।

—মালতি ? ও, আমাদের ওই নার্স কমরেড মালতি, ওল্ড হসপিটালে সা-সা-সার্ভিস করে, হ্যাঁ, কী বলে গেল আদিত্য ? উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করেন প্রাণকিশোর।

আদিত্য রাহুলের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল—তিমির ঘণ্টাখানেক আগে কথা বলেছে। তিনজনের মুখে মুখোস আঁটা ছিল, একজনের শরীরে বোরখা চাপানো ছিল, ছাতা দিয়ে আড়াল করে মেরেছে। নট ওনলি দ্যাট ! ইন দি টাইম অফ স্ট্যাবিং একটা কালো কাপড় তিমিরের চোখের উপর ফেলে দিয়ে চোখ বেঁধে মেরেছে। বোরখাপরা লোকটা অত্যন্ত বেঁটে। বাকি তিনজনের দু'জন অত্যন্ত লম্বা। এখন যদি আমরা তাজের ঘটনা জানতে পারি, ঠিক কীভাবে ঘটেছে, তাহলে খুব পরিষ্কার ছবিটা পাওয়া যায়। আমার মনে হচ্ছে, গুঞ্জের রিপোর্ট সত্য যে, এটা প্রফেসনাল খুনীর কাজ। যদিও তিমির মৃদুভাবে তুহিন এবং খোদা বক্‌সকে ডাউট করেছে। ওই বেঁটে লোকটা কে ? ছুরি মেরেছে বেঁটে লোকটা। বোরখার ভিতর থেকে ছোরা ঝলসে উঠেছিল। মালতির রিপোর্ট।

প্রাণকিশোর শুধালেন—তিমির তাহলে তুহিন এবং খোদাকে সন্দেহ করছে কেন ?

মাথায় কাঁচাপাকা চুল, শ্যামলা রঙ, মাঝারি স্বাস্থ্য, কিন্তু অত্যন্ত মিষ্ট স্বভাব এবং গলার স্বরও মিষ্ট ; স্বদেশ নামের প্রায় পৌঢ় এবং অবিবাহিত কমরেডটি মোহর এবং নাতাশাকে সঙ্গে করে ঢুকে আসে। স্বদেশের সমস্ত কথা যুক্তিপূর্ণ, সে সিরিয়াস, হাসে কম, কিন্তু হেসে উঠলে কালো মানুষটাকে অত্যন্ত স্মিত দেখায়।

স্বদেশ বলল—বেঁটে লোকটা অধীরের লোক বলে শোনা যাচ্ছে এখন। ওর নাম নাকি ঝাঁকু। ঝাঁকু মস্তান।

—তুমি তো কমরেড একঘণ্টা আগে চিতের কথা বলেছিলে। তারই লোক করেছে বলেছিলে ! এখন বলছ... আদিত্য বলে ওঠে।

—আপনাকে বলি আদিত্যবাবু ! গুঞ্জ বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

—ইয়েস ! বলে গলায় অত্যন্ত জোর দিয়ে ওঠে আদিত্য। তারপর বলে—গুঞ্জ থানার লোক অফ কোর্স।

—কিন্তু আমি সিওর প্রাণদা !

—কি ? প্রাণকিশোর স্বদেশকে দেখেন।

—অধীর বেসিক্যালি চেয়ারম্যানের সাপোর্টার। কিন্তু ধাত ভাল নয়। এটা রাহুলের দল ভাল জানে, কিন্তু বাগকে বশে রাখার ক্ষমতা হারিয়েছে তারা। গোরাবাজার থেকে সাইকেল করে আসছি, দেখি, অধীর বেরিয়ে আসছে উকিলপাড়ার দেবপ্রতিমের বাড়ি থেকে। প্রফেসর, শুনলাম ফিরে এসেছে। বড় বিচিত্র কথা শুনে এলাম, দেবপ্রতিমের সঙ্গে ললিতের যোগাযোগ হয়েছে, অনেকে দেখেছে ললিত এবং অধীর একইসঙ্গে প্রফেসরের বাড়িতে যাতায়াত করছে দু'দিন থেকে।

—নাহ, এ হতে পারে না ! বলে চেয়ার ছেড়ে আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ায় রাহুল।

—ব'সো রাহুল ! শান্ত গলায় বলল আদিত্য।

রাহুল বসে পড়ে বলল—আমি বুঝতে পারছি না। কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে, বুঝতেই হবে। না বুঝে তোমার উপায় নেই রাহুল ! বলে উঠল আদিত্য।

অসহায় চোখে এবারে রাহুল আদিত্য সিংহের চশমার কাঁচে চেয়ে থেকে আবার মুখ নীচু করল।

আদিত্য বলল—গুঞ্জ সম্পর্কে ডিটেলস ইনফরমেশন দরকার স্বদেশবাবু। ও কনফিউজ করতে চাইছে, মনে হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে যাচ্ছে।

রাহুল বলল—আপনি যখন রামপূজনকে সঙ্গে করে চলে আসেন, আমি এবং বোলার স্যর চলে গেলাম, তারপর গুঞ্জের সঙ্গে দেখা। ও আমাকে ভয় দেখিয়ে গেল, বোলার স্যরকে বলল আমাকে একলা ছেড়ে দিতে। করুণা বলে একটি মেয়ে প্রফেসর বোলারের বাড়ি কাজ করে। করুণার স্বামী নতুন হাসপাতালের সুইপার। গুঞ্জ করুণার দাদা। গুঞ্জ আসলে কী করছে, বোলার স্যরের সঙ্গে দেখা না হলে বুঝতে পারব না। অধীর বাগ এবং চিতে গুণ্ডা সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। আমি জানি না।

আদিত্য বলল—এদের নাম কখনও শোনোনি ?

রাহুল বলল—শুনেছি।

আদিত্য বলল—তাহলে ?

ফের একদণ্ড চুপ করে থেকে রাহুল বলল—অধীর বাগ কমরেড সি. এম-এর রাজনীতির সঙ্গে কতটা যুক্ত যদি প্রশ্ন করেন, আমি বলতে পারব না। তবে যুক্ত থাকা বিচিত্র নয়। কমরেড লেনিনের দলেও একজন ডাকাতের একটা আশ্চর্য ভূমিকা ছিল, শোনা যায়।

আদিত্য বলল—শোনা যায় বলছ কেন! সেই ডাকাত পার্টিকে বাস্তবিকই সার্ভ করেছিল, লেনিনকে এসকেপ করতে সাহায্য করেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল। কিন্তু সব দস্যুই রত্নাকর নয় কমরেড রাহুল। বিপুল সাংগঠনিক স্ট্রেংথ্ না থাকলে গুণ্ডা দূরে থাক লুম্পেন প্রলেটারিয়েটকেই শ্রেণীস্বার্থে শ্রেণী-শক্তি হিসেবে ব্যবহার করাও কঠিন। তা করতে গিয়ে আমাদের ক্লাস-পলিটিক্স্ লুম্পেন-পলিটিক্সে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। ইট মে টার্ন ইনটু ডার্টি-লুম্পেন পলিটিক্স। গুণ্ডা পোষা আমাদের কাজ নয়। তুমি শুনবে ? আমি বলতে পারি।

রাহুল বলল—মধ্যবিত্ত শ্রেণী লুম্পেন সর্বহারাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, সেটা উচিত নয়।

—নয়, আবার উচিতও। যদি একজন শ্রমিক প্রচণ্ড সুবিধাবাদী হয়, তার প্রতি করুণা, সহানুভূতি অর্থহীন এবং অন্যায়। যদি দেখা যায়, সেটা একটা পাথরের ডিম, তাহলে তাতে তা দিয়ে লাভ নেই। কথাটা কিন্তু আমার নয়। মা-ও-সে-তুং ওই পার্টিকুলার উপমাটি দিয়েছেন। যার নিজের ভিতর থেকে ফুটে ওঠার সম্ভাবনা নেই, তাকে শ্রেণী-রাজনীতির উত্তাপ দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। সে শ্রমিকই হোক আর গুণ্ডাই হোক বা মধ্যবিত্ত। ওভার অল, গুণ্ডা ইজ গুণ্ডা। তাই যদি হয়, ওর সম্ভাবনা কতটুকু ভেবে দেখতে হবে শতেক বার। সাপ নিয়ে খেলা করা আর গুণ্ডা দিয়ে পলিটিক্স্ করা সমান বিপজ্জনক। কোথাও এক্সেপশন হিসেবে একটি দু'টি তেমন গুণ্ডা আমরা পেতে পারি, কিন্তু ওই শ্রেণীটাকে অ্যাজ এ ক্লাস সেন্স দিয়ে আদর্শ শেখাবে, এটা হয় না। অধীর বা চিতে সেই স্তরে নেই।

—আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না আদিত্যদা! বলে উঠল রাহুল।

—কেন ? আমার কথা তো অস্পষ্ট নয়। ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। গুণ্ডাকে শুধু ললিত

বা তিমিরই ব্যবহার করে না। তাদের রাজনীতি যেমন করে এবং ভবিষ্যতে করবে ; মূলত ভোটের রাজনীতি অধীর-চিতেকে ব্যবহার করে গদি দখল করবে। তেমনি প্রশাসন-পুলিশও তাদের ইউজ করবে। তোমার আত্মত্যাগ হবে আত্মক্ষয়।

—না।

—মনে হবে, তুমি ভুল করেছ। ইট উইল বি ইওর ফ্রাস্টেশন। তুমি তারপর হতাশ হবে। অধীর তোমাকে বাঁচাবে এই ভরসায় থাকবে, কিন্তু চিতে তোমাকে কিল করবে। আমি আজ প্রশাসনের যে ধরনের নির্লজ্জ গোঁ আর হীনতা দেখেছি, তা-ই এনাফ।

বলতে বলতে আদিত্যর ফর্সা রাজপুত মুখখানি রক্তাক্ত হয়ে গেল মুহূর্তে। সে ডান হাতের মুঠি বেঁধে টেবিলে দু'বার আছড়ে ফেলে। মোহর এবং নাতাশা এবং আরও কেউ কেউ কেঁপে ওঠে।

আদিত্য আবার বলে উঠল—তুমি ভাবছ, আমি তোমায় ভয় দেখাচ্ছি। মোটেও না। তুমি ঠেকে শিখতে চাও, বেশ! তুমি বলেছিলে, প্রণামপুরের বিলে পুলিস ডোঙায় চড়ে না। কিন্তু সেই জলে পুলিসের মোটর-বোট নেমে যায়। যায় না?

—হ্যাঁ।

—গুঞ্জ যদি এক্ষেত্রে তৃতীয় একটা গুণ্ডাবাহিনী হয় এবং তাকে যদি ডি. এম. লাগিয়ে থাকে, তুমি কী করতে পার? বুঝতে পারছি না, গুঞ্জ শুধুমাত্র কনফিউজ করছে কিনা! তুমি অধীরের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক নির্ধারণ কর। আর একটি কথা।

রাহুল অত্যন্ত নরম সুরে বলল—বলুন!

আদিত্য বলল—পার্টি সংগঠনের উপর বন্দুককে স্থান দিলে খতমের রাজনীতি তোমার আত্মত্যাগের রাজনীতিকে গ্রাস করবে। খতমের সূত্র ধরে অধীর এবং চিতে তোমার দলে প্রবেশ করবে। লিন পিয়াও একটি বুর্জোয়া ভ্রান্ত দর্শন। ওই লোকটি মা-ও-সে-তুঙের সঠিক উত্তর-সাধক বা প্রতিনিধি নয়। তোমারই দলের এই জিলার মুখপত্র, প্রফেসর চক্রবর্তী যার এডিটর, সেই ম্যাগাজিনে লিন পিয়াও সম্পর্কে এতদিনে লিখেছে এইসব কথা। অথচ তোমার দলের কেন্দ্রীয় কমিটি তার কেন্দ্রীয় মুখপত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ লিন পিয়াও-এর নামে স্লোগান দিয়ে 'কমরেড কাজ ত্বরান্বিত করুন, চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে' বলে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে বলেছে, 'বিন্দুভাঙার কাজ' চালিয়ে যেতে বলেছে, তোমার কাছে এই সত্য কতখানি জাস্টিফায়েড আমি জানতে চাই। তুমি পড়েছ?

—কী?

—চক্রবর্তীর ম্যাগাজিন?

—না।

—পড়। নাও, নিয়ে যাও। বলে আদিত্য চেয়ারের ড্রয়ার টেনে সূর্য বিস্ফারিত রক্তাক্ত প্রচ্ছদের একখানি পত্রিকা রাহুলের সামনে টেবিলের উপর ফেলে দিল।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল রাহুল। কেউ কোনও কথা বলছে না। একটু বাদে চন্দ্রিমা বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দেওয়ালের কাছে গিয়ে সুইচ অন করতেই ঘরে বিদ্যুতের আলো উদ্ভাসিত হয়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাইরে হয়তো তখনও গোধূলি।

—তোমার চিঠিটা বউদি! জলগেটের চাবি! বলে আকস্মিক এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতা ছিন্ন করে উঠে দাঁড়ায় রাহুল। কোথায় সে মুহূর্তে হারিয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের তলদেশে চলে যাওয়ার মত এক সুগভীর বিপন্নতা রাহুলকে রুদ্ধশ্বাস জলজ-আঁধারে ঠেলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। থই নেই, প্রশ্বাস নেই, অস্তিত্ব টুঁটি-চেপা নিঃশব্দ কঁকানিতে, শিরাচ্ছিন্ন চাপে

আবর্তিত ; কে সে এবং কবি কোথায় ? কে সে এবং চন্দন চন্দ আপন শোণিত কেন আঁজলা বেঁধে ওভাবে ধরে ঠেলে দেয় কিশোরটির মুখের দিকে ? রক্তকে কেন তার পানীয় মনে হয় ? এই জিজ্ঞাসার শেষ নেই বুঝি ! তবু শেষ নেই। তাজকে কিভাবে বাঁচাব ? বাবা ! তুমি বারবার বলেছিলে, মুমতাজকে সাবধান করে দিও ! কিন্তু ও কেন অমন অতর্কিতে ঝাঁপ দেয় শত্রু-ব্যূহে ? কেন দেয় ? সে কেন বাবা, তোমারই পাশে জ্ঞান হারিয়ে রক্ত মেখে শুয়ে থাকে ? একটি বন্দুক এবং তাজ, এ-কাহিনী এইভাবে শুরু হল কেন ?

তবে আরম্ভ কেমন ছিল সেদিন ? 'আসো দু'মুঠা খাই, রাহুল দাদা ?' গড়াবাসা থেকে বাবার জন্য ধানবীজ এনেছিল চোর কদম আলি। কদম মৃত্যুর আগে পাগলের মত নামাজ পড়ে যাচ্ছিল কেন ? থানার বখসিসের টাকায় মাংসের লাল ঝোলমাখা ভাত এবং চন্দনের রক্ত কেন একাকার হয়ে যায় এখন ! লুম্পেনকে আমি কি দেখিনি ? কদমকে আমি কি দেখিনি ! অন্নদাস গেট-প্রহরী গোকুলদানা গ্রামের লক্ষ্মণ দাস জলে পড়ে ঝুপ শব্দে ভেসে যায়, তা-ও কি আমারই দর্শনীয় ছিল না ? ন্যালার মৃত্যুও কি বিস্মিত করেনি আমাকে ? চয়ন খতিবের মাছধরা দৃশ্য কি অপূর্ব ছিল না ? ছিল নাকি দৌতলডিহার মসজিদে শশঙ্ককে নামাজের জায়নামাজে জড়িয়ে প্রাণ-বাঁচানোর দৃশ্যে খতিব চয়নের ধর্মাচার ; কী বিস্ময় এই ভারতবর্ষ প্রদর্শিত করে, কী দেয় আমাকে, কী অনুভূতি দেয় ? তাজ আমাকে মেহেদিপাতা দিয়েছিল কেন ?

রাহুল এবার অতি স্পষ্ট করে মোহরের মুখের দিকে চাইল। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। লজ্জায় মোহর চোখ নামিয়ে নিল একসময়। রাহুলের চোখে চেয়ে থাকতে পারল না। ভয়ে সে পাশে বসা বউদির কাঁধে মুখ গুঁজে দিল। রাহুল ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল। প্রাণকিশোরের একটি স্নেহময় হাত রাহুলের কাঁধ স্পর্শ করল, সুগভীর আশ্বাস সেই স্পর্শে ঘনীভূত এবং তিনি করুণাঘন চোখে, সমীহ সম্মানে রাহুলের চোখে চেয়ে দৃষ্টিতে ভালবাসা ফুটিয়ে তোলেন। ফুটিয়ে তোলা নয়, সবই তাঁর অন্তর প্লাবিত করে আসে।

প্রাণকিশোর বললেন—ওকে এখন ছেড়ে দাও আদিত্য। ও মায়ের কাছে যাক। মোহর ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাক। যাও, আমার বাড়িতে বুলবনও রয়েছে। বলে জেলা-সেক্রেটারি রাহুলের গায়ে অত্যন্ত মৃদু ধাক্কা দিলেন।

বউদির চিঠির ব্যাপারটি ঘরের উপস্থিত কেউ বুঝতে পারে না, জল-গেটের চাবির বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না। আদিত্য এবং প্রাণকিশোর নিশ্চয়ই অর্ধেক খানিক বুঝে নিতে পারেন। তথাপি তাঁরা প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকেন। রাহুল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

স্বগত গলায় বলে—বাবুল আসবে।

—কে আসবে ? আদিত্য জানতে চায়।

—বাবুল। চৌধুরী মেসের বর্তমান মালিক। অবশ্য ওর মা আসলে মালিক। ও আমাকে মোটর সাইকেলে করে এখানে দিয়ে গেছে, ঘণ্টা পর এসে নিয়ে যাবে। ও এলে কোথাও একটু বসতে বলবেন এখানে।

—তুই বাড়ি যাবি না রাহুল ? হঠাৎ প্রশ্ন করল নাতাশা।

—না। কলেজে যাব কাল ! তাজের কী হল, না জেনে বাড়ি গিয়ে কী করব ! তাছাড়া বাবুর কী হয় দেখি !

—গোরাবাজারে মামার ওখানে থাকছি আমরা। তুই একবার যাবি না ? তোর সঙ্গে কথা ছিল রাহুল !

—কী কথা এখানেই বলে দে !

—তুই যাবি না ? তোর সঙ্গে সত্যিই কথা ছিল আমার ! সেই যে তুই চৌদ্দ বিঘা ছেড়ে চলে এলি, তারপর কী হল ! বলে যা আমাকে !

রাহুল এবার বউদির মুখের দিকে চায়। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বুঝতে পারে না, কবির মৃত্যুর কথা বউদির পার্টির জিলা-নেতৃত্ব জেনেছে কিনা !

আদিত্য সিংহ এবার বলে ওঠে—কবি ওর মামার বাড়ি চলে গিয়েছিল। তারপর সেখান থেকেও চলে যায়। কেন ?

রাহুলের দেহের উপর দিয়ে একটি সিরসিরে হাওয়া বয়ে গেল জানলা বয়ে এসে। ও কেমন বোকার মত বউদির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে প্রশ্নকর্তা আদিত্যর দিকে ফেরে।

আদিত্য বলল—কৈফিয়ত চাইছি না। জানতে চাইছি !

নাতাশা বলল—কবি কেমন আছে রাহুল !

রাহুল এবার মোহরের চোখের দিকে চাইল। ওর চোখেও প্রবল আকুলতা। রাহুলের বোকার মত চাউনি আরও বিহ্বল হয়ে ওঠে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপছে, কিন্তু কথা বার হয়ে আসতে চাইছে না।

ঢোঁক গেলে রাহুল। তারপর চোখ টেনে এনে আবার বউদিকে দেখে। দীর্ণ অথচ ভেজাস্বরে বলে ওঠে—চাবিটা মেসেই আছে বউদি। আছে। আমি চলি ! বলে সে এগিয়ে যেতে গিয়ে টলে পড়ে এবং টেবিলের একটি কোণ আঁকড়ে ধরে পিছলে যায়। পড়ে যেতে যেতে সামলায় নিজেকে।

—শোন বউদি ! বলে দোরের কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ায় রাহুল। চন্দ্রিমা উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায়।

প্রাণকিশোর বলেন—ওর হাতটা ধর চন্দ্রিমা। ওকে আর প্রশ্ন করো না আদিত্য। যাও মোহর, তুমিও সঙ্গে যাও !

—আমিও কি প্রশ্ন করব না প্রাণদা ! সকাতরে বলে ওঠে নাতাশা।

—না। এখন নয় নাতাশা, এখন নয়। তোমার সব প্রশ্নের জবাব আমিই দেব। যাও তোমরা ! বলে প্রাণকিশোর চন্দ্রিমাকে এবং মোহরকে নির্দেশ করেন।

রাহুল বলে ওঠে—আমি একাই যেতে পারব। তাশা, আমি কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছি না। মোহর তুমি এসো না !

মোহরের সমস্ত মুখ নিমেষে কালো হয়ে গেল। মেঝের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন সে গেঁথে গেল পাষাণের ভিতর। যেন বা সে পাষাণতলে পাষাণেরই মূর্তি হয়ে গেল।

বিড়বিড় করে আপন মনে নিজেকেই বলে উঠল মোহর—যাব না ! বেশ। তাই হোক। এইটুকু কথা মৃদু স্বরে উদ্গত হল, তারপর স্বর নেমে গেল অশ্রুতির তলে। মোহর নৈঃশব্দ্যে বলে উঠল—ডাকলেও আর যাব না কখনও ! তুমি কবিকে হত্যা করেছ। আমি তোমার কেউ নই। বলতে বলতে ফিরে এল চেয়ারের কাছে মোহর। ওর চোখ ছলছল করে উঠল। প্রাণকিশোর দেখলেন, এই অফিস-বাড়িটা নাটমঞ্চ বিশেষ, হেথায় একটি কিশোরী যখন কাঁদে, সেই অশ্রু গোপন করে রাখে তার চোখের পাতা, এই দৃশ্যে বড় ব্যথা থাকে, কিছুই করা যায় না।

ছাদে এসে বউদির দুটি হাত হঠাৎ জড়িয়ে ধরে রাহুল—তোমার চিঠিটা...

—ও কথা থাক এখন।

—তুমি বলে দাওনি তো।

—কী ?

—কবি মরে গেছে। তুমি আর আমাকে অপরাধী করো না বউদি !

—প্রাণকিশোরদা ছাড়া আর কেউ জানে না। ওঁকে বলতেই হত।

—ওরা জেনে যাবে না ?

—কারা ?

—মোহর, নাতাশা। ওদের যে আমি কথা দিয়েছিলাম, কবিকে বাঁচিয়ে রাখব !

—মুমতাজের কী হবে রাহুল ! বাঁচবে তো !

চন্দ্রিমা ভেবেছিল এ কথায় রাহুলের মনটা বোধ হয় কবি থেকে তাজে সরে আসতে গিয়ে থতিয়ে থামবে, তার অস্থিরতা কমবে। হল না।

—বাবু কি মরে যাবে বউদি ! আমরা আর কিছুই করতে পারব না ! ভারতবর্ষ আমার দেশ নয়। আমি একে চিনি না।

—মোহরকে আসতে দিলে না কেন ?

—ও ছেলেমানুষ, ও কিচ্ছু বোঝে না !

—তুমি ভুল করলে রাহুল !

—তোমার চিঠিটা বউদি বালিশের তলে রয়েছে। মনে রেখো। ওটা আমার দরকার।

—কেন ?

—চাই আমি।

—কেন ?

—ও ঠিক বুঝবে না।

একটি দণ্ড সন্ধ্যার শেষ ক্ষীণ পশ্চিমালোকে রাহুলের চোখের দিকে অপলক চেয়ে রইল চন্দ্রিমা। এক দণ্ড, চার-পাঁচ নিমেষ, ধীরে ক্রমশ আরও মুহূর্ত। এই সন্ধ্যার রয়েছে নিজস্ব বিচ্ছেদ-বিভাষা, আকাশের সাঁঝতারার আলোয়, গোধূলির রঙে, দিনের ফুরিয়ে যাওয়ার সংকেতে, পাখির কাকলিতে। চন্দ্রিমা অনুভব করে।

ঠিক তখন নাটমঞ্চে বুলবন আসে অপ্রত্যাশিত, তাই এক আশ্চর্য নাটক। সে সাঁঝের তারকাটি দেখে, গোধূলির পশ্চিম লোহিতকণা দেখে, রক্ত দেখে এবং সিঁড়ির মুখে উঠে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই সেই সিনেমা, যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

ওরা কী করছে ওভাবে, ওরা এত সংলগ্ন কেন ? ওরা এক রাত্রি একত্রে ছিল, তবু ওদের সাধ মেটেনি ! এই দৃশ্যটির তো কোনওই ছবি ধরে রাখা যাবে না, প্রাণকিশোরও বুঝবেন না, বুলবন কেন এত হীন হয়ে গেছে ! বুঝবেন না, কেন বুলবন চন্দ্রিমার চুলের গোড়ায় ব্যথা দিয়েছে। চুল টেনে ঘুম থেকে জাগিয়ে ছিঁড়ে তোলা পাশবিক সত্য, কিন্তু বুলবন ভুল করেনি। ভাবে বুলবন চৌধুরী।

ওরা কি মানুষ ? ওরা কি বিপ্লব-প্রয়াসী ! উচ্চ আদর্শের রুচিটাও তো উচ্চ হয় শুনেছি। কই হয় ? উচ্চ আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে প্রতিদিনের তুচ্ছ আচরণের মধ্যেও, দৈনন্দিন রুচির পরিচয়ে। কোথায় সেই ভাবটি, কোথায় সেই জি. এস-এর মর্মবস্তু ? বাবার দেহ হয়তো পচে যাচ্ছে হাসপাতালে, এদিকে এরা প্রেমের আদর্শকে এই

নিভৃত-সন্ধ্যার ছাদে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, কামনা কী বধির হয়—এরা অন্যের উপস্থিতিও টের পায় না। বুলবন ভাবতে ভাবতে পা বাড়ায় ছাদের উপর।

—চল !

—কোথায় ?

—মাকে দেখবে না !

ওদের সংলাপের মধ্যেই ঢুকে এল বুলবন। বলল—মাকে দেখে কাজ নেই রাহুল। মা ঠিক আছে। মণি কোথায় গেল, তাই খুঁজতে বার হয়েছি। বাস ধরে মোহড়া যাব। তোমাদের বোধহয় অসুবিধা করলাম। কথা বল তোমরা, আমি যাচ্ছি ! বলে বুলবন মিটিং যেখানে হচ্ছে সেই ঘরের দিকে ফিরে আসে।

চন্দ্রিমা গম্ভীর এবং কঠিন সুরে বলল—তুমি তাহলে চলে যাও রাহুল। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

এই সময় নীচে বাবুলের বাইক এসে গর্জে ওঠে। চন্দ্রিমা সরে আসে দ্রুত।

॥৪২॥

প্রফেসর বোলার দেখলেন সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই সমস্ত সড়ক প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। দু'একটি রিকশা ঠুনঠুন করে চলেছে চকিতে, কিন্তু তা নিতান্তই বিরল। চৌধুরী মেসে রাহুলকে পাওয়া গেল না। বাবুল তাকে সঙ্গে করে সন্ধ্যার আগে খাগড়ার দিকে বার হয়ে গেছে, এখনও ফিরে আসেনি। ভয় এবং আশঙ্কায় বোলারের মন কাঁটা হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তামাম শহরটা সমাজ-বিরোধী গুণ্ডামস্তানের দখলে চলে গেছে। গলির মধ্যে মৃতদেহ পড়ে থাকছে হঠাৎ হঠাৎ।

তাজ এবং তিমিরের ঘটনার পর আরও দু'টি লাশ পতনের খবর পেয়েছেন তিনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে খতম হয়ে গেছে। হঠাৎ এরকম মৃতদেহ পড়ে থাকার ঘটনা শুরু হল। গুঞ্জর সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি।

করুণা তার দাদা সম্পর্কে যে ধরনের সুসমাচার পেশ করেছে, তা কহতব্য নয়, হেন গর্হিত কাজ নেই, যা গুঞ্জ পারে না। মদমাতাল, লম্পট, খুনে। গুঞ্জকে ফ্যামিলি ভয় পায়, তার দেওয়া অর্থও নাকি গুঞ্জর মা নিতে চায় না। চোলাই বেচা পয়সায় করুণার ভারি ঘেন্না।

গুঞ্জ হল উঠতি মস্তান। দু'নৌকায় পা রেখে চলে, চিতের গালে চুমা দেয়, বাগের গালেও চুমা দেয়। থানার সঙ্গে হরদম ওঠা বসা। বিয়ের পর করুণা ওর দাদার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করে না। জোর করে কথা বলতে এলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—তুমি তো তোমার কথা বলে খালাস হলে করুণা। কিন্তু অমি কী করি এখন !

—কী আর করবেন বাবু, সাবধানে থাকেন।

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে করুণার সংলাপ মনে করে বোলারের হাসি পেয়ে যায়। কিসেরই বা সাবধান হবেন তিনি ! সাবধানী মানুষের কি অভাব আছে সংসারে ! সারা শহরটাই তো সাবধানতায় স্থবির হয়ে পড়েছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে খাকি পোশাকের প্রহরী মোতায়েন। হাসপাতালের প্রধান গেটটি বন্ধ এবং সেখানেও খাকি পোশাক।

স্বর্ণময়ীর রাস্তাগুলিও অসম্ভব নির্জন। হঠাৎ হাসপাতালের কাছাকাছি যে-পথটি

নীচের থেকে উঠে এসে প্রধান সড়কে পড়েছে, সেই পথে একখানি আলো জ্বলা মোটর সাইকেল এদিকে ছুটে আসছে দেখতে পান বোলার। হাসপাতালের গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শ্যামলা রঙের কিশোর আর তার চেয়ে বয়েসে কিছুটা বড় একজন সাঁওতাল যুবতী। মেয়েটি ধরা গলায় পেয়াদাকে গেট খুলে দেওয়ার জন্য বলে চলেছে।

কৌতূহলবশে বোলার আরও কাছাকাছি এগিয়ে আসেন।

—কী হয়েছে তোমার? কী চাইছ মা? বলে উঠলেন প্রফেসর। মেয়েটি গেটের লোহার খাড়া জাফরি স্থূল পাতি ধরে দাঁড়িয়েছিল, ওর মাথার উপর পোস্টের আলো জ্বলছে। সেই আলো পড়েছে মেয়েটির চোখের অশ্রুতে।

কিশোরটি বলল—রুগি আছে। একবার খালি দেখতে চাইছে।

বোলার শুধালেন—তুমি তো বাঙালি। একে কোথায় পেলে?

কিশোর বলল—ওর ঝোপড়ি থেকে ডেকে আনলাম। কিন্তু তুমি অত শুধোচ্ছ কেন! তোমার কে আছে?

—তুমি কে বাবা!

—আমি মণি পালের সাকরেদ। সাকিন তেনার বাঁশতলি। পল্লীমঙ্গল যাত্রা ইউনিট আমাদের দল।

—ও, তুমি ছোকরা?

—না।

—ডান্সার বটে কিনা!

—আজ্ঞে না। আমি বাজনদার। ব্যাঞ্জো আর বাঁশি। আমাকে অধিকারীও ধরতে পারেন।

—তাই নাকি! তুমি তো সাংঘাতিক লোক! বেশ, বেশ!

—এতে বাহবা দেওয়ার কী আছে! আমরা আজিমগঞ্জ সিটি থেকে ড্যান্সার ভাড়া করি। তারা নাচে, আমি নাচব কেন! আমাদের মেল-ড্যান্সার দু'খানা আছে। শচীনাথ আর গুলাম আলি ওরফে বিন্দুবালা।

—তোমার নাম?

—তুমি নাম নিয়ে কী করবে? আমার নামও মণি!

—ওস্তাদ আর সাকরেদ, একই নাম ধরে!

—ধরে না? ওনার টাইটেল পাল। আমি চৌধ্‌রী! তুমি যে এত আঁটি ভেঙে শাঁস নিচ্ছ, তুমি তো পাগল।

বোলার এবার হা হা করে হেসে উঠলেন। মণির সারল্য দেখে তাঁর চোখে জল এসে পড়েছিল। বললেন— হ্যাঁ বাবা! পাগল আমি!

—অ্যাই পেয়াদাবাবু খুলে দাও না গো! বলে মণি অতি অনুনয় করে উঠল।

—খুলবেক নাই। ই ট বান্দর আছে। খালি মোচ পাকড়ে হাঁসে। অ্যাই খুলে দে, হামার আদমী আছে, উর ছাত্তি উপ্‌রি চাক্কু মারেছে, উ মরদ আছে হামার, খুন নিকলে গেলো রে! হাঁ হাঁ হাঁ! বলতে বলতে তীব্র সুরে দুলিয়া কেঁদে ফেলে। মৃদু মৃদু কপাল ঠুকতে থাকে লোহার পাতে।

—তোমার মরদের নাম কী মা? কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করেন বোলার। তিনি

মেয়েটির এই অসহায় অশ্রুপাত সহ্য করতে পারছিলেন না।

লোহার গেটের কাছে ফুলচাচা, চাহরাম, মুমতাজের বউদি এবং দাদা এসেছিল। মা এসে কেঁদেকেটে ফিরে গেছে। গেট খোলেনি। এসেছিল তুহিন এবং খোদা বকস। বিকেল থেকে এখানে হত্যে দিয়ে পড়ে রয়েছে দুলিয়া এবং মণি।

মণি একবার গেট ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, মাথায় এবং কাঁধে রুলের ঘা খেয়েছে। বলেছিল—আমার বাপু আছে, আমাকে যেতে দাও।

পুলিস শোনেনি। মণি ডেকে এনেছিল হাতিনগর গিয়ে, যারা এসেছিল, কেউ তারা মুমতাজকে দেখতে পেল না। তুহিন এবং খোদা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এসেছিল, বেশিক্ষণ থাকেনি।

মোটর বাইক এসে বিশাল এই গেটের লোহার পাল্লার কাছে থামে। বাইকের পিছন থেকে নেমে রাহুল বোলারের সামনে আসে। মণি এবং দুলিয়াকে দেখতে পায়। একটা রাতপেঁচা বীভৎস সুরে গাছের উপর ডেকে ওঠে। সেই ডাক শুনে দুলিয়া ভয়ার্ত-বেদনায় পাশবিক ত্রাসে বিদীর্ণ হয়ে কেঁদে ওঠে উচ্চ স্বরে। পেঁচার ডাকটি শুনে মনে হয় প্রাণীটি রুগ্ণ।

দুলিয়াকে দেখেই চিনতে পারে রাহুল। দুলিয়াও চিনেছে। মণির চোখের দিকে নিমেষভর চেয়ে থেকে রাহুল বলল—হাতিনগর গিয়েছিলি ? তোকে খুঁজে আনতে চিৎপুর গেছে বুলবন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবি ! পুলিস পাহারা আছে, চলে যা। দুলিয়া, তুমি ফিরে যাও ! স্যর, মণি আমার ছোট ভাই।

হঠাৎ এবার দুলিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দু'হাতে মুখ ঢেকে লোহার গেটের কোণের দিকটায় মাটিতে বসে পড়ল।

রাহুল বলল—কান্নাকাটি করলেও এরা গেট খুলবে না দুলিয়া। তাজের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। রাত্রি হয়েছে, ফেরার বাস আর নেই। কী করবি মণি ?

—থাকব !

—কোথায় থাকবি ? মামার বাড়ি চলে যা। দুলিয়াকে নিয়ে যা।

মণি আর কোনও জবাব না করে চুপ করে রইল। রাহুল এবার বোলার স্যরের দিকে ফেরে।

বোলার শুধালেন— তোমরা কোথা থেকে আসছ ? পথে মানুষজন দেখি না, এভাবে ঘোরাফেরা ঠিক হচ্ছে ? ১৪৪ ধারা জারি করেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। মোড়ে মোড়ে পুলিস ডিউটি দিচ্ছে। ব্ল্যাক-আউট বোধ হয় !

রাহুল বলল—উকিলপাড়ায় দেবপ্রতিম স্যরকে পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রভবনের সামনে পুলিস আমাদের আটকেছিল। বলেছি, একজন সাংঘাতিক অসুস্থ, আমরা দেখতে যাচ্ছি।

—সন্ধ্যার সময় খাগড়ায় দু'দুটো লাশ পড়েছে শুনলাম। বললেন বোলার।

রাহুল বলল—শুনেছি। বলেই চার দণ্ড চুপ করে থাকে সে। বাবুলের মুখের দিকে চোখ তুলে বলে—তুমি একাই ফিরে যাও বাবুল।

—তুমি ! শঙ্কাঘন আর্তস্বরে বলে ওঠে বাবুল চৌধুরী।

রাহুল গলা খাদে নামিয়ে বলে— আমার কাজ আছে। আসুন স্যর, আমরা যাই। বলেই ত্বরিতে সে পথের দিকে হেঁটে যায়।

—এই রাতে আর কিছু করার নেই রাহুল। স্যর, আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন স্যর !

বলে উঠল বাবুল চৌধুরী।

রাহুল পথের উপর দাঁড়িয়ে বলল—করার সত্যিই কিছু নেই হয়তো। কিন্তু আমার বোঝাপড়া আছে। কতকগুলো জিনিস যাচাই করে নিতে হবে। বলে একটু থেমে মণিকে ফের বলল— তুই চলে যা ভাই। চলে যা।

বাবুল শুধালো—কোথায় যাবে এখন ?

—ঠিক জানি না কোথায় যাব ! তবে কোথাও যেতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে। আসুন স্যর ! বলে বোলারকে পথের উপর ডেকে নেয় রাহুল।

বোলার পথের উপর নেমে এসে রাহুলের একটা হাত নিঃশব্দে আঁকড়ে ধরেন। এই সময় দুলিয়া আরও জোরে ফুঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সেই কান্নার ধাক্কায় বোলার রাহুলের হাতখানি আরও জোরে চেপে ধরলেন।

বোলার বললেন—চল। ওহে, তুমি ভাই বাইক হাঁকিয়ে ফিরে যাও।

বাবুল মোটর সাইকেল স্টার্ট দেয়। আর কোনও কথা বলে না। সেই গর্জনে দুলিয়ার কান্না থামে। মণি ওকে ডাকে—আসো !

বোলার অত্যন্ত দ্রুত হাঁটতে পারেন। আকাশে রহস্য-জটিল মেঘ, তার তলে চাঁদের রূপালি চাকাটি গড়াচ্ছে, রাহুল দ্রুত বেগে হাঁটতে হাঁটতে সেই দৃশ্য দেখে আকাশে তাকিয়ে।

—খেয়েছ ?

—হ্যাঁ, স্যর !

—কী খেয়েছ ?

—পাউরুটি আর চা।

—ব্যস্‌ ?

রাহুল চুপ করে রইল। তারপর বলল—তাজ আমাকে না খেয়ে থাকার অভ্যাস শিখিয়েছে। ও বলেছে, খিদেয় পেট ডাকলে হেসে উঠতে হয়।

—অদ্ভুত !

রাহুল এবার হ্যাঁ বলে হেসে ওঠে। অতঃপর বলে—পুলিস যদি আমাদের ধরে, আমরা কী বলব ! বলব যে, বাবাকে আমি পথের উপর থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। উনি রাত্রি হলে ঘরে থাকতে চান না।

—হ্যাঁ, তাই বলবে। ইন ফ্যাক্ট্, আমি তাই করি। পাগলামি বলতে পার। গভীর রাত পর্যন্ত পথে পথে হাঁটি। নেশা।

—আপনি অসুস্থ, অথচ আপনি আমাদের মানা শোনেন না !

—আমার হাঁপের রোগ। ও কিছু নয়। অবশ্যি টান উঠলে কাহিল হয়ে যাই।

—এই রাত্রিটা বিশ্বাসযোগ্য নয় স্যর !

হঠাৎ রাহুল তার তীব্র অবিশ্বাস ঘোষণা করে। এবং সহসা দেখে একটি মোটরের আলো এবং আওয়াজ। রবীন্দ্রভবনের কাছাকাছি গাড়িটা, এদিকেই আসছে।

—মনে হচ্ছে পুলিস ভ্যান ! বললেন বোলার।

—হ্যাঁ, জেলখানার ওদিক থেকেই আসছে।

বোলার রাহুলকে সঙ্গে করে কমার্স-কলেজের মাঠের মধ্যে দ্রুত নেমে পড়েন। তারপর দেখতে পান গাড়িটা হাসপাতালের দিকে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

—ডেডবডি তুলবে রাহুল ! সিওর ! আমাকে করুণা বলেছে, হাসপাতালে মরে পড়ে

আছে অনেক।

—এই সব মৃত্যুর কখনও হিসেব হবে না স্যর ! এই মৃত্যুর কোনও ওয়ারিশ নেই।

রাহুলের মনে হল, ভারতবর্ষ এক বধ্যভূমি, গণতন্ত্র একটা প্রেত-নৃত্য। এখানে মৃত্যু স্বাভাবিক, জীবন অস্বাভাবিক।

—তাজকেও কি ভ্যানে তুলবে ওরা ? বাপুকে ?

—কী বলছ রাহুল !

—তাহলে কি দুলিয়া তাজের মৃতমুখটাও দেখতে পাবে না ?

—এ অসম্ভব রাহুল ! হতে পারে না !

—মানুষ একমাত্র জীব, যে আপন প্রজাতিকে হত্যা করে বারবার। বাপুর অহিংস অর্থহীন স্যর ! হিংসা অনিবার্য। আমরা না মারতে পারলে, ওরা আমাদের মেরে শেষ করে দেবে। আমানি মরবে, হিসেব হবে না। কদম ব্যবহৃত হবে, তাকে খেয়ে ফেলবে ভারতবর্ষ। আমি জানি স্যর, মানুষ শান্তি চাইলেও পাবে না ; সাধের গণতন্ত্র শান্তি দেবে মৃত্যুর মধ্যে। মরা ছাড়া শান্তি নেই। মার্কসবাদ যদি সভ্যতার কাজে না লাগে স্যর, তবু রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন মনে করিয়ে দেবে, সমাজের দু'টি ভাগ, ন্যালা একটা ভাগ, শশাঙ্ক আর একটা ভাগ। এই দু'টি আলাদা জীবন আলাদাই থেকে যাবে। হিংসাই কি সভ্যতার শেষ সত্য স্যর, আপনি বলুন আমাকে !

—এ তো গান্ধীজীর জিজ্ঞাসা রাহুল। কিন্তু হিংসাই তাঁকে গ্রাস করল। নাথুরাম হল ধর্মের হিংস্রশক্তি রাহুল ! আর ঐ ভ্যানটা হল সাংবিধানিক হিংসা।

—স্যর !

—হ্যাঁ, রাহুল ! হিংসা যীশুকে মেরেছে। বুদ্ধকে ব্যর্থ করেছে। কারবালার যুদ্ধ মনে আছে তোমার ? হিংসার মৃত্যু হয় না। শুধু তার ব্যবহার বদলায়। রাষ্ট্রযুদ্ধে হিংসার এক ধরনের ব্যবহার, হিরোসিমা নাগাসাকি তার সাক্ষী। গৃহযুদ্ধে হিংসার অন্য আচরণ, তা-ও কম নৃশংস নয়। মার্কসবাদ শুধু বিশ্বযুদ্ধকে শ্রেণীযুদ্ধে রূপান্তরিত করে সমস্যার সমাধান চেয়েছে। যতটুকু জানি, এ বোধ হয় অনিবার্য, হয় বিশ্বযুদ্ধ, নয় শ্রেণী-সংগ্রাম। চল। তুমি নিশ্চয় থেমে পড়তে চাও না ?

—কোথায় যাব স্যর !

—তবু, চল !

বোলার রাহুলকে হাত ধরে টেনে রাস্তায় এনে ফেলেন। পুলিস-ভ্যান হাসপাতালে ঢুকছে।

—কোনদিকে যাব ? কোথায় ? আপন মনে বলে উঠল রাহুল। তারপর বলল—দেবপ্রতিম স্যারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

—বাড়িতে নেই ?

—না। অবাক হয়ে গেলাম, ডোরবেল টিপে টিপে হয়রান। কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না দীর্ঘক্ষণ। দশ পনর মিনিট বাদে দোতলার রেলিঙ-ঘেরা বারান্দায় আলো জ্বলল, অধ্যাপিকা এসে দাঁড়ালেন।

—কে, সবিতা ?

—বাবুল বলল, স্যরকে একটু ডেকে দেবেন, বলুন রাহুল এসেছে। দূর থেকে হলেও বুঝতে পারলাম, আমার নাম শুনেই তাঁর ভাবান্তর হয়ে গেল। আলো নিবিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। এমনকি মিনিট পাঁচ পর বাইরের আলোটাও নিবে গেল। সমস্ত বাড়িটা

অন্ধকারে ডুবে গেল স্যর! ভাবলাম, বুঝি পাওয়ার চলে গেছে। আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখি, না, আলো যায়নি। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকব!

—তোমার নাম বলে দেখা করতে চাওয়া ঠিক হয়নি রাহুল!

—ভেবেছিলাম, তাতে হয়তো সুবিধা হতে পারে। আলো নিবে যাওয়ার পর মনে হল, অধ্যাপিকা ভয়ে এবং ঘৃণায় আলো নিবিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমি জানি, ওই বাড়িতে ললিত এবং অধীর নিয়মিত আসছে যাচ্ছে। আপনি বলুন, দেবপ্রতিম স্যর কি কলেজে ক্লাস নিচ্ছেন?

—না। তুমি কাল কলেজে গেলেই বুঝতে পারবে। মনে হচ্ছে, দেবপ্রতিম হয়তো চাকরিতে জয়েন করবেন, উনি তাঁর পূর্ববিস্থায় ফিরে আসতে চান। কিন্তু...

—বলুন! থামলেন কেন স্যর!

—সে অনেক কথা রাহুল! এখন শুনে আর কী হবে! উনি যেদিন কলেজ ছেড়ে চলে যান সেদিন তাঁর সে কি উত্তেজনা, প্রফেসর রুমে সবাই আমরা বিমূঢ় হয়ে গেছি। 'আই হেট দ্য বুর্জোয়া-এডুকেশন, আই হেট!' বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত শরীর প্রবল টেনশনে কেঁপে উঠছে। তাঁর মধ্যে একটা চরম আবেগ ঝড়ের মত করছে।

—আমি জানি স্যর! অনেক দিন নানান প্রসঙ্গে ও কথা শুনেছি। এমনকি কবির সঙ্গে, তাজের সঙ্গে কতদিন হরবোলার আত্মত্যাগের গল্প হয়েছে। তিনি আমাদের কাছে একটা মিথ। মিথ অফ রেভল্যুশন। কমরেড সি, এম, সম্পর্কে যত আবেগ, তাঁর সম্পর্কেও আবেগ তো কম ছিল না স্যর! কিন্তু এই মানুষটিকে আমি সন্দেহ করতাম। সেই সংশয় দেখা দিয়েছিল রুকসানাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য সেই সন্দেহ যেভাবে নিরসন হয়েছে তা-ও কম অদ্ভুত ছিল না! এত রহস্যময় মানুষ আমি কখনও দেখিনি স্যর!

বলতে বলতে থেমে পড়ল রাহুল।

বোলার বললেন—তুমি ছেলেমানুষ রাহুল। চল, যাওয়া যাক।

—কোথায় যাব?

—বিমান ভদ্রের ওখানে।

—তিনি কে?

—শ্রীপৎ সিং কলেজের শিক্ষক। আমাদের বন্ধু। ওঁর কাছে আমরা 'লিঙ্ক' পেতে পারি।

—ভদ্র জানেন দেবপ্রতিম কোথায়?

—আলো নিবিয়ে দেওয়া হল, তারপরও তুমি দেবপ্রতিম কোথায় প্রশ্ন করছ কেন? উনি নিজ গৃহেই রয়েছেন এবং খুব সম্ভব নিরাপদে।

—তাহলে যাব কেন! না, যাব না। কিছুতেই যাব না! বলতে বলতে অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ল রাহুল। বন্ধ চায়ের স্টলটির কাছে, চাপা আলোর মেঘলা আকাশের তলে, পড়ে থাকা ছোট বেঞ্চটার উপর গাছের কালো ছায়ার ভিতর দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল রাহুল।

মুখ থেকে দু'হাত সরিয়ে অন্ধকারে ডালপালার ফাঁকে চোখ তুলল রাহুল। হঠাৎ মেঘ সরে যাওয়া একটা ফাঁকা নীল অংশে চাঁদটা ভাসছে দেখা যায়, চাঁদের চারপাশে ঘিরে থাকা, পাকাতে থাকা মেঘ গ্রাসে উদ্যত, লোভী। জ্যোৎস্না তীব্র হয়ে রাহুলের চোখে এসে লাগে, রাহুলের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ডুকরে ওঠে সে।

—আমার কোনও লিঙ্ক নেই স্যার। যোগসূত্র নেই। আমি আজ আর কিছুই 'লিঙ্ক আপ' করতে পারি না। সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাজ রয়েছে, যেতে পারছি না, বাপু রয়েছেন, পৌঁছাতে পারছি না।

কথাগুলি বলতে বলতে গলার স্বর এতই খাদে নেমে যায় যে, প্রফেসর বোলার বুঝতে পারেন, রাহুল প্রায় পাগলের মত কথা বলে চলেছে। বলতে বলতে থেমে পড়ে রাহুল এবং আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে।

বাবার নামে কে স্লোগান চালু করেছিলেন প্রণামপুরে ? কেন করেছিলেন ? যে-চাবিটা এখন আমার কাছে, তা নিয়ে এখন কী করব আমি ? সমস্তই বিচ্ছিন্ন, তবু কেন চাবিটা আমার কাছে রয়ে যায় !

—ডাক্তারদা বলেছিলেন...

—কী বলেছিলেন ?

—হরবোলাকে প্রণামপুর থেকে তুলে নেওয়া হল, তার মানে এই নয় যে, তাঁর আর কোনও কাজ রইল না। তাঁকে অন্যত্র কাজেরই জন্য তুলে নেওয়া হচ্ছে। তাঁকে এক ক্ষেত্র থেকে তুলে এনে অন্য এক ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হবে। হরবোলার ভূমিকা যদি শেষ হয়েও যায়, দেবপ্রতিমের কাজ শেষ হয় না।

—হ্যাঁ, তাঁকে নিয়োগ করা হয় কলেজের কাজে, সেটাও তো কাজ রাহুল !

—স্যার !

—তুমি চমকে উঠবে না। সত্যিই হয়তো দেবপ্রতিম কলেজে পুনর্বহাল হচ্ছেন।

—তারপর ? আমার কাছে একটা জলগেটের চাবি আছে স্যার ! এই চাবিটার জন্যে কবি মারা গেল ! বন্দুকটা তাজ ফেলে এসেছে চিৎপুরে, আশঙ্কা হয় সেটা এখনও রয়েছে আমাদের বাড়ির কোথাও লুকনো। এই চাবি এবং বন্দুক, এর ব্যবহার কে করবে ? আমি কী করব ?

বন্দুকটা কোথায়, আমাকে জানতে হবে। বিড়বিড় করে বলে ওঠে রাহুল। বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়। বন্দুকটা না হলে, চাবিটা রাখা যায় না। আমি বিশ্বাস করি না, একটা এই ধরনের চাবি বন্দুক ব্যতিরেকে বুকের মধ্যে আগলে রাখা যায় !

বিনা যুদ্ধে মানুষ সূচ্যগ্র মেদিনীও ছেড়ে দেয় না। এই তবে ইতিহাসের সত্য, মহাভারতের সত্যসার, শ্রেণী-সংগ্রামের মৌলবিশ্বাস, মার্কসবাদের মৃত্যুর পরও সত্যই থাকে ; যদি তার মৃত্যুও হয় কখনও। রাশিয়ার সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র মার্কসবাদের শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করেছে, তবু শত পতনের মধ্যে, অভ্যুদয়ের বিবর্তনে, সূচ্যগ্র মেদিনীর ওই প্রশ্নটি সহস্রবার উত্থিত হয়। ভিয়েতনাম প্রমাণ করে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনেও সূচ্যগ্র ভূমি মানুষ ছাড়ে না, অধিকার উগরে দিতে বাধ্য হয় আমেরিকা।

অসাম্যের পৃথিবী বারংবার সাম্যের স্বপ্ন দেখবে। সাম্যে অবিশ্বাসী মানুষ সাম্যেই যেতে চাইবে সংশয়-সঙ্কুল উন্মত্ত হিংসার পারাবার পেরিয়ে, শত ভিয়েনাম শতবার জেগে উঠবে এই পৃথিবীতে। এবং বিশ্বাস করি, এই ধরনের একটি চাবি এবং এই ধরনের লুক্কায়িত একটি বন্দুক বারবার জমা হবে কোথাও কোন গৃহকোণে, তড়াগে, প্রাঙ্গণে এবং মোহড়া গ্রামের মত গ্রামে এবং নগরে। এবং বুকের কাছে।

অদৃশ্য একটি বন্দুক রাহুলকে টানতে থাকে। উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। এবার পা বাড়িয়ে উচ্চকিত স্বরে বলল—স্যার ! তাজের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে। বলতেই হবে। ওই কালো ভ্যানটা ভয়ংকর স্যার ! আমি চললাম। বলেই রাহুল দৌড়তে শুরু

করল উর্ধ্বশ্বাসে।

—আমরা বিমানের ওখানে যেতে পারতাম রাহুল ! বলে উঠলেন বোলার।

—না স্যর ! বলে আরও জোরে ছুটে চলল রাহুল পারভেজ।

বোলার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন গাছটির তলে স্টলটির নিশুতে। একটি কুকুর গার্লস কলেজের চৌমাথার কাছে লম্বা সুর তুলে লাল দিঘির দিকে খুব সম্ভব ছুটে যায়।

বোলার ধীর পায়ে হাপসাতালের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকেন।

আলোটা নিবিয়ে দিলেন সবিতা। দোতলার উপর থেকে চেয়ে দেখলেন নীচে রাহুল তার এক সঙ্গীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে, দোতলার বারান্দায় আলো জ্বেলে সবিতা দেখলেন। জ্বলে ওঠা, চেয়ে দেখা, কোনও একটিও কথা না বলা, অসম্ভব অভিজাত গাম্ভীর্য, থমথমে দৃষ্টিতে স্বল্প আভাসিত ভয় আর ঘৃণা। হঠাৎ তারপর দোতলার আলো নিবে যায়। এবং শেষে বাইরে গেটের মাথার আলোও নিবিয়ে দেওয়া হয়।

সর্বত্র আলো থাকে, সব ঘরে আলো থাকে। অন্ধকারে হারিয়ে যায় ঘৃণা-নির্বাক মুখটি।

মুখটা অন্ধকারে যায়, কিন্তু রাহুলের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় না।

কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। বার বার ভেসে ওঠে। শতবার মুহূর্তে মুহূর্তে জেগে ওঠে। রাহুল ওই হানাদার মুখের ছবিটা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। খুব কষ্ট হয় বুকের মধ্যে।

পুলিস-ভ্যান ঢুকেছে, প্রধান বড় গেটটির লোহার বৃহৎ পাল্লা খোলা হয়েছে, এখনও খোলাই আছে। গেটের ওখানে একজন কনস্টেবল একা দাঁড়িয়ে। রাহুল গেটের কাছে এসে দম টেনে টেনে দু-চার বার শ্বাস ফেলে এবং নেয়। তারপর কোনও দ্বিধা না করে গেট পেরিয়ে ঢুকে আসে হাসপাতালের ভিতরের সড়ক ধরে, কেন যেন কনস্টেবলটা বাধা দেয় না তাকে।

মণি আর দুলিয়া কালো ভ্যানটির থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে। রাহুলকে দেখবা মাত্র ছুটে এল কাছে। চাপা সুরে মণি বলল—আমি খুনি লোকটাকে দেখলাম রাহুল দাদা !

—কে ? দীর্ণ ভয়ে প্রায় আর্তনাদ করে ফেলে রাহুল।

—দেখলাম, পষ্ট। ওই লোকটা নামল ভ্যান থেকে, হাতে নাঙা ছোরা। ভ্যানে করে গুণ্ডা এনেছে ভাইয়া !

জীবনে এই প্রথম আশ্চর্য ভয় পেল রাহুল। সীমাহীন নৃশংস রাত্রি, অবশ লাগল নিজেকে। তার কাছে অস্ত্র নেই। তাজ দেবপ্রতিমকে পিস্তল ফেরত দিয়েছে।

ভয়ানক নিঃস্ব হয়ে গেল রাহুলের প্রাণ। এত অসহায় কখনও লাগেনি, এত নির্বোধ কখনও মনে হয়নি নিজেকে। তাজেরই উপর এখন অভিমান হচ্ছিল তার। কেন তাজ ওভাবে গঙ্গার ঘাটে তুহিনের হাতে পিস্তল ফেরত দেয় ! বন্দুকের নলই যে ক্ষমতার উৎস, সশস্ত্র সেপাইদের দেখে কি সেকথা মনে হয় না !

বুকের মধ্যে মেঘের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে কান্না। বাইরে ঠেলে আসতে চাইছে, তার শক্তিশালী বুকের খাঁচাটাও যেন ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছে।

তাজ মরদ বাজ। তাই সে শত্রুব্যূহে অতর্কিতে হঠকারীর মতো ঝাঁপ দেয়। এবং এ মুহূর্তে সে ঘুসড়ু মরদ ফুসড়ু, বোকা। কেমনভাবে শুয়ে আছে সে ? নাকের ছিদ্রে কি

তার নল রয়েছে এখনও ! সে কি চেতনা ফিরে পেয়েছে ? বাপুর সঙ্গে কি তার কথা হয়েছে ?

'ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আত্মত্যাগের রাজনীতি ।' আজ এই নৃশংসতম রাত্রিতে, এই কুটিল দুর্ভেদ্য মুহূর্তে কী তার উদ্যোগ ! কী করতে পারে রাহুল ! সে আজ বিন্দুচ্যুত, তার কোনও স্থানীয় নেতা নেই, কমিটি নেই । সে দীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন, সে ভেবেছিল, তাজকে সঙ্গে করে আবার সে শুরু করবে । এই মুহূর্তে তা হলে কি রাহুল আত্মত্যাগ করতে পারে না ?

—ভাইয়া !

—অ্যাঁ !

—কী হবে !

এবার বাস্তবিক রাহুল পাগলের দশায় ফ্যাসফেসে গলায় দুলিয়ার দুই বাহু আঁকড়ে ঝাঁকিয়ে বলে—তুমি কাঁদতে পার না ! কাঁদো !

দুলিয়া কাঠ । বুঝি সে নিস্পন্দ । দুলিয়াকে কাঁদিয়ে তোলাই কি তবে রাহুলের এ মুহূর্তের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ! মনে হয় দুলিয়ার কান্না ছাড়া তার আর কোনও অবলম্বন নেই, আর কোনও চেষ্টাও নেই ।

দুলিয়াকে আঁকড়ে ধরেছিল রাহুল, ঝাঁকিয়ে বলেছিল কাঁদো । ঠিক যে রকম আকুল হয়ে সে ন্যালার মৃত্যুতে হাওয়া বিবিকে বলেছিল । অতএব দুলিয়াও কেঁদে উঠল না । সাহস ছিল না, বুকে জোর ছিল না । সে এতই বিহ্বল এবং নির্বাক ছিল ।

কিছুক্ষণ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মনে হল, দুলিয়া চৈতন্য হারিয়েছে, থামের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে, হাসপাতালের চাতালের নীচে । এখানে পুলিস বিদ্যমান, এখানে সিঁড়ি এবং হাসপাতালের ভেতরে ঢোকার গেট । পাঁচ-ছজন পুলিস দণ্ডায়মান । একজন ছুটে এল এবং রাহুলের পিঠে রুলের গুঁতো চালিয়ে বলল—যা, যা ! হট !

ভিতরে ভয়াবহ হুহু করা বিমর্ষ আর্তনাদ শোনা গেল । প্রধান বড় গেটটির দিকে সহসা গুলির আওয়াজ ফেটে ওঠে । তীব্র । কী হল ওখানে ! দুলিয়াকে দু' হাতে তুলে নেয় রাহুল । গুলির শব্দে দুলিয়ার দেহ মুণ্ডুছেঁড়া সদ্য মৃত পাখির মতো কাঁপে । একটা আঁ আঁ চাপা আর্ত গোঙানি হয় । ব্যস । আর কিছুই হয় না ।

তিনজন সশস্ত্র পুলিস প্রধান গেটের দিকে বুটের তৎপর শব্দ তুলে ছুটে যায় । আকাশে আরও মেঘ জমেছে । চাঁদ মেঘ-নিকষে লুক্কায়িত । মেঘের তলে ঘন শ্লথ হাওয়ার মৃদুবেগ, মেঘ-নিকষে অন্ধকার ঘনায় । পুলিসদিগকে মনে হয় ছায়া ।

ছায়ারা তখন কী করে ? তারা ছুটে যায় । রাহুল দুলিয়াকে প্রধান গেটের দিকে তুলে আনে । মণি আসে না । ডেডবডি তোলা হচ্ছে ভ্যানে । গুণ্ডারা মৃতদেহ তুলছে পুলিসী হেফাজতে । হয়তো যারা মেরেছে তারাই তুলে নিয়ে যাচ্ছে । কিছুদূরে বড় থামের আড়ালে ছুটে যায় মণি । লুকিয়ে পড়ে । তাজের রক্তাক্ত দেহ সে দেখেছে ।

ছায়া-পুলিসেরা গেটের কাছে এসে চমকে ওঠে । তখন রাহুল দুলিয়াকে নিয়ে বাইরে চলে আসে । নীচের দিকে নেমে যাওয়া পথের কিনারে জলকলের কাছে চলে যায় । বোলার ওকে দেখতে পেয়েছেন ।

—ডেড । গুলি করেছে ! ছায়া-পুলিসের মৃদু সংলাপ শুনতে পান বোলার । বোলার দেখেছেন দুজন এসে গুলি করল কনস্টেবলটার গায়ে । খতম করল এবং চলে গেল ।

বোলারের মনে হল, সমুদ্রের পেটের মধ্যে হল্লা হচ্ছে বাতাসের । এক বিশাল

বায়ুমণ্ডল আবর্তমান, ঘূর্ণ্যমান, ঠিক একটি চক্র। ধরা যায় সেই ধরনের একটি মৃত্যুচক্র আছে এই দেশে। গরিব সেই আবর্তে মরে ঝরে পড়ছে নিয়ত, পলে পলে রোজ। বিপ্লবে মরে, অ-বিপ্লবে মরে—ঝরে যায়।

ফলত কনস্টেবলটাও মৃত্যুর পর সেখানেই যায়। কেননা সে-ও গরিব, তার পোশাক চিতার আগুনে পুড়ে যেতে বাধ্য।

কালো ভ্যান প্রধান গেটের কাছে এসে তাকেও তুলে নিল। মণি থামের আড়ালেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারল, কী ঘটনা ঘটল হাসপাতালের মধ্যে।

মণি ঢোঁক গিলতে পারছিল না। গলার ভিতরের শিরা কান্নার রুদ্ধ চাপে বুজে ছিঁড়ে গেছে, ঢোঁক নিতে লাগে।

আকাশের মেঘ সরে গেছে দিব্য। নক্ষত্র ফুটেছে। আশ্চর্য। তারই মধ্যে আগুনের নাক্ষত্রিক হলকা ধাবিত। খোদার ফেরেস্তারা আগুনের দুররা অর্থাৎ গদা নিক্ষেপ করছে, দুঃশাসনীয়কে শাসন করে চলেছে, শয়তানকে তাড়া করছে।

ফিনা রে জাহান্নামা
খলে দিনা ফিহা ॥

ঈশ্বর, তুমি শয়তানকে ক্রমান্বয়ে নরকে নিক্ষেপ কর। ওই উল্কাপাত সেই নিদর্শন। কিন্তু সবই তো আকাশে হয়, মাটিতে হয় না কেন ? এ কথার উত্তর মণি পায় না।

—তাজ ভাই, তোমার বন্দুকটা আমার কাছে আছে গো ! গলার ভিতরে এই বাক্যটি মরিয়া এবং রুদ্ধ। দু' গাল বেয়ে জল নিঃশব্দে বয়ে নামে। থামে মাথা রেখে মণি নিজেকে সামাল দেবার চেষ্টা করে।

—বাপু ! তুমি কি রইলে এখনও ? বলতে বলতে মণি লোহার গেট বন্ধের শৃঙ্খল-ধ্বনিপাত শুনে চমকে ওঠে। ফের দৌড়, শুধু দৌড় আর কিছু নয়।

মণি ছুটে চলেছে। রাস্তার সমস্ত জ্বলন্ত বাল্বগুলি লাল কাগজে মোড়ানো। কে করেছে এই কাজ ! সারাপথ লাল আলোয় রহস্যঘন। অনেক শহিদ চলেছে ভ্যানভর্তি, শ্মশানঘাটের দিকে। বহরমপুর জেলের এই ঘটনা বোলার জানেন, কল্পনা নয়। এই পথ রঞ্জিত, এ কোনও সিনেমা ছিল না।

দুলিয়া চেতনা পায়। কেঁদে ওঠে। ওর একটি হাত রাহুলের নাকে এসে লাগতেই রাহুল মেহেদিপাতার গন্ধ পায়। দুলিয়ার হাত রাঙা। মেদুর গন্ধে রক্তাক্ত বুঝি। দুলিয়া বলল— তোর দোস্তের লেগে হাত রাঙাইছি রাহুল ! জান দুখাইছে রে ! উ দেখলেক নাই। ই দেখ, হামি কাঁদছি বটে !

॥ ৪৩ ॥

সাদা চৌধুরীর চেতনার গভীর স্তরে একটি গম্ভীরা গানের কলি ভেসে আসে। তিনি চোখ মেলে দেখেছিলেন মুমতাজকে।

শিবো হে হামি কী দেখিলাম
তুমি কেনে দ্যাখো না চোখ মেলে
শিবো হে...

গম্ভীরা গানের ধরতাই ছিল সেই পঙ্‌ক্তিদ্বয়। চেতনা সুপ্ত প্রায়, তবু সেখানে গানের কলি ভেসে উঠেছিল। সেই একটা সুর আর সেলের সামনে দিয়ে চলে যায় একটি বাটি ঘষতে ঘষতে মেঝের উপর, সেই ঘর্ষণের শব্দ। পরনের জামা কাপড় ছিঁড়ে জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে দড়ির মত করে চায়ের বাটিটা টানা হয়। বাটি, যা আঙুলে ঘষলে সিসা ওঠে। সেই বাটিতে ভর্তি গরম চা, চোখের সামনে দিয়ে ঘষে ঘষে চলেছে এক সেল থেকে আর এক সেলের দিকে।

কোনও একটি সেলে জামা কাপড় পুড়িয়ে আগুন জ্বেলে চা তৈরি হয়েছে। তারপর বাটির কানা ফুটো করে কাপড়ের দড়ি ঢুকিয়ে বাঁধা হয়েছে এবং দড়ির অন্য মুখটি ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে অন্য সেলের দিকে। অন্য সেলের কয়েদী তাই ধরে টান দিতেই বাটিটা ঘষে ঘষে চলেছে মেঝেয়।

তখনই গান ভেসে ওঠে কোথাও কোনও কয়েদীর গলায়—শিবো হে হামি কী দেখিলাম... তুমি কেনে দ্যাখো না চোখ মেলে...।

জেনারেল ওয়ার্ডে কিছুদিন রেখেই সাদা চৌধুরীকে কনস্ট্যান্ট সেলে এনে ঢোকানো হয়। এই কনস্ট্যান্ট লক আপ এক সেকেন্ডের জন্যও কখনও খোলা হত না। যারা এসকেপ করতে গিয়ে ধরা পড়ে অথবা ভয়ংকর কয়েদী তাদেরই এই নির্জন নিঃসঙ্গ কক্ষে এনে ভরা হয়। সাদা চৌধুরী জানেন না তিনি কতখানি ভয়ংকর জীব এবং তিনি জেল পালানোর চেষ্টাও করেননি। তবু তাঁকে কনস্ট্যান্ট লক আপে ঢোকানো হয়েছিল।

এখানে গরাদের তলা দিয়ে চাপা ভাত আসে। শালপাতায় চেপে চেপে দেওয়া ভাত, যাতে কিনা থালাটা ঢুকে আসে সহজে, ভাত না লেগে যায় গরাদের লোহায়, অবশ্য ফাঁক কিছুটা আছে বইকি! ভাত আসে, তরকারিও আসে। ডাল আসে। সপ্তাহে দু'দিন মাছ, মাংসের বরাদ্দও রয়েছে। তবে মাত্র তিন বাটি জলে সবকিছু সারতে হয়। সব কিছু মানে স্নান পায়খানা সব। তেষ্টার জল, খাদ্যের জল সবই তিনবাটি জলের সঙ্কুলানে করতে হবে।

> 'এ কেমন কাফেরার দেশ গো
> জহর মিলে পানি মিলে না।'

কে গাইছে ওই জারিগানের সারি! কালো ওসমান গাইছে! গান শুনতে শুনতে প্রবল তৃষ্ণায় লুব্ধ সাদা গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়ালেন চা ভর্তি বাটিটার দিকে। এখানে জল যদিও তিন বাটি, চা আধ কাপও নয়, এক বিন্দুও নয়। এখানে পোশাক পুড়িয়ে চা, এখানে জামা ধুতি পাজামা ছিঁড়ে দড়িবাঁধা চা এই প্রথম, আহা কী আহ্লাদ চামেলি! বাবুর চা এসেছে গো!

—বুঝলেন তরফদার! চা আমার মিলিটারি-জীবনের অভ্যেস! কোয়েটায় খুব ঠাণ্ডা তো! সেই সময় চা না খেলে চলত না! মোহড়া গাঁয়ে চা-চল বাড়ি বলতে বাবুর বাড়ি! রোখো! রোখো!

চায়ের বাটি থেমে গেল। নিজের বাটিতে ঢেলে নিলেন সাদা। সেই চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হল, এত বিস্বাদ চা আর হয় না, তবু চা বটে। অর্ধমৃত তিনি, তথাপি চায়ের কী খর নেশা! শরীরের কোষে কোষে চায়ের গন্ধে চরম উৎফুল্লতা জেগে ওঠে। চোখে মুখে যেন জীবনেরই নেশা ফুটে ওঠে, চকচক করে ওঠে চোখ দু'টি।

এখানে কিসের অভাব? জল আর চায়ের অভাব। এবং ভয়ংকর অভাব কথা বলা মানুষের, অতি দুঃসহ নিঃসঙ্গতা এখানে। কথা না বলে মানুষ কিভাবে থাকবে!

লক আপগুলি থেকে বন্দী মানুষ মাঝে মাঝে চিৎকার করে—কথা বলতে দাও। আমার লক আপে অন্তত আর এক কয়েদীকে পাঠাও, কথা বলি। আর কিচ্ছু চাই না আমরা, কথা বলার মানুষ চাই। বারোটা ঘরে আমরা একজন একজন করে একা একা বারো জন বন্দী আছি। কেন এভাবে থাকব!

কনস্ট্যান্ট লক আপে আটক মানুষ একসেকেন্ড দোর খোলা পায় না, কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় একবার সেই সেলের পায়খানার ঝুড়ি বদলে দেয় জেলের মেথর। তখন দোর খোলে। দোর খোলে বটে, কিন্তু জেলের সেপাইরা সারবেঁধে প্রাচীর খাড়া করে দাঁড়ায়, মানব-প্রাচীর।

—আমাদের ওয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে চল! এখানে একলা থাকব না। কথা বলতে দাও! মানুষ দাও আমাদের! একা কথা না বলে থাকতে পারি না ডেপুটি সাহেব!

ঝুড়ি বদলানোর সময় বারো সেলের একজন বিদ্রোহ করে। অসম্ভব জেনেও করে। মানব-প্রাচীর ঠেলে বার হয়ে পড়তে চেষ্টা করে প্রচণ্ড প্রহৃত হয়।

সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে থালা বাটি কম্বল বর্জন আন্দোলন শুরু। ছোঁব না। কথা বলতে দাও। নিরম্বু অনশন চলে তারপর। শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা বলার অধিকার নিয়ে নির্জল উপবাস সহজ ছিল না। কিন্তু যেন উপায়ও ছিল না।

নিরম্বু অনশন হল মানুষের জীবন-তৃষ্ণার শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদ। জীবনকে ভালবেসে জীবনকে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা। তিলে তিলে অনাহারে শেষ হওয়ার জন্য গান্ধীপথ এটি, যা হতদরিদ্র ভারতবর্ষে কতবার তিনি প্রয়োগ করেছেন। অন্ন এবং জলের সঙ্গে শরীরের আমৃত্যু বিচ্ছেদকে জেলও ভয় পায়।

দু'দিন পরে এই দাবি জেল-কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। একটি সেলে অন্তত দু'জন কয়েদী রাখার ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। কিন্তু যে-কয়েদীটি সেপাই-প্রাচীর ঠেলে সাধারণ ওয়ার্ডে চলে যেতে চেয়েছিল, যে কিনা গভীর নিঃসঙ্গতায় কষ্ট পাচ্ছিল বলে উন্মত্ত হয়, তাকে এতই প্রহার করেছিল প্রহরীরা যে, সে এখন মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছে। বাঁচে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ফলে তাকে জেল-হাসপাতালে পাঠানো হল।

—তুমি যাচ্ছ হে আচায্যি! যদি পার হাসপাতালের বালবগুলো ভেঙে দিও।

একথা তার কানে কানে বলে দেওয়া হয়। কিভাবে জেল-পালানোর কর্মসূচি গ্রহণ করে বারো জন, তা অনেক পরে বুঝেছেন সাদা চৌধুরী। তাঁর সেলে এসেছে গোরা নামের এক কিশোর, মণির চেয়েও বয়সে ছোট।

গোরা বলল—অনশন চলবে বাবা! আমরা সবাই জেল-হাসপাতালে যা করে হোক পৌঁছাব।

মণির মত দেখতে গোরা। নাম গোরা, কিন্তু ফর্সা নয়। দাঁতগুলি মণির মত ঝকঝকে, হেসে উঠলে খুব সুন্দর দেখায়। হাত পা মণিরই মত বলিষ্ঠ। গাঁট্টাগোট্টা।

গোরা বলল—আমি অস্ত্র তোয়ের করছি বাবা!

সাদা অবাক হয়ে গেলেন। গোরা চাপা ভাত খাওয়ার থালা দুমড়ে ভেঙে ফেলেছে। ভেঙে ফেলে গরাদের লোহায় ঘষে নিচ্ছে।

—কতদিন অনশন করব?

—যতদিন না জেল-হাসপাতালে যেতে পারি। পঁচিশ-সেলের ওদিকে আপনার নামে স্লোগান হয়, আপনি শুনেছেন কখনও?

—না।

—জেনারেল মেল-ওয়ার্ডে হয়।

—কেন হয়?

—আপনি আমাদের নেতা।

—গোরা! একথা ভুল। আমি নেতা কেন হব! আমি সাধারণ মানুষ।

—আপনি তাহলে অনশন করবেন না?

—কেন করব না?

—আমি অস্ত্রগুলি তৈরি করে নিই। একজন পাহারা দিচ্ছে দেখেছেন! আমি ঘষছি, শব্দ শুনে এদিকে এলে বলবেন। আমি থেমে যাব। এসব হল নকল অস্ত্র, এককেপ করার সময় কাজে লাগবে। পালাতে হলে ফার্স্ট হাসপাতালে যেতে হবে! আমরা ক'জন জেনারেল ওয়ার্ড থেকে মারামারি করে সেলে আসি। বুঝলেন!

অধিক বিস্মিত হয়ে ওঠেন সাদা চৌধুরী।

—আমরা যাব ২৯ নং ওয়ার্ডে। ওটাই হাসপাতাল।

—তারপর?

উত্তর না দিয়ে গোরা সিসের দুমড়ানো থালা ঘষতে ঘষতে অস্ত্রের রূপ দিতে থাকে। সামনের ড্রেন দিয়ে কুষ্ঠস্রোত বইছে। বাতাসে মলমূত্রের কঠিন গন্ধ।

অনাহারে তৃষ্ণায় প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে আসতে চাইছে। আদিম এক ছেলে তার অস্ত্র বানাচ্ছে ঘষে ঘষে। বিশাল সশস্ত্র পুলিস আর মিলিটারির বিরুদ্ধে এই কি তার যুদ্ধের প্রস্তুতি! জেল তো এখন শুধু কয়েদীর জায়গা নয়। যখন তখন গুণ্ডাবাহিনী এবং পুলিস ঢুকে এসে প্রহার করে যায়।

আমরা কিভাবে যাব ২৯ নম্বরে? এক রাত্রিতে দেখা গেল গোরা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে আর ঘষছে, সাদা বসে বসে প্রহরীকে লক্ষ্য করছেন।

—রোখো! বলে উঠলেন সাদা চৌধুরী। কেননা প্রহরীটা গরাদের কাছাকাছি চলে এসেছে, ওর বুটজাতা দেখা যাচ্ছে।

গোরা 'রোখো' শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

—জল! জল! বলে চিৎকার করে উঠলেন চৌধুরী। গেট খোলা হল! গোরার অস্ত্র তিনি কাপড়েরর কোমরের ট্যাঁকে গুঁজলেন। তিনি ভাল করেই জানেন, এই অস্ত্রে যুদ্ধ করা যায় না। তবু গোরা যুদ্ধ করতে চায়। তাহলে মণি কী করছে বাইরের পৃথিবীতে! তার হাতে কি কোনও অস্ত্র আছে! মুমতাজের বন্দুকটা কোথায়?

গোরা এবং চৌধুরীকে ২৯ নং ওয়ার্ডে নিয়ে এল ওরা। এক সপ্তাহ বাদে বাকি ৯ জনকেও পাঠিয়ে দিলে এখানে। মরিয়া এ জীবন কিছুতেই মরতে চায় না।

হাসপাতালে আলো নেই। মিটমিট করছে সরু মোমের শিখা। অন্যত্র আলো আছে। এখানে নাকি ওয়ারিং না হলে আলো জ্বলবে না। সব বালবগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

—কেন?

—আচায্যি ভেঙে দিয়ে গেছে। তাকে জেনারেল ওল্ড হসপিটালে চালান করে দিয়েছেন ডাক্তার। ও আর বাঁচবে না।

কী করে ভেঙে দিয়ে গেল অসুস্থ ওই লোকটা, অত উঁচুতে বালবে কোন বস্তু দ্বারা

আঘাত করল ! খালি সেকথা ভাবতে থাকেন সাদা চৌধুরী।

শুধু ঘর্ষণের শব্দ হয় মাথার মধ্যে। বাটি ঘষে ঘষে যাওয়া, গরাদে দুমড়ানো থালা বাটি ঘষার শব্দ, মস্তিষ্কের কোষে বিঁধে আছে। হাসপাতালের বেডে চিত হয়ে শুয়ে উচ্চস্থানে প্রায় সিলিং-এর কাছে যে বাল্ব ছিল, সেই ফাঁকা জায়গায় চোখ রাখেন সাদা চৌধুরী। আচায্যি লোকটি কে তা তিনি জানেন না, লোকটি যে বাল্ব নষ্ট করে গেল, তা-ও কম নয়। সামান্য ওই কাজটুকু যে সামান্য নয়, তা তিনি বুঝতে পারেন ক্রমশ।

মিটমিটে মোমের আলোর দিকে চেয়ে থেকে বুঝতে পারেন। গরাদে ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করার আদিম প্রস্তুতির কথা ভাবলে এখনও গোরার মুখটা মনে পড়ে, সে বেচারি একটু দূরে তাঁরই মতন একটি বেডে শুয়ে আছে। ঠিক একই ভাবে আরও ন'জন বিভিন্ন বেডে রয়েছে। এরা অনশনে মরে যেতে চেয়েছিল। তৃষ্ণায়, খিদেয় গোরা যখন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল সে যে মৃত্যুকেই মধুর মত, বিষের মত লেহন করছিল। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বিষে এবং মধুতে বুঝি তার চেতনা নেশার মত আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

বালিশের তলে এখনও গোরার অস্ত্রটি রেখে দিয়েছেন সাদা চৌধুরী। ডাক্তার এলে সেটিকে আরও যত্নে লুকিয়ে রাখছেন। এগারো জনের জেল-অ্যাকশন কমিটির এখন তিনি অন্যতম সদস্য।

রাত দশটার দিকে পাশের বেড থেকে একটি হাত প্রসারিত হয়ে আসে তাঁর চোখের সামনে।

—রাখুন !

—কী ?

—দেখুন না আগে। হাতে নিন !

লোকটির উত্থিত হাত শীর্ণ, আঙুলগুলি লম্বা, একটু যেন বেশিই দীর্ঘ—আঁকড়ে ধরা কী একটা। লোকটির থুতনিতে দু'চার নরি দাড়ি, চোয়ালের হাড় ঠেলে বার হওয়া, চোখ দু'টি গর্তে বসা, কিন্তু অগ্নি-বিস্ফারিত। ঝকঝক করছে প্রতিজ্ঞায়।

বস্তুটি হাতে নিয়ে চমকে ওঠেন সাদা চৌধুরী। পিস্তল। পরক্ষণেই বোঝা যায় এটি মাটির তৈরি। মাটির তৈরি বটে, কিন্তু অল্প আলোয় সহসা বোঝার উপায় নেই।

—মনে রাখবেন, আমাদের কমরেডরা বাইরে সত্যি করে আসল অস্ত্র ব্যবহার করেন। কাজে কাজেই মাটির এই জিনিসটাকেও জেলের পেয়াদা আসল ভেবে নিতে বাধ্য হবে। ওদের ধোঁকা দিতে পারব আমরা। আপনি কি নিজেও চমকে ওঠেননি ?

—হ্যাঁ।

—ধরুন তাহলে !

—না বাবা ! নকল কিংবা আসল, আমি অস্ত্র নেব না। যদি বল, আমি আরও অনশন করব ! মরে যাব। আমার মৃত্যু কি তোমাদের কাজে লাগবে ! যদি লাগে, তাহলে আমি তাই করব ! ওটা তোমাদের কাছেই রাখো !

—আপনি তাহলে এসকেপ করবেন না ?

শীর্ণকায় রোগা ধারালো মানুষটি তখন সাদা চৌধুরীকে বোঝাতে থাকে। প্রথমেই সে বলে, বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল চারটি ডিভিসনে এত স্পষ্ট এবং পৃথকভাবে বিভক্ত যে, এখান থেকে এসকেপ করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু সেই কাজটি আমরা করতে চাই।

জেলে বন্দী কমরেডদের উদ্দেশে আমাদের নেতা কমরেড সি. এম এবং সরোজদার বক্তব্য আছে। জেলও আমাদের কর্মশালা। এখান থেকে পালানো একটি তাৎপর্যপূর্ণ

কর্মসূচি। আমরা যদি আপনাকে সঙ্গে করে চলে যেতে পারি, তার চেয়ে উত্তেজক এবং সফল ঘটনা এই মুহূর্তে আর কিছুই হতে পারে না। আমরা বাইরের লড়াকু কমরেডদের অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত করতে পারব। এই জেলে এর আগে এই জাতীয় ঘটনা কখনও ঘটেনি। এর প্রভাব হবে অপরিসীম।

আমরা কীভাবে চলে যেতে পারি? দেওয়াল টপকেই যেতে হবে আমাদের। তার জন্য দরকার মই। সেই মই আমরা কোথায় পাব? আপনি দেখুন এই ২৯ নম্বরে কোনও বাল্ব নেই। এই কাজটি করে গেছে আচায্যি। যে মানুষটি কথা বলতে চেয়ে প্রথম আন্দোলন করেছে এবং মার খেয়েছে।

একটু থেমে ধারালো মানুষটি সামান্য ধরা গলায় বলল—মারই শুধু খায়নি। আজ সকালে ওল্ড হসপিটালে মারা গেছে মাধব। আচায্যি ওর টেকনেম ছিল। আমরা খবর পেয়েছি ও আর নেই। কিন্তু কাজটি সে করে যেতে পেরেছে, পাথর মেরে বাল্বগুলি চূর্ণ করে দিয়ে গেছে। ওর হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। শুধু এই নিপুণ যোগ্যতার জন্যই তাকে প্রথম কথা বলতে চাওয়ার আন্দোলন শুরু করতে হয়। আপনি কথা বলতে চান না? আপনার ইচ্ছে করে না?

—করে। আমার কত কথা বলতে ইচ্ছে করে। কে কেমন আছে, কোথায় তারা? ফুলভানু! হুকুম। মোসলেম। হাওয়া বিবি। আমানি। আমার মণি। নূপুর, আমার ছোট মেয়ে। তাছাড়া বউমা, নতুন বউমা, ওর সঙ্গে একটিও কথা হয়নি বাছা। কদম ছেলেটা যে কী করছে! সবাইকে আমি স্বপ্নে দেখি। ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে, মলন ফেলে এসেছি আমি। রাহুল কোথায়, রাহুল!

বিড়বিড় করে উঠলেন সাদা চৌধুরী। তাঁর কথা স্পষ্টত কিছুই বোঝা গেল না।

—আপনি কিছুই স্পষ্ট করে বলছেন না কেন সাদাবাবু! আপনি একবার মাধবের কথা ভাবুন! ও যে কাজ শুরু করে গেছে, আমরা শেষ করব না?

—মলন ফেলে এসেছি, কাঁদল ফেলে এসেছি, পাঠশালার শিশুদের ফেলে এসেছি! আমার চারাতলার মাচা খালি করে এসেছি। আমের মোল ধরেছে নাকি! ভেবে দ্যাখো, বউমা এল, আর আমি চলে এলাম!

—বাবু!

—আচ্ছা! আমার বউমার না কী বলতে পার?

—আজ্ঞে!

—বউমার নামটা বলে দাও।

—জানি না।

—দ্যাখ, তুমি কিছুই জানো না। ওরা ফের আমাকে ধরে আনবে। নাও, মাটির পিস্তল তুমি রেখে দাও।

ধারালো মানুষটির প্রজ্জ্বলিত চোখ মুহূর্তে নিবে গেল। মাটির পিস্তলটা হাতে নিয়ে বেডের উপর কিছুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। মাথা নীচু করল। তারপর এক সময় প্রবল আবেগে বলে উঠল—তাহলে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন না?

—করব। কেন করব না?

—রাহুল আমাদেরই দলের একজন।

—আমি সাহায্য করব। কিন্তু পালাব না। তোমরা চলে যাও। তৈরি হও তোমরা।

—ঠিক আছে।

—থানা আমাকে সই করিয়ে নিয়েছে, কিসে সই করেছি জানি না, অদ্ভুত আঁধার সব। আশ্চর্য অন্ধকার ! তোমরা মই কোথায় পাবে !

—পাব। ২৯ নম্বর ওয়ারিং হবে। মিস্ত্রি আসবে। মই আসবে। বাইরের দেওয়ালে একটা লাল সাংকেতিক আলো জ্বলবে। সতর্ক-সংকেত। ওয়ারিঙের সময় ওই আলো জ্বেলে দেওয়া হয়। তার মানে এখানে কাজ চলছে। সেই সময় খুব একটা ঢিলেঢালা ভাব থাকে, পাহারা শিথিল হয়। তাছাড়া হাসপাতাল বলে এখানে পাহারার কড়াকড়ি এমনিতেই কম।

—ও !

—আজ্ঞে !

—আমার মেডিসিন বক্স কোথায় বলতে পার ?

—কী মেডিসিন বলুন ! ডাক্তারবাবুকে ব'লে...

—না। তা নয়। বাক্স কোথায় ! বউমা রেখেছে ? আমি রুগিদের ওষুধ দিতাম। গাঁয়ের মানুষ তারা। বুঝলে, মাত্র চার আনা পয়সা ধার্য করেছিলাম। একটা সিকি। কিচ্ছু না। বল, সেটা কি একটা বিজনেস ! আমার লোভ ! আমি এত গ্রিডি ?

—সবই ফিরে পাবেন আপনি।

—ফিরে পাব ? বলছ ? তুমি তবে কিছুই জান না। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন সাদা চৌধুরী।

২৯ নম্বরের বাইরের দেওয়ালে সতর্কীকরণের লাল সাংকেতিক আলো জ্বলে উঠল। ওয়ারিং শুরু হল। ১১ জন কয়েদী তিনটি দলে ভাগ হল। প্রথম দলে চার জন। দ্বিতীয় ভাগে চারজন। এবং তৃতীয় ভাগে তিনজন। এই শেষের ভাগটিতে রইলেন সাদা চৌধুরী, গোরা এবং আর একজন যুবা।

সাদা চৌধুরী বললেন—আমরা পালাতে পারব না কুমুদ ! আমার সামর্থ্য নেই। তোমরা চলে যেও, আমি এই বেডে শুয়ে থাকব।

কুমুদ অর্থাৎ সেই ধারালো মানুষটি বললো—আপনাকেও বাবু উঠে দাঁড়াতে হবে। প্রথম দলটা মই কেড়ে নেবে। দ্বিতীয় দল মিস্ত্রিদের এখানে ঠেকিয়ে রাখবে। মই নিয়ে দেওয়ালের দিকে ছুটে গিয়ে প্রথম দলটি মই খাড়া করে দিলে মাটির পিস্তল হাতে তৃতীয় দলটি মই বেয়ে এসকেপ করবে। প্রথমে যাবে গোরা, তারপর আপনি। বলুন, রাজি আছেন ?

সাদা চৌধুরী কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন—আমি পারব না কুমুদ। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

—গোরা চলে যাক আপনি চান না ? ওর যে মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে, ও যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল !

—পারব না।

—আপনাকে বিনা দোষে আটক করেছে। আপনার ফ্যামিলি বলে আজ আর কিছুই নেই চৌধুরী সাহেব। রাহুল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘর ছাড়া হয়েছে আপনার ছেলে। বউমা কোথায় কী করছে আপনি জানেন না। আপনার সঙ্গে ওদের দেখা করতে দেওয়া হয় না। মণি কোথায় তা-ও আপনি জানেন না। আপনার ছোটমেয়ের কী অবস্থা, সে খবর কে আপনাকে দেবে ? আপনাকে মেরেছে এরা ! আপনি আর কত সহ্য করবেন ! আপনি একদিন মিলিটারিতে চাকরি করতেন, আপনার সাহস নেই ?

গোরার মুখ চেয়ে আপনার কষ্ট হয় না ?

—আমি একটা চা পাখি মেরেছি কুমুদ। ব্যস ! আমি কখনও যুদ্ধ করিনি।

—শুনুন ! আপনাকে আমাদের কথা শুনতে হবে। নিন, ধরুন ! বলে কুমুদ সাদা চৌধুরীর হাতে মাটির পিস্তল গুঁজে দেয়। জোর করে গুঁজে দেয়।

গোরার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে হাতের মুঠোয় পিস্তল ধরে কিছুক্ষণ বোকার মতন বসে রইলেন সাদা চৌধুরী। তাঁর মনে হল কুমুদ বড্ড ছেলেমানুষ। এদের আন্দোলন প্রাণের সচ্ছল উত্তাপে পূর্ণ, কিন্তু এদের কোথাও গভীর বিবেচনা দেখি না। এরা তাঁর কথা শুনতেও চাইবে না। দিনের পর দিন জেলের মধ্যে পচে মরার পক্ষপাতী নয় কুমুদ। প্রাণের এই ব্যর্থতা সে সহ্য করতে পারছে না।

কুমুদ ঘটনা ঘটাতে চায়। প্রাণের এতটুকু মায়া নেই ছেলেটার। জেলকে এরা জেল মনে করে না। সংশোধনাগারকেই যেন এরা সংশোধন করতে চায়। এই জেল তার কাছে কর্মক্ষেত্র। এসকেপ সে করবেই, এখানেই সে স্ফুলিঙ্গ ছড়াবে। অপ্রতিরোধ্য এই যুবক এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

—তুমি এখানে কী করে এসেছ গোরা ?

—পুলিসের চোখে মরিচাগুঁড়া ছুঁড়েছিলাম বাবু !

—কেন ?

—ওরা আমার দাদাকে মেরেছে। জোর করে থানায় ধরে নিয়ে গেল। দাদা কিছুই জানত না।

—দাদা কী করত ?

—টিউশানি। বেকার ছিল তো !

—বেঁচে আছে ?

—লর্ড সিনহা রোডে আটক আছে। কলকাতায়।

—তুমি বাড়ি যাবে ? মা কী করেন ?

—সেলাই স্কুলে কাজ করে। আমাদের বাড়িতে সিঙ্গার মেসিন আছে। আমার দিদি ভাল কাজ জানে। নকশার কাজ। মায়ের সঙ্গে করে।

—তুমি ?

—আমি পড়তাম। কলেজিয়েট স্কুলে। সেভেনে, বি সেকশন। রোল সাঁইত্রিশ। তুমি বাবু পাগলি ঘণ্টি শুনেছ ? বাবু ?

—না, গোরা !

—সাইরেন শোননি ?

—হ্যাঁ গোরা, শুনেছি। মিলিটারিতে ছিলাম কিনা ! ঠিক আছে, আমরা দু'জনে প্রাচীর টপকে চলে যাব। তারপর কোথায় যাব আমরা ?

—বাড়ি ! তোমার নিশ্চয় বাড়ি আছে ! তুমি কী করতে ?

—পড়াতাম। চাষ করতাম। আমার লাঙলবলদ আছে। মরাই আছে। গোলা আছে। আমি চিকিৎসা করতাম। আমার স্টেথো আর মেডিসিন বক্স আছে।

—ও, তুমি ডাক্তার ?

—হ্যাঁ, আমি ডাক্তার-মাস্টার, কালটিভেটর। আমি বাবু। আমি গান গাইতাম। 'উদাসী পথিক শুনেছি তোমার ব্যাকুল বাঁশির কামনা।' আরও গাইতাম, 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা।' আর গাইতাম, 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।'

কুমুদ বলল—গেট রেডি। মই ঢুকছে!

তখন বিকেল। ওরা চারজন মই কেড়ে নিল। মিস্ত্রিরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মই নিয়ে দু'জন যখন প্রাচীরের দিকে ছুটেছে তখনই চিৎকার উঠল।

গোরার হাত ধরে জেল-হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন সাদা চৌধুরী। ওঁর মনে পড়ে গেল তিনি যখন মলন ছেড়ে পুলিসের কালোগাড়িতে উঠে কদমের পাশে বসলেন, গাড়ির শিকের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন, নূপুর অক অক করছে, ওর গলায় ধানপাতা সাঁধ হয়ে গেছে। নূপুর দম পাচ্ছে না। এই দৃশ্য তিনি দেখেছেন।

নূপুরের চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। ও দেখছে, বাবাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। বাবা চলে গেলেন, কথাও বললেন না। নূপুর কথা বলতে চেয়েছিল। ছুটে এসে কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। নূপুরের এই অবস্থা দেখেও সাদা চৌধুরী চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ তখন কালোগাড়ি চলতে শুরু করেছে। তাঁর বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে গিয়েছিল, হৃদযন্ত্র বুঝি বিকল হয়ে থেমে পড়েছিল তখন।

—হায় খোদা! বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে দেখলেন দম বইতে চাইছে না।

একবার শুধু এই জেল-প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে সুবৃহৎ আকাশে চোখ তুলে দেখে, নীল নিঃসীম প্রসন্ন আলোয় দৃষ্টি প্রসারিত করে মহাব্যাপ্ত সপ্ত আকাশ ছিন্নভিন্ন করে যেতে যেতে সাদা চৌধুরীর মনে হল, মোহড়ার চারাগাছে বিকেলের রোদ লেগেছে, জলগেটের কলোচ্ছ্বাসে ডোঙা ভাসছে আর জলের কী অপূর্ব শোভা দিগন্তে বিলীন এবং উদ্ভাসিত, সেখানে কদমতলায় দাঁড়িয়ে নূপুরকে কোলে করে যেন তিনি সমুদ্র দেখাচ্ছেন মেয়েকে।

একবার তাঁর নূপুরকে কোলে করতে ইচ্ছে হয়। প্রবল ইচ্ছে হয়। অবাধ্য ইচ্ছে হয় কেবলই। তিনি আর নিজেকে রোধ করতে পারেন না। মইটা চেপে ধরেন দু'হাতে।

—ওঠো গোরা। আর দেরি ক'রো না। বলে ওঠেন তিনি। গোরা ওঠে মইয়ের উপর। অকস্মাৎ পাগলি ঘন্টি বেজে ওঠে। সাইরেন আর্তনাদ করে যায়। মই ছেড়ে দেন সাদা।

জহ্লাদের মত ঢুকে আসে প্রবল মস্তানদল, সশস্ত্র। উন্মত্ত-উন্মাদ, মদ্যপ, তীব্র সহিংস, অন্ধ যেন, এতই ক্রোধী। সেই প্রহারের দৃশ্য অতি অকথ্য, পাশবিক সেই হিংসায় পশুও ভয় পায়, মুহূর্তে গোরাকে রক্তাক্ত করে দেয় তারা।

—বাবা! আমাকে এরা মেরে ফেলল। বাপু, আমাকে বাঁচাও। সেই ত্রাসিত কাতরতা, সেই আকুল সতৃষ্ণ ডাকটি কী করে ভুলবেন সাদা চৌধুরী! কিন্তু তিনি হঠাৎ মস্তিষ্কে অতর্কিত আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর আর কিছুই মনে পড়ে না।

সাদা যখন চেতনায় ফিরে আসেন তখন তিনি নতুন হাসপাতালের মেঝেয় পড়ে রয়েছেন। ওঁর নাকে নল, শরীরে বিদ্ধ নল। পৃথিবীর বায়ুস্তর থেকে অক্সিজেন টেনে নেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। শত প্রহারে অতি দুর্বল দেহ অর্বুদ প্রহারে যেন নিশ্চল ছিল। হৃদয় ছিল পাখির গুটানো ডানার তলে বধির বা নিস্পন্দ বুঝিবা। পাশে পৃথক দূরত্বে শুয়েছিল তাঁর দোস্তপো, মদনের ছেলে মুমতাজ আলি।

শিবো হে হামি কী দেখিলাম
তুমি কেনে দ্যাখো না চোখ মেলে
শিবো হে....

মেঝেতে বাটি ঘষার শব্দ, চা যাচ্ছে ঘর্ষণের ভিতর, গরাদে ঘর্ষণের শব্দে কনস্ট্যান্ট সেলের নৈঃশব্দ্য উচ্চকিত। পাশে শায়িত মুমতাজ। কথা বলতে ইচ্ছে করে বাবা।

আমি যে পারি না। ঈশ্বর কি আমার মুখের ভাষাও কেড়ে নিয়েছেন!

—হামি কী দেখিলাম শিবো হে। এই নিষ্করুণ নিষ্ঠুর আর্তগান কেন করে মানুষ? লাশে কেন ভর্তি হয়ে যায় হাসপাতাল! নূপুর কেন ওভাবে কোলে চড়তে চাইল, কেন চাইল! আমি কেন গোরাকে মইতে তুলে দিলাম?

তুমি কেনে দ্যাখো না চোখ মেলে......

আমি তো কেবলই দেখি। পাখির মত চোখ মেলে দেখি মাত্র। পাখি যেমন চেয়ে থাকে, তার বেশি এই সকল দৃশ্যে আমার কী সম্পর্ক! মনে মনে এই বিপন্ন বিস্ময় দীর্ণ করে যায় সাদার হৃদয়। ঠোঁট থরথর করে কেঁপে ওঠে অভিমানী শিশুর মত।

চোখের সামনে মুমতাজের নল নিঃশ্বাসশূন্য হয়ে যায়। বোতলে প্রাণ থাকে না। খাবি খেতে খেতে হেঁচকি তোলে তাজ। কেউ দেখল না, হায় রছুল, একে কেউ দেখল না। ডাক্তার এল না। কিন্তু ওরা এল। সেই বিভীষিকা এখানেও ধেয়ে এল। কত কষ্টে এই পৃথিবীতে একটি প্রাণ আসে, এত তার অবহেলা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখতে হয় পরোয়ারদিগার।

ওরা মুমতাজের নল ছিঁড়ে ফেলে দেয়। লাশের মধ্যে তখন প্রাণটি থাকে, তখনও থেকে যায়, তাজ লাশ হয়ে যায়।

—ও এখনও বেঁচে আছে ডাক্তারবাবু! চিৎকার করে ওঠেন সাদা চৌধুরী, কিন্তু, স্বর সামান্য ভেসে ওঠে। সামান্যই কথা বলে উঠতে পারেন তিনি।

সাদা বুঝতে পারেন না, চন্দন যে-কিশোরের মুখে তার আপন শোণিত হাতের আঁজলে জল ভেবে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর আগে, তার নাম গোরা।

অতঃপর গোরা এবং তাজ পুলিসভ্যানের মধ্যে পাশাপাশি শুয়ে রইল।

রাত্রির পথ রক্তিম আলোয় মোহময়। গঙ্গার শ্মশানে এগিয়ে চলল পুলিসের গাড়ি। মণি ছুটে চলেছে।

॥ ৪৪ ॥

তুহিন এবং খোদা বক্সকে কলেজের প্রধান গেটের সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে রাহুল। মনে হয়েছিল তার সঙ্গে ওরা যেন কথা বলতে চাইছে। রাহুল কলেজে অনেকদিন পর এসে ভাবল, আসলে কলেজে আসার কোনও অর্থ হয় না। সে ডিসকলেজিয়েট হয়ে গেছে।

অনার্স নয়, সাধারণ পাস কোর্সের ক্লাসে ঢুকে অজস্র ছাত্রের মধ্যে পিছনের দিকেই বেঞ্চে বসবার চেষ্টা করে এবং নিজেকে তার কেমন বেমানান লাগছিল। কিসের ক্লাস তা-ও সে জানে না। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কী মনে হল, রাহুল ক্লাসরুম ছেড়ে করিডোরে বার হয়ে চলে এল।

করিডোরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল একা। হঠাৎ দেখে দেবপ্রতিম দূর প্রান্তে করিডোর ধরেই প্রফেসরস রুমের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন। অদ্ভুত লাগল বটে। একটু ঘৃণাবোধও হচ্ছিল।

কলেজ ছেড়ে চলে যেতেই ইচ্ছে করল রাহুলের। করিডোর ধরে মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছন থেকে বোলার স্যর ডেকে উঠলেন। রাহুলের স্পষ্ট নাম ধরে

ডাকলেন। রাহুল দাঁড়িয়ে পড়ল এবং পিছন ফিরে চাইল।

বোলার স্যর দ্রুত ধেয়ে এসে বললেন—তুমি চলে যাচ্ছ কেন ? ক্লাস করবে না ?

—না স্যর !

—কেন ?

—কী হবে করে। আমার অ্যাটেনড্যান্স নেই।

—অনার্সের ক্লাসে তোমার অ্যাটেনড্যান্স আছে রাহুল। আমি ব্যবস্থা করেছি। তা ছাড়া অন্য ক্লাসের উপস্থিতির খাতায় তোমার রোল নম্বরের পাশে অবাক হয়ে দেখলাম, কে একজন প্রক্সি দিয়ে গেছে বরাবর। তোমার জন্যে দেবপ্রতিমবাবু প্রিন্সিপালকে বললেন, যাতে তুমি পরীক্ষায় বসতে পার, যাতে কোনও অসুবিধা ফেস করতে না হয়। সবই ঠিক আছে তোমার ! এসো !

—না।

—পাগলামি করো না।

নরম করে রাহুলের একখানি হাত ধরে আকর্ষণ করেন বোলার। রাহুলের চোখেমুখে তীব্র একটা যন্ত্রণা ফুটে ওঠে।

—আমার নামে রোল নম্বর ধরে প্রক্সি দিয়েছে কেউ !

—হ্যাঁ, দিয়েছে। দেবপ্রতিমবাবু নিজেও খুব অবাক হয়েছেন। প্রফেসররাও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। তুমি কাউকে বলে গিয়েছিলে ?

—না, এত ইতর আমি নই স্যর !

—আহা, রাহুল ! তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন ? কেউ যদি দিয়েই থাকে, তার দুটি কারণ হতে পারে। হয় সে জেনে করেছে অথবা সে ভুল করে করেছে। প্রক্সি যে দিচ্ছে, সে হয়তো নিজের রোল নম্বর জানে না। সে মনে করে, অ্যাটেনড্যান্সের জন্য যে রোলে সে ইয়েস করছে, তাই-ই তার রোল নম্বর। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ইওরস নাম্বার।

অদ্ভুত নিরাকার, শূন্য, অবয়বহীন এক সুতীব্র ক্রোধ হচ্ছিল রাহুলের। কার উপর সে রেগে যাচ্ছে, নিজেরই উপর নয় কি ?

—এমন কেন হবে !

—কী হবে ?

—এই যে একজন না জেনে এভাবে প্রক্সি দিয়েছে !

—জেনেও করতে পারে !

—কেন করবে ? আমি চাইনি, আমি তো বলিনি ! আমার হয়ে কেন করবে সে ! তার কিসের স্বার্থ ! কে সে ?

—আমরা কী করে বলব রাহুল ! কলেজে এসেও তুমি ক্লাসে গেলে না। দেখা যাচ্ছে, আজকের বেলা তুমি অনুপস্থিত। তোমাকে সে চেনে। অথবা গত চারদিন তোমার কোনও অ্যাটেনড্যান্স নেই, এটাও লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে মনে হচ্ছে, না জেনেই সে এতদিন তোমার রোল নম্বরে 'ইয়েস' করেছে। খুব সম্প্রতি ছেলেটা জানতে পেরেছে তার রোল নম্বর অন্য। গত চারদিন তার কি অসুখ করেছিল ? সবই বোঝা যাবে যদি তুমি ক্লাস কর !

—না।

—তুমি মেনে নাও !

বোলারের 'মেনে নাও' বলায় রাহুল কেন যেন অসম্ভব অপমানিত বোধ করে।

সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তার হৃদয়। কী বলবে সে, ভেবে পায় না। তার মধ্যে চাঞ্চল্য মাথা কুটতে থাকে।

—উনি কেন আমার জন্য প্রিন্সিপালকে বলবেন !

—কে ? দেবপ্রতিমবাবু ?

—হ্যাঁ, কেন বলবেন ! আমার মঙ্গল অমঙ্গল দেখার তিনি কে ? আমার কেরিয়ারের সঙ্গে ওঁর কী সম্বন্ধ ! ওঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলেননি, আলো নিবিয়ে দিয়েছেন। সেই অন্ধকারে তিনি বসে রইলেন, আমি কল্পনা করতে পারি স্যর ! আমি কি প্রফেসর সবিতার চোখে ঘৃণা দেখিনি !

—রাহুল ! মাই বয়, তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ কেন ? আমরা আজ হাসপাতালে বাপুকে দেখতে যাব ! গতরাত্রে শ্মশানে কত লাশ পুড়েছে, জলে ভেসে গেছে, তাজ নেই রাহুল ; গোরা নেই। তুমি সহ্য কর ! আজ বিকেলে আমরা বাপুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব ! এসো !

আবার একখানি হাত বোলার চেপে ধরেন রাহুলের। দ্বিতীয়বার। সহসা রাহুল হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে ঘাড় নীচু করে করিডোর ধরে দ্রুত হেঁটে যায়। হেঁটে এসে গেটের কাছে তুহিন আর খোদাকে দৃষ্টি দিয়ে খোঁজে হেথা হোথা। গেট পেরিয়ে সড়কে নামে। গঙ্গার ধারে সড়কের পাশে যে চায়ের স্টল আছে সেখানে আসে। কোথাও ওরা নেই। ওরা তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, কী কথা বলতে চেয়েছিল ?

কলেজের সুউচ্চ টাওয়ার-ক্লকের দিকে চাইল রাহুল। ওটা চলছে না। সময় কি তা হলে থেমে পড়েছে ! প্রফেসর দেবপ্রতিম ইজ এ গুড প্রফেসর। আর সে ? হি ইজ এ গুডবয়। হিস্ট্রি অনার্স পড়ে, ভাল ছেলে। তার অ্যাটেনড্যান্সে কোনও কামাই নেই। কে তাকে এভাবে ঠকালো ? কোনও এক অসচেতন বোকা ছেলে তার প্রক্সি। সে কি তারই মত বোকা ? কোথাও কি সে ভুল পথে গিয়েছিল ? কোনও ভুল পথের বাঁকে কি কবির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল ? ইকবাল ভুঁইয়া, রুকসানা, তেরোঘরা, মাহেফরাসের ডোঙা, সবই কি স্বপ্নবৎ মিছে কল্পনা ?

ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে পথের উপর ঝড়ের ঘূর্ণিলাগা ঝাপটায় ছেঁড়া কাগজের টুকরো লাট খেয়ে উড়ে পথেরই পিচে সরসর করে সরে যায়। গঙ্গার জল ছুঁয়ে হু হু হাওয়া বয়ে এসে রাহুলের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মাথর চুল এলোমেলো হয়ে যায়। মোহন সিনেমার চৌমাথায় চায়ের স্টলগুলির কাছে খোদাকে দূর থেকে দেখতে পায় রাহুল। সে গঙ্গার ধারের স্টল ছেড়ে সিনেমা হলের দিকে এগিয়ে এসেছে।

অন্ধকারে চেয়ারে ঘরের মধ্যে বসে রইলেন দেবপ্রতিম, দৃশ্যটা আর একবার কল্পনা করে রাহুল। সবিতা সব আলো নিবিয়ে দিয়েছেন। গৃহ কি তবে এক গুহাকন্দর ? এখানেই কি ফিরে যায় মানুষ ? পথ কি পথেই পড়ে থাকে ! বাবা তবে ফিরতে পারছেন না কেন ? কোন্ বিপুল অন্ধকার বাবুকে ঘিরে রয়েছে ?

দ্রুত হেঁটে খোদাকে ধরবার চেষ্টা করে রাহুল, পারে না। তুহিনকেও দেখতে পেয়েছে। ওরা দুজনই গার্লস কলেজের দিকে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে তাদের আর দেখা যায় না। মেয়েদের কলেজের দিকে ছুটে যায় অতঃপর। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তারা ! রাহুল স্তম্ভিত হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়ে।

গার্লস কলেজের সামনে এসে দাঁড়ায়, এখানে সবিতা কাজ করেন। কখনও এই মহিলার সঙ্গে কথা বলেনি সে। অসম্ভব অভিজাত গম্ভীর চেহারা। স্বাস্থ্য ভাল, চোখে

চশমা, সোনালি ঘড়ি বাঁধা ডান হাতে, কাঁধে ঝোলে চামড়ার বটুয়াসদৃশ কিন্তু বড় ব্যাগ। ফর্সা রঙ, গোল ধাঁচের মুখমণ্ডল, স্বাস্থ্যে ঈষৎ মেদ লেগেছে, চোখ বড় বড়। বড় এবং বুদ্ধিদীপ্ত, চশমার কাঁচ ঠেলে ঠিকরে আসে ঘন বুদ্ধির রশ্মি। গলার ত্বকে দুটি তিনটি ভাঁজ, সেই ভাঁজ পিছনের ঘাড় অবধি প্রায় চলে এসেছে। থুতনিতে একটা তিল আছে, নাসিকা উন্নাসিক দেখায়।

আশ্চর্য চমকে ওঠে রাহুল। কলেজে ক্লাস চলছে বোঝা যায়। হঠাৎ সেই সবিতা একা কলেজ থেকে বার হয়ে আসেন। কলেজ চত্বর ছাড়িয়ে গেট পেরিয়ে এসে তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশায় উঠতে গিয়ে রাহুলকে দেখে থেমে পড়েন।

সবিতা রিকশা ছেড়ে রাহুলের কাছে এগিয়ে আসেন।

—তুমি কিছু বলবে ?

—না।

—দাঁড়িয়ে আছো কেন ? এসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি তোমার চেয়ে বয়েসে বেশ বড়ই হব। তা ছাড়া তুমি দেবপ্রতিমের ছাত্র, আমারও ছাত্র তা হলে !

—না।

—কী, না ?

—আমি কারও ছাত্র নই ম্যাডাম। আপনারা শিক্ষক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে কখনও পড়াশুনা করিনি।

—কথাটা কি আক্ষরিক বলছ, তা হলে ঠিক আছে ! দেবপ্রতিমকে কলেজে দেখলে তুমি ? আমাদের ছাত্র না হতে পার, তবে কলেজে পড় কিনা ! আমি তোমাকে কোনও উপদেশ দেব ভেবো না। শুধু বলব একটি কথা।

—বলুন !

—আমার সঙ্গে একটু আসবে ?

—কোথায় ?

—তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর ? এভাবে রুক্ষস্বরে কথা বলছ কেন ? আমি কোনও অন্যায় করিনি ! স্বামীসন্তান নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের আমার অধিকার আছে। তুমি তা কেড়ে নিতে পার না !

—আমি ! অধিকার কেড়ে নিয়েছি আপনার !

—হ্যাঁ, নিয়েছ বইকি। তোমরাই তো নিয়েছ। তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছ। ওঁর আর কিচ্ছু নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।

—ও !

বিস্ময়বিদ্ধ স্তম্ভিত রাহুল সবিতার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগল। তার মুখ দিয়ে কথা সরতে চাইল না। সেই বিমূঢ় অবস্থায় সবিতা রাহুলের একটি হাত ধরে টেনে তুললেন রিকশায়।

—এসো। তোমাকে আমি ছাড়ব না। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে। শোন, এদিকে পুলিসের জিপটা আসছে, তুমি কিন্তু নিরাপদ নও ! চল মধু, রিকশা চালাও ! বলে উঠলেন অধ্যাপিকা।

সমস্ত পথ অধ্যাপিকা আর কোনও কথা বললেন না। দোতলার বারান্দায় তুলে আনলেন নিজের বাড়িতে। তারপর ঘরের মধ্যে ডাকলেন। পশ্চিমের জানলা সম্পূর্ণ খুলে দিলেন। খোলা জানলা দিয়ে একটি পুকুরের জলসিঁড়ির জলমগ্ন সিঁড়ি পর্যন্ত এই

দুপুরের অতি প্রকাশ্য খর আলোয় চোখে পড়ে গেল—জলসিঁড়ির উপর পা রেখে দুটি পা ডুবিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্ভিন্নযৌবনা এক কিশোরী, পরনে লালরঙের শাড়ি যেন আগুনের মত জ্বলছে। রাহুলের হঠাৎ মোহরকে মনে পড়ে গেল।

মোহরের মুখটা কিছুতেই মনের চোখের উপর থেকে সরতে চাইছে না। অধ্যাপিকা রাহুলের জন্য এক গেলাস শরবত করে আনলেন।

—নিশ্চয় তোমার তেষ্টা পেয়েছে!

—হ্যাঁ।

—খাও তবে। কী ভাবছ? আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব না। এখানে পুলিস আসবে না।

—জানি। এই বাড়িতে ললিত আসে, অধীর আসে। সুতরাং পুলিস আসে না।

—এই বাড়িতে জেলা-শাসক আসেন, পুলিস সুপার আসেন বেড়াতে, সিভিল ড্রেসে। ডি. এম. আমার আত্মীয়। বিয়ের অনেক আগে থেকেই ওঁকে আমরা চিনি, পারিবারিক আত্মীয়তা ছিল, আমার বাবার কাছে যেতেন।

—তবু আপনার স্বামীকে পঙ্গু হতে হল! আমার ধারণা পুলিস-প্রশাসন কখনও কারও আত্মীয় হয় না। ওটা যন্ত্র, ওটা খালি পিষে দিতে থাকে। সেই যন্ত্রই আপনার স্বামীর সব অ্যাবিলিটি নষ্ট করে দিয়েছে, মস্তিষ্ক বাদে।

—একথা আমার সামনে বলছ, অথচ তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না! আজ দেবপ্রতিমকে লাঠি ধরে চলতে হয় না ঠিকই, কিন্তু....

—আমাকে কেন দায়ী করছেন!

—তুমি আমাকে বাঁচাও রাহুল! বলে চরম ক্ষিপ্রতায় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রাহুলের কাছে ছুটে এসে সবিতা দুটি হাত মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন আকস্মিক। রাহুল আশ্চর্য এবং সচকিত হয়ে উঠল। ক্রমশ কেমন বিহ্বল দেখালো তাকে।

—আমি বাঁচাব! অর্ধস্ফুট গলায় স্বগত-বিস্ময়ে বলে ওঠে রাহুল। অধ্যাপিকার এই আচমকা হাত জড়িয়ে ধরে আকুলতা প্রকাশ এবং চোখের সকাতর অনুনয় দেখে সে দুদণ্ড কথাই বলতে পারে না।

অধ্যাপিকা বললেন—তুমিই বাঁচাবে!

—একটু আগে আপনি বলেছেন আমি নিরাপদ নই। তা হলে আমি কী করে আপনার স্বামীকে বাঁচাব! তাছাড়া এই মাত্র বললেন ডি. এম. আপনার আত্মীয়। আপনাকে বাঁচানোর প্রশ্ন উঠছে কেন তা হলে! আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আপনি আপনার স্বামীরই মত রহস্যময়!

—কী বললে! বলে অধ্যাপিকা রাহুলের দু' হাত ছেড়ে দিলেন। জানলার কাছে থেকে সরে গেলেন কাঠের গোল অভিজাত টেবিলের সংলগ্ন চেয়ারে। টেবিলের মধ্যিখানে একটি ইংরেজি ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে। আর রয়েছে ধূপবাতি গোঁজার কাঠি পুড়ে যাওয়া খিল ধরে থাকা ধূপদানি। অধ্যাপিকা চেয়ারে বসে সপ্রশ্ন চাইলেন রাহুলের দিকে।

হঠাৎ তারপর সবিতা বলে উঠলেন—আমি কি কোনও অন্যায় বলেছি তোমাকে! আমি কলেজ-শিক্ষিকা, মফস্বলে এই চাকরির খুব সম্মান আছে, কিন্তু আমি তো খুব সাধারণ মেয়ে রাহুল। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে আমি বলতেও পারব না দেবপ্রতিমের আসল অক্ষমতা কোথায়! ও এসেছে, না এলেও পারত! সত্যি বলতে কি ওর একটা

ছায়া ফিরে এসেছে, রক্তমাংসের সম্পূর্ণ মানুষটা তো ফেরেনি। তোমাকে বলতে পারছি না....

—আমি জানি।

—তুমি জানো ? কী জানো তুমি ?

—ছেলেমানুষ বলে আপনি যা আমাকে বলতে পারছেন না, সে কথাও জানি। তবু ছায়ার ওপর আপনার এত মায়া কেন ?

—ছায়া তো রহস্যময়ই হয় রাহুল ! তুমি খাবে না ? তেষ্টা পেয়েছে তোমার !

—না।

—ছায়া বুকে করে বাঁচতে হবে আমাকে। আমার সন্তান আছে, তার পক্ষে ওই ছায়াই যে আশ্রয় ! এই ছায়াটুকু কেড়ে নিও না আর। শোন, তুমি আর এখানে এসো না। তুমি না এলে আমরা বাঁচব। আমার এই উপকার তোমাকে করতে হবে।

সবিতার কথায় এবার প্রায় মূক হয়ে যায় রাহুল। টেবিলে রাখা শীতল পানীয়ের দিকে চোখ যায় তার। তৃষ্ণা-তাপিত গলায় অসহায়ভাবে ঢোঁক গেলে একবার।

—খাবে না ?

—না, ম্যাডাম। ছাতি শুকিয়ে গেছে, তবু আপনার দেওয়া ওই মিষ্টজল আমি খাব না। চলি।

—তুমি রাগ করলে ! আমার জীবনটা একবার ভাব ! অধীর আর চিতে গুণ্ডার হাতে আজ তোমার রাজনীতি চলে গেছে। দেবপ্রতিম বাধ্য, হি মাস্ট হ্যাভ টু কম্প্রোমাইজ। কোথায় যাবে সে, কোথাও যেতে পারবে না। ও মনেপ্রাণে পঙ্গু হয়ে গেছে রাহুল ! আমাদের তুমি ক্ষমা করে দাও ! ছায়া, তবু তো মানুষ ! আমার স্বামী ! তুমি যদি কখনও কাউকে ভালবাস, তা হলে বুঝবে, শরীর ছাড়াও মানুষ একজনকে চাইতে পারে !

—আমি ছেলেমানুষ। আমি ওসব বুঝি না। বুঝি না বউদির জীবন। ওই চিঠিটাও বুঝি না। আমার বাবার জীবনের কথাও তো কেউ ভাবে না দেখছি। তা হলে, আমি কী করব !

—তুমি সাবধানে যেও !

—ও !

—তুমি ফিরে এসো !

—কোথায় ?

—আমি জানি না ! বলেই সবিতা প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ডুকরে কেঁদে ফেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অসোয়াস্তিকর কান্নার গুমরানি শোনে রাহুল। রহস্য ঘনায় ছায়াশীতল গৃহে। পুকুরের ঘাটে তখনও কিশোরীটি দাঁড়িয়ে থাকে। একটু দূরে পুরনো টঙে সাদা রোদে ইস্পাত ঝলকানো পায়রা পটপট করে বাজি খেয়ে এসে বসছে আকাশ থেকে। সেদিকে একবার চেয়ে দেখে রাহুল। তারপর দু' ধাপ এগিয়ে যায় দোরের দিকে। ঘুরে দাঁড়ায়। ওর দিকে চেয়ে দেখে কান্না থামাতে চেষ্টা করেন সবিতা। হাতের আঙুলে জড়ানো কাপড়ের প্রান্ত মুখের কাছে হাতসুদ্ধো তুলে চেপে ধরেন নিজেরই ঠোঁট দুটি। তবু কান্না চলকে পড়ে একটা চাপা গমকে।

রাহুল ঘুরে দাঁড়ায় এবং সবিতার কাছে আবার দু' ধাপ ফিরে আসে। তারপর ঝুঁকে নামে একটুখানি। অশ্রুময় চোখে দৃষ্টি ফেলে কিয়ৎক্ষণ চেয়ে থাকে। তার মনে হয় জীবনের এই তীব্র আসক্তি সে যেন অবহেলাও করতে পারছে না, ফের এই কান্না দেখে

প্রগাঢ় কোনও অসহিষ্ণুতা রক্তে জেগে উঠতে চাইছে। হঠাৎ-ই সে বলে ওঠে— **আমি** কিন্তু ছায়া নই ম্যাডাম! আস্ত মানুষ। দেখুন, এখনও ছায়া হয়ে যাইনি।

সবিতা যেন একটু শিহরিত হয়ে ওঠে। এবং বলে—আমাকে ক্ষমা করে দাও।

—না ম্যাডাম। আমার দেহটা কিন্তু রক্তমাংসের। আমি মনে করি, কবিও তাই-ই ছিল। শুধু আপনার স্বামীর পলিটিকাল ইগো তাকে কিল করেছে। মনে করি, হরবোলা খতিব কবিকে মৃত্যুর জন্য প্রলুব্ধ করেছিল। আজ আপনি আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন এই বলে যে, আমি যেন ফিরে আসি। কিন্তু ডি. এম. তো আমার আত্মীয় নয়। কে আমাকে ফিরিয়ে দেবে, কোথায় ফিরিয়ে দেবে! আমার ঘর কোথায়! বাপু নেই সংসারে, কে আমার পড়াশোনার খরচ জোগাবে! আমার বড়দা বেকার। মাঠে আমাদের ফসল শুকিয়ে গেছে দিদি! শুনুন, জলগেটের চাবিটা কিন্তু আমার কাছে আছে, একথা বলবেন আপনার স্বামীকে!

—চাবি?

—সেই ছায়াটা, তিনিই সেকথা বুঝবেন!

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে পথের উপর বুলেট-বাইক গর্জে ওঠে। দূর থেকে ছুটে আসে বাড়ির তলায়।

—তাজ কিভাবে মরল, কেউ আমাকে বলবে না? খবর পেয়েছি, তাজ হাসপাতালে নেই। গত রাতে মৃত্যুর মিছিল দেখেছি আমি। এমন গণহত্যার দৃশ্য দেখেছেন কখনও! রাত্রির অন্ধকারে এই সবই কি ছায়া? সবই শুধু রহস্য, আর কিছু নয়?

—ক্ষমা কর। দেবপ্রতিমকে ক্ষমা করে দাও! আমি তোমাকে দেখব! সকাতরে তীব্র অনুনয়ে বলে ওঠেন সবিতা।

রাহুলের তামাম দেহ উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছিল। সহসা স্বর শান্ত করে বলল—ওই বুলেটের শব্দ আমার চেনা। ওই শব্দে গ্রাম সন্ত্রস্ত। ললিত কেন এখানে আসে? কেন আসে?

সবিতা আর কোনও কথা না বলে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। ললিতের ব্যাকে অধীরও এসেছে।

—আমি কী করব এখন? পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে রাহুল।

—তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

—ললিতের সঙ্গে ওটা কে?

—অধীর বাগ।

—আমি ওদের সমুখ দিয়েই পথে নেমে যেতে চাই।

—সর্বনাশ হবে রাহুল!

—ওরা দেখুক যে, আমি এখানে আসি।

—না, হতে পারে না। তুমি এখানে আত্মপ্রকাশ করো না ভাই। একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ এসেছি, সব ভেস্তে যাবে।

—অধীর আমার কমরেড, তাই না? তা হলে ওর সামনে আত্মপ্রকাশে বাধা কোথায়?

—তবু বলছি, সেটা ঠিক হবে না বোধ হয়। আমি তোমাকে ডেকে এনেই ভুল করেছি।

—ও! এই তব পরিচয়! বেশ।

—তোমাকে ভয় করছে আমার! প্লিজ তুমি একটু লুকিয়ে থাক। বলে সবিতা

রাহুলকে ঘরের মধ্যে টেনে আনেন। অন্য একটি ঘরের মধ্যে ঠেলে দেন। তারপর নীচে নেমে যান দ্রুত।

রাহুল ঘরের দরজা জানলা দ্রুততর হাতে বন্ধ করে দিয়ে পাগলের মত হো হো করে হেসে ওঠে। হো হো হাসতে হাসতে সে হা হা করে হাসে।

—কে হাসছে দিদি ! শুধায় অধীর বাগ।

—ওটা আমার এক পাগল ভাই। অসুস্থ। টিটাগড়ের ছেলে, আমার বনি মাসির ছোটছেলে।

কিছু মুহূর্ত বাদে বুলেট গর্জে উঠল আবার। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল রাহুল।

সবিতা বললেন—অবস্থা খুবই খারাপ রাহুল ! চেয়ারম্যানের নামে শপথ করে অধীর বলে গেল সে ছাড়বে না। চিতের দল খোলা সোর্ড হাতে করে গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড হেঁসো, নাঙা ছোরা, পিস্তল। গুঞ্জ নাকি অধীরকে বিট্রে করেছে। অধীর ডাউট করছে, গুঞ্জর লোকই নাকি....

—বলুন, থামলেন কেন ? বনি মাসির ছেলে আমি, পাগল। অসুস্থ। আমাকে বলা না বলা সমান কথা দিদি ! আমি কেঁদে ফেলতে পারি না বলেই তো হাসি।

—তুমি অমন করে বলো না। তুমি তো ভাইয়েরই মত।

—তাই বুঝি আমাকে অমন করে লুকিয়ে রাখলেন ! গুঞ্জ যদি আজ আমাকে মারে, জানবেন আমি সেই তৃতীয় ব্যক্তি যে কিনা তাজ এবং তিমিরের পর স্ট্যাবড হয়েছে। তিন চারদিন আগে পথের উপর গুঞ্জ আমাকে টার্গেট করে, বোলার স্যর সঙ্গে ছিলেন, তখনই বুঝতে পারি আমি নিরাপদ নই। জীবনই যেখানে এত অনিশ্চিত, সেখানে কে আমার রোল নম্বর ধরে প্রক্সি দিল, তাতে কী এসে যায় আমার !

—তোমার হয়ে প্রক্সি ?

—হ্যাঁ দিদি। আপনার স্বামী বলেছিলেন আই হেট দি বুর্জোয়া-এডুকেশন সিস্টেম। আমি বলি, আই হেট দি সিস্টেম, মরে যাব তবু এই দেশটাকে আমি বিশ্বাস করব না। এই দেশ, এই ব্যবস্থা, গণতন্ত্র আমার নয় দিদি ! আমি কারও প্রক্সির অনুগ্রহ চাই না। আমি নিজেও কারও প্রক্সি নই। আর যদি তাই হই, যেন কবির মত মরতে পারি। আত্মহত্যা অসুন্দর নয় দিদি ! প্রবল এক ঘৃণা বুকে করে মরে যেতে চাই।

—রাহুল !

—তার আগে আমি আমার বিচারমতো টার্গেট করব। আই মাস্ট হ্যাভ টু ডু। চলি ! আমি কখনও টিটাগড় যাইনি !

—কাকে তুমি মারবে রাহুল ! কাকে ? আর্তনাদ করেন সবিতা। তাঁর মনে হল দেবপ্রতিম সেই টার্গেট নয় তো ! পাগলের মত পিছু পিছু ছুটে আসেন সবিতা। নীচে নেমে চলে এসেছে রাহুল। পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে রাহুলের একখানা হাত চেপে ধরলেন অধ্যাপিকা। সকাতর যন্ত্রণায় বলে উঠলেন—আমি তোমাকে ঘৃণা করি রাহুল। আই হেট ইউ।

চমকে উঠে থেমে পড়ল রাহুল এবং ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে সবিতার মুখের দিকে চাইল। তারপর নিঃশব্দে হেসে ফেলল। সন্ত্রস্ত জীবন, বড়ই অনিশ্চিত সে ; নিতান্তই এক বিম্ব, তবু স্নেহময় হাসি হেসে ওঠে। সবিতা কেমন হয়ে যান।

রাহুল স্মিতস্বরে বলল— ভয় নেই। আমি কিন্তু তোমাকে মোটেও ঘৃণা করি না দিদি ! আমি আর কখনও এখানে আসব না। ছেড়ে দাও, চলি এবার !

মুহূর্তে সবিতার চোখ জলে ভরে গেল। তিনি রাহুলকে বুঝতে পারেননি, একটুও বুঝতে পারেননি। রাহুল সশব্দ পাগলের মত হেসেছিল, রাহুল নিঃশব্দে স্মিত হেসে উঠল। একই মানুষ দুটি ভাগ হয়ে গেল তাঁরই চোখের সামনে। সহিংস কাতরতায়, অপমানে শব্দময় হাসি ; অহিংস স্নেহে জীবন-প্লাবিত মধুময় হাসি, বেদনায় ম্লান নিঃশব্দ হাসি— ঘৃণা, হিংসা, ভালবাসার এমন ব্যবহার কী ক'রে করে একজন সামান্য ছেলে— এত অপূর্ব জীবন কোথা থেকে পায় এরা ? তাঁর স্বামী তো এই জীবনেরই অন্তর্গত ছিলেন। কেন তবে ফিরে এসেছেন !

না, তবু আমি পারব না। নিজেকেই নিজে বলে ওঠেন সবিতা। দেবপ্রতিমকে বলতে পারব না, তুমি চলে যাও। বড়ই অন্ধকার বাইরে, কালো সূর্যে আকাশ স্তিমিত, বিকেলের আলোয় ঘন শোণিত বহমান, পাখির উড়ন্ত ডানায় অন্ধ সূর্যালোক কালো হয়ে আসে, এক বিমর্ষ অপরাহ্ন সবিতাকে গিলে ফেলে। অন্তহারা নিরন্তর কান্না তাকে জড়ায়। রাহুল চলে যায়, যেন তাঁর সত্যি এক ভাই নেমে চলে পথে। পথ হারিয়ে পাখি যেমন পথেই থাকে, তাঁর মনে হয়, রাহুল তেমনই এক মানুষ। আর আশ্চর্য, রাহুল মনে করে না সে পথহারা। মনে কি করে না রাহুল ! ভাবতে ভাবতে অদম্য কান্না সবিতাকে ব্যথিয়ে তোলে, তাঁর মনে হয়, গুঞ্জ রাহুলকে শেষ করে দেবে।

রাহুল দেবপ্রতিমের বাড়ি ছেড়ে পথে নেমে ঘাড় তুলে বাড়িটাকে দেখে। ওখানে আলো নিবে গিয়েছিল। ওখানে আর কখনও আলো জ্বলে উঠবে না। অবশ্য দেবপ্রতিম ওই অন্ধকারে বসে পথের দিকে অপলক চেয়ে থাকবেন। তাঁর হয়তো রুকসানার কথা মনে পড়ে যাবে। তাঁর কাছে রয়ে গিয়েছে একটি অব্যর্থ রিভলবার। সেটি হবে তাঁর দর্শনীয় কাহিনীর সংগ্রামী প্রতীক, সেটি তিনি মানুষকে দেখিয়ে বলবেন, এই-ই ছিল তাঁর ইতিহাস। মানুষ শুনবে তাঁর কাছে ইতিহাসের গল্প। তারপর ?

দেহ ছাড়াও এক নারী একজন পুরুষকে চাইতে পারে, কথাটি ভাবময়, কিন্তু সেটি এক জ্যান্ত কাহিনী। এর মধ্যে প্লেটোনিক ভালবাসা নেই, আছে এক ব্যর্থ রক্তাক্ত দেহ। ছায়াদেহ এত শরীরময় ভাবতে পারে না রাহুল। একজন মানুষ যখন ছায়া হয়ে যায়, তখনও সেই ছায়াটি জীবনের কাজে লাগে—একথা ভেবে ক্রমান্বয় এক সুউচ্চ বিস্ময় জাগে অনন্ত আকাশের দিকে। দিদি ! তুমি বুঝবে না কত বড় বিস্ময় তোমাতে রয়েছে, তোমাকে কি আমি ঘৃণা করতে পারি !

রাহুলের চোখ দুটি অদৃশ্য অশ্রুতে ভার হয়ে আসে। মোহরের কাছে পৌঁছতে তার প্রাণ চায়। হাঁটতে হাঁটতে দেওয়ালে চোখ পড়ে। একটি পোস্টার দেখে সে। শরৎ জন্মশতবর্ষের জয়ন্তী-সমাবেশের পোস্টার। বহরমপুর কমিটি এই সমাবেশের আহ্বায়ক। আজ এই বিকেল পাঁচটায় সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে গ্র্যান্ড হলের মাঠে। প্রকাশ্য সমাবেশ। নিশ্চয়ই ওই মিটিঙে মোহর রয়েছে।

দ্রুত হেঁটে চলে রাহুল। মনে মনে বলতে থাকে, আমি তোমাকে অপমান করেছি মোহর ! ক্ষমা করে দাও ! ছায়া নই আমি, আমাকে তুমি গ্রহণ কর !

মিটিঙের অন্যতম বক্তা আদিত্য সিংহ। কলকাতার রাজ্যস্তরের বক্তাও রয়েছেন। রাহুলের মনে ভাবাবেগ আলোড়িত হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র মানে তো প্রেম। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী। পথে পথে ঘুরে বেড়ানো এক মানুষ শ্রীকান্ত। তারও কোথাও আশ্রয় ছিল।

বুলবন আর চন্দ্রিমাও কি ওই সমাবেশে রয়েছে ! কিভাবে রয়েছে ওরা ? ধরা যাক,

শরৎচন্দ্র তাদের এই মিটিঙে ডেকেছেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের ব্যাখ্যাটা কি আদিত্যদা ?
'পথের দাবি'-তে কী ঘটনা ছিল ? আমাদের এই জীবনটা কি সেখানে ছিল কোথাও ?
কিরণময়ীর জন্যে অসম্ভব কষ্ট হয় বুকে, অত বুদ্ধি, অত সৌন্দর্য, তবু বেচারি শেষে পাগল হয়ে গেল !

আর অচলা ?

আর মোহর ?

এবং বউদি ?

বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে রাহুলের।

শরৎচন্দ্র কবির মৃত্যুর কী ব্যাখ্যা দিতেন ? তাজের মৃত্যুর কী ব্যবহার হত তাঁর হাতে ? মেহেদি পাতায় নিশ্চয়ই তিনি লুব্ধ হতেন, কেননা তিনি বৈঁচির মালা ব্যবহার করেছিলেন। দুলিয়ার হাতের গন্ধ নাকে লাগে রাহুলের। বুকের ভেতরটা কেমন সিরসির করতে থাকে। মোহরের কোমল শরীরটা একদিন তার খুব বুকের কাছে এসেছিল, সেই মিষ্টি মেয়েটা একদিন পুকুরে রাজহংসীর মত গ্রীবা তুলে পাখা ঝাপটে প্রত্যুষের স্বর্ণালোকে সাদা জলকণিকা ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই উচ্চকিত জলোৎসার তার গায়ে এসে লেগেছিল। রাহুল চমকে উঠল।

এক বিপুল জন-সমাবেশের মধ্যে ঢুকে পড়ল রাহুল। এত লোক এই দলটির পিছনে সমবেত হয়েছে এই ঘোর দুঃসময়ে ! ঘুরতে ঘুরতে মোহরের চোখে চোখ পড়ে। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই মোহর চোখ নামিয়ে নেয়। মোহরের বুকে বেঁধা শরৎ-প্রতিকৃতির মেটাল-ব্যাজ সন্ধ্যার আলোয় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মোহর সরে গেল। মোহর এগিয়ে এল না। রাহুল মোহরের দিকে এগিয়ে যায়। মোহর ভিড়ের আড়ালে চলে যেতে থাকে। কথাও কি বলতে চায় না তা হলে ?

আবার খুঁজতে থাকে রাহুল। ফের দেখতে পায়, আবার আড়ালে সরে যায় মোহর। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠেছে, সবিতার জল সে খায়নি। মোহর তাকে এক গেলাস জল খাওয়াতে পারে না ? তার কথা একটুও শুনবে না ? তীব্র আসক্ত দুটি চোখ ব্যাকুল হয়ে মোহরকে কাছে পেতে চায়। আজ একবার স্পর্শ করতে সাধ জাগে। দ্রুত ছুটে ধরতে যায় রাহুল। হঠাৎ বাধা পায় এবার। ওর চোখ ছুটে চলেছে মোহরের মুখমণ্ডলে, এদিকে খোদা তার হাত চেপে ধরেছে—শোন, কথা আছে !.... এদিকে এসো ! জলদি !

॥ ৪৫ ॥

মোহর ছুটে এসেছিল ভিড় ঠেলে, যখন খোদা বক্স রাহুলের হাত চেপে ধরে সমাবেশের বাইরে গেটের দিকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল। খোদা হাত চেপে ধরেছিল শক্ত ক'রে। ছাড়ছিল না। মোহর ছুটে এসেছিল, কথা বলতেও চেয়েছিল, দু'টি চোখে তারও ছিল অগাধ তৃষ্ণা, চাপা অভিমান ছিল। কিন্তু খোদা তাকে অবকাশ দিল না।

গেট অবধি ছুটে এসে মোহর থেমে পড়ে। রাস্তার জনস্রোতে মিশে যায় রাহুল। কালো, সুদীর্ঘ জোয়ান, তাগড়া ছেলেটাকেও আর দেখা যায় না।

গঙ্গার ধারের একটি গলি ধরে এগিয়ে আসে ওরা দু'জন। গঙ্গার জল শীর্ণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে দেখা যায়। গঙ্গার ধারের প্রান্তিক একটি চায়ের দোকানে বাঁশখুঁটির উপর কাঠের

পাটা ফেলা বেঞ্চে বসে যায় খোদা এবং রাহুলকে বসতে বলে। একটু বাদে তুহিন সেখানে আসে। ওর সঙ্গে আরও দু'জন নতুন ছেলে। রাহুল এই দু'জনকে আগে কখনও দেখেনি।

তুহিনের চোখমুখ শুকনো এবং সকাতর। খোদাও চুপ করে রয়েছে।

—কেন টেনে আনলে এখানে? তুহিন আর খোদার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে নিতে অবাক ভঙ্গিতে বলে উঠল রাহুল।

তুহিন প্রথম মুখ খুলল—এইভাবেই কি ঘুরে বেড়াব আমরা? পাপ করেছি, পাপের প্রয়োশ্চিত্ত করব না?

—পাপ কিসের? ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলে উঠল রাহুল।

—পাপ নয়! কবিকে আমরা মেরে ফেলিনি? আমার দোষে কবি মরেছে! আমি আর বাঁচতে চাই না। তাজকে গুঞ্জর লোক খতম করে দিল চোখের সামনে। এদিকে অধীর আর চিতে তড়পাচ্ছে। তিমিরের পার্টি ভাবছে, অধীর অ্যাকসন করেছে। এই খুনোখুনি থামাতে হলে অম্বরকে টার্গেট করতে হবে। সাদা চৌধুরীকে কে তুলে এনেছিল মলন থেকে? স্যার অধীরকে বোঝাতে পারছে না, খুন গুঞ্জই করেছে। গুঞ্জর লোক করেছে।

—স্যার! স্যার কে? রাহুল তুহিনের কথায় পাল্টা জিজ্ঞাসা করল।

—স্যার কে জানো না! দেবপ্রতিম। বলল খোদা বক্স।

রাহুল বলল—অধীর সব জানে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, গুঞ্জকে খেলিয়ে দিয়েছে অধীর নিজে। অধীর, ললিত এবং দেবপ্রতিম—এরা তিনজনই অম্বরের সঙ্গে যুক্ত। ডি এম জানে, খুনের শেষ হবে খুনোখুনিতে। তোমরা এখনও দেবপ্রতিমকে নেতা মনে কর, তাই না? ওঁর এখন এক রহস্যজনক ভূমিকা, ওঁকে আমি বিশ্বাস করি না। ভাল করে খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, বিহারের সত্যনারায়ণকে সাপোর্ট করেন তোমাদের মহামতী স্যার দেবপ্রতিম। সংসদীয় পথে বিপ্লবের চিন্তাও হয়তো করেন উনি। লিন পিয়াও সম্পর্কে আশাভঙ্গ হয়েছে বলে স্যার এখন ললিতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাইছেন। ওঁর মত নেতা আরও পাপে ডোবাবেন।

তুহিন বলল—তাহলে উনি কেন অম্বরকে টার্গেট করতে বলেন!

—বলেন নাকি! আমি বিশ্বাস করি না।

—খোদা জানে উনি কী বলেছেন!

—কবে!

এবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে তুহিন। তারপর ধীরে ধীরে আবার মুখ খোলে—হরবোলা বলেছে অম্বর কোনও কোনও সন্ধ্যায় ইন্দ্রপ্রস্থের ওদিকে একটা বাড়িতে ব্যাডমিন্টন খেলতে যান। বাড়ির গা-লাগা ছোট মাঠ আছে। গাছপালা আছে। ওটা ওর এক দূর সম্পর্কের বিধবা দিদির বাড়ি।

—তো?

—ওখানে ঠিক সুরকি মোরামের পথের পাশে বাড়িটা। ভাঙা বেড়া ঘেরা বাগান। বাগান মানে নানা রকম গাছপালা আর জিয়ালা, গাবগাছ।

—বেশ।

—আমি আর খোদা দেখে এসেছি।

—ব্যাডমিন্টন খেলছেন অম্বর?

—হ্যাঁ। ইনফরমেশন ইজ কারেক্ট। তাহলে কেন হরবোলাকে বিশ্বাস করব না!

এখন দেখতে হবে, কবে, কখন অম্বরীশ দিদির ওখানে যাচ্ছেন।

মাথা নীচু করে রাহুল দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে দেখল চা তৈরি হয়েছে, এই দোকানটা বোধ হয় খোদা বা তুহিনের গোপন জায়গা। চা-অলা একমনে কাজ করছিল, যেন সে তাদের আলোচনা শুনতেই পাচ্ছিল না, এমনই আনমনা।

রাহুলের মনে হ'ল, গুঞ্জ অধীরকে বিট্রে করেছে, একথা সত্য না হতেও পারে। এমনও হতে পারে, যে অধীর চেয়ারম্যানের নামে স্লোগান দিতে দিতেই তাজের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। তারই লোক তিমিরকে স্ট্যাব করেছে। একই লোক সব করে চলেছে। কখনও বোঝা যাবে না, ঠিক কিভাবে মস্তানবাহিনীকে ডি এম এবং অম্বর ব্যবহার করে চলেছেন।

অধীর এবং চিতেকে লেলিয়ে দিয়ে সন্ত্রাস তোয়ের করা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল। অধীরের সঙ্গে ললিতের যোগাযোগ কখনও শুভ হতে পারে না।

খোদা বলল—তুমি কী মনে কর রাহুল ? যদি বল, দেবপ্রতিমের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারি ! কিন্তু অম্বর সম্বন্ধে খবর যা, সবই ঠিক। মনে হচ্ছে, হরবোলা বাইরে আপোস করেছে, ও এখনও....আর তাছাড়া অধীরকে বিশ্বাস করা যায় না, আলবৎ যায় না। কিন্তু কী করবে তাহলে ? ডাক্তারদাকে বউদি ছেড়ে চলে গেছে। ডাক্তারদাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে গেলাম ! কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

তুহিন কঁকিয়ে উঠে বলল—আমি মরে যেতে চাই। বাঁচতে চাই না রাহুল ! বড় পাপ করেছি। বলেই ডুকরে ওঠে তুহিন। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে।

—এত লজ্জা আমাকে দিও না ! এত দোষ আমাকে দিও না ! আমি পারি না। আর আমি পারি না ! বলতে বলতে স্বর বিকৃত করে কেঁদে ফেলে তুহিন। লম্বা গলাটা এমনভাবে নুয়ে যায় তার, যেন মনে হয় গলায় কে কোপ মেরেছে। মুখ থেকে হাত সরায়, থতুনি বুকে ঠেকে থাকে, হঠাৎ থেমে যাওয়া বিকৃত স্বর এবং সেই স্বর থেকেই যেন জল গড়িয়ে নামে চোখ বেয়ে। অবিরল কেঁদে যায় তুহিন।

—আমাকে ঘেন্না কর ! নিশ্চয় ঘেন্না কর ! ভাঙা বিকৃত স্বরে একথা বলে তুহিন রাহুলের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করে।

রাহুল এঁটো কাপ রেখে দেয় বেঞ্চের প্রান্তে তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে তুহিনের পিঠে হাত রেখে বলল—চলি !

অবাক হল ওরা সবাই। খোদা বলে উঠল—আমরা তাহলে কী করব বললে না তো !

রাহুল বলল—আমি জায়গাটা দেখতে চাই। একটা কথা বল খোদা, তোমরা কি তিমিরকে স্ট্যাবড হতে দেখেছিলে ? তোমরা কি তিমিরকে ফলো করেছিলে কখনও ?

খোদা বলল—হ্যাঁ। আমরা করি। তাজ স্ট্যাবড হয়ে গেলে হাসপাতাল থেকে তিমির পালাতে শুরু করে। আম্মাদের ডাউট হয়। তাজের বুকে চাকু মারা হল, দেখি তিমির ভিড়ের মধ্যে রয়েছে। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে একা ছুটছে গেটের দিকে।

—তোমরা কতদূর ফলো করেছিলে ?

—খাগড়ার ওদিকটায় চলে যাই। গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে তিমির। ও বুঝতে পেরেছিল আমরা ওর পিছুপিছু যাচ্ছি। অন্য একটা গলি থেকে ছুটে এল ওরা। তিন চারজন। একজনের গায়ে বোরখা চাপানো। একজনের হাতে ছাতা ছিল। বোরখা ঢাকা লোকটা মেয়ে নয় বুঝতে পারি, বোরখার ভিতর থেকে ছোরা বেরিয়ে আসে, হাতে

অসম্ভব কালো শক্ত লোম, জানোয়ারের মত।

—তারপর ?

—ছোরা বার হওয়ার ঠিক আগে তিমিরকে দু'জন, পিছন থেকে হঠাৎ চেপে ধরল, বেঁটে বোরখার ভিতর থেকে ছোরা ঝলসে উঠতেই ভয় পেয়ে গেল তিমির, বোবার মত করল। আঁ আঁ করল। ব্যস! ছাতা ফুটিয়ে ওকে আড়াল করল, গোঙানি শুনলাম। মণি আমাদের সঙ্গে ছিল। গোঙানি শুনেই ফের হাসপাতালে ছুটে চলে যায় বেচারি।

—ঠিক আছে। এটা তাহলে খুব প্ল্যান মাফিক হয়েছে। কিন্তু তিমির তোমাদেরকেই আততায়ী মনে করে।

—আমরা কী করব ?

—আমি ইন্দ্রপ্রস্থের ওই দিদির বাড়িটা দেখতে চাই। এখন আমাদের পক্ষে জেলই বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছে। অম্বরীশকে খতম করে গ্রামের দিকে চলে যেতে হবে। দু'একটা পেয়াদা-কনস্টেবল মেরে কিছু হবে না। লিন পিয়াও ভ্রান্ত কিন্তু এ মুহূর্তে বন্দুকের ব্যবহার ছাড়া আমরা বাঁচব না।

রাহুলের কথা শুনে খোদা হঠাৎ বলল—আমরা সারেন্ডার করতে পারি।

—কী ? কী বললে !

—সারেন্ডার !

—কার কাছে ! কে নেবে তোমাকে ! জেল নিরাপদ বলেছি, কিন্তু জেলও নিরাপদ নয়। ওরা মারবেই। বাবাকে মেরেছে। অসংখ্য কিল করেছে। গঙ্গার ঘাটে লাশ ভেসে গেছে। সারা রাত লাশ পোড়ানোর গন্ধ বহরমপুরের বাতাসে ভেসেছে, আগে পুড়িয়ে বিকৃত করে তারপর জলে ফেলে দিয়েছে। যাতে ভেসে যাওয়া লাশ দেখে আমরা চিনতে না পারি।

—আমরা কী করব বলে দাও !

—আমার কাছে জলগেটের চাবিটা রয়েছে। মাহেফরাসদের চাবি। এটা রক্ষা করা এই মুহূর্তের প্রধান কর্তব্য মনে করি। এর দায় বর্তায় আমাদের উপর।

—কিভাবে রক্ষা করবে ?

—জল কি নেমে গেছে ! জল কি আছে আর ! পাগলের মত করে উঠল রাহুল। ওর চোখের সামনে কোদালকাটির জলোচ্ছ্বাস জেগে ওঠে। ঘূর্ণি বয়ে যায়। ডোঙা ভাসে। খোঁড়া ইকবালকে দেখতে পায় সে। রুকসানার মুখটা চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে মিলিয়ে যায়।

রাহুল সহসা পা বাড়ায়। চার ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসে আবার।

—কাল পাঁচটায় এখানে আসব। লিন পিয়াও ভুল। কিন্তু তারই নিশানা ধরে অনেকটা পথ মাড়িয়ে এসেছি, নেতৃত্ব আরও কত ভুল করেছে জানি না ! আমি কবির ডাকে এ পথে আসি। বাবাকে পুলিস অ্যারেস্ট করল, যদি না করত, হয়তো এ পথ আমার হত না। সোভান আলি যদি মারা না যেত, এ পথ আমার হত না। শশাঙ্ক যদি ন্যালাকে মেরে না ফেলত, এ পথ কিছুতেই আমার হত না। চাবিটা যদি এভাবে আমার কাছে থেকে না যেত, আমি আজ গুড বয় হয়ে যেতাম। তাজ যদি বন্দুক ফেলে না আসত, আমি তাহলে সুবোধ বালকের মত অনার্স পড়তাম। বউদি আমার হিস্ট্রির নোট করে দিয়েছিল, আমি খুব কষে মুখস্থ করতাম খোদা বক্স ! মোহরকে দেখলে তো, ও

আমার বউ হত ! হত না ?

খোদা বলল—স্যরও তো এই সব কথা বলতে পারেন ! তাঁরও অনেক ক্ষতি হয়েছে।

—এত সহজে একজন মানুষ চাকরি ফেরত পান কী করে ? ওকে আর স্যর বলে ডেকো না আমার সামনে। কবি থানায় কী বলে কনফেস করেছে এই সন্দেহ, এবং কবিকে পুলিস ছাড়বে না এই ভয়— ভয়ের কথা ক্রমাগত বলে গেছেন দেবপ্রতিম, আজ তিনি নিজে কী কনফেস করেছেন যে, দিব্যি চাকরিতে বহাল হলেন ! আমরা সেই প্রশ্ন তুলব না ? বল, চুপ করে থেকো না।

তুহিন কেবল বলে উঠল—আমি পারি না। বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমাকে মরে যেতে দাও। আমাকে লজ্জা দিও না আর ! পাপ হয়। বড় পাপ হয়।

—এভাবে বলো না তুহিন ! চুপ কর। বাবা কতবার বলেছেন, আমি কি আর চাকরিটা ফেরত পাব ? ন' মাস আর মেয়াদ ছিল, বাপু তারপর রিটায়ার করতেন। বল !

—লজ্জা দিও না !

—চুপ কর তুহিন !

—পঙ্গু মানুষটার কথা এভাবে বললে দয়া-রহম থাকে না রাহুল। বলে উঠল খোদা। সঙ্গে সঙ্গে সবিতার মুখটা মনের পাতায় ভেসে উঠল রাহুলের। রাহুল নিশ্চুপ হয়ে খোদার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। এবং আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল, আমরা কবিকেও একটু দয়া-রহম করতে পারতাম।

—তুহিন ! আমি চললাম। বলে আর রাহুল একদণ্ডও দাঁড়িয়ে থাকে না। গ্র্যান্ড হলের কাছে এসে পথের পাশের একটি ঘুপচি মতন চায়ের দোকানে চায়ের অর্ডার করে নীচু মাচার টানা বেঞ্চিতে বসে যায়। মাইকে শোনে শরৎ-সাহিত্যের 'এথিকাল মাদারহুড'-এর বক্তৃতা-প্রসঙ্গ।

বক্তা নারীর মাতৃত্বকে দু'টি ভাগে ভাগ করে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করছিলেন। জৈব-মাতৃত্ব আর নৈতিক-মাতৃত্ব। নারী যে সন্তান ধারণ এবং পালন করেন, এ তাঁর জৈব-মাতৃত্বের নিদর্শন। কেননা নারীর এই ক্ষমতা এবং বুদ্ধি পশু জগতের অন্যত্রও সুলভ। মানুষ নয়, মনুষ্যেতর জীবও ধারণ এবং পালন করে। নিজ সন্তানকে খেতে দেয়। পাখিও তার শাবকের জন্য ঠোঁটে করে খাদ্যকণা বহন করে আনে। মানুষের মধ্যেও রয়েছে সেই একই 'জীব-পালিনী' বুদ্ধি, এটা থাকে, এটা মানুষের কোনও মেধা-অর্জিত গুণ নয়। জীবস্তরেও এই গুণাবলী আছে, একটা পাখিরও আছে।

প্রথমে ততটা কান না দিলেও রাহুল ধীরে ধীরে কান পাতে বক্তার কথায়। বক্তব্যকে তার সমর্থনযোগ্য মনে হয়।

তাহলে নারী কোথায় মাতৃত্বের এই জৈব-স্তরকে অতিক্রম করেছে, সেটি লক্ষ্য করেছেন শরৎচন্দ্র। কিভাবেই বা সেই স্তরটিকে পেরিয়ে, পাখিরও মাতৃগুণ ছাড়িয়ে নারী তার অতিরিক্ত মানসিক সম্পদের অধিকারিণী হয়েছে, তাই-ই ছিল শরৎসাহিত্যের অনুসন্ধান। জৈব-স্তরকে অতিক্রম করতে হলে নৈতিক-স্তরে যেতে হয়। মানব-সভ্যতার এটাই নিয়ম। মানুষের আসল জোর নৈতিকতার। তাই নারী শুধু মাদার নয়, সে অবশ্যই এথিক্যাল মাদার। জৈব-মাতৃত্বকে সে নৈতিক মাতৃত্বে প্রসারিত করেছে।

একজন নারী ধারণ করেছে রামকে, পালন করেছে রামকে। শ্যাম অন্যের সন্তান, কিন্তু যখন রামের মা শ্যামেরও মা হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর মাতৃত্ব অনেক বড় একটি গুণ হয়ে যায়। কিভাবে নারীর এই ধারণের শর্তকে নারী অতিক্রম করেন, রক্তের সম্বন্ধ ছাড়াই

তিনি অন্যের মা হতে পারেন, তারই দৃষ্টান্ত শরৎসাহিত্যে আছে। নারায়ণী সেই দৃষ্টান্ত। পশু তার জৈব-স্তরকে অতিক্রম করে না। কাক যে কোকিল শাবককে পালন করে এটা তার এথিক্যাল মাদারহুড নয়। সে বুঝতে পারে না, চিনতে পারে না কাকে সে খাওয়াচ্ছে। কিন্তু রামের মা, এমনকি একজন নিঃসন্তান নারী যখন শ্যামকে খেতে দেন, মানুষ করেন, তখন তিনি তা সচেতনভাবেই করেন। জেনে বুঝেই করেন। নৈতিক আদর্শের জন্য করেন। মনুষ্যত্বের কারণে করেন।

অতীতে, নিকট-অতীতেই যৌথ পরিবারগুলি ছিল, সেই বাস্তব সমাজ-পরিবেশের মধ্যে নারায়ণীর নৈতিক মাতৃত্ব বিকাশের সুযোগ ঘটেছিল— একথা সত্য। আজ সেই যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে পড়েছে, নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে বলা যায়। শরৎচন্দ্রের যুগেই সেই ভাঙন শুরু হয়েছিল। তিনি তা লক্ষ্য করে কতকগুলি গল্প লেখেন। সেই গল্প পড়ে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানিয়ে শরৎচন্দ্রকে পত্রাঘাত করেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল, যুগ অনেক এগিয়েছে, নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, নতুনতর মূল্যবোধ, আধুনিক জীবন সাহিত্যে সৃষ্টি করে দেখাতে হবে জীবনের জটিলতাগুলি। এই সব পুরনো গল্প লিখে কী হবে! শরৎচন্দ্র সেই প্রশ্নের জবাব খুব সরাসরি দেননি, তিনি বিনীতভাবে বলেছিলেন, এগুলি গল্প মাত্র, সাহিত্য নয়। এগুলি লিখছি, অতীতের দিনগুলির কথা মনে রেখে। একটা সমাজ পরিবেশ ছিল, যৌথ পরিবার ছিল, সেগুলি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, তাহলে কি আগামী দিনে আর কোনও নারায়ণী সৃষ্টি হবে না, যার মাতৃত্বের আদর্শ ছিল সম্মানের। রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টত একথা লেখেননি শরৎচন্দ্র, কিন্তু মনে মনে সেকথা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেই এইসব তথাকথিত সামান্য গল্পগুলি লিখেছিলেন।

আজ আমরা বুঝতে পারি, সামান্য বা শুধু মাত্র গল্প, সাহিত্য নয় বলা হলেও, গল্পগুলি মানুষের মনে ধরেছিল সেদিন। আজ সমাজে মাতৃত্বের সেই নৈতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে। গল্পগুলি শুধু গল্প ছিল না। গাল-গল্প ছিল না। সাহিত্যই ছিল। মনে করি, সেই গল্পেরও মহত্ত্ব অনুধাবনযোগ্য।

নারায়ণীর সেই মাতৃত্ব কি নারী মনের অর্থহীন পাগলামি? সেই মাতৃত্ব কি আরও কোনও উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে না, যৌথ পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি সেই মাতৃত্বের মৃত্যু হবে? সরাসরি না হলেও, স্পষ্ট কোনও উক্তি শরৎচন্দ্র না করলেও, এই জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছিল শরৎসাহিত্য।

যে নারী নারায়ণীই হতে পারে না, সে কি করে কমিউনিস্ট হয়? গোকুলের ভ্রাতৃগুণ যার মধ্যে নেই, উদারতা যার মধ্যে নেই সে কখনও কমিউনিস্ট হতে পারে না। শরৎসাহিত্যের মহৎ চরিত্রের গুণাবলীই যে আত্মস্থ করেনি, সে কী করে আরও উন্নত সমাজ গড়ে তুলবে?

কমিউনিস্ট বিপ্লবী আরও সেনসিটিভ, আরও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। তার কাছে মানুষ কী আশা করে? গান্ধী এবং নেতাজি বা ক্ষুদিরামের ত্যাগের আদর্শকে যে ছাপিয়ে যেতে পারে না, তাকে কমিউনিস্ট বলা যায় না।

শুনতে শুনতে রাহুল এবার উঠে দাঁড়ায়। ক্ষুদিরাম আর কবি, এরা কি এতই আলাদা, কোথাও কি একফোঁটাও মিল নেই এদের মৃত্যুর স্বভাবে? দেবপ্রতিম তাহলে কে? এরা কি সেনসিটিভ নয়, এরা স্বার্থপর? মনে হল, গান্ধীকে মেরেছিল নাথুরাম, দেবপ্রতিমকে মেরে ফেললে কী ক্ষতি হয়? আমি কি কুখ্যাত হব ইতিহাসে? ওঁকে ব্যবহার করবে পুলিস-প্রশাসন এবং ললিত, এমনকি ভবিষ্যতে কাস্তে হাতুড়ি তারার ভোটদল তিমিরের

পার্টিও ব্যবহার করবে, দেবপ্রতিম বোধ হয় ভোটে দাঁড়াবেন একদিন ? কী করবেন দেবপ্রতিম !

সবিতার মুখ আবার মনে পড়ে গেল। বক্তৃতার একটি বর্ণও আর রাহুলের কানে ঢুকছে না। যৌথ পরিবার ভেঙেছে, তাদের দলও কি একই ভাবে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ? তারা কখনও কি আর উত্তীর্ণ হবে না ? কমিউনিজম কি মানুষকে, দেশকে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত করতে থাকবে ? বউদি আর বুলবন কি আর কখনও মিলিত হবে না ? অধীর, চিতে, গুঞ্জই কি ভারতবর্ষ শাসন করবে ? জরুরি অবস্থার তমসা কি ভারতের বুক থেকে কখনও তার ম্লান ছায়া গুটিয়ে নিয়ে ফুটন্ত সকাল উপহার দেবে না ? ক্রমশ তার কালো ছায়া আরও বিস্তীর্ণ হবে ? একজন নারায়ণী কি গর্কির মায়ের মতন হবে না কখনও, তারও চেয়ে আরও উন্নত মাতৃত্বের দিকে যাবে না কোনও সূর্যোদয়ের পথে !

একটি পাগলি তার ছেলে কোলে করে সামনে এসে দাঁড়ায়। তার কথা বোঝা যায় না। অত্যন্ত ময়লা শাড়ি পরনে, নানাস্থান ছেঁড়া, বুক বা হৃদয় ঢাকা পড়ে না। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ধরেছে দোকানের দিকে। চা-অলা একবার চোখ তুলে দেখে নিয়ে চা ছাঁকতে থাকে। পাগলিটা গলায় একটা দুর্বোধ্য প্রার্থনা শোনায়। চা-অলা কিছুক্ষণ দেখে বুঝতে পারে, মেয়েটা পয়সা চাইছে না। খাবার চাইছে এবং তা না দিলে নড়বে না কিছুতে। চা-অলা ওকে একখানা হলুদ রঙের বড় গোল বিস্কুট দেয়। সেটি হাতে নিয়ে পাগলিটা বিস্কুটের একটুখানি ভেঙে শিশুর মুখে গুঁজে দেয়। অত্যন্ত গভীর মমতায় শিশুর মুখে চেয়ে দেখে একবার, তারপর আবার বিস্কুট ভেঙে মুখে গুঁজে দিতে দিতে পথে নেমে যায়।

সেই চোখ। পাখির চোখ। পাখির মায়ের মত চোখ। রাহুল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে এই দৃশ্য। এই রকম মা পূর্ণ হয়েছে দেশের সর্বত্র। পথে এবং ঘরে। পাগলিটাই যেন এখন রাহুলকে তাড়া করতে থাকে। সবিতাও তাঁর সন্তানের কথা বলেছেন।

আয়েষাও অতএব তাঁর সন্তানদের খুঁজছেন। মাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয় রাহুলের। কবিও তার মায়ের কাছে পৌঁছতে চেয়েছিল। হঠাৎ পাশের স্টলটির জ্বলন্ত দড়ি হাতে তুলে বিড়ি ধরাচ্ছে একটি লোক, তাকে দেখে আঁতকে ওঠে রাহুল। গুঞ্জ।

রাহুল চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ে। গ্র্যান্ড হলের সমাবেশের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে। বাইরের সিঁড়ির উপর বসে মাথা নীচু করে, কারও দিকে চায় না। মাত্র একবার মুখ তোলে এক সময়। নাতাশাকে দেখতে পায়।

তাশাকে দেখেই চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল। নাতাশা ওর দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সে ভিড় ঠেলে গেটের দিকে এগিয়ে যায়, পালিয়ে যেতে চাইছে। নাতাশা প্রশ্ন করবে কবি কোথায় ! কবি কেমন আছে ? রাহুল জবাব দিতে পারবে না। নাতাশার সামনে সে দাঁড়াতে পারবে না। দুলিয়ার সামনেও সে দাঁড়াতে পারবে না। হাওয়া বিবির সামনেই কি দাঁড়াতে পারবে ? রুকসানা কি প্রশ্ন করবে না তাকে ? তারও কি কিছু পাপ হয় নাই ?

রাহুল গেট পেরিয়ে চলে যায়। গুঞ্জ কোথাও রয়েছে। রিকশা চলছে পথে। একটি রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। গুঞ্জ কি তাকে অনুসরণ করছে ? তার কি একবার অন্তত দেবপ্রতিমের সামনে সপ্রশ্ন দাঁড়ানো উচিত ছিল না ! নিঃশব্দ ঘৃণাই কি শেষ কথা ?

নিঃশব্দ এবং অতি তীব্র ঘৃণার চোখেই চেয়ে দেখেছিল রাহুল। ইন্দ্রপ্রস্থের কথিত দিদির বাড়ি বাবুলের মোটর বাইকে মোরাম সুরকির পথে এক গোধূলি বেলায় এসে

পৌঁছেছিল গাবগাছের আড়ালে। এখান থেকে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখেছিল অম্বর এবং দেবপ্রতিমকে। ঘৃণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল হৃদয়। তুহিন তার পাশে দাঁড়িয়ে হরবোলার ব্যবহৃত রিভলবার বার করে ফেলেছিল।

—তুমি এটা ফেরত দাওনি ?

—না। কাজে লাগবে জানতাম। একবার বল, প্রায়শ্চিত্ত করি। যখন লাফিয়ে উঠে হাতের র‍্যাকেট ঘা দিয়ে ছুঁড়বে, কক্‌টা খাড়া হয়ে উঠবে, তাই না ? হয় অম্বর, নয়...

—না তুহিন ! না।

—কেন বাধা দিচ্ছ রাহুল !

রাহুল তুহিনের রিভলবার হাত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর টেনে আনল পথের উপর। বলল—শোনো ! পাগলামি ক'রো না। অম্বর আর দেবপ্রতিম এক নয় তুহিন।

—দেবপ্রতিম আরও ঘৃণ্য !

—না।

তুহিন ক্রোধে ফুঁসে উঠল। কিন্তু রাহুলের 'না' বলা কঠিন স্বর সে অতিক্রম করতে পারল না। ক্রোধের চাপে, হতাশায় তুহিনের চোখে জল এসে পড়ল। ওকে টেনে নিয়ে চলল রাহুল।

পরের দিন রবিবার বিকেলে খোদা বক্‌স রাহুলকে চৌধুরী মেস থেকে ডেকে আনল বিমান ভদ্রের বাড়ি। পাশের ভট্টশালীদের বাড়ি বিবাহের সানাই বাজছে। মাঝে মাঝে পটকা ফাটছে, রৌশনচৌকিতে সুরেগন্ধে ম ম করছে আবহ। দেবদারু পাতায় সাজানো গেটে টুনি বাল্ব জ্বলছে মিটিমিটি। রাহুল অবাক হয়ে গেল।

ভদ্রদের বাড়ির দোতলায় রাহুলকে টেনে তোলে খোদা। ভট্টশালীদের বাড়ির অতি গা-লাগা ভদ্রদের দালান। যে-ঘরে রাহুল এল সেই ঘরের সমস্ত জানলা রুদ্ধ ছিল। ঘরটা অন্ধকারপীড়িত, ঘরে অল্প শক্তির, ছোট রঙিন বাল্ব জ্বলছে, রঙিন আলো ছায়াময় পরিবেশ তোয়ের করেছে।

ঘরের মধ্যে ওই ছায়ারঙিন আলোর মৃদুতায় চেয়ারে উপবিষ্ট দেবপ্রতিম। একা। তাঁকে দেখে রাহুল ভৌতিক বিস্ময়ে চমকে উঠল।

—এসো !

ঠাণ্ডাস্বরে ডেকে উঠলেন দেবপ্রতিম। দু'দুটো পটকা ফেটে উঠল, মনে হল, পাশের বাড়ি নয়, এই ঘরের কার্নিশে জানলার বাইরে ফাটল পর পর দু'বার। বিমান ভদ্র এবং তাঁর স্ত্রী এসে ছায়ামূর্তির মতন খাটের বিছানায় বসলেন। বোলার স্যর এসে খাটের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলেন।

দেবপ্রতিম ডাকলেন—আমার কাছে এসো রাহুল ! এখানে। এই চেয়ারে বসে পড়। শোন, আমি শত্রু নই। আমি এখনও অবধি, তোমাদের কারও কোনও ব্যক্তিগত বা তোমাদের সাংগঠনিক ক্ষতি করিনি ! আমি ডি. এম.-কে বা এস. পি-কে বলেছি, রাহুল অ্যাকসানিস্ট নয়, আমরা কেউ খতমের রাজনীতিতে বিলং করি না। আমি মুচলেকা দিয়েছি এই বলে যে, রাহুলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংযোগ নেই। অধীর যা করছে, চেয়ারম্যানের নামে করছে, এই গুণ্ডাটিকে আমি ভয়ে প্রশ্রয় দিই। বর্তমানে সে ললিতের দলে ঢুকেছে।

—অম্বর আপনার বন্ধু ?

—না।

—আপনি ওঁর সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেন ?

—কে বললে ?

তুহিন ঢুকে এল এই সময়। তাকে দেখে দেবপ্রতিম বললেন—তুমি আমাকে রিভলবারটা ফেরত দেবে বলেছিলে তুহিন। নাকি, রাহুল সেটা ফেরত দিয়েছে আমাকে দেবার জন্যে ! দাও, ওটা দাও আমাকে। বলেই হরবোলা হাত দিয়ে ধাক্কা দিল অতি নিকটের লম্বা বড় জানলার কপাটে।

রাহুল দেখল, খোলা কপাটের দৃশ্য। ভট্টশালীদের বাড়ির সমউচ্চতার দোতলায় প্রায় সমান্তরালে ওদিকে খোলা একটি এদিকের অনুরূপ জানলা। শুধু রঙ আলাদা। ওই বাড়ির জানলা ঘেঁষা খাট। খাটে বসে রয়েছে একটি অপরূপ সুন্দরী বউ, ওর কোলে ছোট মেনিমুখো খরগোসপানা একটি বিলিতি কুকুর।

খোলা জানলা বয়ে বাইরের বর্ণময় এবং হাল্কা নীল মেশা অত্যন্ত তীব্র সাদা আলো ঢুকে আসে। সুন্দরী বউটাকে দেখিয়ে দেবপ্রতিম বললেন—উনি এস. পি-র ওয়াইফ। অ্যাবনরম্যাল। ওঁর পেটের বাচ্চা বাঁচেনি। অম্বরের বুটের লাথি খেয়ে অ্যাবরশন হয়। তারপর থেকে আর কনসিভ করতে পারেন না। আমি এস. পি-কে বলেছি, মানুষ হত্যার কিছু অভিশাপ আছে।

—পাপ ! আমরা পাপ করেছি বলে চিৎকার করে উঠল তুহিন।

অত্যন্ত কঠিন গলায় দেবপ্রতিম বললেন—তুমি রিভলবার ফেরত দাও তুহিন !

—আপনাকে বিশ্বাস করি না।

—ক'রো না। আমি তো করতে বলছি না কাউকে। তবে আমি যা করার করব। গতকাল এস. পি বললেন, বউ নাকি কনসিভ করেছেন, ভারি আহ্লাদের কথা। তিন মাস। নাইনটি ডেজ। বললাম, এমারজেন্সির বাচ্চা কি ভাল হবে স্যর ! দাও, তুহিন ! না দিলেও আমার কিন্তু ব্যবস্থা আছে।

বোলার খুব উদ্বিগ্নভাবে তুহিনকে দেখছিলেন। ভয় করছিলেন তুহিনের ভয়ংকর অভিব্যক্তি দেখে। চোখে মুখে জিঘাংসার ছায়া।

—দাও, দিয়ে দাও তুহিন ! বলছেন, দিয়ে দাও। ওটা কাছে রাখলে তোমাদেরই কষ্ট। ফেলে দাও। বলে উঠলেন প্রফেসর বোলার।

—সমস্ত পাপ আমার। সব বিশ্বাসঘাতকতা আমার। তাবৎ ঘৃণা আমারই। আমাকে আমিও ঘৃণা করি রাহুল ! আমার মত নিষ্ঠুর কেউ নও। দাও, তুহিন দেরি ক'রো না ! বলে ওঠে হরবোলা।

রাহুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—বসো ! উঠলে কেন ? বউটা খুবই সুন্দর, তাই না ! বললেন দেবপ্রতিম।

রাহুল কেমন ভয় মেশানো গলায় তুহিনকে বলল—তুহিন ! রিভলবার দিয়ে দাও। আত্মহত্যার আগে কবিকে তুমি 'শালা' বলে গালি দিয়েছিলে, মনে আছে !

—শালা ! বলে দেবপ্রতিমের দিকে তেড়ে আসে তুহিন। পাগলের মত তার আর্তনাদ।

রাহুল তুহিনকে আটকায়, জোর করে তার হাত থেকে কেড়ে নেয় অস্ত্রখানি। চেয়ারে বসে পড়ে এবং দেবপ্রতিমের হাতে তুলে দেয় সেটি। এবং তখন দ্রুত তৎপরতায় হরবোলা রিভলবার তাক করে তুহিনের দিকে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় তুহিনের। সবার দাঁড়া বেয়ে সিরসিরানি নামে স্রোতবৎ। ঘটনা কি তাহলে বিপরীত হয় ! তুহিন কি

এইভাবে শেষ হয়ে যাবে!

—স্যর! প্লিজ! আমি আপনার ছাত্র স্যর! তুহিনকে বাঁচতে দিন। বলে ওঠে রাহুল।

—শ্রেণী হিংসার ব্যবহার কখনও এমনও হয় বইকি রাহুল! তুমি ছাত্র, নিতান্তই ছাত্র।

—আপনাকে চিনতে পারছি না স্যর! আপনি একদিন রুকসানাকে ভালবেসেছিলেন, ইকবাল আপনাকে এখনও বিশ্বাস করে! চাবিটা এখনও আমার কাছে অছে স্যর!

দেবপ্রতিম এবার হা হা করে সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—বিপ্লব মূর্খের দিবাস্বপ্ন রাহুল! ওটা মানুষের হাস্যকর প্রস্তাব। আমি ভুল করেছি। বলেই তিনি সহসা রিভলবার তুহিনের দিকে আরও নিঃখুঁতভাবে তাক করলেন।

—যাও। চেয়ারে গিয়ে বসো! যাও! গর্জে ওঠেন দেবপ্রতিম। পায়ে পায়ে পেছনে পিছিয়ে যায় হতভম্ব তুহিন। তখনই সেই রিভলবার খোলা জানলা দিয়ে অনেক পটকার শব্দের মধ্যে এস. পি-র বউয়ের বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করে। মুহূর্তে সাদা কুকুরটা চিঁ চিঁ করে কেঁদে ওঠে। বউয়ের কোলের উপর লাফিয়ে উঠে পড়ে যায় তুলোর বালিশের মত। রক্তাক্ত হয়ে যায় সাদা ফুলের পাপড়ির মত কুকুরটা। তা দেখে বউটি সম্পূর্ণ পাগলের মত হি হি করে হেসে ওঠে। তার পেটের ভ্রূণটা কি নড়ে ওঠে তখন? সেই ভ্রূণ কি প্রাণহীন নাকি সপ্রাণ পিণ্ড রাহুল জানে না। দেবপ্রতিম পাল্লা টেনে জানলা বন্ধ করে দিলেন।

উঠে দাঁড়ালেন দেবপ্রতিম। বললেন—নেবে নাকি রাহুল? এই রিভলবার তোমার কাছে রাখবে? মনে রাখবে পুলিস-প্রশাসনের ভ্রূণ পর্যন্ত প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় ভয় পায়। পায় না? নেবে? নেবে না? হা হা হা! কালই হয়তো তোমার সঙ্গে অম্বরীশ দেখা করবে। চলি এখন।

দেবপ্রতিম চলে যান দোরের কাছে। তারপর হাতের অস্ত্র খোদার দিকে ছুঁড়ে দিতে গিয়ে বলেন—না থাক। আমার কাছেই থাক। রাহুল দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে একবার শুধু পাগল বউটির হাসি শুনতে থাকে একাকী। হরবোলা সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে থাকেন, সশব্দে।

॥ ৪৬ ॥

নাতাশা রাহুলকে লেখা বউদির চিঠিখানি বুলবনের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই চিঠি সে পেয়েছিল বালিশের তলে, চৌধুরী মামার শহরের বাড়িতে। বুলবন একটি বার ওই চিঠি পাঠ করেছে। অত্যন্ত অবহেলে চিঠিটা ফেলে দেবার কথা ভাবে, কিন্তু পারে না। অতএব চিঠিটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখে এবং সেই চিঠি ক্রমাগত তাকে অসহ্য কষ্ট দিতে থাকে।

খুব ভোরে বুলবন সেদিন পার্টি-অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে একা। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। প্রাথমিক প্রাতঃকৃত্য ছাড়া সে কিছুই করেনি। চা অবধি খায়নি। নীচে নেমে এল।

রাস্তার পাশের একটি চায়ের দোকানে এসে চা খেল। মুদির দোকানের বাইরের সংকীর্ণ রোয়াকে চা তৈরি হয়, এটি দোকানের চা নয়, চাতালের চা। সারা রাত এখানে

চায়ের ডেকচি গরম থাকে এবং সকাল আটটার আগেই চাঅলা দোকান তুলে দেয়। তখন মুদির দোকান খোলার সময় হয়ে যায়।

চা খেতে খেতে বুলবন ভাবছিল, মণি একটি সাঁওতাল মেয়েকে সঙ্গে করে হাসপাতালে এনেছিল কেন, ছেলেটা তা-ও বলল না ; গতকাল ভোরে সমির মামার ওখানে নাকি মায়ের সঙ্গে এক মিনিট দেখা করে, তারপর সেই মেয়েটাকে সঙ্গে করে কোথায় চলে যায়। নাতাশা পার্টি অফিসে এসে বুলবনকে এই রিপোর্ট করে এবং চিঠিটা দেয়। মণি রাত্রে কোথায় ছিল তারা জানে না।

নাতাশা ব'লে গেছে, আজ ভোরের বাস ধরে মা এবং সে মোহড়া চিৎপুর ফিরে যাবে। বাপুর সঙ্গে তাদের আর দেখা হল না। বউদিও তাদের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরবে না।

ভোরের সাড়ে পাঁচটার বাস ছেড়ে যেতে এখনও দশ মিনিট সময় বাকি আছে। পাশের একজন চা-খোরের ঘড়িতে সময় দেখল বুলবন। তারপরই একটি রিকশায় লাফিয়ে উঠে পড়ল। বুলবন যখন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে রিকশা থেকে নামল, বাস তখন ছেড়ে যাচ্ছে। চন্দ্রিমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বল্প একটু হাত তুলে, হাতখানি সামান্য নেড়ে মা এবং নাতাশাকে বিদায় জানাচ্ছে। বাস ছেড়ে চলে গেল, চন্দ্রিমার হাতও থেমে গেল বুলবনকে দেখে। আঁচল মুখে চেপে ধরে চন্দ্রিমা মাথা নীচু করল।

বুলবন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক দণ্ড। তারপর হাঁটতে শুরু করল লালদিঘির রাস্তার দিকে। অনেকখানি হেঁটে আসার পর পিছনে চেয়ে দেখল একবার। চন্দ্রিমা ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। বুলবন এক নিমেষ চিন্তা করে, চন্দ্রিমার সঙ্গে অন্তত কিছু একটা কথা শুধনো বা বলা কি উচিত ছিল না ? কিন্তু কী কথা সে বলবে তাকে ?

ধরা যাক,চন্দ্রিমার সঙ্গে তার কোনওই পারিবারিক সম্বন্ধ নেই। কিন্তু সে তো তার কমরেড। পার্টির শরৎ জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান চন্দ্রিমার কেমন লাগল, এই একটা প্রশ্নও কি করা যায় না ?

চন্দ্রিমাও অবশ্য বুলবনকে প্রশ্ন করতে পারে। কিন্তু তা যে করবে না, মাথা নীচু করার ভঙ্গিমার মধ্যেই সে কথা স্পষ্ট। নিজে থেকে যদি বুলবন যেচে বলে, তাহলে হয়তো বলবে। কিন্তু চন্দ্রিমার চিঠিতে লিখিত হয়েছে, হুকুম যেমন ফুলভানুর মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারে না, বুলবনও চন্দ্রিমার মুখমণ্ডলে চোখ তুলতে পারে না। এ যদি সত্য হয়, তাহলে বুলবনের সুন্দর এক অব্যাহতি আছে।

অতএব আবার সে হাঁটতে শুরু করে। রবীন্দ্রভবনের কাছাকাছি গার্লস কলেজের চৌমাথায় পৌঁছে আবার পিছনে ফিরে দেখে এবং দাঁড়িয়ে পড়ে। চন্দ্রিমা অনেকখানি এগিয়ে এসেছিল। চৌমাথায় পৌঁছালে ডানহাতি পথটায় নেমে যাবে, বুলবন কমার্স কলেজের দিকে চলে যাবে। ওই পথ ধরে স্বর্ণময়ীর দিকে এবং নতুন হাসপাতালের দিকে। দাঁড়িয়ে রইল বুলবন। হঠাৎ দেখল, পিছন থেকে বয়ে আসা একটি খালি রিকশায় উঠে বসল চন্দ্রিমা। বুলবন নিশ্চিন্ত হ'ল, চন্দ্রিমা তার সঙ্গে কথা বলার জন্য মোটেই উন্মুখ হয়ে নেই। তাকে হয়তো মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলে দিয়েছে।

বুলবন মাথা নীচু করে বাঁ-হাতি পথে নেমে যায়। হাঁটতে হাঁটতে এসে হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়ায়। চায়ের দোকানগুলিতে কয়লার আঁচের ধোঁয়া উঠছে। একটু আশ্চর্য হয়ে দেখে গেট খোলা, কোনও প্রহরী নেই। হাসপাতালের ভিতর ঢুকে পড়ে বুলবন।

ভিতরের পিচপথ ধরে এসে আরও অবাক হয়, হাসপাতালে পাহারার কোনও কড়াকড়ি

চোখে পড়ে না। এবার সে আরও ভিতরে চলে আসে। সূর্য উঠেছে। আকাশে মেঘ নেই। রোদ ঝলমল করছে।

হাসপাতাল চাতালে ব্যালকনির নীচে এসে দাঁড়ায় বুলবন। এখানকার লোহার গ্রিল গেটও খোলা, দীর্ঘ টানা বারান্দা চোখে পড়ে, একজন ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে চলেছে আপন মনে। ঢুকে পড়ে এবার, কিঞ্চিৎ সভয়ে। কেউ তাকে বাধা দেয় না, তেড়ে আসে না। ঝাঁট দেওয়া লোকটি তাকে দেখেও দেখে না। একটার পর একটা দরজা পেরিয়ে ছোট একটি কামরার সামনে এসে দাঁড়ায় বুলবন।

ঘরখানিতে চারপাঁচখানা বেড। সবই খালি। কেবল কোণের দিকে জানলার কাছে একজন রোগী বাইরে চেয়ে বসে রয়েছেন বেডের উপর। বুলবন কিছুক্ষণ তাঁকে পিছন থেকে দেখে তারপর ভিতরে ঢুকে আসে। ঢুকে এসেও অনেকক্ষণ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকে। ডেকে উঠতে পারে না। গলার ভিতরে কান্না দলা পাকিয়ে উঠেছে।

সমস্ত মাথার চুল সাদা। পিঠ বেঁকে গেছে। পরনে সাদা থান কাপড়ের খাটো মোটা ধুতি জাতীয় কিছু একটা, কিন্তু লুঙ্গির মত করে পরে আছেন তিনি, কয়েদীর বেশভূষা নয়, বরং ফকিরের পরিধান।

—বাবু!

ডেকে ওঠার চেষ্টা করল বুলবন। গলায় শব্দ হল কিছুটা, তা-ও খাদের মধ্যে। সেই শব্দে জানলা ছেড়ে ঘুরে বসলেন সাদা চৌধুরী। তাঁরই যৌবনের হুবহু প্রতিরূপ তাঁর সম্মুখে, ব্যথায় ম্লান দু'টি চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে। সাদার চোখ অশ্রুর ক্ষীণ আভাসে টলটল করে উঠল। তিনি মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। যেন তিনি লজ্জা পেয়েছেন।

—বাবু!

ডেকে উঠল দ্বিতীয় দফায় বুলবন। এবার স্বর কিছুটা স্পষ্ট শোনালো। সাদা কেঁপে উঠলেন।

—আমার সময় হয়েছে বুলবন! এবার আমি বাড়ি যাব। গোরা আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালালো বলে গেল না। আমার এখন ঘরে ফেরার ইচ্ছা!

—বাপু!

আর্ত-বিহ্বল বুলবন বাবাকে ডেকে ওঠে মাত্র এবং অবধিহারা বিস্ময় খেলে ওঠে গলায়। বাবার কামনা কী গভীর, কী সচ্ছল, কী সিধা! গোরা ফিরতে পারল না, সেই ইচ্ছা বাবাকে যেন আরও কামনামদির করেছে, আরও তৃষ্ণার্ত করেছে তাঁকে। তাঁর সময় হয়েছে, যেন-বা তিনি নিশ্চিন্তই ফিরে যেতে পারবেন।

—তুমি অবাক হচ্ছ তো!

—জি!

ছেলের মুখের দিকে নিবদ্ধ বাষ্পাকুল চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে সাদা চৌধুরী বললেন—আমি এখন সকলকে অবাক করে দিতে পারি বাবা! যদি তাজ আমাকে অবাক করে দেয়, আমি কেন পারি না তাহলে! রাহুলকে বলেছিলাম, ওকে সাবধান করে দিতে! শুনল না কেউ। অত অসাবধানী জীবন কি বাঁচে গো! গা তখনও গরম হয়ে আছে, প্রাণ আছে! ওকে তুলে নিয়ে চলে গেল কালো গাড়ির মধ্যে। প্রাণ থাকতেও শয়তানরা মুমতাজকে লাশ বানালো। এরপর আর কী অবাক হবে তুমি! .....

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সাদা আবার ঘোষণা করলেন—বড্ড আশক হয়। খুব ইচ্ছা হয়।

—যাবেন আপনি !

—কেন যাব না ! তবিয়ত এখনও জিন্দা, এখনও ঠাণ্ডা হয়নি কলিজা, লোহু বইছে ধড়ে। আমাকে কি ফকিরের মত দেখাচ্ছে বড় খোকা !

—বাপু ! ব'লে অর্ধস্ফুট অনুচ্চ আর্তনাদ করে বুলবন।

—অবাক হচ্ছ তো ! নিশ্চয় হচ্ছ ! আই অ্যাম এ নেকেড ফকির অব ইন্ডিয়া। ভারত আমাকে নাঙা করেছে। লজ্জা করে না আর, একদম লজ্জা করে না। এখন শুধু ঘরে ফেরার তাড়া। নির্লজ্জের মত ফিরতে চাই। শোন, আমি কিন্তু তৈরি !

বুলবনের প্রাণটা এবার অত্যন্ত হাহাকার করে কেঁদে উঠল অতলান্ত সমুদ্রের তলে, বিপন্নতায়। কারণ সে হাহার্ত সমুদ্র- সংক্ষোভে, বেদনায় তলিয়ে যাচ্ছিল। সেই সমুদ্রের তলদেশবর্তী অন্ধকার ভারতরক্ষা আইনের দ্বারা তমিস্র। সেই তমসা মস্তানের অঙ্গুলিহেলনে ঘন এবং তরল হয়, তার জাদু দ্বারা শাসিত এবং ছিন্নভিন্ন হয়। বাবা কি ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারেন !

অসহায় মানুষ তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল জাগতিক ইচ্ছা পোষণ করে ; যেহেতু এই বিশেষ ইন্দ্রিয়টি সব ইন্দ্রিয়ের যোগফল এবং তারও অতিরিক্ত। সেটি কামনাতুর শৃঙ্খলিত মানুষের আত্মার বিমূর্ত কল্পনা-কেন্দ্র, সেখানে উদ্গত হয় দুর্মর বাসনা। গোরার ইচ্ছা হয়, সাদারও ইচ্ছা হয়। অবুঝ সেই ইচ্ছা এক বৃহৎ আকাশ, বিপুল সমুদ্র, অনন্ত মরুভূমি, সীমাহীন অরণ্য, অভ্রংলিহ পর্বতমালা। পৃথিবীর এই পাঁচটি মহৎ সৌন্দর্যের উদ্দেশে সেই বাসনা ডানা মেলে দেয়, ঠিক একটি শুভ্র বলাকা যেমন।

অথচ মানুষের কোনও ডানা থাকে না। তথাপি মানুষ ব'লে ওঠে, 'আমি কিন্তু তৈরি' !

সাদা চৌধুরী তাঁর ছেলের মুখের দিকে চেয়েছিলেন কতক সেকেন্ড এবং বুঝেছিলেন ছেলে তাঁর কথা বিশ্বাস করছে না, বরং কষ্ট পাচ্ছে। কাছে ডাকলেন সাদা চোখের ইশারায়। বুলবন এগিয়ে এসে খাটের লোহার বাজু ধরে দাঁড়ায়।

সাদা বললেন—আমি ডি. এম. সাহেবকে দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে বলেছি, আই অ্যাম রেডি স্যার ! এবার যেতে দাও। আমার অনেক ঘাট হয়েছে ! যতবার আমাকে সই করতে বলেছ, করেছি, যত সাক্ষী চেয়েছ, দিয়েছি। মেয়াদ কি হয়নি আমার !

—এরা আপনার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দেয়নি বাবু ! মা এসেছিল, নাতাশা এসেছিল...

—বউমা, আমার বউমা আসেনি ?

—হ্যাঁ। চন্দ্রিমাও এসেছিল। আমার পার্টির নেতারা এসেছিলেন।

—প্রাণকিশোর, আদিত্যবাবু !

—হ্যাঁ বাপু !

—বউমাকে বলবে, আমি আসছি। শিগগির যাব। আই উইল গো। উইল মানে ইচ্ছা, জানো তো !

আবার চুপ করে গেলেন সাদা চৌধুরী। যেন তিনি আবার লজ্জা পেয়েছেন। মাথা নীচু করলেন।

স্বল্পক্ষণ বাদে আবার চোখ তুললেন। একটা ঢোঁক গিলে বললেন—আমার মুখ দিয়ে

রক্ত উঠত খোকা ! বাহ্যে রক্ত পড়ত ! এরা রোজ দু'বেলা ইঞ্জেকশন করে। ভাল আছি।

'ভাল আছি' কথাটি আর সহ্য হল না বুলবনের। নিরীহ তার চোখ দু'টি কান্নায় সহসা ঝাপসা হয়ে এল। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল সে। রুমাল বার করে চোখের উপর চেপে ধরল।

—কেঁদো না। ওটা খারাপ।

—বাপু !

—হ্যাঁ খোকা, কান্নাকাটি খারাপ জিনিস। বউমাকে একবার নিয়ে আসবে আমার কাছে ! গেট খুলে দিয়েছে, বোধহয় আটকাবে না।

—জি !

—বউমাকে আনো একবার, দেখি !

বুলবন রুমালখানি পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে।

—সঙ্গে করে আনোনি কেন ? তোমরা কমরেড, তোমরা একসঙ্গে থাকবে। বলে উঠলেন সাদা। ঠিক এই সময় টিনের ট্রেতে ইঞ্জেকশন, ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে একটি শ্যামলা রঙের, বেঁটেখাটো এবং শীর্ণ নার্স এল।

বুলবনের দিকে চোখ তুলে দেখল চশমার কাঁচ দিয়ে, পুরু লেন্স, ক্ষুদ্র মানুষটিকে ভারিক্কি করেছে। পানপাতা আদল,ভারি সুশ্রী। গলার স্বর অত্যন্ত নরম। সে বলল—বাবা ? অর্থাৎ সাদা চৌধুরী বুলবনের বাবা নিশ্চয়, কিন্তু সে কথা প্রশ্নে শুধালো নার্স। বুলবন আস্তে করে মৃদু মাথা নাড়ল। নার্সের 'বাবা' ডাকটি এতই স্বাদু যে, মনে হ'ল সাদাকে সে-ও বাবা মনে করে।

—খেয়েছেন ? সাদাকে ঘাড় কাত করে শুধায় নার্স, মিষ্টস্বরে।

—হ্যাঁ, মা ! খেয়েছি, কলা, দুধ, পাঁউরুটি। ছেলে আসার আগেই খেয়ে নিয়েছি। ছ'টা, সাড়ে ছ'টা হবে।

—এবার ইঞ্জেকশনটা নিতে হবে আপনাকে।

—হ্যাঁ, দাও। স্বচ্ছন্দে হাতের বাহু এগিয়ে ধরেন সাদা চৌধুরী।

—দু'ধরনের বড়ি আছে। আধঘণ্টা পর খাবেন।

—তাই খাব। রোজই তো একই ওষুধ।

—হ্যাঁ। বলে সুস্মিত হাসে নার্স। তারপর সূচ বেঁধায়। সাদা একটুখানি কেঁপে ওঠেন।

নার্স চলে গেলে সাদা চৌধুরী তাঁর শীর্ণ হাতের বিদ্ধ স্থানে অন্য হাতখানি এনে আঙুল দিয়ে বুলিয়ে নিতে নিতে বললেন—শোন ! এই যে জানলাটা দেখছ, এখানে অনেক রাতে পাঁচিল টপকে মণি আসে। দেখা করে। জানলার নীচে ড্রেন আছে, ভাঙা কাঁচ পড়ে আছে, নোংরা। ওর পায়ে ভাঙা কাঁচ ফুটেছে। ও কোথায় রাত কাটায় জানো ? স্টেশনে। পাগল।

—জি !

—পাগল ছেলে তো ! ওকে কিছু ব'লো না। আসতে দাও। জানলা ধরে ঝুলে ঝুলে কথা বলে। ও বলেছে, তাজকে জ্যান্ত অবস্থায় শ্মশানে পুড়িয়ে দিয়েছে পুলিস। তখনও প্রাণে মরেনি। বলতে বলতে মণির চোখ দিয়ে পানি পড়ে ; শুনি, কিন্তু আমার দু'চোখ শুকনো, বুড়ো মানুষের সব শুকিয়ে যায়, সব।

—আপনি কী করে বাড়ি ফিরবেন ? আপনাকে ছেড়ে দেবে কেন ?

—দেবে। সাক্ষীসাবুদ যা লাগে সমস্ত দিয়েছি। যতবার সই করতে বলেছে, করেছি। গতকাল আমার কাছে নাটা তরফদার এসেছিলেন। ব'লে চুপ করলেন সাদা।

দু'দুবার তিনি সইসাবুদের কথা উচ্চারণ করলেন। বুলবন বাবার বলা ওই একটি কথা দ্বিতীয়বার শুনল এবং বুঝতে পারল মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে এতই অস্থির করেছে যে, সই দিলেই যেন প্রশাসন প্রসন্ন হয়ে ছেড়ে দেবে, এই একটা কাল্পনিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতার মধ্যে সময় গুনে চলেছেন।

—তরফদার কী বললেন ?

—আমার কাছে বন্দুক ফেরত চাইলেন। বললেন, আপনার ছেলেরা পুলিসের বন্দুক তক ছিনতাই করে রেখেছে ঘরে। আমার বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। এইসব যদি ফেরত দিতে পারেন, আপনার রিলিজের ব্যবস্থা হবে।

—পুলিস আমাদের বাড়ি গিয়েছিল। তল্লাশি করেছে। পায়নি। ওই বন্দুকের খবর কেউ জানে না।

—আমাকে পুলিস মেরেছে বাবা ! জেল থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে একদিন নয়, সাতদিন ধরে জেরা করিয়েছে, থানার লক আপে নিয়ে গেছে। আধমরা অবস্থায় আবার জেলে টেনে এনেছে। আমি যা জানি না, আমাকে তাই কবলু করতে হয়েছে। তারপর আমাকে ওরা কনস্ট্যান্ট লক আপে রেখে দিল।

একটা হৃদয় বিদীর্ণ করা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে টেনে নিল বুলবন। তারপর শান্তস্বরে বলল—আমি যাচ্ছি এখন। পরে আসব।

—বউমাকে আনবে !

—হ্যাঁ। বলে দ্রুত পা বাড়ায় বুলবন।

পিছন থেকে ডেকে ওঠেন সাদা চৌধুরী—বুলবন !

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, ঘুরে দাঁড়াল এবং স্থির হল বুলবন।

সাদা বললেন—শোন ! এর পর এসে যদি দ্যাখো আমি নেই !

বুলবন কোনও কথা উচ্চারণ করতে পারল না। ওর তীব্র কষ্ট হতে লাগল।

ঠিক তখন বাইরের বারান্দা দিয়ে শ্যামলী শীর্ণ পানপাতা নার্সটি চলে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—আপনি এখনও রয়েছেন ! গেট বন্ধ করে দেবে। চলে যান। কর্তারা সব আসবেন। গেট খোলা নিয়ম নয়। কাল ভোরে এই রকম আসবেন, দেখা করতে পারবেন। মেঝেয় ঝাঁট হয়, জলধোয়া হয় বলে আধঘন্টা খোলা হয়। তা-ও আমরা নিজেরা খুলে দিই বলে ঢুকতে পেরেছেন।

—ও !

—হ্যাঁ, আপনি চলে যান এখন। দেরি করবেন না, বিপদে পড়বেন। বলে নার্সটি আর দাঁড়াল না।

বুলবন দ্রুত গ্রিল গেট পেরিয়ে হাসপাতালের ভিতরের সড়ক ধরে এগিয়ে এল এবং তারপর বড় গেটের কাছে এসে দেখল দূর থেকে একখানি সরকারি জিপ এদিকে ছুটে আসছে। কাছে এলে বুঝতে পারল এস. পি. এবং ডি. এম. একসঙ্গে রয়েছেন। বুলবন পথে নেমে চলে এল। ওর মনে হ'ল বাবাকে ফের কারাগারে চালান করে দেবে, বাপু আর কখনওই হয়তো বাড়ি ফিরতে পারবেন না।

এরপর এসে যদি দ্যাখো আমি নেই ! ক্রমাগত এই বাক্যটি মনের মধ্যে বেজে বেজে

উঠতে থাকে। অস্থির এক যন্ত্রণা বুলবনকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। কোথায় গেলে এই সুতীব্র কষ্টের হাত থেকে সে পরিত্রাণ পাবে ভেবে উঠতে পারে না। মনে পড়ে, বাবা বললেন, 'আমি কিন্তু তৈরি!'

বাবা কি তাহলে মৃত্যুর জন্যও মনে মনে তৈরি হয়েছেন!...'যদি দ্যাখো আমি নেই!' এক বিপুল সুউচ্চ শূন্যতা খাড়া হয়ে ওঠে বুলবনের চোখের সামনে। হাঁটতে হাঁটতে সে চৌধুরী মেসের কাছাকাছি আসে। দ্বিধাগ্রস্তভাবে পথের উপর একটি চা-স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর স্টলটির বেঞ্চে বসে যায়। চা খায়। রাহুলের খোঁজ করবে ভেবেছিল। কিন্তু কেন যেন সে আবার পথে নেমে এল।

ফের হাঁটতে শুরু করল। গোরাবাজার নিমতলা হয়ে জজ কোর্টের দিকে ঘাড় গুঁজে হেঁটে চলল। উদ্ভ্রান্ত মন, বিক্ষিপ্ত হৃদয়। এত কষ্ট হচ্ছে যে, আর সে হাঁটতেও পারছে না। তবু হাঁটতে হাঁটতে চৌধুরী মামার বাড়ির দিকে আবার ফিরে আসে। আবার বুলবন নিমতলা আসে।

পথ ছেড়ে সমির মামার বাড়ির দোরের কাছে এসে বাইরের কড়ায় হাত রেখে একটু টেনে ধরে। উপরে চোখ তুলে কলিং বেলটার বোতামটা দেখতে পায়। কড়া ছেড়ে দিয়ে বোতামে আঙুল তুলে টেপে একবার। তার বুকের রক্ত আজ হঠাৎ কেন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কোনও সাড়া আসে না। দ্বিতীয় বার বুলবন বোতামটি চেপে ধরে, যেন সে এক ভীরু মানুষের প্রতিচ্ছায়া, দ্বিধা সংশয়ে হৃদয় কেঁপে ওঠে তার। তৃতীয়বার বেল বাজিয়ে সংকেতে চন্দ্রিমাকে ডাকে সে। কোনওই সাড়া আসে না। তখন বাড়ির উল্টো দিকের রাস্তার ওপারে মেঠাইয়ের দোকানের ঝুলন্ত ফ্যানের দিকে চেয়ে দেখে, ওটা ঘুরছে না।

বিদ্যুৎ নেই। কোনও ভাবেই এখন কি আর সংযোগ সম্ভব? কড়া নেড়ে ডাকার সাহস করে না বুলবন।

বাবা তোমাকে একটি বার দেখতে চান দোলন! মনে মনে কথাটি সাজিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু শহরে তখন বিদ্যুৎ ছিল না। অথচ সে কড়া নেড়ে উঠতে পারেনি। পথে নেমে চলে এসেছিল। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করেছিল।

লালদিঘির রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়াল। সামনের দিক থেকে বুলেট-বাইক তেড়ে আসছে আঁধির মতন। চালিয়ে আসছেন ললিত, ব্যাকে বসে রয়েছেন নাটা। অত্যন্ত কাছে এসে বাইক দাঁড়িয়ে পড়ল।

বুলেটের আওয়াজ থেমে গেল দু'চার সেকেন্ডের মধ্যেই। পিছন থেকে রাস্তার উপর নেমে দাঁড়ালেন নাটা। পিচরাস্তার কিনারে লালদিঘির ধারে দু'একটি কৃষ্ণ বা রাধাচূড়ার গাছ রয়েছে, তার জ্বলন্ত ডালগুলি বসন্তে রাঙিয়ে উঠে পথের উপর নুয়ে পড়ে। দেবদারু অথবা ওই জাতীয় গাছও রয়েছে। পিচপথের গা-লাগা মাটির পথচলা পথ সিধা সমান্তরাল চলেছে। নুয়ে আসা ডালপালা এবং পুষ্পপুঞ্জের ছায়াঘনিলতার তলে দাঁড়িয়েছেন তরফদার।

—বাপ!

—বলুন!

—চলো মেলেটারিকে দেখে আসি। বাপের জান, দেখবা না?

—হাসপাতালে ঢুকতে দিচ্ছে না তরফদার চাচা!

—আমরা আছি। ললিত আছে, কনভেনার। ললিতের জমানা। চলো! সঙ্গে চলো,

গেট খুলে দিবে। আমরা চেষ্টাচরিত্তির কম করছি না বাপ বুবন চৌধুরী। আমি গৃহযুদ্ধ চাই না, গৃহশান্তি চাই।

—জি!

—শ্রেণী-সংগ্রাম চাই না। শ্রেণী-সমন্বয় মুক্তির পথ। তোমার স্লোগান শুনিয়ে দাও ললিত। আমাদের পর করে দাও কেনে বাপজি! চলো, সঙ্গে চলো। মেলেটারিকে রিলিজ করব আমরা। উনি বড়ই কাতর হয়েছেন।

—আমার দেখা হয়েছে চাচা! আমি আর যাব না!

—দেখা হয়েছে! কী করে হল!

—চুরি করে!

—ও, আচ্ছা! আমার বন্দুকের কথা বললেন উনি, মাই গান! আই হ্যাড এ গান, আমার একটা বন্দুক ছিল। ইংরাজী ঠিক বলেছি বাপজি!

—জি!

—ব্যথার আঁচলের চাবি, ওয়াটার গেটের ছুড়াং! শর্ত হয়েছে, সাদা মাস্টার সবই ফিরত দিবেন। আমরা গৃহশান্তি চাই। নন-ম্যাট্রিক নাটা এই দাড়ি ছুঁয়ে কসম খায় বাপ, নবীর কিরা...

আর একদণ্ডও দাঁড়ায় না বুলবন, রাস্তায় বয়ে চলা রিকশাকে ডেকে উঠে ছুটে আসে, যেন উড়ে এসে চেপে বসে লাফ দিয়ে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এত অপমান অসম্মান, বিদ্রূপ সে সইতে পারছিল না। তারপর হাত নেড়ে বিদায় নেওয়ার ভঙ্গিতে বলে—চলি চাচাজি! পরে কথা হবে।

পার্টি-অফিসে এসে দেখে আদিত্য সিংহ দু'জন ছাত্রনেতার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। ইশারায় বুলবনকে বসতে বলে সংগঠন-সংক্রান্ত নানান পরামর্শ এবং নির্দেশ দিতে থাকল আদিত্য। ভীষণ এক কষ্টকে বুকে চেপে মাথা নীচু করে বসে রইল বুলবন।

প্রায় বিশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হয় এভাবে। ছাত্র-নেতাদের বিদায় করে আদিত্য বুলবনকে কাছে ডাকে। হাত দিয়ে বুলবনের একটি হাত স্পর্শ করে একটুখানি নাড়া দিয়ে কমরেড সিনহা বলল—কোথায় গিয়েছিলেন? আপনাকে না দেখতে পেয়ে আমি খুব বিচলিত বোধ করছিলাম বুলবন! রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো!

—হ্যাঁ, তা হয়েছিল। ব'লে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলবন।

—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

—বাবুর সঙ্গে দেখা হল আদিত্যবাবু!

—তাই নাকি? হাসপাতালে গিয়েছিলেন তাহলে! কথা হল?

—ওই আর কি! সামান্য। বাবা বাড়ি ফিরতে চান আদিত্যবাবু! তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখা যায় না। শিশুর মত অবুঝ হয়ে পড়েছেন, এত বাড়ি বাড়ি করছেন, অথচ কিভাবে যে...

এক ধরনের চাপা অশ্রু বুলবনের কণ্ঠস্বরকে রোধ করে দেয়।

—শুনুন! বলে এক নিমেষ চুপ করে যায় আদিত্য। বুলবন চোখ তোলে। তার চোখে চিকিয়ে উঠেছে অশ্রু।

—এমন করছেন কেন বুলবন!

—আমি কী করব! আমার সাধ্য কি বলুন! বাপুর কাছে গিয়ে নিজেকে আরও নিঃসঙ্গ মনে হল আদিত্যবাবু! সাহিত্যের ছাত্র আমি, জীবনানন্দ পড়েছি, এই লোনলিনেস

কিছুতেই ঘোচে না। আমার এক ধরনের বিষণ্ণতা রোগ আছে। খুব একা লাগে, আবার একা না থেকেও পারি না, স্বভাব। পার্টি করি, অথচ আমি হয়তো কমরেডশিপ বুঝি না।

আদিত্য সিংহ বুলবনের বক্তব্য শুনে ব্যথা পায়, চোখ দু'টি সহসা সরু হয়ে আসে। ঈষৎ বিমর্ষ দেখায় তাকেও। মানুষের অন্তর-গহন এই রূপটি প্রায় অগম্য মানুষের, কষ্টের সেই নিঃসঙ্গ উৎসটি দর্শন দিয়ে ধরা পড়ে কিছুটা, অপরিজ্ঞাতও থেকে যায় উৎসতল। আদিত্যর মনে হল, চন্দ্রিমার সঙ্গে বুলবন যদি কথা বলতে পারত ভাল হত। অথচ সেই প্রস্তাব প্রকাশ্যে যদি করা যায়, বুলবন তা-ও সহ্য করবে না।

আদিত্য চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে ফেলে আঙুলে চোখের পাতা দু'টি মোলায়েম করে ঈষৎ রগড়ে নিয়ে ফের চশমাটি নাকে ওঠায়। তারপর মৃদু গলায় বলে—চন্দ্রিমার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল?

—নাটা আর ললিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়। অত্যন্ত ভয় পেয়েছি আমি।

—চন্দ্রিমা কিছুক্ষণ পরে হয়তো এখানে আসবে।

—ওরা বাপুর সঙ্গে দেখা করছে। বন্দুক ফেরত চাইছে, আচ্ছা, ওরা কি পাগল! আধমরা মানুষটাকে ওরা মেরে ফেলবে এইভাবে? বাপু নাকি বন্দুক ফেরত দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। কেন দেবেন না, ওঁর যে বাড়ি ফেরা চাই! বলুন আদিত্যবাবু! যে-লোকটা গৃহযুদ্ধ চায় না, গৃহশান্তি চায়, তার কেন এত বন্দুকের নেশা! রাহুলরা বন্দুক হাতে নিলেই বুঝি সব শান্তি নষ্ট হয়ে যায়!

—যাই বইকি! আজ এস. পি.-র চোখের ঘুম চলে গেছে বুলবন! ওঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েও বউটাকে কথা বলাতে পারছে না। এস. পি. তার নিজের ছায়া দেখে আঁতকে ওঠে, ভাবে ওটা শত্রু। পিস্তল তুলে ছায়াটাকে আক্রমণ করতে যায়, যুদ্ধ এরকমই হয়। কিন্তু তারপর?

—পাগলামি!

—হ্যাঁ কমরেড। নাটাও পাগল। সন্ত্রাসের এই স্মৃতি বুকে করে তাকেও বাঁচতে হবে। বন্দুকটা ওর দরকার। ওটা নইলে বেচারি নিশ্বাস ফেলতেও সাহস পাবে না। কিন্তু অধীর বাগ সমস্ত চেষ্টাকে লুম্পেনাইজ করে দিল। সবচেয়ে বিপন্ন এখন রাহুল। মনে রাখবেন আপনার চেয়েও সে নিঃসঙ্গ। আপনার বন্ধু রাহুল, আপনি তার কথা একটুও ভাববেন না?

আদিত্যর এই উচ্চারণ বুলবনকে এমনই ধাক্কা দেয় যে, সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে ওঠে, শরীর অবধি কেঁপে ওঠে। চন্দ্রিমার রাহুলকে লেখা চিঠির কথা দিব্যপ্রভায় মনে পড়ে যায় তার। অক্ষরগুলি মনের চোখে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

কিন্তু বুলবন অদ্ভুত, সে প্রশ্ন করে অন্য একটি। বলে—এস. পি.-র বউয়ের অমন কেন হল!

—জানি না। যুদ্ধ সহজ নয় বুঝি! আমাদের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় কমরেডের কোষ্ঠীঠিকুজি জানে ওরা। ওদের খবরও আমরা পাই বইকি! চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসে। সাদা চৌধুরীকে যদি ওরা পাগল করে থাকে, ওদেরও তো তাহলে কিছুটা পাগল হতে হয়! নিয়ম। শুধু ভাবছি, অতঃপর রাহুলের কী হবে! ও কেন দেখা করছে না এখানে!

এবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বুলবন। তার মধ্যে এক চরম উত্তেজনা গুমরে উঠে। এক জিয়ন্ত তৃষ্ণা তার দেহের রোমকূপে ভরে যায়। চন্দ্রিমার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে তার।

—উঠে দাঁড়ালেন কেন ?

—চান করব আদিত্যবাবু। আমি খাব।

—ও ! চলুন।

—কোথায় ?

—প্রাণকিশোরদার ওখানে।

—না। আমি হোটেলে খাব। এখানেই স্নান করে নেব। তারপর একটু ঘুমবো।

—সেকি ! এই যে বললেন, ভাল ঘুম হয়েছে !

—না। ঘুম আমার অনেক দিন হয় না। আপনার তোয়ালেটা ব্যবহার করব।

—নিশ্চয়।

—বিকেলে আমি বাড়ি চলে যাব আদিত্যবাবু। রাত্রে ফিরে আমাকে দু'একটা মুনিষ দেখতে হবে। আমি একজন এম.এ. পাশ চাষী। মা চার বিঘে জমি বাঁধা দিয়েছে। আমরা আরও গরিব হয়ে যাব, বুঝলেন ! দারিদ্র কি সকলকে মহৎ করে, বলুন ! নজরুলের ওই লাইনটা 'হে দারিদ্র তুমি মোরে'...ঠিক বিশ্বাস হয় না।

আদিত্য আর তর্ক না করে বুলবনের পিঠে হাত রেখে স্মিত হেসে ওঠে। তারপর পার্টি অফিসের তলায় যে জলের কল আছে, তোয়ালে সাবান তেল ইত্যাদি যুগিয়ে দিয়ে বুলবনকে স্নানের জন্য বলে। এবং তারপর সে অফিস থেকে বিদায় নেয়। যাওয়ার সময় বলে যায়, সে সন্ধ্যায় ফিরবে।

স্নান করে হোটেলে খেয়ে এসে বুলবন বমি করে ফেলে। শরীরটা বেহাল হয়ে যায়। অফিসের বড় ঘরটিতে এসে আদিত্য সিংহের বিছানায় শুয়ে পড়ে। এতখানি নেতিয়ে পড়ছে কেন, ভেবে পায় না।

আচ্ছা, চন্দ্রিমা আসবে বলে গেল সিন্‌হা। কই,সে তো এল না ! দুপুর হয়েছে, কারও দেখা নেই। পার্টি অফিস আগলায় যে কমরেডটি, তারও দেখা নেই। প্রাণদা দুপুরে একবার আসেন। তাঁরও আসা হয়ে উঠল না। হয়তো কোথাও মিটিং করছেন।

অসম্ভব নির্জন এখন। জীবনানন্দের কবিতার মত গাঢ় নির্জনতা, আতার শাঁসের মত ঘন নির্জনতা। বুলবনের একবার আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়। চোখ মুদে আসে। ঘুম আসে। এই নিদ্রা বেড়ালের পদশব্দের মত নৈঃশব্দ্যেও সতর্ক। চটে যায়, আবার আসে।

—আমি মরতে পারব না। বাঁচতে হলে পার্টিকেই অবলম্বন করতে হবে। নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষা পেতে হলে মানুষের মধ্যে যেতে হবে। আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে বুলবন।

যখন ঘুম ভাঙে তখন বিকেল। পশ্চিমের জানলা বয়ে সুবর্ণ আলো এসে বিছানায় পড়েছে, বাসন্তী আভাটি কিছু মদির। ওখানে একটি লেডিজ ব্যাগ এবং একটি মেয়েলি ছোট সুগন্ধি রুমাল পড়ে আছে। রুমালটি দেখে চিনতে পারে বুলবন। ব্যাগটিও চেনা। চন্দ্রিমা এসেছে। চোখ মেলে চেয়ে থাকতে থাকতে রুমালখানি হাতের মুঠোয় চেপে ধরে নাকের কাছে ফুলের মত নেয়। চন্দ্রিমার সমস্ত গন্ধ, সব সত্তা যেন সে মুঠোয় ধরেছে।

সামনে দাঁড়ায় চন্দ্রিমা। বুলবনকে ঘুমন্ত দেখে বাইরে বেরিয়ে কোথাও রেলিং ধরে একা দাঁড়িয়েছিল। ঘরে ফিরেছে এখন।

বুলবন ব'লে ওঠার চেষ্টা করে, বাপু তোমাকে একবার দেখতে চান দোলন। কিন্তু তার আগেই চন্দ্রিমা ব'লে ওঠে—আমি চুনাখালির ওখানে একটা চাকরি পেয়েছি বুবন ! প্রাণদা ব্যবস্থা করেছেন। জুনিয়র গার্লস স্কুল। তুমি নিশ্চয় খুশি !

বুলবনের মুঠো খুলে যায়। তার সমস্ত মুষ্টিবদ্ধ ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। রুমাল ছুঁড়ে দেয় চন্দ্রিমার গায়ে এবং বলে ওঠে—আমি বাড়ি যাব দোলন, এখুনি যেতে হবে। উঠি!

॥ ৪৭ ॥

বুলবন পার্টি-অফিসের আদিত্য সিংহের বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক বদলে দ্রুত তৈরি হয়ে নেয়, এই বিকেলে সে মোহড়া চিৎপুর চলে যাবে। 'উঠি' বলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার আগেই মুষ্টিবদ্ধ রুমালখানি চন্দ্রিমার শরীরে ছুঁড়ে দেয়, সেটি মুখে এসে লাগে দোলনের।

চন্দ্রিমা চাকরি পেয়েছে শুনে মুহূর্তে বুলবনের মুখের রঙ বদলে গিয়েছে। এবং অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছে ; রুমাল ছুঁড়ে মারার ঘটনাটি বিচিত্র। চোখে এসে সামান্যই কোমল আঘাত করতে পেরেছে রুমালের গোল্লা। কিন্তু হঠাৎ এই আচরণের মানে খুঁজে না পেয়ে চন্দ্রিমা অবাক হয়ে গেছে। চোখ এতই নরম পদার্থ যে ওই নম্র আঘাতেই ছলছল করে। দণ্ডভর পরেই সে বুঝতে পেরেছে কঠিন গম্ভীর অপ্রসন্নতা এবং বক্র ঈর্ষা বুলবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

—আগে জানলে তোমাকে বলতাম না।

—কী বলতে না ?

—এই চাকরির কথা ! আমাদের পরিবারের অবস্থার কথা ভেবেই প্রাণদা তাঁর পরিচিত বন্ধুকে দিয়ে চুনাখালির স্কুলটায় যোগাযোগ করেন। তোমার হয়নি, আমার যদি হয় !

—ভালই তো হয়েছে। কিন্তু পরিবারের কথা তুলছ কেন ? পরিবার কোথায় ?

—মানে !

আর কোনও কথা না বলে প্যান্টশার্ট পরে কাঁধে কাপড়ের ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে পায়ে জুতো গলিয়ে বুলবন অফিসের বড় ঘরটি ছেড়ে বাইরের রেলিঙে চলে আসে।

পিছনে এসে দাঁড়ায় চন্দ্রিমা। ঘাড় সামান্য বাঁকা করে তাকে দেখে বুলবন বলল—পরিবার বলে আজ আমাদের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই দোলন ! নেই বলেই সেই ফ্যামিলি তুমি ছেড়ে এসেছ। ভাগ্য তোমার প্রসন্ন, চাকরিটাও হয়ে গেল।

—তুমি রুমালটা ওইভাবে ছুঁড়ে মারলে কেন ?

—অন্যায় হয়েছে ! তোমার কি লেগেছে ! সরি ! আমি বুঝতে পারিনি।

এই কথায় চন্দ্রিমার চোখে অশ্রু আরও গাঢ় হয়ে আসে। নিজেকে সামলানোর জন্য সে বিকেলে আকাশে চোখ তোলে। কতকগুলো ছোট ছোট কালো পাখির ঝাঁক বিক্ষিপ্তভাবে উড়ে চলে যায় চোখের পলকে।

অশ্রু গোপন করার জন্য চন্দ্রিমা মুখটা একপাশে কাত করে টেনে নেয়।

বুলবন আর কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। তারপর সিঁড়িতে একটি পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। অর্ধচন্দ্রাকারে রেলিং ঘুরে গেছে বলে ওখান থেকে চাইলে চন্দ্রিমার দিকে, মুখের উপর সরাসরি চোখ পড়ে। চোখের জল চকিতে সে মুছে নিয়েছে।

—বাপু তোমাকে একবার দেখতে চান দোলন ! খুব ভোরে নতুন হাসপাতালে গেলে দেখা হতে পারে।

—যা খুশি আমাকে বুঝি প্রস্তাব করা যায় বুলবন চৌধুরী ! আমি তোমাদের কে যে, ওই বুড়ো মানুষটিকে দেখতে যেতে হবে ! তোমাদের সম্বন্ধে আমার কোনও পারিবারিক আগ্রহ নেই। তবে কমরেড বলে নিশ্চয় যাব। ওটা একটা কাজ মনে করে যাব। কী বোকা আমি, এখনও তোমার সঙ্গে কথা বলে চলেছি !

—আমি ভুল করেছি ! বাবার হয়ে ওই কথাটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি ! তুমি যেও না। তাহলে আমাদের সম্পর্ক একেবারেই শেষ হয়ে গেল আজকে, এই মুহূর্তেই ?

—হ্যাঁ।

—আজ রাতটা অতএব বহরমপুরেই থেকে যেতে হচ্ছে চন্দ্রিমা মুখার্জি। প্রাণদার সঙ্গে বসা দরকার, পরে কোর্টেও যেতে হতে পারে।

—হ্যাঁ।

—কাল ভোরে বাবাকে বলে যেতে হবে, উনি অযথা প্রত্যাশা করে থাকবেন।

—বাপকে কী বলবে না বলবে, সে তোমার ব্যাপার ! তোমাদের ঘরোয়া বিষয়ের আমি কী বুঝব ! তবে হাসপাতালে গিয়ে একথা বলা, এ সময়...

—তা ঠিক। গিয়ে হয়তো দেখব বাপু নেই। বাপু আর বাড়িই ফিরতে পারলেন না। বাবা সেই আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। এখন তাহলে কাকে বলব এইসব কথা ! দ্যাখো, দু'জন দু'জনকে ত্যাগ করলে, তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি। জীবনটাও অনেক সহজ হয়। চাই কি, একটা চাকরিও জুটে যেতে পারে আমার ভাগ্যে। যাক গে। রাত দশটার দিকে আসব। তুমি থেকো।

বুলবন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলে যায়। রেলিং ধরে চন্দ্রিমা পাষাণ হয়ে যায় তন্মুহূর্তে পার্টি অফিসের দোতলায়। কতক্ষণ এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে একা। আকাশে পাখি ওড়ে। দূরের কোনও বিল থেকে হংস-বলাকারা ছিন্ন মালার মত উড়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে মালাটা জুড়ে যাওয়ার মত হয়, ফের ছিন্ন হয়ে যায়। বিশাল আকাশ এই তুচ্ছ মালিকার প্রেক্ষাপট, খেলাটি চলেছে কেন কেউ জানে না— না ওই অম্বর-নীলিমা, না ওই বলাকাশ্রেণী। মালা ছিন্ন হয়ে ভাসে। যুক্ত হতে গিয়েও হয় না। বারবার এ রকম হয়। একই কবিতার লাইন একই কবিতায় ঘুরে ঘুরে লেখেন যেমন কবিরা, মালাটা ওই একইভাবে যুক্ত হতে গিয়ে হয় না, এই বলাকা-পঙ্‌ক্তি সেই রকম বারবার দেখা যায়। আকাশে কতবার দেখা যায়।

একটি মালা চলে যায়, আর একটি শুভ্রমালিকা উড়ে আসে। আকাশ বিচ্ছেদময়, আকাশ বিচ্ছিন্ন, অথচ শান্ত তার বিশাল পটখানি, কলকাতার ভবানীপুরের ছাদের আকাশে কী নিস্তব্ধ সূর্যাস্ত এখন। মা গো ! তোমার কি একটুও মনে পড়ে দোলনকে, নারকোল গাছের চিরল পাতার ফাঁকে স্বর্ণালী আলো লেগেছে, সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে এক কিশোরীর মুখে, তখনই তো তার বুকে ভালবাসা জেগেছিল একাকী, কেউ জানত না !

চন্দ্রিমা নড়ে উঠল। তারপরই তার সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠল। সিঁড়ির শেষ উচ্চ ধাপে রাহুল দাঁড়িয়ে। বিশ্বাস হয় না। অথচ এত বিশ্বাস্য কিছুই হয় না। একটু একটু করে এগিয়ে আসে রাহুল। অতি অসহ্য ওই মূর্তিটা, খুব সাংঘাতিক ওই ছেলে। কেন এল এই দীর্ণ সময়ে, কেন আসে মূর্খের মত ? স্বপ্নে কেন এসেছিল অদম্য আকাঙ্ক্ষার ছায়া ? তার সর্বস্ব কেড়ে নিল কেন ? এত ব্যর্থ করে দেয় এরা ? এতই কষ্টের কাঁটায় বিদ্ধ করে এরা ? কমরেড সি.এম.-এর পাহাড়ি স্ফুলিঙ্গ এভাবে ছিটকে পড়ে হেথা, কী ঘর্ষণে কার হৃদয়কে পুড়িয়ে মারে এভাবে !

এত হয়, এভাবে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে, তবু এ আলো উদ্ভ্রান্ত আগুন বই তো নয়, কেন তাহলে একে আমি অপমান করব না ? বিভ্রান্ত এই যুবককে কেন ক্ষমা করব ? স্বপ্নের জ্বালা, আকাঙ্ক্ষার অবিমৃষ্য বালি, চক্ষের শূল। চন্দ্রিমার চোখ জ্বলে ওঠে। ক্রোধের বহ্নির মত জ্বালা করে ওঠে।

স্থাণুর মত চন্দ্রিমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ম্লানমদির বিষণ্ণ আলোকে লিপ্ত দেখে, সর্বস্বান্ত দীনতা দেখে, বিহ্বল দেখে রাহুল কেমন ভীত স্বরে ডাকে

—বউদি !

—কেন এসেছ ? কেন আসো এখানে ! কী প্রয়োজন তোমার ? কার কাছে ? কেন ?

—বউদি ! এভাবে বলছ কেন ! তোমার কী হয়েছে ! আমি আসব না ?

—না।

—আদিত্যদা নিষেধ করেছেন ?

—না।

—তাহলে তুমি কেন মানা করছ বউদি !

—এখানে আমি একা ! অফিসে কেউ নেই। তুমি চলে যাও !

—তোমার কাছে আমি একা আসতে পারি না ?

—তুমি বিপজ্জনক রাহুল ! তোমাকে আমার সহ্য হয় না। যাকে মানুষ ভয় করে, তাকে ঘৃণাও করে, তা তুমি জানো না ?

—তুমি এত দুর্বল, সেকথা জানতাম না মিসেস চৌধুরী !

—আমাকে ব্যঙ্গ করছ বুঝি ! তবে শোনো, আমি চৌধুরী নই, আমি মুখার্জি। তোমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমি কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করি না।

—বউদি ! ইটস টু মাচ। তুমি যে চিঠিখানা আমাকে লিখেছিলে, ওটা দাও, আমি চলে যাব।

—আমি কী করে দেব ! তাছাড়া ওই চিঠি কারও কোনও কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি না

—তুমি তা মনে না করতে পার। কিন্তু ওটা জরুরি একটা চিঠি। ওটা দরকার।

—কী হবে !

—বললাম তো ! তুমি [illegible]বে না ?

—নেই। তুমিই হারিয়ে ফেলেছ ! এর আগেও চেয়েছ। আমি কোথা থেকে দেব !

—তাহলে লিখে দাও !

—ওই চিঠি দু'বার লেখা যায় না ! আজ ওই মনটাই নেই। কেন লিখব, কাকে লিখব ! তুমি কে যে, চিঠি লিখতে যাব ! যাও, চলে যাও এখান থেকে ! পুলিস এসে এই পার্টি-অফিস রেইড করুক আমরা চাই না।

—তোমার নেতৃত্ব একথা বলেছেন ?

—না। আমি বলছি। আমি একটা চাকরি পেয়েছি, নতুনভাবে আমি জীবন শুরু করতে চাই।

—চাকরির প্রায় সব টাকাই তো পার্টি-ফান্ডে দিয়ে দেবে, নাকি ? বুলবন জানে ?

—কী ? ও, চাকরির কথা ? হ্যাঁ, একটু আগেই শুনেছে। ও ছিল এখানে ! পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ?

—না। আমি গলি ধরে ধরে অনেক ঘুরে এসেছি।

—চলে যাও ! আর এসো না।

—বুলবন কী বলল ?

—ওর কাছেই জেনে নিও !

—তোমাদের জটিলতা কিসের বউদি !

—আমি কিন্তু এই চাকরির সুযোগ হারাতে চাই না রাহুল ! তুমি চলে যাও ! ভদ্রভাবে বলছি, অত্যন্ত বিনীতভাবে বলছি তোমাকে। যতবার তুমি কাছে আসো আমার সর্বনাশ হয়।

—জানি, এই মাটিতে আমার আশ্রয় নেই। চলি। একটা কথা শুধু বলে যাই, মোহরকে আমি সত্যি ভালবেসেছিলাম বউদি, তুমি একথাটা ওকে বলে দেবে ?

—ভালবাসার মাধ্যমটা কি আজ নির্ভরযোগ্য রাহুল ! আমি তো ভালবাসতেই শিখিনি ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

—প্রণামপুর। ওখানে গিয়ে আত্মগোপন করতে হবে। আমি অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারি। তোমাদের আর ডিসটার্ব করব না। আদিত্যদাকে ব'লো, আমি এসেছিলাম। আই অ্যাম এ ডিসটার্বিং এলিমেন্ট, যেখানে যাব হয়তো কারও সর্বনাশ হবে। আচ্ছা, মোহর কি এখনও সাদা সালোয়ার কামিজ পরে ? তোমার একটা সাদা রঙের ফুপির ফুলতোলা চাদর ছিল, সেটা এখনও আছে ? বুলবন গায়ে দিত !

—হ্যাঁ ! বলে মাথা নাড়তে গিয়ে চন্দ্রিমার গলা বুঁজে যায় এবং ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। কান্নার কোনও শব্দ করে না সে। সেই ঝরে পড়া প্রতিটি অশ্রুর বিন্দু পতিত হতে দেখে রাহুল। মাথা নীচু করে। অত্যন্ত ধীরে পা বাড়ায়। তার যেন আর কিছুই বলার থাকে না।

সিঁড়ির চাতালের কাছে থমকে দাঁড়ায়। প্রথম ধাপটিতে ডান পা নামায়, তারপর চোখ তোলে।

চন্দ্রিমা বিদীর্ণ হয়ে যায়। চাপা আর্তসুরে ব'লে ওঠে—আজ রাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে রাহুল ! তুমি দেখে যাবে না ?

চমকে উঠে রাহুল থেমে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ অবস্থায় অনড় থাকে এবং চোখ নামায় তারপর।

—কত আর বিচ্ছেদ সইব বউদি ! আর পারি না ! বলে এক ধাপ নেমে পড়ে রাহুল। প্রায় এক মিনিট থেমে পরের সিঁড়িতে নামে। কথা বলে না অতঃপর। অর্ধচন্দ্রাকার রেলিং ধরে একটু একটু সরে যেতে থাকে সিঁড়িরই দিকে চন্দ্রিমা।

—তুমি দেখে যাবে না ! আবার একই আকুলতা ভেসে ওঠে।

—কবি অন্ধকার মাঠের মধ্যে নিজেকে গুলি করল। শব্দ শুনলাম। ব্যস !

—একথা এখন কেন বলছ ?

—মনে পড়ছে যে !

আবার একধাপ নেমে যায় রাহুল। ফের ব'লে ওঠে—মুমতাজ আলি চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বউদি ! মেহেদিপাতার স্মৃতি ছাড়া কিছুই রইল না ! এত সব মৃত্যু বউদি ! এত সব কঠিন মৃত্যু ! এ রকম ছিন্নভিন্ন করা মরণ, তারপর কোনও ভালবাসার বিচ্ছেদ মানায় না। তোমরা সংবরণ কর, কেউ কাউকে ফেলে দিও না !

—রাহুল !

—হ্যাঁ বউদি ! ন্যালা যখন মরে গেল, ওকে পাহারা দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল ললিত,

শশাঙ্ক ; হাওয়া বিবি কাঁদতেও পারেনি। অকাট্য মৃত্যু চারিদিকে। মৃত্যুই মারছে যখন, কেন তাহলে ভালবাসাকে মারবে! সত্যিই মানায় না। একটুও মানায় না।

বলতে বলতে গলা ধরে আসে রাহুলের। আরও একধাপ সিঁড়িতে নেমে আকাশে চোখ তোলে। সোনালি আভায় ভেসে চলেছে হংসমালিকার হার, দু'টি মুখ একত্রে টেনে আনলেই আকাশ যেন সেটি গলায় পরতে পারে। দু'টি মুখ বিযুক্ত হয়ে ভেসে চলেছে, হঠাৎ মাঝখান থেকে ছিন্ন হয়ে গেল, তিন তিনটি টুকরো হয়ে গেল তারপর। অবশেষে আরও অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল, একটি অংশে মাত্র দু'টি হাঁস পাশাপাশি উড়ে যেতে যেতে দু'টি দিকে আলাদা হয়ে ভেসে চলল। কিছু পরেই সহসা চোখে পড়ল একটি নিঃসঙ্গ হংসবলাকা ধেয়ে চলেছে, ওর কোনও সঙ্গীসাথী নেই, অনন্ত আকাশে সে একা। প্রবল চেষ্টায় সে উড়ছে।

কায়মনোবাক্যে উড়ে যাচ্ছে পাখিটা। উড়ে যেতে যেতে এরা সাধারণত ডাকে না। কাজের সময় কথা কিসের, পরিব্যাপ্ত আকাশে, নীলিমায় কথা কিসের, চলচঞ্চলতার ডানা বিধূননে কথা কিসের! কিন্তু এই পাখিটা আশ্চর্য এক আর্তনাদ করে উঠল। ক্রো ক্রো ক্রো।

বিস্মিত বেদনায় ভরে গেল হৃদয়, অদ্ভুত মায়ায় বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল রাহুলের।

—অমন করে ডাকছে কেন? ওরা কি উড়ে যেতে যেতে ডাকে! চন্দ্রিমা অবাক হয়ে বলে উঠল।

রাহুল বলল—অত উপরে উঠে ওদের ডাকতে শুনিনি। একা হয়ে হয়তো ডেকে উঠল।

—তুমি যেও না রাহুল!

একটু পিছনে ঘুরে উপরে দাঁড়িয়ে থাকা বউদিকে একবার দেখল রাহুল। কথা না বলে আরও এক ধাপ নেমে গেল। সিঁড়ির নীচের ধাপটির দিকে চাইল।

—বাপুকে দেখবে না? আমাকে উনি দেখতে চান। কাল ভোরে আমি যাব। খুব ভোরে যেতে পারলে দেখা হবে। হাসপাতালে।

—রাত্রে তোমাদের যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তারপর তুমি বাপুর সঙ্গে দেখা করতে পারবে?

—হাঁসগুলো কোথায় যাচ্ছে রাহুল?

—জানি না। বলে রাহুল বাকি ধাপগুলি ভেঙে একেবারে তলায় চলে যায়। আর ওকে দেখা যায় না।

চন্দ্রিমা দ্রুত নীচে নেমে চলে আসে। রাস্তায় নেমে দেখে সবেগে রাহুল হেঁটে চলেছে অপ্রধান সড়ক ধরে। গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছুটে যায় চন্দ্রিমা। রাহুলকে ফিরিয়ে দিয়েছে, অপমান করেছে, পার্টি-অফিসে আসতে মানা পর্যন্ত করেছে। তার কাছে একান্তে দেখা করা নিষিদ্ধ করেছে চন্দ্রিমা নিজেই। হাঁসটা কেঁদে উঠল কেন? ও তার দলটিকে ডেকে উঠল। ও কেঁদে উঠলেও তার অগ্রসর সঙ্গীরা শুনল না। ওভাবে পিছিয়ে পড়ল কেন? একা হয়ে গেল কেন? রাহুল কখনও হংসবলাকাকে আকাশে ওই রকম ডাকতে শোনেনি।

এখন কোথায় যাবে রাহুল? প্রণামপুরে গিয়ে আত্মগোপন করবে! এই একটা ভাবনা চন্দ্রিমাকে ছুটিয়ে মারে। সামনের আর একটা গলির মোড়ে বাঁক নেয় রাহুল। ওকে বাঁক

নিতে দেখে চন্দ্রিমা আরও ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ঠিক তখন অতি ভয়ংকর জিঘাংসার দৃশ্য দেখা যায়। অস্ত্র হাতে, হাত-বোমা, পিস্তল, নাঙা দীর্ঘ হেঁসো এবং তরোয়াল হাতে উন্মত্ত বেগে ধেয়ে আসে ওরা। কাউকে চেনে না চন্দ্রিমা। বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে রাহুল। দলটার সামনে সামনে অত্যন্ত লম্বা একটু ঢ্যাঙা সড়িঙ্গে শ্যামলা বদখদ দেখতে এবং সহিংস আর আতঙ্কিত লোক উদ্ভ্রান্তের মত প্রাণের ভয়ে ছুটে আসছে সামনের গলি থেকে। গলি সংকীর্ণ, দীর্ঘ, গোধূলি-সন্ধ্যা ঘনায়মান। সারা পথটায় আলো নেই।

বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছিল রাহুল, ঠিক সেই গলিতে ঢুকে পড়ল ওই মহা-আতঙ্ক-ধাবিত সড়িঙ্গে মানুষটা। সশস্ত্র উন্মত্ত তীব্র হিংস্র দলটা রে রে করে তেড়ে গেল সেদিকে। সভয়ে বোকার মত এক মিনিট দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দ্রিমা। দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

যেন বা জবাই হওয়ার সুতীব্র চিৎকার শোনা গেল। দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়া চন্দ্রিমা ধীরে ধীরে নিজের চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে বাঁকের মুখে এসে ঝুঁকে দেখে বাঁ দিকের গলিটাকে। অনেকখানি দূরে বিক্ষত দেহ তখনও কাটা পশুর মত মাটিতে পড়ে চিতিয়ে উঠছে, নড়ে নড়ে খাড়া হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে। পারছে না। পড়ে যাচ্ছে কাত হয়ে। ওটা কি তাহলে রাহুল ?

চন্দ্রিমা প্রাণের ভয়কে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে। জানে না, দলটি আবার ওদিক থেকে ছুটে আসবে কিনা ! আবার কী ঘটবে সে জানেই না। ওর বুদ্ধি মাত্র সেইটুকু কাজ করে, যা তাকে চালিত করে সামনে ; রাহুল নয় তো ! দেহটা কাত হয়ে ড্রেনের দিকে সরে গেল।

ওকে ছোরা মেরেছে। হেঁসো মেরেছে কাঁধে। চন্দ্রিমা প্রাণের কোনও এক তীব্র দুর্বোধ সাহসে বিক্ষত লোকটির কাছে আসে।

—কে তুমি ?

—গুঞ্জ ! জল। জল দাও। দিদি গো ! মা গো ! বড় পাপ মা !

সেই এক অমানুষিক কাতরতা। কী করবে চন্দ্রিমা ! জল কোথায় পাবে ? জল কি দেবে তাকে ! এই লোকটাই কি মুমতাজকে শেষ করে দেয়নি ? যদি ঘটনা অন্য কিছু হয় ? কী হয় ঘটনা সে তো জানে না। মৃত্যুর আগে কেউ জল চাইলে মানুষ কী করে ? কিন্তু এ লোকটা যদি মানুষ না হয় ? এ যদি নরখাদক হয় ? এ যদি বিষাক্ত সরীসৃপ হয় ! মানুষকে কখনও আকৃতি বা অবয়ব দিয়ে শনাক্ত করতে নেই।

না। মুখ একবার ঘুরিয়ে নেয় চন্দ্রিমা। জল দেবে না। এর মৃত্যু ত্বরান্বিত হোক। কাতরে উঠল লোকটা। চন্দ্রিমা দূরে একটা জলের কল দেখতে পেল। সেই দিকে ছুটে যাচ্ছে কেন, ছুটে এসে নিজেকে প্রশ্ন করে চন্দ্রিমা। তবু সে টিউবওয়েলের ডাণ্ডি ধরে চাপ দেয়, তারপর আঁজল পাতে। জল ধরেছিল দু'হাতে, এমন সময় দোতলার কোনও একটি জানলা থেকে অদৃশ্য কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে ভেসে এল—এই মেয়ে ! ওখানে কী করছ ! পালাও। থেকো না। পুলিস আসছে ! তুমি প্রাণকিশোরের পার্টি কর, তাই না ? কেন বোকামি করছ ?

আঁজলের জল ফেলে দিল চন্দ্রিমা। দ্রুত ছুটে যাচ্ছিল। একবার দোতলার একটি দু'টি তিনটি জানলার দিকে চাইল। কাউকে দেখতে পেল না। হঠাৎ মনে হল, গুঞ্জ রাহুলকে মেরে ফেলত। তাহলে তারই মুখে জল দিতে যাচ্ছিল কেন সে ? তার মধ্যে কি খুবই একটা বোকা মানুষ বাস করে ! সন্ধ্যা আরও একটু ঘন হয়েছে। তবু দেখা গেল, গুঞ্জ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে কী একটা জিনিস ধরে আছে ! সাংঘাতিক ভয়াবহ মনে

হল সেই দৃশ্য। কী সাধ্যে উঠে দাঁড়ায় গুঞ্জ! অতি হঠাৎ তারপর দু'জন পুলিস ছুটে এল সামনে। চন্দ্রিমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে। সম্মুখে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল। এবং অস্পষ্ট কী বুঝে অস্ত্র নামিয়ে ফেলল।

—কে ওটা? আপনি এখানে কী করছেন? পুলিস গর্জায়। এবং সন্ত্রস্ত থাকে।

—ওটা গুঞ্জ মস্তান। ব'লে ওঠে চন্দ্রিমা। ক্ষত-বিক্ষত প্রাণ নিবু শিখার মত দপ করে জ্ব'লে উঠেছে সম্মুখে, শেষ একটা ঝাঁকুনি-সম্মত বেগে।

দু'টি হাত আকাশে তুলে টলতে টলতে গুঞ্জ এদিকে আসছে। হাতে ধরা জিনিসটা। চন্দ্রিমা বাঁকের আড়ালে দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ে। অতর্কিতে একটা গুলি ছুটে এসে একটি পুলিসের বুকে বিঁধে যায়। তৎক্ষণাৎ পুলিসটা কঁকিয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সহযোগী পুলিসটি রিভলবার ছুঁড়ে দেয় গুঞ্জর বুকে।

—শালা! নেমকহারাম! পুলিস আর্তনাদ করে। গুঞ্জ এমন করবে কে ভেবেছিল!

ওইটুকুই কেবল শুনেছিল চন্দ্রিমা। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। পুলিসকে হতভম্ব করে দিয়েছিল গুঞ্জ। মৃত্যুর আগে অতি ঘৃণ্য জীব তার অস্ত্রের এক সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার সম্পন্ন করেছিল। কেন সে পুলিসকেই গুলি করল চন্দ্রিমা বুঝে পেল না। গুঞ্জ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কিনা আর চেয়ে দেখেনি সে। আদিম মানুষের কাহিনী এরকম যে, মৃত্যুর আগে হাতে অস্ত্র ধরে সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে; নিজে ব্যবহৃত হতে হতে অবশেষে অস্ত্রের যথার্থ ব্যবহার শিখে যায়। এবং তার মৃত্যু হয়।

সমস্ত শরীর অতিশয় উত্তেজিত ছিল। কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারবার। পুলিসের সঙ্গে মস্তানের এমন অসূয়া-সম্বন্ধ, এমনই অন্তর্ঘাত কল্পনা করে শিউরে উঠছিল চন্দ্রিমা।

সমস্ত পার্টি-অফিসে কমরেডদের মধ্যে চাপা উদ্বিগ্ন উত্তেজনা চারিত হয়ে গেছে। রাত্রি দশটা পর্যন্ত সেই উত্তেজনা নানান ব্যাখ্যায় মন্তব্যে বিশ্লেষণে অপ্রশমিত থাকে।

—তাহলে রাহুলের কী হল! কোথায় গেল ছেলেটা! শঙ্কাঘন আর্তসুরে ব'লে উঠলেন প্রাণকিশোর।

চন্দ্রিমা কাঁপা গলায় ব্যাকুল হয়ে আদিত্যকে শুধায়—আমি কেন গুঞ্জকে জল দিতে চেয়েছিলাম আদিত্যবাবু?

আদিত্য স্মিত হেসে ফেলে। তারপর বলে—বাংলা ভাষায় একটা চমৎকার শব্দ আছে। বিভ্রম। তাই হয়েছে।

—কেন?

—ওটা হয়। মানুষের আকৃতি দেখে মানুষ ভুল করে ফেলে। জীব মাত্রেরই হয়তো মরবার আগে তেষ্টা পায়। একটা হিংস্র শ্বাপদেরও পায়। আবার মানুষ যে, যদি রাষ্ট্র তাকে পশু বানিয়ে ফেলে, তারও মৃত্যুর আগে তৃষ্ণা এবং মনুষ্যত্ব জাগে। ওটা একটা আশ্চর্য মুহূর্ত। কমরেড চন্দ্রিমা, আপনি যদি এই ধরনের রাজনীতির মধ্যে না আসতেন, আপনার এই যে অভিজ্ঞতা হল, সেটা হত না! আমরা বিশ্বাস করি, প্রসেস মেক্‌স এ ম্যান। অনেক ক্ষেত্রে প্রসেস মানুষকে মানুষ না ক'রে পশু করে। এমনকি কমিউনিস্ট কালচারের মধ্যে থেকেও ভুল প্রক্রিয়ার উপর্যুপরি ব্যবহারে শোধনবাদী রাস্তায় একজন মানুষ নরকগামী কীটে পরিণত হতে পারে। যাক গে। আপনার কোনও দোষ নেই।

—গুঞ্জ কেন পুলিসকে গুলি করল?

—বলেছি সেকথা। হঠাৎ মনে হয়েছিল, পুলিসই তার শত্রু। ও বলেছে, বড় পাপ মা! সে ভারি অদ্ভুত মোমেন্ট। ওই ভাবের ঘোর! কিন্তু ওই অবস্থাটি, ওই যে ভাবোদয়

হল, ওটা কখনও স্থায়ী হত না। বেঁচে উঠে সে আবার রাহুলকেই হয়তো গুলি করত। কী করত বলা যায় না! এই যে অন্ধকার দেশটা, গুঞ্জর তৃষ্ণা এবং হঠাৎ জাগা মনুষ্যত্বকে সম্মান দিত না। আমরাও হয়তো দিতাম না। কারণ তাকে আমরা বিশ্বাস করতাম না।

—ও সেকথা বুঝেছিল!

—হতে পারে।

—তাই সে পুলিসকেই গুলি করল।

—মে বি।

প্রাণকিশোর কী যেন অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছিলেন। আকস্মিক ধুতির কোঁচা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলতে ফেলতে উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারটা শব্দ করে সামান্য ঠেলে দিলেন। বললেন—আমি একটু যাচ্ছি এখন। বাড়ি হয়ে আসছি। যার যেখানে যাওয়ার চলে যাও। দোলন থাক। ওকে পরে গোরাবাজার পৌঁছে দিতে হবে। তোমরা সাবধানে যেও। কে-কে-কেয়ার করে যেও।

চন্দ্রিমাও উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে প্রাণকিশোর বিস্ময় প্রকাশ করলেন—তুমি কেন উঠে দাঁড়ালে?

—আমি আপনার সঙ্গে যাব প্রাণদা!

—কেন!

—আমার ভয় করছে!

—সেকি!

—হ্যাঁ।

—কেন? এখানে গুঞ্জ আসবে না।

—ও আসবে!

—কে?

—দশটা বেজে গিয়েছে। নিশ্চয় আসবে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রাণকিশোর। এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—এসো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে যেতে যেতে প্রাণকিশোর চন্দ্রিমাকে বললেন—খানিক আগে, তখন আমি বাড়িতে, গুঞ্জর স্ট্যাবড হওয়ার ঘটনা তখনও শুনিনি, বুলবন এসেছিল। হঠাৎ এসে আমার কাছে বিয়ের ঘড়িটা চাইল। অবাক হলাম, কিন্তু কোনও প্রশ্ন না করে ঘড়িটার জন্যে পার্টি অফিসে বেরিয়ে এসে পথে নেমেই শুনলাম, গুঞ্জ ইজ ডেড। সন্ধ্যার সময় স্ট্যাবড হয়েছে। পুলিসও মরেছে একটা। আমি বুলবনকে বসিয়ে রেখে এসেছি। অফিসের আলমারিতে ঘড়িটা রেখেছিলাম।

—আমি যাব না প্রাণদা!

—এসো!

—ওর সামনে যাব না আমি!

—গেলে তোমার ভালই হবে চন্দ্রিমা। ভয় পেও না। আমি আছি। কাম।

প্রাণকিশোর বাড়িতে পৌঁছে শুনলেন বুলবন চলে গেছে। বিষম আশ্চর্য হলেন ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। বললেন—ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে।

চন্দ্রিমা ফুঁপিয়ে উঠল। এবং পর মুহূর্তেই কাঠ হয়ে গেল।

দণ্ড কতক বাদেই প্রাণকিশোর চন্দ্রিমাকে সঙ্গে করে পথে নামলেন। মোড়ে এসে

দেখলেন রিকশা নেই। পথ অত্যন্ত নির্জন। সারা শহরে গুঞ্জর মৃত্যুর ঘটনা আরও ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিস মোতায়েন হয়েছে। রিকশা না পেয়ে হেঁটেই চলেছেন প্রাণকিশোর।

—আমি খালি রাহুলের কথাই ভাবছি চন্দ্রিমা! হাঁটতে হাঁটতে বলে উঠলেন প্রাণকিশোর। তারপর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন—ওর মেসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। আমিই যাব। তুমি সমিরের বাড়িতে গিয়ে দরজা এঁটে চুপচাপ থাকবে, পাশের বাড়ি থেকে কৃষ্ণাকে ডেকে দেব, রাত্রে ও তোমার কাছে থাকবে। আর শোন, যেই ডাকুক, না বুঝে শুনে দোর খুলবে না। এখানেও হানা দিতে পারে। আমার ধারণা রাহুলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

—বুলবন কোথায় গেল তাহলে! বলে ওঠে চন্দ্রিমা।

প্রাণকিশোর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—তুমি ওর কথাও ভাবছ, ভারি আশ্চর্য!

—ও যদি হানা দেয়! বলে ফেলে চন্দ্রিমা।

প্রাণকিশোর এবার চমকে ওঠেন। ফের চলতে শুরু করেন। এক মিনিট চুপচাপ হেঁটে এসে বলেন—দোর খুলবে কিনা তা তোমারই ভাবনা। ভেবে পাচ্ছি না, ও কেন ঘড়িটা হঠাৎ চাইতে এল! চলেই বা গেল কেন! দ্যাখো, সিদ্ধান্ত সহজ নয়, কিন্তু তোমাদের সেপারেশনের ব্যাপার তোমরাই ডিসাইড করবে। তবে বুলবন আশ্রয় চাইতে পারে, হানা দেবে কেন?

—আমি দোর খুলব না প্রাণদা, কিছুতেই না!

—বেশ। প্রাণকিশোর চলার গতি সামান্য বাড়িয়ে দিলেন। নীরব রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর সহসা বললেন—যদি রাহুল আসে!

—ওকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভ্যাস আমার আছে। আমি পারি। ওকে আশ্রয় দিলে আমাদের পার্টি জড়িয়ে পড়বে, ওকে সেকথা বলেছি আমি!

একথা শুনে রাস্তার উপর স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়লেন প্রাণকিশোর। তারপর ঈষৎ বিরক্তির সুরে বললেন—মোটেও ঠিক করনি চন্দ্রিমা! অন্যায় করেছ! ও আর আসবে না তাহলে! খুব খারাপ হল! খুবই অন্যায় হয়ে গেল!

রাতভর সূচীতীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হৃদয়ের তামাম স্থানে বিঁধে বিঁধে যায়। আর কাঁদতে পারে না প্রাণ। রক্তে জেগে ওঠে বিভীষিকা। কবির বিদ্ধ হৃদয়ের রক্ত রাহুলের জামায় লেগেছিল, সেই শোণিত আপন হাতে ধুয়েছে চন্দ্রিমা। জেগে থাকতে থাকতে ভয়ে চিৎকার করে উঠল সে। তারপর মূক হয়ে গেল। চোখের তলায় কালি জমল সারারাত।

তখনই সেই রাতে হাসপাতালের জানলা দিয়ে একটি হাত এগিয়ে এল সাদা চৌধুরীর দেহে।

সাদা বললেন—বাবা! কথা দে, গা ছুঁয়ে কসম খা ছোট খোকা!

মণির অন্ধকারলিপ্ত কালো মুখ, চোখদু'টি যেন অন্ধের মত বিহ্বল। তার হাত কাঁপছে, বাপুকে সে স্পর্শ করতে পেরেছে। কোথা থেকে রাত্রিজাগা আলো এসে পড়েছে ওর পিঠে। হাসপাতালের পিছনে লুকিয়ে এসে জানলার তলে দাঁড়িয়ে গা ঠেলে তুলেছে বহু কষ্টে। উদ্বিগ্ন, ত্রস্ত, কালো, আদিম একটা মুখ জেগে উঠেছে; সাদা বললেন—বন্দুকটা রেখেছিস খোকা! আমাকে ছুঁয়ে বলো। রাখো নাই?

—জি, বাপু!

—ফিরত দিবা।

ফেরত শব্দটি ফিরত উচ্চারণ করলেন সাদা চৌধুরী। দেবে, না বলে দিবা উচ্চারণ ঘটালেন।

তারপর বললেন—আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা মণি বাপা!

মণি বলল—তোমার কসম বাবু! বলেই ঝপ করে পড়ে গেল নীচে। কাঁচ বিঁধে গেল।

কাঁচ ছাড়িয়ে ফেলে মণি রক্তঝরা পায়ে মধ্যরাতে বহরমপুরের সড়ক ধরে একা হেঁটে চলল। ওর বুকে কোনও ভয় ছিল না। ওর মনে কোনও নিঃসঙ্গতার অনুভূতি ছিল না। কেননা সে তার বাপুকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত মণি সমির মামার বাড়িতে এসে কড়া নেড়েছিল। দু'বার মাত্র নাড়িয়ে দিয়ে আর অপেক্ষা করেনি।

পাগলের মত ছুটে এসে দুয়ার খুলে চন্দ্রিমা দেখেছিল, কেউ নেই। রাস্তার কুকুর কাকে যেন দূরে তাড়া করে ছুটে যাচ্ছে।

॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রিমার বারবার মনে হচ্ছিল, কড়া নাড়ার স্পষ্ট শব্দ সে শুনেছে। ভুল শোনেনি। আকাশে চন্দ্রালোক ছিল, হালকা এবং ধূসর মেঘের আঁশের আড়ালে ঘষা চাঁদ রাত্রির আবহে বয়ে আনছিল গঙ্গাস্নান করা মৃদু উতলা হাওয়া। অস্বচ্ছ চাঁদনি, সেই আলোর রহস্যে তেড়ে ছুটে যায় একদল কালো কুকুর, কাকে তাড়া করে যায়!

বুলবনকে তাড়া করে যায়, রাহুলকে তাড়া করে এবং হয়তো মণি এসেছিল, তাকেও ধাওয়া করেছে। চন্দ্রিমার কাছে ওরা আর পৌঁছাতে পারে না। ওরা কি এতই বোকা যে, তাকে সাহস করে একবার ডেকেও উঠল না! ডাকল না, অথচ এল কেন তাহলে! চোরের মত এসেছিল কেউ। অপরাধীর মত কড়া নেড়েছিল।

সমস্ত রাত ঘুমাতে পারেনি চন্দ্রিমা। জেগে বসে থেকেছে, শুয়ে জেগে থেকেছে। পাশে কৃষ্ণা। সে এতই ঘুমকাতুরে যে, বিছানায় পড়ে কি মরে। যে-কোনও স্থানে, যে-কোনও অবস্থায়, যে-কোনও সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারে। ইচ্ছেয় ঘুম, অনিচ্ছেয় ঘুম। ঘুমের ব্যাপারে ওর ইচ্ছে অনিচ্ছে সমান কথা। মিটিঙে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ নেই, তিন মিনিট এক ফাঁকে ঘুমিয়ে নিল। মজার ব্যাপার, এই মেয়েটির দুঃখবোধ একটু কম। তাই বলে সে নিষ্ঠুর নয়। বরং মায়াদয়া বেশি।

ঘুম থেকে তাকে জাগিয়ে তুলে এনে এ-বাড়িতে রেখে গেছেন প্রাণদা। ও যখন এল ঘুমন্ত অবস্থাতেই এল, ঘুমিয়ে হেঁটে চলে এল। ঘুমন্ত চোখমুখ, চেয়ে আছে আবার চেয়েও নেই, তাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে কৃষ্ণা, ওই অবস্থায় যত কথা বলবে, পরে আর এক বর্ণও মনে করতে পারবে না। এই রকম মানুষের সঙ্গে কথা বলাও যা, না বলাও তাই।

আদিত্য সিংহ রসিকতা করে ওকে ঘুমরানী বলে ডাকে। এবং মাঝে মাঝেই জওহরলাল নেহরুর চার ঘণ্টার অনধিক ঘুমের কথা তুলে বলে, আরাম হারাম হ্যায়। তখন কৃষ্ণার হাসি মুখ গম্ভীর করে ফেলার দৃশ্যটি কৌতুকপ্রদ।

কৃষ্ণা ঘুমিয়ে রইল, জেগে রইল একা চন্দ্রিমা। ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমনোর কথা ভেবেছে, কিন্তু চন্দ্রিমার কাছে ঘুমের বড়ি ছিল না। ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমনোর চেষ্টা

পার্টি-কমরেডরা করে বলে চন্দ্রিমা কখনও শোনেনি।

চিন্তার সাহায্যেই কি ঘুমকে আকর্ষণ করা যায় না! যদি যায়, তাহলে কার্ল মার্কসের মাথার চুল শিশুপুত্রের বিয়োগে রাতারাতি কেন সাদা হয়ে গিয়েছিল, বিনিদ্র রাত্রি তাঁরও তো কেটেছে! সাদা চৌধুরী হয়তো কত রাত ঘুমাতে পারেন না। রাহুলের কি ঘুম হয়? অথচ মার্কস নয়, মার্কসবাদের বিচার অনুযায়ী ঘুমকেও নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে একজন কর্মী যথার্থ কর্মী হয়ে উঠতে পারে না। জওহরলাল একজন মার্কসবাদীর কাছেও সদর্থে ঘুম এবং জাগরণের বিষয়ে আদর্শ।

মার্কসবাদ অনেক পুরনো আদর্শকেও ফেলনা মনে করে না। কমরেড জি. এস. এমনও বলেন যে, শত্রুর কাছে থেকেও মানুষের শিক্ষণীয় থাকতে পারে। নাথুরামের কাছেও আমরা নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগ শিখতে পারি। শুধু তাঁর আদর্শ এবং অস্ত্র বর্জনীয়। যে-শত্রু তোমাকে হত্যা করতে এসেছে, মৃত্যুর মুহূর্তেও তার কাছে তুমি শিখতে পার!

চন্দ্রিমা ভেবে চলেছিল এইভাবে। কেননা তার ঘুম আসছিল না। কমরেড সিন্‌হা অজস্র গল্পচ্ছলে নানান আদর্শের কথা, শিক্ষার কথা বলে। বলে এমন ভাবে যে, তা যেন গল্পই, শক্ত কোনও তত্ত্ব যেন সেখানে নেই। তত্ত্বকে লুকিয়ে রাখাই, প্রকটিত না হতে দিয়ে তার নির্যাসকে কথায় মিশিয়ে দেওয়াই, তত্ত্ব-প্রচারের সবচেয়ে বড় কৌশল। উদাহরণ, রামকৃষ্ণদেব পরমহংস ঠাকুর। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই আদিত্য রামকৃষ্ণের নামটি উচ্চারণ করে।

একটি কাহিনী আদিত্যর খুবই প্রিয়। গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগের ছবিটি। ওটা সে বলবেই। ভাষাটিও তখন অধিক স্বাদু হয়ে ওঠে। বধূটি ঘুমায়ে রয়, কোলের কাছে শিশুপুত্রও ঘুমন্ত। বউয়ের একটি হাত এমনভাবে তার নিজেরই কপালে কাত হয়ে অলস মুদ্রায় পড়ে রয়েছে এবং আড় হয়ে এসে শিশুর মুখটাকে আড়াল করেছে, বাইরে জ্যোৎস্না।

এই ছবিটা নিখুঁতভাবে বলার পর ফের বলবে 'বধূটি ঘুমায়ে রয়। বড়ই সুখী সেই ঘুমন্ত মুখটা, বড়ই সুনিদ্রা তখন।'

তারপরই বলবে, চাপা গলায়, 'চারিদিক নিরিবিলি। বাইরে জ্যোৎস্না। কেউ জেগে নেই। বিশ্ব চরাচর ঘুমিয়ে পড়েছে।'

হাওয়া বইছে মৃদুমন্দ। এই কাহিনী আদিত্যকে শুনিয়েছিলেন তার সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। নিরিবিলি শব্দটি তাঁরই বর্ণনার বিশেষত্ব ছিল। বাইরে জ্যোৎস্না। রক্তে বানডাকার মত জ্যোৎস্না। ফিনিক দিচ্ছে, ঝলমল করছে। তীব্র। দোরের কাছে এগিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ। মনে হল একবার তিনি শিশুর মুখটা দেখে যাবেন, শেষ বারের মতন। ওই একটা ইচ্ছে হল উদ্যত মানুষটার। আর একটি ধাপ এগোলেই অন্য কক্ষ, তারপর অন্য কক্ষ, তারপর হয়তো পথ। তারপর এই ঘুমন্ত শিশুকে আর দেখা যাবে না, সব ছিন্ন হয়ে যাবে, রাজার ছেলে ভাবছেন, তাঁর শেষ ইচ্ছা শিশুর ঘুমন্ত মুখটা একবার তিনি পরিপূর্ণভাবে দেখবেন।

বাইরে জ্যোৎস্না যত তীব্র, তাঁর বাসনাও তত তীব্র। বউয়ের হাতের আড়ালে পড়ে রয়েছে শিশুর ঘুমন্ত অবোধ কাঁচা মিষ্টি মুখটুকুনি। এবং বধূর মুখটাও আধখানা দেখছেন সিদ্ধার্থ। অলস হাত নাকের উপর দিয়ে কপালে ভর করে গালের পাশ বেয়ে পড়ে রয়েছে শিশুর মুখের কাছে। এই ভঙ্গিটা তাঁর আবেগকে আরও মথিত করে তুলেছে।

গৌতমের ইচ্ছে হল, তিনি বউয়ের হাতখানি সরিয়ে দিয়ে দেখে নিতে চান, কিন্তু তিনি পারলেন না।

যদি তিনি হাতখানি সরানোর চেষ্টা করতেন, আর পারতেন না। বউ জেগে না উঠলেও, শিশুর ঘুম ভেঙে না গেলেও, ওই দুখানি পরিপূর্ণ ঘুমন্ত সুন্দর মুখ বুদ্ধদেবকে আটকে দিত।

কাব্যে-কবিতায়-সাহিত্যে-চিত্রে হয়তো এ কাহিনী আছে। শুধু বউটার হাতখানা ওভাবে পড়ে না থাকলে বুদ্ধের গৃহত্যাগ হত না এই উপলব্ধি কঠিন। বুদ্ধের ইচ্ছেটি বিচিত্র। যারা ঘর ছেড়ে আসে, তাদেরও কিছু ওই ধরনের ইচ্ছে থাকে, ইচ্ছে সফল হয় না। ত্যাগ যে করে, কোনও একটা আড়াল এসে ঢেকে দেয় সংসার। তীব্রভাবে ভিতরে টেনে তাকে বাইরে ছুঁড়ে দেয়।

চন্দ্রিমা যেদিন চৌধুরী-পরিবার ছেড়ে চলে এল, ভবানীপুরের মাকে ছেড়ে এল, সেদিন কিছু একটা আড়াল ছিল, যা সে সরানোর কথা ভাবে, পারে না।

সিঁদুর ছড়িয়ে পড়েছিল, সে সিঁদুর নেয়নি। চিৎপুরের একটি গাভী কেঁদে ডেকে উঠেছিল তাকে, সে থেমে পড়েও বেরিয়ে চলে এসেছিল। শুধু চুলের গোড়ায় লেগে রইল ব্যথা। মনে হল, আর কোনও প্রয়োজন নেই মোহড়াগ্রামে। বুলবন তাহলে ঘড়িটা চাইতে এসেছিল বলে এখন এত ঘৃণা হচ্ছে কেন ? ঘড়িটা কি কোনও আড়াল, কোনও মায়া ?

সিদ্ধার্থের পুত্রের নাম ছিল রাহুল। চন্দ্রিমার মনে হল, রাহুলের মুখের উপর কার একটা হাতের আড়াল রয়েছে, তার মুখটা দেখতে চাইলেও আর বুঝি দেখা যায় না। কিন্তু রাহুলকে দেখার ইচ্ছে হয় চন্দ্রিমার। অথচ সে তো কড়া নেড়ে ডাকল না তাকে !

কৃষ্ণা ঘুমিয়ে রইল কাদা হয়ে। ভোর হয়ে এল, আঁধার লেগে আছে বাতাসে হালকা জলরঙের মত। ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার সামনে এসে চন্দ্রিমা পাশের ঘরে সুইচ অন করে মুখ দেখে। অনিদ্রায় মাথার ভেতরটা টনটন করছে, মস্তিষ্কের কোনও শিরা দপদপ করছে। চোখের তলায় কালি পড়েছে। এ যেন কোনও সর্বনাশীর রূপ। চোখমুখ ধুয়ে আসে চন্দ্রিমা। তাতেও চোখের কালি সম্পূর্ণ সরে না। একটা অদ্ভুত ঝিমুনি, ভোঁ ভোঁ ভাব। রান্নাঘরে এসে ঝিমুনির মধ্যেই স্টোভে জল ফুটিয়ে চা করে নেয়।

একা চা খায়। কৃষ্ণাকে ডাকে না। চা খেয়ে প্রতিদিনের প্রাতঃ প্রাকৃত অভ্যাসগুলি সেরে বাথরুমে স্নান করতে থাকে। স্নান শেষে শুকনো জামা কাপড় বুকের উপর চেপে ধরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। পোশাকগুলি একটি লম্বা উঁচু টুলের উপর রাখে। আয়নায় পতিত বিম্বের দিকে চেয়ে দেখে তার মনে হয়, শরীরটা একটু কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে। চন্দন সাবানের গন্ধ সারা ঘরটায় ভরে গিয়েছে। চন্দনের সঙ্গে হিন্দুর পূজা এবং বিবাহের সম্বন্ধ নিবিড়। কথাটি মনে পড়ে অযথা। অথবা কে জানে, কেন মনে পড়ে, ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চন্দ্রিমা।

রাহুলের চোখের উপর আড়াল হয়ে রয়েছে একটি হাত। মনে মনে সেই হাতটিকে সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেই ছবিখানি চোখের সামনে থেকে নড়তেও চাইছে না কেন !

গামছাটিকে দড়ির মত পাকিয়ে চুলের জল ঝরিয়ে দেওয়ার জন্য ঝাঁট দেয় চুলের প্রপাতে। যেন সে তার নিজস্ব চুলের সঙ্গে স্কিপিং খেলছে। তখন তার নিজেকে খুব

ছেলেমানুষ মনে হয়। কিশোরী মনে হয়। হঠাৎ হাতের গামছাটি লেই করে ঝুলিয়ে ঘোরায়, পাকিয়ে নিতে নিতে হেসে ফেলে। গুঞ্জ শেষবারের মত টলতে টলতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, হাতে ধরা পিস্তল, যেই মনে পড়ে সেই দৃশ্য, চন্দ্রিমা থেমে যায়। চোখমুখ থমথমে হয়ে আসে। চোখের তারায় ভয় ছায়া ফেলে।

জামাকাপড় দ্রুত পরে নেয় এবং চুল আঁচড়াতে থাকে। পিঠের উপর ঢাল হয়ে থাকে পরিচ্ছন্ন কেশভার, একটু একটু ভিজে যায় পিঠের জামা। চোখের কালি অনেক ধুয়ে গেছে। একটুখানি পাউডার-পাফ মুখের স্নিগ্ধ ত্বকে বুলিয়ে নিতেই মুখটা আলো হয়ে যায়। এত অল্পে সুন্দরী হওয়ার গভীর সৌন্দর্য চন্দ্রিমার আছে বটে, কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারে না। একটি গোল বড় লাল টিপ কপালে আঁকা মাত্রই ওর রূপ যেন আর ধরে না।

টিপ পরলেই, কলেজ-ইউনিভারসিটির বন্ধুরা বলত, তুই খুব সেজেছিস দোলন! ... ওমা কোথায় সেজেছি রে! খালি তো একটা লাল টিপ, দ্যাখ, হাত খালি, নাকছাবি নেই, কানে চাপা সাদা দুল, আর কিচ্ছুটি নেই, এই শাড়ি জামাও নতুন নয়। টিপ পরলেই আমার বদনাম হয়, আর পরব না।

কিন্তু এই অনতিভোরে চন্দ্রিমা শুধু চোখের কালিকে আড়াল করার জন্য টিপ এঁকে নেয়। ওর এই বর্ণবোধ সাংঘাতিক, চোখের কালি আর কালি না হয়ে কাজল হয়ে যায় বুঝি বা। মনে হয় শরীর যদি আর একটু সতেজ হয়, রাতজাগা ছিন্ন-কালিমা মুছে যাবে।

এই রকম সর্বনাশী চেহারা কখনও তার হয়নি, রাত জাগলেই এমন হবে, তার কি মানে আছে! ভেতরের কষ্ট তাকে কালো করে তুলেছিল। ক্রমশ সে টাটকা হয়ে উঠল।

টিপের দিকে লক্ষ্য আর একবার স্থির করে চোখ তুলতেই সামনের দেওয়ালে শরৎচন্দ্রের সুদূরব্যাপ্ত বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে গিয়ে তার চাউনি আটকে গেল। ভাষার শরীরে শুধু একটি টিপ পরিয়ে তাকে সুন্দর করার ক্ষমতা শরৎবাবু আপনারই ছিল ; কী করে আপনার ভাষা অমন সেজে উঠত সেকথা আপনিই বলতে পারেন! ভাববেন না আমি কোনও অহঙ্কারের কথা বলছি, আমি বলছি স্বাভাবিক একটি ভাবের কথা। বন্ধুরা আমাকে খোঁটা দিত, আমিও আপনাকে খোঁটা দিচ্ছি। আপনি হয়তো বলবেন, আমার আর বদনামটি ক'রো না চন্দ্রিমা!...

এই সব বিচিত্র ভাবনা ভেবে একা একা চন্দ্রিমা হেসে ওঠে, লজ্জাও পায়। তারপর বলে— টিপটা কি তাহলে মুছে ফেলব শরৎবাবু! আমি আর কাউকে মুগ্ধ করতে চাই না। এখন একজন বৃদ্ধের সামনে যাব, তিনি কী ভাববেন?

শাশুড়ি দু'খানি হাত ধরে চন্দ্রিমাকে বলেছিলেন— তুমি কি রাগ করেছ মা, আমার ওপর?

—আপনার ওপর রাগ কেন করব মা!

—তুমি চলে এলে, ভাবলাম তুমি পার্টির কাজে এসেছ। তুমি কি আমার ঘরে ফিরবে না?

—ও ঘর তো আমার নয় মা!

—কী কথা বলছ তুমি দোলন!

আহত-বিস্ময়ে চন্দ্রিমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন আয়েষা। কিছুক্ষণ কোনও ভাষা মুখে এল না। মেয়ের চোখের দিকে চাইলেন তিনি। নাতাশা কথা না বলে নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নিল।

—বাবু যদি কখনও ফিরে আসে, আমাকে পুছে,, বউমা কোথায়, আমি কী কথা কইব

বউমা! দোলন! তুমি ব'লে দাও! বুলবন আমার বেকার বলে তুমি আমাদের ফেলে দিলে মা!

চন্দ্রিমা একটুখানি কেঁপে উঠল, কিন্তু চুপ করে রইল। ঘাড় নীচু করে রইল।

—কাল ভোরের বাস ধরে আমরা ফিরে যাব। এখানে থাকলে আমি সুস্থ হব না।

—আপনি কালই ফিরে যাবেন!

—আর কী করব দোলন! বাবুর সঙ্গে দেখা তো হল না! কত আশা করে এসেছিলাম। হাসপাতালের গেটে পর্যন্ত পুলিস লাগিয়েছে, খুন হচ্ছে সেখানে। এই পোড়া দেশে বাঁচাই বা কী, মরা-ই বা কী! রাহুল কোথায় রইল, আছে কি নেই, তা-ও আমি জানি না! ওকে আমি ঘর থেকে বার করে দিয়েছি ভয়ে। তোমরা যাতে নির্ভয়ে থাকতে পার! তবু সেই ঘর তোমার পছন্দ হল না বউমা!

—মা!

—আমার ছেলেরা ভাল নয় দোলা!দোষ আছে। শান্তিসুখ বোঝে না।

—আমি শান্তিসুখ চাইনি মা! ভালবাসা চেয়েছিলাম! সুখ জোগাড় করা যায়। আমার একটা চাকরি হয়েছে!

—ও, তাই নাকি! তাহলে তো তোমার আর কষ্ট রইল না। গাঁ-গেরামে কেনই বা ফিরবে! আমরা ভালবাসার লোক নই চন্দ্রিমা। কপাল মা! আমার সুখের সংসার ভেসে গেল! কেন এমন হল, বুঝতে পারলাম না। বাবু বলেছে, তার ঘাট হয়েছে। খুব সত্য কথা। নিশ্চয়ই দোষ করেছি আমরা। তুমিও আমাদের ক্ষমা করলে না।

—মা!

—কালই আমি যাব। বাবুর আশায় থাকব। অধিকার নেই যে বলি, তুমি বাবুর খোঁজ ক'রো!

—করব মা।

—কী হবে বাছা! বাবু যখন জানবে, তুমি ওর কেউ নও! সেই কষ্ট আর এক যন্ত্রণা। যেও না, বাবুর কাছে যেও না তুমি। খোদার কসম লাগে, বাবুকে ব'লো না, তুমি আমাদের পর হয়ে গেছ!

—আমি কেন তাঁকে একথা বলতে যাব!

—তাই তো! সেই কথাই বলছি তোমাকে!

—আমি বোকা নই মা!

—তোমার বুদ্ধি বেশি, রাজনীতি কর, তোমার বুদ্ধির জয় হোক মা! তোমার বুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করুক, খোদার কাছে মোনাজাত করি দোলন! আমার বড় ছেলেটা বোকা! ওর জিন্দেগি কখনও সুখের হবে না।

ক্রমাগত এই সব সংলাপগুলি চন্দ্রিমার মনে ঢেউ তুলে তুলে আছড়ে পড়ছিল।

—দেশের মানুষ শুনে খুব খুশি হবে বউমা যে, বুলবনের বউ চলে গেছে! সেই পরাজয় সহ্য করতে হবে চৌধুরী-সাহেবকে। আমার সংসার কখনও আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। মণির লেখাপড়া হবে না। ও চাষাভুষা হয়ে থাকবে। তাই থাক। চাষারও দরকার আছে। কিন্তু রাহুল আমার ধ্বংস হয়ে যাবে চন্দ্রিমা!

আয়েষার বলা কথাগুলি ক্রমান্বয় বিদ্ধ করছিল চন্দ্রিমাকে। এই এক গভীর প্রত্যূষে, আঁধার ফিকে হয়, কিন্তু রহস্যময় লাগে, সে জীবনের আসন্ন বিচ্ছেদ এবং ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখবে বলে পথে নেমে আসে।

সূর্য উঠতে তখনও দেরি আছে। পায়ে হেঁটে চলে আসে নতুন হাসপাতালের দিকে। পথে মানুষ নেই। রিকশা ছুটছে রেল-স্টেশনের দিকে। প্রধান গেট পেরিয়ে হাসপাতালের ভিতরের সড়ক ধরে চলে আসে সিধে বহু ভাঁজবিশিষ্ট লোহার গেটটির কাছে। একখানি ছোট কালো পুলিস-ভ্যান দেখতে পায়। ভাঁজ-করা গেট উন্মুক্ত।

দু'জন পুলিস, দু'জন ডাক্তার, দু'তিনজন নার্স চন্দ্রিমার শ্বশুরকে সঙ্গে করে ভিতর থেকে হাসপাতালের বারান্দা ধরে এগিয়ে আসেন। এই সময় একখানি জিপ এসে লাগে এই চত্বরে। দু'জন ভব্য মানুষ নেমে আসেন। চন্দ্রিমা ডি. এম. এবং অম্বরীশকে চিনতে পারে। পার্টি করতে এসে এদের চেনা সহজ হয়েছে।

চন্দ্রিমা খুবই আশ্চর্য হল, যখন ডি. এম. তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন— আপনার শ্বশুরমশাই সুস্থ রয়েছেন। কথা বলতে চান ? ও হো, ওই তো রাহুলও এসেছে দেখছি !

পিছন ফিরে চাইল চন্দ্রিমা। রাহুল এসে তার পিছনে দাঁড়াল।

—কথা বলবার জন্য সুযোগ দিতে চাইছেন এঁরা। বলবে ? আমি বাবাকে কী বলব রাহুল ! গাঢ়স্বরে বলে উঠল চন্দ্রিমা।

রাহুল হঠাৎ অম্বরীশের দিকে চেয়ে বলে উঠল— বাবুকে আপনি সাক্ষী দেবার জন্যে ধরে এনেছিলেন। আমার সামনে থেকে তুলে আনলেন। আমি বাবাকে জুতো জামা এনে দিই। সেই জুতো, জামা, ইসমাইল লুঙ্গি, সাদা রঙ— কোথায় ? বাবাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন ?

—দেব। নিশ্চয় দেব।

—কবে দেবেন ?

—এসো। গাড়িতে উঠে এসো।

—না, রাহুল ! বলে সভয়ে রাহুলের একটি হাত আঁকড়ে ধরল চন্দ্রিমা।

সাদা সিঁড়ির উপর নেমে দাঁড়ালেন, ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে দেওয়া হল। এবার তাঁকে গাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে হবে।

চন্দ্রিমা জোর গলায় বলে উঠল— আমিও জেলে যেতে চাই, একা রাহুল যাবে না। যেতে পারে না। আমাকেও নিয়ে চলুন !

—নাইস। ভেরি নাইস ! ব'লে উঠলেন জেলা-শাসক। তারপর ভণিতাময় মুগ্ধ চোখে রাহুল আর চন্দ্রিমাকে দেখতে লাগলেন। দু' হাত দিয়ে রাহুলকে অবলম্বন করা চন্দ্রিমার অসহায় ভঙ্গি, রাহুলের সুদৃঢ় উদ্ধত চাউনি লক্ষ করলেন দু' মিনিট।

—শোন রাহুল ! তোমার বাবার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। উনি সাক্ষ্য যা দেওয়ার দিয়েছেন। খুব ভাল মানুষ। তুমি সেই ভালমানুষের ছেলে। তাই না ? এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—এসো ! বলে ছুটে এসে অম্বরীশ রাহুলের একটি হাত ধরে টানলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একখানি হাত চেপে ধরা চন্দ্রিমা জিপের দিকে এগিয়ে আসে।

—আপনি কেন ? ছেড়ে দিন !

—না !

—ছেড়ে দিন !

—না। দেব না। আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

অম্বরীশ এবার একটুখানি দমে যাওয়ার ভঙ্গি করে বললেন— জেল জায়গাটা তোমার হেঁশেলঘর নয় চন্দ্রিমা মুখার্জি। আমার সঙ্গে আমার গ্যাং রয়েছে।

—এ হতে পারে না !

—কী হতে পারে না !

—বাপকে একদিন তুলে এনেছিলেন। কেন ? ছেলেকে আজ অ্যারেস্ট করছেন। কী করেছে রাহুল ?

—অ্যারেস্ট আমরা করছি না। ছেড়ে দাও। ওর সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

—না। কোনও কথা নেই। কথা থাকতে পারে না। কোনও দোষ রাহুল করেনি। ও আমার দলের ছেলে। ও খতমের রাজনীতি বিশ্বাস করে না। ও শুধু জানতে চায়, ওর বাবাকে কেন আপনারা জেলে এনে অত্যাচার করলেন !

—রাহুল ! বলে অম্বরীশ কণ্ঠস্বর শক্ত করলেন। তারপর বললেন—এই মেয়েটি তোমার বউদি ?

—হ্যাঁ।

—তোমার রাজনীতি আর ওর রাজনীতি একই রাজনীতি ? সেম পলিটিক্স ?

—না।

—কী বলছে ? শুনছ ? কী বলছে তোমার সাধের দেওরা ? কমরেড চন্দ্রিমা, তুমি হিন্দু, এ মুসলমান। সম্বন্ধ নাই। লেট আস গো। ছেড়ে দাও স্টুপিড, মুখ ছ্যাঁদা করে দেব। গো ব্যাক। গো ব্যাক টু ক্যালকাটা। শ্রীঘরের জল পেটে পড়লে রাজনীতি ঘুচে যাবে বউমা ! আমাদের বউমার অ্যাফেয়ারটা একবার চেয়ে দেখুন ডি. এম. সাহেব ! হট্।

বলে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলের হাত থেকে রুলটা মুহূর্তে টেনে নিয়ে চন্দ্রিমার মাথার উপর উঁচিয়ে ধরলেন অম্বরীশ। মারতে উদ্যত ভঙ্গিটা কিছুক্ষণ অনড় হয়ে রইল। হট্ শব্দে চিত্রার্পিত রইল।

সাদা চৌধুরী গাড়িতে ঢুকতে গিয়ে থেমে পড়লেন। শান্ত গলায় বললেন— থামুন।

অম্বরীশ রুল নামিয়ে ফেললেন।

—বাবর প্রার্থনা করেছিলেন সন্তানের জন্য এস. পি. সাহেব। আমি আর ফিরতে চাই না। ওদের ছেড়ে দিন। খোদা নেই সংসারে। আমি আজ কার কাছে প্রার্থনা করব ! চোখের সামনে আমার বউমাকে আপনারা অপমান করছেন। কিসের জোরে এতখানি অপদস্থ করছেন স্যর !

ডি. এম. এবার অস্বাভাবিক নম্র গলায় বললেন— পুলিস সুপারের আর মাথাটি ঠিক নেই সাদাবাবু ! আমরা আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করছি না। খালি একটু জিজ্ঞাসাবাদ করব। ছেড়ে দেব।

—সেকথা আমাকেও বলেছিলেন আপনারা ! দেহের মার আমি ভুলতে পারব, কিন্তু এই সব অপমান কি ভুলতে পারব কখনও ! মানুষকে আপনারা হিন্দু-মুসলমান তুলে গালি দিচ্ছেন ! বউদি এবং দেবরকে আপনারা ডিভাইড করছেন ! ইংরাজও এই জিনিস পারত না।

রুলটা অম্বরীশ কনস্টেবলের দিকে এগিয়ে ধরলেন। হঠাৎ তখন প্রধান গেটের ওদিকে অসম্ভব জোর চিৎকার শোনা গেল। তুহিন আর খোদা বক্স জনকতক যুবাকে সঙ্গে করে এসে দাঁড়িয়েছে। তুহিনের হাতে রিভলবার।

—রাহুল চলে এসো। দেখি কোন্ শালা কী করে ! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আজ মরব বলে এসেছি। ডু অর ডাই। আরে জীবন তো একটাই। মেরে মরব। ছাড়ব না। শালাদের ছাড়ব না। মস্তানের থানেদার, এগিয়ে আয়। তোর মুণ্ডু চিবিয়ে

দিই, বউটাকে খেয়ে দিলি, পাগল করে দিলি। ওই ডি. এম-এর কথা বিশ্বাস করে নাকি রে ! পাগলা অম্বর ! তোর একদিন আমারও একদিন। টু ডে ইজ লাস্ট ডে। খোদা ! এগো।

তুহিন আর খোদা বক্স এগিয়ে আসতে থাকে পায়ে পায়ে। অম্বরীশের মুখমণ্ডল ক্রোধে চাপা উন্মত্ততায়, ক্রূর হিংসায়, মৃদু আতঙ্কে, রক্তাক্ত এবং মুহূর্তেই কালো হয়ে যায়।

সাদা চৌধুরী ঝপ করে কালো গাড়িতে ঢুকে পড়ে নিজে হাতে দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার করলেন — ছাড়ো। গাড়ি ছেড়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর।

ডি. এম. বললেন— গো।

ড্রাইভার ত্বরিৎ তৎপরতায় গাড়ি ছেড়ে দেয়। বউদির হাত ধরে টেনে গাড়ির গতির সম্মুখে এসে রাহুল আড়াল করে নিজেদের। গাড়ির আড়াল এবং স্বল্পগতির সুযোগে এগিয়ে যায়। অম্বরীশ পিস্তল উঁচিয়ে ধরেন। কিন্তু গাড়ি তাঁকে আড়াল করে দেয়।

প্রধান গেটের কাছাকাছি এগিয়ে আসে রাহুল এবং চন্দ্রিমা।

ডি. এম. ঈষৎ সভয়ে ব'লে ওঠে— নো। স্টপ ইট।

তুহিনের রিভলবার গর্জে ওঠে ভয়ংকর ভোরে। সূর্য ভেসে ওঠে পুবাকাশের দূর গাছপালার আড়ালে।

রাহুল বউদিকে সঙ্গে করে ছুটতে ছুটতে বলে— বুলবন আমার বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে বউদি ! খুব জ্বর !

॥ ৪৯ ॥

রাহুল চন্দ্রিমাকে সঙ্গে করে গোরাবাজারের গলিপথ ধরে ছুটে আসে ঊর্ধ্ব-নিঃশ্বাসে। প্রধান সড়কগুলি পরিহার করে। এমন সব সংকীর্ণ পথ ধরে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল যে, ওই সব গলিতে জিপ পর্যন্ত ঢুকতে পারে না।

একটি পোড়ো ভাঙা বাড়ির কাছে আসে ওরা। বাড়িটা ভেঙে ধসে প্রায় পুরো কাঠামোটিই মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। খাড়া হয়ে রয়েছে দেড়খানি দেওয়াল। ধসা, খসা, স্যাঁতানো ইটের বোঝা, লাল রঙ, নোনায় ক্ষয়া, পলেস্তরা নেই। ভিটেতে গাঁদাল ঝোঁপের অপ্রতিহত বিস্তার।

সেই ঝোঁপের মধ্যে অতি স্নিগ্ধ হলুদ সরষে ফুলের মত রঙদার এক ঝাঁক পাখি কিচমিচ করছে। ওদের দেখে উড়ে পালাল আকাশের দিকে। কতকগুলো ছাতারে পাখি নির্ভয়ে ঝগড়া করতে থাকল। গায়ে ধুলোমাখা চড়াই এবং গুবরে শালিক মেতে রইল তীব্র বিসম্বাদে।

ওরা দু'জনই ঘেমে উঠেছে। দু'জনই হাঁপিয়ে পড়েছে, শ্বাস বইছে ঘন ঘন।

—এখন কী করবে রাহুল !

চন্দ্রিমা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিতে নিতে অসহায় প্রশ্নটি করে। রোদ ইতঃমধ্যেই চড়ে উঠেছে। গা কাটছে। রোদে চেয়ে দেখতে কষ্ট হয়। ভাঙা দেওয়ালের ছায়ায় সরে আসার জন্য চন্দ্রিমা রাহুলকে চোখের ইশারা করে। চন্দ্রিমা নিজে ছায়ায় দাঁড়িয়েছে।

—চান-ফান করেছিলে বুঝি ! ইস্ তোমার টিপটা ধেবড়ে গেল বউদি !

—অ্যাই মা, আমার মনে নেই একটুও। যাক গে ! অথচ...

—অথচ ?

—বাবুর সঙ্গে দেখা হবে বলে একটু সেজেছিলাম। দেখা হল, ব্যাস ! আর তো দরকার নেই। বলে শাড়ির প্রান্ত মুঠোয় নিয়ে কপালে ঘষে ঘষে ধ্যাবড়ানো টিপটা মুছে তুলে ফেলতে থাকে চন্দ্রিমা। রগড়াতে থাকে একটু একটু ক'রে। এইভাবে টিপ মুছে ফেলতে দেখে রাহুলের খারাপ লাগে। বউদিকে কতই না অসহায় মনে হয় তার। ঘরের বউটির দুর্দশা এবং বুলবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধের জটিলতা এবং প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে গিয়েও না হওয়া সকরুণ মুখচ্ছবি এবং টিপ মুছে ফেলার সৌন্দর্য-লাঞ্ছিত অবস্থাটি নিষ্পলক দেখতে থাকে রাহুল।

ক্রমশ টিপ যেখানে ছিল পরে সেখানে ফর্সা ত্বকের সঙ্গে মিশে থাকে খানিকটা রঙ। তা-ও এক সৌন্দর্য রচনা করে। কপালের ওখানে চোখ রাখে রাহুল।

বউদি শুধায়—হয়েছে ?

ঘাড় একটুখানি কাত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাহুল অর্ধস্ফুট হ্যাঁ বলে। চন্দ্রিমা কাতর একটা বোকা বোকা ভঙ্গিতে হাসবার চেষ্টা করে। চন্দ্রিমার রক্তাক্ত তৃতীয় নেত্রটিকে লক্ষ করছে যেন তার দেবরটি।

চন্দ্রিমা বরাবরই লক্ষ করেছে, রাহুল কখনও বউদির শরীরে চেয়ে দেখে না। রাহুল বোধ হয় মেয়েদের শরীর বস্তুটাকে কিছুকিঞ্চিৎ উপেক্ষাই করে, বরং তার আগ্রহ মানুষের চোখের দিকে। অত্যন্ত সহজ চোখে সে চেয়ে দেখে মানুষকে। তার কাছে মেয়ে এবং পুরুষ দু'জনই মানুষ। মানুষের চোখ তার কাছে যেন আকাশ সমান। আকাশের দিকে চাইলে, শান্ত স্নিগ্ধ শারদীয় নীলাকাশে চাইলে মানুষের চোখের দৃষ্টিতে যে বিশালতা আসে, মুগ্ধ দূরত্ব ঘন হয়, রাহুলের দৃষ্টি সেইরকম। ও এখন চন্দ্রিমার কপালে চেয়ে আছে, চন্দ্রিমা বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই রাহুল মুছে যাওয়া টিপটার রঙটুকু ছাড়া কিছুই দেখছে না এবং সে অন্য কথা ভাবছে। চন্দ্রিমার ব্যর্থতার কথাই ভাবছে হয়তো। কষ্ট পাচ্ছে।

রাহুল হঠাৎ বলল—ডাক্তারখানা এতক্ষণ খুলেছে নিশ্চয়।

—কেন ? অবাক হয়ে শুধায় চন্দ্রিমা।

—বুলবনের জ্বর, বললাম তো !

—ও। হ্যাঁ। চল।

ছায়া ছেড়ে আবার ওরা এঁদো গলি ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। সম্মুখে রাহুল। পিছনে চন্দ্রিমা। মাঝে মাঝে পথের আবর্জনা টপকে লাফিয়ে যাচ্ছে রাহুল, চন্দ্রিমা পাশ কেটে পা ফেলছে।

রাহুল বলল—তুহিন এবং খোদাকে এখনই খুঁজে বার করতে হবে। মনে হচ্ছে মেসে গিয়ে পুলিস হানা দিতে পারে। তোমাকে ওষুধ কিনে দিচ্ছি, পৌঁছে দিও। আরও একটা কাজ ক'রো তুমি, আমার জামা কাপড় মেসেই রয়ে গেল, যদি পার তোমার কাছে এনে রেখো, মণি এসে নিয়ে যাবে।

—তুমি তাহলে...

—আমি আর মেসে যাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে কবে ফের দেখা হবে, আদৌ হবে কিনা নিশ্চয়তা নেই। ধর আপাতত এইভাবেই অনেকটা পথ একসঙ্গে হাঁটলাম আমরা।

—আমি কী করব রাহুল !

উচ্চকিত স্বরেই আর্তনাদ করে উঠল সহসা চন্দ্রিমা। খুব অবাক হয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল পিছনে ঘুরে দাঁড়াল। একটা ঘন আবেগ তাকে নাড়িয়ে তুলল। মনে হল, বউদি বুলবনের কাছে যেতে চাইছে না। চন্দ্রিমা রাহুলের বুকের কাছাকাছি সরে আসে। তারপর অসহায় চোখ তুলে রাহুলের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

—বুলবনের জন্য ওষুধ জোগাড় করা কর্তব্য বউদি! তুমি যদি ওর কাছে না যাও, আমাকেই যেতে হবে তাহলে!

—তুমি তো বন্ধু। কিন্তু আমি?

—ঠিক আছে।

—ভুল বুঝবে না আমাকে।

রাহুলের হঠাৎ কেমন ক্রোধ হয়ে যায়। এই ক্রোধের প্রকৃতি সে নিজেও বোঝে না। দ্রুত সে সামনে এগিয়ে যায়। কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে একমনে হেঁটে চলে আসে। বাঁক নিয়ে ডাইনে এবং একটু বাদে বাঁয়ে ঘুরে অধিক প্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুকে যায়।

তারপর আরও চওড়া গলির বাঁকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘুরে দাঁড়ায় এবং দেখে বউদি অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

চন্দ্রিমা কাছে এসে পৌঁছতেই ঈষৎ ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলে ওঠে—এই ভোরে কেন গিয়েছিলে বাবাকে দেখতে? আমরা কে তোমার? তুমি কে আমাদের? এস. পি. বলেছে তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান! তোমার আর আমার কী অ্যাফেয়ার বউদি! বল, কী সম্বন্ধ আমাদের?

—জানি না, জানি না। কিচ্ছু জানি না! আমাকে ধমক দিচ্ছ কেন? এত নিষ্ঠুরের মত করছ কেন?

চন্দ্রিমার এ কথায় রাহুল একটুখানি নীরব থেকে অসহিষ্ণুর মত বলল—নিষ্ঠুর কি তুমি নও?

চন্দ্রিমা এবার মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে। তারপর নীচু গলায় বলে— তাই-ই তো বলবে এখন। বলে আধ মিনিট বাদে চোখ তুলে দেখে রাহুল ত্রিশ সেকেন্ডেই ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলে গেছে অনেকটা পথ। তারপর গলিপথ ছেড়ে প্রধান সড়ক ধরে ছুটে যাচ্ছে। এত লম্বা করে ধাপ ফেলছে, এতই দ্রুত যে, ওকে ধরতে হলে চন্দ্রিমাকে দৌড়তে হয়। লোকে দেখে ভাববে কীই না জানি হয়েছে, তাছাড়া খারাপ মানে করবে।

মনে মনে চন্দ্রিমা নিজেকেই বলছিল, আমি নিষ্ঠুর বইকি! খুব নির্মম। কিন্তু রাহুল বুঝবে না আমি কেন আজ এমন হয়েছি। ও জানে না চাকরির খবর শুনে বুলবন কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেছে।

ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার ঢুকতে পারে, কিন্তু দু'খানি গাড়ি বা ট্যাক্সি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে পাশ করতে পারে না, আটকে যায়—এই ধরনের একটি গলিতে ফের ঢুকে গেল রাহুল। মনে পড়ল, ওই গলিতে একজন এম. বি. বি. এস (ক্যাল) ডাক্তার থাকেন। প্রবীণ ভদ্রলোক। এই ডাক্তারের ভিজিট কখনও চার টাকার উপরে ওঠেনি। ভাল ডাক্তার। কিন্তু ভিজিট কম বলে ওঁর সম্মান বিশেষ নেই মধ্যবিত্তের কাছে। ওঁর রোগীরা অধিকাংশই হত-দরিদ্র মানুষ, বস্তির মানুষ, রিকশাচালকের ফ্যামিলি, সবজিওলি, ক্ষুদে অভাবী দোকানদার, হকার, এই সব অগণ্য মানুষ। এই ডাক্তারটিকে রাহুলরা অধিক পছন্দ করে। বলা বাহুল্য, অন্য শাঁসালো ধনী-ডাক্তাররা ওঁকে দেখতে পারে না।

রাহুলরা যখন ভয় দেখিয়ে চৌষট্টি টাকার ভিজিটঅলাকে চার টাকায় নামিয়ে আনল তখন ওই প্রবীণ ডাক্তারের আহ্লাদের সীমা ছিল না। উনি আবেগে বিহ্বল হয়ে বলেছিলেন—আমার একার আদর্শকে তোমরা জয়যুক্ত করেছ রাহুল ! জানি, এই জিনিস হয়তো স্থায়ী হবে না। কিন্তু আমিও যে ডাক্তার সেকথা আমারই বিশ্বাস হত না, এখন হয়। রোগীদের আমি ভালবেসে তুই তুকারি করি কারুকে কারুকে। তা, গঙ্গাপারের ঢ্যাঙা ফরিদকে সেদিন বললাম গরিবের ডাক্তারও মানুষ রে ফরিদ ! দ্যাখ, সব ডাক্তারই সমান। গরিবের ডাক্তার আর বড়লোকের ডাক্তার সমান সমান, বুঝলি ! তা আমার একথা শুনে রুটিমহলের মেথর-বউ বললে কি শুনবে চন্দ্রিমা, বললে পয়সা থাকলে কি তোমার কাছে আসতুক, মুজুমদারের কাছে যেতুক। হাঃ হাঃ হাঃ !

ডাক্তার হাসেন বটে কিন্তু গরিবের ডাক্তার হওয়ার ঠেলাটাও বুঝিয়ে দেন, অবশ্য সেটাও এক মজা। বুড়ো ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে পড়ল রাহুল। মিনিট দশ পর ওষুধ হাতে করে বেরিয়ে এল। এসে দেখে রাস্তার উপর বউদি তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আনমনা।

অত্যন্ত কাছাকাছি এগিয়ে এসে রাহুল বলল—আমি তাহলে যাচ্ছি। বুলবনের পেটে ওষুধ না পড়লে, ওর যা অবস্থা হয়েছে, উঠে দাঁড়াতে পারবে না। ওকে দেখবার জন্য বাবুলকে বলে বেরিয়ে এসেছিলাম। জ্বরের মধ্যে বুলবন কতবার যে চমকে চমকে উঠেছে।

বলে একটু তির্যক দৃষ্টিতে বউদিকে দেখে নিয়ে রাহুল চন্দ্রিমার পাশে দাঁড়িয়ে তারপর গলায় খানিক জোর দিয়ে বলল—চলি !

আর দাঁড়াল না রাহুল। দ্রুত ধেয়ে চলা রাহুলের ভঙ্গিটি দেখে মনে হয়, চন্দ্রিমার কাছে থেকে যেন সে অতি শীঘ্র দূরে চলে যেতে চাইল। রাহুল কি তাহলে তাকে ঘৃণা করে গেল, ভেবে পেল না চন্দ্রিমা। আরও কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে পথেরই কিনারে দাঁড়িয়ে রইল। চলমান মানুষ, যান ইত্যাদি দেখতে থাকল দিশেহারার মতন।

হঠাৎ চন্দ্রিমার তীব্রভাবে মনে হল, এই মুহূর্তে সত্যি করে এক অপার বিচ্ছিন্নতা তাকে পথের উপর ফেলে দিয়েছে। রাহুল তাকে ফেলে চলে গেছে। বুলবনের জ্বর অধিক, তার শরীর জ্বরের ঘোরে চমকে চমকে ওঠে, সেই দৃশ্যটা কল্পনা করা যায়, কিন্তু বুলবনের কাছে ছুটে যেতে মন চায় না কেন ? বুলবনের কোনও কষ্টই কি আর তার কষ্ট হয়ে ওঠে না ! এই নিষ্ঠুরতা কি কোনও নিরাসক্তি ! ভেবে পায় না চন্দ্রিমা।

মনের এই দুর্গতি অবস্থার কথা কি চন্দ্রিমা পার্টি-নেতৃত্বের কাছে কখনও মুখ ফুটে বলতে পারবে ? তার মধ্যে সব যন্ত্রণার আলোড়নও যেন থেমে আসতে চাইছে। পার্টির কাছে বুঝি হৃদয়কেও গোপন করা উচিত নয়। কিন্তু আপন হৃদয়কে কি মানুষ তার সবখানি চিনতে পারে ! আমি কী চাই ? কী চাই আমি ?

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রিমা সমির চৌধুরীর বাড়ি ফিরে আসে। কৃষ্ণা নেই। বৃদ্ধা রান্নার আয়োজন করছে। শুধু সেদ্দর্ভতা ভাত আর ডাল। যথার্থ একজন গরিবের জীবন। বৃদ্ধার মাস মাইনে সমির মামা দেন। উনিই বৃদ্ধাকে রেখেছেন, অনেক কাল আছে।

ঘরে ঢুকে বিছানায় চিৎ হয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকে চন্দ্রিমা। চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে। বুলবনের কাছে আমি কী চেয়েছিলাম ? কী আচরণ দাবি করেছিলাম ? স্বামী-স্ত্রীর কতখানি কমরেড আর কতখানি স্বামী-স্ত্রী—এর কি কোনও অনুপাত আছে ! আচ্ছা, এভাবে আমি কেন আজ হিসেব করতে বসেছি আবার। হিসেবী মানুষকেও ভালবাসা

জিনিসটা বেহিসেবী করতে হয়। হিসেবের গেরো দিয়ে ভালবাসাকে বাঁধা যায় না। আর কোনও চেষ্টাও করবে না চন্দ্রিমা।

কিন্তু রাহুল মেসে ফিরে গেল। ওখানে যদি অম্বর এস. পি. তাড়া করে যায়! ওকে যদি অ্যারেস্ট করে! যদি ওকে কবির মত করে! কেন তবে রাহুলকে ছেড়ে দিল চন্দ্রিমা! ভয়ে বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। বিছানায় আর পড়ে থাকতে পারে না, উঠে বসে এবং চৌকি ছেড়ে নামে চন্দ্রিমা।

বৃদ্ধাকে সদর দোর বন্ধ করে দিতে বলে রাস্তায় নেমে আসে। হাঁটতে থাকে সজোরে। যত সে এগিয়ে যেতে থাকে ভয় তাকে ততই ঘিরে ধরে। ওষুধটুকু বুলবনের কাছে পৌঁছে দেওয়া কি এতই অসম্ভব ছিল? কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে ট্যাবলেট খাওয়ানোর প্রেম না দেখালেও চলত। শুধু বুলবনের মাথার কাছে ফেলে দিয়ে চলে এলেই চলত নাকি!

অথচ কী একটা অবরোধ তৈরি হল অন্তরে! অন্তরকে চন্দ্রিমা চালিত করতে পারল না। এই হৃদয়ের বশীকরণ নেই, কোনও মন্ত্রও শোনে না সে। কমরেডের নামে দোহাই দিয়েও তাকে কথা শোনানো যায় না। তাকে স্ত্রীত্বের সংস্কারেও প্রলুব্ধ করা যায় না। একবার যে-হৃদয় ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে, তাকে তার সেই উপযুক্ত খোরাক না দিলে সে ক্ষুধার্ত হবে, কথা শুনবে না। চন্দ্রিমার হৃদয় চন্দ্রিমারই বশে নেই এখন। তার বারবারই মনে হয়েছে, বুলবনের কাছে সম্মানজনক ভালবাসা সে পাবে না। এখান থেকেই ভয় এবং শূন্যতার জন্ম, তারই আর এক নাম বিচ্ছিন্নতা। এভাবে ভাববার চেষ্টা কি অহেতুক?

চন্দ্রিমা আরও জোরে হাঁটতে থাকে। এই মেসে কখনও সে আসেনি। তবু জায়গাটা চিনে নিতে পারল। পথের পাশের দোকান থেকে মেসের সঠিক হদিস বুঝে নিয়ে এসে পৌঁছালো সেখানে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চলে এল। বাবুল চন্দ্রিমাকে দেখেই তার বৈঠকখানা প্যাটার্নের খোলামেলা ঘরে নিয়ে এল। তারপর বলল—বুলবন ভাইয়ের অসুখের বাড়াবাড়ি দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি ভাবী। রাহুল ভোরে বেরিয়ে গেল, আমি আহসান ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে সেই তখনই ওষুধ নিয়ে আসি। খাইয়ে দেওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে জ্বর ছেড়ে যায়। সারারাত বড্ড কষ্ট পেয়েছে। রাহুল রাত জেগে মাথায় জলপট্টি করেছে। কোনওভাবে সকাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখে রাহুল আমাকে বলে বেরিয়ে গেল। ও আসলে ডাক্তারের কাছেই গিয়েছিল, পরে ওষুধ নিয়েও এল। কিন্তু ততক্ষণে বুলবন ভাই আর নেই। এক ফাঁকে কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় চলে গেছে। অদ্ভুত মানুষ। একখানা চিঠি লিখে রেখে চম্পট দিয়েছে। রাহুল চিঠিটা পড়ল, তারপর সে-ও বেরিয়ে গেল।

—কোথায়?

—কিছুই বলে যায়নি ভাবী। তবে শুধু বলে গেছে, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরবে।

—চিঠিতে কী কথা লিখে গেছে বুলবন, আপনি পড়েছেন?

—না।

—অ। তাহলে...

—আপনি বসুন। রাহুল হয়তো এখনই ফিরে আসবে। তবে একটা কথা, রাহুলের এই মেসে থাকাটা আর একটুও সেফ নয় ভাবী। সাদা চাচাকে তো আবার জেলে এনে ঢুকিয়েছে। আমি রাহুলকে চলে যেতেই বললাম। দেবপ্রতিম আমাকে ডেকে কাল

সন্ধ্যায় বলে দিয়েছেন, রাহুল যেন বহরমপুর ছেড়ে যায়। একথা আপনাকেই জানালাম। রাহুল দেবপ্রতিমের নাম শুনে রেগে যেতে পারে, তাই ওকে চলে যেতে বলেছি, স্যারের কথা তুলিনি।

—আপনাকে দেবপ্রতিম ডাকলেন কেন ?

—আমার মেসে রাহুল থাকে, সবাই তা জানে ভাবী। তাছাড়া আমি নানারকম যোগাযোগ রাখি। ঠিকেদারি করি কি না, অলমোস্ট সব লিডারই আমার চেনাজানা। গুঞ্জ স্ট্যাবড হয়েছে শুনেছেন তো ?

—হ্যাঁ। বলেই চন্দ্রিমা সুন্দর কাঠের চেয়ারটায় বসবার উপক্রম করছিল, এমন সময় দোরের কাছে ঘোমটা টানা একটি নারীদেহ এগিয়ে এল। মহিলা ঘোমটা সরালেন না, ঘোমটার ভেতর থেকেই বলে উঠলেন—তুমি আর নতুন করে বসে যেও না বউমা, স্বামীর খোঁজ কর। বুলবন যখন নেমে গেল, আমি দেখেছি, ভাবলাম নীচে যাচ্ছে কোথাও। এখন শুনছি চলে গেছে। পার্টি করছ কিন্তু এমন ভেন্ন ভেন্ন হয়ে করছ কেন ? তুমি শহরেই আছো অথচ তোমার কাছে বুলবন গেল না, এটা আমার খারাপ লেগেছে।

—ওখানে অসুবিধা ছিল চাচী।

—কোথায় অসুবিধা ছিল ?

—আমার ওখানে।

—কিন্তু এই মেসে আমার অসুবিধা বউমা ! আমার খুবই অসুবিধা। তোমার শ্বশুর আমার আত্মীয়, ফিরা নাটা তরফদার আমার বেজায় আত্মীয়।

—বুঝেছি ! বলেই চন্দ্রিমা চেয়ার ছেড়ে সরে আসে।

—তুমি বেরিয়ে গিয়ে দ্যাখ স্বামী বা কোথা, দেওর বা কোথা ! মেসে পুলিস ঢুকলে আমার মেস কিন্তু উঠে যাবে। সবাই সে কথা বলছে আমাকে ! চাপ আসছে বউমা ! অ্যাই বাবুল, তুই শুনে যা এখানে ! বলে হঠাৎ কঠিন করে ছেলেকে ডেকে ঘোমটাটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোমটা অদৃশ্য হলেও কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এখান থেকে রাহুলকে সরা। বউটাকে চলে যেতে বল।

অপমানের এমন বক্র আঘাত চন্দ্রিমাকে বাইরে ছিটকে ফেলে দেয়। সে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামে এবং পাগলের মত হাঁটতে শুরু করে খাগড়ার দিকে, পার্টি অফিসের উদ্দেশে। ঘোমটার আড়াল থেকে যে আঘাত বিদ্ধ করেছে তাকে এক বিচারে তাই-ই স্বাভাবিক। এ আক্রমণ, এ ঘৃণা রাহুলকেই ছিন্ন করতে চায়, নিরাশ্রয় করতে চায়। রাহুলের আজ আর কোথাও ঠাঁই নাই। অথচ চন্দ্রিমার দলের ছত্রতলে রাহুল মাথা গুঁজবে না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যও নয়। কেন ?

বোধ হয় সে এখনও সি. এম.-এর রাজনীতিকেই সঠিক রাজনীতি মনে করে। হয়তো লিন পিয়াও ভ্রান্ত, কিন্তু....

কে জানে রাহুল এখনও কী মনে করে ! চন্দ্রিমা এবং রাহুলের রাজনীতি আলাদা, একথা তবু রাহুল পুলিস-প্রশাসনের কাছে গোপন করলেই পারত। করল না।

একদিন রাহুল বলেছিল—বউদি ! তোমার দলের সব ভাল। কিন্তু ভোট বিশ্বাস করে। ভোটে দাঁড়ায়, মন্ত্রী এম. এল.এ হওয়ার চেষ্টা করে। শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢুকে মানুষ কী করে মানুষ থাকে বুঝে পাই না। আমি মনে করি ভোটের রাজনীতি জনগণকে আয়েসী এবং ভীরু করে দেয়। প্র্যাকটিক্যালি তাই-ই করে। ভবিষ্যতে আরও করবে।

চন্দ্রিমা বলেছিল—জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হলে ভোটে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। তুমি ভোটে না দাঁড়ালেও ভোট কিন্তু হবে। জনগণও অংশগ্রহণ করবে। ভোটকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে দেখি আমরা। মন্ত্রিসভার ভেতরে এবং মাঠে প্রান্তরে মাসের মধ্যে একটা সংযুক্ত পরিপূরক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে ইলেকসনে যেতে হবে। ভোটের মোহ ভাঙাতে হলেও জনগণের সঙ্গে থেকে গণতন্ত্রের আসল ক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে হবে, ভাঁওতা যে কী, ফিল করাতে হবে। ডিমক্র্যাসি আসলে চালু সিসটেমের একটা রাজনৈতিক চালাকি। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র নেই, যা আছে তা হল...

রাহুল বাধা দিয়ে বলেছিল—এই সব যুক্তি আমার কাছে একেবারেই কনভিনসিং নয় বউদি। শুয়োরের খোঁয়াড়কে আমি কখনও পাওয়ারঅলাদের তপোবন ভাবি না। ক্ষমতাভোগীরা কোনও কালে গণতন্ত্রের উদার মহৎ কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবে না। ওরা পুলিস-প্রশাসনের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তৈরি করবে, ভোটে রিগিং করবে, মস্তান পুষবে, তোমার দল হাঁ করে এই সব ঘটনা চেয়ে চেয়ে দেখবে, পাওয়ারঅলাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। ক্ষমতার রাজভোগ তুমি কখনও দেখেছ?

চন্দ্রিমা রাহুলের সেই উত্তেজিত মুখের সুন্দর রক্তাক্ত আদল মনে করতে পারে। মনে পড়ে সেদিন রাহুলের এই কথার পর তার চোখের দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ঈষৎ বিহ্বল হয়ে চেয়ে থেকে চন্দ্রিমা বলেছিল—তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না রাহুল!

রাহুল তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিল—তা কেন পারবে বউদি! ভোটের রাজনীতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে দানা বাঁধতে দেয় না। ক্ষোভ যখন বৃহৎ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায় একটা সঠিক নেতৃত্ব পেয়ে, তখনই একটা ভোট ডিক্লিয়ার করে ক্ষমতাঅলারা ব্যালট-বাক্‌সে ক্ষোভকে ঢুকিয়ে দেয়, যেমন ধর বিষাক্ত সাপ যখন ছোবল হানবার জন্য উদ্যত, তখন তাকে সাপুড়ে টক করে ঝাঁপিতে পুরে নিল। আমাদের রাজনীতি এই জিনিসের বারংবার পুনরাবৃত্তি দেখে ভোট বর্জনের রাস্তা গ্রহণ করে। শুনে রাখো, কমরেড সি. এম-ও তাঁর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ প্র্যাকটিস দ্বারা স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, সেটা কিন্তু মূলে কখনও খুনোখুনির রাজনীতি ছিল না। তোমরা কখনও ক্ষমতা দখলের এবং ক্ষমতা বদলের তথাকথিত সাধারণ নির্বাচনের বুজরুকিটা রিয়ালাইজ করনি। তোমরাও ছেষট্টির খাদ্য-আন্দোলনের কথা বল, নূরুল ইসলাম, আনন্দ হাইতের কথা বল, বল না? নিশ্চয় বল। কিন্তু মানুষের প্রাণের ক্ষোভ জিনিসটা বুঝতেই পার না। সেদিন কিন্তু আন্দোলনের জন্য ক্ষুদে দু'জন বালকই যথেষ্ট ছিল বউদি, তার জন্য ভোটের দরকার হয়নি।

—বুঝি!

—কী বোঝ, বল!

—তোমার উত্তাপ, তোমার মন!

—ওহ্, তুমি আমাকে ছেলেমানুষ মনে করছ তাই না?

—একটুও না। মোটেও না। তোমাকে এই জন্যই ভালবাসি রাহুল!

তারপর মনে মনে চন্দ্রিমা বলেছিল, তত্ত্বের চেয়ে তোমার প্রাণের জোর বেশি। সে কথা রাহুল শুনতে পায়নি। রাহুলকে কেন ভালবেসেছি, বুলবন তুমি কখনও কি বুঝবে না! বোঝনি। এ কথা যে বুঝবে না, চন্দ্রিমাও কখনও তার হবে না। আমার এই অহঙ্কারকে চিরকাল আমি নিজেই কুর্নিশ করে যাব। আমার এই ভালবাসাকে আমি লালন করব আজীবন।

মোহন সিনেমার মোড় পেরিয়ে স্কোয়ার ফিল্ডের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চন্দ্রিমা নিজেকে বলল, রাহুল তার উপলব্ধিকে বিশ্বাসের অন্তর্গত করেছে, আগে সে যুক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করেছে, পরে তাকে আবেগের সাহায্যে হৃদয়ের দিকে ঠেলেছে, ও কখনও সেই বিশ্বাস থেকে নড়বে না। অতি বিপদের কালেও সে বলবে, তার রাজনীতি তারই, যখন সে একা হয়ে যায় তখনও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে বলে, বউদির রাজনীতি তার নয়। বেশ রাহুল, তাই হোক।

একজন আস্তিক যেমন নাস্তিককে পীড়ন করে কিংবা এক নাস্তিক যেমন এক আস্তিককে কখনও নির্বোধ এবং কখনও অসহ্য ভাবে, আমার রাজনীতির দীক্ষা তেমন নয় রাহুল যে, তোমাকে দলে টানার জন্য সুযোগ এসেছে মনে করে বলব, তুমি ছেলেমানুষ ; পীড়ন করব তোমাকে। তা কখনওই বলব না। কিন্তু তোমার মৃত্যু হলে যে আমি বাঁচব না। তোমার উত্তাপ ছাড়া আমি কি বাঁচতে পারি ?

আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা যদি কখনও মরীচিকায় পর্যবসিত হয়, তখনও আমার সান্ত্বনা থাকবে, আমি তোমার সান্নিধ্য পেয়েছি। আমাদের ছিল এক অপূর্ব সম্বন্ধ।

ইতিহাসের পক্ষ অনেক বিস্তৃত, আকাশব্যাপ্ত তার ডানা। সেই উড্ডীন পক্ষতলে মাটিতে তার ছায়া পড়ে একটি তৃণমূলে, সেখানে থাকে দু'টি ক্ষুদ্র প্রাণ, দু'টি ছোট প্রজাপতি, তাদেরও পক্ষধ্বনি মাটি শুনতে পায়, বিশ্বচরাচর পায় না।

আমরা কি তেমনই তুচ্ছ-গৌণ জীবন নই, বল ? তবু ভালবাসার অনেক দাম রাহুল। বুলবন কখনও বোঝেনি।

স্কোয়ার ফিল্ডের কাছাকাছি এসে পড়ে চন্দ্রিমা। এখানে হাট বসে সবজির। এখানে রেডিমেড পোশাক এবং শাড়ি ঝুলে থাকে দোকানে। এখানে জমি-জিরেতের মোকদ্দমা চলে কোর্টে। ফিল্ডের চারিদিকে বাংলো, সার্কিট হাউস, নানান ধরনের ব্যারাক এবং পোস্ট অফিস, ডি এম-এর বাসস্থান। তাছাড়া কাছেই থানা। শামলা পরা উকিলরা ঘুরে বেড়ায়। ফিল্ডকে ঘিরে রয়েছে চৌদিক প্রসারিত পাকা সড়ক। এখানে রিক্‌শা স্ট্যান্ড আছে।

স্কোয়ার ফিল্ড অনেক বৃহৎ। চারখানি ফুটবল মাঠ জুড়লে যা হয়। মাঠের মধ্যে হেঁটে আসছে একা রাহুল। এ কী দৃশ্য দেখছে চন্দ্রিমা ! চার পাঁচখানা জিপ রাস্তায় মন্থরভাবে ঘুরছে। প্রত্যেকটিতে সশস্ত্র পুলিস। একখানি ছোট পুলিসভ্যান টেকস্টাইল কলেজের চৌমাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৃশ্যটি জাল ফেলার মত, সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছে, কী একটা ঘটতে চলেছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে যে ছেলেটা, জিপ থেকে তাকেই যেন লক্ষ করছে পুলিস।

রাস্তার এদিকটায় প্রচুর চায়ের স্টল সারিসারি। সবই প্রায় টিন-বাঁশের ঘর। বাঁশের চাঁচের দেওয়াল, উপরে টালি অথবা বাঁশেরই ছাপরা বা পলিথিন ফেলা ছাদ। এতই ঘন-নিবদ্ধ দোকানগুলি যে, লোকজন বসে থাকলে অনেক খদ্দেরকে চট করে দেখা যায় না, ওখানে লুকিয়ে থাকা যায় দু'এক দণ্ডের জন্য, অবশ্য খুঁজে বার করা শক্তও নয় খুব।

স্টলগুলির আড়াল থেকে কেউ একজন অদৃশ্য মানুষ অতি উচ্চ চিৎকার করে উঠল—পালাও রাহুল। এসো না। পালাও।

রাহুল এবার চমকে উঠে থেমে পড়ল। আবার সে চিৎকার শুনতে পেল, পালাও। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর সার্কিট হাউসের ওই দিকে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে থেমে পড়ল। উপায় নেই। ওদিকে দু'খানা জিপ ছুটে যাচ্ছে। রাহুল

ফের অন্য একটা দিকে দৌড়ায়, আবার থেমে পড়ে। সেদিকেও রাস্তায় জিপ একটু একটু এগিয়ে গিয়ে ঘিরছে তাকে। আবার এদিকে ছুটে আসবার চেষ্টা করে। তারপর বুঝতে পারে, পথ নেই।

অতঃপর রাহুল মাঠের মাঝখানে সরে যায় ধীরে ধীরে। বসে পড়ে এবং দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। বিশাল মাঠের মধ্যে একটি বিন্দুবৎ দেখায় রাহুলকে। চারিদিকের রাস্তায় মানুষজনের ভিড় থমকে রয়েছে।

রাহুল চলে যেতে চেয়েছিল। রাহুল পারল না।

চন্দ্রিমা অত্যন্ত কান্নাধরা গলায় একজন রিকশাঅলাকে অনুরোধ করে—আমায় একটু খাগড়ায় পৌঁছে দেবে!

রিক্শঅলা ওর কথায় কানই দিল না। রাহুলের মুখঢাকা অসহায় ছবির দিকে চেয়ে রইল।

—যাবে না, ভাই!

—না।

—দাদা! একটু দয়া করে চলুন! আমি টাকা দেব। আমার টাকা আছে।

—টাকা কে চাইছে আপনার! যাবেন টাকা দেবেন, তাতে কি!

—সে কথাই বলছি। দেব আমি। যা চাইবেন দেব!

—দেখছেন না কী ঘটনা হচ্ছে, এর মধ্যে কী করে যাব! ওই দিকে যান, পথেই পাবেন রিস্কা। যান। বকাবেন না। জানডাই বুঝিনফৌৎ হয়ে যায়, ই কি ছেলেখেলা নাকি! আহা, কেমন করে বইস্যা আছে ছেলেডা গো!

চন্দ্রিমা ছুটতে শুরু করল পায়ে হেঁটে। দৌড়তে লাগল। কেউ তার ছুটে যাওয়া দেখে প্রশ্ন করছে না। বরং তারা স্কোয়ার মাঠের কিনারা অবধি কেউ কেউ ঝুঁকে যেতে চাইছে। পুলিস এবার লোকজনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য লাঠি উচিয়ে তেড়ে যায়।

চন্দ্রিমা টেক্সটাইলের মোড় ছেড়ে সামনের রাধার ঘাট ব্রিজের সড়কের মোড়ে এসে পৌঁছায়। এখানে একখানা খালি রিকশা পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। রিকশাঅলা শুধায়—কী হচ্ছে উখানে দিদি!

—আগে চল দেখি।

—আপনার চোখে পানি কেনে দিদি, কাঁদেন নাকি!

—না। কিছু না। বলে চন্দ্রিমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে বারবার।

রিকশাওলা আর কোনও প্রশ্ন না করে রিক্শা ছেড়ে দেয়, প্যাডেল মেরে কোমর নাচিয়ে দ্রুত ছুটিয়ে দেয় তার বাহনটিকে। চন্দ্রিমা মুখের মধ্যে আঁচল ঢুকিয়ে নিজের আবেগকে দমন করার চেষ্টা করে। গলার মধ্যে কাঠ-ব্যথা সরছে না।

—নিষ্ঠুর কি তুমি নও! এই একটি কথা ছাড়া আর কোনও শব্দ অনেকক্ষণ চন্দ্রিমা শুনতে পায় না।

—ইস্। তোমার টিপটা ধেবড়ে গেল বউদি! এই একটি কথাও উত্থিত হয়। এবং আরও পরে আরও কথা আসে।

—তোমাকে ওষুধ কিনে দিচ্ছি, পৌঁছে দিও। আরও একটা কাজ ক'রো তুমি, আমার জামাকাপড় মেসেই রয়ে গেল, যদি পার তোমার কাছে এনে রেখো, মণি এসে নিয়ে যাবে।

—তুমি তাহলে...

—আমি আর মেসে যাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে কবে ফের দেখা হবে, আদৌ হবে কিনা নিশ্চয়তা নেই। ধর আপাতত এইভাবেই অনেকটা পথ একসঙ্গে হাঁটলাম আমরা।

—আমি কী করব রাহুল।

—ইস্। তোমার টিপটা ধেবড়ে গেল বউদি!

সমস্ত কথা চলে আসে এখন। স্রোতের মত ভেঙে ভেঙে আসে কথার ধারালো বন্যা। অপ্রতিহত আবেগ চন্দ্রিমাকে উন্মাদ করে তুলতে থাকে। কখন সে রিকশা থেকে নামে, দশ টাকার এক খানা নোট ছোট মনিব্যাগ থেকে বার করে রিকশাঅলার হাতে গুঁজে দেয় এবং পিছনে ফিরে দেখে না, কখন তারপর দৌড়ে ছুটে পার্টি অফিসে ঢোকে, সিঁড়ি ভেঙে আসে, কিছুই জ্ঞানত হয় না, সে কেবল চালিত হয়ে আসে, ফলে সে বোকার মত এসে দাঁড়ায় প্রাণকিশোরের সামনে।

প্রাণকিশোরের টেবিলে উপুড় হয়ে ভেঙে পড়ে আছে বুলবন। একটুখানি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চন্দ্রিমা। প্রাণকিশোর বুলবনের উপুড় পিঠের উপর হাত রেখে কী যেন সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তাকে। তাঁর কথা থেমে যায়। পিঠ থেকে হাত উঠে যায়।

প্রাণকিশোর চন্দ্রিমার আতঙ্কমাখা করুণ মুখ দেখে শঙ্কিত গলায় বলেন—কী হয়েছে চন্দ্রিমা?

টেবিল থেকে মুখ তোলে বুলবন। চন্দ্রিমা আঁতকে ওঠে। অতি বিধ্বস্ত, কাঙাল, হতাশা-করুণ বুলবনের সেই চেহারা অবর্ণনীয়। চোখে জল টলটল করছে। একবার তাকে দেখে চন্দ্রিমা। তারপর দৃষ্টি প্রাণকিশোরের মুখে ফেলে বলে ওঠে—রাহুল অ্যারেস্ট হয়েছে প্রাণদা!

এক প্রবল ধাক্কায় প্রাণকিশোরের চোখমুখ যেন অর্ধেক বসে যায় মুখের সংকোচনে।

বুলবন গুমরে ওঠে—আমিই ভাইকে ধরিয়ে দিলাম প্রাণদা! এই চিঠিটা কেন লিখতে গেলাম! স্বার্থপর আমি, স্বার্থপর। আমি ভিখিরি, আর কিচ্ছু না।

প্রাণকিশোর ঈষৎ ঘৃণ্য চোখে বুলবনকে চেয়ে দেখে চন্দ্রিমাকে প্রশ্ন করলেন—কখন চন্দ্রিমা, কোথায়? বল, চুপ করে থেকো না।

চন্দ্রিমা কেঁপে উঠল, ঠোঁট টিপে ধরল ঠোঁটে, বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকল।

॥ ৫০ ॥

বুলবনের লেখা টুকরো কাগজের চিঠিটা প্রাণকিশোরের সামনে টেবিলের উপর পেপার-ওয়েটের তলে চাপা দেওয়া রয়েছে, সেটি পাথর সরিয়ে হাতে তুলে নিলেন সেক্রেটারি। পাথর নয়, কাঁচের পেপার-ওয়েটটা চৌকো বস্তু। তারই ভিতর দিয়ে লিখিত বস্তুর সর্বাংশ আড়াল ছিল না, চিঠির দু'চারটি অক্ষর চন্দ্রিমার চোখে পড়ে গিয়েছিল।

চিঠিটা প্রাণদা চন্দ্রিমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন— চলো!

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাণকিশোর। বুলবনের সকাতর মুখের দিকে আর একবার চাইলেন তিনি। তারপর বললেন— তুমি আদিত্যকে সঙ্গে করে এসো। ও এখনই আসবে। আমরা ডি.এম. এবং এস.পি-র সঙ্গে দেখা করব। থানায় খোঁজ ক'রো আমাদের। ওখানে না পেলে এস.পি অথবা ডি.এম-এর বাংলোয় যেও। যে ভাইয়ের

জন্য তোমার এত কষ্ট বুলবন, তার দেওয়া ওষুধ ফেলে দিও না। তোমার চিঠিটা ঠিক হয়নি, উচিত ছিল না ওইভাবে লেখা।

প্রাণকিশোর চন্দ্রিমাকে সঙ্গে করে চলে যাওয়ার পর দশ মিনিট ধৈর্য ধরে চেয়ারে বসে থাকতে পেরেছিল বুলবন। আদিত্য সিংহের পৌঁছাতে দেরি হচ্ছিল। তার আগেই সমির চৌধুরী আসেন। তিনি রাহুলকে অ্যারেস্ট হতে দেখে এসেছেন। যে-গাড়িতে করে রাহুলকে তোলা হল, সেই জিপটা এস.পি-র বাংলোর মধ্যে ঢুকেছে। সবই দেখেছেন সমির মামা, কিন্তু বাংলোর মধ্যে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, লোহার প্রকাণ্ড ভারী গেট রুদ্ধ করে দিয়ে দু'জন পেয়াদা পাহারা দিচ্ছিল, তারা কথা শোনে না। কাউকে ঢুকতে দিলে তাদের চাকরি যাবে, বলাই বাহুল্য, সেই কথা বলে তারা দু'জন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, পিঠে বন্দুক।

—তুমি কি অসুস্থ নাকি! কথা বলছ না কেন? অ্যারেস্ট হওয়ার বিবরণ পেশ করে খানিক অবাক সুরে বুলবনের দিকে সপ্রশ্ন ঝুঁকে নামেন সমির চৌধুরী, তারপর বলেন—প্রাণবাবুকে ফোনে যোগাযোগ না করতে পেরে ছুটে এলাম। কোথায় উনি?

বুলবন বলল— আমার জ্বর মামা। প্রাণদা আর দোলন গেল, আমি আদিত্যবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি। দোলনের কাছে প্রাণদা খবর পেয়ে ওকে সঙ্গে করেই গেছেন। সবই অর্থহীন চেষ্টা। বাপুকে আজও ছাড়ল না। রাহুলকে বোধ হয় মেরেই ফেলবে। আপনার সঙ্গে আলাদা করে একটা কথা বলতে চাই।

মামার শরীরে চাপানো উকিলের পোশাক। কোর্টের কাজ ফেলে তিনি ছুটে এসেছেন। বললেন— এসো তাহলে!

—কিন্তু আদিত্যবাবু! তাঁকে তো বলা দরকার সব।

—আমি একটা চিঠিতে, কাগজ দাও, সংক্ষেপে লিখে রেখে পেপার-ওয়েটে চাপা দিয়ে যাচ্ছি, চলো! কথা তো আছেই, কিন্তু কথাতে আর কোনও কাজ হয় না বুলবন, কথার দিন শেষ। একথা তুমিও জানো, আমিও জানি।

—আমি ললিতমোহনের সঙ্গে কথা বলতে চাই মামা!

সাদা একটি পাতায় ঘটনা লিখতে লিখতে চোখ তুললেন সমির। তিনি টেবিলে পাতাটি পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খচখচ করে কলম চালাচ্ছিলেন। থমকে থেমে বুলবনের কথা শুনে নিয়ে আবার লেখায় মন দিলেন। লেখা শেষ করে চিঠিটা পেপার-ওয়েট চেপে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন।

অতঃপর সমির চৌধুরী একটা ছোট শ্বাস ফেলে বললেন—চলো!

বুলবন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। বাস্তবিক তার শরীর অত্যন্ত কাহিল ছিল, চলচ্ছক্তি সামান্যই ছিল তার। মাথার মধ্যে জ্বরের ধাঁধোশ তাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। দেহের বল কেড়ে নিয়েছিল। রাহুল অ্যারেস্ট হয়েছে শোনার পর সে যেন একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেকে ভাবছিল, সে এক জন্ম-অপরাধী।

নীচে নেমে এল মামার সঙ্গে বুলবন।

—আমার দ্বারা আর কোনও অন্যায় আটকায় না মামা! আর কোনও লজ্জা নেই, সব পারি। যে-কোনও ধরনের স্বার্থ, কম্প্রোমাইজ, যে-কোনও কিছু হীন কাজ।

—তোমার রেস্ট দরকার বুলবন। এভাবে পারবে না।

মামার কথায় জবাব না করে বুলবন মোড়ে এসে রিকশায় চাপে, মামাও উঠে বসেন পাশে।

বুলবন এবং সমির চৌধুরী চলে যাওয়ার পর নির্জন পার্টি-অফিসে মোহর আসে গ্রাম থেকে। উপরে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে প্রাণদার বাড়ি যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পেপার-ওয়েট চাপানো চিঠির টুকরো দেখতে পায়। কাঁচের চৌকা সরিয়ে সমির মামার চিঠি হাতে তুলে নেয়। পাঠ করে ফেলে। মনে পড়ে শরৎ-জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানের দিন রাহুল তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট করছিল। মোহর নিজেই তখন লুকোচুরি খেলেছিল রাহুলের সঙ্গে, বুকে ছিল গভীর অভিমান। সেই কথা মনে পড়ে যায় এবং অভিমান আরও তীব্র হয়। মোহর আর নিজেকে সামলাতে পারে না।

বুঝতে পারে রাহুলের জীবনটা শেষ হয়ে গেল। পড়াশুনা হবে না কখনও। জীবনের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা ওর ভাগ্যে নেই। চৌধুরী-ফ্যামিলি বলতে আর কিছুই রইল না। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব।

রাহুলদের মত ফ্যামিলি এ দেশে বেশি হয় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী পরিবারগুলি তাদের ঘৃণা করে। মোহর ভাবছিল, রাহুলের সংসর্গ কে চায় ? ওকে ভালবাসার মত মেয়ে কোথায় থাকে ? তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই আর, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাও হবে না, সব সূত্র ছিঁড়ে গেছে। আচ্ছা, রাহুল কি এই মুহূর্তে একটি বারও তার কথা মনে করছে !

ভাবতে ভাবতে এতই উতলা হয়ে উঠল মোহর যে, চিঠিটা যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ রেখে রাস্তায় নেমে এল। একা একা পাগলের মত ঘুরল মোহর। স্কোয়ার মাঠের কাছে এসে দেখল, সমস্ত পরিবেশ স্বাভাবিক। থানায় এল, চৌধুরী মামা অথবা বুলবন কাউকে দেখতে পেল না। চন্দ্রিমা বা প্রাণদা, কেউ নেই। রাস্তার উপর একা হেঁটে হেঁটে ভ্রাতৃ সঙ্ঘ ক্লাবটার কাছে আসে। তারপর এস.পি.-র বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়। রবীন্দ্রভবনের সামনে ফিরে আসে আবার। একা। কেউ নেই কোথাও। কোথাও যেন কিছুই ঘটেনি।

কিছুতেই কি রাহুলকে ছেড়ে দেবে না ওরা ? কোনও আধ্যাত্মিক বা নৈসর্গিক কারণে কি ভারতবর্ষের পুলিস-প্রশাসন রাহুলদের ছেড়ে দেয় না কখনও ?

একথা ভাবতে না ভাবতে চারজন সন্দেহজনক যুবাকে রাস্তার উপর মোহন সিনেমার মাঠ পেরিয়ে দ্রুত উঠে আসতে দেখতে পায় মোহর। তাকে দেখে চারজনই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্রভবনের কাছাকাছি এসে। ওরা কী বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে মোহর বুঝতে পারে না।

চারজনের একজন এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে। অত্যন্ত কাছাকাছি এসে কালো রঙের লম্বা, অত্যন্ত বলশালী তাগড়া চেহারার যুবকটি বলে— আমি খোদা। তোমাকে চিনি। এস.পি.-র বাংলোয় রাহুল আটক আছে। এখনও থানায় নিয়ে যায়নি। কী করবে বোঝা যায় না। বোলার স্যর এবং আরও ক'জন প্রফেসর এস.পি-র সঙ্গে দেখা করবেন। ডি.এম-এর সঙ্গে প্রাণকিশোর এবং চন্দ্রিমা বউদি কথা বলেছেন। সুরাহা হয় কিনা বোঝা যায় না। তুমি কী করবে ?

—আমি থাকব।

—কোথায় থাকবে !

—তোমাদের সঙ্গে।

—পাগল হয়েছ ! আমরা ওই গেটের পুলিস দুইটার বন্দুক ছিনতাই করব। চলে যাও। তুমি থাকলে অসুবিধা হবে।

—না।

—তোমাকে মেরে সুলতানের রিক্সায় তুলে দিব তাহলে !

—এভাবে কথা বলছ কেন ?

—সময় নাই মোহর। অ্যাকশন না করলে রাহুলকে ছাড়বে না।

—কী বলছ তোমরা !

তড়াক করে সামনে এগিয়ে এল তুহিন। তেড়ে এল বাকি দু'জন। সহসা বেঁটে মতন গাঁট্টাগোট্টা দোহারা গড়নের হাফপ্যান্ট-পরা যুবকটি মোহরের চুলের পিঠের উপর পড়ে থাকা বেণীটার গোড়া হাতের মুঠোয় পাকড়ে ধরে এস.পি.-র বাংলোর গেটের কাছে টেনে নিয়ে চলল হিঁচড়ে। ভয়ে মোহর চিৎকার করে উঠল।

গেটের সশস্ত্র প্রহরী দু'জন গেট খুলে বেরিয়ে আসে না। বন্দুক উঁচিয়ে মোহরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দেয় না। বাংলোর ভিতর থেকে এস.পি. তীব্র গোলমাল শুনে ছুটে আসেন মাত্র। সঙ্গে আরও দু'জন পুলিস। মোহন সিনেমার মাঠ পেরিয়ে এতক্ষণে ছুটে এসেছেন বোলার স্যর দু'জন সহ-শিক্ষককে সঙ্গে ক'রে এবং প্রাণকিশোর আর চন্দ্রিমা এসে এখানেই উপস্থিত। লোক জমে যায়। রিকশা থেমে যায়। যাত্রীরা নেমে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হাফ-প্যান্ট-পরা যুবকটি মোহরের বেণীটা হঠাৎ ছেড়ে দেয়। অতিরিক্ত সিধে হয়ে দাঁড়ায়, তারপর দূরবর্তী এস.পি.-র দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেসে ফেলে।

—আজ্ঞে, কিছু বলবেন !

এস.পি গেট খুললেন না। গম্ভীরভাবে জবাব করলেন একটি শব্দে, না। তারপর ফিরে চলে যাওয়ার আগে প্রহরী দু'জনকে বলে গেলেন—গার্ড দাও। বেশি পাঁয়তাড়া করলে বন্দুক চালিয়ে দিও।

এই সময় রিকশা করে এসে ছুটে নামল আদিত্য। চলে যেতে উদ্যত এস.পি.কে বলে উঠল— আমাদের কথা ছিল স্যর !

বোলারও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন—রাহুলকে ছেড়ে দিন। আমরা কথা বলতে চাই। এ অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়।

হাফ-প্যান্ট-পরা যুবকটি নাটকীয় ভঙ্গিতে ঝপ করে এবার মোহরের পায়ে হাত আলতো করে ছুঁইয়ে নেয় নিজের, প্রণামের মত করে বলে—দিদি, দোষ নিও না। চলি। চলে আয় তুহিন। খোদা চলে আয়। হবে না, বুঝলি ! হবে না। এ শালা নারকী, দয়ামায়া নাই। বন্দুক চালাতে বলে গেল ! জিভে টাকরায় এট্টু আটকাল না ! এদের মুচকো ভাঙার ব্যবস্থা আগে করতে হত, অনেক বেড়ে গিয়েছে ! এই ব্যাটারাই দেশটার বারোটা বাজাবে।

বুলবন এবং সমির চৌধুরী এই সময় আসেন। সমির চৌধুরী প্রাণকিশোরের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন— ফিরে চলুন। রাহুলকে ওই বাংলোরই মধ্যে আটকে রেখেছে। কোনও আবেদন নিবেদনে কাজ হবে না। আমি আর বুলবন একটু অন্যভাবে চেষ্টা করতে চাই, আপনি অনুমতি করুন। আমরা নাটা তরফদারের সঙ্গে কথা বলতে পারি !

প্রাণকিশোর একবার সমির চৌধুরীর চোখের দিকে চেয়ে দেখলেন বাঁকা ক'রে, তারপর কোনও বাক্যব্যয় না করে মোহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার আগেই মোহরের কাছে ছুটে গিয়েছিল চন্দ্রিমা। মোহর অর্ধস্ফুটিত গলায় ফুঁপিয়ে উঠে চন্দ্রিমার বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলে আরও একবার চেয়ে দেখল হাফ-প্যান্ট-পরা যুবকটি দলবলসহ ওইদিকে দ্রুত ছুটে চলে যাচ্ছে, পিছন ফিরে চাইছে না একটিবার।

ঘটনা এতই আকস্মিক এবং অদ্ভুত ছিল যে, মোহর অসম্ভব বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ভীত-বিহ্বল ভাবটি কিছুতেই তাকে ছাড়তে চাইছে না। চন্দ্রিমার একটি হাত সে সভয়ে জড়িয়ে ধরেছে।

প্রাণকিশোর বললেন— আমাদের কিছু করার নেই চন্দ্রিমা।

হঠাৎ বুলবন ব'লে উঠল—আমার আছে।

প্রাণকিশোর ঈষৎ বিরক্তির সুরে বললেন— না। তোমাকে কিছুই করতে হবে না বুলবন। তুমি আগে সুস্থ হও, স্বাভাবিক হও। মোহরকে সঙ্গে ক'রে তুমি সমিরের বাড়ি চলে যাও। আর সমির তুমি কো-কো-কোর্টে ফিরে যাও। প্রফেসরদের বলছি, আপনারা ডি. এম-কে একবার বলে দেখুন। আদিত্য আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছে। আপনারা আগে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিন, কীভাবে বলবেন। আমি বলেছি, রাহুল আমার কমরেড। সেকথা কানে তোলেনি ডি.এম.।

আদিত্য বলল— দু'টি জিনিস আমরা কনভিন্স করব। এক, হি ইজ আওয়ার কমরেড। দুই, হি ইজ এ স্টুডেন্ট। ওর সঙ্গে দেবপ্রতিম বা অধীর বাগের কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও ধরনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাহুলের যোগ নেই।

বোলার বললেন— ইয়েস। কলেজের অ্যাটেনড্যান্স খাতায় রাহুল ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন উপস্থিত আছে। ডি.এম. যদি চায়, আমি দেখাতে পারি। কিন্তু ভয় হচ্ছে, রাহুল যদি চুপ করে না থেকে বলে ওঠে, অ্যাটেনড্যান্স ঠিক নয়, ওটা ফল্‌স !

প্রাণকিশোর অবাক হয়ে বললেন—ফ-ফ-ফল্‌স বলবে কেন ?

চন্দ্রিমা বলল অত্যন্ত কাতর-বিদীর্ণ স্বরে— তাই বলবে প্রাণদা ! নিশ্চয় তাই-ই বলবে !

প্রাণকিশোর আরও কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করেন অসহায় সুরে— বলবে !

হঠাৎ বোলার প্রাণকিশোরের কাছে ত্বরিতে ছুটে এসে হাত ধরে টেনে বললেন— আপনি আসুন। কথা আছে ! এই জায়গাটা পরিত্যাগ করুন।

প্রাণকিশোর বললেন— ঠিক আছে। মোহর আর বুলবন গোরাবাজার মামার ওখানে চলে যাক। আমরা চারজন আগে কোথাও বসে কথা বলে নিই। আপনি, আমি এবং চন্দ্রিমা, আদিত্য ! নাকি একাই আমাকে বলতে চান ?

বোলার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখভর্তি দাড়িগোঁফে হাত বুলিয়ে কী যেন চিন্তা করে নিয়ে বললেন— কোথায় বসব আমরা ? ঠিক তখন রিকশাযাত্রী এবং পথিকের ভিড় সরে যায় ধীরে ধীরে।

প্রাণকিশোর সচকিত হয়ে বললেন— তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, মোহরকে ছেড়ে দাও চন্দ্রিমা। ওরা যাক।

বুলবন বলল— আমি কোথায় যাব ? না, আমি ঠিক আছি। বরং আমি চিৎপুর চলে যাই এখন। তরফদারের সঙ্গে কথা বলি। আমি বলছি, সেখানে কোনও উপায় হতে পারে !

প্রাণকিশোর এবার গভীর বিরক্ত হয়ে বললেন— তুমি এতক্ষণ কথা শুনলে বুলবন ! তুমি রাহুলকে চিনতে পারনি ! প্রাণ যাবে, কিন্তু তরফদার কিংবা ললিতের সঙ্গে সে কম্প্রোমাইজ করবে না।

বুলবন কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে— আমি একদম চিনি না রাহুলকে, একথা ভুল।

—না। চেনো না। কথা ব'লো না তুমি। তুমি যদি চিনতে... যাক গে, এসব কথা

বলার জায়গা এই পথ নয়। তোমার সঙ্গে আমি আবার বসব। তোমাকে যা বলছি কর। তুমি চিৎপুর যাবে না। এটা পার্টির নির্দেশ।

—এভাবে আপনি আমার মুখ বন্ধ করতে চাইছেন! আপনি শুনে রাখুন তাহলে প্রাণদা...

—বল!

—রাহুল আপনার দলের সাহায্য চায় না। সেটাকেও সে আপস ভাবে।

—কী বলছ তুমি!

—ওর রাজনীতির অহংকার আপনার জানা নেই। আপনারা ওর জন্য চেষ্টা করবেন না।

—তুমি করবে তাহলে?

—আপনারা পারবেন না বলেই আমাকে করতে হবে।

—তুমি একা এই সিদ্ধান্ত নিলে কিভাবে? আশ্চর্য!

—প্রাণকিশোরের বিদীর্ণ-বিস্ময় চরমে উঠে যায়। তিনি শামলা-পরা সমিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন সন্দেহভরা চোখে।

সমির চৌধুরী বলেন— ওকে একাই চেষ্টা করতে দিন না!

—এই সব সিদ্ধান্ত কখনও কারও একার হতে পারে না। চরম সঙ্কট মুহূর্তে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, তাই না সমির! তুমি বুঝবে না, এই একটা পরীক্ষাই বুলবনের বাকি ছিল! শোন বুলবন! তুমি একা যা খুশি করতে পার, সবই তো তুমি একা একাই করছ। কিন্তু আমি আমার পার্টি-নেতৃত্বের তরফ থেকে বলি, একটা অনুরোধ, তোমার ব্যক্তিগত চেষ্টার কথা, কী করছ না করছ, তা যেন বেগম আয়েষা না শুনতে পান। এমনকি মণিকেও তুমি তোমার সিদ্ধান্ত এবং কাজের কথা জানাবে না।

—কেন?

—চৌধুরী-ফ্যামিলিটা তোমার একার নয়। ওখানে আমারও কাজ আছে। আসুন বোলার সাহেব, আমরা যাই। এসো আদিত্য। চন্দ্রিমা এসো। মোহরকেও সঙ্গে নাও। চলুন! বলে বোলারকে হাত ধরে অকর্ষণ করলেন প্রাণকিশোর।

বুলবন হঠাৎ আদিত্য সিংহের কাছে সরে এসে বলে— আপনি বুঝুন আদিত্যবাবু! আমি আমার ভাইয়ের জন্য ভাবব না? আমার করবার কিছু নেই!

—সবই করবেন বুলবন। কিন্তু পার্টির পরামর্শ অনুযায়ী করবেন। সব বিষয়কেই আপনি ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছেন। এভাবে রিঅ্যাক্ট করলে একজন কিন্তু আর কমরেড থাকে না। এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে একথা বলার নয়, বোঝানোরও নয়। আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন। দরকার হলে আপনি পার্টি ছেড়ে যেতে পারেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনাকে সুস্থির হতে হবে।

—আমি কি আর মানুষ আছি বলছেন! নেই। আমি নেই আদিত্যবাবু! ভুলে যান আমাকে। মনে করবেন আমি পাগল হয়ে গেছি। পাগলের কোনও আদর্শ বা মতবাদ থাকে না। থাকে পাগলামী। অস্তিত্বের ভয় ছাড়া আর কি থাকে? ভালবাসা, তাই বা থাকে কিসে! থাকে না। আমি প্রাণের মায়া করি ভাছেন! স্বার্থপর মনে করছেন! না। এ ভুল কথা। আমি আমার মতো করব। দল নেই আমার। আমি কমিউনিস্ট নই। আপনাদের চিনি না আমি! না। চিনি না। একদম চিনি না। মা! মা গো!

মাকে তীব্র অথচ চাপা আর্তনাদ করে ডেকে উঠে ধু ধু করা জ্বর গায়ে নিয়ে বাস্তবিক

পাগলের মত বুলবন দ্রুতগতিতে এস.পি.-র বাংলোর সামনে থেকে জলঙ্গী বাসস্ট্যান্ডের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে শুরু করে।

সমির চৌধুরী বুলবনকে ধরবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আদিত্য বলল— ছেড়ে দিন চৌধুরী মামা। যাবেন না।

প্রাণকিশোর বললেন— তোমাকে আমি কোর্টে চলে যেতে বলেছিলাম সমির !

সমির চৌধুরী থমকে দাঁড়িয়ে ডাইনের পথ পরিহার করে চৌমাথার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে যান। ঘাড় গুঁজে এগিয়ে যান কোর্টের দিকে। প্রাণকিশোর বোলারকে সঙ্গে করে একটি রিকশা ডেকে উঠে পড়েন। অন্যদের রিকশা ধরবার জন্য নির্দেশ করেন।

আদিত্য চন্দ্রিমার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর বলল— আপানারা চলুন। প্রাণদাকে বলবেন, আমি জলঙ্গী বাসস্ট্যান্ড হয়ে আসছি।

আধঘণ্টা বাদে পার্টি-অফিসে বোলারকে নিয়ে মিটিং হয়। অন্য দু'জন অধ্যাপক ছোট ঘরখানিতে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। বাস-স্ট্যান্ড হয়ে আদিত্য ফিরে এসে মিটিঙে যোগ দেয়।

বোলার আশ্চর্য হয়ে শুধালেন— আপনার কি দেখা হল রাহুলের দাদার সঙ্গে ?

আদিত্য বলল— পরে বলছি সব। আগে আমরা কাজের কথা বলে নিই।

বোলার হেসে বললেন— ওটাও তো কাজের কথা আদিত্যবাবু।

আদিত্য বলল— হ্যাঁ। বটেই তো ! তবে বুলবনের সমস্যা প্রাণদা বুঝবেন। বর্তমান প্রসঙ্গে ওটা এখন থাক।

বোলার বললেন— ঠিক আছে। কিন্তু বুলবন নাকি নাম, ওকে দেখে আমার খুব ব্যথা লাগছিল প্রাণকিশোরবাবু ! ছেলেটা নিতান্তই ভালমানুষ, কমিউনিস্ট হয়তো নয়, তা না হোক, সবাই কি আর কমরেড হতে পারে, পারে না।

আদিত্য বলল— একজন কমিউনিস্ট হতে চায় না, বা যেমন ধরুন একজন নাস্তিক হতে চায় না—আমরা তাকে কিন্তু অশ্রদ্ধা করি না। কিন্তু যে হতে চায় এবং যে এক সময় কী চায় বুঝতে পারে না, তাকে নিয়ে সমস্যা অনেক।

—ও। ঠিক আছে। এটা আপনাদের মতবাদের কথা, ও আমি বুঝব না। রাহুলের এখন কী হবে, হি ইজ মাই সন ! বলুন আমি শুনি, কীভাবে আমরা মুভ করব ! বললেন বোলার।

তারপর ফের অন্যদের কথা শুরু করতে না দিয়ে বলে উঠলেন— শুনুন ! আগে একটা ঘটনার কথা বলে নিতে হবে, যেটা না বললে পরিস্থিতির সব স্তর বোঝা যাবে না। আমি সামান্য অঙ্কের টিচার, আমার রাজনৈতিক বুদ্ধি খুবই কম। বলা যায় জিরো। কিন্তু এটা একটা যুদ্ধ বলে মনে করি। যুদ্ধের পরিণাম জানি না। মার্কসবাদ সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কোথায়, আদৌ আছে কি নেই বলতে পারি না। আমার ছেলেরা মরে যাচ্ছে, রাহুল ইজ এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট। তার প্রাণ গেলে আমার মানসিক ক্ষতি হবে। যুদ্ধে শুধু প্রাণ যায় না। অনেকে পাগল হয়ে যায়। রাহুলের দাদাকে দেখে সেকথা বুঝতে পারছি।

আদিত্য বলল— আপনি কী একটা ঘটনার কথা বলতে চাইছিলেন !

বোলার এবার চন্দ্রিমা এবং মোহরের দিকে চকিতে চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন— এদের সামনেই কি বলব আমি ? যদি এদের কখনও পুলিস তুলে নিয়ে যায় তাহলে মেরে ধরে কথা বার করে নেবে, মেয়ে বলে রেহাই দেবে না।

প্রাণকিশোর সঙ্গে সঙ্গে বললেন— না। তাহলে বলবেন না। চন্দ্রিমা! তুমি মোহরকে সঙ্গে করে গোরাবাজার চলে যাও। বুলবনের কথা চিন্তা করবে না। একদম চিন্তা করবে না।

—আমি যাব! ভেজাস্বরে অনেকক্ষণ পর চন্দ্রিমা অসহায় সুরে কথা বলে উঠল।

বোলার উঠে দাঁড়ানো চন্দ্রিমার দিকে চেয়ে বললেন— তুমি কিছু মনে ক'রো না মা! আচ্ছা! বুলবন কি তোমার স্বামী?

চন্দ্রিমা আশ্চর্য রকম চুপ করে রইল। তারপর অত্যন্ত বেদনাময় অতি অসহায় দৃষ্টি তুলে প্রাণকিশোরের মুখের দিকে চাইল। কী বলবে সে বুঝতে পারছিল না।

প্রাণকিশোর বললেন— হ্যাঁ। ওরা স্বামী-স্ত্রী। রাহুল ওর দেবর, সম্পর্কে। যাও তুমি চন্দ্রিমা!

চন্দ্রিমা মোহরকে সামলে ধরে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। কিন্তু তার পা দু'খানি চলতে চাইছিল না। মিটিঙে সে থাকতে পারল না, কতখানি বিপজ্জনক ঘটনা হয়েছে তাহলে! তার বলতে ইচ্ছে করছিল, পুলিস তাকে ধরে নিয়ে যায় যাক, তবু সে শুনতে চায়। অবশ্য সেকথা শুনে পুলিসের হাতে তীব্র ভয়ঙ্কর প্রহারে দাঁতে দাঁত চেপে তথ্য গোপন করে রাখার সামর্থ্য তার আছে কি নেই, সেই ঘটনার কোনও পরীক্ষা তো তার জীবনে হয়নি।

সিঁড়ির মুখে, ছাদের কাছে চলে এসেছিল ওরা দু'জন, মোহর আর চন্দ্রিমা। হঠাৎ দেখে, দ্রুত তাদের কাছে মিটিং ছেড়ে উঠে এসেছে আদিত্য সিংহ। একখানা হাত তুলে ইশারায় চন্দ্রিমাকে থামতে বলে, কথা আছে নিশ্চয়।

আদিত্য সিংহ কাছে এসে বলে— দুশ্চিন্তার কারণ নেই, আমি বুলবনকে টিকিট কেটে বাসে তুলে দিয়েছি, ওর অবস্থা দেখে ভয় করছিল বলে বাসে তুলে দেওয়াই ঠিক মনে করেছি। সমস্যাটা এমন যে, তার বেশি কিছু করাও গেল না। একজন কমরেডকে সঙ্গে দিলে ভাল হত। সেই সময়ও ছিল না। এসব কথা প্রফেসর বোলারের সামনে বলে লাভ নেই। তাছাড়া এই প্রথম প্রাণদাকে দেখলাম যে, উনি কারও উপর এতখানি বিরক্ত হলেন। প্রাণকিশোরদা আপনাকে অযথা চিন্তাভাবনা করতে ফের নিষেধ করলেন, আমাকে ব'লে দিতে বললেন।

চন্দ্রিমা বুকের মধ্যে লম্বা করে একটা শ্বাস টেনে এবং সেই নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজে দু'সেকেন্ড পর চোখের পাতা উন্মীলন করে বলল— একজন কাউকে সঙ্গে দিলেই ভাল হত আদিত্যবাবু! একজন হেরে যাওয়া মানুষ, তাই বলে তো তাকে ঘৃণা করা যায় না।

—ঠিক।

—আজ বড় আশ্চর্য লাগছে আদিত্যবাবু। বলে শ্বাস রুদ্ধ করে ধরে এক নিমেষ আকাশের দিকে অর্থহীন চেয়ে অশ্রু চিকিয়ে ওঠা চোখ আদিত্যর চোখে টেনে এনে চন্দ্রিমা বলল— রাহুলের প্রতি বুবনের ভালবাসা যে কী, ভাবতাম হিংসেই শুধু করে! কিন্তু আপনারা কী ভাবছেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে, রাহুলের কিছু হলে ও হয়তো সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যাবে! দুঃখ একটাই, বুলবন আমাদের রাজনীতির আর বোধ হয় টাচেও থাকতে চাইবে না।

—ওসব কথা এখন থাক চন্দ্রিমা! আপনি এখন একটু মোহরের কথাও ভাবুন! ও বেচারি ভারি ছেলেমানুষ, ঘাবড়ে গেছে! অ্যাই ছোট বোনটি, ভয় কিসের! সন্ধ্যায় তুমি চন্দ্রিমার সঙ্গে আসবে। তোমার কোনও কথাও শোনা হয়নি।

আদিত্য সিংহের এই কথায় বুকের মধ্যে প্রবল কান্না পেয়ে যাচ্ছিল মোহরের। এরা কেউ দেখেনি এস.পি-র বাংলোর সামনে তার কী হয়েছিল ! কেউ জানে না তার কষ্টের কথা। এরা সকলে পৌঁছনোর আগেই...এই পর্যন্ত ভেবে দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই কেমন করে ওঠে মোহরের হৃদয়। রাহুলকে ভালবাসা কি এতই কঠিন ! ওর জন্য পাগল হতে হবে মানুষকে !

ভাবতে ভাবতে অশ্রু আড়াল করার জন্য মোহর ঘাড় বাঁকা করে অন্য দিকে চাইল, পিঠে পড়ে থাকা বেণীটা পিঠ থেকে টেনে ঘাড়ের উপর দিয়ে এনে হাতের মুঠোয় ধরল। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি আবার যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সে। দৃশ্যের পুনরাবর্তন হয়, চন্দ্রিমা এবং আদিত্য দেখতে পায় না, কিন্তু সে দেখে হাফ-প্যান্ট-পরা চোয়াড়ে যুবাকে, 'দিদি দোষ নিও না' বলে নীচু হয়ে তাকে প্রণাম করছে। দু'খানি কোমল সুন্দর পা সিরসির ক'রে ওঠে। সেই সিরসিরানি পায়ের রক্তকে বোবা করে দেয়।

হাতেরই মুঠোয় ধরা বেণীর প্রান্তভাগ ; যেন সে নিজেরই হৃদয়ে ডেকে ওঠে। প্রকাশ্যে সোচ্চারে যাকে আজ ডাকা যায় না বুঝি তাকে সে ডেকে উঠছে হৃদয়ে ! হৃদয়ের উদ্বেলতা কী বস্তু তা কেবল হৃদয়ই জানে। কেউ জানে না, জানবে না, এস.পি.-র বাংলোর সামনে পথের উপর তার সত্যিই কী হয়েছিল !

চন্দ্রিমা এবার মোহরকে হাত ধরে সিঁড়ির নীচে টানে। মোহর যেন হাফ-প্যান্ট-পরা যুবককে ঠেলে ফেলে সিঁড়ির নীচের ধাপে নামে। হাতে ধরা বেণীর প্রান্তে টান পড়ে চুলের গোড়ার ব্যথা ঝলকে ওঠে, মস্তিষ্কের কোষে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

—বউদি ! বড় ভয় বউদি। বলে ওঠে মোহর, আধফোটা গলায়। মস্তিষ্কের অন্ধকার দিনের রোদকে কালো করে দেয়, সে তার হৃদয়ের ভালবাসার মূর্তিটাকে বলে, রাহুল যেন বেঁচে থাকে, হে নিঃশব্দ ভালবাসা !

ওরা দু'জনে রিকশায় চেপে নেয় এবং আর একবার এস.পি.-র বাংলোর সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করতে চায়। এসে দেখে সকলই নীরব। ক্লাবের ওই দিকটায় চারাগাছের তলে মণির মত কে একটা ছেলে বসে আছে। গাছের তলে শানবাঁধা বেঞ্চিতে নিশ্চল এক মূর্তি।

মোহরের মনে হয়, ওটা মণি। চন্দ্রিমার মনে হয়, অবিকল মণিই। কিন্তু তারা কি ভুল দেখছে না ?

রিকশা থামায় চন্দ্রিমা। নেমে পড়ে। মোহরও নেমে পড়েছিল। চন্দ্রিমা পা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং বলে— তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি আসছি।

চন্দ্রিমা দ্রুত ভ্রাতৃসঙ্ঘ ক্লাবের মাঠের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। যত এগিয়ে যায় মণিকে আরও মণির মত লাগে। ক্রমশ অবিকল মণি মণিই হয়ে যায় এবং সে বউদিকে দেখতে পেয়ে পাথরের বেঞ্চ ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ক্ষিপ্র বেগে বার হয়ে যায় ক্লাব ছেড়ে পথে। পথ ছেড়ে নেমে যায় মোহন সিনেমার মাঠে। সিনেমার সম্মুখস্থ মাঠ দিয়ে ধেয়ে চলে যায় সেন্ট্রাল জেলের লাল প্রাচীরের দিকে। ওকে আর ধরতে পারে না চন্দ্রিমা।

কোথায় থাকে মণি ? কোথা থেকে আসে ? কোথায় যায় ? তার কাছে আসে না কেন ? সে কি রাহুলের অ্যারেস্ট হওয়ার খবর পেয়েছে ? নাই যদি পাবে, তাহলে ওখানে ওইভাবে বসেছিল কেন ?

—ভাই, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না ! তোমাকে যে বোঝাতে পারি না মণি ! আপন

মনে বিড়বিড় করতে থাকে চন্দ্রিমা। ফিরে আসে রিকশার কাছে।

মামার বাড়িতে এসে বাথরুমে স্নান করতে করতে কেঁদে ফেলে চন্দ্রিমা। তার এই কান্না সে গোপন করতে চায় পৃথিবীর কাছে। কী কথা বলে চলেছেন বোলার স্যর প্রাণাকিশোর এবং আদিত্য সিংহের কাছে ? তাহলে কি এমন ঘটনা যে, রাহুল আর কখনও মুক্তি পাবে না ? তাহলে কি আজকার প্রত্যূষেই ছিল তাদের জীবনের শেষ পথ চলা ? মন্মথর মত রাহুলও কি হারিয়ে গেল জীবন থেকে ! কী ভুল করলে বুলবন !

চিঠির কথা মনে পড়ল চন্দ্রিমার। সামান্য চিরকুট। 'ডিয়ার কমরেড রাহুল !' অদ্ভুত সম্বোধন করেছে জ্বরতপ্ত বিকারগ্রস্ত বুলবন। তারপর লিখেছে,

'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। বেঁচে কী হবে ! আমি চললাম। ভেবো না। চললাম আমি।' ইতি তোমার হতভাগ্য বুলবন ভাইয়া।

ব্যাস। রাহুল চিরকুট পড়েই ভেবে নেয়, তার দাদা আত্মহত্যার কথা ভাবছে। এক নিমেষ দেরি না করে দাদাকে খুঁজতে বার হয়ে যায়। চিঠিটা সঙ্গে করে ছুটে আসে পার্টি-অফিস। ওষুধ সঙ্গে করে আনে। এত বিপদ তবু রাহুলের কর্তব্যে ভুল হয় না। বাপকে পুলিস আবার তুলে নিয়ে চলে যায়, তবু সে বলে ওঠে, 'তোমার টিপটা ধেবড়ে গেছে বউদি !' দাদার জন্য তার অপরিসীম মায়া তাকে ছুটিয়ে মারে, মুখ ঢেকে সে বসে পড়ে স্কোয়ার ফিল্ডের মধ্যবিন্দুতে, চারদিকে পথ সশস্ত্র পুলিসবেষ্টিত। রাহুল মুখ ঢাকে লজ্জায়। আশ্চর্য বড়, ভয় পায়, কিন্তু লজ্জাও পায় সে !

কিন্তু চন্দ্রিমার লজ্জার কি কোনও শেষ আছে ! দ্বিতীয় দফায় স্নান করেও সে শীতল হতে পারে না। কপালে কি এখনও রঙ লেগে আছে ! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক পরে অতি যত্ন করে টিপ আঁকে চন্দ্রিমা। মুছে ফেলে।

সহসা ব'লে ওঠে— বুঝলে মোহর !

কিয়ৎক্ষণ থেমে হাতের টিপের শিখাটির দিকে চেয়ে থেকে বলে— রাহুল জানতে চেয়েছিল, মোহর কি এখনও সাদা সালোয়ার কামিজ উড়নি পরে বউদি !

—আমি যে পরেছি বউদি ! বলে চৌকির বিছানার উপর উঠে বসে মোহর। ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে চন্দ্রিমা।

দিন চলে যায়। রাত্রি নামে বহরমপুরের আকাশে। গাছের পাখিরা গাছের ডালে, কন্দরে, পাতার আড়ালে ফিরে আসে। তারা আহ্লাদে চিৎকার করে, অজস্র কাকলি ভরে যায় বাতাসে, এস.পি.-বাংলোর বৃক্ষসমূহে।

রাত্রি গভীর হয়। জানলা দিয়ে একটি দীপ্যমান আলোর বড় গোল মোতিশুভ্র বালব চোখে পড়ে মণির। মণি এই রাতে একা এস.পি.-র বাংলোর সামনের ক্লাবের মাঠে গাছের তলে পাথরের বেঞ্চে শুয়ে থাকে। আলোটার দিকে চেয়ে থাকতে না পেরে শুয়ে যায়। বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সে বালবের উদ্দেশে তাকিয়েছিল দীর্ঘ সময়। বসেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে। শুয়ে পড়েছে। ওর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে নামে নিঃশব্দে। রাহুল না বাঁচলে মণিকে বাঁচাবে কে ? তার এখন যদি জ্ঞান হারিয়ে যায়। ও যদি গোঙায় এবং ক্রমশ রেগে ওঠে !

॥ ৫১ ॥

অম্বরীশলাল জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে চাইলেন, গভীর অন্ধকারে দু'চারটি নক্ষত্র ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। হঠাৎ-হঠাৎ পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে আসে। বোবা এবং ভীত মানুষের আর্তনাদ যেমন হয়, এ ঠিক তাই। এই ধরনের কান্না কখনও শোনেনি রাহুল। ডুকরে ডুকরে ইনিয়ে বিনিয়ে কোনও প্রসঙ্গ ধরে কান্না এ নয়। তীব্র উচ্চকিত হাহাকার ফোয়ারার মত ওঠে এবং মুহূর্তেই শান্ত হয়ে যায়। দুঃস্বপ্নে আক্রান্ত মানুষের সহসা জাগা ভীত স্বর যেমন দুর্বোধ্য বিভীষিকা দেখে কুঁকড়ে যায়, কেঁদে উঠতে সাহস পায় না, এই আর্ত বোবা কণ্ঠস্বর তাই-ই। তবে সেই স্বরের মধ্যে বেদনাও আছে।

—কে অমন করে!

—বুঝতে পার না?

—না।

—পারবে, তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিই। সেদিনটা ছিল ভট্টশালীদের বাড়ি ছোট মেয়ের বিয়ে। মনে পড়ে?

—না।

—প্রফেসর বিমান ভদ্রের বাড়ির ঠিক গা-লাগা, শুধু একটা সংকীর্ণ গলির তফাত, সেই গলিও কানা, লোক যাতায়াত করে না।

—আমি দেখিনি।

—কেন দেখনি শালা! তোমার দেখা উচিত ছিল। আমার বউকে গুলি করার আগে তোমার দেখে নেওয়া উচিত ছিল, ঠিক কোথা থেকে পিস্তল ছুঁড়ছ, তাক করছ কিভাবে!

—আজ্ঞে না।

—কী, না? আমার বউয়ের কোলে এতটুকু একটা সাদা কুকুর, নরম লোমঅলা, মুখে কাজলের পোঁচ। খোলা জানলার কাছে, খাটে তিনি বসেছিলেন। ও. কে? এবার বল, গুলিটা ঠিক কোথা থেকে তুমি করলে? বিমান ভদ্র তখন কোথায়?

—জানি না।

—তোমার মেমারি খারাপ নয় রাহুল!

অম্বরীশের টেবিলের সামনের এপারের চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে থাকে রাহুল, চোখ তোলে না।

অম্বরীশের আচমকা প্রশ্ন— দেবপ্রতিম ওই ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন?

রাহুল একটুখানি বাঁকা করে হাসল এস.পি.-র মুখের দিকে চেয়ে দেখে। তারপর খুব ঠাণ্ডাস্বরে বলল—এই সব প্রশ্ন আমাকে কেন করছেন?

—তুমিই তো বলবে!

—বিমান ভদ্র নামে কোনও লোককে আমি চিনি না। আমি আজ পর্যন্ত কোনও গুলি কারুকে করিনি। তাছাড়া দেবপ্রতিমকে আমি ঘৃণা করি। আমার মৃত্যুর আগে আপনার কাছে আমার শেষ আবেদন, সাদা চৌধুরীকে আপনি ছেড়ে দিন।

—দেব। তুমি গুলি না করলে কে করেছে তাহলে? কোথা থেকে করেছে?

—সমস্ত ঘটনার জবাব কি চৌধুরী-ফ্যামিলিকেই দিতে হবে স্যর! প্রফেসর সবিতা আমাকে বলেছেন, আমি যেন ঘরে ফেরা দেবপ্রতিমকে আর না ঘাঁটাই, যেন সুখে থাকতে

দিই। অথচ আমি বাবা মা ভাইবোন ছাড়া কারও কোন সুখশান্তি নষ্ট করিনি।

—আমার সুখ, আমার শান্তি নষ্ট করনি ?

—নাহ্ ! বলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রাহুল। তারপর পাশের ঘরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে চাইল। ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এসে অম্বরীশ তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন—কোথা যাও ?

—দেখব একটুখানি !

—না।

—আমাকে দেখতে দিন !

—শোন ! সত্য কথা বল রাহুল ! তোমাকে ছেড়ে দেব।

—কবিকেও আপনারা ঠিক এই কথাই বলেছিলেন !

—তুমি কী করে জানলে ?

—কারণ ভারতবর্ষের সমস্ত পুলিস একইভাবে কথা বলে। আপনার স্ত্রীর এই দুরবস্থার জন্য আমি দায়ী নই স্যর ! শুধু এইটুকু বলতে পারি !

—দেবপ্রতিম বলেছেন, তুমিই গুলি করেছিলে !

এই সময় আবার কাতরে উঠল মহিলাকণ্ঠ। তীব্র উচ্চকিত হয়ে থেমে গেল। কেমন একটু নাড়া খেয়ে রাহুল সামনে অগ্রসর না হয়ে ফের চেয়ারের কাছে ফিরে এল। চেয়ারের কাঁধ এক হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—তাহলে আমাকে মেরে ফেলুন। আমি রেডি। ব'লে খুব স্বাভাবিক চোখ তুলে এস.পি.-র চোখে চাইল সে।

—বস। বলে অম্বরীশ একটু ঘুরে তাঁর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—গুলি তাহলে কিভাবে হল ! কোথা থেকে ? আমি জিয়াগঞ্জে বিমানের কাছে গেছি। অ্যারেস্ট করতে পারিনি। ইচ্ছে করেই করিনি।

—কেন ? আমার বাবার মতন তাঁকেও তুলে আনতে পারতেন !

—না। বহরমপুরের এই বাড়িতে বিমান থাকে না। আমি ওর বাড়ির তলায় যে পানবিড়ির স্টল, ওখানে খোঁজ করি, ওরা বললে এ বাড়ি তালা বন্ধ থাকে, খোলে না। বাট আই সাসপেক্ট, ভট্টশালীদের বিয়ের দিন ওই বাড়ির তালা খোলা হয়েছিল। বল, হয়নি ? ওই দিন বিমান ওই বাড়িতে আসে। বিমান তোমার দলের লোক।

এবার হঠাৎ ক্ষেপে উঠল রাহুল। গলার স্বর তিক্ত করে বলল—আমার দলের লোক কারা আপনার জানা নেই স্যর ! আমানি, হাওয়া বিবি, ইকবাল, রুকসানা, কদম আলি—এরা আমার দলের লোক। আমার বাবা, বউদি, আমার মা এবং মণি আমার দলের লোক। বুলবন ভাই আমার দলের লোক।

—কবি ?

—আমার দলের লোক। মুমতাজ আমার কমরেড। গোরা এবং মণি আমার কমরেড। এরা, এরা, এরা—সব আমার লোক। এরা কখনও মানুষ খুন করেনি। কিন্তু প্রয়োজন হলে পিস্তল চলবে স্যর ! আগামী দিনে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। চলি ! বলে রাহুল এক লাফে ঘরের বাইরে চাতালে চলে এসে থমকে দাঁড়াল এক সেকেন্ড। উপরের ঝুলন্ত ব্যালকনির তলে দাঁড়িয়ে বলল—এভাবে মরব বুঝতে পারিনি। ফায়ার ! বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মোতায়েন সমস্ত সশস্ত্র প্রহরী মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। বন্দুক তাক করল তারা।

রাহুল ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে। গাছপালা ঘেরা এস.পি.-র কম্পাউন্ডের ভিতর পাকা সড়ক ধরে গেটের দিকে এগিয়ে চলল।

অম্বরীশ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমে হতভম্বের মতন একদণ্ড চুপ করে থেকে গর্জে উঠলেন সহসা—দাঁড়াও! যেও না রাহুল। মরে যাবে। কেউ গুলি করবে না। বন্দুক নামাও। স্টপ। স্টপ ইট।

রাহুলের পিছু পিছু ছুটে আসেন অম্বরীশলাল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকৃত ঘটনার স্বীকারোক্তি করার চেয়ে রাহুল মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছে। ও আর প্রাণের পরোয়া করছে না। কী সাহস ছেলেটার!

প্রহরীদের সম্মুখ দিয়েই রাহুল লোহার গেট বেয়ে উঠে বাইরে লাফ দিল। ল্যাম্পপোস্টের মিটমিটে আলো জেগে থাকলেও অন্ধকার ভয়াবহ ছিল। অবধারিত মৃত্যু উদ্যত ছিল, রাহুল প্রায় চোখ বন্ধ করেই লাফ দিয়েছিল। বাবা মা মণি সবার মুখ মনে করে সে 'ফায়ার' বলে চিৎকার করেছিল। সে চেয়েছিল তাকে গুলি করা হোক, তাকে শেষ করে দেওয়া হোক।

ভ্রাতৃসঙ্ঘ ক্লাবের মাঠের মধ্যে লাফিয়ে নামল সে। সমস্ত শহর নিশুতির কোলে অসাড়, কেউ বুঝি জেগে নেই। এখনও রাহুল ভাবতে পারছে না, সে বেঁচে রয়েছে। তাকে গুলি করতেও নিষেধ করলেন এস.পি.। কিন্তু কেন? তাহলে কি তাকে মেরে না ফেলে কথা আদায় করতে চান তিনি? সত্য বললে দেবপ্রতিমের আসল পরিচয় জানা হয় তার। কিন্তু সেই সত্য শুধু একটি তথ্য মাত্র, তা ফাঁস করে দিয়ে সবিতার মুখ চিরতরে ম্লান করে দিতে পারে না রাহুল। পারে না সে, কিছুতেই পারে না। মাঠের মধ্য দিয়ে তীরবেগে ছুটে যেতে যেতে এস.পি.-র স্ত্রীর হাহাকার করা কান্না মনের মধ্যে জেগে জেগে ওঠে।

পালাতে পালাতে রাহুল টের পায় ঠিক তার পিছনে কেউ তেড়ে আসছে।

রাহুল ক্লাবের মাঠ ছেড়ে মোহন সিনেমার মাঠে নামে। কে একজন ছুটে আসছে তার পিছনে। সে পিছনে আর চেয়ে দেখে না। মাঠ ছেড়ে আবার রাস্তায় ওঠে। তারপর গঙ্গার ধারের রাস্তার দিকে ছুটে যায়। পারঘাটে এসে নৌকায় লাফিয়ে পড়ে। খুঁটায় বাঁধা দড়ি খুলে দেয় সেই একজন যে তার পিছু ধাওয়া করে আসছিল।

দড়ি খুলে দিয়ে মণিও নৌকায় উঠে এল। বৈঠা টানতে থাকল। এই নৌকায় এত রাতে কোনও মাঝি ছিল না। এখানে নদী এখনও গভীর।

মণি ডেকে উঠল—রাহুল দাদা!

—কে? কে তুমি বৈঠা বাও?

মাঝগঙ্গায় এসে মাও-সে-তুং এবং সি.এম.-কে নিয়ে গাওয়া একটি লোকগানের নকল করে হেঁড়ে গলায় মণি গেয়ে উঠল—

বৈঠা বায় মণি অধিকারী,
দাঁড়ে আছেন রাহুল চৌধুরী ॥
হেঁইও হো, হেঁইও...
করতে করতে মণি প্রাণখুলে হেসে ওঠে

—তুমি গানটা জানো দাদা?

—হ্যাঁ, ভাই!

—এটা আসল নয় কিন্তু।

—এখন এটাই আসল মণি। আমাদের আর কেউ নেই। তুই আর আমি এখন একটা বিন্দু। কী করে যে বাঁচলাম! এত সাহস আমার ছিল না কখনও।

—নূপুর বোন কাঁদে রাহুলদাদা! আমাদের চার বিঘার দাগ বাঁধা পড়েছে। পরিবার ফেরার হয় হয়, তুমি ঘরে যাবা না?

—যাব মণি! নিশ্চয় যাব।

—বউদি নির্দয় হলেন, চাকরি হল তেনার। সংসার ভাঙল। আমার আর কিসের অধিকার রাহুল ভাইয়া! পড়াশুনা হল না! খেতখামার শুকিয়ে গেল।

দাঁড় এবং বৈঠার ছপছপ শব্দ হয় জলে, আকাশতলে। রাহুলের মনে হয়, ছোট ভাইটি তার এ সংসারে যথেষ্ট বুড়া হয়ে গেছে। মণির মুখের ভাষায় বৃদ্ধের বয়ান, গলার গানে বিপ্লবের পাগলামি। এই ছেলে কি সত্যিই বেঁচে থাকবে?

ওরা দুইভাই নদী পেরিয়ে নদীপাড়ের পথ ধরে। পায়ে চলা সিঁথির মতন সরু পথ। চারপাশে গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যবর্তী পথটি এসে উঠেছে রাধারঘাট ব্রিজের গায়ে।

তারা ব্রিজের উপর উঠে স্থির করতে পারে না, কোনদিকে যাবে। যদি নিজের গাঁয়ে ফিরতে হয় তাহলে ফের ব্রিজের সড়ক ধরে শহরের মধ্যে ঢুকতে হবে। রাতে যানবাহন পাওয়া যাবে না। বাস নেই। দু'একটি লরি আচমকা এই ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কখনও এদিকে কখনও ওদিকে। ড্রাইভার দয়া করলে রাহুল বহরমপুরের ওপর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু ড্রাইভার লরি থামিয়ে ওকে তুলে নেবে এমন ভরসা করা যায় না। তথাপি চেষ্টা করে রাহুল।

বিশ পঁচিশ মিনিট পর আর একটি লরি আসে। মণি এবং রাহুল দু'জনে দু'হাত তুলে লরির হেডলাইটের সামনে এমন ভঙ্গিতে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়াল যে, লরি বাধ্য হয়ে থামল।

সেটি ছিল গোয়াসের করুণাবাবুদের লরি। সেই লরি করে রাতারাতি রাহুল মণিকে সঙ্গে করে গোয়াস পর্যন্ত চলে আসে। চেনা লরি, ওদের কাছে ভাড়া নেয় না।

রাহুল ভাইকে সঙ্গে করে পথ হেঁটে চিৎপুর পৌঁছায়। তখনও ভোর হয়নি, অন্ধকার আছে। মায়ের সঙ্গে দেখা করে রাহুল। বাড়িতে বুলবন ছিল না। মা রাহুলকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আয়েষা কাঁদতে কাঁদতে শুধালেন—তুই আমার কাছে থাকবি তো মেজ খোকা!

রাহুল বলল—আমি এস.পি.-র বাংলো থেকে পালিয়ে এসেছি মা! আমাকে এখনই কোথাও গা ঢাকা দিতে হবে। বুবন কোথায়?

আয়েষা দাঁত দিয়ে শাড়ির পাড় চেপে ধরে কান্না দমাতে দমাতে বললেন—মাঠ-পাহরায় গেছে বাবা! ও কি আর মানুষ আছে! বউমার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

রাহুল হ্যারিকেনের আলো খাড়া করে তুলে তারই খাটে ঘুমন্ত নূপুরের মুখটা দেখে নিতে নিতে বলল—বুবনের জন্য কষ্ট হয় মা!

তার বেশি কোনও কথা এ মুহূর্তে রাহুলের মুখে আসে না, সে একটি চাপা ব্যথা বুকের তলে চেপে রাখে। ফুলভানু কিংবা হুকুম কারও সঙ্গে দেখা না করে রাহুল বলল—আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছি, একথা কাউকে বলার দরকার নেই। বুবনকে শুধু বলবে, আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি, ও যেন চিন্তা না করে। বলবে মণির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। শোন! তরফদার অথবা ললিত-শশাঙ্ক, কারও কাছে বাপুর জন্য দরবার করবে

না।

ঘর থেকে বারান্দায় আসে রাহুল এবং হ্যারিকেনটা মায়ের হাতে এগিয়ে দিয়ে নীচে নামে সিঁড়ি দিয়ে, তারপর বুলবনের ঘরে এসে থামে। বাবার মিলিটারি পোশাকপরা, পিঠে বন্দুক বাঁধা ফটোর সামনে দাঁড়ায়, ফটোখানি অন্য ঘর থেকে এঘরে এসেছে, ঠিক বুলবনের সিঁথানের দেওয়ালে উঠেছে।

ফটোর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রাহুল। অন্য দেওয়ালে একটি কিশোরীর দাঁড়িয়ে থাকা ফটো, যা তার চোখে নতুন, দেখতে পায়। এক মিনিট চেয়ে থেকেই বুঝতে পারে এটি বউদির ছবি। বউদির চোখে পবিত্রতা, পৃথিবীর প্রশান্ত-বিস্ময়। এই মেয়েকে ভালবেসে একজন মানুষের সকল কষ্ট দূর হতে পারে বলে মনে হয়। চকিতে প্রাণটা কেমন করতে থাকে।

আয়েষা বললেন—মেজখোকা ! কখনও দেখা হলে বলিস ; বাপু যদি ফেরে, তেমন যদি নসিবে ঘটে, বউমা যেন একটিবার আসে। তোরও তো ভালবাসার দাবি আছে রাহুল, তা-ও কি সে অস্বীকার করবে ?

—মা ! বলে এক নিমেষ চুপ করে থাকে রাহুল। তারপর যেন নিজেকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে চালিত করে সামনে। বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে চেয়ে দেখে। ওই নক্ষত্রটি ভোর হয়ে আসার সংকেত ঘোষণা করছে। সংবিত হয়, আর দেরি নয়, আর দেরি নয় ; এবার পালাতে হবে।

সহসা মায়ের হাতে ধরা ঝুলন্ত হ্যারিকেনের শিখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাহুল বলে উঠল—মা ! বুবনকে ব'লো না আমি এসেছিলাম।

—বলব না।

—বলবে না আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি। দরকার নেই ওকথা বলার। বলবে, ও যেন ওষুধ খায়। বলবে না, আমার সঙ্গে মণির দেখা হয়েছিল। শুধু কেন আমি ওর জন্য কষ্ট পাব ! ও কেন আমাকে আত্মহত্যার ভয় দেখায় ! ওর কষ্ট পাওয়া দরকার। বাপুর জন্যে, আমার জন্যে, বউদির জন্যে।

—বাপু কি ফিরে আসবে মেজখোকা !

—তুমি নামাজ পড় না মা ? নিষ্করুণ দুনিয়ায় কোরানই হয়তো তোমার শেষ আশ্রয় মা। হৃদয়হীন পৃথিবীতে তোমার ধর্ম, সেই-ই একমাত্র হৃদয়। এ আমার কথা নয় মা। মার্কসের লেলিনের কথা। আমি বারবার এই কথা বলি। আগেও বলেছি। আবার বলছি। তুমি আমার রাজনীতিকে ভয় ক'রো না। আমরা নিষ্ঠুর নই।

—তাহলে বউমা এত নির্দয় হয় কেন খোকা ?

—ওরা বোঝে না ব'লে !

—তুই-ই যদি বুঝেছিস, তাহলে চলে যাচ্ছিস কেন ?

রাহুল এবার চমকে উঠল। আর কথা বলতে পারল না। নক্ষত্রের আলো থেকে চোখ সরিয়ে এনে ধূলার পথে চাইল। তার দু'পায়ে জড়াতে থাকল মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

মণি তার পিছুপিছু আসছিল। পদশব্দে পিছনে ফেরে রাহুল। ফিরে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—এই চাবিটা তোর কাছে রেখে দে মণি। ঠিক যেখানে বন্দুকটা রেখেছিস, সেখানে। বউদির সঙ্গে দেখা ক'রো। ব'লো, আমি বেঁচে আছি।

রাহুল আর দেরি করে না। ছুটতে শুরু করে।

জলগেটের কাছে পৌঁছায় রাহুল। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সামান্য উঠে থাকা কপাটের ফাঁক দিয়ে উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণিলাগা স্রোত প্রবাহিত হয়ে বিলের ভরাট জলের ভার অনেক কমিয়ে এনেছে। অন্ধকার ছেয়ে আছে জলের থমথমে উপরিভাগে একখানা অতি বিশাল কম্বলের মত।

জলের চাপ কমে যাওয়ায় জলের ডাক আর তত তীব্র নয়, তবু কোঁ কোঁ আওয়াজ দিচ্ছে থেকে থেকে। আদিত্যদার সঙ্গে এই জল নিয়ে কথা হয়েছে অনেক, কতবার, কতদিন। এই স্রোতের বুকে হত্যাকাণ্ড হয়েছে, ঝুপ শব্দে প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। গোকুলদানা গ্রামের মাঠ-প্রহরী লক্ষণ দাস কদমতলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিত এখানে, সে নেই। পুলিস-চৌকি বসেছিল এখানে, তা-ও উঠে গেছে। এখানে গেটের কপাট নামিয়ে দেওয়ার জন্য জল রোখো আন্দোলনে এসে মাহেফরাসদের জীবন অনেক নষ্ট হয়েছে।

প্রাণ গেছে বলে, জীবন নষ্ট হয়েছে, ভাবছে কেন রাহুল ? এই জলের প্রকৃতির মধ্যে কর্মজীবী নিঃস্ব বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামের কোনও সত্যই কি নিহিত নেই ? জল নেমে গেলেই কি আন্দোলন ফুরিয়ে যায় ! জলে কি আবার পূর্ণ হয় না নদী, খাল, বিল ? জলগেটের নিয়ন্ত্রণ তাহলে ছাড়ে না কেন ললিত-নাটা-তিমিরের রাজনীতি !

জমি যার জলও তারই, এই আকাশ এবং প্রকৃতি তারই, সেই স্বত্বাধিকারী মানুষ কি চিরজয়ী এই দেশে ? ন্যালার মৃত্যুই কি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ? হাওয়া বিবির কান্নাই কি শেষ কথা ? বাপুর নির্যাতনেই কি কালো ভারতবর্ষ চির-আহ্লাদিত সুখি এক সভ্যতার নাম ? কবি-মুমতাজের আত্মত্যাগ কি জীবনের প্রহসন মাত্র ? পাহাড়-কন্দরে জেগে ওঠা চারু-স্ফুলিঙ্গ কি এই জলের বুকে শত সহস্র মশালের আলো ছড়িয়ে এই সেদিন কোনও স্বপ্নই রচনা করেনি ? স্টিমবোট নেমেছিল এই জলে, কালোগাড়ি এসেছিল এই ভূমিতে, এই গাঁয়ে—সত্য বটে, এসেছিল—কিন্তু মশালের আলোও কি সত্য ছিল না ?

কালো কম্বলটা কে যেন আকাশের দিকে গুটিয়ে তুলে নিচ্ছে। বদলে পূর্বাকাশে ঈষৎ রক্তিমাভার আগে সাদা করছে রঙ। কবির সেই ডোঙাটা কে যেন বেঁধে রেখেছে জলখুঁটায়। কে রাহুলের নামে কলেজে প্রক্সি দিয়েছিল সে জানে না, কে ডোঙাটা বেঁধে রেখেছে তা-ও অজানা। কবি সাঁতার জানত না, শহরের ছেলে, তবু সে ডোঙা চালনা অভ্যাস করেছিল। সে খুঁজে ফিরেছিল একটি ছিনতাই করা লুক্কায়িত বন্দুক, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হদিস পায়নি তার। কিন্তু সে জীবনের একটি বিচ্ছিন্নতা-প্রবণ বিন্দু খুঁজে পেয়েছিল।

বিন্দুভাঙা হয় বিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, যেভাবে আলোকণিকা থেকে আলোক-কণিকা ছড়াতে থাকে। চারু-স্ফুলিঙ্গ ধাতব, কঠিন ; কিন্তু বর্ণময় এবং উদ্ভ্রান্ত ; কবির প্রাণের মত অসহিষ্ণু, আত্মত্যাগী অথচ আত্মবিচ্ছেদবাদী। তার এই বিচ্ছেদ তারই আপসহীনতার জন্য।

রাহুল নিজেকে বলল, আমি এখনও মনে করি না এই জলকে আমি ভুল দেখেছি। ব্যথা তরফদারের আঁচলে বাঁধা জলগেটের চাবি ব্যথার নয়, একথা এখনও বিশ্বাস করি। মণির কাছে রইল সেটি।

রাহুল কি খুব আশ্বস্ত হয়েছিল এভাবে ? ডোঙায় চড়ে ভাসিয়ে দেয় নিজেকে প্রণামপুরের দিকে। ভেসে যেতে যেতে ভাবে, আবার শুরু করতে হবে, নতুন ক'রে, বাপুর নামেই স্লোগান দেবে সে। বাপুর নামে স্লোগান দিতে আজ আর তার দ্বিধা নেই।

মণি বুঝতে পেরেছিল, রাহুল ভাইয়া প্রণামপুরের দিকেই গেছে। চাবিটা সে লুকিয়ে

রাখল। তারপর বুলবনের কাছে এল মাঠের মধ্যে। রবিশস্য ম ম করছে পাকা গন্ধে। বুকভরে নিঃশ্বাস টেনে নেয় সে। বারবার বাপুকে মনে পড়ে যায়।

ঝুপড়ির মধ্যে একখানা পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে ছোট একটা বালিশে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে বুলবন। মণি বুলবনের কিছুটা গুটিয়ে দ করা পায়ের কাছে নিঃশব্দে চুপচাপ বসে। ভাইয়াকে ডাকে না।

শুধু একটা কাজলকালো পাখির চোখের মত বুলবনের ঘুমন্ত মুখের দিকে প্রায় অপলক চেয়ে থাকে মণি। চেয়েই থাকে নিমেষ নিমেষ। ক্রমশ এক মায়া, ক্রমশ বেদনা মণিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

শুধু এই মায়া, শুধুমাত্র এক চাপা বেদনা মণিকে তাড়া করতে থাকে। তার কষ্ট কখনও সে কাউকে বলেনি। হাসপাতালের জানলার নীচের কাচে তার পা কেটে রক্ত ঝরেছে, কাউকে প্রকাশ করেনি সেকথা। সে কখনও প্রকাশ করেনি বন্দুকটা কোথায় আছে।

মণি সব চেপে রাখতে পারে, জীবন তাকে সেই শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু বুলবনের চেপে রাখা কষ্ট সে আর সহ্য করতে পারছিল না। কবি এবং মুমতাজের মৃত্যুর কষ্টও হজম করেছে মণি, বাপুর অকথ্য দুর্দশা দেখেও মুখ বুজে থেকেছে। শুধু এইটুকু ভেবে যে, বাপুকে সে স্পর্শ করতে পেরেছে হাসপাতালের জানলার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কখনও আর বউদিকে ছুঁতে পারবে না, এই কষ্ট অসহ্য। বউদি আর কখনও তার গায়ে হাত বুলিয়ে, মাথায় সস্নেহ স্পর্শ দেবে না, এ তার কাছে অসম্ভব কল্পনা। ও নিজেকে বলল, এ মিথ্যা। এ হয় না।

বুলবনের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উঠে দাঁড়াল আর সেই সময় বড় ভাইয়াটির ঘুম ভেঙে গেল।

—তুই ? কখন এসেছিস ?

—ভোর পোয়াতি তারাটা যখন জাগল, সেই তখন।

—দেখা হয়েছে ? থানায় নিয়ে গেল রাহুলকে ? জেলে ভরে দিল ?

—না।

—কী দেখলি, বল আমাকে ! যেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠল বুলবন। তারপর বলল—তোকে আমি জলঙ্গী বাসস্ট্যান্ডে দেখেছি, তখন বাসটা ছেড়ে দিল কিনা ! তখন আমার গায়ে খুব জ্বর, তোকে ডাকতেও পারলাম না। আদিত্যবাবু টিকিট কেটে দিলেন আমাকে। আমি চলে এলাম। শোন্ ! বলে বুলবন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

মণি জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

বুলবন বলল—তুই আর আমি ব্যথাখালার কাছে যাব। যাবি ?

মণি বলল ছোট্ট জবাবে—না।

বুলবন অতএব বলল—তাহলে একাই যাব। একা।

মণি চুপ করে রইল। মণিকে নির্বিকার দেখেও বুলবন রাগ করল না। ঝুপড়ি ছেড়ে মাঠে নেমে একা হাঁটতে থাকল আলপথ ভেঙে, সড়কে নেমে এল। দ্রুত হেঁটে তরফদার বাড়ি পৌঁছালো।

গেট খুলে রেখেছিল কিষাণ। এই প্রত্যুষে। গরুকে জাবনা দিচ্ছিল। প্রধান লোহার গেট পেরিয়ে কাঠের রুদ্ধ পাল্লায় ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। ঢুকে পড়ল বুলবন।

ভোরের ঈশ্বর-প্রার্থনা শেষে ব্যথা তরফদার নামাজের আসন গুটিয়ে রেখে সামনে

এগিয়ে আসেন।

—তুমি এত বিহানে ? কী সম্বাদ বুবন ?

—রাহুল অ্যারেস্ট হয়েছে খালা !

—শুনেছি বাছা।

—আপনি অনুগ্রহ্ করুন খালামা !

ব্যথার মুখে হালকা হাসি ফুটে উঠল। খুব স্থির গলায় বললেন—তোমার কথা আমরা ভাবি বুবন। আমি তোমার চাকরির ব্যবস্থা করব। ললিত আর তরফদার সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে।

—কী বলছেন খালামা ! আমি তো চাকরি চাইতে আসিনি।

—বউটা গিয়েছে যাক। পালিয়েছে, পালাক। ও তোমার বেঁদে রাখার জিনিস না ভাল হয়েছে। এবার তুমি আপন কৌমের মেয়েকে শাদি বসাও। আমি আছি।

—আপনি আছেন !

—হ্যাঁ আছি বাছা। তোমার জন্যে জানপরাণ করব। চাকরি দিব, ওঁরং দিব। বাগ-বাগিচা, ফসলপানি সব দিব। মেয়ে আমার দেখা।

—কে ?

বিমূঢ়-বিদীর্ণ বুলবনের মুখে বিস্ময়—কে ?

—আছে। মোহর আছে। আমার ভাগ্নী। তরফদারের থিকে তার যা পাওনার ভাগ, জমি-বাগান সব পাবে। মোহরের বাপের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে রেখেছি, তুমি আমার আত্মীয় বুবন। আস।

আসো—এই আহ্বান আজরাইলের মত ; মৃত্যুবৎ হিম, তীব্র। ভ্যাম্পায়ার পাখির শিস, পক্ষ-সঞ্চালন, মধুর বিষেভরা মধু এবং বিষ। এ প্রস্তাব আজ যেন কুপ্রস্তাব নয়, অপমান নয়, এ যেন জীবন-সম্মত। মরুভূমির উদ্যানে সেই একটা দীর্ঘচঞ্চু পাখির নিঃশব্দ আক্রমণ, সুদীর্ঘ ক্লান্ত মরুপথে প্রশান্তি কেবল।

তীব্র এক কৌতূহলে বোকার মতন শুধালো বুলবন, মোহরের বাপ রাজি হয়েছেন ?

—কেন, হতে পারে না ? তুমি তো অযোগ্য নও।

—মোহর ?

—তুমি কি মনে কর ফেরার রাহুলের সাথে আমার ভাগ্নী ঘর বাঁধবে ! রাজী নয় হয়তো, ধর নয়। আমি করাবো।

—জি !

—হ্যাঁ। আস।

বুলবন এবার কেঁপে উঠল। ঘাড় নীচু করল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে এল পথে। পথ পর্যন্ত ধেয়ে আসেন ব্যথা।

—রাহুলকে কালই এনে দিব।

—না।

—রাজি হও।

—না।

—কেন আপত্তি কর ? ভাইয়ের জান বাঁচাবে না ?-বাপের জান কি জান নয় বাছা ?

—আমার একটা ম্যারেজ-সার্টিফিকেট ছিল খালা মা ! কোর্টের সবুদ।

—ওটা দেখিয়ে তো চাকরি হয় না বড়খোকা !

—মোসলেমকে হায়নায় দংশন করেছিল, পা চিবিয়ে খেয়েছে। মনে আছে ?
—হঠাৎ একথা ?
—আর কত খালামা ! আর কত ?
—মানে ?
—ও আপনি বুঝবেন না।
—তাহলে আমার ছুড়াং ফিরত দেও বুলবন। মিটে যাক। তরফদারের বন্দুকটা আমার চাই।
—পারব না।
—মোহরকে নিকাহ্ কর।
—পারব না। এ অন্যায়, এ পাপ।
—বউটা তোমার পাপী নয় ? পাপ করেনি ?
—না।
—তোমার ঘর ভাঙল কেন ?
—তোমার জোতজমা আর তোমার ধর্ম আমার ঘর ভেঙেছে খালা মা ! তোমার রাজনীতি আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তবু এসেছিলাম দয়া চাইতে।
—মোহর তোমাকে পছন্দ করে বুলবন !
—ও আমার কমরেড।
—দোলাবিবিও কমরেড ছিল।
—আজও আছে খালা !
—আসো। এখনও টাইম আছে।
—না। আমি হীন। কিন্তু কুসিত নই। এমারজেন্সির চেয়ে এখনও আমার হৃদয় কালো নয় মিসেস তরফদার। তিমিরের মত আমি বিশ্বাসঘাতক নই। ললিতের মত ক্রূর নই।
—কী বললে ? বাংলাটা আবার বল। আরবি লব্জে বল।
—ক্রূর। বে-দীল্। বে-রহম। শয়তান।
—ও। এত বোকা উন্মত। এতই ছোটলোক !
—হ্যাঁ মাসী। তাই। বলে ঝড়ের বেগে বুলবন বাড়ির দিকে ছুটে এসে দেখে, মণি জামাকাপড় পরে স্নানশুদ্ধ ভেজাচুলে পিড়িতে বসে পুরনো আমসত্ব দিয়ে পানতা খাচ্ছে।
—কোথায় যাবি ভাই ? প্রশ্ন করল বুলবন।
মণি বলল—বহরমপুর। বউদির কাছে।

॥ ৫২ ॥

মণি গোরাবাজারের সমির মামার বাড়িতে এসে চন্দ্রিমাকে পেল না। কাজের বৃদ্ধাটি তাকে জানালো, চন্দ্রিমা চুনাখালির স্কুলে চাকরিতে গেছে। আজই প্রথম। মণি বুঝল, আজ বউদির জয়েন করবার দিন। একটা শুভ দিন বটে। কিন্তু মণির মধ্যে আনন্দ হলেও কী এক দুর্বোধ্য কষ্টে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল একসময়। ঘাড় নীচু করে হেঁটে হেঁটে সে খাগড়ার পার্টি-অফিসে এল।

সিঁড়ি ভেঙে বেশ ক' ধাপ উঠে এসে থেমে গেল। আবার নীচে নেমে চলে এল এবং পাকা সড়ক ধরে হেঁটে চলল জলঙ্গী বাস স্ট্যান্ডের দিকে। এভাবে তার একঘণ্টা সময় কেটে গেল শহরের পথে পথে। 'কল্পনা' সিনেমাহলের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে 'চারুলতা' সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখল চেয়ে চেয়ে। একবার টিকিট কাটার লোভ হল, কিন্তু পারল না। ওর চোখ এসে থামল 'সূর্য' সিনেমার গায়ে। পরবর্তী আকর্ষণ এবং চলিতেছে—দুটি জায়গাতেই হিন্দি সিনেমার বড় সচিত্র বিজ্ঞাপন দেখল। দারা সিং এবং মুমতাজের ছবি দেখল। খুব কুস্তি আছে, নাচ আছে,বুঝতে পারল। কিন্তু মুমতাজকে দেখে তার মুমতাজ আলির কথা মনে পড়ে গেল।

মুমতাজ আলির কোনও চিহ্ন পৃথিবীতে নেই। তবু মণি বাসে করে প্রথমে হাতিনগর অবধি চলে আসে। চুনাখালি ছাড়িয়ে চলে এসেছে। ফুলচাচার চায়ের দোকানের কাছে এসে নামে।

ফুলচাচার দোকানের অতি নীচু বাতার বেঞ্চিতে বসেছিল চাহরাম ব্যাঞ্জোবাদক, চাষী। তাকে দেখেই মনটা কেমন হুহু করে উঠল মণির। চাহরাম মণিকে চা খাওয়ালো। তারপর তাকে টেনে আনল নিজের বাড়ির দোতলায়। ব্যাঞ্জো বাজিয়ে শোনালো একঘণ্টা। রুটি, আলুভাজা আর খেজুরের ঝোলা গুড় খেয়ে পানি খেল মণি। তখন একটা নীল ডুমো মাছি মণির চারপাশে উড়ে বেড়াতে থাকল।

মণি তার হেঁড়ে গলায় গান করল :

ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে
রইব না আর বেশিদিন তোদের মাঝারে...

চাহরামের মুখ চকচকে করে কামানো। পরনে ইসমাইল লুঙ্গি, গায়ে সানফ্রাইজের জামা, জামার বুকপকেটে একখানা নোটবুক এবং পাইলট পেন, পুরনো। তাছাড়া হাতে পীতবর্ণ অ্যাংলোসুইজ ক্যাভালরি ঘড়ি, ঘড়ির চেন জাফরি কাটা, তাও নবীন নয়। আরবি আতরমাখা চাহরাম গান শুনে বলল—প্যাথেটিক গান মণি। জীবনভর তাজের কারণে চোখের পানি ফেলববেটা। সাঁওতাল মেয়েটা খালি কাঁদে গো। শুনো, এই জীবনটার তো ইতিহাস লিখা হবে না, যদ্দিন বাঁচব কাঁদব, ওই কালো মেয়েটা কাঁদবে, ব্যস !

একটু থেমে চাহরাম কাবার ছাপঅলা রুমাল মাথায় জড়িয়ে বলল—আসো ! তুমি একটা ছাতা নিবা ?

মণি মাথা নেড়ে ছাতা নিতে চাইল না। কিন্তু কোথায় যেতে হবে তাও বুঝতে পারল না। নিঃশব্দে চাহরামকে অনুসরণ করতে থাকল। চাহরাম মণিকে সঙ্গে করে মাঠের দিকে ঝোপঝাড় ঘেরা আম কাঁঠাল লিচু জাম পেয়ারা গাব বহড়া শিমুল ইত্যাদির বাগানে চলে আসে। এখানে ছোট দুই পুকুর আছে, তালগাছ আছে এবং বাঁশবন নিবিড়। বৈঁচির ঝোপ দেখা যায়, কিছু কাঁটালতা এবং নানান গুল্ম, চারা বটগাছ সন্নিহিত এখানে। এখানেই চোখে পড়ল সাদা রঙের পাকা কবর।

সাদা চুনকাম করা দেওয়াল তোলা স্মৃতি-সমাধি। বিষম আশ্চর্য হয়ে গেল মণি। কবরের গায়ে লেখা, মরহুম মুমতাজ আলি, পিতা অমুক, মাতা অমুক। সাং হাতিনগর। জন্ম ইং সন ১৯৫৪ সাল। মৃত্যু সন ১৯৭৬ সাল।

চাহরাম বিস্ময়-ব্যাকুল মণির দিকে চেয়ে বলল—গঙ্গার শ্মশান থেকে খানিকটা মরা ছাই এনে পুঁতেছি বাপ। লোকে বিশ্বাস করুক না করুক, আমরা করি।

মণি বুঝতে পারল পুলিসেরা শত সন্তানের মৃতদেহ গঙ্গার ঘাটে অর্ধদগ্ধ করে জলে

ফেলে দিয়েছিল, সমূহ জীবন ভেসে গেছে সেখানে। ছাই কিছু ছিল হয়তো। কার ছাই, কেউ জানে না। কিন্তু চাহরাম সেই ভস্মপ্রাণ তুলে এনে সমাধিস্থ করেছে। ইট গেঁথে সমাধি গড়েছে। মানুষ জানবে, এখানে এক যুবক একদা জীবিত ছিল, সে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখত। তার এক প্রেমিকা ছিল, বাপ-মা ছিল।

মণির নিজেকে বিদীর্ণ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল, পারল না। তার কেবলই বন্দুকটার কথা মনে পড়তে লাগল।

মণি ছুটতে ছুটতে চলে আসে পাকা সড়কের বোলতলায়। বাস ধরে চুনাখালিতে এসে নেমে যায়। একবার শুধু বউদির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে।

ছাই শুধু ছাই, বিশ্বাসে তাতেও প্রাণ আসে। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও মণি একথা ভেবে উঠতে সক্ষম হয়। ইতিহাস 'লিখা' হবে না, তাও সে বুঝতে পারে, কিন্তু সমাধির স্মৃতি থেকে যাবে, মানুষ বিশ্বাস করবে, লোকের মুখে বেঁচে থাকবে মুমতাজ আলি।

বউদিকে এই সমাধির কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। মণি একটি গাছের তলে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েদের জুনিয়র হাই স্কুল ছুটি হলে শিক্ষিকাদের দলের মধ্যে চন্দ্রিমাকে দেখতে পেল মণি। চন্দ্রিমাও মণিকে দেখতে পেয়েছে। দ্রুত পায়ে ছুটে এসে মণির হাত ধরে চন্দ্রিমা।

—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে মণি!

—আমারও বউদি!

—এসো।

ওরা প্রধান সড়ক ছেড়ে অন্য পথে নামে। মাঠের দিকে এসে পিচ ফুরিয়ে কাঁচামাটির পথ পড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে বসতি কমে এসেছে। আরও এগিয়ে এসে ওরা দেখল মাঠের সীমান্তে সূর্য নেমেছে দিগন্তপারের অপরাহ্ণ বেলায়। তখনও বেলা আছে যথেষ্ট। চাপা বাসন্তী আলো লেগেছে বাতাসে।

—রাহুল বাড়ি গেছে মণি?

—হ্যাঁ।

—বাড়িতেই আছে?

—না।

—কোথায় তবে ও, বলে গেছে?

—না।

—এস পি ওকে ছেড়ে দিয়েছিলেন?

—না। পালিয়ে এসেছিল রাহুল দাদা।

—এস পি কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। যাই হোক। মা কেমন আছেন? নূপুর?

—আছে। তোমার কত টাকা মাইনে হল বউদি?

—এখনও ঠিক জানি না মণি! চার পাঁচ মাস পর বেতন পাব তো! অ্যাড হক বেসিসে। পেলে পর বুঝব!

—চারবিঘার দাগ বন্ধক পড়ল। মা জমি বেচে দিবে। হুকুমকে আর রাখতে পারব না। ফুলভানু হয়তো থাকবে। তোমার কথা শুধায় বউদি!

—আচ্ছা!

নিরাসক্ত গলায় 'আচ্ছা' বলল চন্দ্রিমা। পায়ে পায়ে আবার পাকা সড়কের বাসস্ট্যান্ডের দিকে ফিরতে লাগল। এগিয়ে আসতে আসতে বলল—জমি একটা

আন-ইকনমিক হোল্ডিং, অলাভজনক সম্পত্তি। ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করার সামর্থ্যও নেই। কী হবে!

—তুমি বউদি বন্ধক জমিটা ছাড়িয়ে দিও!

—কার কাছে বাঁধা দিয়েছেন মা?

—বলে না। কিন্তু জানি।

—কার কাছে?

অনেকক্ষণ চুপ করে আছে দেখে মণির দিকে ঘাড় কাত করে চন্দ্রিমা বলল—তরফদারের কাছে?

—তুমি কী করে জানলে? ব্যাথাখালা সুদের ব্যবসা করে জানো বউদি? ধর্মের কিতাবে সুদ মানা।

—তুমি সেকথা জানো?

—জানব না! আমাদের মরণ হবে জমির গরাসে বউদি! আমার উস্তাদ মণি পাল বলেছেন, জমি ফুরালে পালানাটক, পঞ্চরস ফুরাবে। আমার আর হল না বউদি! তবে তোমাকে আর খাওয়া পরার কথা ভাবতে হবে না।

—আমার টাকা তোমরা নেবে মণি!

—তুমি দিবে?

—হ্যাঁ, দেব।

—ধার?

চন্দ্রিমা চমকে উঠল। সে বুঝতে পারল, চৌধুরীর পরিবারে তার সমস্ত অধিকার শেষ হয়ে গেছে, সেকথা এতই নির্মম! মণি আজ তার কাছে টাকা ধার চাইছে। তার উপার্জিত অর্থকে মণি পরিবারের রোজগার মনে করে না। মনে করে না এইজন্যে যে, চন্দ্রিমা চলে এসেছে, সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। মণির সাহস বড়জোর ধার চাইবার, একদা সম্পর্ক ছিল, তাই।

—তুমি আমার কাছে ধার চাইছ মণি? একথা বলতে গিয়ে চাপা কান্নায় গলার মধ্যে স্বর বসে যায় চন্দ্রিমার। চন্দ্রিমা কথা বন্ধ করে হাঁটতে থাকে দ্রুত।

বাস আসছে দেখে চন্দ্রিমা বলল—তুমি আমার সঙ্গে যাবে? হাতে টাকা এলে তোমার বন্ধকি জমি ছাড়িয়ে দেব।

মণি ইতস্তত করছিল বউদির সঙ্গে যাবে কিনা, এমন সময় তার চোখ পড়ল ডাক্তার বিশ্বরঞ্জনের ডিসপেনসারির দিকে। ডিসপেনসারি বন্ধ। কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে চাইবামাত্র বুঝতে পারল, ওটি আর ডাক্তারি চেম্বার এবং ওষুধের দোকান নয়, ওখানে মনোহারি দোকান হয়েছে। ওখানে খোদা বক্সকে দেখতে পেল মণি।

চকিতে খোদার কাছে ছুটে এসে একখানা হাত জড়িয়ে ধরল। খোদা বক্স অবাক হয়ে মণিকে দেখে বলল—ডাক্তারদাকে চিনতে?

—হ্যাঁ। খুব।

—এখানে বসতেন। কোথায় যে চলে গেছেন, কেন গেছেন, কেউ জানে না।

—ডাক্তার বউদি?

—হোমিওপ্যাথি করেন। ঘুনির ওদিকে পথের ধারে একটা ঝুপড়িতে বসেন। রুগিপত্তর দু-একটা হয়। চলে না। দেখবা একটিবার?

খোদা সতর্ক চোখে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে মণির হাত ধরে টানে। একটি

আমগাছের তলে চায়ের দোকানে টেনে আনে। চন্দ্রিমা সবই লক্ষ করছিল। বাস এসে দাঁড়াল। চন্দ্রিমা বাস ছেড়ে দিল।

খোদা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মণিকে বলল—কেউ সঙ্গে আছে ?

—বউদি আছে।

—গার্লস জুনিয়ারে চাকরি হল, শুনেছি। তা, কুথা যাবা ?

—ঠিক নাই। তাজ-ভাইয়ের কবর দেখলাম।

—হ্যাঁ। চাহরামের জিদ। ধর্মে লেগেছে। মুসলমানের চিতা হয়েছে কিনা ! তাই ছাই নিয়ে এনে ওই একটা ব্যবস্থা হল ! শুনো ! রাহুল কুনখানে বলতে পারবা ?

—প্রণামপুর।

—আমাদেরও পেছনে পুলিস ঘুরছে, ঠিক আছে যাও !

মণিকে ছেড়ে দিল খোদা বক্স। তারপর হঠাৎ পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকল—শুনো ! মীরা সিনেমার নাইট শো শুরু হওয়ার সেকেন্ড বেল বাজলে আজ রাতে থার্ড ক্লাশ কাউন্টারে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আসবা। এখন বউদির সঙ্গে যাও।

মণি চন্দ্রিমার কাছে চলে এল। আবার একখানা বাস আসতেই বউদির সঙ্গে উঠে পড়ল বাসে। চন্দ্রিমা মণিকে বাসের মধ্যে কোনও প্রশ্ন করল না।

বাস বহরমপুর পৌঁছাতে আধঘণ্টা সময়ও লাগল না। বাস থেকে নেমে চন্দ্রিমা রিকশা করে মণিকে গোরাবাজার নিয়ে আসে। রিকশায় চুপচাপ থাকে ওরা দুজনই।

—ওই কালো মতন ছেলেটির নাম কি ? খেতে বসে মণিকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজেও বেড়ে নিয়েছিল চন্দ্রিমা, মণি খেতে শুরু করলে প্রশ্ন করল সে।

মণি বলল—খোদা !

চন্দ্রিমা বলল—ওই-ই তবে খোদা বক্স ! তা, কী বলল তোমাকে ?

—রাহুল কোথায় জানতে চাইল।

—তুমি বললে ওকে ?

—হ্যাঁ।

—কী বললে ?

—প্রণামপুরে রয়েছে বলে দিলাম।

—কেন বললে ?

—ওরা তাড়া খেয়ে ফিরছে, যোগাযোগ দরকার। তাছাড়া রাহুলভাই কোথায় না বললে ওরা দিশা পাবে না।

—ওরা দিশা হারিয়েছে, আর পারবে না মণি। সব চূর্ণ হয়ে গেছে।

মণি কোনও কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল। খাওয়া শেষ করে ওরা দুজন মুখ হাত ধুয়েছে মাত্র, সমির মামা কোথা থেকে ফিরলেন তখন।

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে হাতমুখ ধুয়ে টিনের ঘটি নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে পৈঠার উপর দাঁড়িয়ে পায়ে জল ঢালতে ঢালতে বললেন—সংবাদ শুভ নয় চন্দ্রিমা।

—কী হয়েছে ! গামছায় হাত মুছতে মুছতে ঘাড় ফিরিয়ে মামাকে দেখে চন্দ্রিমা, গলায় শঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে।

—গাঁ থেকে আসছি, বুঝলে !

—আজ্ঞে !

—হ্যাঁ, খুব খারাপ। বাড়িতে শুনে এলাম, ব্যথা তরফদার প্রোপোজাল দিয়েছে খুব সুন্দর। মোহরের সঙ্গে বুলবনের বিয়ে, বুঝলে ! হাউ স্ট্রেঞ্জ ! মোহরের বাপ মা নীরব। মনে হচ্ছে, কনসেন্ট আছে। ভাবতে পারি না ! এসব কী হচ্ছে বল তো !

মণি লম্বা ধাপ ফেলে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। বউদির প্রতিক্রিয়া চেয়ে দেখার ধৈর্য তার থাকে না। দিশা আজ সকলেই হারিয়েছে মনে হয়। একবার শুধু রাহুলের সঙ্গে তার দেখা করতে ইচ্ছে হয়। মীরা সিনেমার থার্ড ক্লাশ কাউন্টারের কাছে এসে পৌঁছায় মণি।

মণি মনে মনে স্থির করে, ব্যথার হাত থেকে জীবনের নিস্তার নেই, অতএব খোদার সাহায্যে নাটা তরফদারের বন্দুক সে উদ্ধার করে ফেরত দেবে। সে সামান্য ক্ষুদ্র তুচ্ছ চাষী, সে পরাস্ত আজ। চাবিটা তারই কাছে রয়েছে, অপর একখানি লুকনো বন্দুক তারই কাছে গচ্ছিত। সবই জমা হয়েছে হাতের মুঠোয়।

কবি নয়, প্রকৃত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ আজ সে নিজেই করবে। রাহুলদাদা তাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করেছিল, সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা তারই দ্বারা সম্পন্ন হবে। একখানি বন্দুক সে চাহরামের দোতলার উপরে চোরকুঠরিতে দেখে এসেছে, কোণে খাড়া করা। কিন্তু ওখানে বন্দুক কেন প্রশ্ন করেনি। তার সন্দেহ হয়, ওটা তরফদারি গান, ওটাই। একবার শুধু খোদাকে শুধনো, ওটি সত্যই কার জিনিস।

প্রথম বেল বাজল টকিঘরে। মীরা টকিজ পুরনো প্রেক্ষাগৃহ, গুদোমের মতন, ওর ভিতরে সিনেমা চলাকালীন মানুষ খুন করার সুবিধা। পর্দায় প্রচণ্ড অ্যাকসনের সময় দর্শকের বুকে ছুরি চালিয়ে দিলে পর্দার আর্তনাদ আর হলের আর্তনাদ একাকার হয়ে যেতে পারে।

মণি অপেক্ষা করতে থাকে, কখন সেকেন্ড বেল বাজে। এদিক ওদিক দেখে নেয়। কাউন্টার খালি হয়ে গেছে। কাউন্টারের কপালে হাউসফুল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউন্টারের নীচে একটা ভিটকে রোমওঠা তেলমালিশ কুকুর শুয়ে কাটা লেজ সিধে করে পড়ে রয়েছে। কোথায় একটা পাগল চিৎকার করে গান ধরেছে, দেখা যায় না। এখনও গেট দিয়ে দর্শক ঢুকছে দু'চারজন। এখানকার গলিটা সংকীর্ণ, দিনের বেলাতেও অন্ধকার। উপরে ছাদ, কখনও সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। এখানে ওখানে প্রস্রাবের দাগ, পথের উপর দিয়ে টিউবওয়েলের জল গড়ায়, স্যাঁতানো এবং প্রখরভাবে পিছল ; পা হড়কালে ড্রেনের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়তে হবে।

একটা লোক পা টিপে টিপে মণির কাছে এগিয়ে এল। খুব অচেনা।

দ্বিতীয় বেল বেজে উঠল আর লোকটি মণিকে ডাকল—এসো ! চোখের ইশারা করল মানুষটা।

মণি কেমন শঙ্কিত হয়ে ওঠে, সত্যিই কি তাহলে একটা সাংঘাতিক ঘটনা কিছু ঘটে যাবে এখন ? লোকটার পিছুপিছু মণি মন্ত্রচালিতের মত চলে আসে থার্ডক্লাশ নয়, চতুর্থ শ্রেণীর দর্শকাসনে, যাকে বলা হয় গান্ধীক্লাশ। গেটম্যান তাদের দুজনের টিকিট পর্যন্ত দেখতে চাইল না। চতুর্থশ্রেণী দিয়ে ঢুকে ওরা সেকেন্ড ক্লাশে চলে এল। তারপর প্রথম শ্রেণীর দর্শকাসনের প্রথম রো-এ এসে দেখে সমস্ত সিট খালি—শুধু মাঝখানে একটা লোক একটিমাত্র আসন দখল করে, বসে রয়েছে একা। তাকে দেখেই চমকে উঠল মণি। তিমিরবরণ।

মণিকে দেখে সহাস্য মুখে তিমির ডেকে ওঠে—আরে ! তুই ? আয়।

যে-লোকটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, পিছন ফিরে মণি দেখল লোকটি নেই। পর্দায় আলো পড়ল তখনই, প্রেক্ষাগৃহের আলো দ্রুত নিবে গেল। দর্শকদের সকলকে আবছা মূর্তির মত দেখায়। মুখের খুব কাছে ঝুঁকে না দেখলে মানুষ চেনা যায় না।

মণি কী করবে বুঝে পাচ্ছিল না। হঠাৎ আবার সেই লোকটা এল। মণির হাতে টিকিট গুঁজে দিয়ে বলল—ওর পাশে বস গিয়ে। লোক আসছে।

অন্ধকারে টিকিট গুঁজে দিয়ে লোকটা আবার চলে গেল। ঠিক বোঝা গেল না কী করে কী হচ্ছে! ফার্স্ট রো-এর সিট সব খালি কেন? প্রথম শ্রেণীর পর পর্দার দিকে দ্বিতীয় শ্রেণী। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গায়ে বিপরীত দিকে একটা খাড়া দেওয়াল। দেওয়াল ঘেরা এবং অনেকটা উচ্চ আসন শুধুমাত্র মেয়েদের। মেয়েরা এখনও কথা বলে গুঞ্জন করছে, একটা বাচ্চা চিল-চিৎকার দিচ্ছে।

তিমিরের পাশে বসল মণি। মণির গায়ে হাত দিয়ে তিমির বলল—রোজই দেখি। নাইট শো। খুব নেশা, বুঝলি! পিছনে তোর বউদি আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে রোজ নাইট শো দেখি। কেমন আছিস?

একটু থেমে তিমির ফের বলল—ঘাড় তুলে দেখলে বউদিকে দেখতে পাবি। আমার এই রো, এই সিট—বাঁধা। আমার ছোটমামার শেয়ার আছে এই হলে। পার্টনারশিপ বিজনেস।

—প্রত্যেক সিনেমা দেখেন?

—হ্যাঁ। তিনচারবার করে দেখি। মুঘল-এ-আজম চৌত্রিশ বার দেখেছি। আনারকলি একান্ন বার। বউ বিরক্ত হয়। পার্টির নেতারা হাসে, বুঝলি! তুই একা? ওই লোকটা কে রে? কোথায় যেন দেখেছি মনে হল!

—আমাকে টিকিট কেটে দিয়েছে।

—চিনিস না?

—না।

—চাকু খেলাম। কিন্তু মরলাম না। সিনেমার মত। ...রাতে কোথায় থাকবি?

—ঠিক নাই।

—বউদির ওখানে? ডাইভোর্স হয়েছে?

—মানে!

—দাদা-বউদির ছাড়াছাড়ি হয়নি?

—আপনি খবর রাখেন?

—রাখব না? পার্টি করতে হলে সব খবরই রাখতে হয়। হাঁড়ির খবর, পেটের খবর। এমারজেন্সির খবর। মিসা উঠে যাবে। শিগগির।

—কী করে জানলেন?

—এমারজেন্সি থাকবে না। আজ সন্ধ্যায় পার্টি-অফিসে আলোচনা হল।

—আপনার পার্টি সবই জানে, তাই না?

তিমির জবাব দেওয়ার আগেই চার-পাঁচজন এই রো-এ ঢুকে এল এবং মণিকে বলল—এই ভাই। তোমার সিট এটা নয়। দেখি টিকিট!

টিকিট দেখিয়ে সিটের নম্বর মিলিয়ে মণি তিন-চারটি সিট ছেড়ে কোণের দিকে সরে এল। তার ঠিক পাশে এসে বসল খোদা বক্স। পাঁচ মিনিট বাদে। একা ঢুকে এল।

তামাম রো সন্দেহঘন নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে উঠল মুহূর্তে। মণি তখন মনে মনে

ভাবছিল, জলগেটের চাবিটা ব্যথাখালাকে ফেরত দিয়ে দেবে সে। সবই সে পারবে, কারণ সে অত্যন্ত দীর্ঘ রেখার উপর দিয়ে নাকখৎ দিতে পারে মাটিতে। সে, এমনকি চুরি করে জমির আল পায়ের চাপে কেটে, অন্যের জমির জল টেনে নিতে পারে নিজের জমিনে।

এই সব যখন ভাবছিল মণি, খোদার মুখটা ওর কানের কাছে সরে এল।

—সব আমাদের লোক। ফিসফিস করে বলল খোদা। মণি এবার কিছুটা শিউরে উঠল। তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

অনুভূতির মধ্যে জিঘাংসার গন্ধ পেয়ে যায় তিমির। তার চোখের উপর ভাসতে থাকে একটি কালো ছাতা। মণি বুঝতে পারছিল, থানার ইনফর্মার তিমির আজ আর বাঁচতে পারবে না, অদ্যই তার শেষ রজনী। তিমির একজন বামপন্থী ক্যাডার এবং নেতা। তার পার্টির ভোটের প্রতীক কাস্তে হাতুড়ি তারা। কবির মৃত্যু এদের কখনও বিচলিত করেনি। এমন কেন হয়? একই প্রতীকের রাজনীতি কেন কবি এবং তিমিরকে শত্রু করে তোলে! ললিতমোহনের সঙ্গে তিমিরের মেলবন্ধন হয় কী স্বার্থে! আবার ললিতের অস্ত্র তিমিরের ক্যাডারকে হত্যাই বা করে কেন? যদি করে, তাহলে তিমির আর শশাঙ্ক একইভাবে শত্রু হয় কেন কবির?

ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই জটিলতার রহস্য ভেদ করতে পারে না মণি। পর্দায় সিনেমার শুরুতেই একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। মণির চোখের উপর রক্তাক্ত ছোরা ঝলসে ওঠে। পর্দায় ফিনিক দিয়ে ওঠে রক্তের ধারা এবং আর্তনাদ হয়। ভয়ংকর সেই হিংসার তীব্রতা। ওই পর্দা একটি ফুলের মত শিশুকেও খুন করে ফেলে। যে শিশু খুন হয়ে যায়, তার মাকে দেখা যায় পর্দায় উদভ্রান্তের মত ছুটে পালাচ্ছে। মায়ের পিছু পিছু তাড়া করে ছুটে যাচ্ছে নগ্ন ছোরা হাতে তিনজন ষণ্ডা।

মণির মাথায় ঢুকছে না পর্দায় কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে? ন্যালার মা যেন ছুটছে পর্দার উপর দিয়ে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, প্রান্তর পেরিয়ে। বিশাল বিস্তৃত মাঠ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে আমানির মা। অনেকখানি পশ্চাতে ষণ্ডা তিনজন। হাতে নাঙা ছোরা, একজনের হাতে কোষখোলা তরবারি।

তিনজনের মধ্যে প্রধান লোকটি শশাঙ্কমোহনের মত দেখতে। ভদ্র কিন্তু ভয়ংকর। শস্তা মারপিটের সিনেমার মত এই দেশ; এই সিনেমাটা খাঁটি। মণি বিশ্বাস করে।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল হাওয়া বিবি। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল, গাছের কাণ্ড প্রকাণ্ড, আড়ালে লুকিয়ে আমানির মা ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, ভয়ে কাঁদতে পারছে না। ওর বুকের নিশ্বাস দেখা যাচ্ছে, ওর মুখে ঘাম জমেছে।

ষণ্ডারা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, একটু আগে মায়ের শিশুকে তারা হত্যা করেছে, তারপর কেন মাকে তাড়া করে আসছে! তাকেও কি খুন করে ফেলবে?

লোক তিনজন হঠাৎ মেয়েটাকে দেখে ফেলল। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। মেয়েটাকে নগ্ন করে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। এবার সেই রাতের দৃশ্যটা মনে পড়ল মণির। দেওয়ালে ছায়া পড়েছে, কুপির আলো কাঁপছে। একটি শায়িত নারীছায়ার উপরে একটি পুরুষের ছায়া, ঠিক এখন সিনেমায় আমানির মায়ের দীর্ণ মদির ভয় এবং আনন্দমিশ্রিত চাপা সুখানুভূতি আর যন্ত্রণা।

পর্দা এবং পৃথিবী এক। এই হিন্দি সিনেমাটা এবং চিৎপুর মোহড়া গ্রাম একই। এখন তিমিরবরণ খুন হবে। ওই যে নায়ক আসছে ঘোড়ায় চড়ে।

তিমির দেখতে থাকে তার চোখের সামনে জেগে উঠেছে একটি কালো ছাতা। তাকে

আড়াল করে ফেলতে চাইছে একটি বড় কালো ছাতা। একান্ত পাশের দর্শকরা সিনেমার পর্দা ছেড়ে যেন তার পাশে এসে বসেছে। এরা ভিলেন, না নায়কের লোক, বুঝতে পারছে না তিমির। প্রত্যেকটা লোক যেন কবি। কারও মুখ আলাদা নয়, কেউ স্বতন্ত্র নয়। সব এক রকম।

এক রো ভর্তি কবি এবং মুমতাজ। তিমির দুর্বোধ্য ভয়ে গলায় কেমন শব্দ করে উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকারের ভাসমান জটলা ছাতার মত হয়। খানিকটা জমাট অন্ধকার চোখের সামনে ডাঁটিবিহীন ছাতা। তিমির দ্রুত গেটের দিকে ছুটে আসে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ে তিমির। বাইরে আকাশ অন্ধকার। অতি প্রকাণ্ড ছাতা। ছাতার বাইরে তাকে চলে যেতে হবে। মিসার অন্ধকার পেরিয়ে চলে যেতে হবে। জরুরি অবস্থার বাইরে চলে যেতে হবে। বিশদফা কর্মসূচির বাইরে চলে যাবে তিমির। তারপর কোথায় যাবে তিমির?

তিমির ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল। কবি বলেছিল, সে মায়ের কাছে ফিরে যাবে। পারেনি।

সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে তিমিরবরণ। স্যাঁতসেতে পিছল অন্ধকারে। জোরালো টর্চের আলো পড়ে সেখানে। একদল কবি এবং মুমতাজ বেরিয়ে আসে, তারাই আলো ফেলেছে। যখন তিমির পালাতে চেষ্টা করে আলো নিবে যায়। ছাতা তাকে ঘিরে ফেলে। পা পিছলে পড়ে যায় সে। ড্রেনের মধ্যে কাঁচের টুকরোয় আছাড় খেয়ে পড়ে। তীব্র আর্তনাদ হয়।

টর্চ জ্বলে ওঠে। পিস্তল প্রস্তুত হয়।

মণি চেঁচিয়ে ওঠে। —না। মেরো না। ছেড়ে দাও।

—কেন ছেড়ে দেব মণি?

—জানি না। তবু মেরো না। বলেই মণি তুহিনের হাত থেকে আচমকা টর্চ ছিনিয়ে নেয়।

তারপর ওখান থেকে এক লাফে সিনেমা হলের ভিতরের অঙ্গনে এসে দ্রুত ছুটে আসে অন্য একটি গলিতে। হতচকিত খোদা, তুহিন এবং অন্যান্যরা ঠিক করতে পারে না কী করবে! মণি এই গলি ধরে ছুটে এসে তিমিরের গলির প্রধান রাস্তার মুখে দাঁড়ায়। এভাবে চার পাঁচ মিনিট সময় কেটে যায়।

প্রধান রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে গলির মধ্যে আলো ফেলে দেখে কেউ নেই। তিমির চলে যেতে পেরেছে।

আর দাঁড়ায় না মণি। গোরাবাজার ফিরে আসে। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে কড়া নাড়ে না। ঘাড় নীচু করে চলে আসে আবার রাস্তায়।

মোহন সিনেমার মোড়ে আসে হাঁটতে হাঁটতে। সুলতানকে দেখে কাছে যায়। বলে—আমাকে একটু নিয়ে যাবেন?

সুলতান মণির কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। কোনও কথা ব্যয় না করে রিকশায় তুলে নেয় মণিকে সুলতান। তারপর রিকশা চালিয়ে দেয় বাড়ির দিকে।

সুলতানের বাড়ি রাত্রিতে শুয়ে থাকে মণি। ভাত বেড়েছিল বউ। মণি খেতে চায় না। কারণ সে গোরাবাজারে সমির মামার ওখানে খেয়েছে।

ঘুমানোর চেষ্টা করেও মণি পারে না। বারবার ঘুম ভেঙে যায়। বাঁশের খুঁটার উপর

তক্তা ফেলে মাচা তৈরি হয়েছে, তার উপর শেতল পাটি আর হাতে বোনা কাঁথা মেলে দেয় বউ। মণির শোবার ব্যবস্থা হয়। ঘুম আসে না। এক ধরনের ঝিমুনি আসে, চটে যায়।

সিনেমার পর্দা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মণি ভাবে, তিমিরকে ওভাবে বাঁচিয়ে সে কি ঠিক করল? টর্চটা সঙ্গে থেকে গেছে তার। তিমির কবিদাদাকে ধরিয়ে দেয় পুলিসের হাতে, তবু ওকে ওভাবে বাঁচালো কেন? সে কি মস্ত অন্যায় করল কিছু? তার কি কোনও পাপ হল? বুকের মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা হতে থাকে মণির।

খুব ভোরে উঠে মণি বিছানায় বসে থাকে। তার দুটি চোখ ফুলো ফুলো, লাল। রোদ লেগে জল গড়িয়ে পড়ে না, কিন্তু জ্বালা করে।

সুলতান শুধায়—নিদ হয়নি?

মণি বলে—না।

পিটুলির দাঁতন ভেঙে আনে সুলতান। মণিকে দেয়, নিজেও নেয়। দাঁতন করতে করতে হঠাৎ মণি বলে—আমি হাতিনগর যাব।

সুলতান বলে—বাহ্যেপেসাব কর, নাশতাপানি হোক। যাবা। মুখ ধুয়ে লাও। আমি পৌঁছায়ে দিব, রিশকায়। তা ফেরে কামে যাব গুরাবাজার। দিনমান প্যাডলারি করি, সর্বহারা মানুষ। ...কী জানেন মণিভাই, কবির লাশ কাঁধে করে গঙ্গাঘাট গেছি, কী কষ্ট! হরিবোল দিই, আর জানটা আল্লা আল্লা করে, কী ভয়! কবির চোখের পাতায় জুনাকি বসেছে, কী ঘটনা ভাবেন!

মণি অতঃপর সুলতানের রিকশা করে চাহ্‌রামের বাড়ি পৌঁছে যায়। বাড়ি ঢুকেই বলে ওঠে—চাচি আমি ঘুম যাব এখন। চাহ্‌রামচাচা কোথায় গো?

—ভুঁই দেখতে গেছে, রোদ চড়ল, বেলা হল, এখনও ফেরে নাই!

ঘোমটার আড়াল থেকে চাচী বলে ওঠে।

মণি বলে—আচ্ছা!

দোতলায় উঠে এসে চৌকির উপর পেতে রাখা বিছানায় শুয়ে যায়। মাথার কাছে টর্চটা রাখে।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মণি ভাবে, বাড়ির বাইরের নাড়ার গাদা ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে, ফুরিয়ে গেলে গরুর খাবারে টান পড়বে। ওরই মধ্যে মুমতাজের বন্দুকটা প্রথম লুকনো ছিল। নাড়াগাদা ক্রমশ ছোট হয়, এটি অনিবার্য ঘটনা এবং তাহলে বন্দুক ওখানে লুকিয়ে রাখা যায় না।

গরুর খাবার ফুরিয়ে গেলে কী যে হবে! গরু না খেয়ে মরবে। মা বলেছিল, নাড়া জোগাড় করতে। সমির মামার ওখানে যেতে, কেননা গাদাটা ছোট হয়ে এসেছে। মা এমনকি যে-কোনও স্থান থেকে কিনে আনার কথাও বলেছে, ঘুমিয়ে যেতে যেতে মণি ভাবে।

একটি গরুর মাথা এগিয়ে আসে মণির ঘুমের মধ্যে। গরুটা লাল রঙের। গরুটা মণিকে চাটতে থাকে জিভ দিয়ে, মাথা এবং গা। গরুটি এভাবে তার কাছে খেতে চায়।

ঘুম চটে যায়। আবার আসে। গরুটা মণিকে ছাড়ে না। মণির সমস্ত শরীর গরুর মুখের ফেনায় ভিজে যায়। সারা দেহ স্পন্দিত হয়। বাপের মুখটা ভেসে ভেসে ওঠে।

ট্রাক্টরের আওয়াজ শুনতে পায় মণি। এই ধরনের যন্ত্রলাঙল কখনও তাদের হবে না। ধনী-চাষী-জোতদার আরও ধনী হবে। শশাঙ্ক এবং ললিতের নতুন ট্রাকটর হয়েছে।

শশাঙ্ক এখন গরুর বদলে যন্ত্রের লাঙলের হিফাজত করবে।

কিন্তু মানুষের মুখে একটি গল্প চালু থাকবে, ন্যালা কী করে মরল ! শশাঙ্কমোহন একদা গরু ভালবাসত। তার রোখ ছিল জবর। একটি গরুর কাহিনীই আসলে একজন মানুষের কাহিনী। গরু মরলে মানুষও মরে।

শুনেন শুনেন মহাজন শুনেন দিয়া মন
ন্যালার কাহিনী আমি করি গো বর্ণন—
শুনেন সর্বজনে,
শুনেন সর্বজনে ঠিক জুবানে করি গো ব্যাখান
হালের গরু মারা গেলে কিসে বুনি ধান—
আসে কলের গরু,
আসে কলের গরু হয় গো শুরু নতুন ইতিহাস
গরিব চাষী কেঁদে মরে করবে কিসে চাষ—
ন্যালার জীবন গেল,
ন্যালার জীবন গেল রাত পোহালো
কলের গরু দিয়া,
চাষ করে কলের গরু কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
ন্যালা ধন্য হল,
ন্যালা ধন্য হল ফাল লাগালো গরুর চরণে
জীবন মারে গরু মারে কোন মহাজনে
তাহার নাই ঠিকানা—
তাহার নাই ঠিকানা তানাবানা কিসের জন্যে কী
আমানির মা বর্তমানে মহাজনের ঝি,
নাম তার ললিতমোহন—

জীবন আশ্চর্য বড়। হাওয়া বিবি ললিত-শশাঙ্কর বাড়িতেই এখন ঝিগিরি করছে। মণির ঘুম চটে যায়। বিছানায় উঠে বসে মণি।

চাহরাম এসে মণিকে দেখে খুশি হয়। দুপুর হয়েছে। মণিকে সঙ্গে করে পুকুরে যায়। স্নান করে আসে। ডবল ডিমের অমলেট, আলু ভাজা, ডাল, পটলের তরকারি, ছোট মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেতে দেয়। সঙ্গে বসে খায় চাহরাম। তারপর ওরা ব্যাঞ্জো বাজায় এক ঘণ্টা। মণি হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

—কী কষ্ট বাপ ?

—ঘুম হয় না।

—নামাজ রোজা কর ?

—না।

—করবা।

—জি ?

—করবা মাঝেমিশেলে দু-এক রিকাত, ফজর মগরিব করবা।

—বউদি কি ফিরবে না চাচা ! বাপু ?

—ফিরবে। সাহস রাখো।

—আমাকে দুই দশ পণ নাড়া দিবেন ? বাপু এলে শোধ দিব। না হয় বেচেন কিছু।

—ঠিক আছে, সাজাও গাড়িতে। চল।

খুবই অভিভূত হয়ে পড়ে মণি। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে পড়ে।

নীচে নেমে এসে গরুর গাড়িতে নাড়া সাজাতে থাকে। চাহ্‌রাম দেখতে থাকে মণির উৎসাহ, উজ্জ্বল মুখ।

চাহ্‌রাম প্রশ্ন করে—বলদগাড়ি নিয়ে যাবা। ফিরত আনবে কে ?

—আমি !

—কবে ?

—কালই, চাচামিঞা !

—বেশ।

একটুক্ষণ থেমে থেকে চাহ্‌রাম বলে—নাকি সাথে একটা কিষেন দিব ? খেদিয়ে যাক।

—না। একলাই পারব।

—দ্যাখো !

—জি। পারব।

—বেলা পড়ে আসছে মণি !

—গাড়ির তলে একটা আলো ঝুলিয়ে নিব।

—হ্যারিকিন ?

—জি।

—আচ্ছা। লাগাও তাহলে। জোরে হাত চালাও।

মণি প্রকাণ্ড গাদার রশি টেনে খুলে নাড়া টেনে এনে সাজাতে থাকে। চাহ্‌রাম হঠাৎ গাড়িতে উঠে আসে। তারপর বলে—আনো। আমি জুত করি।

গাড়ি সাজানো হয়। নাড়ার উচ্চতা রশিতে বাঁধা হয়। অকস্মাৎ মণি ছুটে যায় বাড়ির চিলেকুঠুরিতে। বন্দুকটা পেড়ে আনে। দ্রুত হাতে গুঁজে দেয় নাড়ার অভ্যন্তরে।

চাহ্‌রাম নির্বাক নিস্তব্ধ ভঙ্গিতে গাড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়ায়। বলদ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

—ওই জিনিস কী করবে মণি ?

—দরকার চাচামিঞা !

—সাবধান। খোদা যদি শুধায়.... ?

—বলবেন, আমি নিয়ে গেছি। এটা তরফদারের বন্দুক।

—সাবধানে যেও। কিন্তু আমি বোধ হয় বিপদে পড়লাম।

—না। বলবেন, আমি নিয়ে গেছি। যদি না শোনে আমি ফেরত আনব।

—ওটা ব্যবহার করো না বাপ। কিরা কর, করবে না।

—বাপের কিরা চাচা।

মণি যখন সদরঘাটে পৌঁছালো, সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। রাত না সন্ধ্যা বোঝা যায় না এতই গাঢ় অন্ধকার। বলদ জোড়া এত তেজি যে, হালকা-বোঝা তাদের গায়েই লাগে না। তেড়ে ছুটে আসে।

মণি গাড়ির উপর থেকে দেখতে পায় শরৎ পাঠাগারে আলো জ্বলছে। গাড়ি দাঁড় করায় সে, একজন চেনা লোককে আগলাতে বলে ঝাঁপ দিয়ে নামে।

জোর কদমে পাঠাগারে উঠে আসে। একটা ল্যাম্প জ্বলছে। পাঁচ ছ'জন লোক

মেঝেয় শতরঞ্চিতে বসে রয়েছে। বেঞ্চের উপর চারজন। টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বুলবন। বেঞ্চের কোণে মোহর।

ওকে দেখে সকলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো দরজার দিকে।

—মণি! বলে উঠলো মোহর।

—হ্যাঁ।

—কোথা থেকে আসছ?

বুবন বলল—বাড়ি যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ, যাব। উত্তর দেয় মণি।

—মোহরকে সঙ্গে নিয়ে যা। বুলবন নির্দেশ দেয়। একটু থেমে বলে—ওকে তরফদার বাড়ি পৌঁছে দিবি।

—তুমি যাবে না? মণি বুলবনকে প্রশ্ন করে।

বুলবন বলল—আমার রাত হবে।

—একা যাবে?

—না। একা কেন যাব? প্রণামপুরের লোক পর্যন্ত আছে সঙ্গে।

—কে?

—তুই চিনবি না। যা এখন। বলে মোহরের দিকে চেয়ে দেখে বুলবন বলল—ঠিক আছে, তুমি তাহলে মণির সঙ্গে চলে যাও। কাল কথা হবে।

মোহর উঠে দাঁড়ায়। বাইরে চলে আসে।

রাস্তায় এসে নাড়া বোঝাই গাড়ি দেখে বিষম অবাক হয় মোহর। বলে—এতে কী করে যাব? হেঁটে যাব?

মণি হা হা করে হেসে ফেলে বলল—আমারই বসবার ঠাঁই নাই। তুমি কোথায় বসবে? হবে না। তুমি বুলবন ভাইয়ের সঙ্গে এসো।

—না। আমি তোমার সঙ্গেই যাব। হেঁটে যাব। তুমি গাড়িতে ওঠো। বলল মোহর।

সম্মুখে হেঁটে চলে মোহর। অন্ধকারে তাকে অনুসরণ করে গরু। মণি হাঁকিয়ে চলে গাড়িখানি। গাড়ির তলে ঝাপসা আলো জ্বেলে নেয় ঝুলন্ত হ্যারিকেনে।

মোহর বলল—আজ এখানে আদিত্যদার আসার কথা ছিল। তাই মিটিং। বুলবন ভাই এসেছেন, লোক জোগাড় করে এনেছেন। বহরমপুরের এক কমরেড সুতনু এসে মোহড়ায় নেমেছে গতকাল। দুদিনের প্রস্তুতিতে এই মিটিং। সুতনু যদি চাঙ্গা করতে পারে। বুলবন ভাই কেমন ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়েছেন। অবশ্যি বউদি থাকলে এমন হত না।

—আদিত্যদা আসেনি এখনও! মণি মন্তব্য করে।

—আসবেন হয়তো। সময় এখনও আছে। বলল মোহর।

—তুমি চলে এলে যে!

—রাত হয়েছে কিনা! বুলবনভাই চাইছেন না আমি থাকি।

—রাত হয়েছে, তবু আদিত্যদা আসবেন?

—নিশ্চয়। ডোমকলে আছেন। সেখানের মিটিং শেষ করে আসবেন।

হঠাৎ মণি বলে উঠল—তুমি বুলবনভাইকে বিয়ে করছ মোহর আপা?

—কে বলেছে তোমাকে?

—রাহুলদাদার কথা তোমার মনে নাই ?

সমস্ত পথ আর কোনও কথা বলল না মোহর। মণির মনে হল, মোহর বোধহয় বুলবনকে বিয়ে করতে চাইছে। বউদির মুখটা বারবার মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। বাড়িতে এসে গরুগাড়ি প্রাঙ্গণে দাঁড় করে ভিতর থেকে লণ্ঠনের আলো এনে, সেটি মোহরের মুখের কাছে তুলে মণি চেয়ে দেখল, মোহরের চোখে উপচে পড়তে চাইছে জল। মা এসে মণির পিছনে দাঁড়ালেন।

মোহর বলল—আমি ব্যথামামীর ওখানে যাব না খালা মা। রাতটুকু আপনার কাছে থাকতে দিন!

মণির মনে পড়ল বন্দুকটা লুকাতে হবে। এখনই। সাবধানে। একা।

॥ ৫৩ ॥

রাহুলের চোখের সামনে নদী। নদীর সংলগ্ন বিলের জল-পরিসীমা। চোখেরই সামনে ফিরতি জলের নিষ্ক্রমণ। ধীরে ধীরে জলগেটের খানিকটা তুলে রাখা, যা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি, সেই ফাঁক দিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে জলরাশি, জলের রূপালি শস্য মাছ। চেয়ে চেয়ে দেখতে হচ্ছে রাহুলকে।

এক-একটি সাদা মাছ যখন গেটের এদিকে অথবা ওদিকে লাফিয়ে ওঠে ঘূর্ণি ভেদ করে, রাহুলের রক্ত ছলাত করে চমকে ওঠে। মাহেফরাসের চোখে এ এক অতি পরিচিত দৃশ্য। দীর্ঘ গড়ানে খানিক দূর চলে গিয়ে নদী নিজেকে খাটানের বন্ধনে ধরা দেয়, এই অংশে নদী নাটা-শশাঙ্কর নদী হয়ে যায়—সেই সাদা মাছ এখানে এসে খাটানো জালে লাফিয়ে পড়ে।

মাহেফরাসের একটি বড় দল এখানে এসে জুটেছে। খাটানে খাটানে তাদের জনরব শুনতে পায় রাহুল। নাটার খাটানের সংখ্যা বেশি, ললিতের কম। নদীকে তাঁরা শৃঙ্খলিত করেছেন মাছ আদায়ের জন্য। বাঁশের শক্ত বেড়া দিয়ে বেঁধে মধ্যবর্তী অংশ খুলে দিয়ে জাল পাতা হয়েছে, মাছ এসে লাফিয়ে পড়ছে সেই জালে অথবা বাঁশেরই তৈরি চালুনিতে—এরই নাম খাটান।

মাহেফরাসরা মাছের ঢাকি অর্থাৎ বড় টোকরি পেতে নদীর পাড়ে বসে রয়েছে। মাছের ভাল চালান যখন জালে বা চালুনিতে জড়ো হচ্ছে, ওরা বাঁশের সাঁকো ধরে খাটানে এসে সেই মাছ কিনছে। এক চতুর্থাংশ টাকা জমা দিয়ে মাছ পাচ্ছে তারা, বাজারে বেচে এসে নিজের লভ্যাংশ রেখে বাকি অর্থ জমা দিতে হবে।

নাটার জাল বুনে দেয় হালদারপাড়ার ধীবর-কারিগর। বেড়া-বাঁধের বাঁশবেড়া বাঁধে তেরোঘরা। মুসলমান-ধীবর জালবোনার কারিগরি জানে না অতি উত্তম, অর্থাৎ মাহেফরাসরা সে অর্থে অদক্ষ জেলে। তারা জল পড়ে গেলে কুমে মাছ ধরে পলুই ঝাঁপিয়ে ; ছোট জালে মাছ তোলে বিলে।

এরা নাটা-ললিতের খাটানে জড়ো না হয়ে আর কী করতে পারে! এখানে জল রোখো আন্দোলন প্রথম এক নদীর বিরুদ্ধাচরণ—রাহুল ভাবল, তার রাজনীতি সেই নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। তার রাজনীতির দৃষ্টিটা সঠিক স্থানেই পড়েছিল। নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ইতিহাসকে মুঠোয় ধরা যেত এবং তখন নদীর উৎপন্ন শস্যে

সমাজতান্ত্রিক মানুষের অধিকার কায়েম করা যেত।

নাটা বা ললিত আজও কপাট সম্পূর্ণ খুলে দিতে পারেননি। কবি যেভাবে রেখে গেছে জলগেট ঠিক সেইভাবেই রয়েছে। নদীকে প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্ঞানের কলাকৌশল, সেই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি চাবি, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সেই চাবির অধিকার দিয়ে রেখেছে ব্যক্তি-মালিক নাটাকে, সেই চাবিকে পাহারা দেওয়ার জন্য এই রাষ্ট্রই বন্দুকের লাইসেন্স দিয়েছে নাটার নামে। খুব সহজ হিসেব। মাহেফরাসরা এই চাবি আর বন্দুকের ইতিহাস জানে। নাটার বন্দুককে রক্ষা করে পুলিস-প্রশাসন এবং ললিতের রাজনীতি।

রাহুলের রাজনীতি সরাসরি নাটার বন্দুক এবং চাবির উপর হস্তক্ষেপ করে। অতএব রাজনীতির কার্যকারিতার বিচারে প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী কর্মসূচি ভুল ছিল না। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের চাবিটা যে প্রবল শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তাকে হটানোর সামগ্রিক উদ্যোগ রাহুলের জানা নেই। যদি এলাকাভিত্তিক এই সংগ্রামগুলি সঠিকভাবে দানা বাঁধতে পারত, তা হলে তারই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষব্যাপী একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা বার হতে পারত।

হল না। কিন্তু সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারবস্তুটি মর্মে বিঁধে রইল, এখনও ব্যথা তরফদার জলগেটের কপাট তুলে দিতে পারেননি। সাঁঝবাতি পড়েছে প্রণামপুরের ঘরে ঘরে। রাহুলের চোখের সামনে জ্বলছে একটি নিরীহ লম্ফ।

রাহুল বলল—ওতে তেল দাও রুকু, নিবে যাবে।

রুকসানা সবুজ বাঁশপাতা রঙের বোতলটা খুঁজতে ঘরের কোণের দিকে যায়। ওতে কেরোসিন আছে। ইকবালের এই ঘরখানিতে জন পাঁচ লোক জড়ো হয়ে রাহুলের বক্তব্য শুনছে।

রাহুল বলল—একটি বড় অংশের জেলে নাটার খাটানে চলে গেছে। শুনলাম তেরোঘরায় ললিত এসে বলে গেছে, খাটানের মাছ সবাই পাবে। খুব সস্তায়। যারা গেছে, অবাক হব না, যদি তারাই ব্যথাকে চাবি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে।

তেরোঘরায় মানুষের নতুন ঘর উঠেছে, লক্ষ করেছে রাহুল। রাহুল যখন তেরোঘরীদের সামনে এসে দাঁড়াল বিকেলে, কেউ কেউ মাছ বেচে ফিরেছে, তারা ওর দিকে চেয়ে দেখল নিমেষ কতক, তারপর চোখ নামিয়ে নিল নিঃশব্দে। কথা বলল না।

হঠাৎ রাহুল দেখতে পেল, শরম আলি তিন-চারজন তেরোঘরীর সঙ্গে তাড়ি খেয়ে টলতে টলতে বার হয়ে আসছে। খুব কায়দা করে নিজের কপালের দিকে হাত তুলল সেলামের ভঙ্গিতে, সেটি এক বিদ্রূপাত্মক অভিবাদন বুঝতে অসুবিধা হয় না।

—মুনে আছে পারভিজ, মাস কলাইয়ের বিছন দিয়া ছিল্যা, বুলেছিনু তোমার বিছন আমি মারব। বংশ নিব্বংশ করব। বিশ্বেস কর নাই। এখন কি'রম ঠাহর হয়!

—হয়।

—আর কী পোগ্‌গাম (প্রোগ্রাম) তাহলি! বাপটি কুথা থাকলেন, বউদিমণি কুথা চললেন পারভিচ? মা তুমার জমি বেচা, বন্ধক দেওয়া করেন। মায়া লাগে। গরিবের কাছে আসেছ, ভাল। কাঙাল কাঙালের কথা শুনে না। যার দলিলে জমি-জিরাত কমতে থাকে, তার কথার ওজন কমতে থাকে রাহুল। সাদার বেটা তুমি, তুমাকে সালাম দিই।

—তোমার মতন মাতালের কথাই যদি এত মিঠা লাগে এদের...

—লাগে বুলেই তো আসেছি।

—হ্যাঁ। তাই দেখছি বটে।

—তুমার খতিবড়া কুথা গেলেন ? ও শালা ছিল কলেজের মাস্টার। সেডা রূপকথা, ইখানে তিনি আসেছিলেন বিপ্লব মারাতে। এখন ললিতবাবুর সাথে উঠাবসা।

—হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি।

—আর তিনিই কিনা রুকসানার পেট করলেন, কীর'ম ঘটনা।

—কী বললে ?

—অ রে ! চমকাও কেনে দাদা, শুনো ইতিহাস। রুকুর গর্ভে জারজ বাচ্চা আসেছে !

শরমের এই উক্তিকে তেরোঘরা উচ্চ হাসি দিয়ে সমর্থন করে। ভয়ানক লজ্জায় এবং ক্রোধে সেখান থেকে ছিটকে সরে চলে আসে রাহুল। তারপর ইকবালের কাছে এসে মাথা নীচু করে সমস্ত সন্ধ্যা বসে থেকেছে। কথা বলতে পারেনি।

ইকবাল হঠাৎ বলল—বোনটির আমার বদনাম অনেক। সবই ভাগ্য।

সক্রোধে ফেটে পড়ল রাহুল—তুমি জানো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি জানি, হরবোলার কোনও সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা ছিল না। উনি ছিলেন সেক্সসুয়ালি ইনকেপেবল। তা হলে ওঁর নামে একথা রাষ্ট্র হয় কেন ?

—হয়, রাহুল, হয়। তুমি বুঝবা না। মানুষের মন তুমি বুঝবা না ! আমি বোনটাকে মেরেছি, জানো ? অদ্ভুত দীর্ণ নিরাশা এবং মায়া চলকে ওঠে ইকবালের গলায়।

—তুমি আর রুকুকে কিছু বলো না রাহুল ! ওকে ছেড়ে দাও। যেভাবে ও একদিন কুলগাছের দড়ি বাঁধা কমদকে ছেড়ে দিয়েছিল, গোপনে ওকে তেমনি একা ছেড়ে দাও। ওটা ওর মনের হিসেব।

—কোন্‌টা ?

—ওর ওই পেটের বাচ্চাটা। এমন তো কতই হয় দেশে গাঁয়ে। হয় না ? ওর কোনও ব্যবস্থাই তো আমরা করতে পারিনি। ও নষ্ট হয়েছে। আমাদের বিপ্লব ওকে নষ্ট করে দিয়েছে। খতিবের ভালবাসা ওকে বিকৃত করে...বা ওটা কিছু না। ও যদি ভাবে, বাচ্চাটা খতিবের ঔরস...কিংবা, আমি ঠিক জানি না রাহুল।

—বুঝেছি !

—তোমার মায়া হয় না ! শোন, তোমাকে আমি শীষ পয়গম্বরের গল্পটা বলি। ওর নাকের হাঁচি একটা শিশিতে ভরে রাখা হয়। ওরই মধ্যে পুরুষ-বীর্য ছিল, তাই দিয়ে রমণী-গর্ভ হয়। এ ঠিক সেই রকম। ওই বাচ্চাটা রুকুর কল্পনা। শুনে রাখো, ওটা ওর স্বামীরই মাল। নেয় না ওকে, কিন্তু রাত্রে আসে। বম্বেটে লোক। ফেরার। জড়িবুটির ব্যবসা করে। বা, ওটা কিছু না। হরবোলাকে আমরা কিভাবে চেয়েছিলাম পারভিজ ? কিভাবে ? বল ?

ইকবালের কথা শুনতে শুনতে মাথা নীচু করে থাকে রাহুল।

—শিশিতে ভরে রাখা হয়েছিল পয়গম্বরের হাঁচি, সেটি শুঁকেছিল এক রমণী ?

—হ্যাঁ।

—ওইভাবে গর্ভসঞ্চার হয় ?

—আমি তার বেশি জানি না রাহুল ! এরকম গল্প দেশগাঁয়ে আছে, অনেক পাবে। রুকসানাকে ক্ষমা করে দাও। ওটা কিছু না। আমরা তো ওর জীবনের কোনও ব্যবস্থাই করে উঠতে পারিনি। হরবোলা ওর জীবনের একটা রূপকথা, বুঝলে ! ও ভুল করে শিশিটা শুঁকেছিল।

—কী বলছ তুমি !

—এক রাতে বম্বেটে এল। জড়িবুটি।

—তুমি এত হতাশার কথা বলছ ইকবাল ?

—জীবনটা কী, বল তো ? হরবোলারা এসেছিল আমাদের কাছে, তাই না ? একটা স্বপ্নের মত ! বলে ইকবাল সুদূর জলের বিস্তারে চেয়ে থাকে। তারপর স্বগত ম্লান গলায় বলে—জল নেমে যাচ্ছে।

—তোমার পা-খানি কেমন আছে ইকবাল ?

—এরিক ফন দানিকেন বলে একজন লেখক আছে, আশ্চর্য লেখক ! ওর একখানা বই হল, 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ ?'

—তুমি পড়েছ ?

—বাংলার এক কবি সেটার অনুবাদ করেছেন। ওতে দেখছি...

—কী ?

—দেবতারা অন্য গ্রহ থেকে এসে পৃথিবীতে মানবীর গর্ভসঞ্চার করছে। এভাবে মানুষ দেবতার দ্বারা উৎকৃষ্ট মানুষ হয়ে উঠছে। এটা কি হয় ? দানিকেন প্রমাণ করছে দেবতা যে এসেছিল, তার চিহ্ন আছে। অনেক অনেক কাল আগে...

—বইটা মস্ত ধাপ্পা ইকবাল।

—কল্পনাটা খারাপ না ! কিন্তু হরবোলা কোনও কল্পনা নয় রাহুল, ওটা স্বপ্ন নয় ! আমি তাকে স্পর্শ করেছি। ওর চিহ্ন আছে আমার কাছে। এই দ্যাখো, এই আংটিটা, দামি জিনিস ! নাম লেখা আছে, সবিতা। হরবোলা এটা ফেলে গেছে। এটা যেদিন দেখি, সব ছেড়ে আসা লোকটা যে আবার ফিরে যাবে তখনই জানতাম।

—কবি কিন্তু ফিরতে পারেনি ইকবাল ! আমিও পারব না। কেন জানো ?

—কেন ?

—সাদা চৌধুরীর জন্যে মুমতাজ মরেছে। আর আমরা তো গরিব হয়ে গেছি। আমার শরীরে হরবোলার মতন দামি জিনিস একটিও নেই। ঘড়িটা পর্যন্ত নেই।

—তুমি ফিরে যাও রাহুল !

—কোথায় যাব ?

—হস্টেলে।

—পুলিস আমাকে ছাড়বে না। এস. পি-র বউ পাগল হয়ে গেছে, অম্বরীশ আমাকে ছাড়বে না। আমি পালিয়ে এসেছি।

—তুমি মোহরকে বিয়ে কর। ওর বাপ তোমাকে বাঁচাবে, তোমার মামা-শ্বশুর তোমাকে রক্ষা করবে। তারপর পড়াশুনা কর। চাকরি নাও। এইডা ঠিক।

—হয় না।

—কেন ?

—সবার দ্বারা কি সব কাজ হয় ইকবাল ?

—মোহরের কী হবে ?

—তোমার জীবনে তো কোনও নারী নেই।

—নেই।

—তা হলে ?

—আমি তো মানুষের আধখানা রাহুল। পা নেই। যা ছিল, তা-ও শশাঙ্ক শেষ করে

দিয়েছে।

—এটা একটা চিহ্ন ইকবাল ভুঁইয়া। তুমি টের পাও। লিন পিয়াও ভুল, তোমাকে বোঝানো যায়। হরবোলা একটা রূপকথা, বোঝানো যায়। কবির মৃত্যুর কোনও মানে নেই, তা-ও হয়তো বোঝানো যায়।

—যায় না। বলে কাঁপতে কাঁপতে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ইকবাল পড়ে যায়, আবার দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর জোরের সঙ্গে বলে—যায় না। হাড়ে, মজ্জায়, রক্তে, উঠে দাঁড়াবার কালে, বসার সময়, ঘুরতে ফিরতে, লাঠি ধরি আর বুঝি, যায় না রাহুল পারভিজ। খেতে পাই না, বেকার। সাধু বাংলায় বলি, বাংলাটার, ইংরাজিটার কিছু প্র্যাকটিস আছে, ছাত্র পড়াই কিনা! বলে একটা দম নেয় ইকবাল।

কাঁপতে কাঁপতে আরও একটু সিধে হয়ে ভুঁইয়া বলে ওঠে, একটু হেসে—আমি কোথাও পৌঁছাইনি, তাই আমার প্রত্যাবর্তন নেই। আমি শুরু করার জন্য বসে আছি। রাশিয়া পৌঁছে গেছে মনে করেছিল, তাই সে পিছনে ফিরছে। চীন ভেবেছিল শতপুষ্প বিকশিত হয়েছে, আমি বলি, হয়নি। রাশিয়া এবং চীনে তিমিরের রাজত্ব কায়েম হলে অবাক হব না। ওখানে হরবোলা চেয়ারম্যান হলেও আশ্চর্য হব না।

রাহুল একা করধ্বনি করে।

—এখান থেকেই তা হলে আমাদের শুরু করতে হবে? শুধালো রাহুল।

ইকবাল বলল—হ্যাঁ।

এবং বলল—না। জানি না। শুরু করার জন্য আমি বসে আছি।

রাহুল গম্ভীর এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তারপর রাত্রের এই বৈঠকে বলল—তেল দাও রুকু। নিবে যাবে।

রুকু তেল দিল। লম্ফর শিখা লাফিয়ে উঠল তেলের ধাক্কায়। রাহুলের বুকের মধ্যে একটি মাছ, চিকন মাছ ছলাত করে লাফিয়ে উঠল।

রাত্রি হয়ে এসেছিল, রাহুল মাত্র চার-পাঁচজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে পেয়েছে এবং বস্তুতপক্ষে ইকবালই তার আশ্রয় এখন। শুধু সে ভাবছিল, রুকসানা একটি আশ্চর্য কাহিনীর মত তার চোখের সামনে ঘোরাফেরা করছে।

শীর্ষ পয়গম্বর দানিকের কাহিনীর মতন অলৌকিক কিন্তু লোকায়ত। রুকুর পেটের বাচ্চাটি রুকুরই কল্পনায় হরবোলা খতিবের সন্তান। ইকবাল যথাতথ্য একটি অদ্ভুত মনের কথা বলল। রুকুর চোখ মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে রাহুল ক্রমশ অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

সবাই যখন চলে গেছে, চৌকির উপর লম্ফর সামনে একা মাথা নীচু করে বসে আছে রাহুল। দোকানের ছোট ঘরেই ইকবাল দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে, বসে বসে এভাবে ঘুমিয়ে পড়া ওর অভ্যাস আছে।

রুকসানা হঠাৎ বলল—তেরোঘরার কোলোনির চালায় আমার বন্দোবস্ত পাকা। লোকে জানে আমার সোয়ামি আমারে তালাক করেছে। রাষ্ট্র হয় সোয়ামি নাই। সব মিছা। সোয়ামি মরে নাই, তালাক দেয় নাই। সব আছে। ফের কিছুই নাই পারভিচ ভাই। তুমাকে ঠিক কথা কখনও কই নাই।

—হরবোলা আর ফিরবে না রুকু!

—আমার বাছার কী হবে!

—এটাও তো মিছে কথা রুকসানা। একটা জীবনকে এভাবে বানাতে চাও কেন?

—আসল জেবনডা তুমি কি জানো, সেই জেবনে কী হয় ? তেরোঘরার বাস, কী হয় সেখানে ? আমার সন্তান আমার আহ্লাদের জিনিস। লোকে যা জানে, তুমি তারে মিথ্যা করো না। দোহায়!

রাহুল মনের মধ্যে অসম্ভব আলোড়িত হয়ে ওঠে। একটা মিথ্যা স্বপ্নকে এভাবে আঁকড়ে থাকার মানে কী ? অসম্ভব এই কল্পনার মধ্যে বাঁচতে চায় কেন মানুষ ?

রাহুল কোনও কথা না বলে ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ায়। জল নামতে থাকে। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি কেটে যায় প্রণামপুরের বুকে। জলের ভিতর থেকে কালোমাটির পথ জেগে ওঠে। চৈত্রের দাবদাহে জল শুকিয়ে যায়, মাটি হয় খটখটে। বিল এবং নদীর কঙ্কাল যেন পড়ে রয়েছে। মনেই হয় না এখানে কখনও কোনও আন্দোলন হয়েছিল। জলগেট খাঁ খাঁ করছে।

হঠাৎই রাহুল একদিন লক্ষ্য করে, বুলবনের সঙ্গে জন পঁচিশ লোক প্রণামপুর থেকে মোহড়া চিৎপুরের দিকে দলবেঁধে কালোমাটির মোটা পথের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

দলটির সামনে এসে দু হাত আকাশে তুলে রাহুল পথরোধ করে দাঁড়ায়।

—তোমরা কোথা যাও ?

—মিটিনে।

—বুলবন, এরা কি তোমার দলের লোক নাকি ?

—হ্যাঁ। নটখুলি, দিঘিরপাড়, বীরকুচির লোক সব। তোমার কমরেড কেউ নেই।

—এরা কারা ?

—খেতমজুর। গরিব চাষী। দু-একজন কারিগর, ঘরামি আছে।

—তুমি কোন্ পথে এদিকে আসো ?

—হুদো-হেরামপুর হয়ে সড়ক ধরে। গোয়াস হয়ে। এরা আগে সবাই তিমিরের দলের লোক ছিল। পরে ফের কী হবে জানি না। চলো হে!

—তোমার সঙ্গে বউদির দেখা হয়েছে ?

—না।

—মণি ?

—ও আছে। সপ্তায় দু দিন বাপুর সঙ্গে দেখা হয় জেলে, জালের ওপারে এসে বাবু দাঁড়িয়ে থাকেন। বোবা। তুমি যাবে না ? দেখতে ?

রাহুল চুপ করে রইল। বুলবন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রাহুলকে দেখতে থাকে।

—বোবা ? অর্ধস্ফুট স্বর গলায় লাফিয়ে ওঠে চিকণ বাঁশপাতা মাছের মতন। রাহুল ঢোঁক গেলে।

বুলবন বলল—হ্যাঁ। বোবা। কথা বলতে পারেন না। তুমি যাবে ?

—মোহর ?

—ও মাঝে মাঝে সদরঘাটে পার্টি-প্রোগ্রামে আসে। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট মুকুল।

—হ্যাঁ। টিচার। চিনি। বাজিতপুর না কুঠির লোক!

—ও ডাইরেক্ট পার্টির ছেলে নয়। আর এস পি করত এক সময়। ও মোহরদের কেমন এক ধরনের ভাই। লতাপাতায় সম্বন্ধ।

—মোহর বিয়ে করছে ?

—তুমি শুনেছ ?

—না।

—শোনা যাচ্ছে, বিয়ে হবে। বাপ-মায়ের চাপের মুখে মোহর দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া তুই ওকে ক্লান্ত করে তুলেছিস রাহুল! চলো হে! বলেই বুলবন দলবল নিয়ে এগিয়ে চলল। একবারও পিছনে ফিরে চাইল না।

বাপুকে কে বোবা করেছে? একটা আশ্চর্য এমারজেন্সি বাবাকে বোবা করে দেয়। একটা আশ্চর্য রাজনীতির ত্রাস মোহরকে ক্লান্ত করে তোলে। মুকুলের সঙ্গে বিয়ে হলে কী আশ্চর্য জীবন হবে মোহরের! কী শান্ত জীবন, কী নিরুদ্বেগ জীবন! হয়তো মুকুল ক্রমশ জি এস-এর রাজনীতিতে আকৃষ্ট হবে। কিছু মানুষ তো শখ করেও রাজনীতি করে। বিয়ের পর মোহরও সেই রকম করবে।

এই রকমই একটা দিনে মণি আসে রাহুলের কাছে। সেদিন আকাশে কালো হয়ে মেঘ ওঠে। একখানা চিঠি সামনে এগিয়ে ধরে মণি।

প্রিয় রাহুল,

তোমাকে এই ক্ষুদ্র জীবনে প্রথম লিখছি এভাবে। আমি জোতদারের মেয়ে। তোমার হিসেবমত আমি শত্রুশ্রেণীর একজন। তুমি আমাকে কিছু মেহেদিপাতা এবং একখানা চীনা ফোটো উপহার দিয়েছিলে। শোনা যায়, এই পাতা এবং ফোটো মুমতাজ আলির দেওয়া। দুলিয়াকে যেমন সে দিত, তুমি আমাকে সেই উৎসাহবশেই একদিন এইসব দিয়ে থাকবে হয়তো। বড়লোকের মেয়ে বলেই আমার জীবন এমনিতেই অর্থ-সম্পদে বিড়ম্বিত, আমার সাহস কম।

খারাপ লাগছে লিখতে যে, তুমি আর স্বাভাবিক জীবনে কখনও ফিরতে পারবে না। মেহেদিপাতার লাঞ্ছনা, চীনা ফোটোর উত্তাপ একসময় থাকবে না। আমি দিব্যি ওসব ভুলে যেতে পারব। আমার বিয়ের তোড়জোড় চলছে। শুনেছিলাম, ব্যথা তরফদার বুলবন ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের জন্য প্রস্তাব উঠিয়েছে, চন্দ্রিমা-বউদির সঙ্গে তোমাদের চির-বিচ্ছেদ পাকা করবার ব্যবস্থা ঠাউরেছে মামি।

আমি আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। আমি বিয়ে করব স্থির করেছি। তোমার জীবনে পৌঁছনো গেল না রাহুল! মুকুল নামে একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে, মনে হয় আমার রাজি হওয়াই ভাল। তুমি একবার আমার কাছে আসবে? চৌদ্দবিঘার মামার মাঠ-দালানে? বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে আমাদের দেখা হতে পারে। ওই জায়গাটায় পুলিস আসে না। ইতি—

মোহর

ইকবালকে চিঠিটা দেখায় রাহুল।

—আমি কি যাব?

—একবার যাও।

—না। শিশিরভেজা মেহেদিপাতা, জিনিসটা পাগলামি ইকবাল। বলে ম্লান করে হাসে রাহুল।

দুটি রাঙা হাত বারবার চোখের সামনে উঠে আসে। এই দু'খানি রাঙা হাত একদিন চোখের সামনে মেলে ধরেছিল মোহর; এই রাঙা হাত দিয়ে নিজেরই দৃষ্টি সে আড়াল করেছিল প্রেমে, লজ্জায়। সেই রাঙা হাত দিয়ে এই চিঠিখানি লিখেছে মোহর। চিঠিতে মেহেদিপাতার গন্ধ।

রাহুলের বুকের মধ্যে একটা সাদা ডানার পাখি বারংবার ডানা ঝাপটায়। মেহেদি

পাতার লাঞ্ছনা, চীনা ফটোর উত্তাপ এক সময় থাকবে না। মোহরের এই লাইনটা কতবার করে পড়ল রাহুল। সে কিছুতেই একথা বিশ্বাস করল না। স্বাভাবিক জীবনে কখনও রাহুল ফিরতে পারবে না—কী সেই স্বাভাবিক জীবন ? গার্হস্থ্য সুখের জীবন, স্ত্রীর স্নেহরসে জারিত উপাদেয় বর্ণময় মোহগ্রস্ত ছোট একটা জীবন, ন্যালার মৃত্যুময় জীবন, সোভান আলির রক্তপাত ; মৃত্যু অধ্যুষিত জীবন, তেরোঘরার ভস্মীভূত জীবন, ইকবালের পঙ্গু পায়ে ভার হয়ে চেপে থাকা শশাঙ্কর জুতা, তার তলে দলিত জীবন। রুকসানার কল্পনায় শীর্ষ পয়গম্বরের গর্ভসঞ্চারের অভিমান-আহত বিস্ময়কর জীবন ; মেহেদিরাঙা বৈশাখি পূর্ণিমার উতল উদ্ভাসিত জীবন—একবার শুধু বলতে ইচ্ছে করে, যে-মেয়ে শুধু ঘর করবার জন্য জন্মায়, যার রুচি যে-কোনও পুরুষে সুখি-পরিতৃপ্ত হয়, তাকে দুয়ো দুয়ো দুয়ো।

রাহুল মনে মনে বলল, কোনও পূর্ণিমা রাতে তোমার কাছে ছুটে যাওয়ার ছেলেমানুষি আমার নেই মোহর। ওই মেহেদিপাতাকে আমিও দিব্য ভুলে যেতে পারি।

বাবা এসে একটি জালের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাবা কথা বলেন না। দ্যাখো মোহর ! এখন কি বিয়ের সময় ? জল নেমে গেছে, কালো মাটির পথ পড়েছে হেথা, অথচ আমি তোমার কাছে যেতে পারি না। যেখানে পুলিস আসে না, সেখানেই কি আমরা মিলিত হব ? ভারতবর্ষ পুলিসের দেশ, সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দেশ, এখানে পূর্ণিমার রাতে অজস্র শূকর, গৃধিনী, সারমেয়, ফাল-লাগা গরু আর্তনাদ করে। এখানে প্রেম একটা শিশিরজলে ভেজানো মেহেদিপাতা, আর কিছু নয়—এখানে সেই প্রেম একটি কল্পনার বিষয়, আমি যাব না মোহর, আমার রাজহংসী, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

জানি আমি, তোমাকে আমি ক্লান্ত করেছি। আমাকে তুমি আজ ভয় পাও। আমাকে ভুলে না গেলে তোমার শ্রেণী-চরিত্র সার্থক হয় না। তোমার ট্র্যাজেডি এই যে, তোমাকে চিরকাল বড়লোক ধনী হয়ে থেকে যেতে হয়—ধনীর দুহিতা, ধনীর জায়া, ধনিকের জননী, ধনীর ঘরনী—তুমি ঘর আগলাতে পৃথিবীতে আসো—আমার গলার একটা প্রেমের গান শুনতে আসো তুমি, জন্মাও এই ধরিত্রীর বুকে। তুমি বড় ভাল মেয়ে মোহর ! এত ভাল মেয়ে, আমার রাজহংসী, আমার মেহেদিপাতা, তোমাকে আমি চাই না, একটি পূর্ণিমা রাত্রি তোমার অপেক্ষায় কাটে, আমি যেতে পারি না। একমুঠো পাতা পূর্ণিমার রাতে শিশিরে ভিজতে থাকে, এই দৃশ্যটা দেখতে পাই।

আর কিছু নয়, কোনও কিছু নয়, একটা সাদা ডানা কেবল বুকের মধ্যে ঝাপটাতে থাকে।

ওই প্রস্তাবটা আশ্চর্য খুব যে, ব্যথাখালা বুলবনের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। বুলবন জাতে উঠতে পারত। বড়লোক হতে পারত। কিন্তু জানি, ও তা পারবে না।

কী বোকা আমরা ভেবে দ্যাখো ! কিছুই গুছিয়ে নেওয়া হল না আমাদের। সব তছনছ হয়ে গেল। এখন কেউ এমন করে ডাকে নাকি মোহর ! ডাকলেই কি কেউ সাড়া দেয় !

পূর্ণিমা রাত্রি এল বৈশাখে। প্রণামপুর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রাহুল। হাওয়া উঠল সেই রাত্রিতে। বড়ই এলোমেলো হাওয়া। সদর ঘাটে এসে সেই রাত্রিতেই একটি তেলের গাড়িতে করে গোরাবাজারে এল।

দুয়ারে বেল বাজালো রাহুল। দোর খুলল চন্দ্রিমা।

—তুমি এসেছ ?

—কথা আছে বউদি !

ঘরে এসে চিঠিটা বউদির হাতে দেয় রাহুল পারভেজ চৌধুরী। চিঠিটা পড়ে ফেলে রাহুলের চোখের দিকে শান্তভাবে চাইল চন্দ্রিমা। তারপর স্নিগ্ধ স্বরে বলল—তোমার জন্যে নিশ্চয়ই মেয়েটা অপেক্ষা করে আছে। এখানে এলে কেন ?

—আমি ঠিক পাগল নই বউদি ! বাপুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—বাবাকে ফের জেনারেল নিউ হসপিটালে চালান করেছে জেল-কর্তৃপক্ষ। গত কাল।

—এখানেই তাহলে বাবুর মৃত্যু হবে বউদি ! বল, এখন কি আমি মোহরের কাছে যেতে পারি ?

—বাবা আর কথা বলতে পারেন না রাহুল ! অথচ বাড়ি ফিরে যাওয়ার কত সাধ, কত ইচ্ছে হয়েছিল !

—তুমি বাড়ি ফিরে চল বউদি ! তুমি চল। অন্তত তুমি চল ! আমি আর পারছি না। তোমার কাছেই কেন ছুটে এলাম ! কেন যে এলাম ! কোথায় যাব ! ঠিক কেউ বুঝবে না, কেন তোমার কাছেই ছুটে এসেছি এখন ! দ্যাখো, তুমি যদি ফিরে যাও, আমার সঙ্গে...

—হয় না রাহুল ! তুমি যেমন মোহরের কাছে যেতে পার না, আমিও আর ফিরতে পারি না।

—আমার জন্য চল। মা বলেছে, তোমার ওপর আমার কিছু দাবি আছে।

—কিসের ?

—কেন, ভালবাসার !

—ও কথা ভাল নয়। তোমার স্বপ্নের মৃত্যু হলে তুমি কেউ নও, তুমি কি বাড়ি ফিরতে পার ? তোমার বিচ্ছিন্ন পলাতক জীবন আমাকে কী ঘর দেবে বল ? তোমার মাটি কোথায় রাহুল ? কে তুমি ?

—আমার জন্য তুমি হিস্ট্রির নোট লিখে দিতে, মনে নেই ?

—ওই ইতিহাস আবার পড়বে ? পারবে ? এই দেশ তোমাকে অবকাশ দেবে না। তোমাকে স্বাভাবিক জীবন দেবে না। আজ হোক, কাল হোক, তোমাকে অ্যারেস্ট করবে পুলিস। মোহর ঠিকই লিখেছে।

—আমি খুন করিনি বউদি ! আমি ভালবেসেছিলাম।

—ও কথা ভাল নয়। ভালবাসি বলতে নেই, জানো না ? মানুষকে ভালবাসার কষ্ট খুব রাহুল ! ফিরে যাও।

—কোথায় যাব ?

—মানুষের কাছে। আবার বর্ষা আসছে। নদী ভরে যাবে।

—মানুষকে ভালবাসা... তোমাকে বুঝি নয় ?

—না।

—বর্ষা আসবে নিশ্চয়। নদী ভরে উঠবে। কিন্তু এই পূর্ণিমা, এটা কেন আসে বউদি ! রক্তের ভেতরটা কেমন করে, জানো ?

চন্দ্রিমা আর কোনও কথা বলল না। চুপ করে রান্নাঘরে চলে এল। স্টোভ জ্বেলে খাবার গরম করল।

খেতে বসে রাহুল প্রথম গ্রাস মুখে তুলে বলল— মুকুলকে বিয়ে করছে মোহর ! এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ এই চিঠিটা এত আকস্মিক যে, ঠিক বিশ্বাস হয় না।

—বিশ্বাস ক'রো না। মোহর অত্যন্ত মুডি। বিয়ে করার বান্দা ও নয়। ও কলেজে পড়াশুনা করবে। তবে একথা ঠিক, বিয়ে যদি করেই, কোনও পার্টি-কমরেডকে আমাদের দলের মধ্যেই করবে হয়তো। অথবা ও কখনও বিয়েই করবে না। ওর মতন মেয়ের বিয়ে সহজ নয় রাহুল।

—তাহলে এভাবে লিখল কেন ?

—রাগ।

—কার ওপর রাগ ?

—তা-ও কি ও জানে ?

—ও।

—তুমি দেখা করলে পারতে !

—না। বউদি, হয় না !

—কেন ?

—আমার অস্বাভাবিক জীবন ওকে মানাবে না। চিঠিটা আমি বিশ্বাস করি।

—আমিও করি।

—বউদি ! তুমি কী বলতে চাও ? কেন এত রহস্য, কিসের ? কেন এভাবে আঘাত করছ আমাকে ?

—একটা ব্যাপার তোমাকে মেনে নিতে হবে রাহুল। মোহর তোমার কমরেড নয়। ও আমাদের কমরেড। ওর জীবন সবখানি ওর নিজের নয়। ওই চিঠি তোমাকে লিখে ও ঠিক আচরণ করেনি। মুকুলের সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারে না, যেমন পারে না বুলবনের সঙ্গে। বিয়ে কোনও ছেলেখেলা নয়।

—সে তো তোমাদের দেখেই বুঝেছি বউদি !

—হ্যাঁ। আর দেখেছ বলেই, বিয়ে বললেই বিয়ে হয়ে যায় না। এই চিঠিটা আমার কাছে থাক।

—একটা সামান্য বিয়ের চেয়ে জীবন তোমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বউদি— বুঝি। মোহর ছেলেমানুষ, ও না বুঝেই লিখে ফেলেছে। এই চিঠিটা কি পার্টিকে দেখাবে ?

—উচিত।

—বুলবনের সঙ্গে বিয়ের কথা না উঠলে, মোহর এভাবে আমাকে লিখত না। ওর যে রাগ হয়েছে বললে, এটা তাই-ই। এ চিঠি কিছু না বউদি। দাও, ওটা দাও।

ঠাণ্ডা গলায় স্বর খাদে নামিয়ে চন্দ্রিমা বলল— আগে খেয়ে নাও।

দ্রুত খাওয়া শেষ করে ছাদের উপর উঠে আসে রাহুল। চিঠিটা নেয়। পূর্ণিমার ভরা চাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে থাকে সে। খুব অন্যমনস্কভাবে ছিঁড়ে ফেলে ছাদের মেঝেয় ছড়িয়ে দেয়।

রাহুল বুঝেছিল, মোহর আর সেই মেয়েটি নেই, যে একদা তার গলার গান শুনতে তাদের বাড়ি ছুটে আসত। এখন সে পার্টি-ওয়ার্কার, ওর দাম্পত্য সে একাই রচনা করতে পারে না। বিয়ে ব্যক্তিগত বিষয় নয় আর। আদর্শ যদি সেই দাম্পত্যের আধার সৃষ্টি না করে, তাহলে দাম্পত্য অর্থহীন। যদিও বিয়ে ব্যক্তিগত বিষয় নামে প্রচলিত, কিন্তু আদর্শের যোগশূন্য বিবাহ পার্টি সবার ক্ষেত্রে সমর্থন করে না। রাহুল চিঠির টুকরোগুলি ফেলে দেয়, বাতাস লেগে ছাদময় ওড়ে তারা।

এখানে আদর্শের পথ দু'ভাবে বিভক্ত। একটি কালো মাটির পথ। সেই পথে মহিষের

রক্ত পড়ে, মানুষের রক্ত নির্গত হয়। কোথায় গেছে এই পথ জানা নেই। কিন্তু এই পথেই যেতে হবে রাহুলকে, যেখানে নারীচরিত্র বর্জিত এক পুরুষ-জীবন অতিবাহিত করে ইকবাল, সেই মৃত্তিকায় একটি ভালবাসার বীজ পুঁততে হবে তাকে। অন্য পথে চলেছে মোহর। চলেছে বউদি। আদর্শের পথ দুটি ভাগে ভাগ, এদের কোনও মোহনা দেখা যায় না এখন।

ছাদ থেকে নেমে চলে আসে রাহুল। ছাদের উপরে চিঠির টুকরোগুলি উড়তে থাকে।

—এখনও সময় ছিল মোহর। তোমাকে অধিকার করার। ছিল নাকি?

পথে নেমে হেঁটে চলে রাহুল। আমার দাম্পত্যের আধার নেই বোকা মেয়ে, মাটি নেই, সময় যোগ্য ছিল না রাজহংসী, শিশিরভেজা রাঙা আঙুল, চিত্রিত দু'টি হাত, তোমাদের অবলম্বন ছিল না আমাতে। মহিষের শোণিত-চিহ্নিত পথে কে যায়, প্রিয়তমা?

বোকা রাহুল যায়। একা রাহুল চলে যায়। বোবা পিতা, পাগল ভাই, ফতুর মা, ফেরার পরিবার, বৈশাখী হাওয়ায় কাঁপছে চাঁদ, এ কোন্ দুঃসহ কষ্ট ইকবাল, কিসের ভার চেপে বসে বুকের উপর!

ক্রমশ দিনে দিনে মোহর আরও গভীর নিবিড় হবে তার রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি, তার অর্থ-সম্পদ বিড়ম্বিত জীবন রূপান্তরিত হবে একজন প্রফেশনাল রেভল্যুশনারির জীবনে, সে ঘর ছাড়বে, বাবা-মা-পরিবার পরিত্যাগ করে আসবে, সে হবে সর্বক্ষণের কর্মী। বোঝা যায়, তার বিয়ে সহজ নয়, জীবনও সহজ হবে না।

মুকুল কিংবা বকুল অথবা অন্য কেউ, তারা কেউ তার কেউ নয়— একদিন সম্বন্ধ হবে পার্টির কোনও নেতৃস্থানীয় কমরেডের সঙ্গে। ওর জীবন হবে আলাদা, রাহুলকে সে একদিন চিনতেও পারবে না।

কোনও রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্র-চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিপ্লবের স্তরই শুধু নির্ধারণ করে না, মানুষের চলার গতিপথও নিয়ন্ত্রণ করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নাকি নভেম্বর বিপ্লব— দু'টি আলাদা আলাদা সরণি প্রস্তুত করে দেয়। জনগণতান্ত্রিক বা নয়া গণতান্ত্রিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর মানুষের হৃদয়ের কাঠামো, সম্বন্ধের সূত্র রচনা করে। পার্টির চোখে রাষ্ট্রটি কী, কোন জাতীয় রাষ্ট্র-কাঠামো তাই-ই ঠিক করে দিতে থাকে মোহর কার, কে তার?

আশ্চর্য ধাক্কা খায় রাহুল। সে মনে করেছিল, প্রেম-ভালবাসা অত্যন্ত স্বাধীন কোনও হৃদয়-সত্তা। তা যে নয়, বউদির আচরণে সবই স্পষ্ট হয়েছে।

কমরেড জি. এস. অথবা কমরেড সি. এম—দুটি চিহ্নিত নাম, দু'টি আলাদা পথ, অথচ লক্ষ্য একই। কিন্তু রাষ্ট্র-চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আলাদা দু'জনের। বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি, তাই দু'জনের কর্মপন্থা ভিন্ন, আক্রমণের বর্শামুখ ভিন্নমুখী। বলা হয়, পন্থা আলাদা হলে লক্ষ্যও শেষ অবধি এক থাকে না। পন্থা ভুল হলে লক্ষ্যও ভুল হয়ে যেতে বাধ্য।

পথ খুঁজতেই একটি জীবন যায়। নির্ভুল পথ। সত্য পথ। কত প্রাণ চলে যায় শুধু সত্যকে খুঁজে বার করতে করতে। শুধু কক্ষপথ চাই, নইলে কক্ষচ্যুত হয় জীবন। আবার কক্ষে থেকেও বিচ্যুত হয় কেউ। রাহুল নিজেকে বলল, এ জীবন কি কক্ষহীন, জীবন কি ভ্রষ্টভুল স্ফুলিঙ্গ মাত্র?

কমরেড সি. এম. অনাবৃত হয়েছিলেন, সেই এক নগ্ন লেলিহ শিখা ভারতের সমস্ত কুঞ্চিত অন্ধকারে, তাবৎ জড়তা-কুণ্ঠা-ভীরুতার তমিস্রায় আলো ফেলেছিল, চোখ আমার ধাঁধিয়ে গেছে মোহর !

মোহর, তোমার সরণি একজন মহান দার্শনিকের পথ ধ'রে ধ'রে, যদি সেই পথ সত্য হয়, শুধু তাই-ই যেন প্রমাণ করে আমার ব্যর্থতা, কিন্তু আমি যদি সত্য হই, তোমার ব্যর্থতা বুঝে উঠতে উঠতে এ জীবন ফুরিয়ে যাবে রাজহংসী। সব সত্য এক নয়, কিন্তু প্রতি সত্য যাপনের বিষয়।

তোমার উপর জোর করতে হলে তোমার মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করতে হয়। ও কাজ বউদির সঙ্গে অনেক হয়েছে মেহেদিপাতা ! আমি প্রমাণ করেছি, মাত্র একটি বন্দুক, একটি চাবি ছিনতাই করলেই কিভাবে সমস্ত গ্রাম, তামাম শত্রু-শিবির উন্মত্ত-হিংসায় ফেটে পড়ে ! তর্ক করব না আর, পথ চলতে চলতে আবার প্রমাণ হবে সত্যের অভ্যাস বরফের তলে লুক্কায়িত বীজকে কিভাবে প্রকাশ করে দেয়, কিন্তু কোনওভাবেই কি প্রমাণ করা যাবে, আমরা দু'জন দু'জনকে ভালবেসেছিলাম ?

আমার সান্ত্বনা আছে। তুমি যেদিকে গেছ, আমার ভালবাসা তুমি, পথ তোমার সঠিক হলে ভালবাসা তো ব্যর্থ হবে না, ব্যর্থ হবে একটি ভ্রষ্টভুল স্ফুলিঙ্গের আলো, জ্বালা, তিমির-বিদীর্ণ আর্তনাদ। কিন্তু সেই আর্তনাদও ইতিহাসের সত্য শিশির-কণা, যেভাবে পাখির ঠোঁটে খাদ্য-কণা লেগে থাকে।

কিন্তু বোবা পিতার কি হবে, কি হবে অম্বরীশলালের পাগল বউটির ? মানুষ হিসেবে এরা তো একাকার আমার কাছে।

বিভ্রান্ত স্ফুলিঙ্গটি ভুল করতে থাকে। বাবার মুখ মনে করতে করতে হয়তো সে ভুল করতে থাকে। হঠাৎ তার মনে হয়, বাবা বাড়ি ফিরে গেলে বউদি আর বুলবনের মিলন হবে, ভাঙা বাড়িটা আবার উঠে দাঁড়াবে। মণির জীবন দিশা খুঁজে পাবে। মায়ের জীবন স্থিতু হবে। নাতাশার জীবন স্থির হবে। নূপুর পাবে তার প্রকৃত আশ্রয়।

রাত্রি দু'টোর সময় এস. পি. বাংলোর প্রকাণ্ড গেট টপকে ভিতরে ঢুকে যায় রাহুল। প্রহরী সজাগ ছিল না। অসম্ভব নির্জন ছিল পূর্ণিমা রাত। প্রহরী অভিভূত ছিল ঘুমে, টুলের উপর ঢুলছিল। তড়াক করে জেগে ওঠার আগেই রাহুল এক লাফে বাংলোর ভিতরের সড়কে চলে আসে। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে বন্দুকধারী লোকটা। কুকুর আর্তনাদ করে ওঠে।

এস. পি. স্বয়ং ঘর ছেড়ে নেমে আসেন সড়কে। ভিতরে পিচঢালা পথে।

—কী হল ? হোয়াটস দ্য ম্যাটার ?

তেড়ে এসেছিল প্রহরী। তার আগেই রাহুল এস. পি-র কাছে পৌছে গেছে।

—আমি ফিরে এসেছি স্যর ! আমাকে অ্যারেস্ট করুন। বাবাকে ছেড়ে দিন। দেখুন, বাবা নির্দোষ। ওঁকে রিলিজ করে দিন। আমাকে ধরে রাখুন। আমি চাই...

—কী চাও ?

—সম্মান। আমার বাবার মর্যাদা। এ হয় না স্যর ! এ হয় না ! জীবনটা কী হয়েছে আমার, চেয়ে দেখুন !

—ঠিক আছে। এসো।

ঘটনাটি আসলে এভাবে ঘটে না। রাহুল এস. পি.-বাংলার সামনে এসে দাঁড়ায়। গেটের সামনে। সমস্ত শরীর তার ঘেমে উঠতে থাকে। শুধু ভাবনার তাড়সে তপ্ত হয়

সে। কাঁপে। এত ভয় কেন বুঝতে পারে না।

এইখান থেকেই তো পালিয়ে গিয়েছিল সেদিন। তাহলে আবার কেন এখানে এসেছে! এখানে এভাবে বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকার মানে কী? মোহরই কি তাকে হেথা এভাবে ঠেলে এনেছে? কেন এসেছিল বউদির কাছে!

প্রহরী সহসা গেটের লোহার পাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রাহুলকে দেখতে পায়। অদ্ভুত আর্তনাদ করে ওঠে। বন্দুক তাক করে চেঁচায়। রাহুল পালাতে শুরু করে। ঠিক তখন একটি পর্দাঢাকা রিকশা চলে যায় পথ দিয়ে, রাহুলকে আড়াল হয়ে লাফিয়ে পড়তে সাহায্য করে, এত রাতে রিকশা কেন বুঝতে পারা যায় না। কে একজন বলে ওঠে— পালাও! হাল ধরো।

প্রথমে ভ্রাতৃসঙ্ঘ ক্লাবের মাঠে লাফিয়ে পড়ে। যেভাবে আগে সে পালিয়ে গিয়েছিল, সেইভাবে ছুটে যায়। পালাতে পালাতে গঙ্গার ধারে চলে আসে। পাঁচ সাত দশ মিনিট বাদে রাস্তার সম্মুখের মাথায় জ্বলে ওঠে ধক্ করে বাঘের চোখ, জিপ গোঙায়।

—বাবু! তোমার সঙ্গে আমার কি আর কখনও দেখা হবে না? আমার আর ইতিহাস পড়া হল না বাপু! মোহর! তোমারও জীবনে একটি বিনিদ্র পূর্ণিমা শেষ হয়ে গেল। আকাশে ঝড় উঠছে রাজহংসী। মেঘ ছুটে আসছে অগ্নিকোণ থেকে।

নৌকায় লাফিয়ে পড়ে রাহুল। মনে পড়ে, তাকে কে যেন হাল ধরতে বলে গেল। পিছনে জিপের আলো ছুটে আসে। সমস্ত পুলিস-বাহিনী জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষের আত্মার হিংসা জেগে উঠেছে যেন। ছপছপ করে দাঁড় বেয়ে চলে আসে এপারে রাহুল। পায়ে-হাঁটা সিঁথিপথ ধরে।

পালাতে পালাতে রাধার ঘাটের ব্রিজের উপর ওঠে রাহুল পারভেজ। আলো প্রতিভাসিত হলেই সে চমকে ওঠে। জিপ! না, লরী! জিপ? না, অন্য আলো।

মিটমিটে একটা আলো। সড়কের ঢালের তলা থেকে উঠে আসছে। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ভাবে, নীচে জল প্রবাহিত, এখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

মানুষের মহৎ দুর্বলতা প্রেম, একটা প্রেমের মোহর তারও ছিল। সবারই থাকে। মহার্ঘ, কিন্তু মোহময়। কষ্ট। নিতান্তই কষ্টকর, তবু আর তো দেখা হয় না, কখন সেটি পথে পড়ে রইল। কথা নতুন নয়, ঘটনা বিচিত্র। কী বোকা ছেলেটা, এই রাহুল! নিজেকেই বলে সে। তখন আলোটা এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

—উঠে এসো।

—কেন?

—যেতে হবে যে!

রিকশার চালক রাহুলকে আহ্বান করে। শাড়ির কাপড়ে ঢাকা সেই মিটমিটে আলোর দীপ আসলে রিকশা একখানি। তার চালককে রাহুল চেনে না। আশ্চর্য লাগে, রাহুল আর কোনও প্রশ্ন করল না। ওর মনে হল, এই মানুষটি; রিকশার চালক, কোনও একজন নেতা। তার কণ্ঠস্বর নিয়তির মতন দুর্জ্ঞেয়, গভীর এবং সত্যের মতন প্রত্যয়যুক্ত, তাই রাহুল প্রশ্ন করে না কোথায় যেতে হবে।

সমস্ত রাত্রি আকাশে চাঁদ পুড়তে থাকে। সড়ক পড়ে রয়েছে দিগন্ত অবধি! দিগন্ত চলেছে আরও দিগন্তের দিকে। রাহুলকে নিয়ে রিকশা চলেছে অদ্ভুত নির্জন রাত্রি-প্রহরে, চালক নির্বাক, কিন্তু রাহুল প্রশান্ত, মুগ্ধ, অবিচল এক প্রাণ, তার চোখে শত শশী দীপ্যমান।

—কোথায় চলেছি ? প্রশ্ন করতে পারি না ? অনাবশ্যক তবু শুধালো রাহুল।

—পার।

—কোথায় ?

—প্রণামপুর।

—প্রণামপুর তো এদিকে নয়।

—তোমার জন্য এক হাজার প্রণামপুর, এক লক্ষ মোহড়া গাঁ, শত শত ইকবাল। অসংখ্য রুকসানা অপেক্ষা করছে। তুমি চলেছ অজস্র বিন্দুর দিকে, সম্পূর্ণ মানবতার দিকে, জাস্ট লাইক এ টোটাল ম্যান, ইউ হ্যাভ টু অরগানাইজ ইওরসেল্ফ, তুমিই হবে তোমার নির্মাতা, মানুষ তোমাকে গড়ে তুলবে, জুগিয়ে দেবে প্রতিটি হাতিয়ার, যেমন তুমি নিজেকে গড়তে থাকবে, মানুষ তোমাকে জোগাতে থাকবে... মানুষকেই গড়তে থাকবে তুমি। এক হাজার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তবে একটি সার্থকতা আসে। সহস্র কবির মৃত্যু দিয়ে বিপ্লবের একটি কবিতা রচনা হয়। সহস্র তাজের তেজস্বিতা ব্যর্থ হলে মেহেদিপাতার রঙ লাগে প্রকৃত ভালবাসায়, তুমি চলেছ ভালবাসার দিকে...

—কিন্তু এখনও মোহর জেগে রয়েছে। এখনও !

রিকশঅলা বলল— দুলিয়ার চোখেও ঘুম নেই রাহুল !

রাহুল জানে, আরও অনেকে জেগে। মা। বাবা। বউদি। বুলবন। মণি। ভারতবর্ষ এদের জাগিয়ে রেখেছে। এরা ঘুমায় না। এই জাগরণের মধ্য দিয়ে একটি রিকশা এগিয়ে চলে নিঃশব্দে। দিগন্ত পেরিয়ে চলেছে রিকশা।

॥ ৫৪ ॥

চন্দ্রিমার মনে হল, রাহুলকে যেন মোহর নয়, বরং সে নিজেই প্রত্যাখ্যান করল। মোহর রাহুলের জন্য একটি বৈশাখী পূর্ণিমা রাত ভরা-চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। জ্যোৎস্নার তীব্র মাদকতা শরীরকে জাগিয়ে তোলে, একটা কী রক্তের মধ্যে হয়। আকাশে কখনও টলটল করে ধোঁয়াধুলার আস্তরণের উপরে শুদ্ধ চাঁদ, কখনও মেঘের হালকা আঁশ তার তলা দিয়ে ভেসে যায়, তখন মনে হয় চাঁদ একটি ছুটন্ত গোল চাকতি।

চাঁদ ছুটে যায়, প্রাণও ছুটতে থাকে। মেঘের আঁশগুলি ভেসে চলে গেলে, চাঁদ আকাশে স্থির হয়ে পড়ে থাকে। বোঝা যায় চাঁদ কোথাও যায়নি, প্রাণও যায়নি, যেতে পারেনি কোথাও।

চন্দ্রিমারই কথার প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিঠিটা ছিড়ে ফেলে ছাদে ছড়িয়ে দিয়েছে রাহুল। টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে দেখে চন্দ্রিমা বুঝতে পারে। মৃদু হাওয়ায় চিঠির ছিন্ন অংশগুলি উড়ছে ছাদের মেঝেয়। যেন সেগুলি প্রাণ পেয়ে ছটফট করছে।

কতবার করে বলল রাহুল, তার কণ্ঠে শত অনুনয় অজস্র প্রার্থনা অদ্ভুত কাতরতায় চলকে উঠেছিল। তুমি অন্তত চলো। কেন যে এখানে এলাম। ঝড়ের বেগে আসেনি সে, এসেছিল লঘু সন্তর্পণে, চুপিসাড়ে, সুতীব্র আবেগঘন হয়ে উঠেছিল চোখ। স্বর বারবার কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। রাহুল মনে করেছিল, বউদির সঙ্গে দেখা হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মোহরের সঙ্গেও বুঝি তার সম্বন্ধের কোথাও আশ্বাস আছে,

বউদি সেকথা বলবে।

অথচ প্রত্যাখ্যাত হল রাহুল। রাহুল বলে গেছে, বাপুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাহলে খুব ভোরে কি হাসপাতালে রাহুল আসবে ? নিশ্চয় আসবে। ছাদে ছড়ানো কাগজের ছটফট করা টুকরোগুলি কুড়িয়ে তোলে চন্দ্রিমা, তারপর আবার বাতাসে ছেড়ে দেয়।

আকাশে টইটই করছে চাঁদ। তীব্র জ্যোৎস্না ধকধক করে চাঁদের কানায় স্পন্দিত হচ্ছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আপনা থেকেই চোখে জল ভরে আসতে চায়। জ্যোৎস্না হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে আসছে সরাসরি সহস্র কোটি কিরণের বিকীর্ণ হাত প্রসারিত করে—শরীর কেমন হালকা হয়ে যাচ্ছে। মায়ের কাছে ভেসে চলে যেতে ইচ্ছে করছে চন্দ্রিমার। মন্মথ ওরফে ছোটনকে কত কতবার মনে পড়ে যাচ্ছে।

রাহুল কাল ভোরে আসবে। মন্মথ বা কবি অথবা রাহুল কাউকেই চন্দ্রিমা ধরে রাখতে পারল না। এরা তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে গেল শুধু। শুধুই কি প্রদক্ষিণ করে গেল ? তাকে কি ছিন্নভিন্ন দীর্ণ করে গেল না ? একটি দুর্মর সময় তার উপর দিয়ে বয়ে চলে গেল। এবং এরা প্রত্যেকেই তাকে ঠেলেছে ক্রমান্বয়ে জীবনের কেন্দ্রে স্বপ্নবৎ, পথ ফুরায়নি। চন্দ্রিমার জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে তারা মিশে গেছে রক্তমাংসের উত্তাপে, তারা কেউ আলাদা নয়—এরা না থাকলে বেঁচে থাকার সাহস কমে আসে। দেশ হয় জড়পিণ্ডবৎ, স্থবিরতা আসে, ক্লান্ত হয় ডানা।

আত্মত্যাগের প্রাণধর্ম ফুরালে সংসারে পাপ বাড়ে। মার্কসবাদীরা হয়ে পড়ে আত্মস্বার্থপর নীচ প্রাণী, ধার্মিকরা হয়ে পড়ে আরও হীনমতি, ভোগবাদীরা হয়ে ওঠে আত্মপরায়ণ, আরও তেজিয়ান, শোষক হয়ে ওঠে আরও সুকৌশলী, পুলিস-প্রশাসন হয়ে ওঠে আরও ক্রূর, আরও ভয়াল। দেশে নামে চরিত্রহীন মন্ত্রিমণ্ডলের হিংস্র প্রচ্ছায়া, সাংবাদিক হয় নপুংসক, লেখক হয় গোনাহগার, গায়ক হয় এলেবেলে ভুয়াভস্মমান, ব্যবসায়ীরা হয়ে যায় মুদ্রাস্ফীত বিষ-প্রস্তুতকারী পশু, মানুষ হয় সম্পূর্ণ দাস, আপোস হয় নেতার আদর্শ।

আর কী হয় ? সিনেমার পর্দায় নগ্ন মেয়েরা নাচে, ভূতপ্রেত সংগম করে, সাহিত্যের গা বেয়ে নামে পুঁজ, পচা লাশ ভাসে মানুষের থিয়েটারে, ধর্মস্থানে ধর্ষণ চলে—মোহান্ত-মৌলবি হয় মানুষের উপদেষ্টা, পলিটিক্যাল ক্যাডার হয়ে যায় দিব্যজ্ঞানী মনীষী-মস্তান। এই হয়, এই হতে থাকে।

রাহুল কাল ভোরে আসবে। বাপুর কাছে আসবে না কি রাহুল ? রাত জেগে চন্দ্রিমার চোখের সামনে পূর্ণিমা অস্ত চলে যায়। তার শুধু মনে হয়, আপন প্রজাতির জন্য মানুষ প্রাণ না দিলে সভ্যতা থেমে যায়। মানুষ আত্মত্যাগ ভুলে গেলে লক্ষ কোটি বিষ-পতঙ্গ নাড়াগাদার তল থেকে ভূ-বাতাসে উড়তে থাকে। কেবলই উড়তে থাকে।

ছাদের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহসা আশ্চর্য ঘটনা হয় চন্দ্রিমার অন্তরে। ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগের বাসনা হয়। কেন এরকম হয় ? কখনও সে এভাবে আত্মহত্যার কথা ভাবে না। অত্যন্ত সংকট, অভাব, অসহ্য যন্ত্রণা তবু আত্মহত্যার কল্পনাটি অবধি মনে আসে না। অথচ আজ কেমন লোভের মতন সেই বাসনা মনে চকিতে জেগে ওঠে। কেন এই অনুভূতি আসে ?

তাহলে কি কোনও গভীর হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করেছে ? জীবন সম্পর্কে সুগভীর নৈরাশ্য কোনও ? বুলবনের কথা কি মনে পড়ছে তার ? তার কাছে কি যেতে ইচ্ছে করছে

এখন ?

পাগলের মত হয়ে গেছে যে মানুষটা তার জন্য কি কষ্ট হয় কিছু ? তাকে কি বুলবন এখনও ভালবাসে ? সে-ও কি ভালবাসে বুলবনকে ? বুলবন আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল।

নানাখানা করে নিজেকে চিরে চিরে দেখার এই চেষ্টা সমস্ত রাত চন্দ্রিমাকে ঘুমাতে দেয় না। তার মনে হয়, তারই মত মোহরও জেগে রয়েছে। আত্মহত্যার বাসনা, আকাশে চাঁদ এবং মোহরের মুখটা মনে হওয়া—সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

নিচে নামে চন্দ্রিমা। একটি চামড়ার সুটকেস খুলে জামা কাপড় শাড়ির ভাঁজ করা স্তূপের তলে হাতড়ায় আপন মনে। কী আছে সেখানে ? ছোট একখানা ফটো। মন্মথর ছবি।

ঠিক তার তলে বুলবনের একখানা ছবিও আছে। এই ছবিটার কথা নিশ্চয় বুলবনের মনে নেই। এটি পাসপোর্ট সাইজের ফটো একখানি, চন্দ্রিমা বুলবনের ডায়েরির পাতার ভাঁজে পেয়েছিল একদিন, এটি সে চুরি করে নেয়। একান্তে বুলবনকে চুরি করে চেয়ে দেখার সময় তখন। ফটোর সুবিধা হল, দু'চোখ দিয়ে গিলে নিলেও ফটো কোনও আপত্তি করে না, মুখ ফিরিয়ে নেয় না, লজ্জা পায় না। কথা বললে মনে হয় কথা বলতে চাইছে।

দু'খানি ছবিই চন্দ্রিমার হাতে উঠে এসেছে। যতবার সে বুলবনকে দেখতে চেষ্টা করে ততবারই মন্মথর চোখে গিয়ে চোখ পড়ে।

—দিদি ! তোর এত লজ্জা কিসের ?

—তুই অমন করে চেয়ে আছিস কেন ?

—আছি। আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনি। ফিরে আসব বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম, আর ফেরা হল না। তা বলে কোথাও কি চলে গেছি নাকি, তোর কাছেই আছি !

—আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন ? তোর কি আর কোনও কাজ নেই ছোটন ?

—বা রে ! তোর ভাবখানা যেন কেমন ! সব বুঝেও তুই এত কষ্ট পাস ! আত্মহত্যার কথাও মনে আসে, তুই এত দুর্বল ! আমার দিদি হয়ে এমন করে নাকি কেউ ? যাঃ। ফিরে যা !

—কোথায় যাব ছোটন ! মা আমাকে নেবে না।

—বুলবন নেবে। ওর কাছে যা।

—হয় না ছোটন।

—তুই মিথ্যুক ! বুলবনের সঙ্গে তোর কী কথা হয়েছিল ?

—কী কথা ?

—তা-ও ভুলে গেছিস ?

চন্দ্রিমার মনে পড়ে ভালবাসার শপথ কিছু থাকে প্রতিটি জীবনে। একদিন ভীরু বুলবন তাকে স্পর্শ করে বলেছিল, আমাকে ছেড়ে যাবে না তো দোলন ?

—কেন ?

—হারাবার ভয় তো থাকে, ছোট জীবন, তা-ও কত ভয় !

চন্দ্রিমা এবার বুলবনের চোখের দিকে চাইল।

—তুমি আমার চোখের দিকে চাইতে পার না চোখ তুলে।

—ভয় করে।

—কেন ?

—ওই যে ছোটন, তোমার কাছে আছে, সেই জন্যে।

—মন্মথ চিরকাল থাকবে।

—রাহুল ?

—ও কাল ভোরে, না, আজ ভোরে আসবে। রাত চার প্রহরে এল বুলবন।

দু'টি ফটো চন্দ্রিমাকে ছিঁড়তে থাকে। দু'টি দ্বিধা তাকে দীর্ণ বিভক্ত করে। ও আর্তনাদ করতে পারে না।

কাজের মেয়েটিকে ডেকে তোলে চন্দ্রিমা। তারপর বৃদ্ধার সিঁথানের কাছে দোরের চাবি রেখে দিয়ে বলে—সবুজের মা ! আমি এখন একটু বার হব।

—ফজর হয়নি মা। রোশনাই আছে বড়। চাঁদ ডুবেনি।

—আছে। তাই হোক। শেষ রাতের জ্যোৎস্নায় যাব আমি।

—তাইতেই যাবা তুমি ? কিসের তাড়া, এত ক্ষয় করছ নিজেকে, কেউ তো দেখে না মামন !

—ওই মানুষটা দেখেন সবুজের মা ! ওই যে তছবির, দেওয়ালে রয়েছে। ওই তিনি....

—আর তোমার পার্টি ?

—এই পার্টি তো তাঁরই হাতে গড়া, তিনি আমাদের নেতা। ব্যস ! তুমি ঠিক বুঝবে না, সাহস কোথা থেকে পাই। অথচ একটু আগে আমার কী যে হয়েছিল.... শোন, আমি চলে গেলে... সদরের দোর ভেতর থেকে বন্ধ করে খিল দিও।

অন্ধকারেই পথে নেমে আসে চন্দ্রিমা। অন্ধকার নয়, জ্যোৎস্নায়। চাঁদ ক্রমশ সাদা, স্থির, স্নিগ্ধ। চাঁদের গা থেকে কিরণ যত মুছে মিলিয়ে যায় চাঁদ তত সাদা হয়ে ওঠে। সেই দিকে চেয়ে দেখে গভীর করে একটা নিঃশ্বাস বুকে টেনে নেয় চন্দ্রিমা।

—রাহুল আসবে ঠিক।

মনে মনে স্বগতোক্তি করে সে। হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের প্রধান গেটের কাছে আসে।

খোদা বক্স দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—বউদি !

—কে তুমি ?

—আমি খোদা !

—এখানে কেন ?

—ভেবেছিলাম রাহুল আসবে।

—হ্যাঁ, আসবে।

—না, বউদি !

—কেন ?

—এই জেলা ছেড়ে রাহুল চলে গেছে।

—কোথায় ?

—এক কুরিয়ার নিউজ করে গেল রাত দশটার দিকে। শ্মশানঘাটের গলির ওখানে সম্বাদ রেখে গেছে, স্টলে।

—ও।

—হ্যাঁ বউদি ! তার বেশি জানি না। আমাদের কী করতে হবে, তা-ও জানি না। মণি এখানে আসে খুব ভোরে, আঁধার থাকে। সম্বাদ করব বলে আছি। আপনি বলে দিবেন, ইখানে আমি আর একলা দাঁড়াব না। কথা কি, আমরা হয়তো সারেণ্ডার করে যাব। সব নিভে যায় একে একে। কী থাকে বলেন !

—রাহুল আসবে না ?

—হয়তো আসবে একদিন। বা মরে যাবে। অ্যারেস্ট হবে। বা লড়াই হবে আবার। পাহাড়, জঙ্গল ধুঁইয়ে উঠছে ফের। স্ফুলিঙ্গ চমকায় বউদি। নিভে আবার নিভে না।

—পালাও খোদা বক্স। জিপ আসছে।

—জিপ এই রকম আসবে বউদি। কবির কাছেও এসেছিল। বিপ্লব না হওয়া তক জিপ আসতে থাকে। তাই না বউদি ? ছোট মুখে এই কথাডা বলে যাই, জিপগাড়ি, কালো ভ্যান আসবে। জানি। কতকাল আসবে। যারা ভোট-কাঙালি পার্টি, তারা কালো কবরের মতন গাড়ি হাঁকাবে ভাবী ! এই দ্যাশ-দেহাজে জিপ আসা থামবে না। আমরা হয়তো সারেণ্ডার করে যাব, খুব খারাপ হয়ে যাব, মস্তান হয়ে যাব। গুণ্ডা, বদ হব বউদি, মানুষ হব না। চলি ভাবী।

চাঁদের সাদা আলো, বরফের মতন সাদা প্রকট আলোয় খোদার চোখ অশ্রুম্লান হয়ে যায়। খোদা ছুটে চলে যায় স্টেশনের দিকে।

খোদার চলে যাওয়া পথের দিকে নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে চন্দ্রিমা। তার মনে বারংবার একটি কথা ধ্বনিত হতে থাকে, 'এই জেলা ছেড়ে রাহুল চলে গেছে।'

'হয়তো আসবে একদিন। বা মরে যাবে।'

তারপর চন্দ্রিমার মনে হয়, রাহুলকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। যতই সে একথা ভাবতে থাকে ততই একটি নিরবলম্ব কষ্টের তরঙ্গ বুকের ভিতরে বেয়ে বেয়ে ওঠে।

ঠিক তখন একখানি জিপ গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। চন্দ্রিমার গায়ে মিটমিটে ফ্যাকাসে হেড-লাইটের প্রলম্ব আলো ছিটিয়ে পড়ে। কে একজন জিপের ভিতর থেকে ডাক দেয়—আসুন ?

কে ডাকছে, কাকে ডাকছে, প্রথমে বুঝতে পারে না চন্দ্রিমা। জিপ হাসপাতালের অভ্যন্তর সড়কে ঢুকে যেতে যেতে ডাক দিয়ে ওঠে স্পষ্টত—আসুন, চলে আসুন।

তাহলে তাকেই আহ্বান করছে জিপটা। এখানে গেট-প্রহরী ছাড়া অন্য কেউ নেই। একটি নারকেল গাছের মাথায় একদল মত্ত বিহ্বল পাখি চেঁচিয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে, ওরা জ্যোৎস্না দেখে ভেবেছে ভোর হয়ে গেছে, চন্দ্রিমারও মনে হচ্ছে ভোর হয়েছে।

চাঁদটার দিকে চেয়ে দেখে শঙ্কা হয়, ভোর হয়নি, তবু পাখিগুলি চেঁচিয়ে মরছে, এত সাদা আলো ওদের বিভ্রান্ত করেছে। এই জ্যোৎস্নাই চন্দ্রিমাকে বার করে এনেছে পথে, হাসপাতালে। রাহুল তাকে প্রতারিত করেছে। তার প্রত্যাখ্যানকে প্রতিহত করে চলে গেছে সে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

হয়তো আসবে একদিন। বা মরে যাবে।

চন্দ্রিমা জিপের পিছু পিছু ঢুকে আসে হাসপাতালের মধ্যে। তাকে নিশ্চয়ই ডেকেছে জিপটা।

হাসপাতালের বহুভাঁজবিশিষ্ট লোহার পাতের দরজা খুলে গেছে। পাখিগুলি চিৎকার করছে এখনও। চাঁদ ক্রমশ ধূসর বরফের মত হয়ে উঠছে। এ এমন একটি রাত্রি চলে

গেল, যার হৃদয়ে কোনও অন্ধকার ছিল না, ছিল ক্রমাগত সাদা আলো।

একজন ডাক্তার এবং একটি ছোটখাটো নার্সকে দেখতে পেল চন্দ্রিমা। ওঁরা করিডোর দিয়ে ছুটাছুটি করে চলে গেলেন। কিছুটা ব্যস্তসমস্ত তাঁরা। কোনও মৃত্যু কি হয়ে গেল এই গভীর প্রত্যুষে ? সিঁড়ির ধাপ ভেঙে এসে চন্দ্রিমা দাঁড়িয়েছে ভাঁজঅলা উন্মুক্ত দরজার কাছে। ভিতরে ঢুকে পড়বে কি না বুঝতে পারছে না।

কে তাকে আসুন বলে ডেকেছিলেন ? কেন ? তিনি কোথায় ? জিপে ড্রাইভার ব্যতীত কেউ নেই।

পাখিগুলি ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে। সাদা চৌধুরী কি বেঁচে নেই আর ! সেই নিরবলম্ব কষ্ট বুক বেয়ে বেয়ে উঠছে।

—কিচ্ছু জানু না মুই। আমি একটা চাষালোক, মুই কালটিভেটার, গরিব টিচার। একটি চা পাখি মেরেছি সুপার সাহেব। আই কিল্ড এ বার্ড ওনলি। এ লিটল বার্ড।

কথাগুলি চন্দ্রিমার মনে গুঞ্জন করে ওঠে। তখন সেই ফেরারি মানুষটিকে করিডোরে দেখা যায় ; পিছনে, পাশে একজন খাকি পোশাকের পুলিস এবং অম্বরীশ—নার্স এবং ডাক্তার।

সম্মুখে তিনি, সাদা চুলদাড়ি, পরনে কানি, গা খালি। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে আসার চেষ্টা করছেন। একটি পা বহু কষ্টে টেনে হিঁচড়ে ঘষড়াতে ঘষড়াতে সামনে ফেলছেন, তারপর লম্বা করে শ্বাস নিচ্ছেন এবং আবার সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। ওঁর একপাশে নার্স এবং অন্য পাশে পুলিস। তাঁকে ধরে রয়েছে। ধরে ঠেলে চালিত করে আনছে।

একটি কুকুর ঘেউ টেনে লম্বমান সুরে আকাশ মথিত করল কোথাও। সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

অম্বরীশ সিঁড়ির ধাপ টপকে নামলেন। তারপর বললেন—শুনুন মিসেস চৌধুরী ! আপনার শ্বশুর মশাইকে ছেড়ে দেওয়া হল ! আমিই তাঁকে ধরে এনেছিলাম। সো, আমিই চিৎপুর পৌঁছে দেব। আসুন।

সাদা চৌধুরী কোনও দিকে চাইলেন না। মনে হল, তিনি কোনও কথাই শুনতে পাননি।

সাদা সিধে এসে বধিরের মতন জিপের পিছনের আসনে চুপচাপ এক কোণে বসে পড়লেন। যেন তিনি জানেন, আবার তাঁকে লক-আপে যেতে হবে। কনস্ট্যান্ট সেলে তাঁর পুনর্যাত্রা। তিনি রয়েছেন আচ্ছন্ন এক বিশ্বে, একা।

—আপনি যেতে চান ? সঙ্গে ? অবশ্য আপনি না গেলেও আমরা পৌঁছে দিতে পারব। বললেন অম্বরীশলাল।

—বাবা ! বলে চন্দ্রিমা সহসা ঈষৎ দীর্ঘস্বরে ডেকে উঠল। ডাকটি যেন শুনতে পেয়েছেন সাদা চৌধুরী, কিন্তু বিশ্বাস করতে না পেরে চন্দ্রিমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তিনি। বাবুর মুখের আদল অনেকখানি বুলবনের মতন, দাড়ি গোঁফেও সেই সাদৃশ্য আড়াল হয়নি। দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে রয়েছেন সাদা চৌধুরী। বোধ হয় তিনি চন্দ্রিমাকে চেনবার চেষ্টা করছেন।

—আমার কী পরিচয় দেব আপনাকে। বলে ওঠে চন্দ্রিমা ভেজা স্বরে।

—আমি দিচ্ছি। আপনি উঠে বসুন ওনার পাশে। যান। বললেন এস.পি।

—আমি ভাবিনি, আপনার মতন একজন পুলিস আমার পরিচয় দেবেন এভাবে ওঁর

কাছে !

—আমরা এতই মন্দ মিসেস চৌধুরী ! মানুষ নই ?

—যন্ত্রের আবার ভালমন্দ কী ?

—আমরাও খাই, পরি। আমাদের ঘরেও বউ, ছেলেপুলে আছে।

এস.পি-র এই কথায় চন্দ্রিমা আর কোনও কথা না বলে একবার খালি তাঁর চোখে দৃষ্টি ফেলে আবার বাবুর দিকে চাইল।

—আপনারা যদি আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতেন, সব। খুশি হতাম। কিন্তু তা না করে পাগল করে দিলেন। আই রিঅ্যাক্ট ম্যাডলি। আমি খুঁজে বার করব, কে আমার বউকে পাগল করে দিয়েছে !

—আপনি। আপনিই করেছেন।

—কী, কী বললেন ? সহসা কেমন ক্ষেপে উঠলেন অম্বরীশলাল। চোখ ধক ধক করে উঠল তাঁর।

—আপনি ব্যক্তি মানুষটি পাগল। কাজের মানুষটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এমন তো হয়ই এস.পি. সাহেব। মানুষ মারার কাজ আপনার।

—আপনারা মারেন না ? যন্ত্র আপনারা নন ? পার্টির মেসিন নন ?

—ট্যাজেডি একটাই সুপার সাহেব, আমরা দু'জনই যন্ত্র। হ্যাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু দু'জনই মনুষ্যত্বের দাবিদার। ভাল কথা।

—চলুন। আর কথা বলবেন না। আপনি না যেতে চান, সরে দাঁড়ান। আলো ফোটার আগেই আমাকে পৌঁছাতে হবে।

—দাবি দু'জনই করি। যুদ্ধ দু'জনই করি। তাই না ? দুই তরফই ভাল মানুষ আমরা। কিন্তু ওই বোবা বাপটি আপনার কোনওই ক্ষতি করেনি স্যর ! জেলে যত প্রাণ গেল...

—এমারজেন্সি আমি ডিক্লিয়ার করিনি। হিরোসিমায় আমি বোমা ফেলিনি। মহাত্মা গান্ধীকে আমি কিল করিনি। আমি চাকর। বুঝলেন, আমি বাধ্য।

—ঠিক আছে।

—আমি খুঁজে বার করব।

—হ্যাঁ। যেমন আপনি সাদা চৌধুরীকে বার করেছিলেন। কিল আপনি করেননি। কিন্তু বোবা করে দিয়েছেন।

—আমি সেভ করেছি। আপনি বুঝবেন না।

—ও, তাই নাকি !

—অ্যাই, চালাও ! বলে ডাইভারের পাশে বসে পড়েন এস.পি.।

—আমি যাব !

—না।

—আমাকে যেতে হবে।

—না। ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।

—আমাকে যেতেই হবে। আলো ফোটার আগেই পৌঁছাতে হবে। বাবা। তুমি আমাকে নেবে না ? আমি চন্দ্রিমা ! আমি তোমার বউমা। আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি সব ছেড়ে এসেছি বাবা !

চন্দ্রিমা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। জিপখানি একটু একটু করে গড়াচ্ছে, স্টার্ট নেওয়ার

পর থর থর করে কাঁপছে সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে, ড্রাইভারের হাত অবধি কাঁপছে—ওই আর্ত চাপা বিহ্বল প্রার্থনা তাকে গাড়ি ছুটিয়ে দিতে বাধা দেয়—চন্দ্রিমার অসহায় কথাগুলি থামিয়ে রাখে তাকে।

সাদা চৌধুরী এই ধরনের নারীকণ্ঠ শুনে দুর্বোধ্য বেদনায় কষ্ট পান—বুঝতে পারেন না এমন কেন করছে মেয়েটা! তাঁর মনে হয়, একে কোথাও তিনি দেখেছেন। কিন্তু কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না। বারবার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই দেখেছেন তিনি সুন্দরী, ভদ্র, অভিজাত চেহারার এই মেয়েটিকে।

চন্দ্রিমার মনে হল, তার শ্বশুর তার মুখটাই বুঝি মনে করতে পারছেন না। জেলের লোহার জালের আড়াল থেকে দেখেছেন, দু'এক ঝলক এই হাসপাতালে দেখা হয়েছে, মনে না পড়তেই পারে। বাবা বোবা হয়ে গিয়েছেন, তাঁর স্মৃতিও বিপর্যস্ত হতে পারে। দেহের প্রহার মানুষের মনকেও যে নষ্ট করে দেয়, বাপু তারই দৃষ্টান্ত।

—বাবা!

জিপের গা ধরে আবার আর্তনাদ করল চন্দ্রিমা। হঠাৎ অদ্ভুত ঘটনা হল, সাদা এক লাফে গাড়ি ছেড়ে নেমে দাঁড়ালেন মাটিতে। তারপর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে পড়ে গেলেন মাটিতে। এবং নিজেই উঠে দাঁড়ালেন কাঁপতে কাঁপতে।

অম্বরীশলাল ঝপ করে ছুটে এসে সাদাকে ধরলেন, তারপর বললেন—এভাবে এসকেপ করতে পারবেন না বাবা! রাহুলের মতন আপনাকেও ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু ইউ আর ইনকেপেবল্। আপনাকে জেলখানা নষ্ট করে দিয়েছে।

সাদা চৌধুরী শিশুর মতন এস. পি-র একখানি হাত জড়িয়ে ধরে অর্ধস্ফুট গলায় বলে উঠলেন—রাহুল! আমার ছেলে!

—হ্যাঁ, আপনার ছেলে। এইটি আপনার বউমা! কিন্তু একে আমরা সঙ্গে নেব না। চলুন। আপনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন এখন। সুইট হোম। আপনার গেরস্তি। রাহুল ভুল রাস্তায় গেছে, ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ও নিকেশ হয়ে যেত। গুলি লেগে যেত। ও আমার বউকে দেখতে চেয়েছিল, বুঝলেন! এখন কথা হচ্ছে, আপনি বন্দুকটা ফেরত দেবেন। শর্ত হয়েছে আপনার সঙ্গে। পাগল সেজে থাকবেন না। চলুন! বলতে বলতে প্রায় হিঁচড়ে ঠেলে তুলে দিতে চান এস. পি. সাদাকে।

—ছেড়ে দিন! তীব্র প্রতিবাদ করে চন্দ্রিমা।

—আপনি চুপ করুন! ধমক দিয়ে ওঠেন অম্বর।

—আমি যাব! আমি মনে করি, আপনি আমার শ্বশুরকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছেন! আমি চিৎকার করব। চারপাশে তারা আছে স্যার! আছে!

—কারা আছে? বলুন! ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে? কিসের জোর আপনার! রাহুলের! ওইটে আপনার অবলম্বন, সাহসী ছোকরা! সাহসটাই সব নয় মিসেস চৌধুরী! এই দেশটা ভিয়েতনাম নয়।

—আমার জোর আপনি বুঝবেন না।

—কেন এসেছিলেন এই সব চাষাভুসোর জায়গায়? কী হল শেষটায়, দুঃখু হয় না?

—আপনি কি আমাকে সেন্স দেবেন নাকি? আপনি আমাকে নিতে চাইছেন না কেন? দুঃখ করি না। হ্যাঁ, করি, আপনারাও রেডবুক থেকে বুলি আউড়ে মানুষকে বিদ্রূপ করেন দেখে খুব তামাসা হয়, আপনাদের সদিচ্ছা দেখে মুগ্ধ হই। সব বোঝেন, অথচ এইটা বোঝেন না যে, চাষাভুসো, শ্রমিক, এরা মানুষ। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, ওই মানুষটি

আমার অবলম্বন নিশ্চয়। পাগল উনি নন।...

—হিন্দুর মেয়ে আপনি...বাঙালি....কেন এরকম একটা অজ গাঁয়ে...উঠুন বাবা! আপনাকে যেতে হবে। সুইট হোম। সুখের গেরস্থালি। আপনার মরাই, আপনার জমি-জিরাত...

—আমি বউ। এটাও আমার পরিচয় এস. পি. সাহেব! ধর্মশিক্ষাটা আপনারা কাছে শিখব না। বলে উঠে চন্দ্রিমা।

—শিখুন। আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। আপনার এত জিদ কিসের চন্দ্রিমা মুখার্জি? এত তেজী মেয়েছেলে দেখিনি। দেবর, স্বামী, শ্বশুর, সংসার সব তো গেল!

—যাবে। তাই বলে আপনি আমার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারবেন না!

—তুমি কে হে মেয়ে?

আমি কে? অবাক হয়ে গেল চন্দ্রিমা। ঘাড় নিচু করল। চোখ নত করল। রাহুল এল না।

স্নেহের তীব্রতা অনেক সময় ভালবাসার রঙ ধরে রাহুল! আমার কপালের টিপ ধেবড়ে গেলে তোমার কষ্ট হয় বুলবনের জন্য, আমার উপর তোমার দাবি ভালবাসার সমান, তা নিছক শরীর নয়, শরীর একেবারেই নয়—স্বামীর মধ্যে অনেক স্ত্রী তার পিতার প্রতিচ্ছায়া দেখে, আমি বুলবনের মধ্যে তোমাকে দেখতে চাই, দেখতে চাই মন্মথকে—এই ভালবাসার ছবিখানি ছকে বাঁধা নেই, এর বর্ডার নেই, সীমা নেই, ফ্রেম নেই।

আমি কে? হিন্দুর মেয়ে বাঙালি? হায় ভাগ্য, পোড়াদেশে মানুষের পরিচয় এতটুকু!

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রিমা ঘাড় নিচু করে এগিয়ে যেতে থাকে পায়ে পায়ে। ওর মনে হয়, মন্মথ এবং রাহুলকে ভালবাসার মধ্যে খুঁজে ফেরা, বুলবনের মধ্যে ওদের দেখতে চাওয়া একটি অলৌকিক তৃষ্ণা, এ কখনও মেটে না। কেন সে এইভাবে স্বপ্নের ছায়াকে অনুসরণ করতে চায়? সে কি একভাবে দ্বিচারিণী, খারাপ মেয়ে?

স্বপ্নের মধ্যে সে রাহুলকে ডেকে উঠেছিল আর সেই মুগ্ধ আকুল স্বর শুনেছিল বুলবন, জাগ্রত স্বামী। তাকে স্বপ্ন এবং ঘুম থেকে ছিন্ন করে টেনে তুলেছিল মানুষটা, চুলের গোড়ায় ব্যথা জেগেছিল। রাহুলের ডায়েরিতে লেখা ছিল মানুষ তার প্রজাতির জন্য আত্মত্যাগ করে, এ শুধু সচেতন আকাঙ্খা নয় মানুষের, এ তার প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত শক্তি এবং প্রাণের ধর্ম।

কোনও সংগঠন-শক্তির মাধ্যমে প্রাণের এই ধর্মকে জগৎ পরিবর্তনের কাজে লাগাতে পারলে তাকেই বিপ্লব বলে, আত্মত্যাগের কাজটি তখন সচেতন কাজ। শুধু প্রাণের ধর্মটিকে বুঝে নিয়ে যারা প্রাণত্যাগের নেশায় মেতেছিল, ত্যাগ এবং হননকে যারা একার্থ করতে এগিয়ে গিয়েছিল, শুধু চিত্তের এই সাহস দেখে চন্দ্রিমা তাদেরই একজন মন্মথকে উদ্ভিন্ন যৌবনে অর্ঘ্য অর্পণ করেছে, সেটিও এক ভালবাসা, আবার তারই মধ্যে ছিল ভালবাসার এক আশ্চর্য স্নেহরূপ—কতক মেয়ে এই দেশে এমনই হয়। প্রাণধর্মের এটিও আর একটা রূপ। ভীরু সংসারে সাহসের পূজা। কমরেড জি. এস-এর দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে এই ভাব, এই স্নেহ, এই ধরনের পূজার কোনও বিরোধ নেই।

মন্মথ চলে যায়, মুছে যায় একদা। রাহুল আসে। রাহুল মন্মথকে আবার জাগায়। কবি এসে জাগিয়ে দিয়ে যায় ছোটনের রহস্য-বৃত প্রাণকে। বুলবন তার স্বামী এবং কমরেড হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ এই মেয়েটির মধ্যে কবি, রাহুল, মন্মথ থেকে যেতে চায়—বুলবনের ব্যর্থতা তৈর হয় দুষ্প্রবেশ্য গ্রামের প্রবেশ-দুয়ারে মাথা কুটতে কুটতে, সে

চন্দ্রিমার মনকে বুঝতে পারে না।

বুলবনের আচরণে ক্রমশ কমরেডের চেয়ে স্বামী এবং নেতা বড় হয়ে উঠতে থাকে। সংগ্রামের সামনে পড়ে বুলবনের ব্যক্তিত্ব চূর্ণ হয়ে যেতে থাকে। ভয়ঙ্কর বেকারত্বের অপমান বুলবনকে বাঁকিয়ে দেয়, ললিতের ত্রাস তাকে অকেজো যন্ত্রের মত করে দেয়—বুলবন দিশেহারা বালকে পরিণত হয়, বালকের মতন ঈর্ষা তাকে কুরে কুরে খায়, বালকের ঈর্ষা !

অদ্ভুত বড় যে, চন্দ্রিমাকে বুলবন ঘৃণা করে একদিন, তার স্পর্শ সহ্য করে না। বুলবনের মধ্যে ভদ্রতা প্রচুর, কিন্তু ভদ্রতার তলে শুয়ে থাকে নিঃসঙ্গবোধ, গ্রাম তার কাছে নিষ্ঠুর-সত্তা একটি, কঠিন—সেটিকে ভেঙে ভেতরে ঢোকার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে। প্রেক্ষাভূমিতে ছিল এক জরুরি অন্ধকার।

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রিমার অন্তর উত্তাল হয়, বুলবনের জন্য পর্যাপ্ত স্নেহ উচ্ছল হয়। সেই একটা স্রোত সরে গেল পায়ের তল থেকে, খালবিলের নদীর জল—রাহুল কোথায় গেল কেউ জানল না। সে ফেরার হয়ে গেল ভারতবর্ষে। রেখে গেল সাদা চৌধুরীর মতন বোবা পিতাকে, যার নামে সে স্লোগান দিত, সেই স্লোগানে গ্রাম জেগে উঠত—তিনি ফিরে যাচ্ছেন—ফিরে যাচ্ছেন মুমতাজের বন্দুক ফেরত দেবার জন্য।

অনেক দূর নয়, খানিকটা পথ ঘাড় নিচু করে এগিয়ে এসেছিল চন্দ্রিমা।
সাদা চৌধুরী জিপে উঠে বসলেন। গাড়ি এগিয়ে যায় চন্দ্রিমার দিকে, প্রধান গেটের দিকে।

জিপ যখন চন্দ্রিমার কাছে, একেবারে পিছনে এসে পৌঁছায়, সহসা সাদা চৌধুরী ডেকে ওঠেন বোবা হৃদয় দীর্ণ করে, উচ্চকিত স্বরে—মা !

হঠাৎ তিনি চন্দ্রিমাকে চিনতে পারেন। মনে পড়ে জালের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা তিনি, ওপারে প্রাণকিশোর, আদিত্য সিংহ, আর বউমা।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায় চন্দ্রিমা। আশ্চর্য মুগ্ধ, নরম চোখে, বিহ্বল শিশুর মতন সাদা চৌধুরী চন্দ্রিমাকে দেখছেন। জিপ থেমে পড়েছে। আর দেরি করে না চন্দ্রিমা। শ্বশুরের পাশে এসে বসে যায়। অম্বরীশলাল বাধা দেন না এবার। জিপ ছুটতে শুরু করে।

—তোমার নাম চন্দ্রিমা !

—হ্যাঁ বাপু।

—মণি বলেছে আমাকে।

এইভাবে কথা শুরু হতে পারত। 'মা' ডাকটি ছাড়া আর কেনও কথা উচ্চারণ করলেন না সাদা চৌধুরী। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আবার বোধ হয় তিনি ভুলে যেতে থাকলেন কোথায় তিনি চলেছেন, কে তার পাশে বসে রয়েছে।

খুব এলোমেলো লাগছে সুর। আবার তিনি চন্দ্রিমার মুখের দিকে চাইলেন। কত মৃত্যু পার হয়ে চলেছেন তিনি। এখনও গোরার মুখটা মনে পড়ছে বারবার। পরনে তাঁর সাদা থানের মোটা কাপড়, গায়েও একখানি সাদা থান জড়ানো।

—আপনি কথা বলুন বাবা ! কাতর স্বরে বলে উঠল চন্দ্রিমা। সাদার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপল। বাক্যস্ফূর্তি হল না।

—নাতাশা ? টুকরো শব্দের মতন এক সময় সাদা চৌধুরীর স্বর স্ফুট হয়।

—ভাল আছে। মণি ওকে খবর দেবে। আপনি ভাববেন না। বলল চন্দ্রিমা।

আবার চুপ করে গেলেন সাদা চৌধুরী। দশ মিনিট সময় চলে গেল। হঠাৎ বললেন—কোথায় যাচ্ছি ?

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে থাকা অম্বরীশ এবার অবাক হয়ে পিছনে ঘাড় ফেরালেন।

—আপনার বাড়ি যাচ্ছেন !

—বাড়ি ? হ্যাঁ, আমি তাই যাচ্ছি বটে ! আচ্ছা, তুমি কে মা ?

আশ্চর্য হয়ে গেল চন্দ্রিমা। তার চোখে জল এসে পড়তে চাইল। ফের সাদা চৌধুরী তাকে ভুলে গেছেন।

—ও আপনার বউমা সাদাবাবু ! বললেন অম্বরীশলাল।

—ও বউমা ! আচ্ছা ! তাই বলুন ! কোথায় যাচ্ছি তাহলে ! কেন ?

—ফিরে যাচ্ছেন আপনি।

—বাড়ি ?

—হ্যাঁ।

—গোরা আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বুঝলেন স্যর ! ওর জলতেষ্টা পায়।

—আপনার মনে পড়ছে ?

—খুব। ওই সেই একজন আঁজল-ধরা নিজের রক্ত গোরার মুখের দিকে জল ভেবে ঠেলে দিচ্ছিল, গোরা বাঁচেনি, এই কথাটা ভাবি স্যর। লোকে বলে, এমন নাকি হয় !

—আপনি দুঃখ করবেন না। বললেন এস. পি। তারপর বললেন—আপনি কথা বলার চেষ্টা করুন বাবু !

—কথা ভাল লাগে না স্যার ! লোকে বলে, এমনও নাকি হয় ! মানুষ পাগল হয়ে যায়।

—পাগল সাজে অনেকে। বললেন অম্বরীশ।

—যে সাজে সেও পাগল বাবা অম্বরীশ। যেমন তোমার বউ ! শুনেছি।

—অ্যাই শালা সাদা ! চোপ শালা। অ্যাই ঘটক, দাঁড় করাও। গাড়ি দাঁড় করাও।

জিপ থেমে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে নামেন এস. পি। একলাফে গাড়ির পিছনে এসে ঝটকা মেরে সাদাকে টেনে ফেলে দেন নীচে, আচম্বিতে। চন্দ্রিমা ভাবতে পারেনি এমনটি, সাদা চৌধুরীকে আঁকড়ে ধরতে না ধরতে দুর্বল তিনি, গড়িয়ে পড়েন। এও কি সম্ভব, এই উচ্চণ্ড ক্রোধ, এই আক্রোশ !

এস. পি. একটা লাথি তুলে ধরেন চৌধুরীর মুখের কাছে। তারপর কী মনে করে সংযত হন, মারেন না। ফের হাত ধরে টেনে তোলেন বৃদ্ধকে। ধাক্কা দিয়ে জিপে ঢুকিয়ে দেন। তিক্ত কথ্যে বলে ওঠেন এস. পি.—র‍্যাবিশ !

সাদা চৌধুরী চন্দ্রিমার স্পর্শ পেয়ে শিশুর মতন দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে ডুকরে ওঠেন। তারপর বলেন—এমন দুর্বলের কাছে কেন এসেছিস মা ! বোবা হয়ে যেতে পারলাম না। কথা এল আনন্দ হল মা ! কোথায় যাবে তুমি ! কার কাছে ? বুলবন যে আরও দুর্বল। তুমি ফিরে যাও মামণি !

—না বাবা ! আমি যাব। তোমার নামে মানুষ জাগবে বাবা ! এমন করে মারলেন উনি, এই অপমান সত্য বাবু। তুমি সহ্য কর। তুমি চুপ কর বাপু !

জিপ আবার চলতে থাকে। চন্দ্রিমা বিমূঢ়, জেলখানা সাদা চৌধুরীকে অনুসরণ করে চলেছে। সাদা চৌধুরীর মুক্তি হয়নি। একটি জেলখানা ঘিরে আছে তাঁকে। এই

দেশটাকে ঘিরে রয়েছে জেল-প্রাচীর। এখানে প্রত্যেক মানুষ বোবা। চন্দ্রিমা মনে মনে সহ্যশক্তি সংগ্রহের জন্য এক পিতাকে অজস্র পিতায় বাড়িয়ে নেয়, এক সাদাকে হাজার সাদায় পরিণত করে নেয়।

শিশাডিহার পথে নামে গাড়ি। এত বেগে চলেছে জিপ যে, দিগন্তে জ্যোৎস্না লুপ্ত করছে রজনী। ভোর হয়ে আসছে। আজান হচ্ছে মসজিদে।

এবার মসজিদের কাছাকাছি এসে চরম অবাক করে দিলেন অম্বর। মানে আকাশ। তাঁর মন আকাশের মত হয়ে গেল হঠাৎ। জিপ থামাতে বললেন উনি। ভয়ংকর গতির জিপটি পঁচিশ-তিরিশ মিনিটের মধ্যে ওঁদের এখানে পৌঁছে দেয়।

—আজান শুনলে মনটা কেমন করে চৌধুরী সাহেব! আপনি আমাকে মাফ করেন, পার্ডন মি প্লিজ। পাপ করেছি। অন্যায় করেছি। আপনি নামাজ পড়বেন? প্লিজ! বলে মসজিদের দিকে হাত প্রসারিত করলেন এস. পি.। তাঁর আক্রোশ উন্মত্ত, তাঁর ধর্মভাব বিচিত্র।

—আমি যাব? মাটিতে নেমে বুক ভরে শ্বাস টেনে শরীর শীতল করলেন সাদা চৌধুরী। ভৈরব নদীর প্রবাহিত জলের দিকে চাইলেন। গায়ের কাপড় জুত করে জড়ালেন। চেয়ে দেখলেন এস. পি.-র মুখে পেয়াদার চোখে, চন্দ্রিমার বিহ্বল-কাতর তীব্র দৃষ্টির দিকে।

বললেন—যাব নাকি? খোদার ঘরে যাব?

—নিশ্চয় যাবেন। জবাব করলেন অম্বরীশলাল।

—তোমার অপমান খোদা ছাড়া সহ্য করতে পারেন না অম্বর। এভাবে হজরত মুসা সিনয় পাহাড়ে যেতেন, আমি আসি। চন্দ্রিমা, তোমার নামে মা আছে, খোদার কাছে আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব। এই মসজিদ আমার দুর্গ। এখান থেকে অস্ত্র লাভ করেছেন নবী।

বলতে বলতে সাদা চৌধুরী সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। প্রত্যুষের জ্যোৎস্নায় বিলীয়মান প্রকৃতি আরও সাদা হয় পুব আকাশের সূর্য-সংকেতের শুভ্রতায়। চাঁদ সূর্যের শুভদৃষ্টি হয় অলক্ষ্যে। সাহস ফিরে আসে সাদা চৌধুরীর দেহে, অপরিমিত বল আসে পায়ে। তিনি ছুটে চলে যান মসজিদের দিকে।

নামাজ শেষে হঠাৎ তাঁকে জামাতে নামাজির বেশে দেখে জনতা ধার্মিক শিশাডিহার প্রাণপুঞ্জ আবেগে-বিস্ময়ে মথিত হতে থাকে। নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন সাদা।

—বাবু!

অজস্র কণ্ঠ 'বাবু' নামে গুঞ্জিত হয়। জিপ এসে লাগে সেখানে। এস. পি. এবং পেয়াদাটিকে দেখে জনগণ। চন্দ্রিমাকে দেখতে পায়।

—বউমাকে সঙ্গে করে ফিরলেন বাবু!

—হ্যাঁ ভাই!

—আপনার চাকরি!

—আমার লজ্জা ইমাম সাহেব! সব শেষ হয়ে গেছে!

চয়ন খতিব বলে ওঠে—আপনার জন্যে এন্তেজার ছিল চৌধুরী সা'ব।

—বলো!

—আমি খতিব। ইমাম কেন ডাকেন। ইমাম তো আপনি। আপনিই নেতা।

আপনার কাছে একটা 'খায়েস' আছে।

—বলো।

—বউমা আমাদেরও বউমা!

—জরুর।

—ওকে কলমা পড়িয়ে ঘরে তুলতে হবে। নাটা তরফদারের নির্দেশ মনে করবেন না। এইডা আম-জনতা ধর্মপ্রাণের মর্জি, আশা করি আপনি বুজদিল নন। আর চন্দ্রিমার নতুন নামও আমরা ঠিক করে রেখেছি বাবু!

—কী?

—ফতিমা!

—ও। চন্দ্রিমার বদলে ফতিমা!

—জি!

—আচ্ছা! শুনুন তবে মজলিস-এ-ইসলাম! আমার মেডিনিস বক্সে একটা ওষুধ আছে।

—জি?

—ওটা খেলে প্রাণত্যাগ করা যায়! আছে নাকি মা চন্দ্রিমা? নেই?

—আজ্ঞে! উত্তর দেয় চন্দ্রিমা চৌধুরী।

—চন্দ্রিমার মধ্যে একটি মা আছে, ফতিমার মধ্যে সেই মা আছে। তোমার নির্বাচনের তারিফ করি চয়ন খতিব। কিন্তু ওটা বদলানো যায় না।

—কেন?

—যাঁরা এই নাম রেখেছেন, 'চন্দ্রিমা', তাঁরা ওই মা-টুকুর জন্যেই রেখেছিলেন, ওটির মানে আকাশের চাঁদ। একটিই আকাশ, চাঁদও একটা। বাপ-মায়ের রাখা নাম কেড়ে নেওয়ার সাধ্য আমার নেই। ওটা থাকবে।

—আপনার জিদ!

—কলমা পড়বে কিনা সেটাও চন্দ্রিমা ঠিক করবে।

—আপনাকে ঠিক করতে হবে চৌধুরী!

—আমার মেডিসিন বক্সে ওষুধ আছে বলেছি। জেল আমাকে মারতে পারেনি। তোমরা আমাকে ধ্বংস করো না। এই এস. পি. আমাকে একটু আগে লাথি মারতে গেছে, পাগল, পাগল সাজিয়ে এনেছে তোমাদের সামনে, বোবা করে রেখেছিল। চন্দ্রিমার নাম কেড়ে নিয়ে কলমা পড়ালে তাকে অত্যাচার করা হয় চয়ন।

—আপনার ঘর জ্বলবে বাবু! এই প্রস্তাবে ললিতের সায় আছে!

—কোন প্রস্তাবে?

—নাম বদল। কলমা পড়ানো।

—শুধু নাম, শুধু ধর্ম নয় চয়ন। স্বার্থের জন্য এরা দেশটাকেও অন্য দেশের কাছে বেচে দেয় খতিব। এদের ধর্ম নেই। ওর কথা বাদ দাও।

—আপনার কথা?

—বলা হল! ব্যাস! চলো মা!

—আপনার বাড়িতে বন্দুক লুকানো আছে সাদা চৌধুরী! তরফদারের বন্দুক, পুলিসের বন্দুক। গেটের ছুড়াং!

—আছে। যদি থাকে, ফেরত দেব। চলুন এস. পি.।

—আপনার ফিরে আসা বোধ হয় ঠিক হল না বাবু ! বলে উঠল চয়ন ।

হঠাৎ কে একজন চিৎকার করল—এই খতিব বড়ই কথা বলে । এটার মুখ বোজাও । মগরায় ফিরে যাও খতিব । জাতধর্ম আমরা দেখব । ইনকেলাব জিন্দাবাদ । সাদা চৌধুরী জিন্দাবাদ !

ঝড়ের মতন স্লোগান জেগে উঠল বাতাসে । সূর্যের ক্ষীণতম আভাস লাগল পুব আকাশে । জিপ ছাড়ল ।

চন্দ্রিমা বুঝতে পারল একটি প্রখর যুদ্ধকে ভগ্ন ডানায় করে, মুখে করে, ঠোঁটে করে সাদা প্রবেশ করলেন মোহড়া চিৎপুরে, সেই ডানায় ঝুলতে থাকল চন্দ্রিমা । বাড়িতে এসে সকলকে দেখতে পেল সে । মণি নেই । মণি কোথায় ? মাঠে ? জমিতে ? তার বাপু যে ফিরে এসেছেন ! হুকুম বলল—খুব বিহানে বন্দুক হাতে চলে গেল মণি । উ দিকে । হুকুম আলি আঙুল তুলল কোনও একটি দিগন্তের দিকে ।

॥ ৫৫ ॥

সাদা চৌধুরী যখন শিশাডিহার মসজিদে নামাজ পড়তে ঢুকলেন অম্বরীশের জিপ থেকে নেমে, তখন সেই প্রত্যুষে চাঁদ-সূর্যে অলক্ষ্য শুভদৃষ্টি হয়েছিল । ডিমের খোল ভেঙে যেভাবে রাঙা-কুসুম বার হয়ে আসে, পুবের আকাশে হঠাৎ জড়ো হওয়া কালো মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের কুসুম বেরিয়ে পড়ল গুমানি নদীর দিগন্ত-ছোঁয়া ফিরতি জলোচ্ছ্বাসের উপর ।

সেই আলো এসে লেগেছিল মণির হাতে ধরা বন্দুকটার কৃষ্ণ তনুতে, চকচকে মসৃণতায় । মণি লক্ষ করছিল সেই সোনার আলোর পিছল ঝলকানি । বন্দুকের গায়ে নাটার পাঞ্জার ছাপ আছে, কিন্তু দেখা যায় না । বাপু এই বন্দুক দিয়ে চা-পাখি মেরেছিলেন ডোবার জলের কিনারে, পাখিটার ঠোঁটে ধরা ছিল সাদা কুচি মাছ ।

সেই মাছটা ছটফট করছিল । ওই চা-পাখিটিকে মেরে না দেখালে বাপু যে মিলিটারি ছিলেন, নাটা সে কথা বিশ্বাস করতেন না । কিন্তু কচি মাছটা ঠোঁটের ফাঁকে ছটফট করছিল ।

মাছের মত, পাখির মত মানুষও ছটফট করে । স্বামীর মৃত্যুর পর ছটফট করে আমানির মা হাওয়া বেওয়া । সে একাকিনী থাকে স্বামীর ভিটায় । তার কাছে শুতে আসে আধ-ভিখিরি কানে কালা ফুফু । চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ধোঁয়া ধোঁয়া । রাত্রির অন্ধকার তার চোখে পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে থাকে । পাহাড়ের মত উচ্চ, পাহাড়ের মত ভারী ।

সেই তমসা-পর্বতের গা ঘেঁষে রাত্রিভর একটি হায়েনা হেসে হেসে অস্থির । হায়েনার ডাক মানুষের বিদ্রূপাত্মক হাসির মতন ক্রমাগত হেসেই চলেছে ।

একটি হায়েনা আসে বলে শোনা যায় । রব ওঠে । মোসলেমের পা খেয়ে গেছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে । সেই জন্তুটাকে মণি খুব অস্পষ্টভাবে দেখেছে বা সেটা কল্পনা হতে পারে । মণির অনেক কল্পনা বাস্তবের মত । যেমন সে গত রাতে জ্যোৎস্নার মধ্যে একটি দৃশ্য কল্পনা করছিল, পরে সেটা বাস্তব হয়ে যায় ।

জ্যোৎস্নার মধ্যে হাওয়া বইছিল । মরাইতে রবিশস্যের গন্ধের অবশেষ ঘ্রাণ হয়ে

ভাসছিল। নাকে এসে লাগে।

সেই গন্ধে মন খুব উন্মনা হয়। হঠাৎ মণির মনে হয় গাঁয়ে হায়েনা ঢুকেছে। নিশুত রাতে রব ওঠে হাহাকারের মতন। ফুফুর নিশ্চয় নাক ডাকছে নিদ্রায়, অথচ ফুফু সেই ডাক নিজে শুনতে পাচ্ছে না। মানুষ তা পায় না। কিন্তু জেগে থাকলেও ফুফু রাতডাকা পাখির ডাক শুনতে পায় না। উঠোনে এসে জ্যোৎস্নায় কেউ দাঁড়ালেও দেখতে পায় না।

অথচ এই ফুফু আমানির মাকে পাহারা দেয়। মানুষ জানে আমানির মায়ের পাহারার কোনও দরকার ছিল না। তাকে রোজ রাতে সাত পুরুষে ছিঁড়ে খাবে, তাই-ই যেন সহি হদিস। মণি অবশ্য জানে না ছিঁড়ে খাওয়া কাকে বলে।

ওর হঠাৎ মনে হল, হায়েনা ঢুকেছে কোথাও। এত উড়ু উড়ু জ্যোৎস্নায় খারাপ মানুষরাও প্রেম করে। শশাঙ্কবাবুর প্রেমিকার নাম হাওয়া বেওয়া। মণি ভাবছিল, এই রাতে হয় রাহুলদাদা মোহর আপার কাছে চলে যাবে নয়তো হাওয়ার কাছে আসবে শশাঙ্ক। এটা একটা কল্পনা। কিন্তু সেটা বাস্তব হয়ে যেতে পারে।

শশাঙ্ক গরু ভালবাসে, ন্যালার মাকেও ভালবাসে। কিন্তু মোহরের কাছে রাহুলের ছুটে যাওয়া আর হাওয়ার কাছে শশাঙ্কর আসা—এই দুটি ঘটনা সমান্তরালে ভাবছে কেন মণি! হায় আকাশ, আমাকে পবিত্র কর, উদার কর, প্রশস্ত কর ; আমার বড় কষ্ট হয়! বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে থাকে মণি।

বাপু বলেছেন, কষ্ট হলে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে থাকবি।...আছি। আমি চেয়ে আছি বাপু। নিজেকে বলল মণি অধিকারী। অধিকারী অর্থ হকদার। বলল, এই আকাশের হকদার আমি, এই মাঠ, শস্যক্ষেত্র, এই গাঁয়ের হকদার মণি চৌধুরী, এখানে আমি আছি বাপু।

এই জ্যোৎস্নার মধ্যে কোলাহল হচ্ছে কোথাও। যে-দেশে জোতদার গরু ভালবাসে ভয়ানক রোখে এবং দাসী-বিধবাকে ভালবাসে, হায়েনাচরা সেই দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম হয় না। ন্যালাকে পিটিয়ে মেরেছে শশাঙ্ক, অথচ ঘৃণা নেই হাওয়ার হৃদয়ে, দেহ দেয় বেওয়া-বাঁদী, লোকে সে কথা বলে। দেহ দেওয়া কী জিনিস, কল্পনায় তৈরি করতে পারে না মণি। কখনও সে শশাঙ্ক আর হাওয়ার দু'টি দেহকে কাছাকাছি টেনে আনতে পারে না কল্পনার দ্বারা। অথচ সে দেখেছিল দেওয়ালে কুপির আলোয় দু'টি ছায়া পড়েছে, যন্ত্রণা আর আনন্দ ঘনীভূত।

—পাপ হয়।

—পাপ হয় না।

—ধর্ষণ হয়।

—হয় না ধর্ষণ। দেহদান হয়। এদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম হয়।

—মোটেও হয় না সেসব। কবি মরে যায়। বেওয়া-বাঁদী প্রেম করে হেথা, কী আশ্চর্য! শ্রেণী ঘৃণা জিনিসটা কল্পনা মাত্র। কল্পনা বাস্তব হয় মণির মধ্যে। হায়েনা ছুটছে এখন। রব উঠছে।

—বেওয়া-বাঁদীর সতীত্ব থাকে না।

—মান-অপমান থাকে না।

—রুচি-অরুচি থাকে না।

—দেহ থাকে।

—গতর।
—হৃদয় থাকে না।
—থাকে ভয়।
—গতরের খিদে আর ভয় ছাড়া কিছুই থাকে না।
মণি জানে আমানির মা আনন্দে আছে। ভয়ে আছে। ডালি দিয়ে গোবর ঠেলছে, ঝাঁট দিচ্ছে, থালাবাসন মাজছে, দেহ দান করছে।
ও বলেছে, ডরে ভয়ে থাকি ভাই। বাবু যা বুলে করি। যা চাহে দিই।
—পাপ হয় না?
—না।
লোকচর্চা শোনে মণি। জানে না, দেওয়ালের জোড়া ছায়া দেখা পাপ কিনা, শীৎকার কী জানে না, যন্ত্রণাবিদ্ধ আনন্দ, কতটা যন্ত্রণা, কতটা আনন্দ জানে না—সেই মুখ-গহ্বর উত্থিত, জিহ্বা-লালায়িত বোজা-স্বর শোনা পাপ কিনা! আজ মনে হল, আবার সেই দৃশ্যটা হবে।
দৃশ্যটা যদি দেওয়ালে পড়ে সে কী করবে! সোনাই এসে একদিন বলে গিয়েছে, এটা দেখা খারাপ।
—জানি।
—স্বামী-স্ত্রীতে যা হয়, ওদেরও তাই হয়। এর পর বাচ্চা বিয়োবে হয়তো।
—যাঃ!
—দেখবি হয় কিনা! হিন্দু বিধবারা মাছ খায় না কেন জানিস?
—কেন?
—বাচ্চা হয়ে যাবে সেই ভয়ে!
—তুই মূর্খ, কিছুই জানিস না সোনাই। আমি জানি। ওটা ভালবাসা। আমি শুনেছি।
—কী?
—কাতরানি, আনন্দ, ভয়। মারাত্মক। সিনেমা হত, যদি ন্যালার মা চিৎকার করত।
—কেন করে না?
—এটা বাস্তব, তাই। বাস্তব মানে খাঁটি, বুঝলি! 'ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে। রইব না আর বেশিদিন তোদের মাঝারে!'
—ধুস! তুই ফের গান শুরু করলি!
—কী করব! এটা বিবেকের গান। একে বলে 'ব্যাক মিউজিক', কে গায় বোঝা যায় না।
—'ঝুটি হ্যায় ইয়ে সারি নগরী, ঝুটা হ্যায় সন্‌সার'—গানটা ব্যাক মিউজিক নাকি?
—জানি না। ওটা পাকিস্তানি গান।
—হিন্দুস্তান পাকিস্তান হল কেন রে!
—কায়দে-আজম-জিন্না করেছিল, হিন্দু নেতারা করেছিল। বুঝলি! রাজনীতি জিনিসটা কায়দার জিনিস। কবিদাদার কাছে রাহুলদাদা পলিটিকস শিখল, কিন্তু কায়দাটা জানে না, সেই জন্যে আমরা ডুবে গেলাম।
—তোর অনেক জ্ঞান হয়েছে মণি!
মণি বলল—হুঁ!

দৃশ্যটা কি আবার তৈরি হবে চোখের উপর সাদা দেওয়ালে ? দুটি ছায়া নড়ে উঠবে ? একটি ছায়ার বুকের মধ্যে আর একটি ছায়া ডুবে যাবে ? একটি মুখ লম্বা হয়ে হায়েনার মত নামবে কাপড় সরানো নারীমাংসের হৃদয়ে ?

বন্দুকটা হাতে তুলে নেয় মণি। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে কদমের ভিটার দিকে। বন্দুক কিভাবে ছুঁড়তে হবে মণি তা জেনে নিয়েছে এতদিনে। চা-পাখি মেরে বন্দুকটা নাটার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাবা। সেদিন তার ভয়ানক লোভ এবং রোখ হয়েছিল ফায়ার করার। কিন্তু লজ্জায় সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তুহিন এবং খোদা বকসের কাছে বন্দুক চালনার তালিম সে নেয়নি। শিখেছে মণি পালের কাছে। ওস্তাদ শিখিয়েছেন পালা-নাটকের মহলায়—তাঁর একটি সত্যিকারের বন্দুকও রয়েছে।

যখন স্টেজে বন্দুক ছোঁড়া হয়, তখন গ্রীনরুমে পটকা ফাটে। নকল কার্তুজ ফেটে ধোঁয়া বার হয় বড়জোর। নাটার এই বন্দুকটার পেটে রয়েছে তাজা বিচি। মণি ঢুকিয়ে নিয়েছে। এর নল দিয়ে নকল নয়, আসল প্রাণঘাতী ধোঁয়া ও আগুন বার হতে পারে। মণির দাঁড়ায় ঘাম দেখা দেয়।

আকাশে তীব্রবেগে চাঁদ ছুটে যাচ্ছে হালকা মেঘের আঁশের পেটের ভিতর দিয়ে। সেদিকে চোখ তুলে চাইল মণি। মনে হল সে-ও যেন কোথায় ছুটে চলেছে। পৃথিবীর বাইরে যেন সে ছিটকে চলে যাবে, আর সে সেই মহাশূন্য থেকে ফিরে আসতে পারবে না।

বউদি বলেছে, বেতন পেলে জমির বন্ধকি ছাড়িয়ে দেবে। অথচ সে ফিরে এল না।

কদম মরে গেল, তবু বাপুকে ছাড়ল না এমারজেন্সি। রাহুলদাদা কোথায় গেল, মোহর আপার সঙ্গে দেখা হল কিনা কিছুই জানা যায় না। মোহরের কাছে রাহুল যেতে পারে না, কবি তার মায়ের কাছে যেতে পারে না, চন্দ্রিমা বুলবনের কাছে ফিরে আসে না, কদম তার বউয়ের কাছে পৌঁছাতে পারে না কেন ? মায়ের কাছে বাপুর ফিরে আসার কথা, তা-ও হয় না। অথচ ন্যালার হত্যাকারী শশাঙ্ক কি করে হাওয়ার কাছে সহজে পৌঁছে যায় ! হ্যাবা বউ এখন বিধবা, তার অন্তরে ঘৃণা নেই।

কদমের উঠোনে পেঁপেগাছের কাছে বন্দুক হাতে করে দাঁড়ায় মণি। ঘরের ভিতরে ঘুমন্ত ফুফুর নাক ডাকছে। বাইরে দাওয়ায় চাঁদের তেরছা আলোয় দেহমিলন হচ্ছে।

—আহ্, লাগে বাবু ! হিহি !

—চোপ !

—ছাড়েন কেনে ! ফুপু বহরা কালা, শুনে না। খালি ছ্যা ছ্যা করে। কুত্তা তাড়ায়।

ফুফুর ঘুম চটে যায় এক মিনিট। তখন সে ছিৎকার দেয় আন্দাজে, কে উখানে ! ছ্যা, ছ্যাঁ। ছেই। পালা পালা। এভাবে ফুফু দুশমন খ্যাদায় মুখের শব্দে।

—আরে যাঃ !

যায় না। জ্যোৎস্নায় পুলকিত যামিনী, সুহাসিনী সুমধুর ভাসিনী।

—গায়ে আপনার বাস কত বাবু ! হিহি !

সুজলাং সুফলাং শসশ্যামলাং মাতরম।

—ন্যালা আমার কান্দে বাবু গো !

—দিব, দিব। ধান দিব। গহম দিব। আনাজপাতি দিব। বাস তেল-সাবান দিব। মাথার টায়রা দিব। নাকের নোলক দিব। পায়ে মল পিঁদবি কদমের বিবি। গৃহ দিব।

—সোয়ামি নাই বাবু।

—আমি আছি।

—যা, যা !

আবার ঘুম থেকে জাগে ফুফু। কানে শোনে না, চোখে দেখে না, পাহারা দেয়। অন্ধ ঘৃণা লক্ষ্যহীন। দৃষ্টিহীন ক্রোধ উচ্চকিত, ব্যর্থ। তবু জাগে চেতনার মতন এবং কাতরায়।

—মানুষ ? ইনসান আসেছে মা হাওয়া ? গন্ধ পাই।

ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী।

—ফুলের বাস ফুপু।

—মানুষের গন্ধ মা !

—ন্যালার কবরের ফুল ফুপু, ফিরিস্তার আতর। শুনতে পাও ?

পায় না। ফুফু মানুষের গায়ের গন্ধ পেতে থাকে।

—গন্ধডা বাবু বাবু ! সর্বনাশ হাওয়া। কী করছিস মা ? আমারে ছুঁয়ে দেখা।

বাইরের দাওয়া থেকে ঘরের ভিতরে হাত বাড়ায় হাওয়া বেওয়া। নাগাল পায় না। ফুফুকে স্পর্শ করে বিশ্বাস করাতে চাইছে তার কাছে লোক আসেনি।

শ্রেণী-মিলনের বাতাসে ফুলের গন্ধ ভরে যায়, ফুল্ল কুসুমিত এই গ্রাম পূর্ণ হয় সুখে। একজন অন্ধ দৃষ্টিহীনা প্রহরী আমানির মাকে কী অসহায়ভাবে পাহারা দিয়ে চলেছে। স্পর্শভিক্ষা চাইছে কিরাকসমের মতন।

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ওঠে মণির হৃদয়।

—আমানি মোকে ডাকে ছোটবাবু ! গোর থিকে বহলায়, রুদন দেয় ফাল-লাগা ছাওয়ালডা, আমার চক্ষের মণি, নয়নের তারা !...

মানুষের গন্ধ, সেই গন্ধের আর এক নাম দৃষ্টি, মানুষটাকে দেখা যায়।

—ছেই !

—সরছে না ফুফু !

—অ্যাই শালী ! চুপ কর, গলা টিপে দিব। মাথার কাঁকই দিব তোকে। জমি দিব। গৃহ দিব। মাচানে লতাপাতা দিব। মুরগি ছাগল দিব। লাল ঝাণ্ডা দিব হাতে ; ন্যালা থাকলে গলায় লাল রুমাল বাঁধত একদিন।

—জি, ছোটবাবু !

এবার মণির হাতের বন্দুকটা গর্জে উঠতে পারে। তাক করে মণি। ট্রিগারে আঙুল রেখে চুপ করে থাকে, পারে না।

—সোয়ামি ফিরল না বাবু। পথে গুলি খেয়ে কুকুরের ধারা মরে গেল। জিন্দেগি আমার দুশমন ছোটবাবু ! পাপ হয়। ছেলের শাপ লাগে। আমি চেঁচাব, মানুষ ডাকব। আমাকে ছুঁয়ে দ্যাখ ফুপু, আমি পাপী। ও মা গো !

আকাশে চোখ তুলল মণি, বন্দুক নামিয়ে ফেলল। ডুকরে উঠল হাওয়া।

হাওয়ার বুকের উপর উঠে দাঁড়াল শশাঙ্ক। একটা লাথি কষিয়ে দিল। লাথি খেয়ে আচক্কা কোঁৎ করে শব্দ করল মেয়েটা, ওর মাথার চুল ধরে টেনে দাওয়া থেকে হিঁচড়ে ফেলে দিল ছোটবাবু। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বিধবা।

ফুফু ঘুম থেকে জেগে তার ভাইঝিকে অন্ধ হাত প্রসারিত করে বাইরের দাওয়ায় খুঁজল বাতাসে হাত মেলে মেলে।

—অ মা ! কুন্‌থে মা রে ! অ হাওয়া, কথা কহ বিটি ! বলতে বলতে ফুফু উঠোনে

নামল বাতাসে দু' হাত প্রসারিত করে। অন্ধ কালা সে গন্ধ ছাড়া কিছুই ঠাহর করতে পারে না। শশাঙ্ক হাওয়াকে উঠোনময় চুলের পাশ ধরে টেনে নিয়ে বেড়াল।

—বাবু! আমাকে অমন কেনে করেন! সোয়ামি সন্তান দিয়েছি বাবু। দেহ দিয়েছি। সাধ মিটেনি?

—গতর ছাড়া আছে কী তোর! কাল তেরোঘরায় চলে যাবি। তোকে আমি উচ্ছেদ করলাম।

—বাবু!

গা থেকে হাওয়ার জ্যালজেলে বসনখানি উঠোনে খসে পড়ল। গা ঢাকে বটে, এই কাপড়ে আব্রু বাঁচে না। মণি দিনের বেলা ওই পাতলা কাপড়পরা হাওয়ার দিকে চাইতে পারে না। তবু এই বসনই হয়তো বিধবার লজ্জা নিবারণ করে।

বসনখানি ফুফুর পায়ে জড়িয়ে যায়। উঠোনের এককোণে হাওয়া জড়ো হয়ে বসেছে, মুখ ঢেকে। মণি পেঁপেগাছগুলির আড়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রোখা শশাঙ্ক কোনও দিকে চাইছে না। নগ্ন হাওয়াকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ফুফু উঠোনে নীচু হয়ে পাতলা খাটো শাড়িখানা হাতে করে তোলে। তারপর ডুকরে ওঠে—মানুষের গন্ধ মা, তোকে ছাড়ল না পিয়াসী। দুখপিয়াসী মা! লে, কাপড় লে! হাত বাড়া কদমের বউ!

কুপি জ্বলে উঠল ঘরের মধ্যে। এ কী অবাস্তব আলো! বাইরে মায়াবী জ্যোৎস্না। ঘরের দেওয়ালে নগ্ন প্রেতের মতন ছায়া। চোখ বন্ধ করল মণি।

বেআব্রু শাড়ি হাতে দাঁড়িয়ে জননীর মতন ফুফু। অন্ধ একটা মূর্তি বসন ধরে মানুষের ইজ্জৎ খুঁজছে কোনও একটা দেবীর মতন। এ ছাড়া মণির আর কোনও উপমা মনে আসে না।

—মা! হাত বাড়াও খুকি!

সেই যন্ত্রণা, সেই সুখ! দেওয়ালে ছায়া। দৃশ্যটা তৈয়ারি করলেন খোদা-রসুল। খোদা বানালেন অন্ধ কালা নারী, হাতে তার কাপড়। মণি ভাবল, সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এই শীৎকার সরস্বতীর পবিত্রতা বিদীর্ণ করে। মণি জানে না শীৎকারের এই ধ্বনি হয়তো জগতের সকল দুঃখের উৎস কিনা, ধ্বনিত লালায়িত সুখ তার দুর্বোধ্য যৌন-অনুভূতি জাগায় কেন!

—পাপ হয়।

—হ্যাঁ বউদি পাপ হয়। কদম আলি, পাপ হয় দাদা! আমানি! পাপ হয় বটে। ফাল-লাগা গরু, ভাই! কত পাপ হয়। রাহুলদাদা, পাপের শেষ নাই!

আমাকে পবিত্র কর বাপু! মা আমাকে পাক-সুতরো কর! কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

—বাবু খালি রাগ করে! কত জিদ মশাইয়ের, সাহেবজাদার কত শখ, নাঙা না করলে পেট ভরে না! ফুপু বসন ধরে কাঁদে গো! ছেড়ে দে দুশমন!

—আহ্ মাগি।

প্রচণ্ড চড় গিয়ে বসল হাওয়ার গালে। কঁকাতে থাকল এক অন্ধ ঈশ্বরী, বাইরে, উঠোনে। বোবা অপমানে ফুঁসতে থাকল মণির জিঘাংসা। বন্দুক গর্জে উঠতে পারল না।

পথে নেমে চলে এল মণি। তার দেহে বিষ্ঠা ভরে গেছে। তার সর্বাঙ্গে ঘৃণা।

সমস্ত রাত পথে পথে হেঁটে বেড়াল মণি। কোদালকাটির স্লুইস গেটের কাছে এল। কোদালকাটি ছাড়িয়ে বিলের কালো মাটির পথ ধরে বিলপথ অতিক্রম করল শত রসি।

আকাশে চাঁদ। চারিদিকে গোলাকার দিগন্ত। মাটির উপর উবু হয়ে বসল সে। এখানে রাতচরা পাখি উড়ে যায়। আচম্বিতে ডাকে কর্কশ পেঁচা।

—আমার শিক্ষাদীক্ষা নাই রাহুলদাদা! পলিটিক্স নাই। ডোঙা নাই, জল নাই, গেট নাই। রেডবুক নাই। বাপু নাই, বউদি নাই। চাষ আছে, পয়সা নাই। আমি অধিকারী। পাপী। এই আমার স্টেজ, এই মাঠ, এই বিল, এই কালো রাস্তা।

ওই দৃশ্যটা অসহ্য। অন্ধ ফুফু বসন ধরে দাঁড়িয়ে ডাকছে। নিজেকে তো গুলি করতে পারি। কবি দাদা করেছিল। ন্যালা কাঁদে। উচ্ছেদের ভয় দেখালো শশাঙ্ক। শশাঙ্ককে চয়ন খতিব মসজিদের কোণে নামাজের আসন, বড় শেতলপাটি জড়িয়ে খাড়া করে রেখেছিল।

চয়ন খতিব বউদির নাম রেখেছে ফতিমা। ওয়াক থুঃ! এটা কি ধর্মের প্রস্তাব খতিব? মরবার আগে কদম অনবরত নামাজ পড়ত। সেটাও কি ধর্ম খোদা মিঞা!

আমার ধর্ম নাই, পলিটিক্স নাই। কী আছে রাহুলদাদা! তুমি কোথায়?

ভাবতে ভাবতে চাঁদ হয় ধূসর বরফ। রাত পুইয়ে যায়। বিল ছেড়ে পথে উঠে আসে মণি। চাঁদ সরে যাবে না। পূর্ণিমা গেল। চাঁদ থাকতে থাকতেই আকাশে সূর্যের আলো এসে পৌঁছাবে।

আমানির কবরের কাছে পথের বাঁকে এসে দাঁড়ায় মণি। পথের উপর খাড়া হয়ে নিস্তব্ধ দাঁড়ানো বুলেট; অবাক হয় সে। মোটর বাইকটা এখানে কেন?

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে আমানির কবরের ভিটায়। ওখানে সাদা ফেরেস্তার মতন হাফশার্ট, ধুতিপরা ললিতমোহন মাটিতে লেটিয়ে বসে মাটি মুঠোয় নিয়ে ঝরিয়ে দিচ্ছেন আর চাপাসুরে দেহ কাঁপিয়ে কাঁদছেন। এ দৃশ্য অভাবিত; মণি অনুভব করতেই পারে না, মানুষটা এভাবে কাঁদতে পারেন। কাঁদতে কাঁদতে হাতের মাটি ফেলে দিয়ে দু' হাতে তালি বাজিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দ্রুত ছুটে এসে বাইকে বসে গেলেন। গাঁক করে লাথি মেরে গর্জে তুললেন মোটর। মোটরবাইক ছুটে চলে গেল পথের উপর। মণিকে তিনি দেখতে পেলেন না।

অথচ অদ্ভুত, ন্যালাকে দুই তিন ভাই মিলে বিনে চিকিৎসায় পাহারা দিয়ে মেরেছেন এঁরা। তা হলে কাঁদেন কেন এভাবে! শশাঙ্ক রাত্রে যা করল এই ললিত কি তা জানেন?

মণির মনে হল, এই দৃশ্যটা অবাস্তব, অলৌকিক। কিন্তু সে সচক্ষে দেখেছে। কাঁদছিলেন তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গেও কি মানুষ অভিনয় করে? কিন্তু ললিত তো কাউকে দেখানোর জন্য কাঁদেননি? ওঁরও তা হলে কোথাও ভয় আছে। তাঁর কি কখনও দুঃখ হয় একথা ভেবে যে, সোভান আলিকে শশাঙ্ক গুলি করেছিল? দুঃখ হলেই কি মানুষ তা প্রকাশ করতে পারেন?

এ দেশে যুগ যুগ ধরে রাজারা গণহত্যা করেছেন, রাজাসনে বসে কখনও কি অশ্রুপাত করেছেন তাঁরা! শোনা যায় নাদির শা নাকি করেছিলেন। মণি ভাবল, নাদির শাহের পালাটা আর বুঝি করা হল না।

ক্রোধ হয়। আরও ক্রোধ হয় অন্তরে। ললিতের এই দৃশ্য আরও ঘৃণার বহ্নি জ্বালে। হয়তো ওঁর অশ্রু তাঁর নিজের কাছে একান্ত সত্য, মণি বলে, খাঁটি। কিন্তু দেওয়ালের রাত্রিচ্ছায়া, কুপি, চাঁদ, ফুফুর বসন ধরা মূর্তি কি মিথ্যা ছায়াছবি?

পথ ছেড়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে মণি। সর্বাঙ্গে ঘৃণা, প্রতি অঙ্গে পাপবোধ।

—মা! ললিতমোহন কাঁদে মা! বিড়বিড় করে বলে ওঠে মণির হৃদয়। আয়েষা নামাজে অধিষ্ঠিতা।

তাঁর পাশে মেঝেয় বন্দুকটা রাখে ছোটছেলে। নামাজ সে জানে না। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় নত হয় মণি। আয়েষা বড় আশ্চর্য হয়ে যান।

—কে তুমি?

—আমি মা। মণি!

—কী কর?

—নামাজ পড়ি মা!

—বাপুর জন্য মোনাজাত কর বাছা!

—করি।

—বউদি বুলবনের জন্য খোদাকে বল!

—বলি মা।

—রাহুলের জন্য!

—সবার জন্য মা।

মা নামাজের সালাম ফিরিয়ে দোয়া পড়ে মণির মাথায় ফুঁ দিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন—বেঁচে থাকো। ওই বন্দুকটা কেন রে? ও আর কাছে রাখিস না।

—আচ্ছা! বলে উঠে দাঁড়ায় মণি।

—কোথা যাস?

—আসছি মা।

ছায়ার মত মিলিয়ে যায় মণি। বাইরে পথে নেমে দৌড়তে শুরু করে। ওকে বার কতক ডেকে ওঠে হুকুম আলি। মণি সাড়া দেয় না।

নাটা তরফদারের বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় সে। লোহার বড় গেট টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ভিতরের কাঠের দোর ধাক্কা দিতেই খুলে যায়।

সিধে চলে আসে ব্যথা তরফদারের সামনে। ব্যথা নামাজের আসন গুটিয়ে তছবিহ যথাস্থানে কাঁটায় ঝুলিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই জলগেটের চাবি মেঝেয় ঝনাৎ করে পড়ে পায়ের কাছে সড়কে এসে থামে।

—কে? বলে চমকে ওঠেন ব্যথা।

—ফিরত দিলাম খালা-মা!

—তুমি মণি বাপা?

—জি।

—কাছে আসো।

বাইরের টানা বারান্দায় ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে আশ্চর্য অভিভূত হয়ে এগিয়ে আসেন ব্যথা। এগিয়ে আসেন কিনারা অবধি। বারান্দায় উঠে মণি এক বিঘৎ নাকখৎ দেয়। তারপর বন্দুকটা ব্যথার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে—দু'নলা ফিরত দিই, খোদার নামে। আমার বাপুকে ফিরত দাও খালা-মা।

—পাবি।

—বউদিকে ফিরত দাও।

—পারব না। ওটি পারব না বাপজি।

—রাহুল ভাই !

—হদিস লাগাও। যাও। চলে যাও ! তোর জন্যে মায়া হয় মণি !

—পানি দিবেন জমিনে।

—দিব।

মোসলেম সংবাদদাতা এই সময় উঠোনে এসে দাঁড়ায়। দু'টি আশ্চর্য খবর সে পরিবেশন করে। পায়ের চারপাশে ভনভন করছে মাছি।

—কি সম্বাদ মোসলেম ?

—জি !

—বল। ডর কিসের ?

—পান্তবাসি, সালুনতরকারি, মিঠা কুমড়া, রহড়ডাল, পিয়াজ, পুড়া লংকা।

—সব পাবে।

—বাবু এই মাত্র ফিরলে মা। জিপগাড়ি আসলেন, বউমা আসলেন, পুলিস আসলেন। শিশাডিহায় সালাত কায়েম করেছেন। তার ঠিক আগে বংশী কদমের ভিটায় চাষ জুড়েছে মা ! বেধবা-বউ উচ্ছেদ হয় জননী ! ললিতের টাকটারে জমিভিটা খাইয়ে দিলে ব্যথা ! মণি তুমি দেখবা না খুকা ! রাহুল থাকলে রুখে দিত বাপ ! মা গো, বাঁচাও অবলাকে !

মণি চমকে উঠল। বাপু এসেছেন, এই ভোরে হাওয়া উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। রাতে শশাঙ্ক বলেছিল হাওয়াকে তেরোঘরায় চলে যেতে হবে। মণি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

প্রলম্ব দীর্ঘ পা ফেলে দৌড়তে থাকে বাঘের পাল্লায় এক কিশোর। তার রক্তের মধ্যে গর্জে ওঠে অদম্য অশিক্ষা, অন্ধ বেগবান বিদ্যুৎ লাফিয়ে ওঠে পায়ে পায়ে, পেশীতে তার বিপুল হিংসা আর মানবিকতা মিশ্রণ ঘটায় আদিম ভালবাসা আর নিষ্ঠুরতার। সে বড় দাম্ভিক কিশোর, উদ্ধত তার মূর্খবুদ্ধি।

যেদিন কার্ল মার্কস ছিলেন না এই পৃথিবীতে সেদিনও এই সহিংস নিষ্ঠুর কিশোর জন্মেছিল অরণ্যক্রোড়ে। তার মাতৃভূমি ছিল না, দেশ ছিল না। তার ছিল এক জীবগোষ্ঠী, তার ছিল শস্যগর্ভ মাটি আর পশুদল। সে বার বার ধ্বংস হয়েছিল। বারংবার জন্মেছিল মাতৃভ্রূণের দয়ায়, গর্ভ-চিৎকারে। তাকে কেউ দীক্ষা দেয়নি, শুধু কেউ অস্ত্র তুলে দিয়েছিল হাতে।

মণি জানে, অস্ত্র সে ফেরত দেয়নি। সেটি রয়েছে উপরে। আকাশে চোখ তুলল সে।

অতি প্রলম্ব বাঁশের আঁকড়ি তালগাছে লাগিয়ে আকাশে চোখ তোলে, বেগোর রঙ আর বন্দুকের রঙ এক। সব মোজ কেটে ফেলেছে মণি অধিকারী। ওই হোথায় লুক্কায়িত কার্তুজভরা অস্ত্রটি।

চন্দ্রিমা ডোবার ধারে ছুটে আসে। খড়গাদার কাছে। হুকুম তাকে এখানে ডেকে এনেছে।

—ওই দেখো, বন্দুক পেড়ে নামাচ্ছে বউদি ! তাজের বন্দুক। দেখো কী চকচকে জিনিস।

মণি বাঁশ বেয়ে নেমে আসতে থাকে। পিঠে ঝুলছে বন্দুকের খাড়া নল।

মণির চোখ বাঘের চোখের আগুনে ধকধক করছে। সূর্যোদয় হচ্ছে রাঙা দিগন্তে

কালো মাটির দেশে।

॥৫৬॥

সাদা চৌধুরীর মনে হচ্ছিল তাঁর কথা বলতে ভাল লাগছে। তিনি এতদিন বোবা হয়ে থেকেছেন নাকি তাঁকে বোবা সাজিয়ে রাখা হয়েছিল এই অতি ভোরবেলা মনেই পড়ে না। শিশাডিহায় নেমে তাঁর দেহে এবং মনে বল এসেছে। অবাক হয়েছেন তিনি, তাঁর নামে মানুষ স্লোগান দিচ্ছে।

আগে তাঁকে দেখে মানুষ সালাম বাজাতো। ডাক্তারির সুবাদে জনপ্রীতি ছিল অসম্ভব। কিন্তু তাঁর নামে স্লোগান তিনি ভাবতে পারেন না। শিশাডিহা থেকে দল বেঁধে মানুষ ছুটে এসেছে, সঙ্গে টেনে এনেছে অন্যান্য গ্রামের মানুষকে। মোহড়া-চিৎপুর ভেঙে এসেছে স্রোতের মত তাঁর উঠোনে।

একটি রোগা শীর্ণকায়া যুবতী-মায়ের কোলের দিকে চেয়ে দেখলেন সাদা। পিলে মোটা, অতি রুগ্ণ, গলায় কালো ডোর বাঁধা শিশুর করুণ বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দেখে তাঁর অন্তর মোচড়াতে লাগল। নূপুরের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে আহ্বান করেছিলেন এবং চেয়ে দেখেছিলেন আনন্দ-বিষাদে তীব্র কষ্টে সুখে অশ্রু-পীড়িত আয়েষার চোখ। সামনে ছুটে আসতে চাওয়া অধীর অভিমানী ছোট মেয়ে নূপুর, সিঁড়ির নিচে শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তার পিছনে নামাজ শেষে স্নিগ্ধ পবিত্র আয়েষার মূর্তিটি।

দু'হাত আহ্বান-উদ্যত, প্রসারিত ব্যাকুল তৃষ্ণায় আবেগ-বিহ্বল। তাঁর বলতে ইচ্ছে করল, বউমাকে সঙ্গে করে ফিরেছি চামেলি, বড়ই দাগা দিয়েছে জীবন, কিন্তু বেঁচে আছি এখনও। আজ এ-ঘরে বধূবরণ হবে। কী জানো আয়েষা, চন্দ্রিমাকে কতক্ষণ আমি চিনতেই পারিনি। ভাবছিলাম, চিনতে পারলে যদি ক্ষতি হয়।

দু'হাত প্রসারিত ছিল। হঠাৎ সাদার চোখ চলে গেল রোগা বউটির কোলে। নূপুর তাঁর বুকে ছুটে আসার আগেই দু'হাত ঘুরে যায় ওই দিকে।

—দে মা। তোর ছেলেকে কোলে দে। আমি তোর পুটোটাকে ওষুধ দি। চামেলি! মেডিসিন বক্স নিয়ে এসো। ওষুধ না দিলে এ বাচ্চা বাঁচবে না। হুকুম আলি! মণিকে ডাকো। তরফদারের বন্দুক ফেরত দিতে হবে। ছোটখোকা আমাকে কথা দিয়েছে। যাও! বলে পুটোকে কোলে করলেন সাদা।

ক্রমশ উঠোন হয়ে উঠল জন-সমুদ্র। চন্দ্রিমাকে চোখের ইশারায় অন্য দিকে ডাক দেয় হুকুম। চন্দ্রিমা ডোবার ধারে তালগাছের কাছে চলে আসে।

এস. পি. তাঁর পেয়াদাকে সঙ্গে করে ডোবা এবং তালগাছের থেকে বেশ খানিক তফাতে পথের উপর দাঁড়িয়ে মণির নেমে আসা লক্ষ করছিলেন। তিনি বন্দুকটা ফিরিয়ে নিয়ে তরফদারের হাতে তুলে দিতে চান। খুব অবাক হচ্ছিলেন, মণি অস্ত্রটিকে কিভাবে লুকিয়ে রেখেছে!

অম্বরীশলাল পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পেয়াদাকে বললেন—ওহে ঘটক! মণিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। তরফদারের ওখানে। আমি চৌধুরীকে একটু বলে যাই। বলে সুপার দ্বিতীয়বার রাহুলদের বাড়িতে ঢুকে আসেন।

মণি নেমে এল মাটিতে।

—বাপু এসেছেন মণি! বলে উঠল চন্দ্রিমা। মণি বউদির চোখে চোখ রাখল শান্ত

করে, যেভাবে পাখির ডানা তার শাবকের উপর নেমে বসে, ছড়িয়ে ঢাকে প্রাণ।

—বউদি! বেতন পেয়েছ?

—পাব শিগগির হয়তো। তুমি ভেবো না। বাপু ফিরে এসেছেন।

—তুমি থাকবে তো বউদি! খুব বিহানে বুলবন ভাই মুনিষ খুঁজতে গেছে! আমি ব্যথাখালাকে বন্দুক-চাবি ফিরিয়ে দিয়েছি। এই বন্দুকটা ফিরত দেওয়ার আগে আমার কাজ আছে। তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি। বলেই মণি রাস্তায় উঠে যায়।

—শোনো! বলে ডেকে ওঠে চন্দ্রিমা।

পেয়াদাটা মণির দিকে এগিয়ে আসে। মণি তাকে দেখে বলে— আসছি পুলিস সাহেব! আপনি অপেক্ষা করেন ইখানে। যাব আর আসব।

কথা শেষ করেই মণি হনহন করে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। চন্দ্রিমার মনে হল, বন্দুক হাতে মণির ছুটে যাওয়া সুলক্ষণ নয়, খারাপ কিছু হবে না তো! নিশ্চয় হবে। মুহূর্তে চন্দ্রিমা বুঝতে পারে, কোনও সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। মণির অতি শান্ত স্বর রহস্যজনক।

চন্দ্রিমা আর দেরি না করে মাঠের পথে ছুটে যায় মণির ছুটন্ত দিগন্তে। পেয়াদাটিও চন্দ্রিমার পিছেন অগ্রসর হয়। ঘটক ঈষৎ বিভ্রান্ত।

পথের উপর বুলবনের সঙ্গে দেখা হয় মণির।

—কোথা যাস?

—আসছি। বউদি এসেছে ভাইয়া। বাপু ফিরেছে। যাও তুমি।

—তুই কোথায় যাবি? বন্দুক কেন? দাঁড়া। শোন্!

—না। আমার কাজ আছে। বলে এবার সহসা দৌড়তে শুরু করে মণি।

বুলবন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে মণির ছুটে যাওয়া দেখে। পথের অন্য প্রান্তে চন্দ্রিমাকে ছুটে আসতে দেখেই সে মণির পিছু ধাওয়া করে।

তীরবেগে ছুটে গেছে মণি। বুলবন মণিকে ধরতে পারে না। চন্দ্রিমা চিৎকার করতেও পারছিল না। পেয়াদাও পিছুপিছু ছুটে আসছিল।

মণি কদমের ভিটার কাছে পৌঁছে যায়। বাপু এসেছেন বলে তামাম গাঁ চৌধুরী-প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছে, এখানে লোক নেই তেমন। দু'চারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া বেওয়ার উচ্ছেদ হওয়া দেখছে। মণি কদমের ভিটের লাগোয়া চৌদ্দ কাঠার জমির গাবগাছের তলে এসে দাঁড়ায়। চাষ জুড়েছে বংশী। দূরে শোনা যাচ্ছে ললিতের ছুটে আসা ট্রাকটরের শব্দ।

শব্দ দূরে নয়। দু'মিনিটের মধ্যে ট্রাকটর চালিয়ে এল স্বয়ং শশাঙ্ক। নেমে এল বংশীর লাঙলের কাছে। চাষ বন্ধ করে দিয়ে বলল—লাঙল-বলদ রেখে দে।

বংশী বলল—আপনি ভিটা উপড়ে দ্যান। আমি জমিন চষি বাবু! ভাঁওরে পোকা লাফায়, ওই মাগীডাও তরপাচ্ছে দ্যাখেন। যা, যা!

চষা মাটির উপর লাঙলের মুঠি ধরে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়েছে হাওয়া। চষতে দিচ্ছে না।

—হটে যা, ফুঁসবি না। নাকের পাটা ফোলায় মাগী। বংশী বলে ওঠে চাপা ক্রোধে। সর্প-প্রতীক হাওয়ার কণ্ঠে চাপা বোবা কষ্ট।

ভিটার মাটি আলগা হবে, ধসে যাবে সংসার। মণি দিশা পায় না, রাত্রির ঘটনার পর এরকম ভোর!

বংশীর লাঙল চলেছে হড়হড় করে, মাটি বিদীর্ণ করে যাচ্ছে ফাল। দু'পাশে মাটি সরে গেলে যেরকম পালি পড়ে, গভীর ছিন্নভিন্ন হওয়া আঁচড়, তারই নাম ভাঁওর। লাঙলের বিদ্ধ ভূমির ভাঁওরে পোকা-পতঙ্গ লাফিয়ে ওঠে।

—দাদা! আর ছিড়ো না মোকে। এ জমিন ন্যালার বাপের জমিন বংশীবদন, দাদা গো!

—কে বলেছে তোকে!

—ভূমিহীনের আশ্রয়, দখলের স্বত্ব আছে দাদা।

—সেই স্বত্ব বাবুর কাছে বেচে গেছে কদম। যা, সরে যা।

—না। বেচে নাই, নরলোক জানে।

—রেকর্ড নাই হাওয়া।

—আছে।

ভাঁওরের জমিতে নিজেকে আছড়ে ফেলল হাওয়া বেওয়া। তারপর শশাঙ্ককে দেখতে পেয়েই পাগলের মত ছুটে গিয়ে পায়ের তলায় পড়ে গেল।

—বাবু! গতর আমার, জমিনও আমার।

—তুই জানিস না কালোসোনা। আমার জমির হাতায় এ ভিটে। স্বত্ব কোথায় পাবি তোরা!

—আছে বাবু!

—ও আমি মানি না কদমের বউ। ক্যাম্পে গিয়ে নাম লেখালেই জমি হয়ে যায় না, জমি সহজ নয় হ্যাবা। আমি তোর স্বামীকে বসত দিয়েছিলাম মৌখিক, রেকর্ড কিসের শুনি! এ জমি আমার সিলিং-এর মধ্যে পড়ে। এখানে পুকুর হবে, শানবাঁধা ঘাট হবে। যা, চলে যা। তেরোঘরায় কলোনি হয়েছে, সেখানে যা।

বুলবন ছুটে এল শশাঙ্কর সামনে। বলল—চাষ বন্ধ করতে হবে ছোটবাবু। এ জমি খাস। আপনার জমি নয়। কদমের স্বত্ব বসেছে এতে। তা ছাড়া জমি আগলাবার জন্যে কদমকে এখানে বসত দিয়েছিলেন, যাতে কিনা আর পাঁচজন ভূমিহীন এসে কলোনি না গড়তে পারে। এ ছাড়াও কথা আছে।

—কী কথা?

—পুরনো রেকর্ডে দাগ খতিয়ান দেখলে বুঝবেন, কদমের পূর্ব-পুরুষ এখানে বাস করত।

—সেটা কোনও কথা নয়।

—কথা সেটাই যে, এই জমি তাদেরই ছিল। আপনি তাদের বসত দেন নাই, কদম তার পুরনো স্বত্ব ফিরে পেয়েছিল, এ জমি মোটেও আপনার নয়।

—মিথ্যে কথা। কোথায় রেকর্ড পেলে তুমি? সরে যাও বুলবন, হেথা পলিটিক্স ঢোকাবে না।

—ও বিধবা, ওর কী আছে আর! ছেলে গেছে, স্বামীও গেছে, ওকে ভিটে-ছাড়া করবেন না। অনেক তো হল!

—কী হল!

—ন্যালাকে হত্যা করলেন, ইউ কিল্ড হিম। পুলিস কদমকে মারল।

—চোপ্ শালা! তোমাকে কুপিয়ে মারব বুবন চৌধরী! ললিতের জমানায় কেউ লাটের মতন জিদ করে না আহামক, লুকিয়ে পার্টি করে এত চেতাচ্ছ কেন! যাও, চলে

যাও। মুখ বুজে থাকো, যা করবার করছি, দেখে যাও!

—না। এ হতে পারে না। এই মেয়েটার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ...

—কী বললে...আর একবার বল... রিপিট... রিপিট কর। অ্যাই বংশী, পাচন নিয়ে আয়! দাঁড়া, আমি দেখাচ্ছি! বলেই শশাঙ্ক হনহন করে ছুটে গিয়ে ট্রাকটর চালু করে ভিটার গোড়ায় ফাল মেরে মাটি উপড়ে ঘর ভেঙে দেয়।

—আপনি নেমে আসুন। ট্রাকটর বন্ধ করুন। চিৎকার করে ওঠে বুলবন। কিন্তু চোখের সামনে সবই ধ্বংস হয়ে যায়। হাওয়ার গৃহ আর গৃহ থাকে না। মাটিতে ভেঙে পড়ে, মাটির গোলা ফেটে গমের দানা ছড়িয়ে গেলে কোথা থেকে মুরগি ছুটে আসে দানা খেতে।

মণি গাবগাছের তলে দাঁড়িয়ে দেখছিল মুরগিরা দানা খাচ্ছে। একবার হাওয়া ছুটে যাচ্ছে মুরগি তাড়াতে, তারপর পাগলের মত ছুটে এসে বংশীর লাঙলের মুঠো চেপে ধরতে চাইছে। বংশী ওকে পাঁচন দিয়ে মারল।

কদমের পূর্ব-পুরুষরা এখানে বাস করত এককালে। পরে সেই জমি জোতদারের দখলে চলে যায়। ললিতের পূর্ব-পুরুষ শোনা যায় সদরঘাটের মেঠাইয়ের দোকানে কদমের কোনও পূর্বপুরুষকে মেঠাই খাইয়ে টিপছাপ করিয়ে নেয় জমির স্বত্ব, এ কথা যদি মিথ্যাও হয়, গল্প হয়, তবু এ-কথা মিথ্যা নয় যে, একদা এখানে বসতি ছিল কদমের চৌদ্দপুরুষের কারও। ধরা যাক, হয়তো তা-ও ছিল না, সেটিও কোনও কাহিনী। ভাবছিল মণি। ওর কেবলই রাত্রির দৃশ্য, দেয়াল, কুপি, চন্দ্রালোক এবং বসন হাতে ধরা অন্ধ ফুফুকে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

—গৃহ দিব। কাঁকই দিব। মল পিঁদবি পায়ে, কোমরে বিছা দিব। নাকে নথ দিব। নোলক। এইসব কথা কি সত্য নয়? কদমকে এখানে ঘর তুলতে দিয়েছিল ললিত-শশাঙ্ক। এই জমির সরকারি হিসেব আছে কি নেই, সে অত্যন্ত রহস্য। আবার কদম স্বত্ব পেয়েছিল বলে যা শুনতে পাওয়া যায়, তা-ও কি বাতাসের কণ্ঠস্বর মাত্র! জমি কি দুয়াভুয়া পিছল অস্থাবর? জমি কি জলে ফসকে যাওয়া সাবান? আহা! লাল মোরগটা ঘাড় বাঁকিয়ে করকর করছে, দানা তুলছে অবজ্ঞায়, দর্পে।

—বংশীদাদা, আমাকে বাঁচাও! ডুকরে উঠল হাওয়া।

—থাকতে দেও ছোটবাবু, পায়ে পড়ি, যা চাহ দিব, রাতে আসবা না?

—কী বললি, এত আস্পদ্দা তোর!

—ঠিকই বলেছে, আপনাকে আমরা জানি। ও আপনার রাখনি। বলে উঠল বুলবন। ট্রাকটর থেমে পড়েছিল। শশাঙ্ক নেমে এসে বুলবনের গালে চড় কষিয়ে দিল প্রচণ্ড।

—এটা অন্যায় শশাঙ্ক! আমি বাবুর ছেলে! আমাকে তুমি মারলে!

—হ্যাঁ, মারলাম। যা পারিস কর গে যা। ঘরে বউ রাখতে পারসি না, চাকরি পাস না হতভাগা! মুরোদ তোর জানা আছে! বলে শশাঙ্ক বুলবনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

লোক জমছিল ধীরে ধীরে। চষা ভুঁইয়ের উপর পড়ে গিয়ে গালে হাত দিয়ে মহাবিস্ময়ে শশাঙ্ককে লক্ষ করছিল বুলবন। এক হাত গালে, অন্য হাতটি দেহের বল ধরে পিছনে মাটিতে ভর করা, যেন পুঁতে গেছে।

বুলবন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—ফের বলছি শশাঙ্ক, এ জমি তোমার নয়। তুমি ভিটে ভাঙলে, এই ঘর তোমাকে তুলে দিতে হবে। যত গাছপাতা, লতা, ডাল, শিকড় নষ্ট

করলে সব বুঝে নিতে চাই। তোমার জমানার শেষ আছে শশাঙ্ক !

—কে বলেছে তোকে, আমার শেষ আছে ! আমি যাব, তিমির আসবে। তিমির যাবে, আমি আসব। জমি যাবে, জমি আসবে, আইন যাবে, আইন আসবে। ভিটা দিব, কেড়ে নিব। তুই কুঁই কুঁই করবি পার্টির কুত্তা, শালা বিপ্লবী ! মাগ রাখতে পারিস না, শালা ! বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে বেড়াতে হয় কেন রে বাবুর বাচ্চা ! হায় হায় হায় গো, এ কেমন বিহা গো ! ঘর সামলে রাখ বুবন, আমার কাজ আমাকে করতে দে পশু।

শুনতে শুনতে বুলবন স্তম্ভিত হয়ে যায়। কথা ফুটে বার হতে চায় না। ধীরে ধীরে লোক আসতে থাকে, জমতে থাকে ভিড়। জিপ আসে সশব্দে।

হঠাৎ চমকে ওঠে শশাঙ্ক। বন্দুকধারী মণিকে দেখতে পায়। চন্দ্রিমা সবই শুনছিল জমির কিনারে দাঁড়িয়ে।

চিৎকার করল—শশাঙ্কবাবু ! আপনি স্থান ত্যাগ করুন দয়া করে, স্যার আপনি ওঁকে শিগগির চলে যেতে বলুন ! বলে চন্দ্রিমা এস. পি-র দিকে সানুনয় দৃষ্টিতে চাইল।

এস. পি. গলা তুলে বললেন—মণি ! তুমি বন্দুক ফেরত দাও। এ জায়গাটা লগড়াজলি নয় শশাঙ্কবাবু ! আপনি নিরস্ত্র। ফিরে যান।

—আপনি তো আছেন ! মণিকে সরিয়ে নিন ! বলে ওঠে শশাঙ্ক।

—না। আপনি কথা না বলে চলে আসুন। মণি ! বন্দুকটা আমাকে দাও। ওটা তোমার নয়। বন্দুকের বিনিময়ে তোমার বাবাকে রিটার্ন করলাম। ফিরে এসো খোকা। না হলে বাপুকে আবার নিয়ে যাব। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অম্বরীশ।

হুড়বড় করতে করতে টলতে টলতে কোথা থেকে সহসা ভয়ংকর আর্তনাদ করে চষা জমিতে নেমে আসতে থাকে ফুফু। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে তার ভাইঝির কী সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

—খোকা ! তুমি এদিকে চলে এসো মণি ! এই ঘটক, সাদাবাবুকে ডেকে আনো। কে আছো, সাদা চৌধুরীকে নিয়ে এসো এখানে ! বলে ওঠেন এস. পি.।

দেখা যায়, শশাঙ্ক মণিরই দিকে এগিয়ে চলেছে।

—যাবেন না। ভুল করছেন ! বলে ওঠেন অম্বরীশলাল। মণি এবার বন্দুক তাক করে শশাঙ্কর বুক লক্ষ্য ক'রে ; চন্দ্রিমা চেঁচিয়ে ওঠে—ওকে নিষেধ কর বুলবন !

বুলবন ছুটে যায় মণির দিকে। তারপর থেমে পড়ে হঠাৎ। এবং পাগলের মত আর্তনাদ করে—বাপু ! বাপু এসেছেন মণি ! তুমি থেমে যাও !

মণির চোখে ভাসছে কুপির শিখা, তার আড়ালে শশাঙ্কর মুখ। রাহুলের ডাক কি শুনতে পাচ্ছে মণি ? কোনও অদৃশ্য স্বর ?

—আমি বাঁচব না রাহুলদাদা ! দয়াল আমাকে ডাকছেন। সোনাই, এই দ্যাখ, এই আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র, এই মাঠ, এই মাটি, ওই ন্যালার মা ! কালা, অন্ধ ফুপু—এইসব আমাদের দেশগাঁ, এখানে কত যে উচ্ছেদ-বিচ্ছেদ হয় ! একথা ভাবতে ভাবতে মণি ট্রিগার টিপে দেয়।

—একটা গুলিতে জমানা বদলায় না শশাঙ্ক, গাঁ বদলায়। সোভান আলি ! বলে চিৎকার করে উঠল মণি। সমস্ত ভূ-প্রকৃতি কেঁপে উঠল। কোঁ কোঁ করে ডেকে উঠল মোরগ, পাখা ঝাপটে তীরবেগে উড়াল দিল ত্রাসে, দিগ্‌ভ্রান্ত একদল পাখি, লালবর্ণ ঝুঁটি উড়ল মরাইয়ের দিকে।

দ্বিতীয়বার গুলি চালিয়ে দিল মণি। বুলবনের চোখের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল

শশাঙ্ক।

বুলবন মণির বন্দুকের নলের দিকে চেয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বিমর্ষস্বরে ব'লে উঠল—এ তুই কী করলি ভাই!

বংশী লাঙল ফেলে ভয়ে পালিয়েছে, সেদিকে একবার চেয়ে দেখল মণি। একটি গরু কলকল করে পেচ্ছাব করছে ভাঁওরে, পতঙ্গ উড়ছে মাটির দীর্ণ বুক থেকে, সূর্যের আলো ঝলমল করছে গাছে গাছে, বউলে। আমের মঞ্জরি মৌমাছির গুঞ্জনে অধীর। আকাশে চোখ তুলল মণি, মনে হল আজ তার পাপমুক্তি ঘটল। খুব পবিত্র লাগছে নিজেকে।

মণি পা বাড়াল সামনে। যারা দল বেঁধে বাবুকে দেখতে এসেছিল, সব তারা এখানে জড়ো হয়েছে দ্রুত। আরও লোকজন ছুটে আসছে। মণির একবার ছোটবোন নূপুরকে দেখতে ইচ্ছে হল। কোলে নিতে ইচ্ছে হল।

এস. পি-র সম্মুখে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সে। এস. পি-র পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অতি বিহ্বল চন্দ্রিমার চোখে চাইল।

তারপর বলল—আমি যাচ্ছি বউদি! বলে মণি বন্দুকটা অম্বরীশের দিকে এগিয়ে ধরল।

চন্দ্রিমার ঠোঁট দু'টি থরথর করে কেঁপে উঠল।

—বাপু এসেছেন, তুমি যাচ্ছ মণি!

—হ্যাঁ, বউদি। ফুলভানুকে ব'লো লাল-সাদা গরু দুইটাকে জাব দিতে জুত মতন। বলবে তো?

—বলব মণি।

—বুলবন ভাইয়াকে ছেড়ে যাবে না?

—না।

—বাবুর সঙ্গে চিকিৎসা করবা গরিবের, ইকবাল রুকসানার সাথে দেখা করবা। করবা তো?

—হ্যাঁ, করব।

—রাহুলদাদা একদিন আসবে বউদি!

—অপেক্ষা করব ভাই।

—আমার অনেক ঘাট হল নাকি?

—না।

—দোষ তো করিনি!

—না।

—তোমার কষ্ট হয়?

—না, না, না! হয় না মণি! কোনও কষ্ট নেই, দ্যাখো এই তো আমি কাঁদছি না পর্যন্ত। ওকে নিয়ে যান অম্বরীশবাবু! বন্দুক তো আপনি পেয়েছেন। আর কী চান আপনি আমাদের কাছে? বলুন, আর কী চান?

এস. পি. ঈষৎ বিষণ্ণ গলায় কথা বললেন—ভেবেছিলাম চৌধুরীকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাব, তা কিন্তু হল না! ঘটক! তুমি এখানেই থাকো, আমি আসামীকে নিয়ে যাচ্ছি। লোকাল থানা থেকে টিম এসে ডেডবডি তুলে নিয়ে যাবে। ও-কে?

ঘটক বলল—আজ্ঞে!

—চলো হে! মণির দিকে চেয়ে দেখে অম্বরীশ বললেন।

মণির দিকে আর চোখ তুলে চাইতে পারল না চন্দ্রিমা। দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়ল। চোখের সামনে রৌদ্রালোক কেমন মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে গেল।

প্রচণ্ড গুঞ্জন নয়, প্রায় নির্বাক জনমণ্ডল ধীরে ধীরে কথা বলা শুরু করল।

বুলবন এসে জিপের কাছে দাঁড়িয়ে বলল— মা আর বাবাকে একটু দেখতে দিন স্যার! নূপুরকে একটু কোলে নিতে দিন মণিকে। এসো বাবু, মা এসো! নূপুর আয়। নাতাশার সঙ্গে তোর দেখা হল না ভাই!

সাদা চৌধুরী ভিড় ঠেলে ছোট মেয়ের আঙুল ধরে জিপের কাছে আসেন। আয়েষা আসেন।

—সবই পরিহাস অম্বর, আমার সন্তানকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, ওকে মেরে ফেলো না। ইট ইজ এ পলিটিক্যাল মার্ডার। অ্যাবসোলিউটলি পলিটিক্যাল। আমি তোমার কাছে একদিন হিসাব বুঝে নেব। সন্তান ফেরত চাইব অম্বরীশ। কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন সাদা।

অম্বরীশলাল ভয়ংকর তাচ্ছিল্যে সহসা অট্টহাস করে বললেন— আপনি একটা পাগল চৌধুরী সাহেব। আপনার সন্তান যাচ্ছে জেলে, তবু আপনার তেজ মরল না।

—অনেক কঠিন এই প্রাণ অম্বরীশ। শোকতাপ তো নাই বুকে। মানুষ আর নাই আমি। ওই ছেলে আমার অন্ন জোগাতো মুখে, ওকে আমি চাষী বানিয়ে রেখেছিলাম। লেখাপড়া করাতে পারেনি। বউ এল ঘরে, আর ওকে তুমি জেলে নিয়ে যাচ্ছ। রাহুল আর মণি— আমার দু'টি ডানা— কেটে ফেলে দিলে কিসের দোষে, বলে যাও! পাগল বোবা বাপ ; এমন কেন করলে অম্বর!

—বন্দুক আমি ফেরত পেয়েছি চৌধুরী সাহেব!

—এই শর্ত ছিল না যে, তুমি আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে। চামেলি! তুমি খোকাকে যেতে দিও না! ধর ওকে! বলতে বলতে জ্ঞান হারাতে হারাতে সাদা চন্দ্রিমার দিকে হাত বাড়ালেন। একপাশে বুলবন, অন্যপাশে চন্দ্রিমা ছুটে এসে বাপুকে ধরল।

আয়েষা মণির মাথায় হাত রাখলেন, তিনি স্থির। তাঁর দু'টি চোখে অপার স্নেহ ছলছল করছে। জিপে বসেই নূপুরকে কোলে নেয় মণি, একটা চুমু দেয় নিঃশব্দে।

—মা! আমি আবার আসব। বলে ওঠে মণি। তারপর বোনকে ফিরিয়ে দেয় মায়ের কোলে। জিপ ছেড়ে দেয়।

আয়েষার স্পর্শের বাইরে আচমকা চলে যায় ছোটছেলে। কী আশ্চর্য, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সেই প্রত্যুষে নামাজে সিজদা দিয়েছিল মণি। কী রহস্যময় সন্তান তাঁর। বলে গেল, আবার আসবে! যেন সে আবার জন্ম নেবে তাঁর কোলে। উচ্ছেদ-বিচ্ছেদের গ্রাম-ভুঁইয়ে জন্মাবে বারবার, আয়েষা মা হয়ে আসবেন ধরিত্রীর বুকে—তাই-ই কি বলে গেল খোকা!

বুলবন সহসা চিৎকার করে উঠল বাপুকে সামলাতে সামলাতে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। বলেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের, তার বিদীর্ণ আর্তনাদ ব্যর্থ হল না। প্রতিধ্বনি জেগে উঠল আকাশে।

অতঃপর বুলবন অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে জনতার দিকে চাইল। গলা তুলে বলে উঠল—না বন্ধুগণ! স্লোগান নয়। আপনারা মণিকে নিঃশব্দে যেতে দিন।

—না। এ হতে পারে না। স্লোগান উঠবে। কে একজন বলে উঠল সচিৎকারে জনতার ভিতর থেকে। জিপকে ঘিরে জনস্রোত উত্তাল পরিধি বাড়িয়ে চলল স্লোগানে

শ্লোগানে।

বুলবন চন্দ্রিমাকে বলল— বাইরের থেকে দেখলে এ কাজ হয়তো কেমন মনে হতে পারে দোলন। বড়ই নিষ্করুণ, বড়ই কঠিন। এ-ও এক পরিচয় আমাদের। স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ কিন্তু পাষাণ ঠেলে ফেলবে। আমি কখন শ্লোগান দিয়েছি, কেন, কিভাবে বুঝতে পারিনি চন্দ্রিমা !

—ঠিক আছে। বলে চন্দ্রিমা আঁচলে চোখ মোছে।

—বাপুকে ঘরে নিয়ে যাও ; আমি আসছি !

—কোথায় যাবে তুমি ?

—এস. পি-কে একটি কথা বলতে হত ! বলল বুলবন।

—কী কথা ? শুধালো চন্দ্রিমা।

—রাহুল ফিরে আসবে। মাস্ট। অতি অসহায়, ছিন্ন ব্যাকুল স্বরে বুলবন তারপর চন্দ্রিমাকে শুধালো—তুমি বিশ্বাস কর না ? কনফিডেন্স... ফেথ্... ভালবাসা...

—করি বুলবন ! গলার স্বর কেঁপে যায় চন্দ্রিমার। তারপর বলে—কিন্তু রাহুল এই রাজ্যে আর নেই !

এ কথায় বুলবনের সুদূরে পরিব্যাপ্ত দৃষ্টি বিষণ্ণ প্রতিহত হয়ে ওঠে, মণির দুঃসহ ভালবাসার কথা ভাবে সে। সমগ্র জীবন কদমের বউ মণির ভালবাসা সইতে পারবে না। সেই অসহনীয় ভালবাসা থেকে শ্লোগান উঠছে।

বুলবন শুধু বলল—ও ! ফিরবে না রাহুল ?

রাত্রি গভীর হলে প্লাবিত জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে ছাদের এক কোণে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল চন্দ্রিমা। এই জ্যোৎস্না তাকে বিভ্রান্ত করে টেনে এনেছিল গত রাত্রিতে গোরাবাজারের পথে। সূর্যোদয়ের তখনও একঘণ্টার অতিরিক্ত, ঢের সময় বাকি ছিল।

তিরিশ মিনিট জিপ তেড়ে এল শিশাডিহার মসজিদ বরাবর, তখন আজান পড়ল ডিহির মসজিদে, ফজরের নামাজ শুরু হল। এস. পি. চেয়েছিলেন সূর্যোদয়ের আগেই সাদা চৌধুরীকে পৌঁছে দিয়ে বন্দুক ফেরত নিয়ে মোহড়া ছেড়ে চলে যাবেন। সঙ্গে তিনি পুলিসদল নিয়ে আসেননি, তাঁর এই প্রায় একাকী অভিযান মণি ব্যর্থ করেছে, সূর্যোদয়ে রাঙা মাটি রক্তাক্ত হয়েছে।

চন্দ্রিমার মনে হল, জীবনের নাটক বড়ই অদ্ভুত। এই জ্যোৎস্না শুধু নাটকীয় নয়, সূর্যোদয়ে সেই নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্য সে দেখল। মণি ব্যথাকে বন্দুক ফেরত দিয়েছে, চাবি দিয়ে এসেছে। তালগাছের চূড়া থেকে নামিয়ে এনেছে তাজের বন্দুক। মনে হয়, কবির রেখে যাওয়া সংগ্রামী বিন্দুটি মণি ভেঙে দিয়ে আরও অজস্র বিন্দু ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। তালগাছে বন্দুক লুকনোর বুদ্ধি প্রকৃতিই মণিকে দিয়েছিল। তালগাছের বেগোর রঙ তাকে আকৃষ্ট করেছিল।

হঠাৎ মনে হল, নাটক শেষ হয়নি। মণি গেছে, কিন্তু সাদা চৌধুরীর স্থির-নিথর মূর্তির পায়ের কাছে রেখে গেছে সংগ্রামী প্রণামটুকু তার। যে-গ্রাম চন্দ্রিমার কাছে দুষ্প্রবেশ্য ঠেকেছিল, সাদা চৌধুরীর পায়ের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলে সেই গ্রাম আর অগম্য থাকে না। সাদার নামে ডাকলে সমস্ত গ্রাম জেগে উঠবে।

বুলবন এসে পিছনে কখন দাঁড়িয়েছে চন্দ্রিমা খেয়াল করেনি। পিছনে ফেরে সে।

—ফুলভানু সুর ধরে এখনও কাঁদছে দোলন। বাবা ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সেই ঘটনা

সহ্য হয় না। রাহুল ফুলিকে 'ভুলভানু' বলে ডাকত!

শুধু ওই এক উক্তি 'ভুলভানু', চন্দ্রিমার সমস্ত আবেগকে হৃদয়ে মথিত করে তুলতে থাকে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কেবল অসম্পূর্ণ একটি কথা গলায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে, 'ওগো না'... ঠিক একথার কী যে অর্থ, কী উদ্দেশ্য, কীই-বা বক্তব্য, কী সেই বিদীর্ণ মর্ম চন্দ্রিমার সত্তায় জড়ানো কেউ জানে না। মাত্র সে 'ভুলভানু' শব্দেরই প্রতিবাদ করে না, নিজেকে সমর্পণ করে বুলবনের বুকে ; ফুলে কেঁপে চোখের জলে শিহরিত হয়, 'ওগো না'... দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার উচ্চারণ করে যায়।

বর্ষা নামে তারপর। ভারতবর্ষের অরণ্য-বেষ্টিত এক গ্রামে তার সারাটা বর্ষাকাল কেটে যায়। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন কোনও এক বর্ষায় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। সেই মেঘ সরে গেল একদিন। আকাশে চেয়ে চেয়ে দেখল রাহুল।

সেই গ্রামেই ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ একটি ট্রানজিস্টর রেডিও-র সামনে বসেছিল রাহুল পারভিজ। এখানে তার নাম সঞ্জয়। গভীর রাতের বেতার-সংবাদে সঞ্জয় জানতে পারে জরুরি অবস্থার অবসান হয়েছে। তার মধ্যে অদ্ভুত একটা আলোড়ন হয়ে যায়। সহসা তীব্রভাবে তার মোহড়াগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়।

এত দূরে এসেও ক'দিন আগে মণির সংবাদ সে পেয়েছে। অনেক দেরিতে নেতৃত্বের তরফ থেকে এই সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে। মণি জেল খাটছে। রাহুলের মনে হল, একবার শুধু ছোট ভাইটিকে চোখের দেখা দেখবে সে। যদি সে দেখা না করে, ছোটভাই মণি বাঁচবে কী করে, ওর সেই ব্যারাম, সেই মূর্ছা, কিভাবে আছে ছেলেটা। ওকে তো বলা দরকার, 'আমি আছি, ভয় কি তোর। ভাই, তোকে যে বেঁচে থাকতে হবে!'

এ বড়ই জরুরি কথা, ভয়ানক জরুরি এই খবর, 'আমি আছি!' আর দেরি নয়। শুধু মুখটা ভেসে ওঠে। মণির দু'টি চোখ দেখা যায় অন্ধকারে। সঞ্জয় ওরফে রাহুল কাঁধে কাপড়ের থলেটি ঝুলিয়ে নিয়ে পথে নামে। চোখের সামনে ভাসছে স্মৃতি-অঙ্কনে অঙ্কিত বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের তারের জাল, মাকড়সার জালের মতন ছড়ানো— ওপারে মণির কম্পিত মুখ। অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে একটি অগ্নিকণিকা ; তপ্ত, উষ্ণ, কঠিন একটা মানুষ। তার কণ্ঠে জেগে উঠছে কত গান, অজস্র সুর ; সে ছুটে চলেছে ডানায় ভর দিয়ে, ঠোঁটে তার ভালবাসার বীজ। ঠোঁটে তার শস্যের কণা।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত